757.5
074/75

শনিবারের চিঠি

ষাণ্মাসিক সূচী

কার্তিক ১৩৬১—চৈত্র ১৩৬১

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

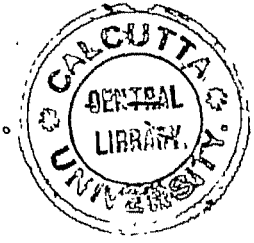

অভিনয় (গল্প)—শ্রীরণজিৎকুমারী সেন ...
অভিনয় (গল্প)—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ...

আকাশ (কবিতা) ...
আকাশ-বাণী (কবিতা) ...
আত্মস্মৃতি (আত্মকথা)—শ্রীসজনীকান্ত দাস ৩২, ১৮১, ২২৭, ৩৫৭,
আবর্তন (কবিতা)—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ...
আমার সাহিত্য-জীবন (আত্মকথা)
—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২, ২১৩, ২৫৭, ৩৪৫

ইস্তাহার (কবিতা) ... ৫

এই গ্রহের ক্রন্দন (উপন্যাস)—দীপক চৌধুরী ... ৫০৩, ৫৮৭
একটি করুণ সূর্যাস্ত (গল্প)—শ্রীশচীন ভৌমিক ... ৪২৫
একটি সাঁওতালী কবিতা (কবিতা)—অসিতকুমার ... ৫৮৭

ঐতিহাসিক চাংতাই (গল্প)—শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় ...

কবি করুণানিধান (কবিতা)—শ্রীপ্রভাকর মাঝি ... ৪৭৬
কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (প্রবন্ধ)—জগদীশ ভট্টাচার্য ... ১৩
কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের স্মরণে (কবিতা)—গোপাল ভৌমিক ১৬
কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণধন দে ৪৭৭
করুণানিধান (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৪৭৩
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)—শ্রীঅবনীনাথ রায় ... ৪৭৯
করুণানিধানের কবিতা (প্রবন্ধ)—শ্রীকালিদাস রায় ... ৪৫৮
ক্রীড় (কবিতা) ...

খড় (গল্প)—শ্রীসঙ্কর্ষণ রায় ...

চলতি পাহাড়ী কবিতা (কবিতা)—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ ...
চাণক্যবচন (কবিতা) ...
চিলিমপুরের ঘাঁট (কবিতা)—অসিতকুমার ...

নিমপুরের ঘাট—প্রত্যাবর্তন (কবিতা)—অসিতকুমার ... ৪৩৩

ন কাব্য বাতিল বন্ধু (কবিতা)—শ্রীঅজিতকুমার সেন ... ৩১৭

ত বনাম মৃত (গল্প)—শ্রীঅমলা দেবী ... ৬৭

(উপন্যাস)—"বনফুল" ৬৩, ১৬১, ২৬৯, ৪১৩, ৪৮১, ৬৩০

াসরা অক্টোবর (কবিতা) ... ৬৬

তুন বছরের ডাইরি (কবিতা) ... ৩৩৯

ই কোনো মিল (কবিতা)—কল্যাণী প্রামাণিক ... ৩৮৫

গল (গল্প)—শ্রীতরুণ রায় ... ২৮৯

র্থক্য (কবিতা)—শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৩৫

পূজা (কবিতা) ... ২০১

পোস্টাফিস-পরিক্রমা (বিচিত্রা)—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ... ৩৪২

প্রসঙ্গ কথা—নারায়ণ চৌধুরী

জীবনশিল্প ... ২৭৮

নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন ... ৩৭০

রবীন্দ্রসঙ্গীত ... ৬০৭

ব্যঙ্গরচনা ... ২০

সাধু ও চলিত ভাষা ... ১৬৮

হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ ... ৫৫২

প্রার্থী (কবিতা)—শ্রীচিত্ত সিংহ ... ৪৩৪

বন্ধু নীরেন বসু (গল্প)—দীপক চৌধুরী ... ২৪১

াংলা কাব্যক্ষেত্রে করুণানিধানের দান (প্রবন্ধ)

—শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় ... ৪৬৫

বাঁশরি ও কৃষ্ণচূড়া (গল্প)—শ্রীবীরেন দাশ ... ৬৫১

বিচার (গল্প)—শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায় ... ১৯৩

স্কো-দা-গামা (কবিতা)—অসিতকুমার ... ৬০০

ষ্মদেব খোশনবিসের পত্র (প্রবন্ধ)—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবিস (ডুপ্লিকেট) ১

মানুষ যতীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—শ্রীকালিদাস রায় ... ১১
মুক্তিস্নান (কবিতা)—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২২
রূপদক্ষ করুণানিধান (প্রবন্ধ)—শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় ... ৪৭
শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় ৬৭১
শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী (কবিতা)—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮০
সংবাদ-সাহিত্য ১০১, ২২৪, ৩২৮, ৪৩৬, ৫৬২, ৬৭১
সমাজ ও বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)—শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ... ৩০৭
সম্পাদকের চিঠি (কবিতা)—"বেতালভট্ট" ... ১১
সর্বেশ্বর (কবিতা)—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৫৫
সহোদরা (গল্প)—শ্রীপ্রণয় গোস্বামী ... ৫০০
সিকি-দেরী (গল্প)—"ভাস্কর" ... ৩৮৭
স্ট্যাটিস্টিক্স (প্রবন্ধ)—যমদত্ত ... ৩১০
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা-সাহিত্য (প্রবন্ধ)—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন ৬১
হৈরব (কবিতা)—"বনফুল" ... ৪৯
হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার (নাটক)
—অনু° যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৫২, ১৪৫, ৩১৯, ৪০৩, ৫৩৫
১৩ই আষাঢ় ১২৯৪ (প্রবন্ধ) ... ১১৩

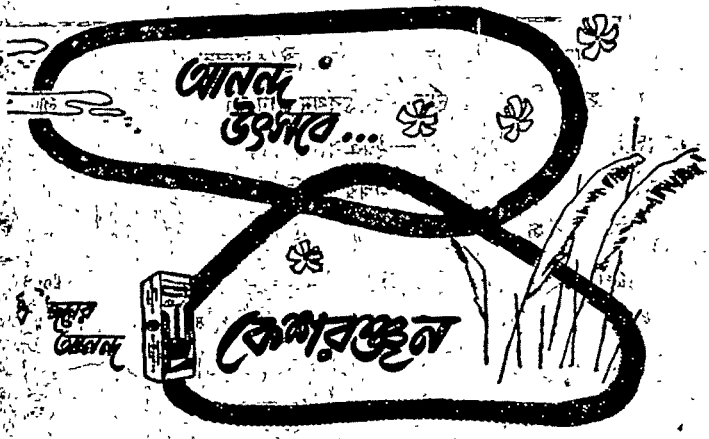

প্রকাশক এন.এন.সেন এণ্ড কোং.লিঃ। কলি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বনে পাহাড়ে ২৷৷০ অসাধারণ ৩৲ অনুবর্তন ৪৷৷০ ইছামতী ৫৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্প-সঞ্চয়ন ৪৲ পঞ্চগ্রাম ৬৲ মন্বন্তর ৪৷৷০ পাষাণপুরী ২৲

অনুরূপা দেবীর মহানিশা ৪৷৷০	রূপদর্শীর নকুশা ৩৲ সার্কাস ৩৲
প্রবোধকুমার সান্যালের যতদূর যাই ৩৲	সাবিত্রী রায়ের পাকা ধানের গান ৩৷৷০
রণজিৎকুমার সেনের রাধা ২৷৷০	ন্যুট্ হাম্‌সুনের ভ্যাগাবণ্ড্‌স্ ৩৷৷০
সন্তোষকুমার ঘোষের চীনে মাটি ৩৲	গজেন্দ্রকুমার মিত্রের রাত্রির তপস্যা ৫৲

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

এ্যালবার্ট হল ৩৷৷০ মহালগ্ন ২৸০ প্রিয়তমের চিঠি ৩৲

অমিয়নাথ সান্যালের স্মৃতির অতলে ৪৷৷০	তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তীর বিপ্লবী বাংলা ৪৷৷০

মিত্রালয় :: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

LIBRARY UNIVERS

শনিবারের চিঠি
২৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬১

ভীষ্মদেব খোশনবিসের পত্র

সম্পাদক মহাশয়,

কমলাকান্তের কৃপায় মৌতাতেই আমার বেশি সময় কাটিয়া যায়, বাইরের খোঁজখবর বিশেষ রাখি না, রাখিবার দরকারও বোধ করি না। মাঝে মাঝে বিপদ হয় পাড়ার সবজান্তা বখাটে ছোঁড়াগুলাকে লইয়া। সে রামও নাই সে আযোধ্যাও নাই যে নির্বিবাদে মৌতাত করিয়া ঢুলিব, আর কমলাকান্তপ্রসাদাৎ নসীবাবুর আশ্রয়ে দিব্য আরাম করিয়া জীবন কাটাইব। কাজেই যুগধর্মে এদিক ওদিক ঘুরিতে হয়, ছোঁড়ারা বয়সের সমীহ না করিয়া তর্ক করিতে আসে। গায়ে জ্বালা ধরে, তবু দুই-চারটা জবাবও দিতে হয়। নহিলে মান থাকে কই? সেদিন বসিয়া ঝিমাইতেছি, এমন সময় ছোঁড়ারা আসিয়া বলিল, কাগজ দেখেছ ঠাকুরদা? কাল অ্যাসেম্বিতে কি রকম জুতো-ছোঁড়াছুড়ি কাণ্ড হয়ে গিয়েছে? স্বীকার করিতেই হইল, পড়ি নাই। মৌতাতের পর খুঁটিয়া খবরের কাগজ পড়িব, এত সময় কোথায়? দ্বিতীয়, কখনও কখনও যেটুকু পড়ি তাহাতে ভিতরের দুই-এক পাতায় অমুক আশ্রমের মামলা, অমুক বাবার কাহিনী, অমুক ধর্ষণের সাক্ষ্য ইত্যাদিতে একটু চোখ বুলাইলেই ছেলেবেলার লুকাইয়া পাঁজির বিজ্ঞাপন পড়ার আস্বাদ মিটিয়া যায়, আর অন্য পাতায় পৌঁছি না। তৃতীয়ত ৺কমলাকান্তপ্রসাদাৎ শুনিয়া শুনিয়া আমার এতটুকু দিব্য-জ্ঞান অন্তত হইয়াছে যে, বুঝিতে পারি, আজ যে সকল বক্তৃতা বা খবর ডবল কলমের হেড-লাইনে গভীর মসীরঞ্জিত হইয়া খবরের কাগজের শোভা বর্ধন করে তাহার অধিকাংশই রাজনীতি নহে, আজ-নীতি, দিনগত পাপক্ষয়—এমন কি পাঁচ বছরের ধোপেও তাহা টিকিবে না। কেবল আজকের সমস্যা নয় বা আগামী ভোটের প্যাঁচ নয়, আগামী দশ-বিশ-পঁচিশ বছরে দেশের কি অবস্থা হইবে, কি মতিগতি হইবে এবং তাহা বুঝিয়া এখন হইতে আমাদের কি করা উচিত, কোন পথে চলা উচিত এ রকম দূরদৃষ্টির কথা ক্বচিৎ কখনও জওহরলালের বক্তৃতায়

পাই, আর কাহারও মধ্যে তাহার ছিটেফোঁটাও নাই। সুতরাং মৌতাত নষ্ট করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে যাইব কোন্ দুঃখে? সেই জন্য এ খবরটিও অন্যান্য খবরের মত আমার চোখে পড়ে নাই।

কিন্তু ছোঁড়ারা আর বয়সের সমীহ করে না, আমায় ছাড়িল না। জোর করিয়া কাগজ পড়াইল। দেখিলাম, এ দিকের এক সদস্য—শুনিলাম লেবার এলাকার সদস্য—চেঁচাইয়াছেন, ওদের চড়াইয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়। অপর পক্ষের একজন সদস্য—শুনিলাম সুন্দরবনের বুনো এলাকার সদস্য—পাল্টা জবাবে জুতা দেখাইয়াছেন। নাঃ, এ তো সেই হরিপদ চাটুজ্জের গদা কাড়ার ব্যাপারকেও অনেক দূর ছাড়াইয়া গেল। খুব হৈ-হট্টগোল হইয়াছে, মুখ্যমন্ত্রী (বেচারা মুখ্যমন্ত্রী,—তাঁহার মত লোকের এই রকম খিস্তি-খেউড়ের মধ্যে বসিয়া এই কর্মভোগ!) শান্ত হইবার জন্য "করুণ আবেদন" জানাইয়াছেন,—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া ধিঙ্গী নৃত্য চালাইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়, একটা কথা বলি। আইন-সভার বাহিরে আমাদের প্রত্যহই কোনও না কোনও পক্ষ বোমা দেখাইতেছে; আইন-সভার মধ্যে তো মাত্র চড় ও জুতা দেখাইয়াছে। তাহাতে আর ধীর লোকের মুহ্যমান হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? বিশেষত আমি ৺কমলাকান্তের চেলা, অহিফেনপ্রসাদাৎ আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে, লাভালাভ সুখ-দুঃখ মান-অপমান দ্বেষ-অনুরাগ সমান হইয়া গিয়াছে। তবু একটা কথা মনে না আসিয়া পারিল না। ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে কি? ছি ছি! এই আমাদের আইন-সভা? যেখানে সারা বাংলার ও বাঙালীর ভাগ্য নিরূপণ হয়, সেই সভার এই চেহারা? তাহার সদস্যদের এই আচরণ? ওই গুরুদায়িত্ব দিয়া জনসাধারণ যাঁহাদের আইন-সভায় পাঠাইয়াছে—সেখানে দেখিব, যুক্তিতর্কের প্রবাহ বহিতেছে, একে অপরের কথা শুনিতেছে, যে পক্ষ হইতেই হউক না কেন ভাল কথা আসিলেই কদর হইতেছে, তাহা কাজে পরিণত হইতেছে, তবে না বুঝিব আইন-সভার সার্থকতা! তাহার বদলে যখন এই রকম চড়-ঘুষি

ও জুতায় কাণ্ডকারখানা ঘটিতে দেখি, তখন সেই মেছোবাজারী কাণ্ডে বাঙালী বলিয়া আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়।

ভাবিয়া দেখুন, এই সব সদস্যের মনে আইন-সভার প্রতি সত্য সত্য কোনও বিশ্বাস নাই। আইন সভার আদর্শ বলিতে সাধারণত যে কথা লোকে বোঝে সেই আদর্শের প্রতি যদি এই সব সদস্যের কোনও বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় দায়িত্বভারে অবনতমস্তকে বিনয়ের সহিত আইন-সভার কাজ চালাইতে বদ্ধপরিকর হইতেন। এখানে তাহা নাই। যিনি চড়ের ব্যবস্থা করিলেন তিনিও মনে করেন না যে, বিরোধী পক্ষের বাধাদানও আইন-সভার কাজ—অর্থাৎ ভোটে না মারিয়া চড়ে মারিবারই তিনি পক্ষপাতী। ডিমোক্রেসির এই ঠাট, এই সব তর্কবিতর্কে স্পষ্টতই তাঁহার বিশ্বাস নাই—তাহার বদলে চড় মারিবার সহজিয়া পন্থাই তাঁহার চোখে ভাল ঠেকিয়াছে। তাই তো মনের অজ্ঞাতসারে রাগের মাথায় ওই কথাটা বাহির হইয়া আসিয়াছে। আর যিনি জুতা মারিবার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন তাঁহার তো কথাই নাই—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। পারিলে অন্য সকল মতাবলম্বীদের জুতাইয়া সিধা করিয়া দিলে ভাল হয়—ভাবখানা এই গোছের। তাই আইন-সভায় বসিয়া ও-রকম জুতা দেখাইতে পারিয়াছেন, নহিলে আটকাইয়া যাইত।

আইন-সভার সদস্যেরা আইন-সভাকে মেছোহাটা করিয়া তুলিতে চান, তুলুন, আমার কিছু যায়-আসে না। আমার মৌতাত ও গুড়ুক থাকিলেই চলিয়া যাইবে। নসীবাবুর আশ্রয়টা থাকিলে আরও আরামে কাল কাটিত। কিন্তু সে কথা থাক্। ইহাতে আমার কিছু না আসিয়া গেলেও দেশের লোকের কথাটা একটু ভাবুন। সে বেচারারা তো দুঃখ-কষ্টে অধৈর্য হইয়া একটু সুখের মুখ দেখিবার প্রত্যাশায় দিন গুনিতেছে। দেশে তো ডিক্টেটরশিপ হয় নাই, এই ডিমোক্রেসি ও আইন-সভার মারফৎই তাহাদের সুদিন আসিবে এই কথাই ভোটের সময় লম্বা-চওড়া স্পীচ ঝাড়িয়া তাহাদের বোঝানো হইয়াছে। আর আজ

তাহাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন (তাও বলি, কাঁঠাল ভাঙিবেই না কেন? সকলের ভোট হইল, সকলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হইল না। এ অবস্থায় কাঁঠাল ভাঙিবে না কেন?) তাঁহারা ভোটের সময় ডিমোক্রেসির মহিমা কীর্তন করিয়া এখন নিজেরাই ডিমোক্রেসির মুখে চড় জুতা লাগাইতে শুরু করিয়াছেন। ঠাকুর কমলাকান্ত থাকিলে নিশ্চয় প্রশ্ন করিতেন, আইন-সভায় নিজেরাই বিশ্বাস কর না, তবে দাঁড়াইতে গিয়াছিলে কেন? ধাপ্পাই বা মারিলে কেন? সি. আর. দাশের মত ভিতরে গিয়া বিরোধীদল শাসনতন্ত্র ভাঙিবে? তাহা দেশবন্ধুর মত লোকও পারেন নাই। আর দেশ স্বাধীন হইবার পরও শাসনতন্ত্র ভাঙিবে? মন্ত্রিত্ব ভাঙিতে পার—কিন্তু সে তো ভোটের জোরেই হয়। এখন আর তাড়াইবে কাহাকে? দেশের লোককেই নাকি? অর্থাৎ যাহারা তোমার মতে মত দেয় না? আর অন্তপক্ষের কথাটাও বলি। তোমাদের হাতে ক্ষমতা, তোমরাও চড়াইবার শর্টকাটের কথা বল? অথচ তোমরা দু দলেই ভোটের আসরে ডিমোক্রেসির গুণগান কর? লজ্জা করে না?

কিন্তু, সম্পাদক মহাশয়, রাগের কথা নয়, পরিহাসের কথা নয়, ব্যাপারটা একটু তলাইয়া দেখুন। অহিফেনপ্রসাদাৎ আমার কিছু কিছু দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে। কয়দিনই বা আর বাঁচিব, কথাগুলি বলিয়া যাই। শুধু আইন-সভার দুই-চারিজন সদস্যের বেয়াড়াপনা নয়, ব্যাপারটা আরও গভীর ঠেকিতেছে। দেশে অনেক রকম দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। ডিমোক্রেসির ভাগ্যাকাশে যেন কাক চিল শকুনি উড়িতেছে মনে হইতেছে। ভিতরে বাহিরে দুর্লক্ষণ। প্রথমে বাহিরের কথাটা বলি। লোকের সামনে রুশিয়া-চীনের আদর্শ আজ অনবরত আসে। ইহা আসিবেই। চীন ভাল কি মন্দ আমি জানি না। তবে লোকে দেখে, আমাদেরই মত দেশ, দারিদ্র্য-অশিক্ষায় জর্জর দেশ আজ হঠাৎ মানুষ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার হুমকি আমেরিকাকেও শুনিতে হয়। অসীম শক্তি তাহার। কমিউনিজ্‌ম্ খারাপ হইতে পারে, তাহার চেয়ে পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসিতে মানবতাবোধ অনেক

বেশি থাকিতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোক তো সামান্য একটু স্বাচ্ছন্দ্য চায়। বিশেষত আমাদের দরিদ্রেরা তাহা চাহিবে না? তাহাদের চোখের সামনে যদি অবিরত একটা দৃষ্টান্ত ভাসে যে, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে অবলম্বন না করিয়াই একটা দেশ আমাদের মতই চড়চড় করিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহা হইলে সেদিকে তাহাদের মন টলিবে না কেন? আর অন্য দিকে যদি আমরা নিজের দোষে কাজ না করিতে পারি তাহা হইলে আসল কারণ অন্য হইলেও দোষটা পড়িবে ডিমোক্রেসির পদ্ধতির উপর। সুতরাং সে অবস্থায় লোকের মন পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসির দিকে টানিবে কেন? তাহাদের দোষ কি, যখন এম.এল.এ.দেরই সে বিশ্বাস নাই?

এক দিকে দুঃখকষ্টের জন্য আমাদের এই অধৈর্য, অন্য দিকে অন্য একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ—এই দুইটিই তো আমাদের দেশে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র অসফল করিবার পক্ষে যথেষ্ট। তাহার উপর আরও দুই-চারিটি বাধার কথা ভাবিয়া দেখুন। প্রথম নম্বর বাধা, আমাদের যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অভ্যাস। ইংরেজ বহুদিন ধরিয়া পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসির খেলা খেলিতেছে—বস্তুত কিং জন ও ম্যাগ্‌না কার্টা কেন, তাহার আগে হইতেই তাহারা ইহাতে হাত মক্‌শো করিতে শুরু করিয়াছে। ইদানীংকার কথা ধরিলেও একালের পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসিতে হাত পাকানোও তাহাদের বহুকাল হইল। তা ছাড়া তাহাদের ধাতটাই উহার উপযুক্ত। যে দেশে পুলিসকে ভিড় সরাইবার জন্য বেটন পর্যন্ত ব্যবহার করিতে হয় না, প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির প্রহরীর হাতে যেদিন রিভলভার ওঠে সেদিন তাহা খবরের কাগজে ছাপার যোগ্য সংবাদ বলিয়া বিবেচিত হয়, হাইড পার্ক কর্নারে সোস্যালিস্ট কমিউনিস্ট আইরিশ আফ্রিকান যে যার খুশি স্বচ্ছন্দে বলিয়া যাইতে পারে, পরস্পরের মুণ্ডপাত করিলেও বোমা ফাটে না, পারস্পরিক গালাগালি পর্যন্ত হয় না, বক্তারা ব্লাডি বৃটিশ ককনি বলিয়া ইংরেজের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিলেও জনতা চুপ করিয়া বক্তৃতা শোনে, সে দেশে ডিমোক্রেসি হইবে না তো কোন্ দেশে হইবে? আর আমরা ইউনিয়ন-বোর্ডে

ভোট দিবার সময় ভাবি, হলধর রাঁড়ুজ্জের পিসেমশায় আমার খুড়োর মাতৃশ্রাদ্ধে ঘোঁট পাকাইয়াছিলেন, অতএব দুই পুরুষ পরে তাঁহাকে বাগে পাইয়াছি এবং ভোট দিব না, রামচন্দ্র সরকারের সঙ্গে আমার দুই নম্বর দেওয়ানী চলিতেছে সুতরাং নিশ্চয়ই তাহাকে ভোট দিব না, তা ছাড়া সৎজাত ছোটজাত ইত্যাদির ঝগড়া, বেটা চাষা অথবা বেটা বামুন ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইবে তাহা অসহ্য—এই সব চিন্তা-ভাবনাতেই তো আমাদের বুদ্ধি বিকৃত। শুনিলাম, উত্তর প্রদেশের এক জায়গায় নবপ্রবর্তিত পঞ্চায়েতে নাকি দোসাধেরা সংখ্যাধিক্যের জোরে পঞ্চায়েৎ দখল করে। তখনই ছড়া উঠিল—

বাহ্মণ কায়স্থ লালা
এ তিনকো মু করদেও কালা
দে দেও দেশ-নিকালা!

যেমন কথা তেমনি কাজ। এক ব্রাহ্মণের কি দোষ পাইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চায়েতের বিচারে সাঙ্গা হইল, গাছে বাঁধিয়া পঁচিশ কোড়া—ভাগ্যক্রমে হঠাৎ পুলিস আসিয়া পড়ে, তাহাতেই বামুন বেচারা কোড়া হইতে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সে যাহাই হউক, আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিব আনুষ্ঠানিক ধর্মের বন্ধনমুক্ত পশ্চিমী ধরনের পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসি—আর আমাদের বিচারবুদ্ধি হইবে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের হাজার রকম দুষ্ট বন্ধনে জর্জরিত—এ দুইয়ের সমন্বয় আফিংযোগেও আমি ঘটাইতে পারি নাই—আপনারা পারেন তো করুন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ইতিহাসের ধারাই এই রকম যে, সকল রকম বন্ধনমুক্ত হইয়া নিজের শিরদাঁড়া সোজা করিয়া আমরা দাঁড়াইতে শিখি নাই। একটা কাউকে খাড়া করিয়া চোখ বুজিয়া তাহাকে অন্ধভক্তি না করিতে পারিলে আমাদের তুষ্টি হয় না। শাস্ত্র হোক, গুরু হোক, বিধি হোক, বিধান হোক, একটা কাউকে খাড়া করিয়া পূজা না করিতে পারা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি নাই। সেই একটা লোক বা একটা বিধি না থাকিলেই সর্বনাশ। গান্ধীর কোনও কথা আমরা শুনি না বটে, কিন্তু তাঁহাকে ঠাকুর বানাইয়া পূজা করিবার

বেলা সমারোহের অন্ত নাই। দেশ চালাইতে জওহরলালকে বেদম হইয়া যাইতে হইতেছে,* তাঁহার সে কাজ সহজ করিবার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ করিব না, অথচ মীটিঙে গিয়া তাঁহার জয় চেঁচাইব—আমাদের কাজের ও ভক্তির ধারাই এই। আমাদের সব বুদ্ধি ও কর্মশক্তি অপরকে জিম্মা দিয়া নিজেরা হাম্বা হাম্বা রবে চীৎকার করি। কাজেই আমাদের একটি রাখাল চাই। আমাদের এই মতি-গতি আর যাহাই হোক, পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসির সহায়ক নহে—পরন্তু তাহার পথে চরম বাধা।

কিন্তু এ সব তো আছেই, তাহার উপর ইহার চেয়েও আরও গুরুতর দুইটি কথা আছে। পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসি স্থাপনের জন্য দেশ-বিদেশ হইতে তিল তিল ভাল জিনিস আহরণ করিয়া আমরা একটি ত্রিলোত্তমা গঠনতন্ত্র গড়িয়াছি। তাহার ফলে এত অসঙ্গতি দেখা দিয়াছে যে, রোজই গঠনতন্ত্র বদল করিতে হইতেছে,—ডান হাতে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে বাঁ হাতে সে অধিকার অনবরত হরণ করিতে হইতেছে। তাহাতে লোকের মনে পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসির উপর শ্রদ্ধা ক্রমেই কমিতেছে। যদি ডেটিনিউ রাখিতেই হয়, তবে আর ব্যক্তিস্বাধীনতার ভড়ং কেন—সোজাসুজি করিলেই তো পার। পক্ষান্তরে জবাব হইল, উপায় কি? যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রাখে না, যাহাদের পার্টি-পতাকা পর্যন্ত অন্য রাষ্ট্রের, সশস্ত্র বিপ্লবে যাহাদের অরুচি নাই,—অন্য দেশে তো তাহাদের মৃত্যুদণ্ড হয়, আমরা তাহাদের আটকাইয়া রাখিতে না পারিলেও রাষ্ট্র চলিবে কেমন করিয়া? ঠিক কথা সন্দেহ নাই। সেই জন্যই শুনিয়াছি, পণ্ডিতেরা নাকি বলিয়াছেন, যখন শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ এত গভীর ও মৌলিক হইয়া উঠে যে গঠনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তাহার সমাধান হইতে চায় না, তখন গঠনতন্ত্র ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। যেমন এখন ঘটিতেছে। ইংরেজ-ফরাসীর ইতিহাসেও ইহা ঘটিয়াছে। যখন শেষ ডুমা রুশিয়ায় হইল, তাহা যদি পঞ্চাশ বছর

* এই লেখার পর সংবাদপত্রে পড়িলাম, জওহরলাল পদত্যাগের কথা ভাবিতেছেন।

আগে হইত তাহা হইলে হয়তো বিপ্লব ঘটিত না। কিন্তু আর যখন তাহা দিলেন তখন গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কাজেই যখন এ রকম সঙ্কট ঘটে তখন সশস্ত্র বিপ্লবই অনেক সময় ঘটিয়া যায়। আর যে সব জাতের বুদ্ধি যথেষ্ট এবং সত্যকারের শিরদাঁড়া খুব মজবুত— যেমন ইংরেজ, তাহারা পূর্ব হইতেই সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তন ঘটাইতে থাকে, যাহাতে সশস্ত্র বিপ্লবের আর প্রয়োজন থাকে না। এ দেশে প্রয়োজনানুরূপ বদল হয় নাই। কাগজে-কলমে যেটুকু হইয়াছে তাহা কাজে কতটুকু হইয়াছে? ঘটিলেও অবনতির তুলনায় তাহা সত্যই কতটুকু? গঠনতন্ত্র হইতে শুরু করিয়া অন্য নানা আইন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা কাজের বদলে বাধা সৃষ্টি করে অথচ তাহার ফাঁক দিয়া হাতী পর্যন্ত পালায়। কত অসাধু ব্যবসায়ী আজ আইনের ফাঁকে পলাইতেছে আর আমরা তাহার প্রশ্রয় দিতেছি। উপরতলায় গলদ, মধ্যে গলদ, গোড়ায় গলদ। কত কেলেঙ্কারি ঘটিতেছে, বন্ধ হইতেছে না। একটা সৎ জওহরলাল থাকিলে কি হইবে, তাঁহারই বাণিজ্য-মন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে আইন-সভায় দাঁড়াইয়া যখন কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক ভেজাল সাবু দমনের চেষ্টার নিন্দা করেন তখন ভরসা কোথায়?

এই কথাটি হইতেই আমার সর্বশেষ কথাটি উঠিয়া পড়ে। আমাদের দেশে আশানুরূপ না হইলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন কিছু কিছু ঘটাইতেছি সত্য। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন উঠে, তাহার ফল কতখানি পাইতেছি আর কতখানি অপচয় হইতেছে? প্রথমত, আমাদের দেশে সাধুতার মানদণ্ড খুব কড়া নয়, গলদ খুব বেশি। সৎ ইংরেজের দেশের আইন চালাইতে গিয়া তাহার ফাঁকে এখানে অসৎ লোক দিব্য মজা লুটিতেছে। দ্বিতীয়ত, পার্টির সঙ্গে গভর্নমেণ্টের সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হয় নাই। বার্কের মত আমরা তো বলিতে পারি-ই না যে, একবার নির্বাচিত হইবার পর সমস্ত দেশের স্বার্থই আমায় সমানভাবে দেখিতে হইবে, কেবল আমার নির্বাচন-কেন্দ্রের নহে। কিন্তু তাহা চুলায় যাক। শুধু যদি নির্বাচনকেন্দ্রের স্বার্থই দেখিতাম, তাহা হইলে তো কথা ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন দেখি আমার দলের স্বার্থ, আমার ব্যক্তিগত সাহায্য-

কারীদের পারমিট লাইসেন্স ইত্যাদির ব্যাপার, মায় ইলেকশনে কাজে লাগে বলিয়া গুণ্ডা বদমায়েশদের জন্য মিনিস্টারদের নিকট হইতে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট আনিয়া দেওয়া ইত্যাদি কাজই আমি করিতেছি, তাহা হইলে এম. এল. এ. হিসাবে আমি দেশের সত্য সত্য কোন্ কাজটা করিলাম? আমার ওই সব কাজের ফলে দেশ আগাইবে, না, পিছাইবে? তৃতীয়ত, এ সব ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া দিলেও আরও একটি বড় কথায় যাওয়া যাক। দেশে যে ধারা বহাইয়া দেওয়া হইতেছে তাহা কি প্রত্যেক জায়গায় ব্যক্তিমানুষকে গড়িয়া তুলিবার সহায়ক? প্ল্যান দুই রকম হইতে পারে। এক, উপর হইতে ছকা প্ল্যানে মানুষকে জোর করিয়া পুরিয়া কল চালাইয়া দেওয়া। অথবা, তলা হইতে এক-একটি মানুষ গড়িয়া তুলিয়া তাহাদেরই স্বেচ্ছাসমবায়ের ভিত্তিতে উপর অবধি গড়িয়া তোলা। দ্বিতীয়টিতে সত্য সত্যই দেশ গড়ে, মানুষ গড়ে। গান্ধীজী সেইজন্য ওই পদ্ধতির কথাই বলিতেন। কংগ্রেসও যদি কেবল ভোটের কল না হইয়া এই দিকে কিছু মন দিত, তাহা হইলে কিছু হয়তো হইতে পারিত। কিন্তু এ পথে কংগ্রেস যায় নাই। আজ বেশির ভাগ উপর হইতেই কল চলিতেছে। তাহার লজিক্যাল পরিণতি ডিক্টেটর-শিপ—পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসি নয়। তাহার উপর বিকেন্দ্রীকরণের বুলির প্রলেপ ছড়ানো বৃথা। ওটা শৌখিন কথা, মনের কথাও নয়—আর এভাবে ও-জিনিস হয়ও না। সেদিন ছোঁড়ারা এলিয়ট নামে একটা লোকের লেখা দেখাইতেছিল—পড়িয়া ভাল লাগিল, তুলিয়া দিতেছি। এলিয়ট বলিয়াছেন, "a decentralisation under central direction would be a contradiction." সুতরাং এই সব ধারা চলিতে থাকিলে আমাদের দেশে পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসি গড়িবে কি করিয়া, গড়িবেই বা কেন?

বহুকাল পূর্বে নসীবাবুর আড্ডায় একটা কথা শুনিয়া আসিয়া ৺কমলাকান্ত আমায় কথাটা টুকিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। কথাটা ১৮১২ সনের ফিফ্‌থ রিপোর্ট নামে কোন্ একটা রিপোর্টের। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্বন্ধে তাহাতে লেখা আছে দেখিতেছি—

"The Moghul dominion, in the best time, and under the wisest princes, was a government of discretion. The safety of the people, the security of their property, and the prosperity of the country, depended upon the personal character of the monarch. By this standard, his delegates regulated their own demeanour; in proportion as he was wise, just and vigilant and humane, the provincial viceroys discharged their respective trusts with zeal and fidelity, and as they possessed or wanted the recited qualifications, the inferior agents conducted themselves with more or less diligence and honesty. A weak monarch and corrupt minister encouraged and produced every kind of disorder; for there was no law paramount to the Sovereign's will. Few of the officers of government were liberally paid; and property was left to accumulate, from breach of trust, abused patronage, perverted justice or unrestrained oppression."

আমাদের এই দুর্দশা হওয়াতেই আমরা ইংরেজের তরবারির সামনে কলাগাছের মত কাটা পড়িয়াছিলাম। পুনরায় আমাদের এই দুরবস্থা সম্পূর্ণ আসে নাই সত্য, কিন্তু আমার দিব্যজ্ঞানে আমি ওইরূপ কিছু কিছু দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, যাহার কথা উল্লেখ করিলাম। আরও দেখিতে পাইতেছি, এখন হইতে যদি সামলানো না যায় তাহা হইলে ক্রমে জওহরলাল সমস্ত জীবনীশক্তি নিঃশেষে দান করিয়া চরম চেষ্টা করিলেও স্রোত ফিরিবে না, তাঁহার জীবদ্দশাতেই আরও ভাঙনের লক্ষণ দেখা দিবে। তারপর তাঁহার অবর্তমানে আর প্রাদেশিক আইন-সভায় নয়, দিল্লীর আইন-সভাতেই জুতা-ছোঁড়াছুড়ি হইবে, এমন কি

বোমা-ছোঁড়াছুড়িও হইতে পারে। তাহার পর হয়তো ক্রমওয়েল বা হিটলারের মত একজন লোক কিছুকাল পার্লামেণ্ট তাড়াইয়া গায়ের জোরে রাজত্ব করিবেন, কিন্তু তাহার পর গায়ের জোরে রাজত্ব কিছুটা বৃদ্ধ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই পার্লামেণ্টারী ডিমোক্রেসির শ্মশানভূমি হইতে রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া ক্রুর কঠোর কমিউনিজ্‌মের অভ্যুদয় হইবে। তাহার প্রতিকার কি?

হয়তো আপনারা বলিবেন, ইহা আমার মৌতাতের ফল। তা ভাল। যাহাই হউক, আমি ততদিন টিকিব না, শ্রীগুরুচরণে আশ্রয় লাভ করিব। আপনারা দেখিবেন। ইতি।

ভবদীয়
শ্রীভীষ্মদেব খোশনবিস (জুনিয়র)

সম্পাদকের চিঠি

তোমার লেখাটা কবিতা হয় নি, মানে বোঝা যায় প'ড়ে,
ছন্দে লিখেছ মিল দিয়ে দিয়ে, ছাপাই কেমন ক'রে?
তোমার লেখায় একেবারে দেখি নতুন শব্দ নাই।
ইংরাজী, গ্রীক ফরাসী ফারসী—মিলিল না কোনটাই।
বাংলার কথা লিখেছ যে এতে কূপমণ্ডুক তুমি,
জান না এখন স্বদেশ মোদের গোটা এ বিশ্বভূমি।
জান নাকো তুমি ফুরিয়ে গিয়েছে রবি ঠাকুরের যুগ,
চপ কাটলেট ভাজিছে কবিরা, ভাজিতেছে ছোলা-মুগ।

উইলোর যুগে করিতায় তুমি এনেছ মাধবীলতা,
ছি-ছি তারপরে লিখিয়াছ কিনা তুলসীপাতার কথা।
লেখার মধ্যে এক ঠাঁয়ে দেখি রহিয়াছে 'ভগবান,'
গতযুদ্ধে সে বোমায় মরিল রাখ নাকো সন্ধান।
করিতা যদিই লেখ—
নাতিদের লেখা পড়িয়া পড়িয়া কবিতা লিখিতে শেখ।

"বেতালভট্ট"

আমার সাহিত্য-জীবন

চোদ্দ

এরই মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪২এর ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যেই অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গিয়েছিল। কারণ আমার দিনলিপিতে দেখছি, ২১শে তারিখ অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনে গিয়েছিলাম। ৪৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটে। লেখা রয়েছে "সেখানে চা খাওয়া চলছিল, সঙ্গে গরম সিঙাড়া। শৌখিন প্রফেসর কবি সাহিত্যিক জমিয়ে বসেছেন। রাজনৈতিক কর্মী (কম্যুনিস্ট) কয়েকজন রয়েছেন। অভিনেতা শম্ভু মিত্রও রয়েছেন। দুজন মহিলা সভ্য পরিবেশন করছেন। অধ্যাপক শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় টেবিলের উপর ব'সে প্রুফ দেখছেন। বোমাতঙ্কে কলকাতায় মানুষের মনোবল কি ভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে তারই আলোচনা চলছে।"

আমার জীবনে অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সংস্রবের অধ্যায়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সম্পর্কে কিছু পূর্বকথা আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় বোধ করি দু বছর আগে। দু বছর বলছি একটা হিসেবের উপর নির্ভর ক'রে। আমার আগে এই প্রতিষ্ঠানের দুজন সভাপতির কার্যকাল বিগত হয়েছে। প্রথম সভাপতি ছিলেন ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর পর সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তৃতীয় সভাপতি আমি। সেই হিসেবে দু বছর ধ'রে এর প্রতিষ্ঠাকাল হয় ১৯৪১ সনের প্রথম বা ১৯৪০ সনের শেষ। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল ঢাকায় সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্য ক'রে। এমন একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার লক্ষ্য যে আগে থেকেই ছিল, এমন অনুমান অনেকেই করেন। সোমেন চন্দ একাধারে সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। অবশ্যই কম্যুনিস্ট কর্মী। ঢাকায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের কর্মী সোমেন চন্দকে ছুরি মেরে খুন করেন। এই উপলক্ষ্যে স্থাপিত হ'ল এই প্রতিষ্ঠান। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সোমেন চন্দ হত হয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে, সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর

বিরুদ্ধে আক্রমণের কোন কারণ ছিল না। সোমেন চন্দের সাহিত্যকৃত্য পরিমাণে খুবই স্বল্প, তবে এই স্বল্প সৃষ্টির মধ্যে কয়েকটি, বিশেষ ক'রে "ইঁদুর" গল্পটি, প্রকাশকালে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর এই গল্পটি নিয়ে এঁরা বিপুল কোলাহল তুলেছিলেন। বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য ইত্যাদি মন্তব্য তখনকার এঁদের সভা-সমিতিতে নিত্যই উচ্চারিত হ'ত। সমারোহের সঙ্গে মৃত্যুদিবস পালিত হ'ত। এখনও পালিত হয় কি না জানি না। আজ সোমেন চন্দের নাম চোখে পড়ে না, সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে "ইঁদুরে"র উল্লেখও দেখি না। যাই হোক, সেদিন সোমেন চন্দের সাহিত্যিক সত্তাকেই বড় ক'রে তুলে এই প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের প্রাক্কালে সই সংগৃহীত হয়েছিল। আজ সই সংগ্রহের ধারাটি পুরনো হয়েছে, কিন্তু সেদিন হয় নি। সেদিন লোকে নিন্দনীয় ব্যাপার ভেবে সরল বিশ্বাসে সই করত।

একদিন শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে এলেন শ্রীযুক্ত সজনীকান্তের সই সংগ্রহ করতে। আমিও সেখানে ব'সে ছিলাম। শ্রীযুক্ত হালদার বললেন, বাংলার সমস্ত সাহিত্যিক এবং শিল্পীর সই সংগ্রহ করব। সজনীকান্ত সই করলেন। কিন্তু হালদার মশায় আমাকে সই করতে বললেন না; কাগজখানি গুটিয়ে পকেটে পুরে চ'লে গেলেন। এতে যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনে ধারণা হ'ল যে, হালদার মশাই তথা অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের চোখে আমি সাহিত্যিক নই বা আমার সাহিত্যিক মূল্য নগণ্য, সেই হেতু আমার সইয়ের মূল্যই নেই। আহত হলাম বইকি। ঠিক এই কারণেই মাত্র দু বছর পর এবং ৺রামানন্দবাবু ও শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মশায়ের সভাপতিত্বের পর এঁরা যেদিন আমার কাছে এসে সভাপতিত্ব করবার অনুরোধ জানালেন সে দিন এক কথাতেই প্রায় সম্মতি জানালাম।

আমার কাছে অনুরোধ নিয়ে এসেছিলেন আমার সুপরিচিত 'অমৃতবাজারে'র কর্মী শ্রীসরোজ দত্ত এবং আমার স্নেহের পাত্র প্রীতিভাজন

শ্রীবিনয় ঘোষ। আমাকে বলেছিলেন, অনেক ঝগড়া ক'রে জিতেছি আমরা। আমরা নাম-করা লোককে সভাপতি হিসেবে চাই না, চাই সত্যিকারের সাহিত্যিককে। আমার 'গণদেবতা' তখন সদ্য-প্রকাশিত। 'গণদেবতা' সম্পর্কে দুজনেই অনেক আলোচনা ক'রে বললেন, আপনি নূতন ধারার প্রবর্তন করেছেন। আপনাকেই আমরা সভাপতি হিসেবে চাই।

আমি সম্মতি দিলাম। সম্মতি দেবার সময় মনশ্চক্ষে দু বছর আগের স্মৃতিটি ভেসে উঠল। একবারও বিবেচনা করলাম না কিছু। জিজ্ঞাসা করলাম না কাউকে। নীচে অধ্যাপক নির্মল বসু থাকতেন, তিনিও তখন জেলে, জিজ্ঞাসা করবই বা কাকে?

এর পর একজন অধ্যাপক বন্ধু আমাকে একদিন বললেন, সভাপতির অভিভাষণে এদের উলঙ্গ স্বরূপ দেখিয়ে দিন। অধ্যাপক বন্ধুটি রাজনৈতিক দলভুক্ত এবং বিখ্যাত ব্যক্তি। কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। প্রকৃত কথা বললে স্বীকার করব যে, আমি সেদিন এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিছক রাজনৈতিক দলের একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠান ব'লে প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারি নি। কারণ ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয়দের নাম আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে দেয় নি। এ ছাড়াও আমার সভাপতিত্বে একটি সভাপতি-মণ্ডলী ছিল, তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন, ৺সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন। কবি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীও বোধ হয় সভাপতি-মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন; মণ্ডলীর মধ্যে না থাকলেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সে সময় এর মধ্যে ছিলেন। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর কোন প্রকার রাজনৈতিক রূপ আমি কল্পনা করতে পারি না এবং ৺সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়কে ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ভাবতে পারি নি সেদিন। এ ছাড়া আরও একটি ভ্রান্তি ছিল আমার। আমি ভাবতে পারি নি যে, সভাপতিত্ব গ্রহণ করলে পূর্ণ এক বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে আমাকে জড়িত থাকতে হবে। শ্রীসরোজ দত্ত এবং শ্রীবিনয় ঘোষও এ কথা আমাকে জানান নি। সাধারণত

বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি সম্মেলনের সভাপতিত্ব ক'রে থাকেন; প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর থাকে না, কার্যকরী সমিতির সভাপতি থাকেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। আমি গোড়াতে তাই ভেবেছিলাম। সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের তিনতলার হলে। শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত বিদায়ী সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে একটি প্রশ্ন তুলেই বক্তব্য শেষ করেছিলেন। বলেছিলেন—অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট নামটি নেতিবাচক, অর্থাৎ আমরা ফ্যাসিস্টদের বিপক্ষে, কিন্তু স্বপক্ষে কার? আজ সেই কথাটি পরিষ্কার ক'রে বলার প্রয়োজন হয়েছে।

আমার ভাষণ ছিল লিখিত ভাষণ। পরে ভাষণটি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে আমি আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিকৃত অবস্থার পটভূমিতে জীবনান্দোলন ইতিহাস বিবৃত ক'রে সাহিত্যিক দায়িত্বের প্রশ্ন তুলেছিলাম। তারই উপসংহারে অতুলবাবুর প্রশ্নেরই প্রায় প্রতিধ্বনি তুলেছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের জাতীয় নেতারা নিঃসংশয়ে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী। কিন্তু তাঁরাই আজ কারাগারের অন্তরালে নিক্ষিপ্ত। আজ এমন ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যিক আন্দোলন প্রেরণা পাবে কোথায়? দৃষ্টান্ত দেখাবে কে, যে দৃষ্টান্ত হবে সাহিত্যের বিষয়বস্তু?

অধিবেশন শেষে জানতে পারলাম যে, আমাকে এক বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে। শুনলাম, পরদিন সকালে ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে প্রতিনিধি-সম্মেলন হবে। সেখানেও প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবুদ্ধদেব বসু এবং শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী। সেদিন একটি বিচিত্র ঘটনা ঘ'টে গেল। সম্মেলন শুরু হতে দেরি হচ্ছে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, শুনলাম, ঢাকার প্রতিনিধি কেউ আসেন নি তখনও, তাঁদের জন্যই অপেক্ষা করা হচ্ছে। কথাটা শুনে আমি হাসতে হাসতেই বললাম, ঢাকার স্বয়ং বুদ্ধদেববাবুই রয়েছেন সুতরাং কাজ আরম্ভ ক'রে দিন; সভা চলতে চলতে তাঁরা এসে যাবেন।

বুদ্ধদেববাবু আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন; তারপর কখন নিঃশব্দে সকলের অগোচরেই বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

এর পর নানা স্থান থেকে বন্ধুবান্ধবে প্রকারান্তরে আমার এই সংস্রবের বিরুদ্ধে তাঁদের অনিচ্ছা জানালেন। আবার দেখলাম, দেশের জ্ঞানী গুণী বহু ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসাযাওয়া করছেন। অন্য দিকে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এঁদের কর্মীদের দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। বিদ্যার, বুদ্ধির পরিচয়ে অভিভূত হয়েছি; ভদ্রতায় মিষ্টতায় পরম পরিতৃপ্তি পেয়েছি; কর্মনিষ্ঠা, কর্মক্ষমতা দেখে বিস্ময়ের সীমা থাকে নি। এ কথা আজ অকপটে স্বীকার করব যে, হীরেনবাবু, চিন্মোহনবাবু, শ্রীমান সুভাষ এবং আরও কয়েকজনের ভদ্রতা ও মিষ্টপ্রকৃতির যে পরিচয় পেয়েছি সে সুদুর্লভ; হাজার জনের মধ্যে একজন এমন মানুষ মেলে। কবি অধ্যাপক শ্রীঅরুণ মিত্র এঁদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কি না জানি না। তবে এই সাহিত্যিক-সংঘের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, তিনিও এঁদের একজন। শ্রীযুক্ত সুধী প্রধানের মত সাংস্কৃতিক সংঘের দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মী আজও আমার চোখে পড়ে নি।

এক বৎসরের মধ্যে এঁদের সঙ্গে বহুবার আমার মতবিরোধ হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তাঁরা আমার মতকে গ্রহণ ক'রে আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং আমাকে তাঁদের মধ্যে রেখেছেন। বোধ করি, মাস দুই-তিনের মধ্যেই ওখানে সমবেত সভ্যদের ঘরোয়া খণ্ড খণ্ড মজলিসের একটি মজলিসের মধ্যে ভারতবর্ষের এক মহান নেতাকে কুইসলিং আখ্যা দিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি প্রতিবাদ জানিয়ে চ'লে এসেছিলাম। তাঁরা অবশ্য কংগ্রেসের দোহাই দিয়েই নিজেদের যুক্তিকে প্রবল ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন, কংগ্রেস বলেছে জাপানীদের নিয়ে কোন নেতা ভারত অভিযান করলে তাঁরাই তাঁর বিরোধিতা করবেন, প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলবেন, ইত্যাদি। পরদিন আমি জানালাম, আমি পদত্যাগ করছি। কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি এলেন; আমি বললাম, যাঁর সম্পর্কে কথা তিনি কোন হীন স্বার্থপর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে এই পথ গ্রহণ করেন নি। নিজের দৃঢ় বিশ্বাস বশে

তের স্বাধীনতা অর্জনের এই পথকেই শ্রেষ্ঠ এবং সংক্ষিপ্ত পথ ব'লে গ্রহণ করেছেন। এ নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, তাঁকে ভ্রান্ত বলতে পারে ভিন্নমতাবলম্বী; কিন্তু তাঁকে হেয় অভিধানে অভিহিত করবার অধিকার কারও নেই।

আমার কথা স্বীকার করলেন তাঁরা এবং এ ধরনের আলোচনা সংঘের নিয়মবিরোধী ব'লে ঘোষণা করা হ'ল।

সেকালে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক বাইরে থেকে কিছু ছিল না। ভিতরে অবশ্যই ছিল, কিন্তু সে ভিতরের সঙ্গে আমার বা আমার মত অধিকাংশেরই কোন সম্পর্ক ছিল না। সংঘে নিছক কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক কর্মী বা নেতারা কদাচিৎ আসতেন। এলেও বাইরের সাধারণ আগন্তুকের মতই দর্শক বা শ্রোতার মত ব'সে থাকতেন। সেই সব কম্যুনিস্ট কর্মীই সংঘের কর্মে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতেন, যাঁরা নিজেরা শিল্পী-সাহিত্যিক; এখানে ওই পরিচয়টাই ছিল তাঁদের বড় পরিচয়। সংঘের মধ্যে বহু মতবাদের ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেন না শুধু ফরোয়ার্ড ব্লকের কোন কর্মী বা ওই দলের প্রতি সহানুভূতিশীল কোন ব্যক্তি। শিল্পী যামিনী রায়, অতুল বোস, সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন। আমার পরের বৎসরে অর্থাৎ চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে প্রেমেন্দ্র মিত্র হয়েছিলেন সভাপতি। পঞ্চম সভাপতি শৈলজানন্দ। মধ্যে মধ্যে আসতেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। কম্যুনিস্ট কর্মীরা নীরবে কাজ ক'রে যেতেন, কখনও মতবিরোধ নিয়ে তর্ক তখন তুলতেন না।

এ নিয়ে তখনকার পার্টি-সেক্রেটারি পি. সি. জোসির সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছিল তার একখানি উদ্ধৃত করব এইখানে।—

15 December, 1945

Dear Tarasankar Babu,

...It is our personal tribute to the great understanding you have shown of the Bengali people in their distress. We consider you as one of the great sons of Bengal who served her when many betrayed her.

To-day the whole country is suffering from a canker. You saw Bengal suffering in a small but very fragile way during the famine.

India as the martyrs built it since '27 onwards is going up in flame. In this critical juncture we keep our faith intact in the destiny of our country and her great future by thinking about persons and friends like you who continue to remain true to the great tradition of the past and struggle to do their bit for the future.

With greetings,

P. C. Joshi

চিঠিখানির উত্তরে নকল আমি রেখেছিলাম কি না জানি না, তবে খসড়াটা চিঠিখানির সঙ্গে পিনে আবদ্ধ অবস্থায় থেকে গেছে।—

Dear Mr. Joshi,

My best thanks to you for your very kind letter and the books. [এই সময় বম্বে থেকে নিয়মিত বই আসত। নিয়মিত ভাবে পাঠাতেন ওঁদের পার্টি।]... I also thank you for the tribute you have paid me in your letter.

Though we met and congratulated each other and had the opportunity of being personally known to each other, we had not the opportunity or occasion of exchanging our views. Still I hope, you know my views. I know that from your writings. Inspite of my best regards for you, I differ in my outlook from that of yours in some points. As regards your party-policy, I disagree with you in many points. But I admire the sincerity of the workers of your party and your boldness. I sincerely believe that everybody has the right of doing what he thinks just and right. You have done and are doing what you think right and just. My creed is Ahimsa and Truth. Not to accuse anybody and to love all, is my motto. I remain, I try always to remain, true to my creed and motto of life....

এই চিঠি থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্পর্কের স্বরূপ স্পষ্ট হবে। আন্তিক্যবাদ এবং অহিংসার সঙ্গে বিরোধ না থাকলে এই মহান আদর্শ সম্পর্কে আমার আজও কোন বিরূপতা নেই। এবং সাম্যের কল্পনা আমাদের দেশে বহু-আকাঙ্ক্ষিত। ধর্মজীবনের এই উপলব্ধি ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য। গৌতম বুদ্ধ থেকে এ পর্যন্ত ছোট বড় কত সাধক—মানুষে মানুষে ভেদ নেই, এই কথা প্রচার ক'রে এসেছেন। তার ইতিহাসে নূতন মহাভারত রচিত হতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের কামনা বাস্তবে সমাজযন্ত্রের চাকার দাঁতে নিষ্পেষিত হয়ে গেছে; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক বিধানে পরিবর্তন ঘটে নি ব'লেই তা সার্থক হতে পারে নি। এবং এই সাম্য সর্বোত্তম সত্য তার সত্যের

জন্তই। এর মধ্যে সত্যের প্রকাশ না থাকলে কোনদিনই এ আদর্শ পৃথিবীর মানুষের কাছে এমন অলঙ্ঘ্যনীয় জোর নিয়ে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু সৎকে অসৎ পথে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, বা অসৎ পথে, ক্রোধের পথে, হিংসার পথে, কুটিল কৌশলের পথে যদি কোথাও প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে, তবে দেখা যাবে সেখানে পূর্ণ সৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নি; সত্যের উপাসক ব'লে দাবি জানিয়েও যাঁরা প্রতিষ্ঠার পথে অসৎ বা অসত্য, ক্রোধ বা হিংসাকে আশ্রয় করেছেন, তাঁরা সত্যের বদলে শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেদের; আদর্শের বদলে সেখানে সেই একটি ক্ষমী-গোষ্ঠীরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অসৎ পথে সৎকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে অসৎ নিজের দাবিতেই সত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে। সৎ বা সত্য ছাড়া আর সর্বত্রই প্রয়োজন হয় মন্ত্রগুপ্তির—iron curtain মন্ত্রগুপ্তিরই বাস্তব রূপ।

ভারতবর্ষে গান্ধীজী সত্যকে এবং অক্রোধ ও অহিংসাকে রাজনীতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের চিরন্তন কামনার এক দিককেই প্রবুদ্ধ করেন নি; সমাজ ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের নূতন গঠন-তত্ত্বকেও গ্রহণ করেছেন।

অহিংসা প্রেম অক্রোধ গান্ধীজীর আবিষ্কার নয়, এ মানুষের আবিষ্কার; তাকে কি ভাবে জীবনায়ত্ত করতে হবে, তারই পথ তিনি নিজের জীবনসাধনায় প্রকাশ করেছেন। অহিংসা-ধর্ম বা তত্ত্ব হিসাবে পৃথিবীর সর্বমানবীয় ধর্ম বা তত্ত্ব। যে গ্রহণ করবে তার। এতে ভারতবর্ষের বা কোন গান্ধীশিষ্যের প্রতিবাদ বা তা নিয়ে স্বত্বের মামলা নিষ্ফল। তেমনি অন্নে-বস্ত্রে, জলে-বায়ুতে, রাষ্ট্রীয় অধিকারে, সামাজিক অধিকারে, মানবিক অধিকারে মানুষের সমান দাবি জানানো বা সেই দাবি প্রতিষ্ঠার অধিকার কোন দেশের বা কোন দলের বা একটি মাত্র শাস্ত্রের একান্ত-ভাবে নিজস্ব নয়।

এঁদের সঙ্গে বিরোধ আমার এখানেই। প্রথম এটা প্রকট হয় নি। বুঝতে পারি নি। ক্রমে প্রকট হ'ল।

[ক্রমশ]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ কথা

"রম্যরচনা"

সাহিত্য বহুমুখী। তার চিন্তা ও কল্পনার বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। নিত্য নব নব বৈচিত্র্যের সন্ধানে সাহিত্য কেবলই নিজের দিগন্ত প্রসারিত ক'রে চলেছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যসম্পাদনের আশায় যেমন সে তার পরিধির ভিতর নতুন নতুন ভাবনা কল্পনা ধারণার সমাবেশ ঘটাচ্ছে, তেমনি তার প্রকাশভঙ্গিরও নব নব রূপান্তর সাধিত হচ্ছে। যুগধর্মের ভেদ ও রুচির তারতম্য অনুযায়ী সাহিত্যের এই-যে নিত্য নব নব বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-প্রয়াস—এ কিছু মন্দ জিনিস নয়। বৈচিত্র্যস্পৃহা মানুষের স্বভাবের গভীরে নিহিত; কাজেই স্বাদ-বদলের আশায় সাহিত্য-পাঠক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে পরিক্রমণ করতে চাইবে এতে দোষের কিছু নেই।

কথাটা বুঝি শর্তবিরহিত নয়। বৈচিত্র্য ভাল জিনিস, কিন্তু বৈচিত্র্য সম্পাদনের নামে সাহিত্যের গতি কেবলই যদি নিম্নাভিমুখী হতে থাকে, সে ক্ষেত্রে কোথাও না কোথাও এসে সীমারেখা টানতেই হয়। আর যা-ই হোক, বৈচিত্র্য আর গুণাপকর্ষ এক বস্তু নয়। শিল্পোৎকর্ষের অপহ্নব ঘটিয়ে বৈচিত্র্য বিধানের রীতি স্বাদ-বদলের উপায় হিসাবে সাময়িকভাবে গ্রাহ্য হতে পারে; কিন্তু সেটি সাহিত্যের একটি অপরিবর্তনীয় রীতি হয়ে দাঁড়ালেই মুশকিল। ভাবঘন কবিতার ফাঁকে ফাঁকে ছড়ার কবিতা বা খাপছাড়া কবিতা (nonsense rhymes) পড়তে মন্দ লাগে না; কিন্তু সমগ্র আধুনিক বাংলা-কাব্য-আন্দোলনটি যদি নিরবচ্ছিন্ন ওই ছাঁচেই ঢালাই হতে থাকে, তা হ'লে কাব্যামোদী পাঠকমাত্রেই শঙ্কিত হয়ে উঠবেন ব'লে মনে করি।

সম্প্রতি বাংলা-গদ্যসাহিত্যে "রম্যরচনা" নামে এক অভিনব রচনা-রীতির সৃষ্টি হয়েছে। উপরে যে কটি কথা বলা হ'ল, সেগুলি এই রম্যরচনাকে লক্ষ্য ক'রেই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। অলস, লঘু মুহূর্তের মনোরঞ্জনী পাঠ্যক্রম-হিসাবে রম্যরচনাকে গ্রহণ করলেও করা যেতে পারে, কিন্তু সেই নজীরে তার জন্যে মনের দ্বার সর্ব সময়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা চলে না। ছোটকে ছোট মাপে গ্রহণ করাটাই রীতি,

কিন্তু ছোট যদি বড়র দাবিতে পাঠকের মনের ভিতর বিস্তৃত জায়গা জুড়ে বসতে চায়, তাকে জুলুম আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। ঠিক এ জাতীয় জুলুম বর্তমানে বাংলা-সাহিত্যে ব্যাপক আকারে চলেছে। এক শ্রেণীর পাঠকের লঘুমনস্কতার সুযোগ নিয়ে রম্যরচনা নামধেয় কিম্ভূত সাহিত্য-সৃষ্টি পাঠক-সাধারণের ঘাড়ের উপর চেপে বসতে চাচ্ছে। রম্যরচনায় রম্যতা কতটুকু আছে বলতে পারব না, তবে চিহ্নিত লক্ষণাদির মানদণ্ডে ওটি যে যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না, সে কথা জোর ক'রে বলা চলে। সাহিত্যের বিস্তৃত সঞ্চরণক্ষেত্রকে যদি একটি বিরাট ভোজ্যশালার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হ'লে রম্যরচনাকে নিতান্ত তুচ্ছ খাদ্যের অধিক মর্যাদা কোনক্রমেই দেওয়া যায় না। মাঠে-ময়দানে বেড়াতে বেড়াতে ডালমুট চিবোতে মন্দ লাগে না, কিন্তু বলাই বাহুল্য, তার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয় না। শরীরের পুষ্টির জন্য চাই এমন খাদ্য, যার মধ্যে যুগপৎ উপাদেয়তা ও স্বাস্থ্যদ শক্তি আছে। আমাদের মনের খাদ্যনিরূপণে একই নীতি অনুসৃতব্য।

রম্যরচনার রম্যতার ক্ষমতাকে সহজেই উপেক্ষা করা যেত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ যুগের পাঠক-সম্প্রদায়ের একাংশের তরল মানসিকতার রন্ধ্র পথে তা ক্রমশ সাহিত্যে আসর জাঁকিয়ে বসছে। প্রবহমান যুগরুচির প্রভাবে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে চটুলতা যত বেশি প্রশ্রয় পাচ্ছে, ভাল ও মন্দের ভেদ তত ঘুচে যাচ্ছে। শিল্প-সাহিত্যের ভাল মন্দ চিনে নেবার ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী মানসিক পরিশীলনের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, এই অভ্যাসের আজ আর কোন মূল্য নেই। শিল্পরুচি তৈরি হতে সময় লাগে, রসবোধ আয়ত্তকরণের সাধনা অনেকটা পরিমাণ কাল জুড়ে পরিব্যাপ্ত হ'লে তবেই তা থেকে যথার্থ সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু আজ আর এ-সব কথা কেউ শুনতে চায় না। নগদ পাওনার লোভে, আশু পাওনার লোভে স্থায়ী পাওনার ঘরকে নির্মমভাবে সংকুচিত করতে এখন বাধে না। যুগের দোষে শুধু যে মুড়ি-মিছরি এক-দরে বিকোচ্ছে তা-ই নয়; ভাব-সাব দেখে মনে হয়, মিছরির চাইতে মুড়ির কদরই যেন বেশি। কাঞ্চনের চাইতে

P30573

কাচের জেল্লায় মানুষ সমধিক মুগ্ধ। পাঠক আজকাল রচনায় ভার চায় না, সার চায় না, চায় 'তার'—যে-কোন রকমের রসনাকণ্ডুয়নকারী তার। এই তুচ্ছ তারস্পৃহার তাড়নায় পাঠকের সহজ বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত, ক্ষেত্রবিশেষে অপগত। একালীন মানুষের হাল্কা ফুরফুরে-পনার দাপটে সাহিত্য থেকে যথার্থ রসবুদ্ধি বিলুপ্ত হবার উপক্রম। চিন্তার অভ্যাসও অন্তর্হিতপ্রায়। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে রম্যরচনা যথার্থ সাহিত্যলক্ষণাক্রান্ত রচনাকে পায়ের জোরে পিছনে ফেলে রেখে নিজের অনুকূলে সবটুকু মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।

রম্যরচনাকে 'কিম্ভূত' বলা হয়েছে নানা কারণে। প্রবন্ধ-সাহিত্যের সেই ধারাকেই আজ রম্যরচনা নামে অভিহিত করা হচ্ছে, যার ভিতর স্থির কোন বক্তব্য নেই, সবটাই যার অনিয়ন্ত্রিত, অগোছালো, ঢিলেঢালা। রম্যরচনায় চিন্তার সংযমের প্রয়োজন হয় না, বক্তব্যকে যুক্তিপরম্পরাক্রমে বিস্তারিত, পরিণামে প্রতিষ্ঠিত করবার যে রীতি প্রবন্ধ-সাহিত্যের সাধারণ নিয়ম, সে রীতি এখানে না মানলেও চলে। রচনার ভিতর হাল্কা স্ফূর্তির আমেজ লাগাতে গিয়ে ওর মধ্যে এমন একটা বাগ্‌বাহুল্যের আবহাওয়ার সঞ্চার করা হয় যে, তার সংস্পর্শে এসে বুদ্ধির স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য স্বতই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। রম্যরচনার যে সকল নমুনা পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় তা দেখে মনে হয়, যে কোন বিষয়ে যে কোন ভঙ্গিতে খানিকটা বাগ্‌বিস্তার করতে পারলেই তা রম্যরচনা হ'ল। এখানে চিন্তার দায় নেই, পরম্পরা রক্ষার দায় নেই, বক্তব্য প্রতিপাদনের দায় নেই। গালগল্পের আসরে লোকে যে রকম হাল্কা ভঙ্গিমায় কথা বলে, প্রয়োজনবোধে কথাবার্তার ভিতর ছ্যাবলামির সুর লাগাতে দ্বিধা করে না, তাকেই বোধ করি লিখিত আকারে প্রকাশ করলে তা রম্যরচনায় দাঁড়ায়।

শুনি, আধুনিক বাংলা রম্যরচনাকে ইংরেজী essay-র সমগোত্র মনে করা হয়। এই প্রতিতুলনা মনে কৌতুকের সঞ্চার করে। ইংরেজী essay-র ঐতিহ্যের শুরু মহামতি বেকন থেকে, তারপর বহু বহু

সাহিত্যরথীর লেখনীর ধারে তার রূপ শাণিত হয়েছে, ক্রম-উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ কালের অনুশীলনের ফলে ইংরেজী সাহিত্যে essayর একটি অবিচল মান দাঁড়িয়ে গেছে। ফরাসী সাহিত্যেও essayর ঐতিহ্য পুরাতন, এবং ইংরেজী সাহিত্যের মতই সমৃদ্ধ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যগ পথের অনুসারী ভূয়োদর্শী মন্তেইন গভ্যালোচনায় সরস মৃদুবাক্ অথচ জ্ঞানগর্ভ যে রচনারীতির প্রবর্তন করেছিলেন তার রেখাচিহ্ন অনুসরণ ক'রে ফরাসী নিবন্ধ-সাহিত্য আজ বহু দূর এগিয়ে গেছে। আমাদের সাহিত্য নিবন্ধরচনার দিক দিয়ে ওই দুই সাহিত্যের তুলনায় ঢের ঢের পিছনে প'ড়ে আছে। কাব্য-সাহিত্যে আমাদের কীর্তি রটনাযোগ্য, কথা-সাহিত্যে, বিশেষ ক'রে ছোটগল্প-শাখায়ও সাফল্যগৌরব কিছু কম নয়, কিন্তু সাহিত্যিক নিবন্ধরচনার ক্ষেত্রে মোটামুটি সাফল্য লাভের জন্য এখনও আমাদের দূর পথ অতিক্রম করতে হবে। প্রবন্ধরচনার জন্য যে সুতীক্ষ্ণ যুক্তিনিষ্ঠা ও ভাষার যাথাযথ্যের বোধ (precision) দরকার, তা এখনও আমাদের লেখনরীতির ভাল রপ্ত হয় নি। সাধারণ প্রবন্ধ বা নিবন্ধের বেলায়ই যখন এই কথা, তখন রম্যরচনা-নামধারী লঘু প্রবন্ধের বেলায়ও যে এ কথা কত সত্য তা সহজেই অনুমান করা চলে। দুই-একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, রম্যরচনায় এখনও আমরা নিতান্ত হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে চলছি। রম্যরচনার শৈশব অবস্থা অতিক্রান্ত হতে না হতেই সে যদি বিভিন্ন শাখার সাহিত্যের স্বীকৃত রূপগুলিকে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে বসে, তবে তো বড়ই বিপত্তির কথা।

বিদেশী *belle-lettres*-এর একটি অঙ্গ হ'ল personal essay বা 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ'। আমাদের সাহিত্যের নবোদ্ভিন্ন রম্যরচনা-সাহিত্যকে কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সমার্থক মনে ক'রে থাকেন। এই প্রতি-তুলনাও নিষ্ফল। লঘু মেজাজের রচনার ভিতরে পাকেচক্রে খানিকটা পরিমাণে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটালেই তা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হ'ল এমন মনে করবার কারণ নেই। খোসগল্পের আসরে লোকে নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলে, নিজ নিজ রুচি পছন্দ ছিট

ও বাস্তিক বিস্তারে ব্যাখ্যান করে; আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ রম্যরচনাকারী ঠিক এই ধারাটিকেই সাহিত্যের আসরে প্রমোশন দিয়েছেন দেখতে পাই। কিন্তু এ জাতীয় আত্মকথন আর ব্যক্তিধর্মী রচনার জাতিকে কোনক্রমেই এক ক'রে দেখা চলে না। ব্যক্তিধর্মী রচনার আঁট ফুটিয়ে তুলতে হ'লে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের প্রয়োজন হয়, যে বোধ তথাকথিত রম্যরচনাকারদের অধিকাংশেরই নেই ব'লে আমার ধারণা। এঁদের লেখায় বাগ্‌বিস্তার আছে, কলরব আছে, আত্মপ্রচার আছে; ব্যঞ্জনা নেই। মৃদু মধুর স্বরে অথচ ফলপ্রদ স্বরে কথা বলবার কৌশল এঁরা জানেন না। চণ্ডীমণ্ডপ কিংবা বৈঠকখানার গালগল্পের ভাষায় স্বভাবতই কেউ সংযম বা যুক্তিশৃঙ্খলা আশা করে না। কুরুচির প্রবেশও বোধ করি সেখানে সব সময় নিষিদ্ধ নয়। আদিরসের মিশাল না দিলে আড্ডার গালগল্প এক-এক সময় বাস্তবিক জমতে চায় না, সেই সঙ্গে পরচর্চার লঙ্কা-ফোড়ন দেওয়া যায় তো আরও ভাল। কিন্তু এ তো হ'ল বাস্তব জীবনের বৈঠকী আলোচনার ধারা; বাস্তবতার নজিরে তাকে সাহিত্যে পাংক্তেয় করবার যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। জীবনের বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তব এক নয়। যা বাস্তব-জীবনের সীমায় মানায় ভাল, তাকে বাস্তব-জীবনের স্বকীয় পরিসরের ভিতর ধ'রে রাখাই উচিত; গায়ের জোরে তাকে সাহিত্যে জাতে তোলবার চেষ্টা করলে ফল ভাল না হওয়ারই কথা।

আধুনিক বাঙালী রম্যরচনাকারেরা তাঁদের রচনা-প্রয়াসের ধারা ক্রমাগত সমালোচনার খোরাক জুটিয়ে চলেছেন ব'লে মনে হয়। তাঁদের চোখে সাংসারিক বাস্তব আর সাহিত্যিক বাস্তবের ভেদ লুপ্ত। রচনা-রীতির ভিতর স্ফূর্তির আমেজ না থাকলে নাকি রম্যরচনার রম্যত্ব বিহিত হয় না, তাই রম্যরচনাকারেরা তাঁদের রচনাকে স্ফূর্তিমান করার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, আমুদেপনা আর স্ফূর্তিমত্তা এক জিনিস নয়। স্ফূর্তি প্রাণবন্ততার প্রতীক, আমোদ স্থূল সুখান্বেষণ-পৃহার। খোসগল্পের ছ্যাবলামির মধ্যে এক ধরনের সজীবতা আছে, তবে তা সহজ প্রাণস্ফূর্তি নয়, ওটি আমুদেপনারই একটি ঢঙ মাত্র।

আধুনিক রম্যরচনাকারেরা এই জায়গাতেই করেন সব চাইতে বড় ভুল। তাঁরা আমুদেপনাকে প্রাণস্ফূর্তির স্বগোত্র ধ'রে নিয়ে ভাষার লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন। রম্যরচনাকারদের ভাষণমুখরতায় কান পাতা দায় হয়ে উঠল। যে হারে কলরব বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে রোয়াকের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষায় প্রভেদ নির্ণয় করবার জন্য শীঘ্রই হয়তো বিচক্ষণ ভাষাবিদ্‌কে ডাকবার প্রয়োজন হবে। ভাষার সৌষম্য, ব্যঞ্জনা, মৃদুতা—এগুলি দিনে দিনে কথার কথা হয়ে উঠছে। ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাষারীতি অনুসরণের দায় নেই, দায় নেই ব্যাকরণ কিংবা স্বীকৃত প্রকরণাদি মানবার—কেবল আড্ডার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে প্রগল্‌ভ হতে পারলেই হ'ল, তুচ্ছাতিতুচ্ছ গালগল্প দিয়ে পাতার পর পাতা ভরাতে পারলেই হ'ল। না ভাবের সৌকুমার্য, না চিন্তার সংযম। রচনার কাব্যসৌন্দর্য অদৃশ্যপ্রায়। লেখায় যে অনুপাতে প্রগল্‌ভতা, সে অনুপাতে কল্পনার নিষ্প্রভতা। ভাষার শুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের সৌন্দর্যও রম্যরচনার পরিধি থেকে অন্তর্ধান করেছে।

এ রকম হওয়ার একটি কারণ এই যে, রম্যরচনার বেলায় কোনরকম বাধ্যবাধকতা স্বীকার করা হয় না। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা ইত্যাদি সাহিত্যের সব কটি শাখায়ই কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিপ্রকরণ মেনে চলবার দায় আছে; এখানে সে রকম কোন দায় নেই। লেখকের ইচ্ছা অনুযায়ী রম্যরচনার ভিতর একদিকে যেমন কবিতা ও ছোটগল্পের উপাদান ঢোকানো যায়, তেমনি সাংবাদিক-সুলভ প্রতিবেদন, ভ্রমণকাহিনী, আত্মকথা, গালগল্প—কোনটাই সেখানে অপাংক্তেয় নয়। প্রয়োজনবোধে নিছক রাশ-আলগা-করা জল্পনা-কল্পনার ধারাও পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুলতে বাধা নেই। লিখনভঙ্গির এই বল্গাহীনতার জন্য রম্যরচনায় কাঠামো স্বতই হয়ে উঠেছে নিতান্ত ঢিলেঢালা, অগোছালো, পূর্বাপরসম্বন্ধবিবর্জিত। অর্থাৎ রম্যরচনার গঠনকর্মে পূর্বপরিকল্পনার স্থান নেই। এখানে পূর্ব থেকে ছক ক'ষে, মাপজোপ একে, ভেবে-চিন্তে কিছু লেখা হয় না; পালের হাওয়ায় স্বয়ং-চালিত নৌকোর মত অনিয়ন্ত্রিত ভাবাতিশয্যের

বেগমুখে লেখনীকে যদৃচ্ছা ছেড়ে
লেখনীর উপর যেমন আপাতসম্মোহি
তেমনি রম্যরচনার ভূত একবার ক
লেখকের শাসন মানতে চায় না। র
পরিণামে গিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করা
নিজেই জানেন না।

রম্যরচনার এই দিকটি বিশেষভ
বুঝলে অন্যান্য শাখার সাহিত্যকর্মের
অচিরেই ধরা পড়বে ব'লে মনে করি।
প্রবন্ধকে "a loose sally of the
শুধু তার প্রকৃতি ও সংজ্ঞা নির্দেশ কৃ
তুলনায় তার স্বাভাবিক গুণাপকর্ষে
কারণ সাহিত্যে—বস্তুত সকল
অশ্রদ্ধেয়, অতএব অগ্রাহ্য। আত্ম-
চনার মধ্যেই শিল্পকর্মের স্ফূর্তির স
আঁটসাঁট, বাহুল্যবর্জিত, আদিমধ্য
সৌন্দর্য পরিস্ফুট হবে। ছন্দ এবং
কবিতার সৌন্দর্য অপ্রতিরোধ্য; তা
সুরের ক্ষ্যাপামিকে কেউ গান বলে ন
আত্ম-আরোপিত শাসন পদে পদে
কোথায় আরম্ভ করতে হবে, কোথায়
কোথায় ঝোঁক কমাতে হবে ইত্যাদি
নিরূপিত ধারণা না থাকে, তা হ'লে
হয় শিল্পকর্মকে খুব বেশি দূর এগিয়ে
কথিত পূর্বনিরূপণের কোন বালাই
নেই। হাওয়ার গতি সেখানে অনি
রম্যরচনারূপ কাগজের নৌকো প্রায়ই

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সঙ্গে রম্যরচন

প্রতিতুলনাটি সার্থক হ'লে বলার কিছু ছিল না, কিন্তু সে সার্থকতার প্রমাণ কই! আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলী এবং তাঁর শিষ্য-অনুশিষ্যেরা রম্যরচনার যে ধারাটির প্রবর্তন করেছেন, তার সঙ্গে সত্যিকার ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধারাধরনের মিল সামান্য। বরং এই ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতির্ময় রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ইন্দ্রজিৎ', 'রঞ্জন' প্রমুখকে স্বীকার করা যায়, সৈয়দী রীতিতে প্রগল্‌ভতা ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অনেকটা লিরিক কবিতার মত। লিরিক কবিতা যেমন কবির ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনুভূতির সুবাসে ভরপুর, তেমনি ব্যক্তিগত প্রবন্ধেও কাব্যিক ব্যঞ্জনারীতি অনুসরণ ক'রে মৃদু-মোলায়েম ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা পুলক-বেদনার অনুভূতিকে রূপ দেওয়া সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, সেইটেই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আসল রূপ। অথচ এ রূপের সঙ্গে আজকের দিনের তথাকথিত রম্যরচনার কতই না তফাত! এখনকার রম্যরচনায় আত্মকীর্তন আছে, আত্মোদ্ঘাটন নেই; কলরব আছে, মৃদুভাস নেই,; স্থূলতা আছে, শালীনতা নেই; এক কথায় গদ্য আছে (তাও গদ্যের ঠাটমাত্র), কাব্য নেই। আর কাব্যই যদি না থাকল, রচনাকে রম্যতাগুণের দ্বারা চিহ্নিত করবার কোন অর্থ হয় না।

সৈয়দ মুজতবা আলীর নামোল্লেখ করবার কারণ, আধুনিক বাংলা-রম্যরচনার ধারাটির তিনিই মুখ্য প্রবর্তক। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থের দ্বারা তিনি পাঠক-মনে কিঞ্চিৎ অভিনবত্বের চমক সৃষ্টি করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু একই ঢঙ ও ধাঁচের বারম্বার পুনরাবৃত্তিদোষে তাঁর সে অভিনবত্ব এক্ষণে ক্লান্তিকর মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। গোটা সৈয়দী সাহিত্যের উপর চোখ বুলিয়ে নিলে দেখা যায়, রসিকতার নামে তা বাচালতার দোষে অতিশয় দুষ্ট। একাধিক বিদেশী কৌতুক-ঘেঁষা anecdotes বা টুক্‌রো গল্প—যা তিনি বিদেশবাসকালে বন্ধুজনমুখে বা গ্রন্থপ্রসাদাৎ জেনে থাকবেন, ক্রমাগত উদ্‌গার ক'রে এক্ষণে তাঁর ঝুলি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। সৈয়দ সাহেবের মধ্যে হয়তো বয়স্ক-তার কিঞ্চিৎ সহজ ক্ষমতা আছে, কিন্তু বাংলা-ভাষার নিজস্ব রীতিপদ্ধতি

আয়ত্ত না থাকায় সে কৌতুকনৈপুণ্য প্রায়শ মাঠে মারা যাচ্ছে। স্বীকৃত ভাষাপদ্ধতির বিকৃতি ও ব্যভিচার সাধনে আধুনিক বাংলায় তাঁর জুড়ি লেখক নেই। ভাষাকে অতিমাত্রায় naturalistic করতে গিয়ে তিনি তাকে প্রায় 'রকের' ভাষায় পর্যবসিত করেছেন। অহেতুক 'যাচ্ছাই মিশাল'ই যে তাঁর ভাষারীতির একমাত্র দোষ তা-ই নয়, আত্যন্তিক বাচালতা তার আর একটি মজ্জাগত ত্রুটি। ক্রমাগত 'বেরাদর', 'আণ্ডা' 'এড্ডা ছোড্ডা পোলাডা,' 'খুলে কই' এই জাতীয় শব্দ বা শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ ক'রে তিনি বাংলা-গদ্যের গভীর-গম্ভীর রূপটিকে প্রায় ইয়ার্কির কিনারায় এনে ঠেকিয়েছেন। মুজতবা আলী সাহেবের বেঁচাল বাচাল রূপটির একটি নমুনা দিই—

"এতখানি বলার পরও যদি কেউ লেমনেডের বোতল খোঁজে তবে আমার দ্বিতীয় নিবেদন, গোটা দুই ভাষা শিখলে চাকরী জোটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। হ'ল? এখন তবে আশা করতে পারি, পাঠক বোতলটি আমার মাথায় না ফাটিয়ে সেটার ভিতরকার জিনিস বরফের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করবেন।" ("হরিনাথ দের স্মরণে," 'শারদীয় সংখ্যা যুগান্তর ১৩৬১')

বক্তব্যমূলক সীরিয়স প্রবন্ধের মধ্যে কেউ যে এ জাতীয় ভাষা প্রয়োগ করতে পারে, সৈয়দী ভাষারীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে সে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। উদ্ধৃতাংশটিকে বিশুদ্ধ ইয়ার্কি ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। 'ডক্টরেট' উপাধিধারী মুজতবা আলী সাহেবের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনেছিলাম, কিন্তু তাঁর রচনার ধরন-ধারণ দেখে সে কথা বিশ্বাস করতে আর ইচ্ছা হয় না—এটি অকপটে স্বীকার করব। বিদ্বান ব্যক্তি কখনও এই ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করেন না। শুনি, পাঠকমহলে এই লেখকের প্রচুর সমাদর। তাঁর বই নাকি হু-হু ক'রে কাটে! এ তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, হয় পাঠক-সাধারণের বুদ্ধিবৈকল্য ঘটেছে, নয়তো বাংলা-সাহিত্যের মান এত দ্রুত নেমে যাচ্ছে যে এর থেকে ভাল রচনা লেখকদের কাছে কেউ আশা করে না।

আমাদের কেউ ভুল বুঝবেন না। ভাষার গণতান্ত্রিকীকরণের আমরাও পক্ষপাতী। সাহিত্যের ভাষা যত সুবোধ্য হবে এবং যত বেশিসংখ্যক মানুষের আয়ত্তগম্য হবে তত দেশের কল্যাণ। তা ব'লে গণতান্ত্রিকীকরণের নামে ভাষার অশালীনীকরণের কোন অর্থ হয় না। রুচির অধঃপাত ঘটিয়ে ভাষাকে যাঁরা বৃহত্তর সংখ্যক পাঠকের অধিগম্য ক'রে তুলতে চান আমরা তাঁদের দলে নই। যুগভেদে ভাষারীতির নানা পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু যে-কোন অবস্থায় প্রকাশভঙ্গির dignity বজায় রাখা চাই। ভাষার dignity-র সঙ্গে সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের সম্পর্ক নিবিড়। এই সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের মান কোন সময়েই ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। আধুনিক গণতন্ত্রের মানদণ্ড অনুসারে, সামাজিক কৌলীন্যের মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু এই আদর্শ ক্ষেত্রান্তরে প্রয়োগ করলে অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে। সাংস্কৃতিক জীবনে ভাব ও ভাষার কৌলীন্য সর্বাবস্থায় রক্ষিতব্য।

অথচ ঠিক এই আদর্শটিরই মূলে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ লেখকগণ ক্রমাগত আঘাত হানছেন। রম্যরচনাকে সার্থকনামা করবার অধীর আগ্রহে তাঁরা প্রাকৃতজনের ততোধিক প্রাকৃত আটপৌরে ভাষাভঙ্গির কোঠায় সাহিত্যের স্বীকৃত ভাষাকে নামিয়ে আনছেন। এই vulgarization-এর প্রক্রিয়া বাধাবন্ধহীনভাবে চলতে থাকলে কোথায় গিয়ে তার শেষ হবে, পূর্বাহ্নে বোধ হয় তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

অদ্ভুত ভাষাভঙ্গিম রম্যরচনার এই আধুনিক রীতিকে হুতোমী ভাষারই একটি অভিনব সংস্করণ জ্ঞানে কেউ কেউ তাকে প্রবলভাবে সমর্থন করছেন। যেন শুধুমাত্র এই নজিরের জোরেই কোন একটি ভাষাভঙ্গি নানাবিধ ত্রুটিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পার পাওয়ার যোগ্য। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র যুগ পিছনে ফেলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, আজ ইচ্ছা করলেই আমরা হুতোমী স্টাইলের সঙ্কীর্ণ পরিসরের ভিতর ফিরে যেতে পারি না। আজকের দিনের কোন লেখক যদি তাঁর রচনায় হুতোমী স্টাইল হুবহু চালাবার চেষ্টা করেন, তেমনি অমার্জিত ও রুচিহীন ভাষা তাঁর মনোভাব প্রকাশের বাহন হয়, তা হ'লে তাঁর সে

সাহিত্যপ্রয়াস সর্বথা ধিক্কৃত হওয়ারই কথা। হুতোমী এবং সৈয়দী ভাষার সমর্থকবৃন্দের একটি কথা জেনে রাখা ভাল, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে বাংলা-সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের মনের জগতের গভীর পরিবর্তন সাধন ক'রে গেছেন, আমাদের চিন্তাভঙ্গি ও রুচির মোড় সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ফিরিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বব্যাপী প্রভাব চোখের সামনে একটি সুমহান দৃষ্টান্ত হিসাবে বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কেউ যে আজ হুতোমী ভাষায় প্রগল্‌ভতা করার কথা ভাবতে পারে, এ আমাদের ধারণায়ও আসে না। রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে অন্য অনেক শিক্ষার সঙ্গে রুচির পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাও আমরা লাভ করেছি। ওটি এতদিনে আধুনিক লেখকবর্গের অন্তরস্থ হওয়ার কথা। আজকের দিনের সাহিত্যিকের কাছে এইটেই প্রত্যাশিত যে, যা-কিছু অশালীন, যা-কিছু স্থূলরুচি, তার দিক থেকে তিনি স্বাভাবিক ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রাখবেন; স্বীয় রচনারীতির ভিতর ভাষার ব্যভিচার তিনি কোনমতে ঘটাতে দেবেন না। কিন্তু কার্যত প্রায়শ এর বিপরীত দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। অন্তত, তথাকথিত রম্যরচনার ক্ষেত্রে যে এই দৃষ্টান্তের প্রচুর সদ্ভাব মিলবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সব চাইতে দুঃখ হয় যখন দেখি, শ্রীরাজশেখর বসুর মত স্থিতধী প্রবীণ সাহিত্যিকও আধুনিক বাংলা রম্যরচনারীতির সমর্থনে অগ্রসর হয়ে এসেছেন। শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয় বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম আচার্যপদে অধিষ্ঠিত, তিনি যদি এ-জাতীয় যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেন, সাধারণ পাঠক সুবিবেচনা আশা করবে কার কাছ থেকে? ইতিমধ্যে এমন কিছু কিছু রচনার অনুকূলে তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন, যাদের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। তবে কি ইদানীং বসু মহাশয় শব্দতত্ত্ব ছেড়ে অসার সাহিত্য পাঠে কালক্ষেপণ করছেন? বিলাতের কোন বিশিষ্ট রাজনীতিক 'লর্ড'-উপাধিপ্রাপ্ত হ'লে যেমন তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের অবসান হয়, তেমনি আমাদের দেশের কোন বর্ষীয়ান লেখক 'সাহিত্যাচার্য' বা অনুরূপ নামীয় পদে উন্নীত হ'লেই বোঝা গেল, তাঁর সক্রিয় ও সুফলপ্রসূ সাহিত্যিক

জীবনের অন্ত হ'ল। নিরীহ পাঠকের অসহায় মাথা লক্ষ্য ক'রে বড় বড় সার্টিফিকেটের থান ইট ছুঁড়ে মারাই তখন তাঁর একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

অথবা আমাদেরই ভুল। আমরা বোধ হয় বসু মহাশয়ের কাছে প্রত্যাশার হস্ত বড্ড বেশি দীর্ঘায়িত রেখায় প্রসারিত ক'রে ধরেছি। বসু মহাশয়ের সাকুল্য সাহিত্য পাঠে কেন জানি না মনে হয়, সর্বপ্রকার ভাবের তারল্যের প্রতি তাঁর এক প্রকার গোপন পক্ষপাত আছে। কতিপয় অবসরবিলাসী 'রিটায়ার্ড' বৃদ্ধের পারস্পরিক বাক্যবিনিময়ের সূত্রে আড্ডার গালগল্পের যে আবহাওয়াটি তিনি তাঁর প্রায় গল্পে সঞ্চার করেন, তা নিতান্তই ফেলে-আসা উনিশ শতকীয় চণ্ডীমণ্ডপের আবহাওয়ার প্রতীক—একালের বুদ্ধিদীপ্ত কথনরীতির সঙ্গে তার মিল নেই। একালের মেজাজটিও তাঁর লেখায় দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে অনুপস্থিত। বসু মহাশয়ের পরিহাস-রসিকতা উপভোগ্য, কিন্তু প্রায় সময়েই ভাব-তারল্যের মূল্যে এই উপভোগের অধিকার অর্জন করতে হয়। তাঁর অধিকাংশ গল্পে সুকুমার হৃদয়বৃত্তি ও আদর্শকে ব্যঙ্গ করবার যে প্রবণতা দেখা যায়, সেটি আসলে মানসিক শূন্যগর্ভতারই প্রতীক। এক ধরনের শুষ্ক যুক্তিবাদ এবং cynicism দিয়ে তিনি মানুষের সহজ প্রাণোচ্ছ্বাসকে প্রতিহত করতে চান। এ প্রয়াস সর্বপ্রকার কমনীয় অনুভূতি ও ভাব-গাম্ভীর্যবর্জিত তাঁর সাধারণ সাহিত্য-প্রয়াসের মতই বন্ধ্য হতে বাধ্য।

এ সব দেখে-শুনে এক-এক সময় মনে হয় আধুনিক রম্যরচনাকারেরা একালে যদি কারও দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকেন তো তিনি শ্রীরাজশেখর বসু। তাঁর রচনার অসংশয় তারল্যের সুরটি খুব সম্ভব রসসৃষ্টিপ্রয়াসী পরবর্তী লেখকদের লিখনরীতির ভিতর অর্ধজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হয়ে থাকবে। নিজে তিনি যে ভঙ্গির পারপোষক, সে ভঙ্গি অপরের রচনায় প্রতিফলিত হতে দেখলে তাঁর ভাল লাগবারই কথা। কার না ভাল লাগে?

নারায়ণ চৌধুরী

আত্মস্মৃতি

তৃতীয় প্রবাহ—অষ্টম তরঙ্গ

ত্রিশঙ্কু

'শনিবারের চিঠি' নবপর্যায় প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। প্রবাসী প্রেস হইতে উহার মুদ্রণ রহিত হওয়াতেও যে তাঁহার ক্রোধশান্তি হয় নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৩৩৮ আশ্বিনের 'স্বদেশে'। দার্জিলিং-গিরিশৃঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত কবি নজরুল ইসলামের মুলাকাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ হাবিলদার-কবি স্বয়ং প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে এই নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাটি ছিল—

"কবি হেসে বল্লেন, সজনে গাছকে কোন রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেমন চমৎকার ফুলঝুরির মত ফুল সেজে থাকে।...কবি হাসতে হাসতে বল্লেন, এই রকম আর একটি জীবের নাম করা চলে—দেখতে সে বেশ সুশ্রী, কিন্তু সেও ঠিক ঐ কারণে সাহিত্যের আসরে একেবারে একঘরে হয়ে আছে।

আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠ্‌লুম। তিনি মুখ টিপে বল্লেন, মুরগী।"

ইতিমধ্যে বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিজাত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়ে'র আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মাসিক 'বিচিত্রা' পুরা চার বৎসর চলিয়াও অভিজাত সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের আভিজাত্যের মোহ কাটাইতে পারে নাই। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'বিচিত্রা'র প্রাপ্তে তু পঞ্চমে বর্ষে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় রয়াল সাইজের মোটা অ্যান্টিক কাগজে মুদ্রিত অতিকায় অথচ সুদর্শন 'পরিচয়' আত্ম-প্রকাশ করিল। "পরিচয়"শীর্ষক মুখবন্ধে লিখিত হইল—

"সভ্যতার আদবকায়দার কড়াকড়ি সত্ত্বেও মানুষের আদিম পরিচয়স্পৃহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। হঠাৎ সিগারেটের জন্য দেশলাইয়ের দরকার হয়, পাশের লোকের রিস্টওয়াচ দেখিয়া সময় জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে,...সে অপরের সান্নিধ্য চায়, তাই সে সাহিত্য চায়।...দেশ ও কালের বিস্তীর্ণ ব্যবধানের সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সাহিত্য-জগতেই সমধর্মী মন পরস্পরের সহিত করকম্পন করে,...আজ মানুষের প্রধান কাজ—ভাষা-সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাসত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগযুগসঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন-পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণচিত্ততার রক্তগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ।"

সম্পাদকের এই বিজাতীয় উপমা-কণ্টকিত দন্ত আমাদের ভাল লাগে নাই। "সঙ্কীর্ণ-চিত্ত" বলিয়া "শনি"র উল্লেখও রাগের কারণ হইতে পারে। হাত নিশপিশ করিতেছিল, কিন্তু উপায় ছিল না, নবপর্যায় 'চিঠি' তখনও স্বল্পনামাত্র। পুনর্জীবনপ্রাপ্ত 'চিঠি'র প্রথম সংখ্যাতেই (আশ্বিন) কাজেই ডক্টর সুশীলকুমার দের 'পারচয়'-মারী "পরিচিতি" বাহির হইল। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাদপুত 'পরিচয়'—রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় "নবীন কবি" প্রবন্ধে। 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি ইঙ্গিত করিয়া "সাহিত্যিক মোরগের লড়াই" কথাটা তিনি ব্যবহার করিলেন এবং সেই সঙ্গে লিখিলেন, "এই লড়াইয়ে কোনোদিন আমি যোগ দিই নি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েছি।"

ইঙ্গিত যে আমরাই গায়ে পাতিয়া লইলাম তাহা নয়, 'মাসিক বসুমতী'তে (ফাল্গুন, ১৩৩৮) শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের "এই লড়াইয়ে কোনোদিন আমি যোগ দিই নি" উক্তিটির প্রতিবাদে "সাহিত্যিক মোরগের লড়াই" নামে এক বেনামী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন এবং উক্ত প্রবন্ধের সঙ্গে "জয়ন্তী-সংখ্যা" 'শনিবারের চিঠি'র মোরগলাঞ্ছিত মলাটটি ছাপিয়া দিয়া রবীন্দ্রনিন্দিত মোরগ যে কে তাহা স্পষ্টভাবে সনাক্ত করিয়া দিলেন। এড়াইবার আর পথ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের এই বিরূপতায় তরুণেরাও নানাভাবে উল্লাস প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইহা একান্ত শত্রুর লাঞ্ছনায় সামান্যজনোচিত উল্লাস মাত্র, রবীন্দ্রনাথ এক পক্ষকে গালি দিয়া অন্য পক্ষকে তখনও সমর্থন করিলেন না। কার্তিকের 'পরিচয়ে' "পত্রিকা" নামীয় প্রথম প্রবন্ধে লিখিলেন—

"শুনেছি তরুণেরা বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি অনেক নূতন কীর্তি করেছেন বলে গৌরব করেন কিন্তু ভাষার নূতন পথকে বাধামুক্ত করবার যে-উদ্যোগ প্রমথ করেছেন তার চেয়ে ইদানীং আর কী উদ্ভাবিত আমি জানি নে। এটা জানা আছে প্রমথকে বয়স খতিয়ে তরুণ বলবার জো নেই।"

স্বয়ং প্রমথনাথও সে যুগের তরুণ-পত্রগুলিকে এক কঠিন মার দিলেন এই 'পরিচয়ে'ই। তিনি লিখিলেন—

"আমি পুরোনো লেখক। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে নতুন কাগজ মানে হচ্ছে—সেই কাগজ যার লেখক সব পুরোনো। সুতরাং পুরোনো লেখকেরা যদি না লেখেন, তা হ'লে নতুন কাগজ আর চলে না। এর কারণ তরুণপত্রের প্রধান লক্ষণই এই যে তার অন্তরে প্রেরণা নেই।"

আমাদেরও বয়স ছিল কম, রক্ত ছিল গরম। পূর্বের "সজনে ফুল" ও "মুরগী"র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া "সাহিত্যিক মোরগে"র উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল ১১ই পৌষে (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত "রবীন্দ্র-জয়ন্তী"কে কেন্দ্র করিয়া। যখন কবির সপ্তর বৎসর পূর্তি-উৎসবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কলিকাতা নাগরিকদের পক্ষে মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষে কবি কামিনী রায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু-নামাঙ্কিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রচিত অভিনন্দন পাঠ করিলেন, যাবতীয় সাময়িক পত্র বিশেষ-সংখ্যায় কবিকে সম্মানিত করিলেন, তখনই আমরা "জয়ন্তী-সংখ্যা" (মাঘ ১৩৩৮) প্রকাশ করিয়া ব্যাজস্তুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ করিয়া বসিলাম। শ্রীঅমল হোম প্রমুখ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না, বিশেষ করিয়া তাঁহার ছবিকে "ছবিতা" আখ্যা দিয়া যে সচিত্র ব্যঙ্গরচনাটি (আমার রচিত, হেমন্ত-চিত্রিত) আমাদের জয়ন্তী-সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, রবীন্দ্রনাথকে উত্যক্ত ও মর্মাহত করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। তদ্ব্যতীত কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্রেও কম লঘুতা প্রকাশ পাইল না। মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসাপরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল। আমাদের আহত ভক্তি ও অভিমানই যে ব্যঙ্গ-বক্রোক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল, এই সহজ কথাটা সাধারণ পাঠক তো বুঝিলই না, রবীন্দ্রনাথও বুঝিয়াও বুঝিলেন না। ব্যবধান দুস্তরতর হইয়া উঠিল। এই ব্যাপারে নিতান্ত বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম যে, তখন পর্যন্ত রবীন্দ্র-লাঞ্ছনায় উল্লসিত হয় এমন লোকের সংখ্যা বড় কম নয়।

"সজনে ফুল" ও "মুরগী"র উপমা রবীন্দ্রনাথ ঠিক আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রয়োগ করিয়াছিলেন কি না, আজ আর তাহা হলফ করিয়া

বলিবার উপায় নাই। তবে আমাদের মত আরও অনেকের ধারণা হইয়াছিল, আমরাই তাঁহার লক্ষ্য। সুতরাং আমরা মনের সাধেই মনের ঝাল মিটাইয়াছিলাম, গদা ছুঁড়িয়াছিলাম অনেককেই লক্ষ্য করিয়া; কিন্তু কেন্দ্রস্থলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আঘাতটা তাঁহাকেই বাজিয়াছিল সর্বাধিক। আমরাও তখন বেপরোয়া। প্রেস এবং আপিস—উভয় দিক দিয়াই 'প্রবাসী'র সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন আমি, একেবারে 'আউট' বলিলেই চলে। কোনও দিক দিয়া ভয়-ডরের কোনও বালাই নাই, খাপখোলা তরোয়ালের মতই তখন আমি উলঙ্গ, কটু উপমা ও শ্রদ্ধাহীন উক্তি কিছুতেই বাধে নাই। মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ নেতারা কারারুদ্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরে দেশের অতিশয় রাষ্ট্রনৈতিক দুর্দিনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সুতরাং আমাদের বিরোধিতায় সমর্থকের অভাব হয় নাই। দেশের দুর্দিন এবং দেশের জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ছবির সুযোগ আমরা পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সকল মন্দেরই একটা ভাল দিক থাকে; রবীন্দ্র-জয়ন্তী লইয়া আমাদের ব্যঙ্গও অন্তত একটি সুফল প্রসব করিয়াছিল। সে সুফল একান্ত আমারই ব্যক্তিগত প্রাপ্তি। ব্যঙ্গের পাল্লার পাষাণ ভাঙিবার জন্য জয়ন্তী-সংখ্যার গোড়ায় এবং শেষে দুইটি প্রশস্তি-কবিতা যোজিত হইয়াছিল—গোড়ায় মোহিতলালের "কবি-বরণ" এবং সমাপ্তিতে আমার "রবীন্দ্রনাথ"। সুফল আমার সেই একটিমাত্র কবিতার পরিধিতেই আবদ্ধ থাকে নাই, আমার সমগ্র কাব্যজীবনে তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাঁকুড়া কলেজ হস্টেলে এক পূর্ণিমা-রাত্রে যে ছন্দ আয়ত্ত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস করিয়াছিলাম এবং যাহা তাহার পর দীর্ঘ বারো বৎসরের অবিশ্রান্ত সাধনাতেও ধরা দেয় নাই, অকস্মাৎ অত্যন্ত অসতর্ক মুহূর্তে তাহাই আমার লেখনীমুখে ধরা দিল। নূতন অস্ত্র হাতে পাইয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম। স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করিবারই গোপন বাসনা ছিল। কিন্তু সত্যকার কাব্য হৃদয়াবেগকেই মানে, বুদ্ধিকে নয়। আমার যুক্তিবাদী প্রখর বুদ্ধি হার মানিল। হৃদয়াবেগ-স্পন্দিত ছন্দ নিজেই নিজের পথ করিয়া লইয়া লিখিয়া চলিল—

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য সমাকুল,
যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়.
ব্যাঘ্র, হস্তী, বরাহ বন্য, ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত।
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায়, দুয়ারে অসাড় শির।
ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে—
মহিমা বিরাট, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালবাসিবারে যত যাই, তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

এই বিচিত্র ছন্দের নির্মল ধারায় স্নান করিয়া যেন আমি পূত পবিত্র নবজন্মান্তর লাভ করিলাম; সকল ক্ষোভ, সকল অভিমান, সকল বিদ্বেষ ভাসিয়া গেল, শেষ দুই স্তবক আপনা হইতেই সেই অবগাহনপুণ্যে মধুর হইয়া উঠিল—

হিমালয়—
চিনিতে চেয়েছি, বুঝিতে চেয়েছি, ধরিতে চেয়েছি তারে,
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।
হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-দ্বারে—
সুমুখে আমার সবজির ক্ষেত, তাহারি আড়াল দিয়া
হিমালয় হতে ঝরণা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরিঝিরি আর কুলুকুলু রবে ছুটেছে গাঁয়ের মেয়ে।
কোথা হিমালয় হিমেতে রয়েছে ঢাকা
পাহাড় গলিয়া মৃত্যচপল এসেছে গাঁয়ের মেয়ে,
বিস্ময় মানি তারি পানে চেয়ে চেয়ে
ঢেউ গনি আর শুনি কুলুকুলু রব.
ভুলি হিমালয়, ভালবাসি নদীটিরে—
তত ভালবাসি যত কাছে যাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।
হিমালয়—
তুমি হিমে ঢাকা থাকো, নদীরে ক'রো না হিম।

আমার কুটীর-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সবজি-ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাকো, নাহি থাকো—
হিসাব তাহার আমি তো রাখিব নাকো,
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও-সলীজলে—
কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিকথা তার যে পারে রাখুক লিখে
সলীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

শুভমুহূর্ত মানুষের জীবনে কখন কোন্ দিক দিয়া আসে কেহ বলিতে পারে না। বঙ্গভারতীর বরপুত্রকে নির্মম আঘাত হানিবার জন্য যে ক্ষুরধার অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলাম, স্বয়ং বীণাপাণি সকৌতুকে তাহাতেই তন্ত্রী যোজনা করিয়া বিদ্রোহীকেই সুরের ঝঙ্কার তুলিবার আদেশ ও অবকাশ দিলেন, আমার কাব্য-জীবনের ইহাই বিচিত্রতম ইতিহাস। এই "রবীন্দ্রনাথ" কবিতাতেই আমার পরবর্তী কাব্য 'রাজহংসে'র গোড়াপত্তন।

নবপর্যায়ে যাঁহারা নূতন আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রবন্ধকার ব্রজেন্দ্রনাথ এবং কবি ও কথাশিল্পী কৃষ্ণধন দের উল্লেখ করিয়াছি। বৈষ্ণব-সাহিত্যের ঘুন, তিন খণ্ডে প্রকাশিত সুবৃহৎ 'বীরভূম-বিবরণে'র সম্পাদক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও প্রথম সংখ্যা হইতেই বৈষ্ণব সাহিত্যে রায়বাহাদুরী মহিমা ফাঁস করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নূতনেরা সকলেই সশরীরে হাজির হইয়াছিলেন। ডাকযোগে অচিরকাল মধ্যে আরও দুইজন বিচিত্র শিল্পীর সমাগম হইল—সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ মনে হইল চিরপরিচিত। মুঙ্গের হইতে কবি ও কথাশিল্পী শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গলা খাঁকারি দিয়া জানান দিলেন, আমিও আছি হে। পর পর তিনটি উৎকৃষ্ট স্যাটায়ার কবিতা তিনি পাঠাইলেন—কার্তিকের জন্য "বাঙ্গালী চিত্রকরের প্রতি," অগ্রহায়ণের জন্য "বিরহিণীর পত্র" এবং মাঘের জন্য "নৃত্যময়ী"। কোনটিতেই লেখকের নাম ছিল না। পরে

তিনি "চন্দ্রহাস" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কবিতাগুলি 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিষ্ঠা প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়াছিল। লেখক কে তাহা না জানিয়াও অনেককে কবিতাগুলির পংক্তিবিশেষ আওড়াইতে শুনিতাম, যেমন—

"কত রকমের তনু।
দেখিলে আকুলি মুহু যাইত
মহাসংযমী হনু।
পীন-উন্নত আয়ত নিটোল
কল্পাসে আঁকা স্তন গোল গোল,
কাঠির মত ক্ষীণ কটি যেন
বাঁকা মন্মথ-ধনু।"—"বাঙ্গালী চিত্রকরের প্রতি"—

অথবা "বিরহিণীর পত্রে"—

"বিরহে আর কত যুগ রইবে এ বুক
তোমার তরে দিল খুলিয়া?
শেষে কি পাড়ার লোকে প্রেমের ঝোঁকে
পড়বে ঢুকে পথ ভুলিয়া?
যদি না এসো ত্বরিত
ঝরিবে চোখের সরিৎ।
এ পাড়ার তরুণগুলো ঝাঁকড়া-চুলো
গাইছে গজল নজরুলিয়া।"

এবং "নৃত্যময়ী"র—

"বালো ভাসিল নৃত্যকেনিল বন্যাতে
নাচে এক সাথে পিসী-মাসী-মাতা-কন্যাতে
—আমি চেয়ে থাকি বোকার মতন শঙ্কিত।"

বন্ধুবর শরদিন্দুর কোনও কাব্যগ্রন্থ এতাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। একালের বাঙালী পাঠক-সমাজ তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট কবিতার রসাস্বাদনে বঞ্চিত আছেন।

নোয়াখালি জেলার ফেণী শহর হইতে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'-সংক্রান্ত কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র ডাকযোগে পাঠাইয়া সাড়া দিলেন দ্বিতীয় জন—চিত্রশিল্পী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, অধুনা বিখ্যাত পি.সি.এল. বা কাকী খাঁ।

প্রফুল্লচন্দ্র তখন ফেণী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। বন্ধুবর গোপাল হালদারও ফেণীর লোক; তিনিই সর্বপ্রথমে এই অধ্যাপকের কার্টুন-পারদর্শিতার কথা বলিয়াছিলেন। 'শেষ প্রশ্নে'র ছবি চারখানি দেখিয়া এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা ভাবিয়া হৃষ্ট হইলাম। হরিপদ রায়ের মত তখনও তাঁহার রেখাগুলি দৃঢ়তাব্যঞ্জক হইয়া উঠে নাই; কিন্তু দেখিলাম সূক্ষ্ম খুঁটিনাটির দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি; উচ্চশিক্ষিত তিনি, বংশগৌরবও যথেষ্ট—ঢাকার সুবিখ্যাত আনন্দচন্দ্র রায়ের সাক্ষাৎ দৌহিত্র, সুতরাং ভাব ও বিষয়বস্তুও তাঁহার যথেষ্ট অধিগত হইবার কথা। আমি ফেরত ডাকে তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া অধ্যাপকপদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আহ্বান করিলাম; জোরের সঙ্গেই ভরসা দিলাম, কার্টুন-শিল্পকে তিনি ত্যাগ না করিলে উহা তাঁহাকে কখনই বিপদে ফেলিবে না। সাহসী বীরপুরুষ তিনি, আমার ডাকে অবিলম্বে সাড়া দিলেন। কলিকাতার কার্টুন-শিল্পের রঙ্গমঞ্চে ভাগ্যপরীক্ষায় জয়ী হইয়া তিনি আমার মান বাঁচাইয়াছেন এবং পরবর্তী দীর্ঘকাল বিনা মাহিনায় আপ্‌খোরাকিতে 'শনিবারের চিঠি'র কার্টুন সরবরাহ করিয়া বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বের জন্য আমি আজিও মনে মনে গৌরব বোধ করি।

নবপর্যায়ে প্রথম ছয় মাসের মধ্যে বন্ধুবৎসল সহৃদয় নলিনীকান্ত সরকার লেখকরূপে চিঠির রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। কাজী নজরুল ও দিলীপকুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, আবার এই দুইজনই 'চিঠি'র বড় টার্গেট, কাজেই 'শনিবারের চিঠি'র ধর্ম এই হাস্য-ব্যঙ্গরসিকের স্বধর্ম হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্কোচ ছিল। জয়ন্তী-সংখ্যা উপলক্ষে তিনি আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, একেবারে "জয়-জয়ন্তী" গাহিতে গাহিতে আসরে অবতীর্ণ হইলেন—

"যাত্রী মাতিল শুধি প্রাক্তন ঋণ মৃত ছুঁড়ি হোমজ ভস্মে,
গাহে সুরঙ্গম-সুরঙ্গমা কত বিচিত্র দীর্ঘে হ্রস্বে।
কত তরুণারুণ-রাগে কলিকাস্ফুট-বর মাগে
লিষ্টিত কাগজ তা তা।
জয় জয় জয় হে বগলে-ধৃতরবি, জয়ন্তি-ভাগ্যবিধাতা।"

কিন্তু এত তোড়জোড়, এত সমাগম-সমারোহ, এত হৈ-হৈ-কোলাহল কিছুই আমার অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যকে রোধ করিতে পারিল না। রঞ্জন প্রকাশালয়ে বইয়ের সংখ্যা চার ('অজয়,' 'পথ চলতে ঘাসের ফুল,' 'পথের পাঁচালী' ও 'যোগভ্রষ্ট') হইতে দশ (আমার 'মনোদর্পণ,' 'অঙ্গুষ্ঠ,' 'বঙ্গরণভূমে' ও 'মধু ও হুল'; বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' ও অরবিন্দ দত্তের 'রক্তের টান' এই ছয়খানি নূতন মুদ্রিত) হইল; তথাপি ইংরেজী ভাষানুযায়ী দুই প্রান্তের সংযোগ বিধানে অপারগ হইলাম। অভিমান তখনও প্রবল, প্রবাসী আপিসের লোকেরা আমার পতনে হা-হুতাশ ছলেও বক্রোক্তি করিবে—এই আশঙ্কায় পূর্বের চাল এক চুল কমাইতে পারিলাম না। প্রবাসী প্রেসের ফোরম্যান ও মুদ্রাকর মানিকচন্দ্র দাস তখনও আমার বাড়ির নিম্নতলার ভাড়াটিয়া; তিনি আমার বিশেষ ভক্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার কাছেও মুখোশ পরিয়া থাকিতে লাগিলাম। বীডন স্ট্রীটের ছাপাখানা ও আপিস-বাড়ির ভাড়া মাসে মাসে দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত ফাল্গুনের গোড়াতেই (১৯৩২, ফেব্রুয়ারির শেষ) আপিস ও ছাপাখানা ৫সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটেই স্থানান্তরিত করিতে হইল। লক্ষ্মী যখন বিরূপ হন অলক্ষ্মী তখন নানা ব্যসনের আকারে দেখা দেন, অত্যন্ত সঙ্কটের মুহূর্তে গুরুতর ভ্রান্তির আকারেও তিনি দেখা দিয়া থাকেন। আমারও তাহাই ঘটিল, পদে পদে ভুল করিতে লাগিলাম। 'শনিবারের চিঠি'র আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি, ডি. এম. লাইব্রেরি ও শ্রীগুরু লাইব্রেরিকে অত্যধিক কমিশনে রঞ্জন প্রকাশালয়ের বই বেচিয়া যাহা পাইতাম তাহাও চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে ফুঁকিয়া যাইত। সংসারের দৈনন্দিন খরচ ছাড়া, 'শনিবারের চিঠি'র কাগজের দাম ও ফর্মা ছাপার খরচ নগদা-নগদি দিতে হইত। এমন দিন আসিল যখন আর কিছুতেই চলে না, শতচ্ছিদ্র তরণী ডোবে ডোবে—কাহাকেও কিছু বলিতে বাধে, এমন কি গৃহিণীকেও। মরিব তবু প্রবাসীওয়ালাদের কাছে প্রেস্টিজ হারাইব না—নির্বোধের ইহাই হইল পণ।

রাজা (তখন কুমার) ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহিত সে সময়ে গাঢ়

বন্ধুত্বের সম্পর্ক; তাঁহার অহেতুক ভালবাসায় আমি সেদিন হইতে আজও পর্যন্ত ধন্য হইয়া আছি। তাঁহার কাছে শুধু মুখের কথা খসাইলেই মায়ামন্ত্রে আমার সকল সমস্যার নিরসন হইবে, ইহা জানিয়াও আমি নীরব থাকিতাম; অথচ কাব্য-সাহিত্যচর্চার ছলে তাঁহার গ্রেট ইণ্ডিয়ান ও পরে ক্যালকাটা হোটেলের আড্ডায় সদলবলে নিয়মিত হাজিরা দিতাম। অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বশে তিনি প্রায়ই আমার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হইয়া নানা প্রশ্ন করিতেন, আমি কৌশলে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতাম। আমার মনের অবস্থা তখন সত্যসত্যই রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কারে"র কবির মতন—

"কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর।
থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী,
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,
রাখি না কাহারো আশা।"

বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ধীরেন্দ্রনারায়ণ আমাকে একটি সুবৃহৎ রূপার গড়গড়া উপহার দিয়াছিলেন, উপযুক্ত নল লাগাইবার সামর্থ্য ছিল না, একটা সস্তা রবারের নল কোনও রকমে সংগ্রহ করিয়া প্রহরে প্রহরে নিজেই তামাক সাজিয়া চক্ষু বুজিয়া টানিতে টানিতে আর্থিক গোলোক-ধাঁধা হইতে বাহির হইবার উপায় খুঁজিতাম। ঠিক এই সময়ে এই অবস্থায় তারাশঙ্করের কাছে ধরা পড়িয়াছিলাম। 'আমার সাহিত্য-জীবনে' তিনি সে কাহিনী এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"এই সময় 'শনিবারের চিঠি'র দুরন্ত প্রতাপ। সাহিত্যিক মজলিশ বসলেই শনিবারের চিঠি'র কথা ওঠে। গালাগালির অন্ত থাকে না; যাঁরা গাল খেয়েছেন তাঁরা জ্বলেন। যাঁরা খান নি তাঁরা নিজেদের দুর্ভাগা মনে করেন। আমি অবশ্য একবার গাল তখন খেয়েছি। কিন্তু তবুও দুর্ভাগার দলেই আছি। একদা ইচ্ছা হ'ল 'শনিবারের চিঠি'র দুর্দান্ত সজনীকান্তকে দেখে আসি। কেমন সে লোকটা! রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে 'শনিবারের চিঠি'র আপিস। সাবিত্রী এবং কিরণকে কিছু না ব'লেই একদিন বেরিয়ে গেলাম। মানিকতলা খালের কাছাকাছি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে সভয়ে প্রবেশ ক'রে

দাঁড়ালাম। চকমেলানো বাড়ি, উঠানের চারি পাশে টাকা রোয়াক বা বারান্দা। সেই বারান্দায় বেশ জবরদস্ত কাঠামো—মোটা নাক, রুঢ় উগ্র-দৃষ্টি চোখ, ফরসা রঙ, চেয়ারে ব'সে গড়গড়ায় রবারের নল লাগিয়ে তামাক টানছে। মনে হ'ল এই সজনীকান্ত, শনিবারের চিঠির সম্পাদকের মত জবরদস্ত চেহারাটা বেশ মিলে যাচ্ছে। তবে রবারের নলে গড়গড়া টানতে দেখে অশ্রদ্ধা হ'ল। এ কি গুরুচণ্ডালী ব্যাপার!"—১ম সং., পৃ. ৫৫-৫৬

সুন্দরবনের দুর্দান্ত কেঁদো বাঘ যে তখন অবস্থাবিপর্যয়ে তৃণভোজী হইয়াছে, তারাশঙ্করের তাহা জানিবার কথা নয়। বস্তুত, আমি তখন নিমীলিত নেত্রে উক্ত রৌপ্য-গড়গড়াটিকেই ঝাড়িয়া ফেলিবার ফন্দি আঁটিতেছিলাম; সুতরাং গুরুচণ্ডালী দোষ দেখিবার দৃষ্টিই আমার ছিল না।

এই নিদারুণ ত্রিশঙ্কু অবস্থায় বাঁচিবার আপাতসহজ এবং পরিণামে ভয়াবহ পথের সন্ধান দিলেন তখন 'শনিবারের চিঠি'র বিজ্ঞাপন-সংগ্রাহক বন্ধুবর সুবলচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রাসবিহারী। নিমজ্জমান ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে বাঁচাইবার নানা হদিস তাঁহারি জানা ছিল। তাহার একটির নাম চোটাসুদে টাকা ধার করা। একদিন অতি প্রত্যূষে শ্রীমান আমাকে গরানহাটার একটি সুবৃহৎ প্রাসাদোপম ভাঙা বাড়িতে লইয়া গেলেন। সেখানে ভোর হইতেই দলে দলে আসামীরা হাজির হইতেছে। একটি খেরো-বাঁধানো খাতায় সহি ও টিপসহি দিয়া মুনিমজাকে বাড়ির ঠিকানা লিখাইয়া আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাসবিহারী জামিন হইলেন। একজন ভোজপুরী দরোয়ান সরেজমিনে তদন্ত করিতে গেল, ঠিকানা সাচ্চা কি না। সে ফিরিয়া আসিয়া অনুকূলে সাক্ষ্য দিলে প্রথম দিনের দেয় তিন শত পয়সা ও লিখাই-খরচ ইত্যাদি বাবদ দশ টাকা কাটিয়া লইয়া আমাকে লিখিতমত তিন শত টাকা ধার দেওয়া হইল। মোট বাহাত্তর দিন ধরিয়া প্রত্যহ তিন শত করিয়া পয়সা আদায়কারী দরোয়ানের নিকট দিলে তবেই সুদে আসলে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হইবে। ইহারই নাম চোটাসুদে ঋণগ্রহণ। আমি আসামী হইয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া অত্যন্ত জরুরি তাগাদাগুলির সুরাহা করিলাম। যতদিন তিন শত টাকার ভগ্নাংশ হাতে ছিল পরোয়া ছিল না, ভোরে দরোয়ান আসিলেই তাহাকে বিদায় করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার

পর 'শনিবারের চিঠি'র নগদ বিক্রয় ও সামান্য বিজ্ঞাপন ও রঞ্জন প্রকাশালয়ের বই বিক্রয়ের টাকা হইতে দেয় পয়সা দিতে গলদ্‌ঘর্ম হইতে লাগিলাম। প্রাণ যায় আর কি! কিন্তু এই কথা স্বীকার না করিলে আজ অন্যায় হইবে যে, এই কারবারীরা আসামীর মানে কদাচিৎ আঘাত করিত। দরোয়ান অতি প্রত্যুষে নিঃশব্দে আসিত এবং নিঃশব্দে চলিয়া যাইত। একদিন আধদিন অপারগ হইলে কথাটিমাত্র বলিত না। আসামীকে যথোপযুক্ত সম্ভ্রম দেখানোই যেন এই ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু যত ভদ্রতাই ইহারা করুক, বাহাত্তর দিনে পরিশোধের দায়িত্ব ছিল আসামীর। নাগপাশ প্রত্যহ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছিল, কখনও যে উদ্ধার পাইব সে ভরসাও ছিল না।

কিন্তু উদ্ধার পাইলাম। মুক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া মানুষকে দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মনোহারী মূর্তি তো আছেই। আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে ততখানি অগ্রসর হইতে দিলেন না। একদিন ভোরে সদর বহির্দ্বার ঘেঁষিয়া লেন-দেন হইতেছে, বন্ধু ডাক্তার বিরিঞ্চিবিলাস রায়ের কাছে ধরা পড়িয়া গেলাম। তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া ত্রিতলের হিতেন নন্দী এবং দ্বিতলের সজনীকান্তের সহিত একটু আড্ডা দিতে আসিয়াছিলেন। চোটাঋণের পরিমাণ তখন ছয় শত টাকায় উঠিয়াছে, 'শনিবারের চিঠি'র কাগজের দাম ছয় শত টাকা না দিলেই কাগজও উঠিয়া যায়। বিরিঞ্চিবিলাস সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত কটু ভাষায় ভৎর্সনা করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি স্বভাবত বদরাগী লোক। আমি লজ্জায় ও ঘৃণায় মুহ্যমান হইয়া কম্পোজিং ঘরের টুলেই বসিয়া রহিলাম, বাড়ির আর কেহই কিছু জানিল না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বিরিঞ্চিবিলাসের পুনরাবির্ভাবে একটু যে বিব্রত হই নাই, তাহা বলিতে পারি না। তিনি আমাকে কোনও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া—প্রায় অভিভাবকের ভঙ্গিতে কঠোর আদেশ করিলেন, জামা গায়ে দিয়ে আয়, গরানহাটা যেতে হবে।

ঝাপসা চোখ কিছুক্ষণ অন্যদিকে ফিরাইয়া রাখিতে হইল। যাহা

হউক, বিরিঞ্চিবিলাস আমার সঙ্গে গিয়া চোটাঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া বিচিত্র টিপসই সম্বলিত খেরো-বাঁধানো বালি-কাগজের খাতাটি উদ্ধার করিলেন এবং প্রত্যাবর্তনান্তে আরও ছয় শত টাকা নগদ আমার হাতে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইবার উপদেশ আমার মগজে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সত্যকার মুক্তিরূপে এই সঙ্কটকালে তিনিই প্রথম দর্শন দিলেন।

কিন্তু সাবধান হইব কেমন করিয়া, আয়ের পথ কোথায়? দুর্ভাবনার অন্ত নাই। ঠিক এই সময়ে প্রায় একসঙ্গে আরও তিনজন মুক্তিদাতার আবির্ভাব ঘটিল, যাঁহারা শেষ পর্যন্ত আমাকে বিরিঞ্চিবিলাসের নিকট প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে দিলেন না। প্রথম, বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ ও যাদুকর প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত, দ্বিতীয় সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকার এবং তৃতীয় সাহিত্য-বন্ধু 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইঁহারা যেন ষড়যন্ত্র করিয়াই একসঙ্গে আসিয়াছিলেন। আমার আয়ের থার্মোমিটারের পারা প্রায় তলায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল, ইঁহাদের সহৃদয়তার তাপে তাহা ধীরে ধীরে চড়িতে লাগিল। কিন্তু ইঁহাদের কথা বিস্তারিতভাবে বলিবার পূর্বে কাজী নজরুল ইসলামের সহিত আমার সাক্ষাৎ আলাপ ও ঘনিষ্ঠতার কাহিনী বলা প্রয়োজন।

নজরুলকে 'শনিবারের চিঠি' কম গালি দেয় নাই, সত্য কথা বলিতে গেলে 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকাল হইতেই সাহিত্যের ব্যাপারে একমাত্র নজরুলকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম উদ্যোক্তারা তাক করিতেন। তখন আমি আসিয়া জুটি নাই। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এলাইয়া পড়িলে ওই নজরুলী রন্ধ্রপথেই আমি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মোহিতলালও ওই নজরুলের কারণেই আসিয়া জুটিয়াছিলেন,—তবে আমাদের ছিল স্রেফ খেলা, মোহিতলালের ছিল জীবনমরণ-সমস্যা। মনে আছে, নজরুলের ভাষায় 'খুন-খারাপি'র আতিশয্য দৃষ্টে পীড়িত হইয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় একটু কঠোর অনুযোগ করিলে কাজী নজরুল সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র পৃষ্ঠায় সেই

অনুযোগ উপেক্ষা করিয়া সদম্ভে বলিয়াছিলেন, "'শনিবারের চিঠি'র কৃপায় আমি তো গালির গালিচায় বাদশাহ।" সেই নজরুলের সহিত আমার ভাব হওয়া একটু বিচিত্র বটে। অচিন্ত্যকুমার, তাঁহার 'কল্লোলযুগে' এই প্রসঙ্গে আমার তারিফ করিয়াছেন।

এই অঘটন ঘটাইয়াছিলেন অঘটনঘটনপটীয়ান পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—আমাদের পবিত্রদা। মিলনের স্থানটা ধর্মস্থান ছিল না, মিলনেচ্ছুরাও ছিল না শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্। এক মজলিসে গান-বাজনার মধ্যে রাত্রি গভীর হইতেছিল। হঠাৎ পবিত্রদা প্রত্যাদিষ্টের মত অনুভব করিলেন, এমন একটা রাত্রে—"In such a night as this" নজরুল এবং সজনীকান্ত পৃথক থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না। সেই গভীর রাত্রেই তিনি পড়ি-কি-মরি করিয়া ছুটিলেন এবং ব্যাপারটার তাৎপর্য আমাদের ঠাহর হইতে না হইতেই মজলিস-ভবনের দ্বারে কাজীর চকচকে চকলেট রঙের ক্রাইসলার গাড়ির দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। মাটিতে চাদর লুটাইতে লুটাইতে তাম্বুলরাগরক্তাধরোষ্ঠবক্ষ নজরুল আসিয়া ঘরের মেঝেতে দাঁড়াইতেই আসরে উপবিষ্ট আমাকে পাঁচজনে মিলিয়া জোর করিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। তারপর হুমদো হুমদো দুই পুরুষের নারীসুলভ কোমললালিতলবঙ্গলতা পদ্ধতিতে প্রথম মিলন সংঘটিত হইল। সদ্যপরিচয়ের "আপনি-আজ্ঞা" সম্বোধন অর্ধঘণ্টায় "তুমি" এবং পরবর্তী আধ ঘণ্টায় চড় চড় করিয়া "তুই-তোকারি"র অধোভূমিতে নামিয়া আসিল। সেদিন যাঁহাদের এই মহামিলনের মহানাটক অবলোকন করিবার সুযোগ হইয়াছিল তাঁহারা ভাগ্যবান। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সেই ভাগ্যবানদের দলে ছিলেন, এইটুকুমাত্র আমার মনে আছে।

বিমল, নলিনীকান্ত, সতীশচন্দ্র এবং নজরুল—আমি যখন অসীম শূন্যপথে নিশ্চিত সংঘাত-মৃত্যুর দিকে দ্রুত অবতরণ করিতেছিলাম, ঠিক তখনই ইঁহারা বিশ্বামিত্রের মত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিলেন। আমি তিষ্ঠিয়া গেলাম।

[ক্রমশ]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

আকাশ-বাণী

১। সাগর

পূর্ণিমা রাত, প্রাণ-সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে মম,
কোথা চাঁদ, মোর মানসের চাঁদ কই ?
মেঘের আড়ালে পড়েছে কি ঢাকা সমুদ্র-প্রিয়তম,
দেখিতে পাই না, তবু জল থই-থই।
হে চাঁদ আমার, চকিতে প্রকাশ পাও,
আকর্ষণের সঙ্গে আলোক দাও ;
আড়ালে রহিয়া মোরে কেন উথলাও—
কাঁদিছে সাগর ফুলিয়া ফুলিয়া মহা-অজগর সম
কান্না তাহার থামিবে না তুমি বই।
পূর্ণিমা রাত, প্রাণ-সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে মম
কোথা চাঁদ, মোর মানসের চাঁদ কই ?

তোমারে ডেকেছি বহু নাম ধ'রে সৃষ্টির আদি হতে
বেদের ছন্দে—আমারি তো সেই ডাক ;
তোমারে খুঁজেছি উপনিষদের অরণ্য-পর্বতে,
আমি সাম গাই, তুমি থাকো নির্বাক্।
কত ঋষি কত মন্ত্র দিয়েছে কানে,
উচ্চারি তাই বুঝি না যদিও মানে ;
ওগো সোম, আমি যুগ যুগ সোমপানে
বিশ্রামহীন ভাসিয়া চলেছি উর্ধ্বমুখীন স্রোতে—
রোধিতে পারে নি সহস্র চার্বাক।
তোমারে ডেকেছি বহু নাম ধ'রে সৃষ্টির আদি হতে,
বেদের ছন্দে—আমারি তো সেই ডাক।

আমি জানি তুমি আকাশ স্বয়ং, সমুদ্রে আছ ছেয়ে
তবুও তোমারে ভাবি আকাশের চাঁদ,

বিরাট প্রসারে চিত্ত ভরে না, ভূমারে বুকেতে পেয়ে
মন খালি খুঁজে ফেরে অল্পের ফাঁদ।
আপন মনের বাসনা-বিকারে চাই—
আকাশের চাঁদে যদি মুঠি ভ'রে পাই;
দোলে সমুদ্র আকাশ-শিকারে তাই
আপন মুকুরে পাগলের মত আপনি দেখিছে চেয়ে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে শুধু ভেঙে ভেঙে যায় ছাঁদ!
আমি জানি তুমি আকাশ স্বয়ং, সমুদ্রে আছ ছেয়ে
তবুও তোমারে ভাবি আকাশের চাঁদ।

বোকা সাগরের আকাশ-বিলাস চলে চিরকাল ধরি,
অস্থির চায় সুস্থিরে হতে লীন,
প্রশান্ত বুকে ছায়া পড়ে, তবু অশান্ত হয়ে মরি,
ফেনতরঙ্গে ভেঙে পড়ি প্রতিদিন।
হে প্রিয়, ঘুচাও ছায়া-ধরাধরি খেলা,
অসীমে ধরিতে সীমার এ জাল-ফেলা;
জানি জানি আমি, তুমি আছ সারাবেলা
সাগরের জলে চাঁদ ও মেঘের ছায়া বিস্তার করি;—
ছুঁয়ে ভালবেসে শুধিবারে চাই ঋণ।
বোকা সাগরের আকাশ-বিলাস চলে চিরকাল ধরি,
অস্থির চায় সুস্থিরে হতে লীন॥

২। বৃদ্ধ বট

বৃদ্ধ বটের মর্মেতে রয়
গোপনে সবুজ আশা,
বসন্ত-রাগে অন্তরে জাগে
শঙ্কিত ভালবাসা।

অরণ্যভূমে নাচিছে সবুজ পাতা ;
বট মনে ভাবে, কবে যে ভরাব খাতা
ছন্দে ও গানে, আশাহীন প্রাণে
তুলি জীবনের ভাষা।
বৃদ্ধ বটের মৃদু মর্মরে
এখনো সবুজ আশা।

শাখা খ'সে খ'সে পড়িয়াছে কবে
হয়েছে পত্রহীন—
বৃদ্ধ বটের মনে পড়ে শুধু
অনেক অতীত দিন।
হাজার হাজার রাতের পাখিরা যবে
ভোরের আলোর আনন্দ-উৎসবে
গান ধরি কবে নিঃসীম নভে
সবে হ'ত উড্ডীন।
পাতার স্বপ্ন, পাখির স্বপ্ন
দেখিছে পত্রহীন॥

['রূপ-লেখা']

—

চাণক্যবচন (১)

রুদ্ধ করিয়া দ্বার,
রাজ্যশাসন করে যে উচিত ডাক্তারী করা তার॥

চাণক্যবচন (২)

দেশের যে প্রতিনিধি
হইবারে চায়, দশের মতন থাকাটাই তার বিধি॥

হৈরব

১

দু' পেগ করিয়া পান
শেষ করি গোটা 'লেগ্-রোস্টে'
হারু ঘোষ মরি মরি
সত্য আবিষ্কার করি
কভু কেঁদে কভু হেসে
কবিতা লিখিল শেষে
পাগলা-গারদে নহে স্বকীয় প্রকোষ্ঠে।
কবিতাটি এই—
(কোন খাদ নেই।)

২

"আবিষ্কার করেছি নির্ভুল
মাথায় থাকিত যদি চুল
বিকায়ে বিলকুল
দেনা মোর হ'ত না উশুল,
দেনা যে অঢেল
চুলও নাই, সব টাক—ভৃঙ্গরাজ ফেল।
জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে
ধীরে ধীরে ডুবিয়াছি ধারে
কত যে জানি না
কত মানুষের কাছে কতই যে ঋণ আছে
সে কথা ঢাকিতে চাই
নানা ভাবে নানা ধাঁচে,
মানুষ দূরের কথা পশু-পাখি ফুল-ফল
তাদেরই দাক্ষিণ্যটুকু সবার যে সম্বল
কাক চিল শকুনি গৃধিনী
তাহাদেরও কাছে আছি ঋণী

কিন্তু তা মানি না।
কেন যে জানি না।
অহঙ্কার-অন্ধকারে জ্বালাইয়া বাক্য-ফুলঝুরি
করি বাহাদুরি,
শূন্যতার সিংহাসনে করি আরোহণ
কাঁপাই গগন
চিৎকারিয়া উঠি থাকি' থাকি'
যে প্রহরী নাই তারে ডাকি
—কোই হ্যায়
ত্রস্ত কোনও দৌবারিক ছুটে এসে
সাড়া নাহি দেয়।

যখন শিবের গীত গাওয়াটাই সমুচিত
গাই না কিছুতে
ধান ও ঢেঁকির চিন্তা নিয়ে যায়
অনেক নীচুতে
ধান ঢেঁকি মেলে যবে
শিব-গীত গাই তবে
ধান তো ভানি না
কিন্তু তা মানি না
কেন যে জানি না।

এলোমেলো হয়ে যায় সব ;
কেউ বলে জ্ঞানী আমি
কেউ বলে-নব।
কেউ বলে ধূর্ত সভিন
কটাক্ষে ঢাকিবে ব'লে পরিয়াছে চশমা রঙিন
হতভম্ব হই,

সকরুণ কণ্ঠে কহি—কোথা তুমি, কই
কোথা তুমি পরমাত্মা,
মেলে না তাহারও পাত্তা!
দুত্তোর বলিয়া শেষে গান গাই, বাজায়ে গীটার
পাখাটা চালাই জোরে বাড়ে যদি বাড়ুক মিটার।
মোদ্দা কথা বুঝিয়াছি তোমাদেরই একজন আমি
কারো দাদা, কারো ভাই, কারো শালা,
কাহারও বা স্বামী।
করজোড়ে অনুরোধ করিতেছি তাই বারে বারে
পায়ে ঠেলে দিও না আমারে।"

৩

বাজারে গুজব জোর হারু ঘোষ বেচে গাই গরু
এমন কি বাঁধা দিয়ে বোন বেটী জরু
অবতীর্ণ হবে নাকি নির্বাচন-দ্বন্দ্বে
আর উক্ত কবিতাটি হৈরব ছন্দে
আবৃত্তি করিবে নিজে লরি-শীর্ষে হইয়া উন্মনা
কবিতা-চুম্বক নাকি আকর্ষিবে ভোট-লৌহ-কণা!

"বনফুল"

—

আকাশ

মেঘ আসে মেঘ চ'লে যায়,
নীলাকাশ রয় চিরস্থির,
আমরা ভুলিয়া থাকি হায়,
মানুষের আত্মায় গভীর
কোনো চিহ্ন কোনো দাগ কভু,
পড়ে না করনো কোনো ছায়া,
আমরা অস্থির হই তবু,
পরম-আত্মার সেই মায়া।

হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

(পূর্বানুবৃত্তি)

রাণী। এ তোমারি মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা।
বাতুলতা সৃজিয়াছে অশরীরী ছায়া
পরম চাতুরী ভরে।

হ্যাম। বাতুলতা!
তোমার আমার নাড়ী গাহে একই তানে
সুমধুর স্বাস্থ্যের সঙ্গীত।
কহি নাই বাতুলের কথা।
পরীক্ষা করহ মোরে,
যা কহেছি বর্ণে বর্ণে কহিব তা পুনঃ
বাতুলে তা পারে কি কখনো?
মা গো, তাঁহারি করুণাকণা
মাগিতে ত হবে একদিন;
তাই বলি,
হৃদয়ের ক্ষতমুখ ঢাকিতে যেয়ো না
মিথ্যাময় সান্ত্বনা-প্রলেপে;
আত্মপ্রতারণা করি ভেবো না জননী—
এ নহে মায়ের পাপ, ছেলের প্রলাপ।
এ প্রলেপে ক্ষত ত সারে না,
বাহিরটা চাপা থাকে,
অন্তর্মুখে বাড়িতে বাড়িতে
গোপনে বিষায়ে তুলে জীবনের মূল।
তাঁর পায়ে সর্বপাপ করহ স্বীকার;
অতীতের অনুতাপে এড়াইয়া চল ভবিষ্যৎ;
বিষতরু সিঞ্চিয়া যতনে
বর্ধিত ক'রো না তারে আর।
ক্ষম মম যত দুর্ভাষণ;

বর্তমানে পাপ এত পেয়েছে প্রশ্রয়
পুণ্যই তাহার পাশে মাগুক মার্জনা
নতজানু নতশির হয়ে।
হয়ত তাতেই শুভ হবে।

রাণী। বৎস হ্যামলেট,
দ্বিখণ্ডিত ক'রে দিলি হৃদয় আমার।

হ্যাম। যে খণ্ড কলঙ্কময় ছুঁড়ে ফেলে দাও,
অপর খণ্ডটি ল'য়ে করহ যাপন
শুদ্ধতর নিষ্পাপ জীবন। বিদায় জননী!
পিতৃব্যের শয্যাভাগী হ'য়ো না কো আর;
অন্তরে না পার যদি মুখে সৎ হও।
অভ্যাসের বহু দোষ, গুণও আছে তার;
সৎ পন্থা করিলে গ্রহণ
দিনে দিনে পথ হয় সহজ সুগম
অভ্যাসেরই গুণে।
অভ্যাসেই নবরূপ ধরে যে স্বভাব।
আবার বিদায় মাগি।
ঈশ্বরের আশীর্বাদ যদি কভু চাহ,
আমিও মাগিয়া লব মায়ের আশিস্।
এঁর তরে (পলোনিয়সকে দেখাইয়া)
সত্যই হতেছে অনুতাপ।
বিধাতার ইচ্ছা ছিল তাই,—
আমারে নিমিত্ত করি শাস্তি দেবে এরে,
ইহারে করিয়া হত্যা আমি শাস্তি পাব।
আমিই ব্যবস্থা করি এঁর,
হত্যার কারণ যাহা আমিই কহিব।
নিষ্ঠুর হতেই হবে
পরিণামে শুভ হবে তাতে,

মন্দ দিয়ে এ আরম্ভ,
আরো মন্দ আসিছে পশ্চাতে।
আর একটি কথা দেবি!

রাণী। কি করিব বল?

হ্যাম। যা বলি, তা ছাড়া সব কিছু।
যখন সে ভুঁড়ো রাজা পালঙ্ক-শয়নে
অজস্র দর্শনক্ষতে ভরিয়া কপোল
সম্বোধিবে 'তুলালী' বলিয়া,
এক জোড়া মসীকৃষ্ণ চুম্বন দাগিয়া
সোহাগ করিবে তার
জঘন্য হাতের হাতা নেড়ে
তখন খুলিয়া ব'লো সবই;
ব'লো,—সত্যই উন্মাদ নহি আমি,
এ শুধু কপট উন্মত্ততা।
এ কথা বলাই ভাল তাকে;
কোন রাণী,—সুন্দরী যুবতী অপ্রমাদী,
লুকাইতে পারে এ পরম গোপ্য কথা
সে দর্দুর, সে মার্জার,
সেই চর্মচটিকার কাছে?
কেই বা তা পারে?
তাই ক'রো,—
গল্পের বানরী সম
আপনার সর্বনাশ ক'রো নিজ হাতে।

রাণী। নিশ্চিন্ত থাকিও বৎস,
যতক্ষণ দেহে রহে শ্বাস
তোমার গোপন কথা হবে না প্রকাশ।

হ্যাম। আমায় ইংলণ্ডে যেতে হবে;
শুনেছ নিশ্চয়।

রাণী। স্মরণ ছিল না মোর ;
তাই স্থির হইয়াছে বটে।

হ্যাম। পরোয়ানা আঁটা হয়ে গেছে।
মোর দুটি সহপাঠী,
বিষদন্তী সর্পসম যারা মোর বিশ্বাসভাজন,
নির্দেশ পেয়েছে তারা।
তারাই চলিবে আগে পথ সাফ করি,
আমারে ফেলিবে নিয়ে দুর্বৃত্তের ফাঁদে।
দেখা যাক।
জতুগৃহী পুড়ে মরে নিজ জতুগৃহে
সে বড় কৌতুক।
তলে তলে সুড়ঙ্গ খনিয়া
উড়ায়ে না দিই যদি ঊর্ধ্বে পিতৃলোকে,
সেও হবে বিস্ময়েরই কথা।
কি আনন্দ,
সেয়ানে সেয়ানে যবে হয় ঠোকাঠুকি।
কাজ শুরু করি ;
এটাকে টানিয়ে ফেলি পাশের ও-ঘরে।
তা হ'লে চলিনু মাতা।
এখন এমন স্থির
বাক্যহীন সুগম্ভীর
এই মন্ত্রীবর,
জীবনে ছিলেন ইনি
নির্বোধের শিরোমণি
ব্যাচাল বর্বর।
এস দেব, শেষ করি তোমার ব্যাপার।
চলিনু জননী।

[পৃথক ভাবে প্রস্থান ; হ্যামলেট পলোনিয়সকে টানিয়া লইয়া গেল]

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য। দুর্গ-প্রাসাদের একটি কক্ষ

রাজা, রাণী, রোজেনক্রানজ্ ও গিলডেনস্টার্নের প্রবেশ

রাজা। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বুকফাটা এই দীর্ঘশ্বাস,
হেতু তার খুলে বল।
আমারও তা জানা প্রয়োজন।
পুত্র তব কোথা?

রাণী। একটু নিভৃত চাই।

[রোজেন ও গিলডেনের প্রস্থান]

প্রভু, প্রিয়তম!
আজ রাত্রে কি দেখিনু আমি!

রাজা। কি দেখিলে গারট্রুড?
হ্যামলেট কেমন আছে?

রাণী। সম্পূর্ণ উন্মাদ;
সিন্ধু সনে রণে যেন মাতিয়াছে মত্ত প্রভঞ্জন।
পর্দার পিছনে শুনি মৃদু সঞ্চরণ
'মূষিক, মূষিক,' বলি করিল চিৎকার
মত্ততার ঝোঁকে, ক্ষণমাত্রে নিষ্কাশিয়া অসি
বধিল নিভৃতবর্তী বৃদ্ধ সভাসদে
মস্তিষ্কের উত্তপ্ত খেয়ালে।

রাজা। এ কি কাণ্ড!
আমিও থাকিলে সেথা অনুরূপই হ'ত।
তার স্বাধীনতা হ'ল সকলেরই ভীতির কারণ,
কি তুমি, কি আমি, কিংবা রাজ্যের যে কেহ।
বীভৎস হত্যার এই কি জবাব দেব?
নিশ্চয় আমারই স্কন্ধে চাপিবে এ দোষ,
আমারই উচিত ছিল উন্মত্ত যুবকে
আটক করিয়া রাখি সবার কল্যাণে।

একান্ত স্নেহের বশে
বুঝেও বুঝি নি মোরা কর্তব্য মোদের।
দুষ্ট ব্যাধি না করি প্রকাশ
ক্ষয় করিলাম বুঝি জীবনের মূল।
কোথায় গেল সে ?

রাণী। শবদেহ রাখিতে বাহিরে।
সেই মত্ততার মাঝে
দেখা দিল ক্ষণিক চেতনা,
নিকৃষ্ট খনিজ স্তরে স্বর্ণরেখা সম ;
কার্য অন্তে লাগিল কাঁদিতে।

রাজা। যা হবার হয়েছে, গারট্রুড !
প্রথম অরুণছটা শৈলচূড়া নাহি পরশিতে,
হেথা হতে পোত খুলি লবে সে বিদায় ;
আর সেই হীন কর্মভার
সুকৌশলে, শক্তির প্রয়োগে
আমাদেরই সহিতে ও বহিতেই হবে।
গিলডেনস্টার্ন !

[রোজেন ও গিলডেনের পুনঃপ্রবেশ]

বন্ধুগণ, তোমরা উভয়ে যাও
সাথে ল'য়ে আরও সহায়ক।
উন্মত্ততা বশে
হ্যামলেট করেছে হত্যা পলোনিয়সেরে ;
বাহির করেছে তারে টানি।
খুঁজিয়া আনহ তারে ;
ধীরভাবে কথা কবে।
আর শবদেহ, গির্জায় লইয়া চল।
বিলম্ব ক'রো না বন্ধুগণ !

[রোজেন ও গিলডেনের প্রস্থান]

এস গারট্রড ;
বিজ্ঞতম বন্ধুগণে করিয়া আহ্বান
জানাই সকল কথা,
যা হয়েছে, যা করিতে চাই।
তা হ'লে হয়ত,
কুৎসার বিষাক্ত শর না বিঁধি মোদের
ব্যর্থ হবে অচ্ছেদ্য বাতাসে ;
জান ত কুৎসার গতি, অব্যর্থ সন্ধান,
অনায়াসে পার হয় ব্রহ্মাণ্ডের সীমা।
চল মোরা যাই,
আতঙ্কবিহ্বল চিত্তে স্থৈর্য নাহি পাই। [প্রস্থান]

২য় দৃশ্য। দুর্গ-প্রাসাদের অপর এক কক্ষ

হ্যামলেটের প্রবেশ

হ্যাম। বেশ ক'রে গুদামজাৎ ক'রেছি।

রোজেন ও গিলডেন } (নেপথ্যে) হ্যামলেট! কুমার হ্যামলেট!

হ্যাম। ঐ আবার কিসের গোলমাল? হ্যামলেটকে ডাকে কে? ওঃ, এই যে এঁয়ারা এসেছেন।

[রোজেন ও গিলডেনের প্রবেশ]

রোজেন। মৃতদেহ কি করলেন কুমার?

হ্যাম। মাটির ধন মাটিতে মিশিয়ে দিইছি।

রোজেন। কোথায় রেখেছেন বলুন? সেখান থেকে আমাদের গির্জায় নিয়ে যেতে হবে।

হ্যাম। ওটা বিশ্বাস ক'রো না।

রোজেন। কি বিশ্বাস করব না?

হ্যাম। যে আমি তোমাদের পেটের কথা চাপতে পারি, কিন্তু

নিজেরটা পারি নে। তার উপরে প্রশ্ন করছেন স্পন্জ্; রাজার ছেলে তার কি উত্তর দেবে?

রোজেন। আমি কি স্পন্জ্ কুমার?

হ্যাম। নিশ্চয়। রাজার অনুগ্রহ, পুরস্কার, শক্তি সবই ত শুষে নিচ্ছ। এই সব কর্মচারীই শেষের দিকে রাজার বড্ড কাজে লাগে। বাঁদরে যেমন গালভর্তি কুল নিয়ে একটা একটা ক'রে গেলে, সেই রকম। তোমরা সংগ্রহ কর, তিনি নিংড়ে বার ক'রে নেন; তার পর, স্পন্জ্ বাহাদুর, তুমি যে শুকনো সেই শুকনো।

রোজেন। আপনার কথা বুঝলাম না কুমার।

হ্যাম। শুনে খুশি হলাম। পাজির কথা ছুঁচোর কানে।

রোজেন। কুমার, মৃতদেহ কোথায় আমাদের বলতে হবে, আর আমাদের সঙ্গে রাজার কাছে যেতে হবে।

হ্যাম। দেহ গেছে রাজার কাছে রাজা নেইকো দেহে। রাজা তো এমন একটি পদার্থ—

গিলডেন। পদার্থ!

হ্যাম। তবে অপদার্থ। আমায় নিয়ে চল তার কাছে। চোর লুকিয়েছে, চল চল, খুঁজে বার করি। [প্রস্থান]

অনুবাদঃ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

—

ক্রীড়

মানুষেরে ভালবাসি এ সংসার তাই তো সুন্দর,
সব বিক্ষোভের শান্তি—সকল পাপের আছে ক্ষমা;
আর জানি সর্বব্যাপী রয়েছেন পরম ঈশ্বর,
তাঁরই আশীর্বাদ করে ধরণীরে নিত্য মনোরমা॥

—

ইস্তাহার

মাতালের দেশে সুরাবন্তিরা হুকুম করেছে জারি,
মদের নিন্দা যে করিবে তার জরিমানা হবে ভারি॥

ভাস্কো-দা-গামা

১

ভাস্কো-দা-গামা ইতিহাসে বিস্ময়
ভাস্কো-দা-গামা একটি মানুষ নয়।
এই পৃথিবীতে যেখানে মানুষ কাঁদে
আশা-আশঙ্কা ঘর ভাঙে ঘর বাঁধে
রক্তে মাটিতে ফসল বোনার পর
কুঁড়ের আঁধারে কাঁদে সম্বৎসর
এখানেতে ছিল বিচিত্র ইতিহাস—
এখানেতে ছিল চেঙ্গিস তৈমুর,
বন্যার মত মুহূর্তে ভেঙে পড়া,
লাখো জনপদ নিমেষে ভস্ম করা,
ক্রোধ গৌরবে পৃথিবীকে করে হেঁট,
তলোয়ারে তোলা লাখো মুণ্ডের ভেট,
ভাস্কো-দা-গামা এখানে হঠাৎ এল ;—
নরমুণ্ডেতে কোন শ্লাঘা নেই তার,
বিনয়ে কোমল সব মত্ততাহীন—
দেবে কিছু নেবে, মণি গোলকোণ্ডার,
নিয়ে যাবে ভার, লাক্ষা লবঙ্গের,
মসলা, রেশম, দারুচিনি, মস্‌লিন ॥

২

ভাস্কো-দা-গামা কি ক'রে ঘুমিয়েছিল
এতকাল ভাঙা গ্রামের অন্ধকারে ?
কতদিন পরে এই পণ্যস্তূপে,
কি প্রাণস্পন্দ রূপ নিল এই রূপে !
না—না—কখনই আর লুণ্ঠন নয়,
গেছে সে সময় নেই তাতে সংশয়,
যত পাপ তাপ মনেই গিয়েছে মিশে

চুক্তি, সনদ, সুবিনীত কুর্ণিশে,
মস্‌নদে লাল ঝালরে ও গালিচায়
রাজার নিকটে ভাস্কো-দা-গামা চায়,
'ধর্মাবতার, দিন, অনুমতি দিন—
ভাস্কো-দা-গামা দেবে কিছু, আর নেবে—
মসলা, রেশম, দারুচিনি, মস্‌লিন।'

৩

ভাস্কো-দা-গামা জানাল আপন দাবি
চাপা দিগন্ত খুলে দিল তার চাবি,—
ছিঁড়ে গেল মায়া অতীত বন্দরের,
পিষে গেল রোষ ক্রুদ্ধ তরঙ্গের,
আকাশেতে ওড়ে উদ্ধত সাদা পাল,
যেন সে উড়েছে উড়ে যাবে চিরকাল,
নানা ছল ক'রে টানে কোন্ তটভূমি—
রাত্রি পাথারে তারকার বাতি-ঘর,
সমুদ্রে ডাকে মৃত্যুর বন্দর,
ভাস্কো-দা-গামা জানি, তাকাবে না তুমি—
দিগন্ত ছেঁড়া আঁখি—ভ্রূক্ষেপহীন,
ইতিহাসে এক অবাক অন্বেষণ;
মরীচিকা নয়;—মসলা মস্‌লিন !!

৪

ভাস্কো-দা-গামা, শুধু এই চাও তুমি
এরই তরে এত সমুদ্র মরুভূমি
পার হয়ে এলে এত রাত এত দিন,
কোন্ ফল চাও এই দৃঢ় সাধনার ?
শুধুই রেশম মণি গোলকোণ্ডার ?
শুধুই লাক্ষা, লবঙ্গ, মস্‌লিন ?

৫

না, না, এ কি ভুল। জানি তুমি নিশ্চয়
চাও পৃথিবীতে ত্রাণকর্তার জয়।
তাঁহারই করুণা জানাইতে—আজ তুমি
পার হয়ে এলে সমুদ্র মরুভূমি,
বিশ্বাস রাখ তুমি তাঁরই সাধনায়;
কি করে মিথ্যা রেশমে মসলায় ?
ভাস্কো-দা-গামা, ধন্য ধন্য তুমি !

৬

বন্দরে চলে বিচিত্র বিকিকিনি
প্রাণের অন্ন, লবঙ্গ, দারুচিনি,
বহু সনাতন সিংহাসনের ছাতা,—
আজ পাঠ করি, প'ড়ে আছে খোলা খাতা,
শতাব্দী যায়, শতাব্দী তার পর,
দিল্লীতে হাসে কোন্ দিল্লীশ্বর ?
ভাস্কো-দা-গামা, কি আশ্চর্য তুমি !

৭

তবু ইতিহাস এখানেই শেষ নয় !
এখানে থামলে থেকে যেত সংশয়,
মহামানবের এ মহাসাগর তটে,
আরও কিছু রেখা পড়েছে কালের পটে ;
সংবাদ ছিল উহ্য সে সাধনার,
ভাস্কো-দা-গামা খোঁজ রাখে নি কো তার,
তবু আজ এই উদ্ধত এশিয়ার,
দিকে দিগন্তে তারই ত বার্তা রটে ;—
ধুলো হয়ে যাক মণি গোলকোণ্ডার
পাতার পতাকা ওড়ে অক্ষয় বটে ॥

অসিতকুমার

ডানা

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে যা অহরহ ঘটছে কিন্তু যার সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই—ক্ষুদ্র পরিবেশে সেই ঘটনাটা কবির মনে কৌতুক সঞ্চার করলে একটু। পৃথিবী যে সেকেণ্ডে আঠারো মাইল বেগে ছুটে চলেছে এবং যে কোনও মুহূর্তে যে সেটা চুরমার হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাতে পারে এ সম্ভাবনা জেনেও আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরনা করছি—ঠিক এ কথাটা কবির মনে হ'ল না, কিন্তু দ্রুতবেগে ধাবমান ট্রেনের কামরায় সহসা জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়াতে এ কথাটা তাঁর মনে হ'ল যে, আমাদের প্রত্যাশাটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ব'লে অপ্রত্যাশিতকে আমরা ভাল ক'রে সম্বর্ধনা করি না, মনে মনে তার জন্যে প্রস্তুত থাকি না। সে যখন আসে আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পায়। মন্দাকিনী না এসে যদি একটা খাওলা-ধরা কলসী জানলার ভিতর দিয়ে এসে হাজির হ'ত আর সেই কলসীর ভিতর থেকে দৈত্য না বেরিয়ে যদি মন্দাকিনী বেরিয়ে আসতেন এবং এসে বলতেন যে যাদুকর পি. সি. সরকারের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি আমার গাড়িভাড়াটা বাঁচিয়ে দিলেন—তা হ'লেও কি এর চেয়ে বেশি বিস্ময়কর হ'ত কিছু? কবি লক্ষ্য করলেন, মন্দাকিনীর গালে কপালে কালো কালো দাগ হয়েছে কিসের। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন মনে করলেন না। চুপ ক'রে চেয়েই রইলেন তাঁর মুখের দিকে। মন্দাকিনীও কোনও কথা বললেন না কয়েক মুহূর্ত। তিনি স্বামীর মুখের দিকে এক নজর চেয়েই সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। রূপচাঁদবাবু চিঠিতে যে সব ইঙ্গিত করেছিলেন তা যে মিথ্যা তা কবির মুখভাবের সূক্ষ্ম শুচিতা দেখেই বুঝেছিলেন তিনি। এই সূক্ষ্ম শুচিতার স্বরূপ আর কারও চোখে হয়তো ধরা পড়ত না, কিন্তু মন্দাকিনীর চোখে পড়ল, কারণ ওই শুচিতাটুকুর ভিত্তির উপরই তাঁর সমগ্র দাম্পত্য জীবন গ'ড়ে উঠেছিল, সে ভিত্তির স্বরূপ তাঁর কাছে অবিদিত ছিল না, তাতে এতটুকু

চিড় খেলে আর কেউ না জানুক তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানতে পারতেন তা কোনও প্রমাণ-প্রয়োগের অপেক্ষা না রেখেই। তবে একটা কাণ্ড যে কিছু ঘটেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, আর খুব সম্ভবত ঘটেছে কবিরই নির্বুদ্ধিতার জন্য বা কোনও কিছু নিয়ে বাহাদুরি করতে গিয়ে—এ রকম ধরনের কাণ্ড তো একবার নয়, অনেকবার উনি করেছেন। একবার তো চাকরিটাই যেত আর একটু হ'লে। ছেলেরা করেছে স্ট্রাইক, ওঁর সর্দারি ক'রে তাদের দলে ভিড়ে যাওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু উনি ভিড়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে থাকাটা ক্রমশ যেন একটা সেতুর মত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সেতুর উপর দিয়ে মন্দাকিনী যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে, কবির মনে হ'ল।

মন্দাকিনী এর পর যা বললেন তা কিন্তু কবি প্রত্যাশা করেন নি।

বড্ড রোগা হয়ে গেছ তুমি। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হয়েছে নিশ্চয়। ঠাকুরটা রাঁধে কেমন?

কবি তবু চুপ ক'রে রইলেন। অভিভূত হয়ে কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে লাগলেন।

রূপচাঁদের চিঠি পেয়ে আসছ তুমি! কি লিখেছে রূপচাঁদ? আমাকে কিছু না জানিয়ে তোমাকে চিঠি লেখবার মানে কি তা তো বুঝতে পারছি না।

মন্দাকিনী যে প্রশ্ন করেছিলেন এটা ঠিক তার জবাব নয়। নিজেও তিনি বুঝতে পারছিলেন তা, কিন্তু যত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই হোক সব চেয়ে দরকারী কথাটা তিনি যে ব্যক্ত করেছেন, করতে পেরেছেন, এইতেই তিনি যেন আরাম পেলেন একটু, সাহসও পেলেন।

মন্দাকিনীর উত্তর কিন্তু একটুও অপ্রাসঙ্গিক হ'ল না। তিনি বললেন, তিনি তোমার বন্ধু ব'লেই লিখেছিলেন। এসব কথা তোমারই উচিত ছিল আমাকে জানানো। তুমি দিনরাত ব'সে ব'সে কবিতা লিখতে পার, কিন্তু আমাকে দু লাইন চিঠি লিখতে পার না। শঙ্করীকে চিঠি লিখেছিলে? না, তাও লেখ নি?

মন্দাকিনীর কথার ধাঁচে সেই সাবেক সুর বেজে ওঠাতে আনন্দ-মোহন আর একটু সাহস পেলেন। সাহস পাবার আর একটা কারণও ছিল। যে সব অস্ত্র চালনা ক'রে মন্দাকিনী তাঁকে কাবু করবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর মনে হ'ল, সে সব অস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেবার মত একটা অস্ত্র অন্তত তাঁর তূণে আছে। ব্যবহার করলেন সেটি।

অতবড় জমিদারির ম্যানেজারি করতে করতে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাই না, চিঠি লিখব কখন? তার ওপর খুনের মামলায় ফেঁসে গিয়ে-ছিলাম একটা—

এইবার মন্দাকিনী আকাশ থেকে পড়লেন এবং প'ড়েই নির্বাক হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। জমিদারির ম্যানেজারি? খুনের মামলা? এসব কি আবার! এসবের বিন্দুবিসর্গ তো তিনি জানেন না! রূপচাঁদবাবুও তো লেখেন নি কিছু! তিনি কেবল লিখেছেন—আপনি চ'লে আসুন, আনন্দমোহন কাছা-খোলা লোক, আপনি না থাকাতে নানা ভাবে ও নানা রকম কেলেঙ্কারি ক'রে বেড়াচ্ছে, ওকে একদিন থানায় পর্যন্ত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, অনেক তদ্বির ক'রে জেল থেকে উদ্ধার করেছি আমরা; একটা মেয়েমানুষের নামের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে যা-তা রটাচ্ছে লোকে। জমিদারির কথা তো লেখেন নি কিছু!

তাঁর বাক্‌শক্তি যখন ফিরে পেলেন তখন প্রশ্ন করলেন, কার জমিদারির ম্যানেজারি করছ তুমি?

অমরেশবাবুর। মল্লিক মশাইয়ের চাকরি গেছে। আমিই এখন হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার।

কি রকম?

মন্দাকিনীর মুখভাব দেখে কবি খুশি হলেন। এই সংবাদ-বোমাটি যে মন্দাকিনীর সমস্ত বিরুদ্ধতাকে বিধ্বস্ত ক'রে দেবে এ তিনি জানতেন। কিছুদিন পূর্বে মল্লিক-গৃহিণী মন্দাকিনীকে তাচ্ছিল্যভরে কি একটা বলেছিলেন তার থেকে মন্দাকিনীর মনে ধারণা জন্মেছিল যে, উনি ম্যানেজারের বউ ব'লেই এ ধরনের কথা বলতে সাহস করেছেন। কিন্তু

এ ধারণা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল যে, চাকা ঘুরে যেতে পারে এবং তিনিই একদিন ম্যানেজারের বউ হয়ে যেতে পারেন। এই অসম্ভব-সম্ভব হয়েছে এ কথা স্বকর্ণে শুনেও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কবিকে নানা রকম প্রশ্ন ক'রে নানা ভাবে ঘুরে ঘুরে সম্পূর্ণ খবরটি তিনি যখন জানলেন, বিশেষত যখন টের পেলেন যে এর জন্যে বেশ মোটা মাইনেও পাওয়া যাবে, ইতিমধ্যে হাজার টাকা পাওয়াও গেছে, তখন তিনি উথলে উঠলেন। তাঁর এই উথলে-ওঠা অবস্থা দেখেও কবি কিন্তু আর একটা কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন মনে মনে। শঙ্করীকে, মানে তাঁর মেয়েকে সত্যিই এখনও চিঠি লেখা হয় নি। সেই প্রসঙ্গটা যদি হঠাৎ উঠে পড়ে তা হ'লে কি জবাব দেবেন তিনি! মরীয়া হয়ে ঠিক করলেন, নিজেই প্রসঙ্গটা তুলবেন। বললেন, ফিরে গিয়েই তোমাকে খবরটা দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু কাজের চাপে নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতা ছুটতে হয়েছিল। শঙ্করীকে পর্যন্ত চিঠি লিখতে পারি নি এখনও। ওই খুনের মকদ্দমাটায় এমন জড়িয়ে ফেলেছিল আমাকে—আমার বিশ্বাস মল্লিক আছে এর ভেতরে।

দেখা গেল মন্দাকিনীর প্রত্যয় আরও দৃঢ়। তিনি বললেন, নিশ্চয় আছে।

একটা বড় স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল।

মন্দাকিনী একটা ফেরিওলাকে দেখে বললেন, আমার জন্যে কিছু ফল কেনো তো, আজ আমার ষষ্ঠীর উপোস।

কবি তাড়াতাড়ি ফল কিনতে লাগলেন।

[ক্রমশ]

"বনফুল"

দোসরা অক্টোবর

আসবে ফিরে অনেক-অনেক দোসরা অক্টোবর।
সবগুলি তার ব্যর্থ একটি বিশেষ দিনের পর—
আমরা যদি করতে থাকি লড়াই পরস্পর॥

জীবিত বনাম মৃত

প্রাচীন জরাজীর্ণ বাড়ি। গ্রামের ভূতপূর্ব জমিদারদের বাড়ি। সামনে সিং-দরজা। দু পাশে সারি সারি ঘর। এক পাশের ঘরগুলি জমিদারী সেরেস্তা ও সেরেস্তার কর্মচারীদের এবং অন্য পাশের ঘরগুলি বাবুদের বৈঠকখানা, অতিথি-অভ্যাগত ও অন্যান্য চাকর-বাকরদের থাকবার জন্যে ব্যবহৃত হ'ত। সিং-দরজা পার হ'লেই সামনে নাট-মন্দির, তার পিছনে দেব-মন্দির। পাশ দিয়ে গেলেই আর একটি দরজা। দরজা পার হ'লেই বিস্তৃত উঠন। ডান পাশে সারি সারি ঘর। কোলে টানা চওড়া বারান্দা—দোতলা। সামনে রন্ধনশালা—একতলা। তার পরেই খিড়কি-দরজা। দরজা পার হ'লেই আম-কাঁঠাল-নারকেলের বাগান। এক পাশে পুকুর। বাগান পার হ'লেই মাঠ। মাঠের পরেই নদী।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও এ বাড়ির চেহারা অন্যরকম ছিল। নূতন-তৈরী বাড়ির মত ঝকঝকে তকতকে। সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করবার সময় সকলেই দু দণ্ড দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকত। আত্মীয়-পরিজন চাকর-ঝি কর্মচারী মিলে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক বাড়িতে বাস করত। ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সারা বাড়ি লোকজনে গমগম করত। এখন কিছুই নেই। বাড়িটা ভেঙে পড়ছে। ঘরগুলো বাসের অযোগ্য হয়েছে। লোকজনও বেশি নেই। আছেন মাত্র একজন বিধবা, তাঁর অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ও এ বাড়ির বহু দিনের চাকর হরিপদ। হরিপদ শুধু চাকর নয়, অভিভাবকও। পৃথিবীতে তার নিজের বলতে কেউ নেই। এদের নিয়েই তার সংসার। জমিদারি তেজারতি যা নিয়ে এ বাড়ির নাম-ডাক জাঁক-জমক ছিল, এখন তার কিছুই নেই। ভাগ্যের অনুকূল স্রোতে একদিন যেমন এসেছিল, প্রতিকূল স্রোতে আর একদিন তেমনই ভেসে চ'লে গেছে। সামান্য জমি-জমা পুকুর-বাগানের যৎসামান্য আয়ে কোনমতে এই তিনটি মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন চলে।

বিধবার নাম সুলোচনা। বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। তাঁর বাবা গদাধর রায় মাস কয়েক আগে গতায়ু হয়েছেন। অবস্থাপন্ন ঘরে শিক্ষিত ছেলের হাতেই মেয়ে দিয়েছিলেন গদাধর। ছেলেটি উকিল হয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যে বেশ পসারও হয়েছিল। কিন্তু সুলোচনার ভাগ্য ভাল

নয়। অল্প বয়সেই সিঁথির সিঁদুর মুছতে হ'ল। কোলে একটি মাত্র মেয়ে। তাকে নিয়েই দেওরের সংসারে থাকতেন। দেওরও ওকালতি করতেন শহরে। পাকিস্তান হবার পরও টিঁকে ছিলেন কোন রকমে। কিন্তু হঠাৎ গোলমাল শুরু হ'ল আবার। চ'লে যেতে হ'ল এ দেশ ছেড়ে। এখন কলকাতার কাছে জমি কিনে বাড়ি-ঘর তুলে সপরিবারে বাস করছেন। সুলোচনা ও তাঁর মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্যে জিদ করেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ গদাধর তখনও বেঁচে ছিলেন। সুলোচনার দেওর তাঁকেও তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্যে সসম্মানে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু গদাধর রাজী হন নি।

পিতৃ-পিতামহরা যে মাটিতে দেহরক্ষা করেছেন সেখানে আমিও থাকতে চাই বাবাজী, আমাকে আর এ বয়সে টানাটানি ক'রো না।—বলেছিলেন গদাধর। কাজেই মেয়েকে নিয়ে বুড়ো বাপের কাছে থেকে যেতে হ'ল সুলোচনাকে। এখন গদাধর চ'লে গেছেন। দেওরের কাছ থেকে, জ্ঞায়ের কাছ থেকে অনুরোধ আসছে বার বার। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্যে যেতে পারছেন না।

ভাগ্যবিড়ম্বনা বইকি! না হ'লে এত বড় মেয়ে—লেখাপড়া-শেখা, বুদ্ধি-শুদ্ধিওয়ালা মেয়ে, সে এমন হয়ে যায়! মেয়ের নাম সুচিত্রা, ডাকনাম খুকী। কাকার বাড়িতে থাকতে কলেজে পড়ত। আই. এ. পর্যন্ত পড়েছিল। পরীক্ষা দেয় নি। দেবার সুযোগ হয় নি। গোলমাল বাধল হঠাৎ। তাদের পাশের বাড়িতে একজন ভদ্রলোক থাকতেন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সের যুবক। নাম বিধুভূষণ। স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। অঙ্কন-বিদ্যা ও ব্যায়ামের শিক্ষক। লম্বা-চওড়া মজবুত শরীর। শরীরে শক্তিও ছিল যথেষ্ট। লাঠিখেলা ও ছুরিখেলায় পারদর্শিতা ছিল। চমৎকার ছবি আঁকতেন, গান গাইতেন, সব রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে জানতেন। এক কথায় সব দিক দিয়ে গুণী মানুষ। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেছিলেন। চেষ্টা করলে কলকাতায় চাকরি যোগাড় করতে পারতেন। গান-বাজনা শিখিয়ে রোজগারও করতে পারতেন। কিন্তু সে চেষ্টা করেন নি। এই জেলাতেই বাড়ি। ছেলেবেলায় এ শহরেই মানুষ হয়েছিলেন। পূর্ব-সম্পর্কের টানটাকে নানা অসুবিধার সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন।

বিধুভূষণের কাছে ছবি-আঁকা গান-বাজনা শিখত সুচিত্রা ও তার একজন খুড়তুতো বোন। পাড়ার এবং শহরের আরও অনেক মেয়ে শিখত।

সুচিত্রাদের কাছ থেকে টাকা নিতেন না বিধুভূষণ। বাড়ির ছেলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় বাড়িতে আসতেন, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গল্প করতেন, খেলা করতেন, তাদের নানা রকম খেলা শেখাতেন। বিধুভূষণের নম্র ও ধীর স্বভাবের জন্যে পাড়ার সকলেই তাঁকে ভালবাসত। তাঁর উপরে নির্ভরও করত সবাই। পাড়ার কোন বিপদে আপদে তিনি যে সর্বাগ্রে গিয়ে দাঁড়াবেন, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল সবাই। সুচিত্রাই বিধুভূষণের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রী ছিল। অল্প দিনেই বেশ ছবি আঁকতে শিখল; গান গাইতে শিখল; এসরাজ ও সেতার বাজাতে শিখল। বিধুভূষণ ঠাট্টা ক'রে বলতেন, যা তাড়াতাড়ি শিখছ, মাস্টারের বিদ্যেতে আর কুলোবে না বেশিদিন। সুচিত্রাকে স্নেহও করতেন। বলতেন, আমার একটি বোন ছিল ঠিক সুচিত্রার মত দেখতে—এতদিন পরে আবার দাদার কাছে ফিরে এসেছে। বিধুভূষণের সঙ্গে সুচিত্রা একদিন সিনেমায় গিয়েছিল সন্ধ্যার শোয়ে। অনেক দিন পরে একটা বাংলা ছবি এসেছিল। সুচিত্রাই ঝোঁক ক'রে বিধুভূষণকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সুচিত্রার বোন যেতে রাজী হয় নি। রাত নটার সময়ে ফিরছিল। পথে কয়েকজন গুণ্ডা তাদের আক্রমণ করল। সুচিত্রাকে তারা সিনেমায় দেখেছিল। বিধুভূষণ একা তাদের রুখেছিলেন। সুচিত্রা প্রাণ ও মান নিয়ে পালাতে পেরেছিল। বিধুভূষণ গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন। সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে বাড়িতে আনা হ'ল। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে শহরে একটা গোলমাল মাথা তোলবার উপক্রম করল। সকলের পরামর্শে সুলোচনা, সুচিত্রা ও বিধুভূষণকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। সুচিত্রা প্রাণ দিয়ে সেবা করল। এক মাস ভুগে বিধুভূষণ মারা গেলেন।

বিধুভূষণের মৃত্যুর পর সুচিত্রা কি রকম হয়ে গেল! গুম হয়ে থাকত সারা দিন। রাত্রে ঘুমোত না। খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাসখানেক পরে এ অবস্থাটা কাটল, কিন্তু ওর মতিগতি একেবারে বদলে গেল। সংসারের কাজকর্ম কিছুই করে না। যে ঘরটায় বিধুভূষণ মারা গিয়েছিলেন, সেখানেই সারা দিন-রাত থাকে। বিধুভূষণের একটা ছবি এঁকেছিল নিজের হাতে। বাঁধিয়েও ছিল। সেইটাকে টাঙিয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় পুজো করে। সকালে দুপুরে রাত্রে ভোগ দেয়। সেই প্রসাদই

খায়। সুলোচনা কতবার বলেন, সব সময় ওই অন্ধকার ঘরে থাকিস না, বাইরে আয়, ঘুরে-ফিরে বেড়া, সংসারের কাজকর্ম কর্, তা হ'লেই মনটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তা কে কার কথা শোনে! সুলোচনার সস্নেহ অনুরোধ, কাতর অনুনয়, সক্রন্দন তিরস্কার—সব ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। মেয়ে তার মাস্টারমশায়ের স্মৃতি নিয়ে দিনরাত বিভোর হয়ে থাকে। বিয়ে করবে না, এইভাবেই জীবন কাটিয়ে দেবে—এই কথাই বার বার বলে। অথচ বিয়ে তো কোন্ ছেলেবেলা থেকে পাকা হয়ে আছে সুলোচনার সইয়ের ছেলের সঙ্গে। রূপে গুণে এমন ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। যেমন চেহারা, তেমনি বিদ্যে-বুদ্ধি। বিলেত গেছে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। সুলোচনার সই সরলা ছিলেন গদাধরের প্রিয় বন্ধু চন্দ্রনাথ মুখুজ্জের একমাত্র মেয়ে। চন্দ্রনাথ শহরের নামজাদা ডাক্তার ছিলেন। ছেলেবেলায় কতবার মেয়েকে নিয়ে এ বাড়িতে এসেছেন। তখন থেকেই সুলোচনার ভাব হয়েছিল সরলার সঙ্গে। সেই ভাব আরও পাকা হয়েছিল, গাঢ় হয়েছিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। সরলা সুলোচনার মতই ভাগ্যহীনা। কলকাতায় বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু অল্প বয়সেই একটিমাত্র ছেলে কোলে নিয়ে বিধবা হলেন। যতদিন চন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন, সরলা ছেলেকে নিয়ে প্রায়ই বাবার কাছে এসে থাকতেন। সুলোচনার সঙ্গে কতবার ছেলে নিয়ে এখানে এসেছেন। গদাধর খুব স্নেহ করতেন তাঁকে, তাঁর ছেলেকেও। তখন থেকেই দুই সইয়ের মধ্যে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছিল। সরলা একদিন বলেছিলেন সুলোচনাকে, তোর মেয়েকে আজ থেকে নিলাম, আর আমার ছেলে আজ থেকে তোরও ছেলে হ'ল, বুঝলি! বেঁচে থাকি আর ম'রে যাই—এ কথার নড়চড় হবে না।

ছেলে-মেয়ের মধ্যেও খুব ভাব ছিল। দুজনে খেলা করত, এ ওকে ছেড়ে থাকতে চাইত না। শুধু ছেলেবেলাতেই নয়, বড় হবার পরেও তাই। ছুটি-ছাটাতে ছেলে যখন এখানে আসত, মেয়ের তখন মনে স্ফূর্তি ধরতে চাইত না, চোখে-মুখে উপচে পড়ত। সুলোচনার চোখে ধরা পড়ত সবই। বিলেত যাবার আগেও তো ছেলেটি দেখা ক'রে গেল। দুজনে নৌকো ক'রে এখানে এল একদিন। গদাধরকে প্রণাম ক'রে গেল। গদাধর ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন, নাত-জামাই! এস, কাছে ব'স, ভাল ক'রে দেখে নিই। যখন

ফিরে আসবে, তখন আমি থাকব না হয়তো। ছেলেটি বিলেত যাবার পর সুচিত্রা একেবারে মন-মরা হয়ে গিয়েছিল। শুকনো মুখ ক'রে ঘুরে বেড়াত। ওর খুড়তুতো ভাই-বোনরা ঠাট্টা করত—জামাইবাবুর জন্যে হেদিয়ে গেছে দিদি। বেশ চলছিল, বিধুভূষণ আসাতেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। কি যে কাল হ'ল মেয়েকে গান-বাজনা ছবি-আঁকা শেখানোর শখ ক'রে। ভাবলেন, বিলেতফেরত ছেলের বউ হবে, সুবিধে যখন জুটেছে শিখে নিক। মাস্টারি করতে করতে যে বিধু একদিন তাঁর মেয়ের মন জুড়ে ব'সে যাবে, তা কোনদিন ভাবেন নি। এখন সুচিত্রা সে ছেলের নাম পর্যন্ত করে না। বিলেত থেকে একটা ছবি পাঠিয়েছিল। আগে যখন তখন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত। এখন কোথায় ফেলে দিয়েছে ছবিটাকে। মেয়ের এই পাগলামির জন্যেই সুলোচনা দেওরের কাছে যেতে পারেন নি। তারা এই পাগলামি সহ্য করবে কেন? এইখানেই এমনই ভাবে প'ড়ে থাকবেন ঠিক করেছেন। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে রাত্রে ঘুম হয় না তাঁর।

২

সকালবেলা। নটা বেজে গেছে সম্ভবত। সুলোচনা কোন্ ভোরে উঠেছেন স্নান ক'রে দেবমন্দিরের কাজকর্ম সেরেছেন। পূজা-আহ্নিক শেষ করেছেন। তুলসীতলায় জল দিয়েছেন। তারপর উনোনে আঁচ দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করছেন।

হঠাৎ একটি উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে এল—'মাসীমা!' অতি-পরিচিত, অতি-প্রিয় কণ্ঠস্বর। কতদিন শোনেন নি। তবু তাঁর অন্তরের সুর যেন এ স্বরের সঙ্গে বাঁধা ছিল। স্বর শোনবামাত্র সারা অন্তর ভ'রে ঝঙ্কার উঠল। শশব্যস্তে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে, উঠোনে নামলেন, দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন সদর-দরজার দিকে। দরজার কাছে এসে ব'লে উঠলেন, কে? রঘুবাবা? একজন যুবক এসে পায়ে প্রণত হ'ল। উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বললে, আপনি গলা শুনেই চিনতে পেরেছেন? আমি ভাবতে ভাবতে আসছিলাম—চিনতে পারবেন কি না। যুবকের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ কান্তিমান চেহারা। ধবধবে ফরসা রঙ। নাম রণেন। পরনে সাহেবী পোশাক। হাতে একটা মাঝারি সুটকেস।

বিধবা আনন্দে কেঁদে ফেললেন। রণেনকে এক হাতে জড়িয়ে ধ'রে আর এক হাত দিয়ে চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে বললেন, চিনতে পারব না? ও-স্বর যে অন্তরে গাঁথা আছে বাবা। এতদিনে মনে পড়ল গরিব মাসীকে? বিলেত থেকে কবে ফিরলে বাবা? রণেন বললে, মাস কয়েক আগে ফিরেছি। এসেই আপনাদের খোঁজ করতে শুরু করলাম। অনেক দিন অনেক জায়গায় খোঁজবার পর মেসোমশায়ের সন্ধান পেলাম। গেলাম একদিন নিজে। শুনলাম, আপনারা কেউ সঙ্গে আসেন নি। দাদুর জন্যে থেকে গিয়েছিলেন। দাদুর মৃত্যুরও খবর পেলাম। মেসোমশাই বললেন—কাকাবাবুর মৃত্যুর পরও কেন যে আসছেন না বউঠান, বুঝতে পারছি না, তুমি একবার যাও; পার তো বুঝিয়ে শুঝিয়ে নিয়ে এস। কাজেই আসবার উদ্যোগ শুরু করলাম। আজকাল তো মনে করলেই আসা-যাওয়া যায় না। অনেক ব্যবস্থা করতে হয়। সে সব করতে দেরি হয়ে গেল। কাল এসেছি শহরে। দাদুর বাড়িটা তো একজন উকিল ভাড়া নিয়ে আছেন। তাঁর ছেলে আমার কলেজের সহপাঠী ছিল। ওখানেই উঠলাম। ওদের মোটরই পৌঁছে দিয়ে গেল।

বিধবা বললেন, এস বাবা, বাড়ির ভেতরে। আসতে আসতে বললেন, বাড়ির কি কিছু আছে বাবা! সব ভেঙে চুরে গেছে। দুটো ঘর একটু-আধটু মেরামত ক'রে কোন মতে বাস করছি। বারান্দায় উঠে বললেন, দাও তোমার সুটকেসটা ঘরের মধ্যে রেখে দিই। সুটকেসটা ঘরে রেখে দিয়ে একটা মাদুর নিয়ে এসে বারান্দায় পেতে দিয়ে বললেন, ব'স বাবা।

রণেন ঘরে গিয়ে পোশাক বদল ক'রে এল। একটি ধুতি জড়িয়ে নিয়েছে কোন রকমে। গায়ে একটা গেঞ্জি। পা খালি। মাসীমা মেঝেতে ব'সে ছিলেন। ওঁর সামনেই ব'সে পড়ল।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরপোদের ওখানে কবে শেষ গিয়েছিলে?

আসবার দুদিন আগে।—বললে রণেন।

সব ভাল আছে তো?

হ্যাঁ।—হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ল এই ভঙ্গী ক'রে রণেন বললে, মেসোমশায় আর মা আপনাকে চিঠি দিয়েছেন। আপনাকে দেওয়া হয় নি? উঠে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে দুটো চিঠি নিয়ে এসে সুলোচনার হাতে দিলে।

সুলোচনা চিঠি দুটি একে একে পড়তে লাগলেন।

দেওর লিখছেন—খুকীকে নিয়ে রণেনের সঙ্গে চ'লে আসুন। এখনও ওই মেয়ে নিয়ে ওখানে প'ড়ে থাকার কোন অর্থ বুঝি না। রণেনের মা রণেন চাকরিতে যোগ দেবার আগেই তার বিয়ে দিতে চান। কাজেই তাড়াতাড়ি না এলে বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ওঠা অত্যন্ত কষ্টকর হবে, ইত্যাদি।

রণেনের মা লিখছেন—সই কেমন আছিস? চিঠির জবাব দিস না কেন? বন্ধুকে পাঠালাম তোদের আনবার জন্যে। তোর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের যে দেব একদিন কথা দিয়েছিলাম তোকে। সে কথা আমি ভুলি নি। আশা করি, তুইও ভুলিস নি। ছেলে এতদিন বিদেশে ছিল। তাই এতদিন এ কথা তুলি নি। ছেলে ফিরে এসেছে। পাঞ্জাবে চাকরি করতে যাচ্ছে। অনেক দূর। তাই তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দিয়ে, বউ ছেলে নিয়ে সেখানে যেতে চাই। এই বিয়ের সম্বন্ধে তোদের মনোভাব এখনও আগের মত আছে কি না জানি না। যদি থাকে, মেয়ে নিয়ে দু-একদিনের মধ্যেই চ'লে আসবি। যদি না থাকে তাও স্পষ্ট জানিয়ে দিবি। কারণ এখানে একটি পছন্দসই মেয়ে দেখা আছে। সেটিকেই নেবার ব্যবস্থা করব। মোট কথা, যত শিগগির পারি বন্ধুর বিয়ে দিতে চাই, ইত্যাদি।

কিংবা বিষণ্ণ মুখে কাতর কণ্ঠে বললেন, তোমার সঙ্গে খুকীর যে হবে—এ তো আমার চিরদিনের সাধ বাবা। মনে মনে কত স্বপ্ন দেখেছি! তুমি যাবার পর থেকেই দিন গুনতে আরম্ভ করেছি—কবে ফিরে আসবে, কবে খুকীকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, কিন্তু হতভাগী মেয়েটার যে কি হয়েছে—

বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে রণেন বললে, কি হয়েছে? কোন অসুখ কিংবা কোন ছেলের সঙ্গে, মানে—

সুলোচনা বললেন, ঠিকই ধরেছ বাবা। বিধুভূষণ-সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনাত্র পরিচয় দিয়ে সুলোচনা বললেন, ছেলেটি মারা যাবার পর থেকে খুকী বদলে গেছে। সব সময়ে গুম হয়ে থাকে। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। ওপরের একটা ঘরেই তো ছেলেটি মারা গিয়েছিল। ওই ঘরেই দিনরাত থাকে। ছেলেটির জিনিসপত্র সব আনা হয়েছিল এখানে। সেগুলো রোজ ঝাড়া-

মোছা করে, গোছগাছ করে। ছেলেটির একটি ছবি আছে। ছেলেটি বেঁচে থাকতে খুকীই এঁকেছিল। সেই ছবিটি টাঙিয়ে রেখেছে। রোজ দু বেলা ধুনো দেয়, প্রদীপ জ্বালে তার সামনে। মালা গেঁথে পরিয়ে দেয়। দু বেলা পুজো করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে—কখনও চোখ বুঁজে, কখনও ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। খাওয়া-দাওয়া ছেড়েই দিয়েছে এক রকম। যা খায় ছবিকে নিবেদন ক'রে দিয়ে তবে খায়। এখন আর ওকে দেখলে হয়তো চিনতেই পারবে না। কঙ্কালসার হয়ে গেছে। সোনার মত গায়ের রঙ কালি হয়ে গেছে। পাগল, বদ্ধ পাগল অবস্থা। লাফ-ঝাঁপ চেঁচামেচি কামড়া-কামড়ি করে না এই যা তফাত। না হ'লে ওকে পাগল ছাড়া কিছু বলা চলে না। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি তো সব আশা ছেড়ে দিয়েছি। এখন তুমি যদি কোনমতে পাগলামি সারিয়ে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে পার বাবা, প্রাণভরে আশীর্বাদ করব তোমাকে।

রণেন বললে, আচ্ছা দেখিগে, কি করছে এখন।

সুলোচনা বললেন, কিছু খাবে না?

আমি তো খেয়ে বেরিয়েছি।

তা হ'লেও মাসীর বাড়ি এলে—খুদ-কুঁড়ো যা আছে কিছু খেতে হবে তো।

একজন বৃদ্ধ এসে দাঁড়াল। রণেন বললে, হরিদা নয়? কণ্ঠস্বর উঁচু ক'রে বললে, হরিদা, চিনতে পার?

হরিপদ চোখে ভাল দেখে না। পরম কৌতূহলে চোখ দুটো মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিহ্বলকণ্ঠে বললে, চিনলাম না।

সুলোচনা বললেন, আমার রনু, সেই যে খুকীর সঙ্গে—

বয়সের আঁচড়-কাটা মুখখানি সরল হাসিতে ভ'রে উঠল, বললে, ওঃ, তাই বল, নাতজামাই আমাদের। কবে বিলেত থেকে ফিরলে দাদাবাবু? পর-মুহূর্তেই মুখ আঁধার ক'রে বললে, খুকীদির একটা ব্যবস্থা কর দাদাবাবু। ওর কি হয়েছে দেখ। আমার মনে হয় ওকে ভূতে পেয়েছে। সেই ছেলেটা ভূত হয়ে ওর ঘাড়ে চড়েছে। মাকে বার বার বলি, রোজা ডেকে এনে ঝাড়-ফুঁক করাই। মা আমার কথা কানে তো তোলে না। এখন তুমি এসেছ ভাল হয়েছে। যেমন ক'রে হোক ওকে সারিয়ে নিয়ে চ'লে যাও।

রণেন বললে, বিলেত থেকে অনেক মন্ত্র-তন্ত্র শিখে এসেছি হরিদা। দেখি ভূত ছাড়াতে পারি কি না।

হরিপদ হেসে বললে, দেখ দাদা, যদি পার। তা হ'লে হাতাহাতি লগ্ন আছে, তাতেই বিয়ে সেরে দেব।

দোতলার একটা ঘর। চুন বালি খ'সে গিয়ে লোনা-ধরা ইটগুলো বেরিয়ে গেছে। চৌকাঠ ও দরজা জীর্ণ। জানলা আছে দুটি, পাল্লা নেই। ইট দিয়ে বন্ধ করা। দিনের বেলাতেও আলো প্রবেশ করবার উপায় নেই। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের এক পাশে একটা খাটে মলিন বিছানা পাতা। বিছানার ওপরে একটা সেতার ও একটা এসরাজ। কয়েকটা টগর ফুল প'ড়ে রয়েছে এখানে সেখানে। কিছু দূরে এক পাশের দেওয়ালে আঁটা কাঠের আলনা। দু-একখানা আধময়লা শাড়ি শেমিজ ঝুলছে। দরজার ও-পাশে একটা দেওয়াল-আলমারিতে খান কয়েক বই, আরও নানা জিনিস। সামনের দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো। তার নীচে একটা টেবিল। টেবিলের উপর ধুনুচি ও পেতলের প্রদীপ। একটা রেকাবিতে তাজা বেলফুল। ও-পাশে দেওয়াল ঘেঁষে একটি খাটে সামান্য বিছানা গুটোনো রয়েছে। কাছেই জলের কলসী ও গ্লাস।

ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুচিত্রা। বয়স কুড়ি-একুশ। মাঝারি গঠন, রঙ ফরসা, শীর্ণ দেহ। পরনে আধময়লা শাড়ি ও শেমিজ। রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলের রাশি কোন রকমে এলো-খোঁপায় জড়ানো। ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। টেবিলের ধুনুচি থেকে ধোঁয়া উঠছে সাপের মত এঁকে বেঁকে, ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরে; একটি পাতলা আবরণের মত মেয়েটির ধ্যান-নিবিষ্টতাকে বাইরের কুতূহলী দৃষ্টি থেকে যেন আড়াল করবার চেষ্টা করছে। প্রদীপ জ্বলছে। তারই স্বল্প আলোতে ছবিটি ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রণেন এসে দাঁড়াল দরজায়। দেখতে পেল সুচিত্রাকে। বহুদিন ধ'রে আঁকা একটি কল্পনার ছবি মিলিয়ে গেল এক মুহূর্তে। ওকে এখানে এ ভাবে এ রকম দেখবে, ও কোনদিন কল্পনা করেছিল কি? দীর্ঘ বিরহের পর প্রথম মিলনের যে উচ্ছ্বাস ও উল্লাস কল্পনা ক'রে সুদূর বিদেশে বহু নিদ্রাহীন রাত্রিতে তার সর্বাঙ্গে পুলকের রোমাঞ্চ জাগত, এসে তার বিন্দুমাত্র আভাস দেখতে না

পেয়ে মনে আশাভঙ্গের অভিমান ও বেদনা জাগল। ঘরে ঢুকল। আলগা পায়ে পিছনে এসে দাঁড়াল। সুচিত্রার ধ্যানাবেশের বিঘ্ন ঘটল না মোটেই। ছবিটা দেখল রণেন। একটি যুবকের মুখের ছবি। শক্তিমান পুরুষের মুখ। একটি সারল্যের হাসি ফুটে রয়েছে সারা মুখটিতে। আয়ত চোখ। উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় রয়েছে চোখে চওড়া কপালেও। সুচিত্রার হাতে আঁকা ছবি। বেশ আঁকতে শিখেছে তো! সুচিত্রার অঙ্কন-বিদ্যার প্রশংসা করল মনে মনে। শিক্ষকের শিক্ষাদানের নিষ্ঠার প্রশংসা করল। মন-প্রাণ দিয়ে শিখিয়ে গেছে। অবশ্য গুরু-দক্ষিণা যা পেয়েছে কম শিক্ষকের ভাগ্যেই তা জোটে। দ্রোণ বুড়ো আঙুল পেয়েছিলেন একলব্যের কাছ থেকে। এ পেয়েছে শিষ্যার জীবন। জীবনটা মুঠো মুঠো ক'রে অঞ্জলি দিচ্ছে দিনের পর দিন। শেষ ক'রে এনেছে প্রায়। বাকি বেশি নেই।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। সুচিত্রার ধ্যানাবেশ একটু ফিকে হয়ে এসেছিল বোধ হয়। চমকে ফিরে তাকিয়েই দু পা পিছিয়ে গিয়ে ভীতি ও বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে ব'লে উঠল, কে আপনি? এখানে কেন? রণেন একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে মৃদু হাসি। সুচিত্রার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হ'ল, দৃষ্টি রইল স্থির হয়ে রণেনের মুখের 'পরে; ধীরে ধীরে ওর মুখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল। যেন চিনতে পেরেছে মনে হ'ল। রণেন বললে, চিনতে পারছ না?

সুচিত্রা বললে, আপনি রণেনদা! কখন এলেন? প্রণাম করবার উপক্রম করতেই রণেন বললে, থাক্, থাক্।

সুচিত্রা বললে, থাক্ কেন? দাদা বোনের প্রণাম নেবেন না?

প্রণাম করল। মাথায় হাত দিল রণেন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে।

সুচিত্রা বললে, কি আশীর্বাদ করলেন?

তোমার ভাল হোক, কল্যাণ হোক। এ ছাড়া আশীর্বাদ তো আমার আর নেই। একটু থেমে বললে, কি করছ তুমি?

মৃদু হেসে বললে সুচিত্রা, দেখলেন তো নিজের চোখে—

ধ্যানস্থ হয়েছিলে। ছবিটাকে ইঙ্গিত ক'রে বললে, কে ইনি?

আমার মাস্টারমশায়। ছবি আঁকা, গান-বাজনা শিখতাম এঁর কাছে।

এখনও পৃথিবীতে আছেন, না, চ'লে গেছেন?

একটি বেদনার ম্লান ছায়া ঘনাল সুচিত্রার মুখে চোখে। বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, চ'লে গেছেন।

রণেন বললে, গুরুকে অনেকে আরাধ্য দেবতার স্থানে বসিয়ে পূজো করে। তুমি যদি তাই করছ, আপত্তি নেই। কিন্তু সেখান থেকে নামিয়ে যদি আর কোন স্থানে বসিয়েছ তো আমার আপত্তি জানাচ্ছি।

সুচিত্রা সবিস্ময়ে বললে, তার মানে? একটু ভেবে বললে, বুঝেছি। তাতে আপনার আপত্তি কেন?

হাসবার চেষ্টা ক'রে রণেন বললে, কারণ সেই স্থানটায় বসবার জন্যে একদা আমি মনোনীত হয়েছিলাম। তোমার-আমার ওপরওয়ালাদের মধ্যে পাকা কথাবার্তা হয়েছিল। আমাদের দুজনের মধ্যেও প্রতিশ্রুতির আদান-প্রদান হয়েছিল ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে আমি এমন কিছু অপরাধ করি নি, যাতে ওই স্থানের জন্যে অযোগ্য বিবেচিত হতে পারি—

সুচিত্রা একদৃষ্টে রণেনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ ব'লে উঠল, জানেন রণেনদা, ইনি আমার জন্যে কি করেছেন? আমার প্রাণ মান বাঁচাবার জন্যে নিজের প্রাণ দিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে কি কারও তুলনা হয়?

রণেন বললে, কাছে থাকলে আমিও দিতাম।

কি ক'রে জানব? কাছে থাকেন নি তো। পালিয়ে গেলেন সাত সমুদ্র পারে। আমাদের এত বিপদ গেল, খবর পান নি তা তো নয়।

তোমার জন্যেই তো গিয়েছিলাম। আমার যা কিছু সব তোমার ভেবেই যত কিছু পারি সংগ্রহ করছিলাম।

সুচিত্রা ম্লান হেসে বললে, আমার আর কিছুই চাই না। যত শিগগির ওঁর পায়ের কাছে পৌঁছুতে পারি, তাই আমার একমাত্র কামনা।

রণেন বললে, নিছক ভক্তি ব'লে মনে হচ্ছে না। এর সঙ্গে ভালবাসার ভেজাল রয়েছে মনে হচ্ছে। ওঁকে ভালবেসেছিলে নাকি?

লজ্জারক্ত মুখে সুচিত্রা বললে, উনি আমাকে ভালবাসতেন। ওঁর হাবে-ভাবে কথাবার্তায় টের পেতাম। যাবার কদিন আগে মুখে প্রকাশ করলেন। বললেন—আমাকে ভালবাসা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, জানতাম। তাই কিছু বলি নি—পাছে লজ্জা পাও, দুঃখ পাও। আমার যাবার দিন ঘনিয়ে

আসছে। চ'লে যাবার আগে তোমাকে এ কথা না জানিয়ে স্বস্তি পাচ্ছি না মনে। আমি চ'লে গেলে, আমাকে ভোলার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভালবাসার কথাও ভুলে যেয়ো। আর একদিন বললেন—তোমার জন্যে যে মরতে পারলাম, এ আমার সৌভাগ্য। বেঁচে থাকলে তোমার মনে একটুও স্থান পেতাম না। ম'রে গিয়ে হয়তো একটু স্থান পেতে পারি, কি বল? মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব চেয়েছিলেন। তখন জবাব দিতে পারি নি। পরে দিয়েছিলাম—একটু নয়, আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে স্থান পেয়েছেন। শুনে মুখখানি পরিতৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন—জীবনে কিছুই পাই নি। নিদারুণ ক্ষোভ ছিল মনে। তোমার এই সুমধুর স্বীকৃতিটুকু আমার সব ক্ষোভ দূর ক'রে দিলে। এইটুকু সম্বল ক'রে আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে মৃত্যুর পথে পাড়ি দিতে পারব।

রণেন বললে, ভদ্রলোক কবিতা-টবিতা লিখতেন নাকি?

ছবি আঁকতেন, গান গাইতেন চমৎকার। সেতার এসরাজ বাজাতেন আরও চমৎকার।

রণেন বললে, তুমি বুঝি তাঁরই পথের সঙ্গিনী হবার চেষ্টা করছ?

সুচিত্রা জবাব দিল না। রণেন বলতে লাগল, হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে বটে। দিন কয়েক এই রেটে ধ্যান-ধারণা চালালেই বেশি দেরি হবে না। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, আমার একখানা ছবি তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা দেখছি না তো?

সুচিত্রা গম্ভীর মুখে বললে, আছে কোথাও।

রণেন বললে, ফেলে দিয়েছ বোধ হয়, না?

সুচিত্রা জবাব দিল না।

রণেন সক্ষোভে বললে, আমাকেও একদিন শ্রদ্ধা করতে। ভালও নাকি বাসতে। ভালবাসা ঠুনকো—ভেঙে গিয়ে থাকলে বলবার কিছু নেই। কিন্তু শ্রদ্ধাটা ভাঙল কেন?

সামনের টেবিলে একটা বাটিতে চিঁড়ে আর কিছু নারকেল-মিষ্টি ছিল। রণেন বললে, বাটিতে কি? মুখ বাড়িয়ে দেখে বললে, ভোগ দিয়েছ বুঝি? মাসীমা বলছিলেন বটে, এঁকে নিবেদন না ক'রে কিছু খাও না। নারকেল-মিষ্টি

যে কতকাল খাই নি! লোভ হচ্ছে। নিতে পারি একটা?—ব'লে হাত বাড়াতেই সুচিত্রা বাটিটা সরিয়ে নিয়ে বললে, না না, আপনার খাওয়া চলবে না। ওঁর উচ্ছিষ্ট। আপনি আমার দাদা। ওঁরও তো গুরুজন।

রণেন বললে, হরিদা বলছিল, তোমাকে ভূতে পেয়েছে। কথাবার্তা যা বলছ, তা শুনে অবিশ্বাস হচ্ছে না। রোজা ডাকাই উচিত।

মুখে বেদনার ছায়া পড়ল সুচিত্রার। ক্ষোভের স্বরে বললে, হরিদা মুখ্যু মানুষ। ওর কথায় দোষ ধরি না। কিন্তু আপনার মত বিলেত-ফেরত বিদ্বান লোকের মুখে ও-কথা শুনব আশা করি নি।

রণেন গম্ভীর হয়ে উঠে নীরস স্বরে বললে, তা হয়তো আশা করি নি। তবে তোমার পছন্দমত সব কথা আমার কাছ থেকে শুনতে পাবে—এও আশা ক'রো না। যাকগে ও-সব কথা। একটা দিনের জন্যে এসেছি; সন্ধ্যের সময় চ'লে যাব। ওঁর তো প্রাতের সেবা-ভোগ শেষ হয়েছে। এখন তোমাকে একটু ছুটি দিতে পারবেন কি? একবার জেনে নাও দেখি!

সুচিত্রা মুখ লাল ক'রে বললে, জেনে নেব এখন। আপনি নীচে যান। আমার কিছু কাজ এখনও বাকি।

রণেন সকৌতুকে বললে, আবার কি কাজ?

ওঁকে সেতার শোনানো। ঠিক এই সময়ে ওঁর কাছে সেতার শিখতাম।

বল কি? উনি শুনতে পান?

হ্যাঁ, পান। ভুল হ'লে শুধরে দেন।

দুই চোখ বড় ক'রে রণেন বললে, রীতিমত ভৌতিক ব্যাপার যে! তা আমি একটু থাকি না, দেখে যাই ব্যাপারটা।

সুচিত্রা ধারাল স্বরে বললে, আপনি থাকলে হবে না। যান আপনি। হাত জোড় ক'রে বলছি, যান।

নীচে থেকে সুলোচনার ডাক শোনা গেল, রনু! এস বাবা, কিছু খেয়ে নাও। খুকীকেও ডেকে নিয়ে এস।

ও যেতে চাচ্ছে না মাসীমা।—বললে রণেন।

সুলোচনা ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে ওই হতচ্ছাড়া মেয়ে। যাচ্ছি আমি, দাঁড়াও।

সুচিত্রা সক্ষোভে বললে, মাকে রাগিয়ে দিলেন। এখনই এসে হৈ-হল্লা শুরু করবেন।

সুলোচনা হাঁক দিলেন, অ্যাই খুকী! আসছিস, না, যেতে হবে আমাকে?

সুচিত্রা হাঁক দিয়ে বললে, যাচ্ছি মা। রণেনকে সক্রোধে বললে, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান না তাড়াতাড়ি, না হ'লে মা এখনই এসে পড়বেন।

রণেন বললে, তোমাকে না নিয়ে যাই কি ক'রে?

সুচিত্রা বললে, একেবারে দরদে ম'রে যাচ্ছেন! চলুন।

রণেন বললে, বাটিটা নেবে না?

আপনাকে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, চলুন।

মামীমা রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে দিলেন রণেনকে। রণেন খেতে শুরু ক'রে দিল অবিলম্বে। সুচিত্রা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। সুলোচনা তাই দেখে ব'লে উঠলেন, এতদিন পরে বাছা এসেছে, কাছে গিয়ে ব'স্ না, গল্প কর্। ছেলেবেলায় কাছছাড়া হতে চাইতিস না যে! বিলেত যাবার সময়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলি! যাবার পর কতদিন কাঁদতিস!

সুচিত্রা রাগের সুরে বললে, কাঁদতাম, আর কত কি করতাম! মা যেন কী!

সুলোচনা বললেন, করতিসই তো! খেতিস না, পরতিস না, কেমন উদাস হয়ে থাকতিস। রঘুর চিঠি এলে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়তিস। আমি আর তোর কাকীমা দেখে হাসতাম।

রণেন নতমুখে খাচ্ছিল, একবার মাথা তুলে মা ও মেয়ের দিকে তাকিয়েই আবার মাথা নীচু ক'রে খেতে লাগল।

লজ্জায় সুচিত্রার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। যেন পূর্বজন্মের কথা—এমনই মনে হচ্ছে। রণেনের দিকে দৃষ্টি পড়ল। দিনের আলোয় এতক্ষণে তাকে এই প্রথম ভাল ক'রে দেখল সুচিত্রা। মনে হ'ল, রঙ কত ফরসা হয়েছে! সাহেব। মুখটি কত সুন্দর! কতদিন দেখে নি ওকে। ওর ছবি পর্যন্ত দেখে নি। এখন চোখ বুজলে ওর মুখ মনে আনতে পারবে না হয়তো। অথচ একদিন চোখ বুজলেই মনের পটে ওর ছবি ফুটে উঠত।

হঠাৎ মুখ তুলে রণেন ওর দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি খাচ্ছ না কেন খুকু?

বুকের মধ্যে ধক ক'রে উঠল ওর 'খুকু' বলা শুনে। ওই শুধু আদর ক'রে ওকে 'খুকু' ব'লে ডাকত। ওই আদরের ডাক কতদিন শোনে নি সুচিত্রা!

সুচিত্রা গম্ভীর মুখে বললে, খাব এখন।

কেন, গুরুদেবের পেসাদ বুঝি একা-একা এমনই মুখ ক'রে খেতে হয়!—ব'লে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করল রণেন। এবার হেসে ফেলল সুচিত্রা। এই প্রথম হাসল। কৃত্রিম রাগের সুরে বললে, আহা! কি ভঙ্গী! দেখছ মা, রনুদা কি রকম মুখ ভেংচাচ্ছেন। রান্নাঘরের ভিতর থেকে সুলোচনা বললেন, বেশ করছে। তোকে ওই রকমই করা উচিত। বলছে এত ক'রে, খা না, তাতে এমন কিছু বেদ অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। রণেনকে উদ্দেশ ক'রে বলতে লাগলেন, জান বাবা রনু, কি রকম যে অবাধ্য হয়েছে। বেশ ছিল। ওই ছেলেটি এসে সব মাটি ক'রে দিলে। ভাবলাম ছাব আঁকতে শিখুক, গান-বাজনা শিখুক, রনু এসে কত আনন্দ করবে। ও মা! ভেতরে ভেতরে এমন বিগড়ে দেবে জানতাম না—

সুচিত্রা তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ করলে, মা! নেমকহারামি ক'রো না। উনি বিগড়োন নি। আমি নিজে বিগড়েছি। তাঁর নিন্দে তোমার মুখে সাজে না মা। আমাকে যদি একটুও ভালবাস তো ওঁর কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তোমার মেয়ের জন্যে উনি প্রাণ দিয়েছেন। উনি রক্ষা না করলে কি যে হ'ত, ভাবতেও ভয় হয়।

সুলোচনা বাইরে এসে বললেন, কে অস্বীকার করছে বাছা! শ্রদ্ধা ভক্তি কর, আমি মানা করব না। তা ব'লে বিয়ে করবি না, সংসার করবি না—এই সৃষ্টিছাড়া গোঁ ধ'রে ব'সে আছিস যে! ওই ছেলেটি যদি এ সব শিখিয়ে গেছে একলা পেয়ে, তবে আমার সর্বনাশ করেছে, তোমার সর্বনাশ করেছে, এ কথা আমি একশো বার বলব।

খাওয়া শেষ ক'রে রণেন বললে, আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি খেয়ে নাও।

সুলোচনা বলতে লাগলেন, কতদিন পরে এসেছে, আজকের দিনটি থাকবে, যা যা বলছে তাই করলে ওর যদি আনন্দ হয় কর্ না। তারপর তোর গুরু-ভজন তো চিরদিনই চলবে। তুই যে ভাবছিস তোর টানে এসেছে, তা নয়। কত দেশ-বিদেশে গেছে। কত ভাল ভাল মেয়ে দেখেছে।

তোর ওপর যা টান ছিল, সে কখন ম'রে গেছে। ওর মা পাঠিয়েছে ওকে। আমাকে কথা দিয়েছিল, তোর সঙ্গে রমুর বে দেবে। সত্যি রক্ষার জন্যে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখ না, চিঠি লিখেছে ওর মা। সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে দেখা আছে। তোর সঙ্গে বে না হ'লে, কলকাতায় ফিরে গিয়েই বে হবে। মস্ত বড় চাকরি পেয়েছে পাঞ্জাবে। কিছু দিন পরেই মা বউ নিয়ে চাকরিস্থলে চ'লে যাবে। গভীর ক্ষোভের স্বরে বললেন, তারপর তুমি কি করবে মা? আমি আর কদিন? হয় দাসীবৃত্তি করবে, না হয় শঙ্খের সন্ন্যাসিনী সেজে দরজায়-দরজায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াবে।

সুচিত্রা থাচ্ছিল নতমুখে। মায়ের কথাগুলো তীক্ষ্ণমুখ তীরের মত ওর মনের গায়ে এক-একটি ক'রে বিঁধতে লাগল।

৩

নাট-মন্দিরের এক পাশে ব'সে ছিল রণেন। ছাদটা প'ড়ে গেছে। এখানে সেখানে ইটের স্তূপ জড়ো হয়ে আছে। বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে আছে রণেন। মুখে চিন্তার ছাপ পড়েছে।

সুচিত্রা বার হয়ে এল। দূরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। কি এত ভাবছে? অত বড় ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে, এখনও ছেলেমানুষি যায় নি একটুকুও। মনটা খারাপ হয়েছে কেন? আমি আর ওকে ভালবাসি না, ওর ছবিটা কোথায় ফেলে দিয়েছি, সেই জন্যে? সত্যি কি আর ওকে ভালবাসি না? সত্যি কি মাস্টার মশায়কে মন-প্রাণ একবারে সঁপে দিতে পেরেছি? কে জানে? আজ যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হুঁশ নেই একেবারে। কার ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেছে? সেই সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তার? পা টিপে টিপে একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একবার ইচ্ছা হ'ল, ওর গায়ে হাত দেয়। কতদিন ছোঁয় নি ওকে। সংবরণ করল নিজেকে। বললে, রমুদা যে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছ? কার কথা ভাবছ? রণেন ওর দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বললে, বাঁচালে আমাকে। যে ভাবে আপনি-টাপনি ব'লে সম্বোধন করছিলে, ভাবছিলাম এখুনই পালিয়ে যাব—

সুচিত্রা বললে, ভাবী বউয়ের কথা ভাবছিলে বুঝি এতক্ষণ?

হ্যাঁ।

বিয়ে না হতেই এই অবস্থা, বিয়ে হ'লে কি হবে? কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতার আভাস রয়েছে মনে হ'ল রণেনের। ওর দিকে তাকিয়ে সখেদে বললে, বিয়ে আর হচ্ছে কই? যে বউ হবে ভেবেছি এতদিন, সে তো হাঁকিয়ে দিচ্ছে। তাড়িয়ে দিয়েছে ওর মন থেকে, তাড়িয়ে দিয়েছে ওর ঘর থেকে।

সহসা রক্তোচ্ছ্বাসে সুচিত্রার সারা মুখ, কান দুটি লাল হয়ে উঠল। তার জন্যেই চিন্তা! তবে যে মা বলছিলেন—আমার ওপর টান নেই মোটেই! বললে, তোমার ছবি তো ফেলে দিই নি রঘুদা। তোমাকেও ঘর থেকে তাড়িয়ে দিই নি। তবে তোমার বউ হতে পারব না অবশ্য। যিনি আমার জন্যে জীবন দিতে কুণ্ঠিত হন নি, তাঁর ভালবাসার প্রতিদান না দিয়ে আমার উপায় নেই রঘুদা। রণেন বললে, কিন্তু যে চ'লে গেছে পৃথিবী থেকে, তার ছবিটা টাঙিয়ে রেখে তার সামনে দেহ ও মনকে উপবাস দিয়ে মারলে, সে কি দেখতে পাবে, না, তৃপ্তি পাবে? সে তো এখন সব উপলব্ধি ও অনুভূতির সীমার পারে চ'লে গেছে। সুচিত্রা বললে, আমার বিশ্বাস, তিনি সর্বদা আমার কাছে কাছে আছেন। সর্বদা আমাকে দেখছেন। আমার প্রত্যেকটি কাজে তাঁর যোগ আছে, আমার প্রতি আনন্দ ও বেদনায় ভাগ আছে। আমার মন ও আত্মার সঙ্গে মিশে আছেন তিনি। রণেন শ্লেষের স্বরে বললে, একেবারে 'মহাভাব' দেখছি। থাক্ ও-সব আলোচনা। চল, একটু বেড়িয়ে আসি। তোমাদের বাগান দিয়ে তো নদীর ধারে যাওয়া যায়, না? সুচিত্রা বললে, কিন্তু এখন স্নান করতে যাব যে?

বেশ তো, চল না, নদীতে নেয়ে আসব। অনেকে দিন নদীতে নাই নি। ভারি ইচ্ছে করছে।

সুবিস্তৃত বাগান। নারকেল আম জাম কাঁঠাল পেয়ারা ইত্যাদি নানা রকমের গাছ বিস্তর রয়েছে। বাড়ির পিছনেই খিড়কি পুকুর। পুকুরের পাড়ে নানা ফুলের গাছ। টগর কলকে করবী বেলা চাঁপা। টগর-বেলার গাছগুলো ফুলে ও কুঁড়িতে সাদা হয়ে গেছে। চাঁপাও ফুটেছে বিস্তর। পুকুরের পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথ। সেই পথ দিয়ে গিয়ে বাগানের সীমানা পার হয়েই মাঠ। মাঠ পার হ'লেই নদীর তীর। নদীর ধার দিয়ে একটা রাস্তা সোজা শহরের দিকে গেছে।

পাশাপাশি চলতে লাগল দুজনে। গল্প করতে লাগল অতীত দিনের। ছুটি-ছাটাতে এ বাড়িতে কতবার এসেছে রণেন। সুচিত্রার দাদু 'নাতজামাই' ব'লে কত আদর করেছেন তাকে, কত রসিকতা করতেন তার সঙ্গে। বাগানের কোল ঘেঁষে একটা ছোট খাল। পার হবার জন্যে সাঁকো রয়েছে। সাঁকো দিয়ে পার হ'ল তারা। একবার অনেক দিন আগে সাঁকো পার হবার সময়ে পা পিছলে প'ড়ে গিয়েছিল রণেন। সর্বাঙ্গে কাদা লেগেছিল, পায়ে আঘাত পেয়েছিল। হরিদা পাঁজা-কোলা ক'রে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে। তাই দেখে সুলোচনার কি কান্না! সুচিত্রাও নাকি খুব কেঁদেছিল। দিদিমা ঠাট্টা করতে লাগলেন, হ্যাঁ নাতজামাই, আমার নাতনীর সঙ্গ পেয়ে এমন তন্ময় হয়ে গেলে যে, পা পিছলে প'ড়ে গেলে? ও মা, কি হবে! এই রকম নানা কথা হতে লাগল। অতীত দিনগুলি যেন মুক্তার মত চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে যেন মালা গাঁথতে লাগল তারা।

হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। সুচিত্রার অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাব। রণেন ওকে আড়চোখে দেখছে। একেবারে কাহিল। ফ্যাকাশে রঙ। যেন জীবনের ধারার সঙ্গে ওর জীবন-মূলের বিচ্ছেদ ঘটেছে এর মধ্যেই। বিবর্ণ লাবণ্যহীন শুষ্ক দেহ। অতীতের পটভূমিকার সামনে ওকে না দেখলে হয়তো ওর কোন আকর্ষণই থাকবে না তার মনের ওপরে। অতীতটাকে মন থেকে ছাঁটতে পারলেই ওকেও বোধ হয় মন থেকে ছেঁটে ফেলা দুঃসাধ্য হবে না। কি দরকার তবে ওকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওর পছন্দসই জীবন থেকে টেনে বার ক'রে আনার? না, কিছু দরকার নেই। আজ সন্ধ্যেয় নিশ্চয় সে চ'লে যাবে।

সুচিত্রা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, এতক্ষণ কি ভাবছিলে রণুদা?

রণেন বললে, ভাবছিলাম, আবার কবে আসব! আজকাল এখানে আসা তো সহজ নয়। আর জীবনে হয়তো আসব না এখানে।

মা যতদিন থাকবেন, ততদিনও আসবে না?

কত দূরে চ'লে যাব।

হঠাৎ বললে সুচিত্রা, মাকেও নিয়ে যেও তোমার কাছে।

রণেন বললে, পরের বাড়িতে যাবেন কেন? কোন সম্পর্ক নেই তো!

সুচিত্রার মুখ দিয়ে বার হতে গেল, সম্পর্ক নেই তো সম্পর্ক ক'রে নাও। জিব কেটে কোন মতে কথাগুলো থামিয়ে ফেললে।

অনুশোচনা জাগল মনে। নিজেকে ধিক্কার দিলে নিজের দুর্বলতার জন্যে। এত সহজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলা! কি কথা দিয়েছিলাম তাঁকে? বলেছিলেন—জীবনে মন প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলাম—প্রিয়া, জীবনসঙ্গিনী। জীবন তো ফুরিয়ে এল, জীবনসঙ্গিনীর প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। এখন চাই মরণ-সঙ্গিনী। জীবনের পারে অন্তহীন কাল একা থাকতে হবে, ভাবলে ভয় করে চিত্রা। সে বলেছিল—আমি হব আপনার মরণ-সঙ্গিনী। অপেক্ষা ক'রে থাকবেন আমার জন্যে। যত শিগগির পারি মিলব। এই কথা দিয়ে, আজ একজন মানুষকে দেখেই ভুলে যাচ্ছি—ছিঃ!

নদীর তীরে পৌঁছেই রণেন স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়ে বললে, আমি নেমে পড়ছি সুচিত্রা। ব'লেই নেমে পড়ল নদীতে। 'সুচিত্রা' ডাকটা কানে খট্ ক'রে লাগল সুচিত্রার। 'খুকী' ডাকটা ভুলে গেল এর মধ্যেই! রণেনের সঙ্গে এ স্নেহের বন্ধনটুকুও থাকবে না, ভাবতে মনটা টনটন ক'রে উঠল।

সুচিত্রা বললে, দাঁড়াও রঘুদা, আমিও যাব যে!

স্নানের পর ফিরে আসবার সময়ে রণেন বললে, ভারি ভাল লাগল। অনেক দিন পরে সাঁতার দিলাম। প্রাণ ভ'রে স্নান করলাম।

কেন, কলকাতায় গঙ্গা আছে তো!

গঙ্গায় সাঁতার দিতে ভাল লাগে না। ছেলেবেলার কত মধুর স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো এই নদীটিকে বড় নিজের ব'লে মনে হয়। আজ সাঁতার দিতে দিতে ভাবছিলাম, যে ঢেউগুলির সঙ্গে সাঁতার দিতাম, সেই ঢেউগুলির মতই ছেলেবেলার সেই আনন্দময় দিনগুলি কোথায় হারিয়ে গেছে! একবার মনে হ'ল, যদি নদীর মধ্যে ডুবে নদীর বুকে সেই দিনগুলির দেখা পাই, যদি হঠাৎ কুড়িয়ে পাই ছেলেবেলার সেই নিজেকে আর আর সবাইকে—

একটি করুণ সুর বাজল ওর কণ্ঠস্বরে। সুচিত্রার মনেও তার রেশ বাজল। রণেনের প্রতি তার যে ভালবাসা মনের কোণে দীর্ঘ অনশনে নির্জীব হয়ে প'ড়ে ছিল, হঠাৎ যেন কোথা থেকে প্রাণদ রস পান ক'রে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। যাকে

আজ যে ভুলেছে, অবহেলা করেছে, তাকেই ঘিরে একদিন কত মধুসঞ্চয় হয়েছিল হৃদয়ের কোষে কোষে, কত রাত্রিতে কত মধুর স্বপ্ন-রচনা—একে একে মনে পড়তে লাগল সুচিত্রার।

সুচিত্রা বললে, সেই যেবার প্রথম মাসীমার সঙ্গে এলে। সাঁতার জানতে না। কলকাতার চালিয়াৎ ছেলে তো। আমার কাছে বাহাদুরি নেবার জন্যে জলে নেমে প'ড়েই তলিয়ে গেলে। মা না ধরলে ভেসে যেতে।

রণেন হেসে বললে, সেই দিনই তো মা মাসীমাকে কথা দিয়েছিলেন—ছেলে তোকে দিয়ে দিলাম, বদলে তোর মেয়েকে নিলাম। একটু থেমে বললে, মাসীমা একটুও বদলান নি। আজ আসবামাত্র আমাকে যে ভাবে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলেন, আমার মন যেন জুড়িয়ে গেল। যেন ঠিক এই জিনিসটার জন্যেই সারা পথ আমার মন প্রতীক্ষা করছিল। সুচিত্রা বললে, বদলেছে কে?

প্রশ্নের-জবাব নিজেই দাও।

পাশাপাশি চলেছে। বৈশাখ মাস। সূর্য এর মধ্যেই কড়া রোদ ঢালতে শুরু করেছে। রণেন মাথায় ভিজে তোয়ালে জড়াল, গায়ে জড়িয়ে নিল ভিজে কাপড়টা। আড় চোখে সুচিত্রা দেখতে পেল, ভিজে কাপড়ের মধ্য দিয়ে শুভ্র শাঁখের মত ফরসা রঙ ফুটে বেরোচ্ছে। মাংসপেশীবহুল বলিষ্ঠ বাহু ও বুকের আভাস দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ বিধুভূষণকে মনে পড়ল তার। তাঁর দেহও বেশ পেশীবহুল বলিষ্ঠ ছিল। কিন্তু রণেনের শরীরের গঠনে যেমন একটি সুষ্ঠু সুসঙ্গতি আছে, তেমনটি তাঁর ছিল না।

বাগানের আমগাছগুলিতে ছোট ছোট বিস্তর আম হয়েছে। সেখানে একটু থামল রণেন। বললে, গাছে চ'ড়ে আম পাড়তাম, মনে পড়ে সুচিত্রা?

সুচিত্রা বললে, তুমি প্রথম প্রথম গাছে চড়তে পারতে না। আমি তোমার চেয়ে ভাল পারতাম।

এখন পার?

পারি বইকি। তবে স্নান-টান ক'রে পরিচয় দিতে পারব না। তা ছাড়া এর পর ফেরা উচিত। মা ভাববেন—

আমার সঙ্গে যখন এসেছ, মাসীমা ভাববেন না নিশ্চয়। তবে তোমার গুরুদেবের স্নান ও মধ্যাহ্নভোগের সময় হয়েছে বোধ হয়।

লজ্জিত মুখে সুচিত্রা বললে, ঠাট্টা করছ বুঝি?

রণেন বললে, ঠাট্টা কিসের? মধ্যাহ্নভোগ দাও না?

সুচিত্রা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, আসল কথা কি জান—যা করি ওঁকে উপলক্ষ ক'রে করি। এই যে বেঁচে রয়েছি, সে তো তাঁরই দয়াতে। নিজেকে জীবনের সব ভোগ থেকে রঞ্চিত করেছেন তিনি আমাকে বাঁচাতে। তাই আমার প্রত্যেকটি ভোগকে তাঁর উদ্দেশে নিবেদন ক'রে তাঁর ঋণ স্বীকার করি।

এত ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, আড়ম্বর ক'রে করবার দরকার কি? সকলের সঙ্গে মিশে স্বাভাবিক জীবন যাপন ক'রে নীরবে নিভৃতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না কি? আসল কথা, তুমি প্রচার করতে চাও—দেখ দেখ সব, আমি কত মহৎ! যার কাছে উপকার পেয়েছি, তার একটা মুখের কথায় নির্ভর ক'রে জীবনটা হেলাফেলায় নষ্ট ক'রে দিচ্ছি।

সুচিত্রা বললে, মুখের কথা নয়, বুকের কথা। পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নেবার পূর্বে কেউ জেনে-শুনে মিথ্যে কথা বলে না।

রণেন বললে, যদি বলি, শেষ দিকটায় তাঁর মাথার ঠিক ছিল না—ভুল বকেছিলেন, তাই তুমি সত্যি ব'লে ভেবে নিয়েছ! একটু হেসে বললে, তোমার মাথাও খুব ঠিক আছে ব'লে মনে হয় না।

সুচিত্রা রাগের সুরে বললে, কি বলতে চাও? আমি পাগল, এই তো? বেশ তাই। তোমরা ভাল হ'লেই হ'ল।

আমি ভাল তো নিশ্চয়ই। আমরা কে কে?

তুমি আর তোমার যিনি বউ হবেন তিনি।

রণেন ভ্রূ নাচিয়ে বললে, ওঃ!—ব'লে নীরবে হাসতে লাগল।

সুচিত্রা বললে, তোমার বিয়েতে আমাদের নেমন্তন্ন করবে না?

নেমন্তন্ন করতেই তো আসা এক রকম। মাসীমা যেতে পারবেন না। বললেন, পাগলীটাকে নিয়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

বিরক্তির ভ্রূকুটি জাগল সুচিত্রার মুখে; গম্ভীর মুখে বললে, বিয়ে হচ্ছে কখন?

দিন কয়েক পরেই তো চ'লে যাব কলকাতা থেকে। গিয়েই হবে।

বিয়ের পরেই এত দূরে বউ নিয়ে যাবে? নতুন বউ থাকতে পারবে?

খাড়ী মেয়ে, থাকতে পারবে না? তা ছাড়া জানাজানি আছে আগে থেকে।

সুচিত্রা ঢোক গিলে বললে, খুব সুন্দরী ?

হ্যাঁ।

কতদূর পড়েছে ?

বি. এ. পাস করেছে। এম. এ. পড়ছিল। পড়া বন্ধ হ'ল বিয়ের জন্যে। তা ওখানে কাজকর্ম তো বেশি নেই। পড়বে। প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে পরে।

বাড়িতে এসে পৌঁছুল। সুলোচনা রান্নাঘরে ছিলেন। রণেন কাপড়চোপড় ছেড়ে এসে সামনে মেঝেতে বসবার উপক্রম করতেই বললেন, ওই আসনটা নিয়ে ব'স বাবা। সুচিত্রাকে দেখতে পেয়ে বললেন, খুকী, আসনটা দিয়ে যা তো।

সুচিত্রা ঝঙ্কার দিয়ে বললে, কাছেই তো রয়েছে, নিজে নিয়ে বসলেই পারেন।—ব'লে চ'লে গেল।

সুলোচনা বলতে লাগলেন, ভারি অবাধ্য মেয়ে। ওর কপালে অনেক কষ্ট আছে বাবা। তুমি কি করবে ? তোমার মার, আমার সম্মান রাখবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করলে। কথা কি জান রনু-বাবা! আমার অদেষ্ট খারাপ। অল্প বয়সে বিধবা হলাম। দেওরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করতাম। ভেবেছিলাম, মেয়েটাকে সুখী দেখে মরব। সুখ আমার হাতের তালুতে, তবু নেবার উপায় নেই। ভগবান এমন দুর্মতি দিলেন মেয়েটাকে যে, সাত রাজার ধন মানিক হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার মত অভাগী—। বলতে পারলেন না আর, কেঁদে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে চোখ-মুখ মুছে বললেন, কি রকম দেখলে বাবা ? বাগ মানবে ?

রণেন বললে, বুঝতে পারছি না মাসীমা। ওই অন্ধকার ঘরটায় দিনরাত থেকে ক্রমাগত একটা জিনিস ভেবে ভেবে ওর দেহ-মন দুই অসুস্থ হয়ে উঠেছে। ওই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে কিছুদিন পাঁচজনের সঙ্গে মিশলে ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারবে।

কার কথা ও শুনবে বাবা!—একটু চুপ ক'রে থেকে মাসীমা বললেন, তুমি কি আজই যাবে ?

কি আর করব থেকে ?

সুলোচনা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তুমি তা হ'লে ওর আশা ছেড়েই দিলে ?

রণেন চুপ ক'রে রইল।

দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সুলোচনার। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বললেন, সবই আমার অদৃষ্টের দোষ বাবা রনু। তুমি কি করবে?

রণেন বললে, আপনি বসুন, আমি একবার ওপরে যাচ্ছি, দেখি কি করছে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে সুচিত্রা ছবিটির সামনে দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনে মনে বললে, রাগ করেছেন? কি করব? আজকের দিনটিই তো শুধু। তারপর তো চিরদিনই আপনার। কেমন, রাগ কমেছে তো? ছবির ভাবহীন মুখ পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য সুচিত্রার মনে ধরা পড়ল না আজ। মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে। ছবির মুখের ভাব ভাষা ধরতে পারছে না। চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। চিন্তা করতে লাগল বিধুভূষণকে। মনের পটে তাঁর মুখখানি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করল। ফুটে উঠল রণেনের মুখ। তাজা গোলাপের মত সুন্দর মুখখানি। ধিক্কার দিল নিজেকে, ছিঃ ছিঃ! আবার ছবির দিকে তাকাল। ছবিতে মন ধরছে না আজ কিছুতেই, পিছলে যাচ্ছে। আজ ওই প্রাণহীন দৃষ্টিতে মন ভরছে না। ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে একদিন পোলাও-কালিয়া খেয়ে যেমন গরিবের নিজের বাড়ির ডাল-ভাত আর ভাল লাগে না, তার মনেরও যেন সেই রকম অবস্থা। রণেনের প্রাণময় সঙ্গ তার মনকে বিকল ক'রে দিয়েছে। ও এখান থেকে না গেলে মন শান্ত হবে না।

সুচিত্রা দেওয়াল-আলমারি থেকে একটি ছবি বার করল। দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধ'রে। রণেনের ছবি। বিলেত থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কতদিন দেখে নি ছবিটিকে। অথচ একদিন নিদ্রায় জাগরণে সাথী ছিল। চোখের দৃষ্টি যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ ক'রে দেখতে লাগল ছবিটিকে। চেহারা এখনকার মত দোহারা নয়—লম্বা কাহিল। পরনে সাহেবী পোশাক। হাসি-হাসি মুখ। দুই চোখ স্নেহভরা। কাকে মনে ক'রে স্নেহ ভ'রে উঠেছিল দু চোখে ওর! তাকেই নিশ্চয়!

রণেন ঘরে ঢুকল। পা টিপে টিপে এসে সুচিত্রার পিছনে দাঁড়াল। কার ছবি দেখা হচ্ছে! মুখ বাড়িয়ে দেখল, তার ছবি। কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল? গুরুদেবের ছবিকে অবহেলা ক'রে তার ছবি দেখছে। কেসটা হাতের বাইরে যায় নি তা হ'লে! মুখে একটি আনন্দের আভা ফুটে উঠল।

হঠাৎ সুচিত্রার হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নিল রণেন। চমকে উঠে ভয়ার্ত স্বরে ব'লে উঠল সুচিত্রা, কে? রণেনকে দেখতে পেয়ে বললে, ছবি নিলে কেন?

রণেন বললে, আসল মানুষটাকে অবহেলা ক'রে তার ছবি দেখে কি হবে? এটা আমি নিয়ে চ'লে যাব।

তীক্ষ্ণস্বরে বললে সুচিত্রা, তার মানে? আমার জিনিস তুমি নেবে কেন?

আমিই তো দিয়েছিলাম, ফিরিয়ে নিচ্ছি।

দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিতে লজ্জা করবে না তোমার?

না, করবে না। তোমার করে?

জবাব না দিয়ে সুচিত্রা অনুনয়ের স্বরে বললে, দাও না রমুদা।

রণেন বললে, না। যার কাছে আদর নেই, তাকে দিয়ে কি হবে? যে আদর করবে, তাকে দেব বই।

সুচিত্রা হাত বাড়িয়ে বললে, না না, দাও, আমার ছবি দাও।

রণেন আরও উঁচুতে তুলল ছবিটা। সুচিত্রা এবার রণেনের মুখের দিকে তাকাল। রণেনের দুষ্টুমি-ভরা মুখটি অপরূপ সুন্দর দেখাল। চোখ দুটো নড়তে চাইল না তার। জোর ক'রে চোখ তুলে ছবিটার দিকে তাকাল, তারপর লাফিয়ে দু হাত দিয়ে রণেনের হাত জাপটে ধ'রে নামিয়ে নিয়ে এল।

রণেন দু হাত দিয়ে চেপে ধরল ছবিটা। সুচিত্রা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করল, তারপর ছেলেমানুষী নাকী সুরে বললে, দাও না রমুদা! দেবে না? মাকে ডাকছি। মা, শুনছ—রমুদা আমার ছবি কেড়ে নিচ্ছে। রণেনের মুখে তেমনই দুষ্টুমির হাসি। এক-একবার দেখে নিচ্ছিল সুচিত্রা, সারা অন্তর মধুময় হয়ে উঠছিল। সুচিত্রা একবার রণেনের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, চোখে চোখে মিলল; বুকের ভেতরে কাঁপন জাগল। তার পর দৃঢ়কণ্ঠে বললে, দেবে না তো? ব'লেই ফস ক'রে একটা হাতে কামড় বসিয়ে দিল। রণেন চুপ ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুচিত্রা মুখ তুলে বললে, এখনও ছাড়লে না? দাঁত ব'সে গেছে, রক্ত জ'মে গেছে, তাতেও দেবে না? রণেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সুচিত্রা বললে, কি দেখছ অমন ক'রে? ভাবছ, সত্যি পাগল হয়ে গেছি, না? রণেন তেমনই তাকিয়ে রইল। সুচিত্রার মুখ শুকিয়ে গেল। কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে, পাগল আমি হই নি রমুদা।

রণেন ছুরিটা দিয়ে দিল। সুচিত্রা ছুরিটা রেখে দিয়ে বললে, সেই দিলে, কেন মিছেমিছি কামড় খেলে? খুব লেগেছে, না?

হাতটা দু হাতে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বললে, রক্ত বেরিয়ে গেছে, কি হবে বল দেখি।

রণেন বললে, কি আর হবে? বিষিয়ে যাবে, জ্বর হবে ১০৪—১০৫°। ওই বিছানাতে—ওটা তোমার গুরুদেবের, না? ওইটাতেই শুয়ে শুয়ে ভুল বকব—তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভাল বাসতাম। তোমার জন্যে সাত সমুদ্র পার থেকে ফিরে এলাম। তুমি দয়া ক'রে আমার জীবনসঙ্গিনী হও—এই সব বলব, তারপর ম'রে যাব। তখন তুমি আমাকে ভালবাসতে শুরু করবে। আমার ছবিটা ঘটা ক'রে পুজো করতে লেগে যাবে।

চুপ ক'রে রইল সুচিত্রা। সুলোচনার ডাক শোনা গেল, রমু-বাবা, এস। খুকী, তুইও আয়।

রণেন বললে, চলি, তোমার তো আবার ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

রণেন চ'লে গেল। সুচিত্রা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রণেনের গায়ের তাপময় স্পর্শ তার হাতে লেগে রয়েছে, মুখে রয়েছে ওর দেহের ওর রক্তের নোনা আস্বাদ। ওর দুষ্টুমি-ভরা সুন্দর মুখখানি ওর চোখের সামনে ভাসছে। একটা অননুভূতপূর্ব উত্তেজনায় ওর সারা দেহ কাঁপতে লাগল, একটি অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্যে ওর অন্তর ভ'রে উঠল।

খানিকক্ষণ পরে নীচে গেল সুচিত্রা। রণেন খেতে বসেছে। সুলোচনা সামনে ব'সে পাখা করছেন আর হা-হুতাশ করছেন।—একটা দিনের জন্যে বাছা এসেছে। কাছে এসে বসবে, দুটো কথা বলবে, মেয়ের সে দিকে হুঁশ-চিন্তা নেই। কি ক'রে যে এমন হয়ে গেল, বুঝতে পারি না বাবা! সুচিত্রা আসতেই বললেন, এই যে এসেছিস! একটু কাছে এসে ব'স, পাখা কর। পাগলামি তো চিরদিনই করবি। আজকের দিনটা বাছাকে আদর-যত্ন করলে দোষ কি? সুচিত্রা কাছে আসতেই ওর হাতে পাখা দিয়ে উঠে গেলেন সুলোচনা।

সুচিত্রা পাখা করতে লাগল। মৃদু গলায় বললে, মা হাতটা দেখতে পায় নি তো?

রণেন হেসে বললে, না, বল তো দেখাতে পারি।

সুচিত্রা ত্রস্তকণ্ঠে বললে, না না। দেখলে ঝাঁটা মারবে মুখে। এমনই তো মেজাজ দেখতে পাচ্ছ।

সুলোচনা সামনে এসে বললেন, হ্যাঁ বাবা, আর একটা দিন থেকে গেলে চলে না?

রণেন বললে, না মাসীমা, আপনাকে তো সব বলেছি।—ব'লে আবার মাথা নীচু ক'রে খেতে লাগল। সুচিত্রা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাখা করতে লাগল। সুলোচনা কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, যদি ওই দুটিকে চিরদিনের মত মিলিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন, তা হ'লে নিশ্চিন্তে মরতে পারতেন। বললেন, আর কবে দেখতে পাব কে জানে? হয়তো আর পাবই না। বে-থা ক'রে চাকরিতে বসলে, আর কি গরিব মাসীকে মনে থাকবে বাবা?

রণেন কোনও কথা বললে না। সুলোচনা আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চ'লে গেলেন।

সুচিত্রা বললে, কি এমন কাজ যে একটা দিন বেশি থাকা চলে না? তা হ'লে এতটা পথ এত হাঙ্গামা ক'রে আসবার কি দরকার ছিল?

রণেন বললে, কেন দরকার ছিল, কেন আজই পালাচ্ছি, তোমার বোঝবার শক্তি নেই। মাসীমা বুঝেছেন, তাই আর কিছু বললেন না।

৪

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সুচিত্রা নিজের ঘরে এল। এমন সময়টা বই পড়ে, যে বইগুলি সাজানো আছে দেওয়াল-আলমারির তাকে। বইগুলি সব বিধুভূষণের। অত্যন্ত প্রিয় বই তার। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশই। বাকি শরৎচন্দ্রের ও অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকের। কিংবা ছবি আঁকে। ছবি আঁকবার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিধুভূষণের যা ছিল সব নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। প্রতিদিন বিধুভূষণের প্রিয় কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রে বিধুভূষণের আত্মার তৃপ্তি-সাধন করছে ভেবে সে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে।

আজও পড়তে বসল সুচিত্রা। মন বসল না। রণেনের ছবিটি এবং কাগজ-পেন্সিল নিয়ে এল। ছবিটি নকল করবার চেষ্টা করল। সুবিধে হ'ল না। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল। মনটা অস্থির হয়ে আছে, কোন কাজেই বসতে চাচ্ছে না।

উঠে ঘোরাঘুরি করল খানিক। বিধুভূষণের বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রতিদিন সকালে নতুন ক'রে বিছানা পাতে, ফুল ছড়িয়ে দেয়। আজও তাই করেছে সকালে। হঠাৎ মনে হ'ল, সব বৃথা। দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর কি অনুভূতি থাকে, থাকে চৈতন্যময় সত্তা? প্রদীপ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবার পরও থাকে তার শিখা? কে জানে? কিন্তু আজ তার মনে সন্দেহের কীট প্রবেশ করেছে। করিয়েছে রণেন। হয়তো একদিন বিশ্বাসের ভিতকে শিথিল ক'রে দেবে, ভেঙে পড়বে তার বিশ্বাস, তার জীবন।

ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেই ভাবহীন মুখে প্রাণহান দৃষ্টি। ছবি, শুধু ছবি? পেছনে কেউ নেই? কিছু নেই? নেই আকুল তৃষ্ণা? নেই ব্যাকুল প্রতীক্ষা? চোখ বুজল। সমস্ত মন একাগ্র করল। ফুটে উঠল না কারও ছবি। না বিধুর, না রণেনের। এ কি হ'ল? সবাই চ'লে গেছে। কি নিয়ে থাকবে সে তা হ'লে? তার মানসচক্ষের সামনে তার জীবন-মরণের পথ তৃণ-তরুহীন জনপ্রাণীহীন অন্তহীন রুক্ষ নিষ্ঠুর প্রান্তরের মধ্যে পথিকহীন পথের মত নিদারুণ বিভীষিকা নিয়ে প্রতিভাত হ'ল। সেই নিঃসীম নিঃসঙ্গতার সামনে দাঁড়িয়ে তার দেহ ও মন যেন অসাড় হয়ে আসতে লাগল।

ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সুচিত্রা। নীচে গেল। একটা ঘরে মাদুরের ওপর রণেন ঘুমোচ্ছে। গা খালি, ধবধব করছে গায়ের রঙ। মুখের পাশটা দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর মুখখানি! এর চেয়ে সুন্দর মুখ সুচিত্রা দেখে নি। এর চেয়ে সুন্দর চেহারাও দেখে নি। এমন মানুষ তারই জন্যে এত কষ্ট ক'রে এসেছে। সে একটু হ্যাঁ বললে, ও বর্তে যাবে। কি এমন সে? এই তো চেহারা! এই তো গায়ের রঙ! ওর পায়ের নখের যোগ্য নয় যে! অথচ কিছুতেই হ্যাঁ বলতে পারছে না সে। পৃথিবীর বাইরে জন্ম-মৃত্যুর সীমানার বাইরে একজন তার মনকে টেনে ধ'রে আছে। অথচ রণেনের দিকেও মন সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে আছে। একেও ছাড়তে বেশ ইচ্ছা নেই তার। এ কি দোটানায় পড়েছে সে! যদি রণেন জন্মের মত চ'লে যায়, তখন কি সে পূর্বের মত একাগ্র মনে পূর্বের পথে চলতে পারবে? সে পথ কি ভাল লাগবে? রণেনের সঙ্গে মিলে, ওর সঙ্গে কথা

ব'লে; ওর সঙ্গমাধুর্য আস্বাদ ক'রে, ওর আবেগচঞ্চল প্রাণের তড়িৎময় স্পর্শ পেয়ে; আনন্দময় আলোময় জীবনের আভাস যা ওর মুখ চোখ উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে তা দু চোখ ভ'রে দেখে, সুস্থ ও সুন্দর জীবনের বার্তা যা ও বহন ক'রে এনেছে তা দু কান ভ'রে শুনে; সে কি আর আশাহীন আলোহীন আনন্দহীন পূর্ব জীবনে অবিকৃত মনে ফিরে যেতে পারবে?

প্রচুর ঘামছে রণেন। সুলোচনা এ ঘরে এসে তাই দেখে ও সুচিত্রাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, বাছা ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। দে না একটু তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস! একটু মায়া নেই! বিয়ে নাই বা করলি, বোনের কর্তব্যটা কর্ একটা দিনের জন্যে—। গজগজ করতে করতে চ'লে গেলেন।

সুচিত্রা ঘরে গিয়ে রণেনের পাশে বসল। একটু দ্বিধা এল মনে। তা ঝেড়ে ফেলে তোয়ালে দিয়ে অতি যত্নে রণেনের পিঠ বুক মুখ মুছে দিল। তার পর একটা পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

রণেন চোখ খুলল হঠাৎ। চোখে চোখ মিলল। রণেন বললে, কৃতার্থ হলাম। এইটুকু যে পেলাম, এই আমার পরম সৌভাগ্য। ধন্যবাদ দিচ্ছি।

সুচিত্রা লজ্জারক্ত মুখে বললে, ও মা! তোমার ঘুম ভেঙে গেল বুঝি! যা ঘামছিলে! রণেন বললে, মনে মনে তোমার কথাই ভাবছিলাম শুয়ে শুয়ে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমাকেই স্বপ্নে দেখছিলাম এতক্ষণ—

কি দেখলে?

সাঁতার দিচ্ছিলাম দুজনে—হঠাৎ ডুবতে লাগলাম, ডাকলাম তোমাকে। তুমি আমার ডাকে কান না দিয়ে সাঁতরে চ'লে গেলে—

সুচিত্রা বললে, ও মা! আমি যখন অত যত্ন ক'রে ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছি, তখন তুমি ওই রকম স্বপ্ন দেখছ! বেশ লোক তো?

রণেন বললে, আজ যাচ্ছি তো, যাচ্ছ না সঙ্গে তারই রিঅ্যাক্সন আর কি!

সুলোচনা ও-ঘর থেকে বললেন, রমু উঠেছে? জল খাবে কি না জিজ্ঞাসা কর্ দেখি। রণেন বললে, খাব মাসীমা। সুলোচনা সুচিত্রাকে বললেন, খুকী জল দে—জলটা খুব ঠাণ্ডা হয়েছে এ ঘরে।

রণেন উঠতেই সুলোচনা বললেন, চা খাবে নাকি?

রণেন বললে, এখন থাক্। একবার বাগান থেকে ঘুরে আসি। আর আসব না হয়তো। আর একবার দেখে যাই। ও-বেলায় দেখি নি ভাল ক'রে। সুচিত্রাকে বললে, তুমি যাবে নাকি?

সুলোচনা বললেন, যাক না, কি করবে ব'সে ব'সে।

বাগানে একটা গাছের নীচে বসল তারা। রণেন বললে, ছেলেবেলা হ'লে এতক্ষণ গাছে উঠে আম পাড়তে লেগে যেতাম। ও-বেলায় বললে—আমি গাছে উঠতে ভাল পারি না। পারি কি না-পারি দেখ।—ব'লেই কাপড় এঁটে-সেঁটে প'রে গাছে উঠে পড়ল। কাছাকাছি একটা ডালে উঠে ব'সে বললে, তুমি পার কি না পরীক্ষা দাও।

সুচিত্রা বললে, থাক্, মা দেখতে পেলে বকবে।

রণেন বললে, আম খাবে খুকুমণি! দাঁড়াও দিচ্ছি।—ব'লে হাতের কাছে দুটো আম ছিল, ছিঁড়ে ফেলে দিল নীচে।

সুচিত্রা কুড়িয়ে নিয়ে বললে, কাঁচা আম, খাব কি ক'রে? দাঁড়াও, নুন নিয়ে আসি বাড়ি থেকে। সুচিত্রা ফিরে এসে দেখলে, যেখানে রণেন ছিল, সেখানে নেই। এদিক ওদিক দেখল। দেখতে পেল না। কোথায় গেল? ডাক দিল, রণুদা! রণেন সাড়া দিল না। এ পাশে এসে একটু খুঁজে দেখতেই দেখতে পেল, রণেন আরও উঁচু ডালে ব'সে রয়েছে।

সুচিত্রা বললে, অত উঁচুতে উঠেছ কেন? অভ্যেস নেই প'ড়ে যাবে। হাত-পা ভেঙে গেলে সেই সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে চাইবে না যে।

প'ড়ে গিয়ে ম'রে গেলে তোমারই তো সুবিধে।

বিরক্তির ভ্রূকুটি ক'রে সুচিত্রা বললে, তার মানে?

বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না তোমাকে।

বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে কেন?

হবে না? একজনকে একদিন ভালবেসেছিলে; অন্তত তাকে বুঝিয়ে-ছিলে যে ভালবাস। আজ তাকে বেপরোয়া হাঁকিয়ে দিচ্ছ। বিবেক তোমার সায় দেবে নাকি তাতে?—ব'লে ডালে পা ঝুলিয়ে বসল।

সুচিত্রা এবার সত্যই ভয় পেয়ে বললে, দেখ রণুদা, নেমে এস। কায়দা-টায়দা যা দেখাবার নীচের ডালে এসে দেখাও।

রণেন বললে, আচ্ছা খুকু, এখান থেকে যদি লাফ দিই, হাত-পা ভেঙে যায়, সেবা-টেবা করবে তো ?

সুচিত্রা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, তুমি নামবে না তো ? মাকে ডেকে নিয়ে আসছি।

রণেন বললে, যদি ম'রে যাই একটু কাঁদবে তো খুকু ?

সুচিত্রা বললে, আমি চ'লে যাচ্ছি। তুমি যা ইচ্ছে কর।—ব'লে চ'লে যাবার উপক্রম করতেই রণেন বললে, আরে, না না, দাঁড়াও, নামছি।

রণেন নেমে পড়ল। বললে, একটু কাঁদবারও প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারলাম না। নাঃ, তোমার কাছে আর কিছুরই আশা নেই, চল।

সুচিত্রা বললে, একটু ব'স না, এই আমটা খেয়ে নিই।

দুজনে গাছের নীচে বসল।

রণেন বললে, ছেলেবেলায় সারা দুপুর আম পাড়তাম, খেতাম, মনে পড়ে তোমার ?

একদিন ভরপেট কাঁচা আম খেয়ে পেট কামড়ানোর জন্যে কেঁদে-কেটে সবাইকে অস্থির ক'রে দিয়েছিলে, মনে পড়ে বইকি।

রণেন বললে, কাঁচামিঠে আমের গাছ ছিল না একটা ?

প'ড়ে গেছে বছর দুই আগে।

রণেন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সুচিত্রার দিকে। টক আম চিবোতে চিবোতে ওর মুখের অপরূপ ভঙ্গী দু চোখ দিয়ে গিলছিল।

সুচিত্রা বললে, তাকিয়ে আছ কেন অমন ক'রে ? খাবে না কি ? এঁটো আর দিই কি ক'রে ? ছেলেবেলায় যা করেছি করেছি। বড় দাদা যখন—

তা হোক, দাও।—ব'লে রণেন হাত থেকে কেড়ে নিল আমটা।

সুচিত্রা বললে, আমার এঁটো খেলে! আমি পাগলী, আমাকে ভূতে পেয়েছে। এঁটো খেলে তোমাকেও ভূতে পাবে, পাগল হবে।

আমাকে ভূতে নয়, পেত্নীতে পেয়েছে। দেশ-বিদেশ ঘুরে এসে যে এখানে ছুটে এসেছি, তাতে আমি যে পাগল তা বুঝতে কারও বাকি আছে ?

সুচিত্রার মুখখানি গম্ভীর হয়ে উঠল।

ফিরে এল দুজনে। রণেন নিজের জিনিসপত্র গোছ-গাছ শুরু করল। পাঁচটার সময়ে গাড়ি এসে হাজির হবে। দেরি নেই বেশি।

সুচিত্রা সুলোচনাকে একলা পেয়ে বললে, হ্যাঁ মা। রণুদা আজ সত্যি চ'লে যাবে না কি?

সুলোচনার চোখ-মুখ থমথম করছিল। ধরা-গলায় বললেন, কে বারণ করবে বল! আমার তো মুখ নেই। আমার মুখ তো তুমি রাখ নি মা। চ'লে যাবে চিরদিনের জন্যে। তোমার কপালে সুখ নেই, আমি কি করব বাছা! হঠাৎ কেঁদে ফেলে বললেন, আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই, মরণ হ'লে হাড় জুড়োয় আমার।

সুচিত্রা শুষ্কমুখে স'রে পড়ল। বুকের ভিতরটা আনচান করছে, যেন প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস বুকের মধ্যে জ'মে উঠেছে। কোন রকমে বাইরে বেরুতে না পেরে বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছে। যদি হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে পারত, তা হ'লে হয়তো আরাম পেত সে।

নিজের ঘরে ফিরে এল। অভ্যাসমত ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দৃষ্টি। কিন্তু আজ তার মনকে স্পর্শ করতে পারল না। মনে হ'ল, জড় নির্জীব, যেন দেবতাহীন মন্দির, যেন দীপহীন দীপাধার—যে দেবতা অন্তর্হিত হয়েছে চিরদিনের জন্য, যে দীপ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর জ্বলবে না কোনদিন। কি হয়েছিল তার এতদিন? সম্মোহিত লোকের মত যা যা নয়, হতে পারে না, তা তাই ভেবে মুগ্ধ হয়েছিল, তৃপ্ত হয়েছিল! খদ্যোতের তুচ্ছ ক্ষণিক আলোকে ভেবেছিল ধ্রুবতারা। যাদুমন্ত্রপ্রভাবে খালি-মুঠিতে মহার্ঘ বস্তু আছে ব'লে মনে হয়েছিল; প্রভাব কেটে যাবা মাত্র দেখলে, মুঠি খালি, কিছুই নেই তাতে। যা মনে হয়েছিল ইহজীবনের লক্ষ্য, পরজীবনের আশ্রয়, এখন মনে হচ্ছে তা মরীচিকা মাত্র। যে প্রেমবাণীকে পরম সত্য ভেবে, সংসারের সব সুখ ও আনন্দকে ছেড়ে দুঃখ ও নিরানন্দকে বরণ ক'রে নিয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে তা অসুস্থ মস্তিষ্কের প্রলাপ মাত্র। এর পর তার দিন কাটবে কি ক'রে? আশা-আনন্দহীন নিঃসঙ্গ জীবন যখন দুর্বহ ভারের মত মত তাকে প্রতি মুহূর্তে পিষে ফেলতে থাকবে, তখন সে বাঁচবে কি ক'রে? অথচ রণেনকে যদি একবার বলে—আমার ভুল হয়েছে, নাও আমাকে, অমনি পরম আদরে বুকে তুলে নেবে। তার পর দেখতে দেখতে জীবন ভ'রে উঠবে। তার পর কত আশা! কত আনন্দ! কত প্রাপ্তি! কত সাফল্য!

কিন্তু তা কি বলা যায়। ছিঃ ছিঃ, মনে করবে কি। হয়তো কোনমতে মুখরক্ষা করবার জন্যে এসেছে, কোন রকমে তাকে ছেঁটে ফেলতে পারলেই সেই মেয়েটিকে বিয়ে করবার জন্যে ছুটবে। কি হবে ব'লে? সকলের ভাগ্যে কি সুখ থাকে? সে অভাগী, দুঃখেই চিরদিন কাটাতে হবে তাকে। ইহলোকে পরলোকে কোথাও সুখ মিলবে না তার।

রণেন কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। একেবারে ধ্যানমগ্না! এত ভালবাসে ওকে? কেন? ওর প্রাণ-মান বাঁচিয়েছিল নিজের জীবন দিয়ে! যে কোন সত্যিকার পুরুষমানুষ ও-অবস্থায় ও-ছাড়া আর কি করত? তাই ব'লে জীবনটাকে উৎসর্গ ক'রে দিতে হবে তার উদ্দেশে? ভাবপ্রবণ মেয়ে! চিরদিনই ওই রকম! বলিদানের সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। সেবার একজন হিন্দু নেতা হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে জেলে গেলেন। তাই শুনে ও কেঁদে অস্থির। ভাল ক'রে খায় নি, পরে নি কদিন। সে নেতাটিকে চোখের সামনে দেখতে পেলে ও বোধ হয় তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ত। অত্যন্ত ছেলেমানুষ ও। নিজের ভাল-মন্দ এখনও বোঝে না। জীবনে কষ্ট পাবে খুব। মাসীমার অবর্তমানে কে ওকে দেখবে, কি ওর হবে—ভেবে সে যত দূরেই থাক্, তার চিন্তার অবধি থাকবে না। যদি কোন রকমে ভুলিয়ে ওকে নিয়ে যেতে পারত, নূতন পরিবেশে নূতন নূতন মানুষের সঙ্গে ওকে মিশিয়ে দিতে পারত, তা হ'লে ওর এ পাগলামি কেটে যেত। একে ছেড়ে যেতে মন চাচ্ছে না, না ছেড়েও উপায় নেই তার। একটা প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল রণেনের। চমকে পিছনে তাকাল সুচিত্রা। রণেনকে দেখতে পেয়ে বললে, এখনই যাচ্ছ? এত শিগগির?

রণেন বললে, কি করব থেকে? কি হবে? একটু থেমে বললে, তুমি তোমার পথে যাও, আমিও আমার পথে যাই। আর কোনদিন দেখা হবে না। দিন দিন আমাদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে উঠতে থাকবে—বিস্মৃতির কুয়াশা পরস্পরকে পরস্পরের কাছ থেকে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন ক'রে দেবে।

সুচিত্রা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল—তার সমস্ত অন্তর উৎকর্ণ হয়ে রণেনের কথাগুলি শুনতে লাগল। রণেন বলতে লাগল, যাবার আগে আর একবার জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? চিন্তা ক'রে দেখ, যে জীবন

তুমি বেছে নিয়েছ, তা কি চিরদিন ভাল লাগবে? এর রিক্ততা একদিন তিক্ত হয়ে উঠবেই। সন্তান, সকলকে জড়িয়ে থেকে সুখে-দুঃখে জীবন-যাপন—সে-সুযোগ ঘটবে না। আলেয়ার পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে একেবারে সংসৃতির মাঝে গিয়ে দাঁড়াবে। এক মৃত্যু ছাড়া কোন গতি থাকবে না। পারবে তা সহ্য করতে?

সুচিত্রা ছবির দিকে তাকাল। মনে মনে বললে, পারব কি? আপনি কি দেবেন আমাকে শক্তি সহিষ্ণুতা? আপনার সঙ্গে মিলনের কামনাটিকে সকল দুঃখ-দুর্গতির ঝড়ে নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির অচঞ্চল রাখতে পারবেন কি? বলুন। এখনই ব'লে ফেলুন। না হ'লে ফিরে দিন আমার মন, মুক্তি দিন আমাকে আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতির বন্ধন থেকে।

নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ ছবির কাছ থেকে কোনও সাড়া পেল না সুচিত্রা।

গাড়ির শব্দ শোনা গেল। রণেন বললে, আমি যাচ্ছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে সুমতি দিন। যেন এই মোহজাল থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকার কল্যাণের পথ দেখতে পাও।

মাথা নীচু ক'রে প্রস্তরপ্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইল সুচিত্রা। রণেনকে প্রণাম করবার কথাও মনে এল না তার। রণেন ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

আবার গাড়ির শব্দ শোনা গেল। চ'লে গেল নাকি? আর আসবে না? চিরদিন এখানে প'ড়ে থাকতে হবে? ছবির দিকে তাকাল। অন্ধকারে দেখা গেল না। চিৎকার ক'রে বললে, কোথায় আপনি? দেখা দিন, আশ্বাস দিন, সাহস দিন। কি ক'রে থাকব তা হ'লে?

হঠাৎ অন্ধকারের পটে বিধুভূষণের মৃতদেহের ছবি ভেসে উঠল। নিস্পন্দ বিবর্ণ। চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত। সারা দেহে অপরিসীম শীতলতা। কি হ'ল, ঘরের বাতাস শীতল হয়ে আসছে, বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, আরও—আরও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তার দেহের রক্তও জ'মে যাচ্ছে, বুকের স্পন্দন স্তিমিত হয়ে আসছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখনই ম'রে যাবে নাকি!

সমস্ত অন্তর প্রতিবাদ ক'রে উঠল, না না, মরতে চায় না সে; বাঁচতে চায়; চায় স্বামী সন্তান সংসার। পৃথিবীর যত আনন্দ আছে ভোগ করতে চায়,

যত রস আছে পান করতে চায়। এই বিষাক্ত অন্ধকার ছেড়ে প্রাণপণ আলোর মধ্যে যেতে চায়। রণেনদার কাছে আছে আনন্দ, হাতে আছে রিক্ত শুষ্ক জীবনকে এক মুহূর্তে পরিপূর্ণ ও সরস করার মায়াদণ্ড। চ'লে যাচ্ছে সে চিরদিনের জন্যে। চিৎকার ক'রে উঠল, গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে মনে হ'ল। ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আবার প্রাণপণে চিৎকার করলে, রনুদা! আমি যাব, আমাকে নিয়ে যাও।

মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছে, কান দুটোর মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করছে, চেতনার শিখা ক্রমে নিবে আসছে। আর একবার সমস্ত প্রাণশক্তি সংহত ক'রে চিৎকার করলে, মা, মা গো, রনুদাকে ফেরাও। সুলোচনা শুনতে পেলেন সুচিত্রার ডাক। রণেন যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে ছিল। ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, ডাকছে, না?

সুলোচনা উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, তাই তো! চল বাবা, একবার দেখি কি হ'ল! সুটকেসটা বারান্দায় নামিয়ে রেখে রণেন দোতলায় ছুটল।

বারান্দায় দরজার সামনে প'ড়ে আছে সুচিত্রার অচৈতন্য দেহ। মূর্ছা গেছে সুচিত্রা। রণেন ঘরের ভিতরের কলসী থেকে জল এনে মুখে ছিটে দিতে লাগল। ক্রমে জ্ঞান হ'ল সুচিত্রার। ডাকল, মা! সুলোচনা সামনেই ব'সে ছিলেন। বললেন, এই যে মা আমি। সুচিত্রা ক্লান্ত করুণ স্বরে বললে, রনুদা চ'লে গেছে? সুলোচনা সস্নেহে বললেন, মাথাটা একটু তুলে দেখ—

রণেনের কোলে মাথা ছিল সুচিত্রার। মাথাটা একটু তুলতেই রণেনের স্নেহভরা চোখের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল।

উঠে বসল সুচিত্রা। ক্ষীণকণ্ঠে বললে, আমি যাব তোমার সঙ্গে। নিয়ে চল আমাকে।—ব'লে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই রণেন তাকে ধ'রে ফেলল। বললে, তুমি কি এখন যেতে পারবে?

পারব।—দৃঢ়কণ্ঠে বললে সুচিত্রা। রণেন তাকে ধ'রে ধ'রে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে চলল।

পিছনে সুলোচনার দু চোখ থেকে অশ্রুধারা নামল। আনন্দাশ্রু।

শ্রীঅমলা দেবী

সংবাদ-সাহিত্য

বাংলার কাব্য-সংসারে মৃত্যু বড় ঘন ঘন হানা দিতেছে; কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরেই কবি জীবনানন্দ দাশ কাল-কবলিত হইলেন। অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওর কলিকাতা শাখার আহ্বানে গত ১৩ অক্টোবর ভরুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-যতীন্দ্রনাথ-কালিদাস-জীবনানন্দ প্রমুখ এগারো জন বাঙালী কবির কবি-সম্মেলনে মিলিত হইয়া স্ব-স্ব কণ্ঠে কবিতা পাঠের কথা ছিল। সম্মেলন বসিবার ছাব্বিশ দিন পূর্বে ১৭ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ রোগভোগ করিয়া যতীন্দ্রনাথ বিদায় লইলেন। সম্মেলনের পরদিন ১৪ অক্টোবর জীবনানন্দ আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত হইয়া শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নীত হন এবং সেখানেই আট দিন জীবন-মরণ সংগ্রাম করিয়া ২২ অক্টোবর রাত্রি সাড়ে এগারোটার পর শেষনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। ১৩ অক্টোবর রাত্রি সাড়ে নয়টায় আকাশপথে কবির কণ্ঠস্বর শেষবারের জন্য শ্রুত হইয়া চিরতরে নিস্তব্ধ হইল। মাত্র পঁয়ত্রিশ দিনের ব্যবধানে বাঙালী দুই প্রিয় কবির বিয়োগে মুহ্যমান হইয়াছে।

কবি যতীন্দ্রনাথ আমাদের একান্ত অন্তরঙ্গ হিতৈষী ছিলেন; তাঁহার প্রতি শেষ কর্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি গত সংখ্যায় আমরা দিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এক মাস বিলম্ব হইল। আমরা অগ্রহায়ণ সংখ্যাকে যতীন্দ্রনাথ-স্মৃতি-তর্পণ সংখ্যা করিব। তাঁহার বৈবাহিক কবি কালিদাস রায় কবির ব্যক্তিগত পরিচয় দিবেন, অধ্যাপক কবি জগদীশ ভট্টাচার্য দিবেন তাঁহার কাব্য-পরিচিতি; কবি গোপাল ভৌমিক কবিতায় তর্পণ করিবেন এবং আমরা তাঁহার জীবনী, গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জী সাধ্যমত সঙ্কলন করিয়া দিব। কবির অটোগ্রাফ-করা শেষ চিত্রের প্রতিলিপিও আমরা দিব।

কবি জীবনানন্দের কাব্যের প্রতি আমরা যৌবনে যথেষ্ট বিরূপতা দেখাইয়াছি, তাঁহার দুর্বোধ্যতাকে ব্যঙ্গ করিয়া বহু পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেও ছাড়ি নাই। তিনি প্রধানত 'কল্লোল'-'প্রগতি'-গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে

বিপক্ষ দলে ফেলিয়া লড়াইয়ের ধর্ম অনুযায়ী আক্রমণেই আমাদের আনন্দ ছিল। আজ কালধর্মে আমাদের মতি ও বুদ্ধির পরিবর্তন হইয়াছে, তিনিও সকল নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছেন। পুরাতন যাবতীয় অশোভন বিরূপতা সত্ত্বেও এ কথা আজ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করিতেছি যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-কাব্যসাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন, তিনি অকপটে সুদৃঢ়তম নিষ্ঠার সহিত কাব্য-সরস্বতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশভঙ্গিতে অস্পষ্টতা থাকিলেও সাধনায় বিন্দুমাত্র ফাঁকি ছিল না। তিনি ভঙ্গি ও ভান-সর্বস্ব কবি ছিলেন না। তাঁহার অবচেতন মনে কবিতার যে প্রবাহ অহরহ বহিয়া চলিত, লেখনীমুখে সজ্ঞান-সমতলে তাহার ছন্দোবিদ্ধ প্রকাশ দিতে প্রয়াস করিতেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তাঁহার বক্তব্যের চাবিকাঠি খুঁজিয়া পাইয়া আনন্দলাভ করিতেন, যাঁহারা তাহা পাইতেন না তাঁহারাই বিমুখ হইতেন। আমরা এই শেষোক্তদের দলে ছিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া কবি জীবনানন্দের কাব্যসম্পদ কিছু বাতিল হইয়া যায় নাই। আমরাই বরং সহৃদয়তার সাধনা করিয়া তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

যতদূর মনে পড়ে, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয়। তখনও তিনি অবচেতনার গহনে সম্পূর্ণরূপে ডুব দেন নাই। সমগ্র কাব্যগ্রন্থখানির ভাব ছিল দরদ-করুণ, ছন্দও ছিল সাধারণ-পরিচিত ছন্দ এবং সে ছন্দে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। মোহিত-লাল ও নজরুল ইসলামের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই পথে পদচারণা করিলে তাঁহার কাব্য ঝরা পালকের মতই ভূতলাশ্রিত হইত, তিনি বড় জোর ভাল গুণীর ভাল সাগরেদ হিসাবে নাম করিতে পারিতেন। কিন্তু যিনি স্বয়ং ওস্তাদ গুণী, তিনি অনুসরণ-অনুকরণের পথে বেশিদিন চলিতে পারেন না। অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি নিজের পথ অর্থাৎ নিজস্ব পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং সেই পথেই শেষ পর্যন্ত 'বনলতা সেনে'র আবির্ভাব হইল। তাঁহার এই কাব্য-অভিযান-কাহিনী আমরা যোগ্যতর ব্যক্তির নিকট শুনিব। আমরা

ব্যাক্তগত কৈফিয়ৎ দিয়াই এবার ক্ষান্ত হইলাম। দেশবন্ধুর তিরোধানের অব্যবহিত পরে তিনি "দেশবন্ধু" নামে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা আজিও আমাদের মনে গাঁথা আছে। তবু বলিব, সেই পুরাতন গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভালই করিয়াছিলেন।

এই হিংসা-হানাহানি-কলহ-বিদ্বেষ-কণ্টকিত বর্তমান পৃথিবীতে এই উদারহৃদয় প্রসন্ন প্রেমিক কবিকে পদে পদে আমাদের মনে পড়িবে। সত্য বটে, দুঃখবাদই তাঁহার কাব্যের মূল সুর ছিল, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন নালিশ ছিল না। তাঁহার সমগ্র কাব্য স্নিগ্ধ ভালবাসায় ওতপ্রোত, কাহাকেও ফুলের আঘাত পর্যন্ত হানিতে তিনি অক্ষম ছিলেন। তাঁহার অন্তরের অভিলাষ "কমলালেবু" কবিতায় যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই ছিল তাঁহার সত্যকার জীবনদর্শন, নিজের জীবনাহুতি দিয়াও পরিচিত মানুষের কল্যাণসাধন :

"একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে ?
আবার যেন ফিরে আসি
কোন এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।"

কবি জীবনানন্দ জীবনাহুতি দিয়াছেন, এই ব্যাধিক্লিষ্ট মুমূর্ষু পৃথিবীর সাময়িক তৃপ্তি বিধান সম্পর্কিত তাঁহার আন্তরিক আবেদন গ্রাহ্য হইবে কি না জানি না।

আমরা এখানে কবি অজিত দত্তের লিখিত ১৪ই কার্তিক 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত কবি-পরিচয়টি অংশত উদ্ধৃত করিতেছি :

" 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে সতেরো বছর আগে একজন সমালোচক দুঃখ করেছিলেন যে, জীবনানন্দের অনুরাগী পাঠক-সংখ্যা বড়ই কম। সত্যই কয়েক বছর আগে পর্যন্তও জীবনানন্দের কবিতার সে-রকম খ্যাতি বা সমাদর হয় নি। যদিও বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের

প্রভাব বহুদিন থেকেই লক্ষ্য করা গেছে, তবু জীবনানন্দের কবিতা যে দুর্বোধ্য হিজিবিজি কিছু নয়, আস্বাদ করতে পারলে তার রস যে সত্যই অতুলনীয়, এ ধারণা শিক্ষিত ও কাব্যানুরাগী পাঠকমহলেও বিরল দেখেছি। যদিও কাব্যপাঠকমাত্রই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, সমসাময়িক কোনো কোনো কবির উপর, এবং তাঁর কনিষ্ঠ অধিকাংশ কবির উপরই জীবনানন্দের রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তবু সাধারণ পাঠকমহলে তাঁর কবিতার বিশেষ কোনো সমাদর বা জনপ্রিয়তা ছিল না। এর কারণ দুর্বোধ্য নয়। একে তো জীবনানন্দ স্বভাবতই নির্জনতাবিলাসী কোলাহলবিরাগী লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। কী ক'রে নিজেকে প্রচার করতে হয় তা তিনি জানতেন না, সম্ভবত সেটা পছন্দও করতেন না। দ্বিতীয়ত, তাঁর কাব্যের জগৎ ছিল তাঁর একান্তই নিজস্ব। যে কাব্যলোক সাধারণ কাব্যপাঠকের পরিচিত তার সঙ্গে মেলাতে গেলে জীবনানন্দের কবিতা অদ্ভুত, দুর্বোধ্য ও সঙ্গতিহীন মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। তাঁর মন যেন চলেছিল প্রচলিত ভাব ভাবনা ও চিন্তার পথ এড়িয়ে অন্য পথে, তাঁর উপমাগুলো যেন অন্যরকম, তাঁর ছবিগুলো যেন অন্যভাবে আঁকা। সেইজন্য কবিমনে ভিন্ন অন্য ধরনের মনে জীবনানন্দের কবিতার আবেদন যথাযথভাবে এবং জোরালোভাবে পৌঁছানো শক্ত। সেই হিসেবে তাঁকে কবিদের কবি বললে অন্যায় বলা হবে না। এমন কি কবিদের মধ্যেও সকলের পক্ষে জীবনানন্দের কবিতার সম্পূর্ণ রস উপভোগ করা হয়তো সম্ভব হয় নি।

"আমাদের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দই বোধ হয় একমাত্র কবি যিনি নিজের কবিতার মধ্যেই স্বয়ম্প্রকাশ স্বয়ম্প্রচারিত নন—অবশ্য সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কয়েকটি মনের কাছে ছাড়া। তাঁর কবিতা সহজেই অনভিনিবিষ্ট বা অলস মনকে আকৃষ্ট করে না। তাঁর কবিতায় যে ছন্দ আছে তা নর্তকীর নূপুরের ছন্দ নয়, সমুদ্রের ঢেউ, কিংবা বলা যায় বাতাসের সুর। সেইজন্য সকল লোকের কাছে সহজেই তা মর্যাদা পায় না। তাঁর কবিতা এমন জাতের যাতে লোককে অভিনিবিষ্ট করবার জন্য রসিক সুজনের ব্যাখ্যা ও প্রচারের প্রয়োজন হয়। জীবনানন্দের

কবিতার রস পাঠক-মনে সঞ্চারিত করবার জন্য মল্লিনাথের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

"তবে আমার মনে হয় না যে, কোনো ব্যাখ্যাতাই জীবনানন্দের কবিতার রসকে জনসাধারণের বোধগম্য ক'রে তুলতে পারবেন। জীবনানন্দের কবিমন যে বিশেষ ধাঁচে তৈরি হয়েছিল, তার সঙ্গে শুধু বিশেষ-বৈদগ্ধ্য দ্বারাই যোগাযোগ সম্ভব। জীবনানন্দের কবিতায় আছে—

বলি আমি এই হৃদয়েরে
সে কেন জলের মত একা একা ঘুরে কথা কয়!

"এই একা একা কথা বলার মধ্যে জীবনানন্দের কবিতার অনেকখানি তাৎপর্য নিহিত।

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের আঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে; স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই!

"এ কথা জীবনানন্দের কবিতার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কথা।

"জীবনানন্দের কবিতায় একটা বিশেষ সুর, একটা বিশেষ ছন্দ, একটা বিশেষ ধ্বনি ছিল। জীবনানন্দের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য কবিতাই এই বিশেষ ধাঁচে, বিশিষ্ট সুরে লেখা। তাঁর কবিতার বিরতি, ঝঙ্কার, শব্দচয়ন, উপমা সবই যেন ছিল একটু আলাদা ধরনের। অনেক সময় এই বিশেষ ভঙ্গিটি এত প্রকট হয়ে উঠত যে, সেটা অনেকের কাছে একটা মুদ্রাদোষ ব'লেই মনে হ'ত। কিন্তু জীবনানন্দের মনের যে বিশেষ গঠন, তারই সুসঙ্গত ভঙ্গি ও সুরটি তিনি তাঁর রচনার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন ব'লেই তাঁর রচনা সাধারণ পাঠকের কাছে এত অদ্ভুত ঠেকে।

"জীবনানন্দের কবিতার আরো একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁর ছবি এঁকে কথা বলার ভঙ্গিটি। যেমন—

ভোর:

আকাশের রঙ ঘাস-ফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল;
চারিদিকের পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ!

একটি তারা এখনও আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরের সব চেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো ;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে
যে-মুক্তা আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে—তেমি—
তেমি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

"এমনি ছবিতে, উপমায়, সুরেই জীবনানন্দের কবিতায় ঐশ্বর্যের প্রকাশ। জীবনানন্দের উপমা কেবল নতুন উপমা নয়, নতুন ধরনের উপমা। নইলে নীচের পংক্তিগুলোর উপমা ও বিশেষণ আমাদের কাছে এত অদ্ভুত, এত দুর্বোধ্য মনে হ'ত না :

শাদা শাদা ছোট ঘর নারকেল ক্ষেতের ভিতরে
দিনের বেলায় আরো গাঢ় শাদা জোনাকির মতো ঝরঝরে।
শ্বেতাঙ্গ দম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো
সময় পোহায়ে যায়, মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত,
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

অথবা,

মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন ;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের ;
সূর্যের আলোয় তার রঙ কুমকুমের মতো নেই আর ;
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।

"জীবনানন্দের কবিতার বিস্তৃত আলোচনা বা তাঁর রচনার সুষ্ঠু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সম্প্রতি জীবনানন্দের কাব্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বাংলা দেশের পাঠকসমাজ কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছেন। এ চেতনা যদি আরো বিস্তৃত হয়, আরো বেশি লোক যদি তাঁর কবিতা অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা সহকারে পড়তে অগ্রসর হয়, তা হ'লেই সেটা পরম তৃপ্তির বিষয় হবে। মৃত কবির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাবার এর চেয়ে ভালো কোনো পথ আমার জানা নেই। এবং দেশের লোক আগ্রহ সহকারে তাঁর কবিতা পড়ছে, একজন কবির পক্ষে এর চেয়ে বড় কাম্যও

আর হতে পারে না। জীবিতাবস্থায় তাঁর কাব্যের সম্পূর্ণ মর্যাদা যদি কবি জীবনানন্দ না পেয়ে থাকেন, তবে সেটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বাভাবিক নয়। এখন যদি বাঙালী পাঠক জীবনানন্দের কবিতাকে তার যোগ্য মর্যাদা দিতে অগ্রসর হয়, তবেই বাংলা দেশের কবিসমাজ তৃপ্ত হবে।"

—

বাংলা সাংবাদিকতাকে যাঁহারা বর্তমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহাদের অন্যতম প্রধান ছিলেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর হইলেও তাঁহার মৃত্যু যে অকালমৃত্যু, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বাংলা-সাংবাদিকতার সদ্যনির্মিত সৌধের অন্যতম স্তম্ভের পতন হইল। পর পর সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদপত্র-জগতের শোচনীয় দুর্ভাগ্যেরই সূচনা করিতেছে। কি অভাব অনটন ও রাজকীয় নিগ্রহের মধ্যে শ্রীমাখনলাল সেন ও প্রফুল্লকুমার সরকারের সহযোগিতায় ইঁহারা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সর্ববিধ অসুবিধা সত্ত্বেও কাজ করিবার অদম্য শক্তি ও অবিচলিত নিষ্ঠা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল বলিয়াই সহস্র বাধার মধ্যেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিয়মিত বাহির হইয়াছে, এবং সত্যেন্দ্রনাথের নির্ভীক ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মত ধীরে ধীরে বাংলার জনমতকেও গঠন করিয়াছে। তাঁহাকে বাংলা দেশের সংবাদপত্রসেবীরা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিবেন। তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভা যদিও সংবাদপত্রের কঠোর এবং নিত্যজরুরী তাগিদে সম্যক স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রেও স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি 'শনিবারের চিঠি'র এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অকৃত্রিম হিতৈষী সুহৃদ্ ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা আত্মীয়বিয়োগের দুঃখ পাইয়াছি।

—

ভারতবর্ষের অতি সঙ্কটকালে জনাব রফি আহমদ কিদোয়াইয়ের হঠাৎ মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার অসাধারণ উদ্ভাবনী প্রতিভা ও গভীর আত্মপ্রত্যয় শোচনীয় খাদ্য-সঙ্কটকালে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছে। সকল সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকিয়া তিনি ভারত-মাতার একনিষ্ঠ সন্তানরূপে নিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, আমরা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেই পরিচয়ই চিরদিন স্মরণ করিব।

—

সাত মাসাধিক কালের এই একটার পর একটা মৃত্যুজনিত শোকের প্রবাহ-প্রতিরোধ করিবার মত সুখের সংবাদ কি কিছু নাই? আছে বই কি।

শ্রীজওহরলাল নেহরু চীন হিন্দুচীন প্রভৃতি—এক কথায় উত্তর-পূর্ব এশিয়া জয় করিয়া নিরাপদে সোল্লাসে ও সগর্বে ফিরিয়া আসিলেন। সাক্ষাৎ পরিচয়ে তাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে বই কমে নাই; ভারত এবং চীনের ঘনিষ্ঠতর মিলনের মধ্যে তিনি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ স্থায়ী শান্তি দেখিতে পাইয়াছেন। দুই প্রাচ্য মহাদেশের মিলন তাঁহার মতে কঠিন নয়, সুতরাং পৃথিবীর প্রার্থিত শান্তিও অসম্ভব বা সুদূরপরাহতও নয়। পৃথিবীর দুই শক্তিমান দলের ক্রমবর্ধমান ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও যে ভারতবর্ষ ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, শ্রীজওহরলালের ইহাই সর্বাধিক কৃতিত্ব। বুঝিতেছি তাঁহার কষ্ট হইতেছে, একজন কৃতী "রোপ-ডান্সার" অপেক্ষাও অধিক সতর্কতা তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইতেছে। খাস চীনে বসিয়াই বর্তমান চীনের মহান মানব মাও সে তুংয়ের কাছেও তিনি বিদেশপ্রবাসী চীনাদের দুর্বল নাগরিকত্বের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন—এ বড় কম শক্তির পরিচয় নয়। মাও সে তুং কি জবাব দিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; কারণ বোধ হয় এই অসুবিধাজনক প্রসঙ্গের পর তাঁহার আর দ্বিতীয় সাক্ষাতের সুবিধা হয় নাই। না হউক, জওহরলাল যে খুশি হইয়া ফিরিয়াছেন ইহাতেই আমাদের সুখ। তিনি ২রা নবেম্বরের গড়ের মাঠের বক্তৃতায় নয়া চীনের নূতন মানুষদের ডিসিপ্লিনের প্রশংসা করিয়াছেন; এই বস্তুটি

প্রাচ্যদেশসুলভ নয়, বরঞ্চ আমরা বিপরীতপ্রকৃতির মানুষ। "হচ্চে হবে" ঢিলাঢালা ভাবই আমাদের স্বাভাবিক। সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন ধর্মসঞ্জাত ইহলৌকিক লাভালাভ সম্পর্কে নির্লিপ্ত বৈরাগ্যের উপরেই আমাদের দৌড়ধাপহীন আরামপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত। যাহাদের নকলে চীন এই ডিসিপ্লিনের সংস্কার অর্জন করিতেছে, তাহারা এখনও ডিসিপ্লিনের রাজা; কাজেই বকলমের প্রশংসা না করিয়া গুজরৎ খোদের প্রশংসাই সমীচীন। কিন্তু জওহরলালজী কি ভুলিয়া গিয়াছেন, জাপান সেই পথে তো আসলকেও ডিঙাইয়া গিয়াছিল, শেষ রক্ষা হইয়াছে কি? জাপান আর জাপান নাই, তেলাপোকারা কাঁচপোকা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ওই ডিসিপ্লিনের পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকিলে স্থায়ী মিলিটারী মেজাজ অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর শান্তির পক্ষে সেটা কাম্য নয়। জওহরলাল যদি পাশ্চাত্যের "সেক্যুলার" নয়, প্রাচ্যের "সেক্রেড" ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন চৈনিক গুণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন, আমরা আরও খুশি হইতাম।

* * * *

আরও একটা দুঃখের কথা না বলিয়া পারিতেছি না। এই মহামিলনের শুভমুহূর্তে যে রুশিয়ার নিকট চীনের টিকি বাঁধা সম্ভবত সেই রুশিয়ার একজন লেখকের একটি গল্পের ইংরেজী রূপ অপর পক্ষ প্রচার করিতেছেন। ইহা শুভসূচক নয়। গল্পটি নাকি রুশিয়ার একটি ফেমাস ফেব্‌ল্—মানে প্রসিদ্ধ হিতোপদেশ। লেখকের নাম এম. ই. সালটাইকভ (M. E. Saltykov—ঠিক উচ্চারণ কি জানি না, বন্ধুবর মনোজ বসু রুশিয়া সফর সারিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিব)। এই সালটাইকভ আধুনিক লেখক হইলে এমন গল্প তিনি কাহাকে বা কাহাদের লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন, তাহাও ভাবিবার কথা। তিনি পুরাতন মৃত লেখক হইলে অপর পক্ষই বা গল্পটি কাহাদের লক্ষ্য করিয়া প্রচার করিতেছেন তাহাও ভাবিতে হইবে। যাহা হউক, গল্পটা তো আগে খাস বাংলায় বলিয়া লই—

"এক ছিল রুইমাছ (carp) আর সেই রুইমাছ ছিল আদর্শবাদী

(idealist)। কি রকম আদর্শবাদী শুনবেন? সাধুরা (monk) নদীতে মাছ ধ'রে ঝোল রান্না ক'রে খায়—এ কথা সে কিছুতেই মানতে চাইত না, কারণ তার কোন প্রমাণ কেউ দিতে পারে নি। সে যুক্তি দিত, সাধুরা নদীর মাছ তাদের পুকুরে রেখে দেয় এবং সেখানে মাছেরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে।

রুইমাছ তার বন্ধু ভেট্‌কিমাছের (gremille) সঙ্গে তর্ক করত বোয়ালমাছের (pike) চরিত্র নিয়ে। কারণ এই বোয়াল সম্বন্ধে সাংঘাতিক সাংঘাতিক গল্প সব চলিত ছিল,—অন্য মাছেদের ন্যায্য অধিকার উপেক্ষা ক'রে তাদের ওপর নির্দয় ব্যবহারের গল্প, তার সর্বগ্রাসী খিদের গল্প। রুইমাছ দেখলেই গিলে ফেলে এমন শয়তান বোয়ালমাছ যে থাকতে পারে, রুইমাছ দীর্ঘকাল তা বিশ্বাস করতেই চায় নি। বার বার শুনতে শুনতে সে শেষ পর্যন্ত ব'লে বসল যে, বোয়ালমাছের সঙ্গে সে দেখা করবে এবং তাকে কিছু ধর্মকথা শুনিয়ে বোঝাবে যে, বোয়াল আর রুইয়েরা যদি ভাইয়ের মত একসঙ্গে (Brotherly Co-existence) থাকে, তা হ'লে দুপক্ষেরই কত সুবিধে। রুইমাছ বার বার এই কথাই বলতে লাগল যে, ভালবাসা পেলেই বোয়ালের হৃদয়-মন উন্নত হবে। তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেই সে অন্যের সম্বন্ধে ভাববে এবং দয়ালু হবে।

আদর্শবাদী রুইয়ের কথা শেষ পর্যন্ত বোয়ালের কানে পৌঁছল এবং একদিন ভোরবেলায় তাকে নেমন্তন্ন ক'রে পাঠাল। রুই বলতে বলতে গেল, আমি ভয় পাই নি, কেনই বা ভয় পাব? আমি তো কারও কাছে কোনও দোষ করি নি!

বন্ধু ভেট্‌কি বললে, তুমি বোকা, এইটেই তোমার দোষ—তার ওপরে নাদুসনুদুসও।

রুই যখন গিয়ে পৌঁছল বোয়ালের তখন খিদে ছিল না, কাজেই খুব ভদ্রভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানালে। রুই মনে মনে ভাবলে, কি মিথ্যাই না এর বিরুদ্ধে রটেছে! এ তো দেখছি আর পাঁচটা মাছেরই মতন! এর সঙ্গে কথা বলায় বাধা নেই।

কাজেই রুই আর বোয়ালের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল।

আলোচনা যখন খুবই গভীর হয়ে উঠেছে বোয়াল তখন জলের দীর্ঘ-নিশ্বাস নেবার জন্যে হাঁ করলে এবং নিতান্ত দৈবদুর্ঘটনা বশতই রুইও তার পেটের মধ্যে চ'লে গেল।"

গল্পটি চমৎকার এবং গভীর তত্ত্বোপদেশপূর্ণ। ইহা ছাড়া আর কোনও মন্তব্য এখন করা যায় না। তবে এই প্রশ্নটা করিতে পারি, রুশিয়ার জবানিতে ভারতবর্ষকে যাঁহারা সতর্ক করিতে চান, তাঁহারা এই গল্পের উপসংহারে রাঘববোয়ালের ভূমিকা লইবেন না তো?

—

ভারতীয় সতীকুলের শিরোমণি সতী পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতৃনিন্দা আরও ভয়ঙ্কর। পিতার খাতিরে ব্রাহ্মণ পরশুরাম ব্যাপক ক্ষত্রিয় নিধনে পিছপাও হন নাই। কিন্তু এই সকলই হইল ধর্মাশ্রিত সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা। ধর্মনিরপেক্ষ বর্তমান ভারতরাষ্ট্রে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যরূপ ধর্ম উপেক্ষিত হইলেও কোনও প্রত্যবায় নাই। নিন্দা শুনিতেও বাধা নাই, যাহারা নিন্দা করে তাহাদের সহিত লেন-দেন যাওয়া-আসা, এক কথায় আঁতাতও আপত্তিকর নয়।

জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে কথা বলিতেছি। ১৪ কার্তিকের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় দেখিলাম সোভিয়েট বিশ্বকোষে (এনসাইক্লো-পিডিয়া) মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে ঘোরতর অবমাননাসূচক পরিচয় বাহির হইয়াছে। ইতিপূর্বেও আমরা এই "সংবাদ-সাহিত্যে"ই একটি সোভিয়েট-প্রচারিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, সোভিয়েট ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না, ইহাকে বলে ভূয়া স্বাধীনতা। তৎসত্ত্বেও ভালবাসাবাসিতে বাধে নাই, আজ গান্ধীদূষণের পরেও বাধিবে না। আমরা প্রাচীনপন্থী এই উদারতার মর্ম পরিগ্রহ করিতে অক্ষম।

কানাঘুষায় শুনিলাম, এই বিশ্বকোষে জওহরলালজীও লাল বর্ণে

চিত্রিত হন নাই। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সে খবর কি ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া গিয়াছেন?

* * *

বিশ্ব আজ আয়তনে
অতি ক্ষুদ্র বিজ্ঞানের গুণে,
অতীব বৃহৎ তবু
জাতি আর ধর্মের বিরোধে;
বিমানেতে উড়ে আর
বিশ্ববার্তা বেতারেতে শুনে
ছোট যারে মনে হয়,
ধরি না তো অন্তরের বোধে।
আমরা রচনা করি
মানুষে মানুষে ব্যবধান—
দেশে দেশে গণ্ডী তুলি
দল বেঁধে করি যে কলহ।
মহৎ উদার প্রেমে
রাখো তুমি মানুষের মান—
কবির প্রার্থনা এই
তব কাছে, বিশ্ববার্তাবহ।

—

সম্পাদকীয় অক্ষমতাবশত এবারেও পুস্তক-পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল না।

———

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ২৮৩৮

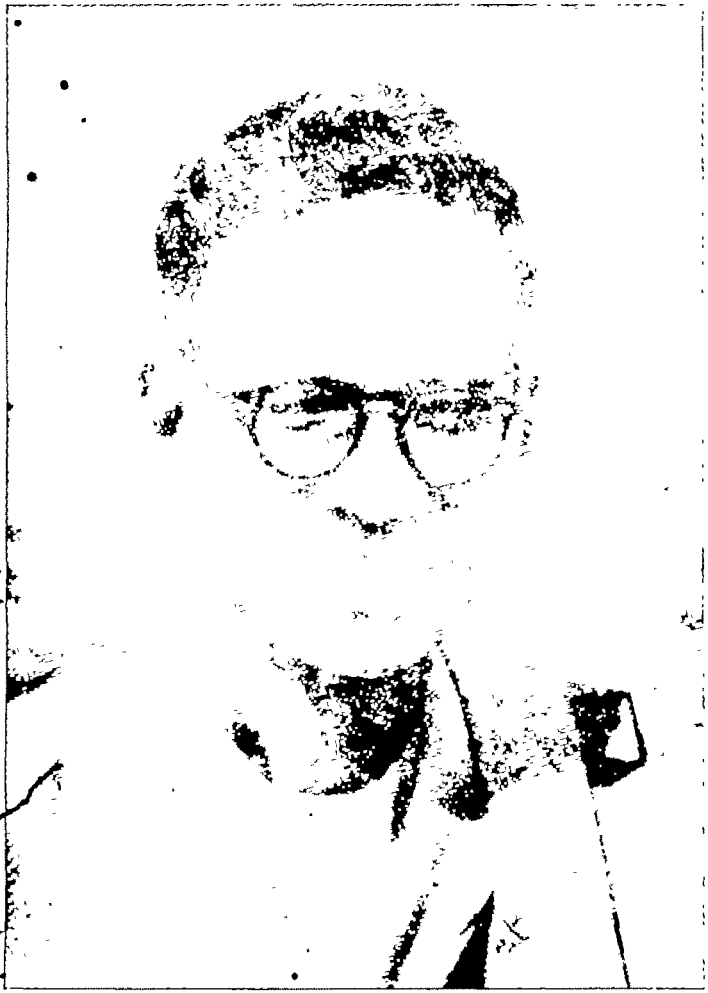

জন্ম
১৩ আষাঢ় ১২৯৪
[২৬ জুন ১৮৮৭]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মৃত্যু
৩১ ভাদ্র ১৩৬১
[১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪]

ফোটো : শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

CALCUTTA

শনিবারের চিঠি
২৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬১

১৩ই আষাঢ় ১২৯৪

নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলা বা প্রচারের জন্য লেখায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সঙ্কোচ ছিল। দীর্ঘকাল পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তে মাসে মাসে কবি ও সাহিত্যিকদের সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কবিকর্মের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কথাসাহিত্যে পরশুরাম ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাব্যে করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন ও মোহিতলাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া যতীন্দ্রনাথে আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছিলাম। চিত্র বা জীবনী তিনি কিছুই দিতে রাজী হন নাই, এবং আমাদেরও কবি-পরিচিতির প্রয়াস মধ্যপথে খণ্ডিত হইয়াছিল। প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে ১৩৬০ বঙ্গাব্দের গোড়ায় তাঁহাকে পুনরায় অনুরোধ করি, অনেক দিন বাদে তিনি কিছু উপকরণ পাঠান এবং বহুকষ্টে শ্রীমান গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের তোলা একখানি ছবিতে তাঁহার সহিও দেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি জীবিত থাকিতে এইগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকাতে তাঁহার চিরবিদায়ের সুযোগ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইতেছে।

১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় (২৬ জুন ১৮৮৭) রবিবার শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার শান্তিপুরের সন্নিকটে হরিপুর গ্রাম। পিতা দ্বারকানাথ দরিদ্র ছিলেন এবং সামান্য চাকরি করিতেন। যতীন্দ্রনাথের ছয় ভাই বোন শৈশবেই মারা যান। বারো বছর বয়স পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথ গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। সেখান হইতেই ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া কলিকাতায় কাকার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে আসেন। তৎপূর্বে আট বৎসর বয়সেই তাঁহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছিল। কলিকাতায় ১৯০০ সনের ভয়াবহ বিউবনিক প্লেগের মড়কের সময় তিনিও আক্রান্ত হন, কিন্তু পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া ও শহরের প্লেগের দড়ি-টানাটানিতে শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়ারই জয় হয়। পরে ধরিল বাতশ্লেষ্মা বিকার বা টায়ফয়েড। কোনও ক্রমে রক্ষা

পাইয়া পৈতৃক পল্লীর পাশের গ্রামের হাইস্কুলে তিনি ভর্তি হইলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যখন উঠিলেন, তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা শোচনীয়। পিতা কর্মস্থান বালেশ্বরে পুত্রকে লইয়া গেলেন। সেখানকার স্কুলে পড়িতে পড়িতে জলহাওয়ার গুণে শরীরও সারিল, কিন্তু হঠাৎ পিতার চাকরিটি গেল। কাজেই কলিকাতায় ফিরিয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে প্রবেশ করিলেন। সেখান হইতেই বেনিয়াটোলার এক মেসে থাকিয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এনট্রেন্স পাস করেন। ১৯০৫ সনে ১৮ বছর বয়সে জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) হইতে এফ.এ. পাস করিয়া অনেক হাঙ্গামার পর শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হন; অবস্থান—সংলগ্ন কলেজ-হস্টেলে। হস্টেলের প্রাঙ্গণে একটি পুকুর এবং তাহাতে পদ্মফুলের অপরূপ শোভা দেখিয়া যতীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের প্রথম উন্মেষ হয়। ইহার পূর্বে গ্রামের মুচিপাড়া ও কুলোপাড়ার বারোয়ারী পূজায় কবির গান ও তরজার লড়াই, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র "সীতা ও সরমা" অধ্যায় এবং হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর সাহায্যে বঙ্গভারতীর সহিত তাঁহার যৎসামান্য পরিচয় ঘটিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনধীত। সহপাঠী মিহির প্রথম তাঁহার সংবাদ দেয়, বলে—রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। যতীন্দ্রনাথ নবীন সেনের পক্ষ লইয়া ঘোর তর্কে প্রবৃত্ত হন। শেষ পর্যন্ত মিহিরের কৃপায় একখণ্ড টালি-এডিশন 'রবীন্দ্রকাব্য-গ্রন্থাবলী' হাতে আসে। রবীন্দ্রকাব্যের বিপুল বিস্ময়কর প্রভাবে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র ভাসিয়া যান। স্ফুটনোন্মুখ কবির বয়স তখন উনিশ।

১৯১১ সনে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করিয়া যতীন্দ্রনাথ ট্রেনিং লইতে ঢাকা যান এবং দুই বৎসর নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া ১৯১৩ সনে নিজ নদীয়ায় জেলা-বোর্ডের চাকরি গ্রহণ করেন। চাকরি-জীবনের ইহাই আরম্ভ। (জেলা-বোর্ডের অধীনে যাঁহারা ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করেন, সচরাচর তাঁহারা সততার জন্য প্রসিদ্ধ নহেন। যতীন্দ্রনাথ আজীবন ইহার ব্যতিক্রম থাকিয়া বার বার নানাভাবে বিপন্ন

হন, তাঁহার আর্থিক দৈন্যেরও অবধি থাকে না। এই ব্যাপারটি তাঁহাকে ধীরে ধীরে pessimist বা দুঃখবাদী করিয়া তোলে, তাঁহার 'মরীচিকা'র "ঘুমের ঘোরে" কবিতাগুলি এই সময়ে মনের অপ্রসন্ন অবস্থায় রচিত।

চাকরিতে সাধুতা-অপরাধের জন্যই আশানুরূপ উন্নতি হইল না। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য মাঝে মাঝে ছুটি লইতে হইত। ১৯২০ সন হইতে তিন বৎসরের লম্বা ছুটি, অর্থাৎ কবি তখন বেকার। খদ্দর আর দেশলাইয়ের কল লইয়াই থাকেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ এই কালেই আরম্ভ হইয়াছে। কবি স্বগ্রামে বসিয়া চরকা কাটেন, খদ্দর বোনেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (পরবর্তী কালে "মিতে") উৎসাহ ও উদ্দীপনা কাব্যসাধনায় বিশেষ সহায় হয়। ফলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয়। 'মরীচিকা' হইতেই আবার তাঁহার ভাগ্যোদয়। সেই বৎসরেই পুণ্যশ্লোক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের এস্টেটে ইঞ্জিনীয়ারের কাজও জুটিয়া যায়। কবির বয়স তখন ছত্রিশ।

কাশিমবাজারে ছয় বৎসর চাকরির পর ১৯২৯ সনে এস্টেটের সমস্ত আপিস কলিকাতায় উঠিয়া আসিলে যতীন্দ্রনাথও কলিকাতায় আসেন, এবং সেখানেই দীর্ঘ তেরো বছর থাকিয়া ১৯৪২ সনে বোমার ভয়ে রাজধানী পুনরায় কাশিমবাজারে গেলে তাঁহাকেও যাইতে হয়। সাহিত্য-সাধনার দিক দিয়া কলিকাতায় এই তেরো বৎসর নিষ্ফল হয় নাই। ১৯৫০ সনে বহরমপুর হইতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সংক্ষেপে এই চাকরি-জীবন সম্বন্ধে "বিপ্রতীপ গুপ্ত" বেনামীতে লিখিয়াছেন—

"১৯২৩ থেকে ১৯৫০। এই দীর্ঘকাল নানা বিপর্যয়ের মধ্যে যতীন কাশিমবাজার ষ্টেটেই চাকরি করেছে। সূত্রে তাকে বঙ্গ বিহার-উড়িষ্যার অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। তার কর্মজীবনে যেসব দুষ্টগ্রহের দৃষ্টি পড়েছিল, যে কারণেই হোক, তারা কেউ মারক হয় নি। যতীনও তাদের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ এড়িয়ে মাঝে মাঝে কবিতা লিখেছে, চরকাও কেটেছে। 'মরীচিকা'র পরের সমস্ত কবিতাই তার কাশিমবাজারের চাকরির সময় লেখা।"—'মাসিক বসুমতী', শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃ. ৪৬০

যতীন্দ্রনাথের কর্ম-জীবনের এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যেই তাঁহার কবি-জীবনেরও চাবিকাঠি আছে; তাঁহার কবিতার ভাব, ছন্দ, ভাষা,

ভঙ্গি এই কারণেই একটা বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন—

"আধুনিক কবিগণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার কবিতায়—ভাবা ও ভাবের বলিষ্ঠতা এবং তীব্র অনুভূতির সহিত আত্মস্থতা অতি লক্ষণীয়। যতীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও কবিজীবনে সাক্ষাৎ বিরোধ আছে মনে করিয়া কৌতুক বোধ হয়। তিনি বি-ই উপাধিধারী ইঞ্জিনিয়ার; আর কোন বাঙালী বোধ হয় ঐরূপ শিক্ষা ও ঐরূপ কর্মজীবনসত্ত্বেও এমন কবি-প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেন নাই। কর্মকার যেমন অতি কঠিন লৌহ আগুনে কোমল করিয়া তাহার সেই অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ পিণ্ডকে হাতুড়ির আঘাতে নানা আকারের গঠন দেয়—যতীন্দ্রনাথের কবিতায়, অগ্নিতপ্ত ভাবপিণ্ডের উপরে সেই হাতুড়ির আঘাত, এবং তাহার ফলে ভাব ও ভাষার জমাট দৃঢ়তা ও সুপরিচ্ছন্ন গঠন পরিলক্ষিত হয়।"—'কাব্য-মঞ্জুষা'

সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসরের (১৯১৩-১৯৫০) প্রায় একটানা হাড়ভাঙা চাকরি-জীবন সত্ত্বেও সাধু ও অকৌশলী যতীন্দ্রনাথ কিছুমাত্র আর্থিক সঙ্গতি অর্জন করেন নাই; ১৯৫০ সনে চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে তাই কৌতুক করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"ইট কাঠ চুন বালি আনাইয়া গাড়ী গাড়ী
সারাটা জীবন শুধু গাঁথিনু পরের বাড়ী।
কত দুশ্চিন্তাই ঘটাতে বাসের সুখ,
আলো হাওয়া জল ড্রেন—পাছে কোন হয় চুক্।
সে সব বাড়ীতে মোর কোন অধিকার নাই,
পথে পথে খুঁজি আজ মাথা গুঁজিবার ঠাঁই।

ছন্দ অর্থ আর ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বাছি,
সকলই পরের তরে কবিতা যা গাঁথিয়াছি।
অশ্রুসাগর সেচি অহেতুক কৌতুকে
গাঁথিয়া গাঁথিয়া মালা দুলায়েছি বুকে বুকে।
হায় রে, আমার বলি সে-বুক সে-মালা কোথা,
যার পরশনে মোর জুড়াবে বুকের ব্যথা?

বরাত সঙ্গে চলে, কিছু নাই বলিবার,
মিথ্যে হইনু কবি, মিছে ইঞ্জিনিয়ার।"

দৈহিক ব্যাধি ও কর্মজীবনের অসাফল্য—কবির জীবনের দুঃখবাদ

প্রধানত এই কারণেই, আমাদের এইরূপ মনে হইলেও কবি স্বয়ং জানাইয়াছিলেন—

"আমার কাব্যের দুঃখবাদ পারিবারিক জীবনের দুঃখ হইতে উদ্ভূত নহে; এ ভূত কোথা হইতে ঘাড়ে চাপিল, জানি না—প্রথম কৈশোর হইতেই সে আমার পিছু লইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।"

অবসর গ্রহণের পর কবি বহরমপুর ত্যাগ করিয়া তাঁহার কৃতী পুত্রদের কর্মস্থান সিন্ধুরি ও হিজলি-খড়্গপুরেই প্রধানত বসবাস করিতেন। গত ৩১এ ভাদ্র (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪) বিশ্বকর্মাপূজার দিন খড়্গপুরেই তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। কবি কালিদাস রায় তাঁহার অন্যতম বৈবাহিক। যাঁহারা শিল্পী ও গুণীদের জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান করিয়া থাকেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চাশত্তম জন্মদিবসে যতীন্দ্রনাথের জন্ম ও শরৎচন্দ্রের অষ্টসপ্ততিতম জন্মদিবসে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই বিস্মিত ও চমকিত করিবে।

১৯১০ সনে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ছাত্র অবস্থাতে তাঁহার কাব্য-সাধনার আরম্ভ এবং মৃত্যুর সঙ্গে তাহার সমাপ্তি। প্রচুর লিখিবার গৌরব তাঁহার নয়। তিনি অল্পই লিখিতেন এবং তাহাও বাছাই করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতেন। বাংলা দেশে তিনিই সম্ভবত একমাত্র কবি, যিনি নিজের যাবতীয় মৌলিক রচনা বাছাই করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ গ্রন্থ—কাব্যসংকলন 'অনুপূর্বা'র দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহার মৃত্যুশয্যাতেই প্রকাশিত হয়। পূর্বে-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হইতে সংকলন ছাড়াও ইহাতে তাঁহার স্বনির্বাচিত শেষের কবিতাগুলি (১৩৫৪-১৩৫৯) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "অযত্নে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে" বলিয়া আক্ষেপের অবকাশ আমাদের নাই। আমরা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবির মৌলিক রচনাগুলির প্রয়োজনীয় পরিচয় সহ একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি।—

১। মরীচিকা [কাব্য], প্রকাশক হেমন্তকুমার সরকার, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পৃ. ৬+১৩০।

"ঘুমের ঘোরে" সাতটি "ঝোঁক"কে সাতটি স্বতন্ত্র কবিতা ধরিলে মোট কবিতার সংখ্যা ৪৭। উৎসর্গ কবিবন্ধু যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে। ১৩৩০ [১৯২৩], এক টাকা।

২। মরুশিখা [কাব্য], প্রকাশক মণীন্দ্রমোহন বাগচী ১০।১ আরপুলি লেন, কলিকাতা। পৃ. ৮+১২০।

কবিতার সংখ্যা "মুখবন্ধ" লইয়া ৪২। উৎসর্গ যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে। ১৩৩৪ [১৯২৭], পাঁচ সিকা।

৩। মরুমায়া [কাব্য], প্রকাশক মণীন্দ্রমোহন বাগচী, ৪৭ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। পৃ. ৮+১১৫।

কবিতায় রচিত "শুদ্ধি-পত্র"কে একটি কবিতা ধরিলে কবিতার সংখ্যা ৩০। উৎসর্গ "জ্যোতি"কে "যতি"। ১৩৩৭ [১৯৩০], পাঁচ সিকা।

উপরের তিনটি কাব্যেরই "উৎসর্গ" কবিতায় রচিত।

৪। কাব্য-পরিমিতি [গদ্য-প্রবন্ধ], প্রকাশক রসচক্র সাহিত্য-সংসদ হইতে রাধেশ রায়, ১সি লেক রোড, কলিকাতা। পৃ. ৪+১০৭।

'কাব্য-পরিমিতি' ১৩৩৭ ও ১৩৩৮ সালে 'উপাসনা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাব্যের—সূত্র, অঙ্কন; সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত, অনুশীলনী—এই পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। উৎসর্গ কালিদাস রায়কে। আষাঢ় ১৩৩৮ [১৯৩১], এক টাকা।

৫। সায়ম্ [কাব্য], প্রকাশক বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সারস্বত মন্দির, ১ রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা। পৃ. ৬+১৮৪।

কবিতার সংখ্যা ৩৮। ১৩৪৮ [১৯৪১], দেড় টাকা।

৬। ত্রিযামা [কাব্য], প্রকাশক মহাদেব সরকার, সমবায় পাবলিশার্স, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। পৃ. ৮+১৯৩।

রচনাকাল শ্রাবণ ১৩৪৮—ভাদ্র ১৩৫৫। কবিতার সংখ্যা ৭৭। আশ্বিন ১৩৫৫ [১৯৪৮], চার টাকা।

কাব্য-সংকলন গ্রন্থের তালিকা :—

৭। অনুপূর্বা [কাব্য], প্রকাশক মহাদেব সরকার, সমবায় পাবলিশার্স, ৩৩-২ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৵+২৪৪+।০।

কবির ফোটো-চিত্রের একটি প্রতিলিপি, কবির "আমার কথা", প্রকাশকের "ভূমিকা" ও "নিবেদন" আছে। কবির প্রথম চারখানি কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলন করা হইয়াছে, কবিতার সংখ্যা—'মরীচিকা' হইতে ১৯, 'মরুশিখা' হইতে ১৭, 'মরুমায়া' হইতে ১৮ এবং 'সায়ম্' হইতে ২৮—মোট ৮২। বৈশাখ ১৩৫৩ [১৯৪৬], তিন টাকা আট আনা।

৮। অনুপূর্বা [কাব্য], উপরোক্ত সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন সংকলন বলা যায়, কারণ ইহার সব কবিতাগুলি কবি নিজে বাছাই করিয়াছেন; পুস্তকাকারে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত যাবতীয় কবিতা হইতে এই সংকলন করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার শেষ গ্রন্থও বটে। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ॥০+২৮৭। ইহাতেও কবির ফোটো-চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

কবিতা-সংখ্যা 'মরীচিকা' হইতে ১৬, 'মরুশিখা' হইতে ২০, 'মরুমায়া' হইতে ১৭, 'সায়ম্' হইতে ২০, 'ত্রিযামা' হইতে ২০ এবং পরবর্তী গ্রন্থকারে অপ্রকাশিত কবিতা হইতে ("নিশান্তিকা") ৯—মোট ১০২। রচনাকাল ১৯১০ হইতে ১৯৫৩—মোট তেতাল্লিশ বৎসর ধরিয়া ব্যাপ্ত। ভাদ্র ১৩৬১ [সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪], সাড়ে পাঁচ টাকা।

অনুবাদ বা অনুসরণ কাব্যের তালিকা এই :—

৯। কুমারসম্ভব [কাব্য], প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। পৃ. ৪+৮+৬৩

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী অঙ্কিত বারোটি পূর্ণপৃষ্ঠা রঙিন ও অনেক একবর্ণ চিত্র পরিশোভিত। কবি কালিদাস রায় "পরিচায়িকা" লিখিয়াছেন, কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন "ভূমিকা"। তিনি লিখিয়াছেন—

"কালিদাস সর্বদেশের, সর্বকালের, বুঝিবা সর্বজনের কবি। হিমালয়কে পটভূমি করিয়া তিনি যে কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন, তাহা হিমালয়ের মতই বিশাল অরণ্যানী-মণ্ডিত, সহস্রনির্ঝরঝঙ্কৃত, প্রেমিক ও তপস্বীদের পরমতীর্থ দুর্গমসুন্দর মহাশৈল। তাহাতে অধিরোহণের পথ অসংখ্য। আমার এ-যুগের পাঠকচিত্ত যে-শৈলপথে অগ্রসর হইয়া বিশেষ একটি রসনির্ঝরিণীর তীরে তীরে আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া

ফিরিতেছে, সঙ্কীর্ণ হইলেও সেই পথ আরও অনেক বাঙ্গালী পাঠকচিত্তের পক্ষে সুগম ও সুপথ হইবে বলিয়া আশা করিয়াছি, সেই পথের ও সেই নির্ঝরিণীর সন্ধান দিবার চেষ্টা এই অল্পায়তন রচনার মধ্যে আছে।"

১৩৫৬ ? [১৯৪৯ ?], তিন টাকা।

১০। রথী ও সারথি (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহজ মর্মানুবাদ) [কাব্য], প্রকাশক উমানাথ সিংহ, নিরীক্ষা প্রকাশনী, বহরমপুর। পকেট সাইজ। পৃ ৬+১২৩।

"ভূমিকা"য় কবি লিখিয়াছেন—

"অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া এই বহুমনের সুগভীর সংশয় ও গীতার মীমাংসাকে সংহত ও সহজ সাহিত্যরূপ দেওয়া সম্ভব কি না এই কৌতূহল হইতেই 'রথী ও সারথি'র জন্ম···ফল যাহা হইয়াছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের চরণেই অর্পণ করিলাম।"

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫৭ [১৯৫১], বারো আনা।

মুদ্রিত পুস্তকের ইহাই সম্পূর্ণ তালিকা। নিজের মৌলিক রচনার শক্তি সম্বন্ধে কবি যখন সন্দিহান হন, তখনই তিনি অনুবাদ ও অনুসরণে হাত দেন, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র এই "হাতুড়ে" কবি ছিলেন না। এই উদ্যমের ফলেই আমরা ১৩৫৪-৫৫ বঙ্গাব্দে [১৯৪৭-৪৮] "ইংরেজী হইতে ছন্দে অনুবাদিত" "গান্ধী-বাণী-কণিকা" পাইয়াছি। ওইগুলি ওইকালেই 'শনিবারের চিঠি'তে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই।

১৩৫৮-৫৯ সনে (১৯৫১-৫২) তিনি মহাকবি শেক্সপীয়রের কয়েকটি ট্রাজেডির প্রায় আক্ষরিক অথচ কাব্যসম্মত অনুবাদ করেন। 'ম্যাকবেথ,' 'হ্যামলেট' ও 'ওথেলো'র অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। 'ম্যাকবেথ' ১৩৫৯ চৈত্রের 'মাসিক বসুমতী'তে আরম্ভ হইয়া ১৩৬০ ভাদ্রের সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। 'হ্যামলেট' ১৩৬০ কার্তিকের 'শনিবারের চিঠি'তে আরম্ভ হইয়া ধারাবাহিকভাবে এখনও প্রকাশিত হইতেছে। 'ওথেলো' পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে।

যতীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা যৎসামান্য। 'শনিবারের চিঠি'র (১৩৩৪-১৩৩৮) পৃষ্ঠায় তাঁহার কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট গদ্য রচনা রহিয়া গিয়াছে। তিনি ১৩৩৪ সাল হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে

'চিঠি'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সংযোগের গোড়ার ইতিহাস একটু কৌতুককর। ১৩৩৪ সালে অতি-আধুনিক নামধেয় সাহিত্যিকেরা যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা'-মোহগ্রস্ত হইয়া তাঁহারই অনুকরণে গাদা গাদা অনুপ্রাসবহুল কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিতে থাকেন। আমরা ১৩৩৪ আশ্বিনে সতর্কবাণী এইভাবে উচ্চারণ করি—

বুকের রক্ত উজাড় করিয়া যে রচিল 'মরীচিকা',
বিড়াল-ভাগ্যে সহসা তাঁহার ছেঁড়ে নি কাব্য-শিকা।
কথার উপরে কথা গেঁথে শুধু রচে নি অনুপ্রাস—
প্রতি পংক্তিতে জমাট বেঁধেছে বুকের দীর্ঘশ্বাস!
কেবল ছন্দ নয়—
বিশ্বের সাথে 'হাতুড়ে' কবির সুনিবিড়প রিচয়।
তোমরা করিছ কাব্যসৃষ্টি বাক্য উলটি নিয়া,
বিরোধী কথায় অনুপ্রাসের ছিটা মাঝে মাঝে দিয়া;
কাব্য সে নহে মহে—
কাব্য সৃষ্টি হয় শুধু ভাই বেদনার কালিদহে।

ইহার পর যতীন্দ্রনাথ আর দূরে রহিতে পারিলেন না। পৌষেই (১৩৩৪) "তরুণের লজ্জা" প্রবন্ধ লইয়া 'চিঠি'র আসরে অবতীর্ণ হইলেন। 'চিঠি'র নব পর্যায়ের প্রথম সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩৩৮) হিজলী-রাজবন্দীদের উপর গুলি-চালনার সাত দিনের মধ্যেই তাঁর "হিজলী-দর্শন" প্রকাশিত হইয়া ইহার মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিল।

কবি নিশ্চয় তাঁহার জীবন-দেবতার কাছ হইতে পুরস্কার লাভ করিয়া বিদায় লইয়াছেন। আমরা যেন তাঁহার এই বিদায়কে স্বীকার না করি। তাঁহার নিজের কাছে যেমন, আমাদের কাছেও তেমনই ১৩ই আষাঢ় তাঁহার আবির্ভাবই অক্ষয় হইয়া থাক্। আমরাও যেন তাঁহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারি—

"মেঘের আড়ালে তেরই আষাঢ় চুপি চুপি চ'লে যায়;
অপরিচিতের মতন এবারও বিদায় দিবি কি তায়?
বার বার বার তেরই আষাঢ় এসেছে গিয়েছে চলি'
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন কথাটি না বলি'।

এবার সাধিবা শুধাও তাহারে কি চাহে সে বলিবারে,
জীবনে যাহারে করি নি স্মরণ, বরণ করহ তারে।
তারি বক্ষের সজল শ্বাসে ভরি' লহ তব বুক,
এই দিনটির দর্পণে দেখ সারা জীবনের মুখ।
আজিকার কালো, রবি-শশাঙ্কে হয় নি কলঙ্কিত,
কাল-সাগরের কৃষ্ণকমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত!
ঢল ঢল তার নির্মম শোভা সনির্বন্ধ ডাকে,
তারি গন্ধের মেদুর ছন্দে সকল গগন ঢাকে,
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হ'ল গুঞ্জনহীন
মর্মের কোষে তপন তারকা তারি মধুপানে লীন।
চিরকলঙ্কী ওরে কবি, তোর কী সৌভাগ্য বল,
এই দিনটির মৃণালে ফুটিল হেন সহস্রদল।
পেরেছিস কি রে চিনতে?
মরণ-কমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে
চেয়ে থাক্ চেয়ে থাক্
বন্দনাহীন অর্ঘ্যবিহীন নিশ্চল নির্বাক।

[১৩ আষাঢ় ১৩৫৮ তারিখে রচিত]

মানুষ যতীন্দ্রনাথ

(স্মৃতিকথা)

কবি যতীন্দ্রনাথ ছিল বে-সরকারী ইঞ্জিনীয়ার। প্রথমে যতীন নিজের জেলায় নদীয়া-জেলা-বোর্ডে চাকরি করত, তারপর কাশিমবাজার এস্টেটের ইঞ্জিনীয়ার হয়। কয়েক বৎসর নাটোর রাজ-এস্টেটের কাজও ঐ সঙ্গেই করেছিল। সে যা মাহিনা পেত তাতে সচ্ছলভাবেই তার মধ্যবিত্তের সংসার চ'লে যেত, বিশেষ সঞ্চয় করা সম্ভব হ'ত না। সে চারটি কন্যার বিয়ে দিয়ে গিয়েছে—তিনটি ছেলেকে উচ্চশিক্ষাও দিয়ে গিয়েছে। চুন-সুরকি নিয়ে সারাজীবন ঘাঁটাঘাঁটি করলেও তার দুটি হাতই ছিল নির্মল, পরিচ্ছন্ন, নিষ্কলঙ্ক। সে জন্য সে এর বেশি কিছু করতে পারে নি, যেমন—একজন ইঞ্জিনীয়ারের পক্ষে যা স্বাভাবিক—কোথাও নিজের একখানা বাড়ি, সে তা তৈরি ক'রে যেতে

পারেনি। অবশ্য তার প্রয়োজনও কিছু হয় নি। চাকুরে দুই ছেলেই কর্মস্থানে ভাল বাসা পেয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে এমন অক্ষুণ্ণ সাধুতার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। চাকুরির কাজে যতীন ছিল অসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠ। কর্তৃপক্ষ চিরদিনই যতীনকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, কখনও অধস্তন কর্মচারী মাত্র মনে করেন নি।

যতীন জনসংঘট্ট মোটেই ভালবাসত না। সে-জন্য সে যত দূর সম্ভব সভা-সমিতি এড়িয়ে চলত। কোন সাহিত্যগোষ্ঠীর মজলিসেও কখনও যোগ দিত না।

আমার বাড়িতে প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যায় রসচক্রের বৈঠক বসত। রসচক্র যখন ভাল ক'রে জ'মে ওঠে নি, তখন সে চক্রে প্রতি রবিবারেই যোগদান করত। তার 'কাব্য-পরিমিতি' রসচক্রেই প্রথম পঠিত ও আলোচিত হয়। রসচক্র থেকেই সাবিত্রীপ্রসন্নের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। তারপর যখন রসচক্রে ক্রমে সাহিত্যালোচনা মন্দীভূত হয়ে এল, তখন দু-একটা বৈঠকে সে এসেছিল। সে একদিন বললে—আমি ভেবেছিলাম, তোমার এটা ষোল আনা সাহিত্যের বৈঠক হয়ে উঠবে, এখন দেখছি এটা ছ আনার বৈঠক হয়ে দাঁড়াল। এতে সাহিত্যালোচনা আর তেমন হয় না, এ রসচক্র তোমার রঙ্গ-রসচক্র হয়ে পড়েছে এতে হাসি মস্করা রঙ্গব্যঙ্গ আর বাজে গল্প যতটা হয়, সাহিত্যের আলাপ ততটা হয় না। মিতে (যতীন্দ্রমোহন) ভালবাসে মাতালদের, আর তুমি ভালবাস পাগল আর ভাঁড়দের।

শরৎচন্দ্রের উদয়ে রসচক্র যখন আলোকিত, যতীন তখন রসচক্রকে একেবারেই বর্জন করল, অন্য সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করত। তবে রসচক্রের বাৎসরিক গার্ডেন-পার্টিতে সে যেত। সেখানেও সে টেকো নিয়ে এক কোণে ব'সে ব'সে সুতো কাটত, গল্প-গুজবে বা আমোদ-প্রমোদে যোগ দিত না।

খুব কম সাহিত্যিকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। যে দু-চারজন সাহিত্যিকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল, তা হয় যতীন্দ্রমোহনের 'ইলাবাসে' কিংবা তার নিজেরই বাড়িতে। দেশে তার অসংখ্য ভক্ত,

কিন্তু তাদের দু-চার জনের সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছিল, তাও তারা কবির বাড়ি গিয়ে আলাপ করেছিল ব'লেই। ভক্তদের সঙ্গেও তার আলাপ করবার আগ্রহ ছিল না। সে বলত—আলাপ হ'লে দুর্বলতাগুলো চোখে পড়বে, তাতে ভক্তিশ্রদ্ধা যেটুকু আছে সব উবে যাবে।

যতীন নিজে উদ্যোগী হয়ে গায়ে প'ড়ে কারও সঙ্গে আলাপ করে নি, কোন সাহিত্যিকের সঙ্গেও না, কোন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গেও না।

শুভার্থী যতীন্দ্রমোহন চেয়েছিলেন, যতীন্দ্রনাথ তাঁর মত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষক হোক। যতীন যতীন্দ্রমোহনের এ প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। যতীনদার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে নিতান্ত অনিচ্ছায় যতীন একবার সম্মতি প্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্তাব্যক্তির কাছে যতীনদা যতীনকে নিয়ে যান। আমিও সঙ্গে ছিলাম। কর্তাব্যক্তিটি ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য একটা আবেদন করতে বলেছিলেন। আবেদনের সময় উপস্থিত হ'লে যতীনকে আবেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। যতীন বললে—তুমি ক্ষেপেছ কালিদাস! দরখাস্ত ক'রে পরীক্ষক হতে যাব—সে বান্দা আমি নই। তা ছাড়া আমি শিক্ষা-বিভাগের লোক নই। মিতের পীড়াপীড়িতে কর্তৃপক্ষের একজনের কাছে গিয়েছিলাম। তার অনুরোধ এড়াতে পারি নি। মিতে এতদিনেও আমাকে চিনলে না। মিতের অনুরোধে এই রকম অনেক বার আমার স্বধর্মচ্যুতি ঘটেছে।

তারপর বিনা আবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একেবারে এম.এ. পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র রচনা ও পরীক্ষকতার আমন্ত্রণ এল। যতীন আমন্ত্রণপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে বললে—দেখ দেখি, এ কি বিপদ! আমি তোমাদের শিক্ষা-বিভাগের কার্যকলাপ কি বুঝি? আমার তো কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমি প্রত্যাখ্যান করব ভাবছি। তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে তো কিছু করতে পারি না। কি করব বল?

আমি আমার তৈরি কয়েক বৎসরের প্রশ্নপত্র যতীনকে দিয়ে বললাম—এগুলো প'ড়ে প্রশ্নের আকৃতি-প্রকৃতি ধরন-ধারণ বুঝতে

পারবে। তারপর একখানা প্রশ্নপত্র তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দাও। প্রত্যাখ্যান ক'রো না; খাতা না হয় নাই দেখবে।

যতীন ছিল অত্যন্ত শাণিতবুদ্ধির মানুষ, সে প্রশ্নপত্র রচনা ক'রে পাঠিয়ে দিল। বলা বাহুল্য, সে প্রশ্নপত্র ভালই হয়েছিল। তারপর যথাসময়ে পরীক্ষার খাতা এল। যতীন এসে বললে—ওহে, এ আবার নতুন বিপদ! একটাও যে পাস হয় না।

আমি বললাম—তুমি সাহিত্যিকের আদর্শে খাতা দেখো না, সহৃদয় শিক্ষকের আদর্শে খাতা দেখ। এম.এ. পরীক্ষা দিলেও এরা ছেলেমানুষ। এটা মনে রেখে সহানুভূতির সঙ্গে খাতা দেখো,—দেখবে সব পাস হবে।

যতীন ছিল গণিতের কৃতী ছাত্র। তার সকল কাজেই ছিল নিয়মানুবর্তিতা, পারিপাট্য, যথাযথতা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সুশৃঙ্খলা। কোন কাজ তার এলোমেলো হ'ত না। যে কেউ পত্র লিখুক, অবিলম্বে তার উত্তর দিত। যে পত্রের উত্তর দিতে হবে, সে পত্রখানি পাশে রেখে সে উত্তর লিখত।

এ বিষয়ে অনবধানতার জন্য সে বার বার আমাকে তিরস্কার করত। আমি চিঠিতে তারিখ দিতে ভুলে যাই এবং উত্তর দেওয়ার সময় পত্রখানা খুঁজে পাই না। সে-জন্য সকল কথার উত্তর দেওয়া হয় না। যতীন লিখত—আমি যে সব প্রশ্ন করেছি সবগুলোর উত্তর তোমার চিঠিতে নেই; আমার পত্র পাশে রেখে ভবিষ্যতে উত্তর লিখবে, পত্রে তারিখ দেবে এবং প্রতিপত্রে ঠিকানা লিখবে। তোমার কাজ বড় এলোমেলো। কলকাতার ঠিকানা কারও মুখস্থ থাকে না, এ কথা মনে রেখো।

তিরস্কৃত হয়ে তার প্রত্যেক পত্রে আমি তারিখ দিতাম। তাতেও বিপদ ছিল। যতীন একবার লিখলে—"তোমার ২রা মার্চ তারিখের পত্রে লিখেছিলে —, ২২শে মে তারিখের পত্রে লিখেছিলে —, আজকার পত্রে লিখেছ —, তিন পত্রের বক্তব্যের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাই না।"

যতীন কিছুকাল আগে একটা পত্রে লিখেছিল—"কেমন ক'রে শ্রদ্ধেয় প্রবীণদের চিঠিপত্র লিখতে হয়, তা আজকালকার অনেক

সাহিত্যিকই জানে না। অন্ত কাউকে শেখাতে না পার, গজেনকে অন্তত শিখিয়ে দিও। সে তোমার ছাত্রের মত। তবে তোমাকেও ভার দেওয়া ভুল। তোমার চিঠিতেও অনবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তোমার চিঠি গজেনের মত সংক্ষিপ্ত নয়। অন্তটা ঔদাস্তও থাকে না।"

যতীন ছিল গোঁড়া গান্ধীভক্ত। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে অনেক বই এবং মহাত্মার লেখাগুলি সবই সে যত্ন ক'রে পড়ত। সে ছিল গান্ধীতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ।

মহাত্মা গান্ধী যখন অনশনব্রত আশ্রয় করেছিলেন, সেই সময়ে টাউন-হলে শরৎচন্দ্রের বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল। এতে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে যতীন, আমি ও সাবিত্রীপ্রসন্ন খবরের কাগজে একটা আবেদন পাঠাই—তাতে উদ্যোক্তাদের আমরা অনুরোধ করেছিলাম, এ সময়ে শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনা স্থগিত থাকুক। সংবর্ধনা পণ্ড হয়েছিল, অবশ্য এই চিঠির জন্য নয়, সেদিন হিজলি-ডে ছিল ব'লে। কিন্তু শরৎচন্দ্র আমাদের উপরই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। আমাকে তিনি 'পাপেটে'র মধ্যে গণ্য ক'রে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন এক বছর ধ'রে নানাভাবে শরৎচন্দ্রকে প্রসন্ন করেছিলেন। শরৎচন্দ্র যতীনকে কিন্তু ক্ষমা করতে পারেন নি। যতীনের সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ ভাব বরাবরই থেকে গিয়েছিল, এর কারণ যতীন শরৎচন্দ্রকে প্রসন্ন করবার অমর্যাদা স্বীকার করতে রাজী হয় নি।

মোহিতলাল ছিলেন যতীন্দ্রনাথের কবিতার পরম ভক্ত। কিন্তু গান্ধীবাদ নিয়ে দুজনের রাজনীতিক মতের আদৌ মিল ছিল না। তা ছাড়া, সাহিত্যরস-বিচারেও দুজনের মতসাম্য ছিল না। যতীন মোহিতলালের রচনার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে পারত না। মধুসূদন, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সারস্বত সাধনা সম্বন্ধে মোহিতলাল যে সব প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখেছেন, সে সমস্তে অত্যুক্তি হচ্ছে ব'লে যতীনের ধারণা ছিল। যতীনের সঙ্গে মোহিতলালের জেনারেল প্রিণ্টার্সের ছাপাখানায় আকস্মিক ভাবে প্রথম (ও শেষ) সাক্ষাৎকারকালে যতীন এই মত প্রকাশ করেছিল। তাতে

মোহিতলাল যতীনকে মানুষ হিসাবে ভালবাসতে পারেন নি। উভয়ের দ্বিতীয় বার আর সাক্ষাৎ হয় নি। আমি আমার বাড়িতে দুজনের সাক্ষাৎ ঘটাবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছিলাম—যতীন কিছুতেই রাজী হয় নি। সে বলত—পত্রবিনিময় আছে, তাই তো ভাল। দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই নিরাপদ।

মোহিতলাল 'বঙ্গদর্শনে' যতীনের কবিতাবলী সম্বন্ধে তিন সংখ্যায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন ; 'কাব্যমঞ্জুষা'য় যতীনের সম্বন্ধে যে অকপট অকুণ্ঠিত প্রশংসামূলক মন্তব্য লিখেছিলেন তা অন্য কোন কবির ভাগ্যে ঘটে নি, 'বঙ্গদর্শনে'র বহু সংখ্যায় আদর্শ কবিতা ব'লে যতীনের অনেক কবিতা উৎকলিত হয়েছিল। যাঁর কাছে প্রশংসা অত্যন্ত দুর্লভ, তাঁর এত প্রশংসাতেও যতীন ভাবে গদ্‌গদ হয়ে ওঠে নি—কৃতজ্ঞতায় তার চরিত্রের প্রকৃতিস্থতা হারায় নি। এই ব্যাপারে দুজন কবির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়।

মোহিতলাল বলতেন—দুজনের চরিত্রে মিল তো কিছুই দেখি না, তবু যতীন্দ্রমোহন ও যতীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন গভীর বন্ধুত্ব হ'ল কি ক'রে?

আমি বলেছিলাম—যতীন্দ্রমোহনের উদার সহৃদয়তা ও অসামান্য গুণমুগ্ধতাই যতীন্দ্রনাথকে চির বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করেছিল। যতীন্দ্রমোহন যতীন্দ্রনাথের কবিজীবনে প্রথম আত্ম-সচেতনতা জাগিয়ে দেন, যতীন্দ্রনাথও তা কখনও ভুলতে পারেন নি।

দুজনের চরিত্র সম্বন্ধে মোহিতলালের খুব সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

যতীন আমাকে একবার বলেছিল—দেখ, অনেক তরুণ লেখক আমার লেখার প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে অন্যান্য কবিদের তুলনা ক'রে আমাকে লজ্জিত করে। আমার লেখা যখন অন্যান্য কবিদের লেখা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার ব'লে তারা স্বীকারই করছে, তখন তুলনার প্রয়োজন কি? তোমরা যে ধারায় লেখ সে ধারার লেখা নিকৃষ্ট—এটা মনে করবারই বা কি কারণ আছে? তুমি যদি আমার লেখা সম্বন্ধে কোন আলোচনা কর—কদাচ অন্য কবির রচনার সঙ্গে তুলনা ক'রো না। তুলনা ক'রে আমাকে উঁচু গাছে তুলে দিলে তার উঁচু ডালে ব'সে আমি কেঁপে মরি।

যতীন বলত—সাহিত্যিক হয়েছি ব'লে সাহিত্য ছাড়া অন্য ব্যাপারেও আমাকে ডাকাডাকি করলে আমি বিপদে পড়ি। সরস্বতীপূজো কার ব'লে আমাকে ষষ্ঠীপূজো, মনসাপূজো, শীতলাপূজোতেও ডাকলে চলবে কেন? সরস্বতীপূজোও আমি নিভৃতে করতে চাই—সর্বজনীন সরস্বতী পূজোয় পৌরোহিত্য করতে রাজী নই।

তিন বছর আগে বহরমপুর-জেলা-শিক্ষক-সম্মেলনে পৌরোহিত্য করতে গিয়ে যতীনের বাসাতেই উঠেছিলাম। সকালে উদ্যোক্তারা গাড়ি নিয়ে এল। তারা যতীনকে আমার সঙ্গে সভায় নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। যতীন কিছুতেই সম্মত হ'ল না। অনুরুদ্ধ হয়ে আমিও অনুরোধ করলাম। যতীন বললে, তোমাদের শিক্ষকদের ব্যাপারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমি অনধিকার-চর্চার পক্ষপাতী নই। তা ছাড়া সভায় গিয়ে ব'সে থেকে শোভাবর্ধনের চেহারা আমার নয়, তোমাদের সভার বাদানুবাদ শোনবার ধৈর্যও আমার নেই। আমি তার বাড়িতে অতিথি ও পরম বন্ধু হ'লেও তাকে সভায় নিয়ে যেতে পারি নি।

অতিথি-সৎকারে যতীনের কখনও ত্রুটি হ'ত না, বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করলে সে খুব খুশিই হ'ত। কিন্তু সে নিজে কখনও কারও আতিথ্য স্বীকার করত না। যে স্থানে নিকট-বন্ধু বা আত্মীয়জনও থাকত, সে স্থানেও সে মনিবের সরকারী কাজে গিয়ে ডাক-বাংলো কিংবা হোটেলে উঠত। তাকে এ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলেছিল—মহারাজা আমাকে হল্‌টেজ্ দেবেন, সে টাকা গাপ ক'রে আত্মীয়ের ঘাড়ে চাপ দেব কেন? আত্মীয়ের বা বন্ধুর খরচা করিয়ে ধনকুবেরের পয়সা বাঁচাতে যাব কেন?

যতীন বলত—যে কেউ বাড়িতে গেলেই মিতে তাকে কবিতা শোনায়। শুনেছি মোহিতবাবুও তাই করেন। এঁরা অধিকারী অনধিকারী বিচার করেন না। একজনের বাড়িতে গিয়ে সিঙাড়া সন্দেশ খেতে খেতে তার কবিতা শুনে সকলেই 'অপূর্ব' 'চমৎকার' 'ওয়াণ্ডারফুল' বলবে। তা শুনে এঁদের তৃপ্তি হয় কি ক'রে তাই ভাবি।

আমি বলেছিলাম—দুজন ঠিক এক উদ্দেশ্যে কবিতা শোনান না। লোকে তো কবিতা নিজে থেকে কেউ পড়ে না—কাজেই যতীন্দ্রমোহন বাগে পেয়ে নির্বিচারে সকলকেই কবিতা পড়িয়ে শোনান। ভরসা, কারও না কারও সত্যই ভাল লাগবে। কবি কবিতা শুনিয়ে একটা তৃপ্তি পান। প্রশংসাটা তাঁর উপরি-পাওনা।

আর মোহিতলাল যে কবিতা শোনান, তা নিন্দাপ্রশংসা শোনবার জন্য নয়, প্রশংসা করলে বরং তিনি পেট্রোনাইজিং জ্যাঠামি মনে করেন। মোহিতলালের কাছে কবিতা শুনে প্রশংসা করলে রীতিমত যুক্তি দেখাতে হয়—কেন ভাল লাগল, তা বলতে হয়। আমি তাই তাঁর কবিতা শুনে চুপ ক'রে থাকি। প্রশংসা করলে তিনি যুক্তি চাইবেন—যুক্তিগুলো তাঁর মনোমত না হ'লেই বিপদ।

তা ছাড়া, মোহিতলাল প্রধানত নিজেকেই শোনাবার জন্য কবিতা পড়েন—নিজের কান দিয়ে নিজের লেখার আর একবার পরখ ক'রে নেন। কেবল নিজের কবিতা নয়, অন্যের বহু কবিতাও তিনি আবৃত্তি ক'রে এবং প'ড়ে অপরকে শুনিয়ে আনন্দ পান, শ্রোতা উপলক্ষ মাত্র। তবে দুজনের এক বিষয়ে মিল আছে, দুজনেই চমৎকার আবৃত্তি করেন—কবিতার উৎকর্ষ অনেকটা সর্বাঙ্গসুন্দর আবৃত্তির উপর নির্ভর করে। চমৎকার আবৃত্তির দ্বারা তাঁদের কবিতার উৎকর্ষকে এমন কি মর্মার্থকেও শ্রোতার কাছে সুস্পষ্ট করা দুজনেরই উদ্দেশ্য।

যতীন বললে—কেউ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করলে আমি কবিতা প'ড়ে শোনাই না। আর মৌখিক সাধুবাদ আমি শুনতে চাই না। কোন আলোচনার প্রসঙ্গে যদি আমার কবিতার উল্লেখ দেখি অথবা কবিতার অংশ উদ্ধৃত হতে দেখি, তবেই আনন্দ পাই। অবশ্য সে উদ্ধৃতি লেখকের বক্তব্যের পক্ষে বেমানান বা বেখাপ্পা না হয়। এই ধর, 'বসুমতী'র একটা সাহিত্যরস-বিচারের প্রবন্ধে তোমাদের ডাক্তার শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমার একটা কবিতা তুলেছেন, তাঁর বক্তব্যের সমর্থনের উদ্দেশ্যে। ওই উদ্ধরণটাও বেশ অক্ষরে অক্ষরে সুসঙ্গত হয়েছে, তাঁর প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সেটার বেশ সামঞ্জস্য আছে। এতে আমি বড়ই

তৃপ্তি লাভ করেছি। আমি [illegible] লিখে আমার পরিতৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।... দল বেঁধে চা[illegible] যদি আমাকে অভিনন্দন দিত, তাতেও আমি এতটা খু[illegible] অভিনন্দনের অন্তঃসার-শূন্যতা তুমি তো ভাল ক'রেই জ[illegible]। তাই পরকে দাও, নিজে নাও না। অনেকের লেখায় আমার সম্বন্ধে অত্যুক্তি লক্ষ্য করেছি। অত্যুক্তি নিন্দাবাদেরই সহোদর।

আমার দুই কবিবন্ধুর জীবনধারা ছিল বিপরীতমুখী। মোহিতলাল ছিলেন সাহিত্যসর্বস্ব, সাহিত্যই ছিল জীবনের পরম ব্রত; সংসার সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। যতীন্দ্রনাথের সুষ্ঠুভাবে সাংসারিক জীবনযাত্রাই ছিল মুখ্য ব্রত, অবসরকাল বিনোদনের জন্য এবং সাংসারিক জীবনের পরমার্থকে কর্পূরবাসিত করবার জন্যই তার সাহিত্যসেবা। সাহিত্যের মাধুর্যের চেয়ে গার্হস্থ্যজীবনের মাধুর্য তার কাছে অধিকতর উপভোগ্য ছিল। যতীন্দ্রনাথ সাংসারিক জীবনের সকল কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা ক'রে মহাস্বস্তির শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

আমার কাছে যতীনের শেষ পত্র

24. 7. 54. P. O. Kharagpur-Technology.

ভাই কালিদাস,

সংগীতার চিঠিতে জানলাম তুমি উপস্থিত কিছু সুস্থ হয়েছ। আশা করি কর্মক্ষম হোয়ে পূর্বের মত ব্যস্ত আছ। তোমার সুস্থ থেকে কর্মক্ষম হওয়া যে কত দরকার তা বলবার কথা নয়; এখনও অনেক কর্তব্য বাকি। আমার শেষ কর্তব্য একরকম শেষ হয়েছে, অর্থাৎ নিজে জীবিত থেকে মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা।

অত্যন্ত অসুস্থ শরীরে এখানে এসেছিলাম, আশা ছিল এখানে যদি কিছু সুস্থ হই। কিন্তু ফল বিপরীত হোল, অতি কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলাম। একে হৃদ্‌রোগে সমস্তক্ষণ হাপরের মত হাঁপাই, তার উপর এই রোগ। সুতরাং আরোগ্যের সম্ভাবনা খুব কম। বাইরে থেকে কখনো মনে হয় কিছু ভাল, কিন্তু আমি বুঝছি এর সত্যকারের ভাল কিছু নেই। সকলকে কষ্ট দিচ্ছি ও কষ্ট পাচ্ছি। মনের অবস্থা বুঝবে অনুপূর্বার সম্পর্কে উদাসীনতা দেখে। গজেনদের লিখেছি আমার বাবা অনুপূর্বা সম্পর্কে কোন সাহায্য আর হবে না, তারা যা করবে তাই হবে।

তোমার যতীন

শ্রীকালিদাস রায়

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বঙ্গীয় বর্তমান শতাব্দীর [illegible] দশকের নবীন কবিতা ছিল মূলত রবীন্দ্রানুসারী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়— সেদিনকার-তরুণ এই কবিপঞ্চক সামান্য-লক্ষণে ছিলেন রবীন্দ্র-গোত্র, আনন্দপন্থী। তৃতীয় দশকে বাংলা-কাব্যে নতুন সুর শোনালেন মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মোহিতলালের দেহাত্মবাদ আর যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা-কাব্যে রবীন্দ্রানুসৃতির আত্যন্তিকতা-মুক্ত নতুন যুগের সূচনা হ'ল। 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কনিষ্ঠ কবি হিসাবে মোহিতলালের প্রথম দিককার রচনায় তবু ঐতিহ্যের ধারাটি দৃশ্যমান ছিল, 'স্বপন-পসারী'র কবি 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরলে' এসে তবেই তাঁর বলিষ্ঠ ভোগমোক্ষবাদের স্বকীয়তায় সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ একেবারে প্রথম থেকেই তাঁর দুঃখবাদে অচলপ্রতিষ্ঠ। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ এক স্পর্ধিত বিদ্রোহের রূপেই যেন বাংলা-কাব্যে আত্মপ্রকাশ করল। স্বাতন্ত্র্যে ও স্বকীয়তায় সমুদ্ভাসিত এক নতুন জীবনবোধ প্রথম-সমরোত্তর যুগচেতনায় স্পন্দিত হতে লাগল।

কিন্তু বাংলা দেশে, বিশেষত রবীন্দ্র-প্রভাবিত কাব্য-সংসারে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ আপাতদৃষ্টিতে অসুস্থ ও অস্বাভাবিক কবিমানসের সৃষ্টি ব'লেই মনে হয়। যেন নৈরাশ্যপীড়িত, দুঃখ-বাতিকগ্রস্ত এক উৎকেন্দ্রিক জীবন-চেতনা আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট কাব্যছন্দ আয়ত্ত ক'রে পরিহাসোচ্ছল হয়ে উঠেছে। তাই যতীন্দ্রনাথের কাব্যলোকে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁর দুঃখবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের উৎস তাঁর ব্যক্তি-পাক্ষিক জীবনবোধের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, কবি ব্যক্তিজীবনে দুঃখী মানুষ ছিলেন। কবি নিজেই বলেছেন, 'আমার কাব্যের দুঃখবাদ পারিবারিক জীবনের দুঃখ হইতে উদ্ভূত নহে।' অন্যত্র রসিকতার মাত্রা উচ্চগ্রামে চড়িয়ে তিনি বলেছেন,

'বাল্যের ম্যালেরিয়াই কুইনাইন দ্বারা অবদমিত হয়ে প
কাব্যরূপ গ্রহণ করেছে।' আসলে ব্যক্তি বা পরিবার-
এই দুঃখের বীজ উপ্ত না হয়ে থাকলেও সেখানে ক
জীবনের বিপুল পরিধির মধ্যে প্রসারিত হয়েছে, সেখানে
মহীরুহমূর্তি তাঁর প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। তাঁর দুঃখবোধ-
জীবনবোধের সঙ্গে হরিহরাত্মা। পৃথিবীর সেরা দুঃখবা
সর্বাগ্রগণ্য কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবনেও দুঃখে
অস্তিত্ব ছিল না, জীবনের দুঃখমূর্তির সাক্ষাৎ তিনি
ব্যক্তিসীমা অতিক্রম ক'রেই। সত্যেন্দ্রনাথও ব্যক্তিগত
সুখদুঃখের ক্ষুদ্র সীমা পেরিয়ে দ্রষ্টার আসনে ব'সে দুঃখের
করেছেন। তাই তাঁর কবিদৃষ্টিতে দুঃখের বিশ্বরূপদর্শন অ
সার্থক হতে পেরেছে। কবি তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গিতে বিভিন্ন
দুঃখবোধের উৎসমূলের কাব্যসংকেত রেখে গিয়েছেন।
"কেতকী" কবিতাটির ভাবগ্রন্থি মোচন করলে তার কি
পাওয়া যেতে পারে। মহানগরীর এক বাদল-সন্ধ্যায় ব
তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছে 'বৌবাজারের মোড়ে—যে
দোকানের পাশে কসাইয়ে মাংস থোড়ে।' সেখানে কি এ
বেদনায় কবিহৃদয় বিমথিত হয়ে উঠল। সেই বেদনার
করতে গিয়ে কবি সচেতন হলেন যে, যাকে তিনি বুকের
মনে করেছিলেন, আসলে তা হ'ল মালীর মাথায় ঝুড়িতে
দেড়-দুই কেয়াকুসুমের গুচ্ছ থেকে বিনির্গত বনকেত
বর্ষা-সন্ধ্যায় শহরের বুকে কেয়াফুলের সন্ধান পেয়ে ক
তারই একটিকে সংগ্রহ ক'রে এনে শয়নঘরের হুকে ঝুলিয়ে
গন্ধামোদিত সেই কাব্যিক পরিবেশে মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ
কিন্তু এক অদ্ভুত দৃশ্য কবির চোখে পড়ল। তাঁর মনে
লটকানো কেয়াফুল যেন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে

ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি!

কষিয়া কোমর বাঁধা,
ঘনকচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা।

কবি আক্ষেপের সুরে বলছেন :

সে হতে বন্ধু হায়,
—এমন-ঠাণ্ডা বাদল রাতেও জেগে ব'সে আছি ঠায়।
বনের বেদনা পথে বিকাইছে,—কি মোর কপাল-ভোগ—
গন্ধের লোভে কিনে এনে ঘরে ধরে অনিদ্রারোগ।
চোখে মুখে গায়ে কে যেন মাখায়ে দিয়েছে লঙ্কাবাটা,
বুকে ফুটে আছে কেয়ার গন্ধ, হাতে ফুটে আছে কাঁটা।

এ কবিতায় একই সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা ও কবিমানসের বিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়েছে। জীবন ও জগৎকে তিনি কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, কেতকীর রূপকে তারও পরিচয় এতে পাওয়া যাবে পুষ্পগন্ধ তাঁর হৃদয়ে আনন্দের বদলে কেন বেদনাই একান্ত হয়ে ওঠে তার কথা আরও স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত হয়েছে "পাষাণ-পথে" কবিতায় শহরের পাষাণে-বাঁধানো ফুটপাথে বকুলগাছ দেখে কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে—

কানন-রাণীর শিশু কন্যায় হরণ করিয়া কেবা
লোহার খাঁচায় মানুষ করিয়া করায় পথের সেবা?

এই প্রশ্নের সরণী বেয়েই কবির চেতনা সম্প্রসারিত হয়েছে জীবনের বুকে—

জ্যৈষ্ঠ দুপুরে শ্রেষ্ঠ শহরে পথ চলি আর ভাবি,—
কত-না বকুল দিল তার ফুল মিটাতে নরের দাবি!
কত না বকুল দিল তার ফুল, কত ফুল দিল গন্ধ!
দেবে-নরে মিলে ফুলের কপালে লিখে দিল সেবানন্দ!
ঘ্রাণ-লোলুপের করে প্রাণ সঁপা,—সেই তো চরম সুখ,
ফুল-জীবনের পরম স্বর্গ মিলন-মথিত বুক। * * *
প্রতি সন্ধ্যায় কোটি কুসুমের অকাল মরণ পাতি'
ঘরে ঘরে নামে যাঁটি স্বর্গীয় প্রেমের কামুক রাতি।

মানুষের ঘরে ঘরে 'প্রেমের কামুক রাতি' কাটাবার জন্যে পুষ্পশয়ন-রচনায় কোটি কুসুমের অকাল মরণের বেদনা কবি ভুলতে পারেন না। হাটে হাটে ঘুরে তিনি হাটের বুকে কেবল মাঠের ক্রন্দনই শুনতে পান,

কেন-না, সেখানেও ওই একই দৃশ্য—'কচি বুক হাটে সুলভ করিতে ফলে ফালা দিল চাকু!' শুধু হাটের বুকেই নয়, কবির দৃষ্টিতে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ওই একই সত্যের উন্মেষ—ভোগের উপকরণ-সৃষ্টিতে একজনের চোখের জলই আর একজনের আনন্দ-রসের উপাদান। 'খেজুর-চাষে'র রূপকে এই সত্য আরও বেশি বাস্তব রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। চাষীর দৌলতে চক্ষুষ্মান খেজুরগাছের চোখের জল কণ্ঠের নলি বেয়ে মাটির ভাঁড়ে সঞ্চিত হয়ে কখনও হচ্ছে নেশার রসদ তাড়ি, কখনও রসনারোচন 'নলিন গুড়'। খেজুর-বাগানের এই অশ্রুক্ষরা রস-রহস্যই কবির চোখে বিশ্বরহস্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে—

এ ধরণী ভরি' খেজুর গাছের আবাদ করিল কেবা?
নয়নের জল-জ্বাল-দেওয়া চিনি কোথা কে করিছে সেবা?
অবেলায় ঝরা অশ্রু তাহার ভাঁড় ছেপে গেঁজে ওঠে —
এ নেশার আশে কোন্ মাতালের অধরে হাস্য ফোটে।
মোদের এখানে খেজুর-বাগানে কেঁদে কেঁদে নিশি ভোর,
না জানি সেখানে হেসে খুন্ কোন্ রসখোর তাড়িখোর!

এই চোখের জলের মধ্য দিয়েই যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার স্বরূপ ধরা পড়েছে। বিশ্বের এই অশ্রু-ঝরানো বেদনাই কবিকে করেছে দুঃখবাদী।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদের বিপরীত কোটীতে রয়েছে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ। রবীন্দ্রনাথও দুঃখকে দেখেছেন, কিন্তু তাকে চরম সত্য ব'লে স্বীকার করেন নি। তা ছাড়া আনন্দমন্ত্রেই তিনি দুঃখজয়ের দীক্ষা নিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথের কাছে—

অতল দুঃখ-সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বজগতের রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর আনন্দ-সুন্দরের গীতি-বন্দনা করেন যতীন্দ্রনাথ তখন ভাবেন, বাহিরের এই প্রকৃতি-মায়াবিনী মানুষকে রাত্রিদিন বিপথযাত্রী করছে। গোধূলিলগ্নে রবীন্দ্রনাথের যখন মনে হয়, 'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে সোনার গগন রে', যতীন্দ্রনাথ তখন দেখেন 'রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা।' রবীন্দ্র-

নাথের বিভিন্ন পর্যায়ের প্যারডি-রচনার মধ্যেও আনন্দবাদ সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথের এই একই আপোসহীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ ও যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের মধ্যে এক শতাব্দীর ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথের চেতনার ভিত্তিমূলে রয়েছে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বলিষ্ঠ আশা ও অবিচলিত বিশ্বাস। যতীন্দ্রনাথের মধ্যে জন্ম নিয়েছে বিংশ শতকীয় অতৃপ্তি ও জিজ্ঞাসা, অবিশ্বাস ও বিদ্রোহ। স্কট জেমস তাঁর 'ইংরেজী সাহিত্যের পঞ্চাশ বৎসর' (১৯০০-১৯৫০) গ্রন্থে এই যুগের প্রারম্ভিক যুগ-লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন, "It was an exciting age for writers—an age which marked a definite break with the past, a challange to authority, an assertion of the right to be anarchistic in thought and form—romantic, realistic, passionate—a self conscious age when writers were intensely critical of the composition of society." আনন্দবাদের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহের মধ্যে এই বিংশ শতকীয় যুগলক্ষণই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ যুগের বাস্তব জীবনোপলব্ধিতে দুঃখই অধিকতর সত্য। তাই বাংলা-কাব্যে যখন যতীন্দ্রনাথ তাঁর দুঃখবাদ নিয়ে আবির্ভূত হলেন, তখন শুধু নতুন সুর ব'লেই নয়, এ যুগের মানুষের কাছে তা অধিকতর সত্য সুর ব'লেও সহৃদয় রসিকসমাজে সহজেই স্বীকৃতি ও সমাদৃতি পেল।

২

ব্যক্তিজীবনে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন এঞ্জিনীয়ার—বাস্তকার যন্ত্রবিদ্। জীবিকার সঙ্গে কবিজীবনের সম্পর্ক বিরোধে-মিলনে কি ভাবে কতটা ক্রিয়াশীল হয়েছিল সে সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কবির পরিহাসরসিক চিত্ত তাঁর ব্যক্তিজীবনের বৃত্তিকে ভাগ্যদেবতার নির্মম পরিহাস রূপেই গ্রহণ করেছিল। 'পথের চাকরি' এবং 'বনপ্রস্থ' কবিতায় তারই ইঙ্গিত রয়েছে। বন-বিভাগের চাকরি নিয়ে শালজঙ্গল পরিদর্শনে গিয়ে কবির মনে হয়েছে, 'অরণ্য হায় দারুভূত আজ বনবিভাগের বিপণি পণ্য।' কিন্তু দারুভূত অরণ্যের বুকে গিয়েও যন্ত্রবিদ্‌কে ছাপিয়ে উঠেছে

কবিসত্তা। তাই 'থাতা ও কিতা'র বেষ্টনী ভে
আরণ্যক চেতনার গভীরে। কবিকণ্ঠ গেয়ে উ

কালি রজনীতে স্বপ্নশঙ্কাসঙ্কোচ
নির্জ্জন বন-বাংলায়
আমি দেখেছিনু কোন্ শিখরচারিণী
বাঁকে বাঁকে টাল সামলায়।
আর শুনেছিনু কোন্ বনঘরণীর
হারা গাভী দূরে হামলায়।
ঘোর ঘনান্ধন্ন ঝঞ্ঝাপন্ন
গহনারণ্য বাংলায়।

এ সেই কবিকণ্ঠ যে আর এক 'শাওনরাতি'র
নতুন সুরসৃষ্টি ক'রে বলেছিল—

কান পেতে শোনো দেখি
গর্জ্জে শাবকহারা বাঘি

খলাই বাহুল্য, লোহা-লক্কড়-হাতুড়ি-ইস্পাতের
এ কবিকণ্ঠ তলিয়ে যাবার নয়। বরং কবি
তার নিজের কিছু কিছু উপকরণ এগিয়ে দিয়ে
শালায় বিশ্বকর্মকারের হাতুড়ির নীচে অগ্নিদাহ-
প্রাপ্ত জীবের নিয়তিকল্পনায় যন্ত্রবিদের প্রতী
রূপক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কবিজীবনে যন্ত্রবিদের
সন্ধান করতে হবে। বাস্তুকার যেমন ইমার
প্রাক্‌কল্পনা রচনা করেন এবং তারই নির্দেশ অ
একটি ইস্পাতকাঠামো গ'ড়ে তোলেন, যতীন্
দেখতে পাই তাঁর সমগ্র কবিজীবনের একটি প্রা
হয়েছে আর তারই ছকে ছকে গ'ড়ে উঠেছে
তাঁর সমগ্র কাব্যসৌধ সেই ইস্পাত-পঞ্জরেরই ি
কাব্যসৃষ্টির অনুরূপ ইতিহাস আর-কোথাও অ
নেই। যতীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিক্রমায় অন্তর্দৃ

সেখানে সূত্রাকারে যা ব্যক্ত হয়েছে, পরবর্তী
'মরমায়া', 'সায়ম্', এবং 'ত্রিষামা'র বিভিন্ন কবি
টীকা-ভাষ্য। কবিতা-রচনায় এই যন্ত্রবিদ্‌সম্মত
দুইই আছে। প্রথমেই মনে হবে, জীবনের চ
নব অভিজ্ঞতার আলোকে কবিমানসের যে বিবর্ত
পদ্ধতিতে তার সমান্তরাল কাব্যপ্রকাশের পথকে অ
কিন্তু কবিদৃষ্টি যদি ঋষিদৃষ্টি হয়, এবং কবিমান
প্রতীতিই যদি উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎস হয়, তা হ'লে
প্রগাঢ়তাই কাব্যরসিকের বরণীয় হবে। লক্ষ্য
যতীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠ প্রথম থেকেই বলিষ্ঠ ও প্রগাঢ়
প্রস্তুতিপর্ব পেরিয়ে একেবারে ধ্যানসিদ্ধ হয়েই
হয়েছেন, তাই তাঁর কল্পনা বা কাব্যপ্রকাশে কোথা
আভাসমাত্রও নেই। এই জন্যই যতীন্দ্রনাথের
বিলম্বিত। পঁয়ত্রিশ বৎসর পেরিয়ে তাঁর প্রথম কা
করেছেন। কিন্তু আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ক
স্বকীয়তায় কৌতূহলী পাঠকসমাজকে বিস্মিত ও বি

'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটিকে আমরা কবির জীবন
করেছি। তাঁর কাব্য-জিজ্ঞাসা সেখান থেকেই
ধ্বনিপ্রধান ছন্দবন্ধে সাতটি ঝোঁকে কবিতাটি সমাপ্ত
করা প্রয়োজন যে, এই ছন্দ এবং স্তবকগুচ্ছ রচনায়
যতীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা একটা স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল
'ঘুমের ঘোরে' কবিতায় পাই কবি আর তাঁর দেবত
[illegible] কবির অশ্রুক্ষরা রক্তোবেদনা ও স্রষ্টার

এসো ত বন্ধু, আবার আলিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা ;
তোমায় আমায় হয়ে যাক ছুটো কাটাছাঁটা সোজা কথা।
জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল থাম-খেয়ালী !

ভক্তেরা বলেন, এমন কথা উচ্চারণ করাও পাপ—'দেখিছ যেটারে ঠাওর করিয়া দেখ যেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম।' যুগে যুগে অব এসে মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তোমাদেরি তিনি চান।' উত্তরে কবি বলছেন, 'কি হবে কথার ভগবান চান—তবু হয় নাকো, এ কথা পাগল বলে ?' এ সম্পর্কে তাঁর কণ্ঠ আরও ব্যঙ্গভরা—

এমন স্রষ্টা, এমনি সৃষ্টি, হেন তার কৌশল,
এ-যুগে ও-যুগে এবেলা ওবেলা রিপড়িয়ে যায় কল !
নিজে এসে এসে ছদ্মবেশে যে ঠুকে ঠেকে দাও জোড়,—
ছদিন না যেতে 'চিল' হয়ে যায়, হেন বিদ্যার দৌড় !

আসলে, কবির দৃষ্টিতে, ভগবানও স্বয়ং অসক্ত অসহায়—

সাগরের কূলে পুরী তব, দারু-মূরতি জগন্নাথ,—
রথের চাকায় লোক পিষে যায়, তোমার নাহিকো হাত !
তুমি শালগ্রাম-শিলা,—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা !

তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে কবির মনে অন্ধ ভক্তির কোনও মোহ তাঁর দৃষ্টিতে এই সৃষ্টিও একটি বিরাট বন্দীশালা। 'আলো-আ গরাদে বসানো অনন্ত কারাগার।' সৃষ্ট জীবের কোনও স্বা নেই, আছে কেবল স্বাধীনতার ছলনা—

সীমা নাই যার, নাহিকো দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,
গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে ওরা ছোলা।
এ ব্যঙ্গ কিসে সহি ?
কয়েদে বখন—ব্যবস্থা করো—কয়েদীরই মতো রহি।

এই বিশ্বকারাগারে 'মরণপ্রবাহতাড়িত জীবনবিম্ব' পলকে উ আবার পলকেই মিলিয়ে যাচ্ছে। জীবনের স্বরূপ-ব্যাখ্যানে ক বলেন—

মিলন যেমন বিরহের ভয়ে মুখে মুখ বুকে বুক,
জীবন তেমনি মরণের ভয়ে হৃদয়ের ধুক্ ধুক্।
যত খুলে যায় পাক
মরণেরই দমে জীবনের ঘড়ি টিক্‌টাক্ ঠিক্ ঠাক্।

এই যদি জীবনের স্বরূপ হয়, তা হ'লে কবির বক্তব্য হ'ল—

মরণাতঙ্ক রোগে—
কি হবে গুনীর মিছে কাড়ফুঁকে কবির মুষ্টিযোগে?

সত্যসন্ধ কবি তাই 'সুখ-সন্ন্যাস' ও 'গেরুয়ার বিলাসিতা' দুঃখের নগ্নমূর্তিকেই ধ্যান করা অধিকতর সত্যনিষ্ঠ ব'লে দুঃখের মধ্যেই তিনি স্বস্তি পান, সুখের ছলনায় তাঁর অস্বস্তি কারণ তাঁর প্রতিমুহূর্তে মনে হয়—

আমার প্রমোদ-ভবনের তরে কারা হ'ল ভিটাহীন?
আমার দীপালি রাত্রি,
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবায়ে জীবন-বাতি।
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্য ছিন্ন শিশুকুসুমের কচি মুণ্ডের মালা!

সুখ আহরণে যদি এত দুঃখের সৃষ্টি হয়, তা হ'লে সে সর্বভাবে বর্জন করাই কবির কাছে শ্রেয়স্কর ব'লে মনে হয়েছে, ছাড়া এই সৃষ্টির মূলেই যে দুঃখ—দেবতাও স্বয়ং দুঃখময় মনে হয়েছে, দুঃখ-সঞ্জাত অশ্রুর দরিয়ায় ভাসমান বিরুদ্ধেও তাঁর অভিযোগের কোন অর্থ নেই।—

যার যাহা আছে, তাহা ছাড়া আর কি পারে সে পে
অপার দুঃখ তোমা হতে তাই ঝ'রে পড়ে চারিভিতে
হে বিরাট! তোমা হেরি যেন তব দুঃখের নাহি ও
চির- া ফুরায় না তবু অফুরান আঁখিলোর!
ওগো অক্ষয় বট!
যত বে.ড় যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।
তাই দাকাঁদি মাথা-কোটাকুটি সকল জগৎময়,

সকল দুখের খনি।
শিহরিয়া উঠে পরাণ, তোমার ব্যথার অঙ্ক গণি।

অর্থাৎ যে স্রষ্টা শুধু সমস্ত দুঃখের হেতুই নন, তিনি নিজেই সর্বজীবের দুঃখের বোঝা বহন ক'রে চলেছেন তাঁর প্রতি পরম সমবেদনাতেই যেন কবির চিরকালের একটা বোঝাপড়া হয়েছে। তাই তিনি বলেন, 'হে চিরদুঃখী! ব্যথার বাঁধনে ব্যথিতে করিলে বন্দী!' এই বেদনার সূত্রেই ব্যথিত কবির সঙ্গে তাঁর প্রাণবন্ধুর অপূর্ব রাখিবন্ধন হয়েছে। কবি অন্যত্র একে বলেছেন তাঁর 'দুর্ভাগবতগীতা'। দুর্ভাগা মানুষের ভাগবতচেতনার এই ভাবসংহত বাণীরূপটি বড় সুন্দর হয়েছে। আনন্দবাদে বিশ্বাসী ভক্তগণ কল্পনা করেন, এই বিশ্বের রাসমঞ্চে রসস্বরূপের সঙ্গে হ্লাদৈকময়ী এই সৃষ্টির নিত্য আনন্দলীলা চলছে। যতীন্দ্রনাথও তাঁর স্রষ্টাকে সৃষ্টির প্রেমে মর্ত্যবাসীর সংসারে ডেকে এনেছেন। দুঃখস্বরূপ তাঁর সৃষ্টির বুকে অপরিসীম দুঃখের মর্মান্তিক বেদনা প্রত্যক্ষ করছেন; কিন্তু প্রতিবিধানের সামর্থ্য তাঁর নেই, তাই পরম প্রেমে ও করুণায় তাঁর চোখের জলেরও শেষ নেই।—

বিশ্বের ক্রন্দনে বিচলিত নারায়ণ
আঁখি তাঁর অশ্রুতে ভরিল,—
গোলোকে হ'ল না ঠাঁই, শিবজটা বহি তাই,
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।

যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই হ'ল ভাগবতপ্রেমগঙ্গার মর্ত্যাবতরণের কাহিনী। এখানেই এসে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবোধ নৈরাশ্যবাদ বা pessimism-এর শ্বাসরোধী পরিবেশ থেকে এক নব ভাগবতপ্রেমের অশ্রুস্নাত বিশ্বাসের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে চিরমুক্তি-লাভ করেছে।

৪

উপরন্তু দুঃখবোধই যতীন্দ্রনাথকে দুঃখী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা দান করেছে, এবং এই পথেই দুঃখের বেশে কবির উপাস্য দেবতা কবিকে জীব-শিবের অভেদমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে গেছেন। যতীন্দ্রনাথ কবিধর্মে শৈব, তাঁর উপাস্য দেবতা শিব। কিন্তু সে শিব বৈদিক বা পৌরাণিক শিব নন। যিনি বাংলার চাষীর ঘরের দেবতা, তার

সুখদুঃখের শরিক, তার দুর্বহ জীবনের নিত্যসঙ্গী, তিনিই যতীন্দ্রনাথের পরমদেবত। এ দিক দিয়ে যতীন্দ্রনাথ এ যুগের জনচেতনায় প্রবুদ্ধ হয়েও আমাদের সহস্র বৎসরের লোকসংস্কৃতির মর্মলোকে তাঁর কবিকল্পনাকে অনুবিষ্ট ক'রে রেখেছেন। 'মরীচিকা'তেই কবির শৈবচেতনার উন্মেষ ঘটেছে 'শিবের গাজন' কবিতায়। কিন্তু 'মরুশিখা'র শিবস্তোত্রে 'ব্যথার দেবতা'রূপেই কবি তাঁর আপন শিবকে চিনতে পারলেন—

কত মরণের স্মরণ গাঁথিয়া পরেছ হাড়ের মালা,
কটির কাপড় দিয়েছ ফেলিয়া—না জানি সে কত জ্বালা!
বেছে বেছে তুলে ধুতুরার ফুলে ভরা বসন্ত-রাতে,
কি জানি কি মনে ভ্রমো হে কিশোর ভূত-ভুজঙ্গ সাথে!
সুরের জনম যার কণ্ঠে, সে বেণু-বীণা তেয়াগিয়া
সাধারণ দুখে কাটায় কি দিন শিঙা ডুগডুগি নিয়া?
কি জ্বালা ভুলিতে, জ্ঞানের আকর, ধরেছ ভাঙের নেশা?
অন্নপূর্ণা-পতি কম দুখে ভিক্ষা করে নি পেশা!

কিন্তু এখানেও শিব দেবতা হয়েই রয়েছেন। 'সায়ম্'-এর 'কচি ডাব' কবিতায় দেবতা একেবারে মানুষের বেশেই দেখা দিয়েছেন। দুঃখের মহাদেবমূর্তিকে কবিও অমন বাস্তব রূপে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। শুধু উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার নিদর্শন হিসাবেই নয়, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের সার্থক পরিণাম হিসাবেও কবিতাটি কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। অঘ্রাণের শীত-সন্ধ্যায় কবির দ্বারদেশে এক বৃদ্ধ মাথায় এক-ঝাঁকা ডাব নিয়ে কচি ডাব ফিরি করতে এল। কবি ভাবছেন, দরিদ্রপল্লীর সংকীর্ণ গলিপথে যখন 'উদরে উদরে অন্নাভাব' তখন এই নিদারুণ শীতে কচি ডাব কেনার বাতিক হবে কার?—

কাঁদিয়া কহিল বুড়া— 'তুমি মোর বাপ খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,
বারেক নামায়ে বোঝা মাজাটা করিব সোজা,
ডাব তুমি নাও বা না নাও।'

কবি এই বিপন্ন বৃদ্ধের ঘাড় থেকে ঝাঁকার ভারই শুধু নামালেন না, ন্যায্য মূল্য চুকিয়ে ডাব কটিও কিনে নিলেন। কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে

গণ্ড ভিজিয়ে খালি ঝাঁকা মাথায় নিয়ে বৃদ্ধ গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। কপালে করাঘাত ক'রে কবি ভাবছেন, তাঁর ভাগ্যদেবতা তাঁর কপালে এ কি নিয়তি লিখে দিয়েছেন!—

মোর ভাগ্যে এহেন দুর্ভোগ!
অপরের কাব্যভালে মিলাও ত কালে কালে
অনুকূল কত না সুযোগ!
সেসব কবির বেলা,— শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পসারিণী,
তনুদেহে সিক্তবাস, নয়নে মিনতি-ফাঁস,
ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।
আরো ভাগ্যবান যিনি আসে তাঁর পসারিণী
কোমল করুণ ক্লান্তকায়,
"শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব—"
সাধে কবি সমবেদনায়।

আর এ কবির ভাগ্যে এল এক বৃদ্ধ ডাবওলা। তাও বৈশাখী দুপুরে নয়, একেবারে শীতের সন্ধ্যায়। তবু হায়, 'মিটাতে প্রাক্তন দেনা' কবিকে ডাব কিনতেই হ'ল, অথচ ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে, গৃহে একখানি কাটারি পর্যন্ত নেই! কবি যখন এই ভাবে নিয়তিকে ধিক্কার দিচ্ছেন, তখন অকস্মাৎ তাঁর চোখে দিব্যদৃষ্টি উদ্ভাসিত হ'ল—

দারুণ শীতের সাঁঝ, হে আমার নটরাজ,
কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে?
অশ্রুর সাগরমন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ
ভাগ্যে ফিরাই নি একেবারে।
শীতাতপে দিগম্বর, দিশাহীন পথচর,
দেহ টলে ক্ষুধার বেশায়,
অন্তর-শ্মশানে চিতা সারি সারি নির্বাপিতা,
তাহারি বিভূতি ফুটে গায়।

'অশ্রুর সাগরমন্থ' এই নীলকণ্ঠই কবির উপাস্য দেবতা। বিশ্বের নিঃস্ব ও বঞ্চিত মানুষের দলে কবি নিজের স্থান খুঁজে পেয়েছেন ব'লে দুঃখের দেবতা তাঁকেই প্রিয়ভক্ত ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছেন,—

যে মোহিনী স্বর্গটাটে পাতে পাতে সুধা বাঁটে,
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,
হে মোর বঞ্চিতরাজ নিঃশেষে বুঝেছি আজ—
আমি যে তাদেরি একজনা।
তাই তুমি নামাইলে আমার অন্তরতলে,
আমার দুয়ারে আঙিনায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসো, কাঁদি ব'লে ভালোবাসো,
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায়।

নিখিল-ভরা দুঃখের অশ্রু-দরিয়ায় দেবতা ও মানুষে অমন আত্মীয়তার কথা, কবিকণ্ঠে অমন দরদ-মাখানো সুরে এর পূর্বে আর কখনও শোনা যায় নি। এ জীবে-দয়া নয়, করুণাভরে দরিদ্রের দুঃখহরণের সেবাব্রতও এ নয়, দুঃখকে চরম সত্য জেনে, দুঃখী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃখের মধ্যেই দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা—এ যুগের জীবন-চেতনার উপর তোলা এ এক অপূর্ব অশ্রুভাগবত।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিস্বভাব ও কবিধর্মের মর্মকথা বলা হ'ল। এবার তাঁর কবিত্বকলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আলোচনা শেষ করব। কাব্যের প্রসাধনকলায় যতীন্দ্রনাথ অতিসূক্ষ্ম সৌকুমার্যকে যেন অবজ্ঞা ভরেই অবহেলা ক'রে চলেন। প্রগাঢ়কণ্ঠ কবি তিনি, ভাবে ও ভাষায় বলিষ্ঠতার পূজারী। কিন্তু সাহিত্যের সুভাষিত-রত্নভাণ্ডারে তাঁর দান নগণ্য নয়। বিশুদ্ধ কবি-কল্পনা ও কাব্য-সৌন্দর্যের কয়েকটি উদাহরণ তাঁর কাব্যলোক থেকে সংগ্রহ করা যাক—

লোকের ক্ষেতে নূতন চাবাগুলি
সবুজ, যেন টিয়ে পাখীর পাখা। [চাষার বেগার]

চিক্কণ কালো জলে,
মুমূর্ষু আলো আহত কৃষ্ণসর্পের মত চলে। [মৎস্য-শিকার]

শোণিতগন্ধী মহাপ্রান্তরে বিষাদ অন্ধ রাতি। [শরশয্যায় ভীষ্ম]

মাঘের প্রভাত
উষাস্নান সারি ছাড়িছে কুহেলি-শাড়ি
পূর্বানদীতটে। চম্পাপীত কৃষ্ণনয় বুকে

ঘুরায়ে জড়ায়ে নিল জরীর আঁচল,
স্মিতমুখে চ'লে গেল
আলোকের অন্তরাল পথে। [জংশন ষ্টেশনে]

নৃত্যপর নটেশের ডমরুর মতো
চলেছে সাঁওতালী মেয়ে নাচিয়া গাহিয়া
দোলায়ে কঠিন তনু মুঠিম কটিতে। [জংশন ষ্টেশনে]

পথপার্শ্বে মলিন দোকানে, স্বর্ণশালে,
কাঁপে পাণ্ডু দীপশিখা,
অগ্নিস্নাত অঙ্গারিকা
পাংশুমুখে ছাড়ে কালো শাড়ি। [রূপ কোথা আছে]

সত্যেন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে যে স্বকীয়তা ছিল, উদ্ধৃত পংক্তিগুলি তারই উদাহরণ। কিন্তু যেখানে তাঁর দুঃখবোধ বক্রোক্তিতে বিদীর্ণ হয়েছে, সেখানে তাঁর বাণীপ্রকাশে এসেছে অবিস্মরণীয় ব্যঞ্জনা।—

প্রাণের দুঃখ না যাক কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ। [ঘুমের ঘোরে]

যত তেজই হায় থাক অনলের পোড়াতে পারে না ছাই। [শরশয্যায় ভীষ্ম]

যন্ত্রে যে জনা মরে,
সবযজ্ঞশাস শোভার তারিফ্ সে বাবদে কে বা করে? [দুঃখবাদী]

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি। [ঘুমের ঘোরে]

এ ধরা গোরস্তান,—
মরণের ভিতে মরণের টিপি দুদিনে ভূমি-সমান। [ঘুমের ঘোরে]

এই ধরনের সংক্ষিপ্ত-ভাষণগুলি প্রাজ্ঞোক্তিরূপে জাতির প্রবাদ-বচনের অঙ্গীভূত হবার যোগ্য। কিন্তু যেখানে কবির ভক্তকণ্ঠ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় দেব-পরিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে, সেখানে কবি যেন পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন।—

চার হাত খাড়া মানুষে ভরিয়া সাড়ে তিন হাত ঘরে
কৌতুক দেখ কেমনে নিয়ত মাথা ঠুকে ঠুকে মরে। [ভক্তির ভারে]

পুথি দিয়ে দেওয়া অন্ন
গোরু মেরে জুতা দান' অপেক্ষা নহে কভু বেশি পুণ্য। [ঘুমের ঘোরে]

(২১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

অন্য দৃশ্য। প্রাসাদদুর্গের অপর এক কক্ষ

[অনুচর-বেষ্টিত রাজার প্রবেশ]

রাজা। লোক পাঠায়েছি তারে করিতে সন্ধান,
আর, মৃতদেহ কোথায় জানিতে।
এ মানুষ যদি ছাড়া থাকে, হবে সাংঘাতিক।
তবু তারে পূর্ণ শাস্তি দেওয়া চলিবে না।
নির্বোধ প্রজার দল ভালবাসে তারে,
তাদের বিচার শুধু চোখের নজরে।
অপরাধ যাই হোক,
কোন্ উত্তেজনাবশে অপরাধী করে হেন কাজ
তাই দেখে তারা। সব দিক বজায় রাখিতে,
দেখাতে হইবে যেন বহু চিন্তা করি
প্রবাসে পাঠানু তারে।
উৎকট ব্যাধিতে দিলে উৎকট ঔষধ
উপশম হ'লে হতে পারে।

[রোজেনক্রান্জের প্রবেশ]

কি গো, কি খবর ?

রোজেন। মৃতদেহ কোথা রেখেছেন
কিছুতে গেল না জানা।

রাজা। সে কোথায় ?

রোজেন। বাহিরে প্রহরাধীন ভবদীয় অনুমতি লাগি।

রাজা। নিয়ে এস হেথা।

রোজেন। গিলডেন্স্টার্ন, কুমারকে নিয়ে এস।

[হ্যামলেট ও গিলডেনের প্রবেশ]

রাজা। হ্যামলেট, পলোনিয়স কোথায় ?

হ্যাম। ভোজনে।

রাজা। ভোজনে! কোথায় ?

হ্যাম। ভোজন তিনি করছেন না, তাঁকে ভোজন করা হচ্ছে।

কতকগুলি বিচক্ষণ কীটসংঘ তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত আছে এখন। আমরা অপরাপর জীবকে মোটা করি নিজে মোটা হতে, আর নিজে মোটা হই কীটসংঘের পুষ্টিবিধান করতে। মোটা রাজা আর রোগা ভিক্ষুক একই খানায় পৃথক পাত্রে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পরিণাম তো এই!

রাজা। ছি-ছি!

হ্যাম। রাজা-খেকো পোকার টোপে আমরা মাছ ধরি, আবার পোকা-খেকো মাছ ধ'রে আমরা ভোজন করি।

রাজা। কি সব বলছ?

হ্যাম। বলছি, রাজাদের শোভাযাত্রা কেমন ক'রে ভিক্ষুকের পাক-স্থলীর মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে।

রাজা। পলোনিয়স কোথায়?

হ্যাম। স্বর্গে। সেখানে লোক পাঠান। আপনার দূত যদি সেখানে তাঁকে না পায়, আপনি স্বয়ং স্থানান্তরে সন্ধান করুন। তাতেও যদি এক মাসের মধ্যে তত্ত্ব না মেলে, তবে বৈঠকখানায় যেতে যে সিঁড়ি ভাঙতে হয়, সেখানেই ঘ্রাণ পাবেন।

রাজা। (কতিপয় অনুচরের প্রতি) যাও, সেইখানে সন্ধান কর।

হ্যাম। কোন ভয় নেই, পালাতে পারবে না।

[অনুচরগণের প্রস্থান।

রাজা। হ্যামলেট, যে কাজ করেছ তারি তরে
একান্ত সন্তপ্ত মোরা;
তবু তব নিরাপত্তা কাম্য আমাদের।
শুধু তারই লাগি
তোমারে পাঠাতে হবে সুদূর প্রবাসে।
প্রস্তুত হইয়া লহ,
ঘাটে লাগিয়াছে তরী, বায়ু অনুকূল,
সঙ্গীরা প্রস্তুত আর সবই ঠিকঠাক
ইংলণ্ডের অভিমুখে।

হ্যাম। ইংলণ্ডের অভিমুখে?

রাজা। তাই, হ্যামলেট।

হ্যাম। উত্তম।

রাজা। সত্যই উত্তম,
যদি মোদের উদ্দেশ্য বুঝে থাক।

হ্যাম। দৈববাণী শুনে সব বুঝেছি; ইংলণ্ডের অভিমুখে। তা হ'লে স্নেহময়ী মাতা, বিদায় দাও।

রাজা। স্নেহময় পিতা বল হ্যামলেট।

হ্যাম। আমার মাতা। পিতা ও মাতা, স্বামী ও স্ত্রী; স্বামী ও স্ত্রী একদেহ; তা হ'লেই হ'ল আমার মাতা। চল মন ইংলণ্ডের অভিমুখে। [প্রস্থান।

রাজা। শীঘ্র পিছু পিছু যাও; দেখো যেন
জাহাজে উঠিতে তিল বিলম্ব না করে,
আজই রাত্রে স্থানান্তরে পাঠাইতে চাই।
যাও যাও, এ ব্যাপারে যা যা প্রয়োজন
সমস্তই যথাযথ ব্যবস্থা হয়েছে।
তোমরা ক'রো না আর দেরি।

[রোজেন ও গিল্‌ডেনের প্রস্থান]

তা হ'লে ইংলণ্ড!
যদি না ভুলিয়া থাক মোর পরাক্রম
আমার প্রীতির মূল্য অবশ্যই দিবে।
আশা করি, এত শীঘ্র যায় নি মিলায়ে
দিনেমার-অসিক্ষত তব অঙ্গ হতে,
এখনো ভুলে নি চিত্ত
যোগাতে ভয়ের রাজকর।
তাই যদি হয়, ঠেলিতে পারিবে নাকো
অভিপ্রায় মোর; হ্যামলেটের হত্যা তরে
যথাযথ দিয়েছি নির্দেশ তোমা।
ইংলণ্ড, পুরাও অভিলাষ;

ব্যাধির প্রদাহ সম জ্বলিছে সে রক্তে মোর,
তুমি পার নিরাময় করিতে আমারে।
তাহা নাহি হয় যতক্ষণ
পাব না জীবনে আমি আনন্দের কোন আস্বাদন।
[প্রস্থান]

৪র্থ দৃশ্য। ডেন্‌মার্কের এক প্রান্তর

[ফর্টিনব্রাস, জনৈক কাপ্তেন ও সৈন্যদলের প্রবেশ]

ফর্টিন। জানায়ে ডেনমার্ক-রাজে যথাযোগ্য সম্ভাষণ মম
কহিবে তাঁহারে—পূর্ব অঙ্গীকারক্রমে
অনুমতি চাহে ফর্টিনব্রাস
এ রাজ্যের মধ্য দিয়ে সৈন্য নিয়ে যেতে।
মোদের গন্তব্য তুমি জান।
যদি রাজা মোর সহ চাহেন সাক্ষাৎ,
অবশ্য ভেটিবে তাঁরে বিহিত বিধানে।
সব কথা জানাইবে তাঁরে।

কাপ্তেন। যথা আজ্ঞা।

ফর্টিন। যাবে সন্তর্পণে। [ফর্টিনব্রাস ও সৈন্যদলের প্রস্থান]

[হ্যামলেট, রোজেন, গিল্‌ডেন প্রভৃতির প্রবেশ]

হ্যাম। মান্যবর মহাশয়, কার সৈন্য এরা?

কাপ্তেন। নরোয়ের সৈন্যদল।

হ্যাম। কি উদ্দেশ্যে কোথা যায়, শুনিতে কি পাই?

কাপ্তেন। পোলাণ্ডের একাংশ করিতে আক্রমণ।

হ্যাম। কে এদের সেনাপতি?

কাপ্তেন। নরোয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, নাম ফর্টিনব্রাস।

হ্যাম। সমস্ত পোলাণ্ড রাজ্য করিবারে জয়,
অথবা সীমান্তবর্তী স্থান?

কাপ্তেন। কহি তবে বাহুল্যবর্জিত সত্য কথা।
আমরা চলেছি সেথা জিনিয়া লইতে

অতি ক্ষুদ্র এক খণ্ড জমি,
নাম ছাড়া অন্য কোন লাভ নাই তাতে।
পাঁচ টাকা জমা তার হয় কি না-হয়;
কি নরোয়ে কি পোলাণ্ড,
এর বেশি মূল্য কেহ দেবে না কোথাও।

হ্যাম। তা হ'লে তো পোলীয়েরা বাধাই দেবে না।

কাপ্তেন। বলেন কি? দুর্গসম রক্ষিছে তাহারা।

হ্যাম। দু হাজার প্রাণ আর বিশ হাজার টাকা
ঢেলে দিতে হবে তবে এ তুচ্ছের পিছে!
ধনের ও নিষ্কর্মার প্রাচুর্য যেখানে
সেখানে এমনই হয়,
অন্তঃস্থ স্ফোটক যথা ফাটিয়া ভিতরে
নাশে প্রাণ, হেতু তার না পায় প্রকাশ।
ধন্যবাদ করুন গ্রহণ।

কাপ্তেন। কুশল হউক আপনার। [প্রস্থান]

রোজেন। চলুন কুমার।

হ্যাম। এখনই যেতেছি আমি,
কিছু আগে চল না তোমরা।

[হ্যামলেট ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

যা কিছু ঘটনা ঘটে, আমারেই করে অপরাধী;
মন্দীভূত প্রতিহিংসা মোর
তারই পিঠে লাগায় চাবুক।
মানুষের কিবা মূল্য?
সময়কে পণ্যরূপে গোহাটায় এনে
সে যদি কাটায় তাহা ভোজনে নিদ্রায়
পশু ভিন্ন কি তারে কহিব?
পূর্বাপর চিন্তা করিবার
এত শক্তি এত বুদ্ধি দিয়ে

যে জন স্থ
নিশ্চয় সে
পচায়ে দুর্গ
এত দৈবদ
পশুচিত নি
চুল-চেরা
করেছে নি
এ মনোভ
তিন ভাগ
বেঁচে থে
'এ কাজ
অথচ সে
হেতু, ইচ্ছ
সকলই র
দৃষ্টান্ত মা
নিয়ত কা
দেখ না চ
সুকুমার
দুরাশায়
ভবিষ্যতে
দুর্দিন, বি
চলেছে
গজভুক্ত
বৃহৎ কার
মহত্তেরই
কিন্তু যদি
এক গোট
তা হ'লে

পিতা যার হত, যার মাতা কলঙ্কিতা,
বক্ষের শোণিত তার উঠিল না ফুটি,
ঘুমায় সে অকাতরে ? ধিক মোরে,
আসন্ন মৃত্যুর মুখে
ছুটে ওই বিশ হাজার প্রাণ
সামান্য খ্যাতির মোহে, খেয়ালের বশে
আরাম লভিতে ছুটে সমাধি-শয়নে।
যে ভূমির তরে এরা করিবে সংগ্রাম
দু পক্ষের সৈন্যবল আঁটে না সেথানে,
মৃতদেহ ঢাকিবারও স্থানটুকু নাই।
আজি হতে অন্তরের সংকল্প আমার
রক্তে রাঙা হোক, নহে যাক ছারেখার [প্রস্থান]

৫ম দৃশ্য। দুর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষ

[রাণী, হোরেসিয়ো ও এক ভদ্রলোকের প্রবেশ]

রাণী। নাহি চাই তার সাথে সাক্ষাৎ করিতে।
ভদ্রলোক। সে এক নাছোড়বান্দা, পাগলেরই মত ;
দশা দেখে খুবই দুঃখ হয়।
রাণী। কি চায় সে ?
ভদ্র। কহিছে পিতারই কথা তার।
সে শুনেছে এ জগৎ ছলনায় ভরা,
কাঁদে আর বুক চাপড়ায়।
লাথি মেরে পথতৃণে
কহে এলোমেলো কথা, অর্থ বুঝা ভার।
অসংলগ্ন সে কথায়, অঙ্গভঙ্গী দেখে,
মনে হয় পেতেছে সে দারুণ বেদনা
যদিও তা অস্পষ্ট অস্ফুট।
হোরে। কিছু কথা কহাই তো ভাল।

না হ'লে তাহার দশা নিন্দুকের মুখে
জাগাইতে পারে নানা কুৎসার রটনা।

রাণী। ভিতরে আসিতে বল। [হোরেসিয়োর প্রস্থান]
অপরাধী চিত্তে মোর
প্রতি তুচ্ছ গড়ি তুলে দুর্দৈব-সূচনা।
সতত সন্দিগ্ধচিত্ত অপরাধ, তাই
যত তারে চেপে রাখি ততই ছড়াই।
[ওফেলিয়া ও হোরেসিয়োর প্রবেশ]

ওফে। ডেনমার্কের মহারাণী কোথা ?

রাণী। কেমন আছ গো ওফেলিয়া ?

ওফে। (গান) আরও পাঁচটার মাঝে তোমার সাঁচ্চা প্রেম
কেমনে চিনিব বল তায় ?
গেরুয়া জড়ায়ে মাথে চলে সে দণ্ড হাতে
কাঠের পাদুকা দুই পায়।

রাণী। হা রে বোকা মেয়ে,
এ গানের মানে কিছু আছে ?

ওফে। মানে জানতে চাও ? মন দিয়ে শোন।—
(গান) চুকে বুকে গিয়েছে সে,
হায় গো মেয়ে হায় !
সবুজ ঘাসের চাপড়া শিরে
পাথর চাপা পায়।

রাণী। কিন্তু ওফেলিয়া—

ওফে। শোন গো শোন—
তুষার সম সাদা চাদর—
[রাজার প্রবেশ]

রাণী। দেখ প্রভু, কি দুর্দশা !

ওফে। (গান) তুষার সম সাদা চাদর
ঢাকা ফুলের ভারে,

মাটির তলে গেল গ'লে
প্রেম-অশ্রুধারে।

রাজা। কেমন আছ কন্যা?

ওফে। ভাল, ভগবান আপনার ভাল করুন। লোকে বলে, রুটি-ওয়ালার মেয়ে ঠাকুরের শাপে প্যাচা হয়ে গেল। অদৃষ্টে যে কি আছে তা তো জানা নেই। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

রাজা। নিজের পিতার মৃত্যুই ভাবছে।

ওফে। ও-কথা বলবেন না; লোকে যদি শুধায়, কারণ কি, তা হ'লে বলবেন—

(গান) শিব ঠাকুরের দিবস যে কাল
উঠব ভোরে ভোরে,
তোমার সাথে জোড় মেলাতে
জুটব তোমার দোরে।

রাজা। কতদিন এমন হয়েছে?

ওফে। আশা করছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। ধৈর্য ধরা চাই। কিন্তু আমি যে না কেঁদে থাকতে পারি নে। শেষে ঠাণ্ডা মাটিতে শুইয়ে দিল। আমার ভাই তো জানতে পারবে। আপনাদের ধন্যবাদ। চল চল, তা হ'লে বিদায়! মায়েরা সব বিদায়, বিদায়!

রাজা। সাথে সাথে যাও,
সাবধানে লক্ষ্য কর তারে।

[হোরেসিয়োর প্রস্থান]

গভীর শোকের বিষক্রিয়া;
পিতার এ অপঘাতই কারণ ইহার।
গার্ট্রুড, গার্ট্রুড, দুঃখ যবে করে আক্রমণ
আসে না সে গোপনে একাকী,
দলে দলে পাঠায় বাহিনী।
প্রথমত পিতা তার হইল নিহত,
তার পরে, চ'লে গেল তোমার তনয়

আপনার কৃতকর্মে লভি নির্বাসন।
পলোনিয়সের মৃত্যু লাগি
নানা চাপা কথা আর দূষিত চিন্তায়
সন্দেহে আবিল সব প্রজাদের মন ;
আমরাও দিই নি বুদ্ধির পরিচয়
তাড়াতাড়ি সেরে দিয়ে অন্ত্যেষ্টি তাহার।
যে জ্ঞানের অভাবেতে
মানুষ পুতুল কিংবা পশু হয়ে যায়
হতভাগ্য ওফেলিয়া হারাল সে জ্ঞান।
সর্বশেষে সব হ'তে দুঃসংবাদ দেখ,
ফ্রান্স ছেড়ে লেয়ার্টিস ফিরিয়া গোপনে
একেবারে দিয়েছে গা-ঢাকা,
যত মক্ষিকার দল পিতৃহত্যা ল'য়ে
তার কানে সতত গুঞ্জিছে কুমন্ত্রণা,
রটাইছে মোর নামে কুৎসা নানাবিধ।
প্রিয়তমে গার্ট্রুড, এই শতগ্লীতে
অনিবার্য মরণ আমার।

[ভিতরে কোলাহল]

রাণী। ও কি, কিসের ও গোলযোগ ?
রাজা। কোথা মোর বৈদেশিক দেহরক্ষী দল ?
দ্বার রক্ষা কর।

[একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ]

ব্যাপার কি ?
ভদ্র। আত্মরক্ষা করুন রাজন।
মহাসিন্ধু তীর ছাপি বেলাভূমি ভাসায় প্লাবনে,
তা হতে অধিক ক্ষিপ্র যুবা লেয়ার্টিস
আক্রমিল তব রক্ষীগণে
সাথে ল'য়ে বিদ্রোহী জনতা।

ইতরেরা বলে কিনা সে তাদের প্রভু ;
জগৎ-বিধান যেন সবে শুরু হ'ল,
সনাতন ব'লে কিছু নাই,
রীতিনীতি মিথ্যা কথা,
তারা যা করিবে তাই হবে।
চিৎকার করিছে সবে—
'লেয়ার্টিসে রাজপদে করিব বরণ।'
টুপি ছুঁড়ে, হাত নেড়ে,
তারস্বরে ভেদিয়া গগন
কহিতেছে, 'রাজা হবে লেয়ার্টিস,
রাজা হবে লেয়ার্টিস।'

রাণী। ডেনমার্কের যত কুত্তা
পথ ভুলে এসেছে এখানে।

রাজা। দ্বার ভেঙে গেল!

[ভিতরে কোলাহল]

[সশস্ত্র লেয়ার্টিসের প্রবেশ, পশ্চাতে দিনেমারগণ]

লেয়া। রাজা কোথা? আপনারা বাহিরে থাকুন।

দিনেমারগণ। না, আমরাও যেতে চাই।

লেয়া। যেতে দিন একাকী আমায়।

দিনে। তাই দাও, তাই দাও।

লেয়া। ধন্যবাদ ; দ্বার রক্ষা করুন সকলে।
রে দুর্বৃত্ত, দে আমার পিতারে ফিরায়ে।

রাণী। স্থির হও লেয়ার্টিস।

লেয়া। রক্তের একটি কণা যদি স্থির থাকে
তা হ'লে জারজ আমি।

রাজা। কি হয়েছে লেয়ার্টিস?
এত বড় বিদ্রোহের কারণ কি শুনি?
ছেড়ে দাও গার্ট্রুড, ভেবো না আমার তরে।

রাজদেহ দৈবস্বরক্ষিত,
বিদ্রোহ বহিরে থেকে করে আস্ফালন,
কার্যত স্পর্শিতে তারে নারে।
বল লেয়ার্টিস, এতটা উত্তপ্ত কেন?
ছেড়ে দাও গার্টুড।
বল না কি চাও?

লেয়া। কোথায় জনক মোর?

রাজা। মৃত।

রাণী। উনি তাঁর হেতু নন।

রাজা। যা বলে বলিতে দাও।

লেয়া। কি ভাবে হলেন তিনি মৃত?
চাই না কথার খেলা,
রাজভক্তি জাহান্নমে যাক!
প্রতিশ্রুতি, বিসর্জিনু পিশাচের পায়।
বিবেক সম্ভ্রমবোধ চুলায় পড়ুক!
সর্বনাশে ডরি নাকো আর।
ইহকাল পরকাল দুইই তুচ্ছ মোর,
যা ঘটে ঘটুক ভাগ্যে
পিতার মৃত্যুর আমি প্রতিহিংসা চাই।

রাজা। কে তাহে সহায় তব?

লেয়া। আপনার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কেহ নয়;
উপায়ও করেছি স্থির।

রাজা বৎস লেয়ার্টিস,
চাহ যদি নিরূপিতে
পিতার মৃত্যুর তব প্রকৃত কারণ,
ভেবেছ কি শত্রুমিত্র না করি বিচার
যেথা সেথা প্রতিহিংসা লবে?

লেয়া। শত্রু ছাড়া কারেও চাহি না।

রাজা। তাদের জানিতে চাও তবে!
লেয়া। যারা মোর পিতৃবন্ধু
প্রসারিয়া বাহু মোর বক্ষে টেনে লব;
তাদের বাঁচাব আমি নিজ রক্ত দিয়া।
রাজা। উত্তম, এই তো চাই,
এই তো কহিছ কথা সুবোধের মত
অতি ভদ্রভাবে। তোমার পিতার মৃত্যু,
সেই অপরাধে অপরাধী নহি আমি,
একান্ত বেদনা আমি পেয়েছি তাহাতে;
এ কথা প্রতীত হবে নয়নে তোমার
স্বচ্ছ দিবালোক সম।
দিনে। (নেপথ্যে) যেতে দাও ওরে।
লেয়া। ও কিসের গোলমাল?

[ওফেলিয়ার পুনঃপ্রবেশ]

মস্তিষ্ক বিশুষ্ক হও চরম সন্তাপে!
দৃষ্টিহারা হও আঁখি সাতগুণ লবণধারায়!
উন্মাদ করেছে তোরে?
তুলাদণ্ডে মেপে মেপে লব প্রতিশোধ।
বৈশাখী গোলাপ ওরে! সরলা কুমারী,
স্নেহার্দ্র ভগিনী মোর, প্রিয় ওফেলিয়া!
হা ঈশ্বর! এও কি সম্ভব?
তরুণী হারাল বুদ্ধি, বৃদ্ধ যথা হারায় জীবন?
প্রীতিভরা প্রকৃতি একান্ত সুকোমল,
পিতার মরণে তাই মরিছে তনয়া।
ওফে। (গান) মাচান বেঁধে নিয়ে গেল
মুখটি ছিল খোলা,
তাই রে না রে নাই রে না।

কবরখানায় দিল মাটি
চোখের জলে গোলা।
চললাম তবে বন্ধু!

লেয়া। যদি তুমি প্রকৃতিস্থ থেকে আমায় প্রতিশোধ নিতে বলতে, তা হ'লেও এতটা বিচলিত হতাম না বোন।

ওফে। (গান) গান কর গো—গড়গড়িয়ে, গড়গড়িয়ে,
যদি তাকে ডাকতে পার—গড়গড়িয়ে,
খাসা চলছে চরকা। বেইমান নায়েব চুরি করলে প্রভুকন্যাকে।

লেয়া। এই এলোমেলো কথায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

ওফে। এই নাও সাঁইবাবলার পাতা; লক্ষ্মীটি, আমায় ভালবাসো, আমায় ভুলো না। আর এই ধর চিন্তামণিচুড়ো ফুল।

লেয়া। স্মৃতি আছে, চিন্তাও আছে, কিন্তু পাগলামির একখানি পুথি।

ওফে। তোমায় দিচ্ছি—বিষকণ্টকী লতা আর ছাতিম পাতা। এটা হ'ল তুলসীমঞ্জরী, তুমি নাও; আমিও কিছু রাখি। আমরা দুজনেই রবিবারে ধারণ করব, বেশ? তুমি কিন্তু গলায় পোরো। এই যে একটি জুঁইফুল; তোমায় কিছু অপরাজিতাও দিতাম, কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর ফুলগুলি সব শুকিয়ে গেল। সবাই বলে তিনি ভালই গিয়েছেন।

(গান) রব ন খাসা ফুটফুটে গো
আমার প্রাণের আলো।

লেয়া। ভয় ভাবনা দুঃখ শোক, ওর মুখে সবই সুন্দর প্রীতিময় হয়ে উঠছে।

ওফে। (গান) আর কি ফিরে আসবে না সে?
আর কি ফিরে আসবে না?
না না না, সে যে গেছে ম'রে।
তার পিছনে যাও তুমি, সে
আসবে কেমন ক'রে?

ফুলের মত সাদা দাড়ি
দুধের মত চুল,
আসবে না আর আসবে না সে,
কেঁদে মরাই ভুল।
ভগবানের চরণতলে
পায় যেন সে কূল।
ঈশ্বর তোমাদের সব ভাল করুন। [প্রস্থান]

লেয়া। ভগবান, তোমার চোখে পড়ছে না?

রাজা। লেয়ার্টিস, তোমার ব্যথার কথা শুনিবারে চাই;
সে দাবি রয়েছে মোর। অন্তরালে গিয়ে
নির্বাচন কর তব হিতাকাঙ্ক্ষীগণে;
সব শুনে তাঁরা এর করুন বিচার।
তাঁরা যদি রায় দেন,
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবেতে
এ ব্যাপারে আমি বিজড়িত,
তা হ'লে দিতেছি কথা—
রাজ্য মোর, প্রাণ মোর, মাথার মুকুট,
আমার বলিতে যাহা আছে,
সব আমি তোমারেই দিব।
অন্যথায়, আমি চাই,
মোর কথা ধৈর্যভরে করিবে শ্রবণ,
তারপরে দুইজনে একত্র হইয়া
সন্ধান করিব তব শোকের সান্ত্বনা।

লেয়া। তাই হোক।
কি ভাবে হইল মৃত্যু, গোপন অন্ত্যেষ্টি কেন,
যথাযোগ্য স্মৃতিস্তম্ভ, নিদর্শন কোথা,
শোকযাত্রা, সমারোহ সবেরই অভাব,
এই সব জিজ্ঞাসার সদুত্তর চাই।

রাজা। সকলই পাইবে ;
যেখানে প্রকৃত অপরাধ, সেইখানে কুঠার হানিও।
এস মোর সাথে। [প্রস্থান]

[ক্রমশ]

অনুবাদ° যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের স্মরণে

সকালে কাগজ খুলে কি গভীর শোকে
মন ভ'রে গেল ; দেখি, কবি, তুমি নেই
আমাদের পরিচিত এই মরলোকে।
'মরীচিকা' দেখে ভুলে 'মরুমায়া'তেই
চেয়েছিলে খুঁজে পেতে যে 'মরুশিখা'কে
আছে তার ইতিহাস বেদনার গানে :
শেষ রবিকর দেখা জীবনের বাঁকে
জানি সে 'সায়ম্'-এ গাথা রবে প্রাণে প্রাণে।

তোমাকে দেখি নি চোখে, পেয়েছি প্রাণের
পরিচয় বিকশিত কবিতা-কমলে,
বেদনা-বারিধি থেকে ফোটে যা গানের
রূপ নিয়ে মানুষের সুরসভাতলে।
সে গান গেয়েছ ব'লে করি অনুভব
মরণেও হবে নাকো সে সুর নীরব।

গোপাল ভৌমিক

ডানা

১২

কবি যথাসময় এসে পৌঁছেছিলেন ঠিক, কিন্তু ডানার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। কবি ব্যস্ত ছিলেন মন্দাকিনীকে নিয়ে—ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ডানাকেও ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রথমত, চিড়িয়াখানার পাখিগুলোকে নিয়ে, আবার দু-চারটে পাখি ম'রে গিয়েছিল, সে জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল তার। দ্বিতীয়ত, রূপচাঁদবাবু আবার বিব্রত করছিলেন তাকে। আগ্নেয়-গিরিশিখর থেকে আবার ধূমোদ্‌গিরণ শুরু হয়েছিল। কবি টেলিগ্রাম পেয়ে যেদিন কলকাতা চ'লে গেলেন, সেই দিন রাত্রেই রূপচাঁদবাবু এসেছিলেন। অনেক রাত্রে। ডানা তখন খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। ঘুমোয় নি, বই পড়ছিল। রূপচাঁদবাবুর ডাকাডাকিতে উঠে আসতে হ'ল। তাকে দেখেই রূপচাঁদবাবু হাত দুটি জোড় ক'রে বললেন, প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, তুমি না ডাকলে আর আসব না। কিন্তু আসতে হ'ল, তোমার জন্যেই আসতে হ'ল। একটু আগে তোমার চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে আসছিলাম—মনে হ'ল, তোমার চিড়িয়াখানায় সাপ ঢুকেছে। পাখিগুলো খুব চেঁচামেচি করছে। ফোঁস ফোঁস শব্দও পেলাম দু-একবার। মালীটার কি রাত্রে ওখানে শোবার কথা? ডাকাডাকি ক'রে সাড়া পেলাম না কারও, তাই ভাবলাম তোমাকে অন্তত খবরটা দিয়ে যাই।

ডানা একটু বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সপ্রতিভভাবে বললে, ও! কি করা যায় তা হ'লে বলুন তো? মুন্সীর ওখানে শোবার কথা। ঘর রয়েছে তার—

আমি তো ডেকে সাড়া পেলাম না কারও। তুমি যদি যেতে চাও, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি—ও, বেগ ইওর পার্ডন, তুমি যে আমার সঙ্গে যাবে না তা মনে ছিল না।

আমি গিয়েই বা কি করব? সাপ মারা তো আমার সাধ্যে কুলবে না। আচ্ছা, আমি দেউড়িতে খবর পাঠাচ্ছি, সুখন পাঁড়ে যা পারে করুক।

বেশ, আমি চললাম তা হ'লে।

রূপচাঁদ চ'লে গেলেন কিছুদূর। তারপর ফিরে এলেন আবার। এসে যা বললেন তা অপ্রত্যাশিত নয়, ওই রকমই একটা কিছু প্রত্যাশা করেছিল ডানা।

সেদিন ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যে কাজটা ক'রে ফেলেছি, তার জন্যে এখনও কি ক্ষমা কর নি আমাকে? ভগবানও শুনেছি পাপীকে ক্ষমা করেন, তুমি কি তাঁর চেয়েও নিষ্ঠুর?

প্রত্যুত্তরে অনেক কিছু বলা চলত, কিন্তু ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। রূপচাঁদ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর তিনিও ভিতরে উঠে গেলেন। বললেন, ডানা, এমন অবুঝের মত ব্যবহার তোমার কাছে আশা করি নি। তুমি সত্যিই যদি আমার নিতান্ত স্বাভাবিক আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাক, স্পষ্ট ভাষায় সেটা জানিয়ে দিতে তোমার সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়। তোমার এই সঙ্কোচ দেখে আমার আশা হচ্ছে যে, আমার সেদিনকার ব্যবহারে সত্যিই হয়তো তুমি তত রাগ কর নি।

এর উত্তরে ডানা যে কথা যে সুরে বললে, তা তার নিজের কানেই অত্যন্ত নরম শোনাল। সে বলতে চাইছিল, এই মুহূর্তে আপনি বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে বা ওই ধরনের একটা রূঢ় কিছু। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনুনয়ের সুর—কেন আপনি আমাকে এ ভাবে জ্বালাতন করছেন রূপচাঁদবাবু?

এটাকে জ্বালাতন মনে করছ কেন তুমি? অভিনন্দন এটা, পুরুষের অকৃত্রিম অভিনন্দন প্রকৃতির উদ্দেশে। সত্যিই তুমি বিরক্ত হয়েছ?

আমার সেদিনের আচরণ থেকে তা কি স্পষ্ট হয় নি?

না। সেদিন তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু পালিয়ে যাওয়াটা অনেক সময় আমন্ত্রণেরই নামান্তর। পুরুষের শক্তি বা আগ্রহকে মাপবার মাপকাঠি ওটা অনেক সময়ে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তোমরা অনেক সময় ব্যবহার কর ওটা—বড় বড় প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলেন।

আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। মানুষের বিচার প্রাণীদের নিয়ম দিয়ে হয় না। প্রাণীরা প্রকৃতির কারাগারে বদ্ধ জীব। মানুষ সে কারাগার ভেঙেই মনুষ্যত্ব অর্জন করেছে। কামনার দাসত্ব করা প্রাণীদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে, মানুষের পক্ষে নয়। অন্তত আমার পক্ষে নয়।

আমাকে কি তা হ'লে তুমি অমানুষ ব'লে মনে কর?

আপনার স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা আমি কোনদিন করি নি। করবার ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। এইটুকু শুধু বুঝেছি, আপনি যে পথে চলতে চান সে পথে আমি চলতে চাই না। সম্ভবত আপনার স্ত্রীও চান না।

কথাটা ব'লেই ডানার মনে পড়ল, বকুলবালা মানা ক'রে দিয়েছিল রূপচাঁদবাবুকে তার কথা বলতে।

আমার স্ত্রীর কথা জানলে কি ক'রে তুমি?

শুনেছি।

কি শুনেছ?

শুনেছি তিনি সতী।

কে বললে তোমাকে?

ঠিক মনে নেই। আশা করি সংবাদটা মিথ্যে নয়।

কিন্তু তিনি আমার পথে চলতে চান না—এ খবরটা তো তাঁর কাছ থেকে ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এ খবরটা পেলে কোথা?

ওটা আমার অনুমান। আর খুব সম্ভবত সত্য অনুমান। তিনি সত্যই যদি সতী হন, তা হ'লে আপনার পথে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

রূপচাঁদ হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

এ দেশের সতী স্ত্রীরা স্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্যে সব কিছু করতে পারে। সতী স্ত্রী পঙ্গু স্বামীর লালসা চরিতার্থ করবার জন্যে তাকে কাঁধে ক'রে বেশ্যা-বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে—এ গল্পও প্রচলিত আছে এ দেশে।

হয়তো আছে। কিন্তু ও-গল্পের মূলে আর একটা জিনিস আছে,

সেটাকে উপেক্ষা করবেন না। ওতে স্বামীর অকপটতাও প্রকাশ পেয়েছে। স্বামী অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর লালসার কথা স্ত্রীর কাছে, শিশু যেমন মায়ের কাছে অকপটে ব্যক্ত করে তার সন্দেশ-লোলুপতা। লুব্ধ অসহায় পঙ্গু স্বামীর তুচ্ছ সাধ মেটাবার জন্যে হয়তো করুণাময়ী সতী স্ত্রী তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ্যালয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার আচরণের মিল কোথায়? আপনি কি আপনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন আপনার স্ত্রীর কাছে? আমার বিশ্বাস, করেন নি। আপনি যা করছেন, তা চোরের মত করছেন। আপনার লোলুপতায় শিশুর সারল্য নেই, আছে অতি জঘন্য ভণ্ডামি। যান, বাড়ি যান। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।

রূপচাঁদ তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো শ্বাপদের চোখের মত জ্বলতে লাগল। নাসারন্ধ্রযুগল বিস্ফারিত হ'ল একটু। কিন্তু যে কথাগুলি তিনি বললেন, তাতে উষ্মার আভাস পাওয়া গেল না।

তুমি আমার নিখুঁত ছবি এঁকেছ; তোমার অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করছি। কিন্তু একটু খটকা লাগছে। তুমি আমাকে এতটাই যদি বুঝেছ তা হ'লে আমাকে এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছ কেন, আর প্রশ্রয়ই যদি দিয়েছ তা হ'লে মাঝপথে থামছই বা কেন?

আমি আপনার কথার উত্তর দেব না। আপনি বাড়ি যান।

ঠিক এই সময়ে চাকরটা না এসে পড়লে কি হ'ত বলা শক্ত। চাকরটার আগমনে রূপচাঁদ বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু, সে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

মাইজী, মুন্সী এসেছে।

এতক্ষণে তা হ'লে ঘুম ভেঙেছে যাদুর। আচ্ছা, আমি চললাম। আবার আসব পরে।—রূপচাঁদ বেরিয়ে গেলেন।

মুন্সী এগিয়ে এসে সেলাম ক'রে প্রশ্ন করলে, মাইজী কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

আমি তো ডেকে পাঠাই নি।

রূপচাঁদবাবুই তো একটু আগে ডাকছিলেন আমাকে। আমি

বেরিয়ে এসে দেখলাম তিনি এই দিকেই আসছেন, তাই মনে হ'ল আপনিই বোধ হয় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

না, আমি ডাকি নি। রূপচাঁদবাবু চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে আসতে আসতে শুনেছিলেন যে, পাখিগুলো চিৎকার করছে, সাপের ফোঁস ফোঁস আওয়াজও পেয়েছিলেন তিনি, তাই তোমাকে ডাকছিলেন। চিড়িয়াখানার সব ঠিক আছে তো?

ঠিক আছে। অনেক পাখি তো রাত বারোটার সময় রোজই ডেকে ওঠে। সাপের আওয়াজ তো পাই নি। অমন ঘন জালের বেড়ার মধ্যে সাপ ঢুকবেই বা কি ক'রে?

তুমি চিড়িয়াখানার চারিদিকে ফিনাইল ব্লিচিং পাউডার দাও তো?

রোজ দু বেলা দি মাইজী।

নতুন যে প্যাঁচাটাকে আজ এনেছ, সেটা খেয়েছে কিছু?

একটা ইঁদুর খেয়েছে।

আচ্ছা, যাও তুমি। আমি কাল সকালে যাব।

মুন্সী চ'লে গেল, চাকরটাও শুতে গেল নিজের ঘরে।

ডানা বিছানায় শুয়ে আবার আগের মতন পড়তে শুরু করল।

ভাবতে চেষ্টা করল, যেন কিছু হয় নি। রত্নপ্রভার কথাগুলো মনে পড়ল—ও কিছু নয়, সুন্দরী মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই একটু-আধটু মতিভ্রম হয়, ওতে ভয় পেয়ো না। ডানা ভয় পায় নি; কিন্তু এটা সে ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছিল যে, রূপচাঁদ-সমস্যার একটা ভদ্র সমাধান করতে না পারলে তাকে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ক'রে যাবে কোথায়? কে তাকে আশ্রয় দেবে? খুঁজলে হয়তো আশ্রয় কোথাও মিলবে, কিন্তু তার জন্যেও যে প্রাথমিক প্রয়াস প্রয়োজন তা করবার শক্তি তার আছে কি? খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অনেকগুলো দরখাস্ত সে করেছিল। সন্তোষজনক কোনও জবাব আসে নি। দু-এক জায়গা থেকে ইণ্টারভিউ করবার জন্যে ডেকেছিল, কিন্তু ডানা যায় নি। তার মনে হয়েছিল, চাকরিই যদি করতে হয় তা হ'লে এর চেয়ে ভাল চাকরি পাওয়া যাবে না আপাতত। অমরেশবাবু বা রত্নাপ্রভাকে মনিব ব'লে

মনে হয় না কখনও, তাঁরা যেন আত্মীয়। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে গেল ডানা একটু। নিজের ভবিষ্যতের কথা এমন ভাবে কেন ভাবছে সে? এ ভাবনার কোনও কূল-কিনারা তো নেই! সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তিনি একদিন বলেছিলেন—কাজ কর, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ক'রো না। নির্বিকার হয়ে যদি কাজ করতে পার, তা হ'লে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাবে। আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি, এ কাজটা ভাল ও কাজটা মন্দ, কাজ করবার বদলে আমি এ চাই ও চাই—এই সব অহং চিন্তাকে যদি প্রশ্রয় দাও, তা হ'লে দুঃখের শেষ থাকবে না। এ কথা নূতন নয়, চির পুরাতন। কিন্তু পুরাতন ব'লেই পরিত্যাজ্য নয়, দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার ওটা একটা পরীক্ষিত পথ।...ডানা ভাবতে লাগল, নির্বিকার হয়ে কাজ করা কি সম্ভব? আমি কাজ করব অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা করব না—এই বা কেমন ধারা কথা? ভাল কাজ, মন্দ কাজ—দুইই সমান ব'লে মনে করা যায় কি! তা হ'লে ওই কামুক রূপচাঁদের বাহুপাশে ধরা দেওয়া আর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করায় কোন তফাত নেই? ডানার মনে হ'ল, সন্ন্যাসীর যুক্তি হয়তো ঠিক অনুসরণ করতে পারে নি সে। কাল গিয়ে পুরাতন প্রসঙ্গটা আবার একবার তুলতে হবে। সন্ন্যাসীকে ধরাই কিন্তু শক্ত। প্রায়ই তো বাসায় থাকেন না। ডানা বইটাতে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলে আবার। বিলেতের এক স্কুলের হেডমাস্টার মিস্টার প্যাট্রিজ (E. H. Patridge) লিখেছেন বইখানা। এ বইটাতে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, ভারতবাসীর পক্ষে তা খুব নূতন কথা নয়। বর্তমান যুগের যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব ও-দেশের মানুষকে প্রকৃতির কাছ থেকে যতটা বিচ্ছিন্ন করেছে, আমাদের দেশে এখনও ততটা করে নি, কারণ আমাদের দেশে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব এখনও তেমন প্রবল হয় নি, যদিও আমরা কামনা করছি, প্রবল হোক। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর। প্যাট্রিজ সাহেব বলছেন যে, যদিও বর্তমান যুগের টেকনিক্যাল শিক্ষাকে উপহাস করা বা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, তা করতে যাওয়া

যুক্তিযুক্তও নয়, কিন্তু তবু এ কথা ভুললে চলবে না টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে অতি-প্রবণতা আমাদের ক্রমশ অমানুষ ক'রে ফেলছে, আমাদের সমাজ-বন্ধন শিথিল করছে, আমরা আদর্শ পিতা-মাতা হতে পারছি না, আদর্শ ভাই-বোন হতে পারছি না, আদর্শ বন্ধু-আত্মীয় হতে পারছি না, আদর্শ দেশসেবকও হতে পারছি না। ওসব হতে হ'লে বুদ্ধিবলের চেয়ে চরিত্রবল থাকা বেশি দরকার। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিতেই শান দিচ্ছে কেবল, স্বার্থপর ক'রে তুলছে ক্রমাগত। আমরা এর ফলে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছি, জীবনটাকে ভাল ক'রে ভোগও করতে পারছি না। টাকা রোজগার করছি কিন্তু সুখী হচ্ছি না, জীবনটাই ক্রমশ যেন বিস্বাদ হয়ে আসছে। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের পরিপূর্ণ রূপ-রস থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমরা। এমন অবস্থা হয়েছে, যাঁরা বয়স্ক তাঁরা জীবনের পরিপূর্ণ রূপ দেখতে চান না; ভয় পান। যারা শিশু বা কিশোর-কিশোরী তারা এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। সুতরাং প্যাট্রিজ সাহেবের অভিমত নানা ছুতোয় প্রকৃতির সংস্পর্শ লাভ কর। আমরা এই যে এক-পেশে জীবন যাপন করছি, এ জীবন অসম্পূর্ণ, তাই আমরা অসুখী। ডানার মনে হ'ল, প্যাট্রিজ সাহেবের প্রকৃতি সম্পূর্ণ জীবনের যে শিক্ষা আমাদের দেবে, তাও কি আমাদের কাম্য? প্রকৃতিলালিত বর্বর মানুষ এখনও আছে পৃথিবীতে, তারা প্রকৃতিকে চেনে, প্রকৃতির ভাষা বোঝে, তার প্রতিটি ইঙ্গিতের অর্থ তাদের নখদর্পণে, আমরা কি তাই হতে চাই? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ডানা। ভারতবর্ষের দর্শনেও প্রকৃতির উল্লেখ আছে। সন্ন্যাসী সেদিন বলেছিলেন, প্রকৃতি অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয়, সত্ত্ব, রজ, তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব। ঠিক বুঝতে পারে নি কথাটা। আর একদিন গিয়ে বুঝে নিতে হবে। বইটা আবার পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু আর ভাল লাগল না। আলো নিবিয়ে পাশ ফিরে শুল। সন্ন্যাসীর কথাই মনে পড়তে লাগল কেবল। স্বপ্নেও দেখা দিলেন সন্ন্যাসী।

[ক্রমশ]

"বনফুল"

প্রসঙ্গ কথা

সাধু ও চলিত ভাষা

সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষার সমস্যা বাংলা-সাহিত্যে নূতন সমস্যা নয়, তবু আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে আর একবার যাচাই ক'রে নিতে চাই।

অদ্যকার অধিকাংশ বাঙালী লেখক তাঁদের চিন্তা ও কল্পনা চলিত ভাষার আশ্রয়ে প্রকাশ ক'রে থাকেন, এটি দেখতে পাই। শুধু যে সাহিত্যের নিজস্ব পরিসরের মধ্যেই চলিত ভাষার এই আধিপত্য বর্তমান তা-ই নয়; সাহিত্যেতর বিষয়, যথা—দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি ইতিহাস ইত্যাদি ঘটিত আলোচনায়ও চলিত ভাষা সাধু ভাষার উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছে। সাধু ভাষার গঠনরীতির উপর যে সব লেখকের দখল অপ্রতিপাদ্য, তাঁরাও দেখি আজকাল যুগপ্রভাবের বশে স্বকীয় অধিকারের ক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে অনিশ্চিত অধিকারের সীমায় প্রবেশ ক'রে নিজেদের আধুনিকতা প্রমাণ করতে চাইছেন। এ থেকে এইরকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক, মনোভাব প্রকাশে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার আপেক্ষিক যোগ্যতার প্রশ্নে আজ আর চলিত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কারও মনে কোনও দ্বিধা নেই; সকলেই বিনা প্রতিবাদে ধ'রে নিয়েছেন যে, সাধু ভাষা হ'ল বাংলা-গদ্যের পুরাতন বাতিল রূপ; পক্ষান্তরে গদ্যের চলিত বা কথ্য রূপটাই হ'ল আধুনিক জীবনোচিত চিন্তন-মনন প্রকাশের একমাত্র উপযুক্ত বাহন।

কিন্তু সত্যই কি তাই? সত্যই কি চলিত ভাষার সমধিক উপযোগিতা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হয়েছে? আমাদের তা মনে হয় না। জানি, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (চৌধুরী মহাশয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'ল, তার কারণ তিনিই এ-যুগে বাংলা-সাহিত্যে চলিত ভাষারীতি আন্দোলনের মুখ্য প্রবর্তক) মত প্রধানগণ চলিত ভাষার অনুকূলে তাঁদের দ্বিধাহীন রায় জারি করেছেন, তবু মামলাটির এখনও পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয় নি ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। চলিত ভাষার স্বপক্ষে যদি অনেক বলার কথা থাকে, তা হ'লে সাধু ভাষার পক্ষেও অনেক বলবার কথা খুঁজে পাওয়া যেতে

পারে। অন্তপক্ষে, উক্ত রথীচতুষ্টয়ের সোৎসাহ পোষকতা সত্ত্বেও চলিত ভাষারীতির বিরুদ্ধে লম্বা একটি অভিযোগের ফিরিস্তি দাখিল করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। অন্তত, বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে যে-জাতীয় চলতি ভঙ্গির ব্যাপক প্রয়োগ চলছে তার বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত ভাবেই পর্বতপ্রমাণ যুক্তি স্তূপীকৃত ক'রে তোলা যেতে পারে।

মুশকিল হয়েছে এই যে, যিনি যে পক্ষের অনুকূলে যুক্তিজাল বিস্তার করবার চেষ্টা করেন, আপাতত তাঁর দৃষ্টি সেই পক্ষের উপরই বিনিঃশেষে নিবদ্ধ থাকে, অন্য পক্ষের অনুকূলেও যে একটা বক্তব্য থাকতে পারে সেটি তাঁর দৃষ্টি প্রায়শ এড়িয়ে যায়। এই যে একচক্ষুহরিণসুলভ খণ্ডিত দৃষ্টির দুর্বলতা, এ দুর্বলতা থেকে আমাদের সাহিত্যের প্রধানগণও সব সময় মুক্ত নন। এ-জাতীয় একদেশদর্শী রীতি আদালত-গৃহে বিবদমান দুই পক্ষের ব্যবহারজীবীর গ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠার এ পদ্ধতি নয়, তা বলা প্রয়োজন। যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে বিতর্কাধীন দুই বস্তুর ভালমন্দ বিচার ক'রে তারপর এক পক্ষের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে সুস্থির রীতি, বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার চাইতে কার্যকর প্রক্রিয়া আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তেমন প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের উৎসাহ কম। প্রায়শ আমাদের যুক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় পূর্বাহ্নে নিরূপিত পছন্দ-অপছন্দের দ্বারা; যুক্তির আলোকে ভালমন্দ বাছাইয়ের ব্যাপারে আমাদের শৈথিল্য সুপ্রকট। আমরা এখনও ঈশপের গল্পের সেই সনাতন রীতিতেই কম-বেশি বিশ্বাসী, যে রীতিতে সিংহ মূর্তিশিল্পে সব সময় মানুষের পায়ের তলায় প্রক্ষিপ্ত; সাধু ভাষাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে হ'লে গোড়ায় তাকে বদনাম দিয়ে ঝোলানোর চাইতে সহজ কাজ আর কি হতে পারে!

এমন কথা বলব না, চলতি রীতিতে বাংলা-গদ্যের গভীর-গম্ভীর রূপটি পরিস্ফুট ক'রে তোলা আদৌ সম্ভব নয়। সে রকম কোন অপরিবর্তনীয় ধারণা যদি লেখকের থাকত, তা হ'লে এই নিবন্ধ চলিত ভাষায় রচিত হবার পক্ষে কোনই যুক্তি থাকত না। ব্যাপারটি তাজ্জব হ'লেও সত্য যে, এই নিবন্ধে সাধু ভাষার পোষকতা করা হয়েছে, অথচ

তা লিখিত হয়েছে চলিত ভাষায়। এর কৈফিয়ৎ এই যে, লেখকের অভ্যাসটাই এই জন্য মূলত দায়ী, সাধু ভাষার তুলনায় চলিত ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এই অভ্যাসের সঙ্গে আদৌ জড়িত নয়। হতে পারে চলিত ভাষা বহুব্যাপক অনুশীলনের দ্বারা একদিন সব দিক দিয়ে উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে উঠবে, এমন কি সাধু ভাষার প্রচলিত রূপের সুষমা ও সৌন্দর্যকেও তার পক্ষে বিনিঃশেষে অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই সম্ভাবনা এখনও বহু—বহু দূরে। চলিত ভাষার আকাঙ্ক্ষিত রূপ এখনও দূর-ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত; সেই দূর-সম্ভাবনাকে 'fait accompli' মনে ক'রে এখনই সাধু ভাষার সঙ্গে তাল ঠোকার কোন অর্থ হয় না। বর্তমান প্রচলিত সাধু ও চলিত ভাষার ধরন-ধারণ পাশাপাশি বিচার করলে এ কথা নিঃসন্দেহেই স্বীকার করতে হয় যে, সাধু ভাষা চলিত ভাষার তুলনায় বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এর কারণ শুধু এই নয় যে, সাধুভাষার ঐতিহ্যের পিছনে গত দেড় শত বৎসরের অভিজ্ঞ লেখকদের অনুশীলনের সমর্থন আছে; এর কারণ এও বটে যে, সাধু ভাষার অভ্যস্ত ভঙ্গিমার মধ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য ও প্রসাদগুণ আছে যা অর্বাচীন চলিত ভাষায় প্রায়শ অনুপস্থিত। এই গাম্ভীর্য ও প্রাঞ্জলতা আয়ত্ত করতে চলিত ভাষাকে আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।

চলিত ভাষাকে যুগধর্মের প্রভাববশে যদি সর্বস্বীকৃত মর্যাদা দিতে হয়, তা হ'লে সর্বপ্রথমে চলিত ভাষার বদ্ধমূল অপূর্ণতাগুলি স্বীকার ক'রে নিয়ে সাধুভাষার দৃষ্টান্তের আলোকে তাকে সুগঠিত করা দরকার। উপরন্তু, চলিত ভাষায় হাত দেবার আগে কিছুকাল একাগ্র নিষ্ঠায় সাধুভাষা মক্স করা দরকার। সাধুভাষার পদ্ধতি-প্রকরণ ভালমতে আয়ত্ত হ'লে তবেই শুধু চলিত ভাষায় অধিকারলাভ সম্ভব। ভাল গদ্য-কবিতা লিখতে হ'লে যেমন প্রথম বহুকাল মিলের কবিতায় হাত পাকাতে হয়, তেমনি চলিত ভাষায় রচনার স্ফূর্তি আনতে হ'লে সর্বপ্রথমে বাংলা সাধুভাষার স্বীকৃত রূপটিকে বিধিমতে অনুধাবন করা আবশ্যক। কিন্তু আজকাল হয়েছে সব উল্টো। মাতৃজঠর থেকে ভূপতিত হয়েই কবিরা সব গদ্য কবিতায় হাত পাকাতে শুরু করেন, গদ্য-লেখকেরা বীরবলী

ধরনে বুকনি কাটতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ কুড়ি বৎসরের গদ্যরচনা মূলত চলিত ভাষায় লিখিত—এই নজিরটিকে আজকাল খুব ফলাও ক'রে প্রচার করা হয়, কিন্তু তৎপূর্ববর্তী সাহিত্যজীবনে তিনি যে একটানা পঁয়তাল্লিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন সাধুভাষার চর্চা করেছেন, এবং উৎকর্ষ লক্ষণের দিক দিয়ে তাঁর ওই গদ্যের সঙ্গে যে শেষ বয়সের গদ্যের কোন তুলনা হয় না—এই অকাট্য তথ্যটিকে অসুবিধার কারণেই প্রায়শ চেপে যাওয়া হয় ব'লে মনে হয়। তথাকথিত আধুনিক রুচির প্রীতিকর না হ'লেও এ কথা জোর গলায় বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' কিংবা 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যের পাশে 'শেষের কবিতা' কিংবা শেষ বয়সের প্রবন্ধাবলীর গদ্যের ভাষা নিতান্ত নিষ্প্রভ। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্রে'র দৃষ্টান্তপ্রভাবে রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে চলতি ভঙ্গির দিকে বিশেষ ভাবেই ঝুঁকেছিলেন সন্দেহ নেই, তবে এই পক্ষপাত অবিমিশ্র শুভ ফলের কারক হয় নি। বক্তব্যের স্বতঃস্ফূর্তি বিধানের চেষ্টায় শেষ বয়সের গদ্যে এমন একটা অবিন্যস্ততার ছাপ পড়েছে যা প্রথম বয়সের রচনায় তিনি নিশ্চয় বরদাস্ত করতে পারতেন না। চলিত রূপাশ্রয়ী শেষ বয়সের রবীন্দ্র-গদ্য ভঙ্গিপ্রধান, ভাষণবহুল, মুদ্রাদোষলাঞ্ছিত এবং বিশেষ ভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কথ্যভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। এ ভাষা সরস পত্ররচনার পক্ষে উপযোগী, হালকা মেজাজের নিবন্ধ রচনার পক্ষে উপযোগী, কিন্তু ভাবগম্ভীর বিষয় আলোচনার উপযোগী কি না তাতে সন্দেহ আছে। চিন্তার গভীর-গম্ভীর অথচ প্রাঞ্জল রূপটি ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আত্মশক্তি', 'বিচিত্রপ্রবন্ধ', 'পঞ্চভূত' প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থসমূহের ভাষা বহু বহু গুণে শ্রেষ্ঠ—এ কথা বললে লেখক আজকের দিনে জাতে পতিত হতে পারেন, তবু কথাটা বলবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনাভঙ্গি এবং প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভঙ্গি এ-কালীন গদ্যলেখকদের রচনারীতিকে এমন একান্ত ভাবে আচ্ছন্ন ক'রে আছে যে, এ প্রভাব তার ভিতর বিশেষ এক ধরনের mannerism-এর জন্ম দিয়েছে। এই mannerism-মুক্ত হতে পারলে বাংলা-গদ্যের ভাল বই মন্দ হবে না।

বাংলা সাধুভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদীরা সচরাচর এই একটি যুক্তি দেখান যে, পৃথিবীর কোন সাহিত্যে সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষা—ভাষার এইরূপ দ্বিধাকরণ নেই; একমাত্র বাংলা-গদ্যের বেলায়ই দেখা যায়, দুটি সমান্তরাল স্রোতের মত সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অন্যত্র যেটা নেই সেটি বাংলা-ভাষায়ও থাকা উচিত নয়, সুতরাং একটিকে ছাঁটাই ক'রে অন্যটিকে ষোল আনা প্রতিষ্ঠা দান করলে তবেই সব ল্যাঠা চোকে। আর যেহেতু চলিত ভাষার 'পরেই অধুনাতন অধিকাংশ লেখকের সুস্পষ্ট পক্ষপাত, সেই হেতু কোন্‌টিকে বাদ দিয়ে কোন্‌টিকে রাখতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ সামান্যই থাকা উচিত। প্রতিবাদীদের অগ্রনায়ক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষাকে রূপকথার রাজার সুয়োরাণী ও দুয়োরাণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, "সুয়োরাণী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরাণী বসবেন রাজাসনে" ('বাংলাভাষা-পরিচয়', পৃ. ৩৮-৩৯)।

পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের ভাষায় গদ্যের দ্বিধাবিভাজন স্বীকৃত নয় ব'লে বাংলায়ও যে তা স্বীকৃত হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। বর্তমানের নৈষ্ঠিক একাচারিতার দিনে ব্যতিক্রমনিদর্শন হিসাবে বাংলা-ভাষার এই দ্বিমুখিনতাকে যদি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করা যায়, তা হ'লে কার কি বলবার থাকতে পারে! অন্যান্য ভাষার সঙ্গে জোড় না মেলালে ঐক্য রক্ষিত হবে না, সুতরাং জোর ক'রে জোড় মেলানো চাই—এমন মাথার দিব্য কেউ বাংলা-ভাষার উপর আরোপ করে নি। আর যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যায় যে, নানাবিধ বাস্তব সুবিধা-অসুবিধার বিচারে বাংলা-ভাষার এই দ্বিধাগ্রস্ততা লোপ করা উচিত, তা হ'লে বলব, সেই বিলোপ-সাধনের কাল এখনও আসে নি। নিকট-ভবিষ্যতে আসবে ব'লেও মনে হয় না। এখনও 'বাংলাবাক্যাধীপের' হৃদয়ে সুয়োরাণী এবং দুয়োরাণী দুইয়েরই স্থান হওয়ার মত যথেষ্ট জায়গা প'ড়ে আছে। আগে সুয়োরাণীর প্রয়োজন নিঃশেষিত হোক, তখন দুয়োরাণীকে একলা রাজাসনে বসাবার পরিকল্পনা ধীরে সুস্থে করা যাবে।

সাধু-ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার একটা প্রধান পার্থক্য তার ক্রিয়াপদের ব্যবহারে। মুখের কথার রীতি অনুসরণ ক'রে চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদকে সংকুচিত আকারে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু 'যাইতেছে'-র স্থলে 'যাচ্ছে' 'করিতেছে'-র স্থলে 'করছে' বললেই যে সাধু ভাষা চলিত ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে চলিত ভাষার বিশেষ ঢঙটিকে প্রকাশ করে এমন নয়। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আরও অনেক বেশি মূলগত, এবং এই মূলগত প্রভেদের বিচারেই চলিত ভাষা অদ্যাবধি সাধু ভাষার নিম্নবর্তী হয়ে আছে। সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার সব চাইতে যেটি বড় পার্থক্য তা হচ্ছে, সাধু ভাষা সংস্কৃত ভাষার ভাবচেতনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত; পক্ষান্তরে আধুনিক চলিত ভাষা সংস্কৃতের ঐতিহ্য থেকে একেবারেই স্খলিত হয়ে পড়েছে। পার্থক্যটির গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার। এবং এইটি যদি বুঝতে পারি, তা হ'লে চলিত ভাষার তুলনায় সাধু ভাষার মজ্জাগত শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

সত্য বটে, বাংলা-ভাষার উদ্ভব প্রাকৃত থেকে, কিন্তু শক্তিশালী পরবর্তী লেখকদের দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার ফলে সংস্কৃতের রস বাংলা-ভাষার অস্থিমজ্জার ভিতর এমন গভীরভাবে প্রবেশ করেছে যে, প্রাকৃত ও সংস্কৃতে মিলে তার এক অখণ্ড যৌগিক রূপান্তর হয়েছে। প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মিশ্রণজাত এই অখণ্ড ফলটিকেই আমরা নাম দিতে পারি 'সাধু ভাষা'। যা দীর্ঘকালের অনুশীলনে ও পঠনপাঠনের অভ্যাসে একটি সংস্কারের মত দাঁড়িয়ে গেছে, আজ হঠাৎ ইচ্ছা করলেই আমরা তাকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দিতে পারি না। চলিত ভাষা সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ আহরণ করছে বটে, কিন্তু যেহেতু বাংলা-ভাষার অভ্যস্ত প্রকাশভঙ্গি অর্থাৎ সাধুরীতির সঙ্গে তার যোগ স্থাপনের আন্তরিক কোন চেষ্টা নেই, সেই কারণে চলিত ভাষা সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে আহৃত শব্দসম্পদ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাঙালী পাঠকের মনোজগতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারল না। মৌখিক বাক্যরীতির অনুসরণে লিখিত হ'লেও কোথায় যেন চলিত ভাষার চঙের মধ্যে একটা মস্ত

বড় কৃত্রিমতা লুকিয়ে আছে, যার জন্যে তা আজও সাধু ভাষার মত প্রাঞ্জলতা অর্জন করতে পারল না। সাধু ভাষা মহাজন কর্তৃক 'কৃত্রিম ছাঁচে ঢালাই করা একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা' আখ্যায় যতই কেন না ধিক্কৃত হোক, এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, সাধু ভাষার রচনা পড়তে যত সুবোধ্য ও স্বচ্ছন্দ মনে হয় চলতি ভাষাশ্রিত রচনা কখনও তেমন মনে হয় না। বর্তমান নিবন্ধের লেখক অভ্যাসবশে (অভ্যাসদোষেও বলা যায়) মূলত চলতি ভাষাশ্রয়ী রচনাকার, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত পঠনের অভিজ্ঞতায় বার বার এ কথা প্রমাণিত হয়েছে, এবং সেই জন্যেই কথাটা এত জোরের সঙ্গে বলা হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাক্-পঞ্চান্ন রবীন্দ্রনাথ ('সবুজ পত্রে'র আমল থেকে অর্থাৎ পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের কাছাকাছি সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাষার মোড় ঘুরে গিয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে) এবং শরৎচন্দ্রের রচিত উপন্যাসের পাশে চলতি রীতিতে লেখা আজকের দিনের কোন উপন্যাস পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লেই উক্তিটির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে ব'লে বিশ্বাস করি। তারাশঙ্কর কিংবা বিভূতিভূষণ কিংবা 'বনফুল'-এর চলতি ভাষাশ্রিত গল্প বা উপন্যাসের তুলনায় তাঁদের রচিত সাধুভাষাশ্রয়ী গল্প বা উপন্যাস অনেক বেশি প্রাঞ্জলতাগুণসমৃদ্ধ, এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এ রকম হওয়ার কারণ বোধ করি এই যে, সাধু ভাষার পিছনে দীর্ঘকালীন পঠনপাঠনের অভ্যাসপুষ্ট একটি দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারের পোষকতা আছে, অন্তপক্ষে চলতি ভাষার অনুকূলে এখনও তেমন কোন সংস্কার গঠিত হয় নি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হয়তো চলতি ভাষার পাঠক্রিয়া ক্রমশ সহজ হয়ে আসবে। কিন্তু পূর্বসংস্কার থেকে চলতি ভাষাকে বিশ্লিষ্ট ক'রে চলতি ভাষার মধ্যেই যদি আমরা এই সহজ পথের সন্ধান করি তা হ'লে ভুল করব। চলতি ভাষারীতির অপূর্ণতা কোথায়, সাধুভাষার শ্রেষ্ঠত্বই বা কোন্‌খানে—এ সব বিষয় ধীর চিত্তে বিবেচনা ক'রে সাধু ভাষার সংস্কারের সঙ্গে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি আমরা চলতি ভাষাদেহের সম্মার্জন তথা সংস্কারের চেষ্টা করি, তা হ'লেই কেবল যথাযথ পথে চলতি ভাষার অগ্রগমন সম্ভব। আসল কথা, সংস্কৃত ভাষার

ধ্বনিগাম্ভীর্য ও ভাবসৌকুমার্যের সঙ্গে বাংলা-ভাষার যোগ হারালে চলবে না। রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন, "সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল" (পৃ. ৪১)। এইটি হচ্ছে বাংলা ভাষার গড়ন সম্পর্কে সব চাইতে আদত কথা। সাধুই হোক আর চলতিই হোক, বাংলা-ভাষারীতিকে সংস্কৃত-রসচেতনার ভিত্তিভূমির উপর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। 'রসচেতনা' কথাটি ব্যবহার করেছেন সুপণ্ডিত ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়। বাংলা-ভাষার কুললক্ষণ ও প্রকৃতিনির্ণয়ে এর চাইতে সুষ্ঠু কথার ব্যবহার বুঝি কিছু হতে পারত না। ডক্টর দে তাঁর 'নানা নিবন্ধ' গ্রন্থে সংস্কৃত ও বাংলার আলোচনাপ্রসঙ্গে অভ্রান্ত হস্তে বাংলা-ভাষার স্বরূপ নিরূপণ করেছেন, আমরা কথাঞ্চৎ বিস্তারিত ভাবেই তাঁর বক্তব্য এখানে সংকলন ক'রে দিচ্ছি (পৃ. ৩৬-৩৭)—

"সাধু ভাষাকে অসাধু অপবাদ দিবার প্রধান কারণ এই যে, ইহা সংস্কৃতবহুল,—সংস্কৃতের নাম উচ্চারণও নাকি পাপ। এখন যে ভাষা সন্তভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহা নাকি সংস্কৃতবর্জিত বলিয়াই উৎকৃষ্ট। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না, সংস্কৃত ও প্রাকৃত, বাংলা ভাষার এই দ্বিবিধ রূপ, যাহা দুই হইয়াও এক, তাহা আকস্মিক নয়, ব্যক্তিবিশেষের যদৃচ্ছারোপিত নয়, তাহা ইহার স্বাভাবিক বিকাশধর্মের বিবর্তন। বাংলা ভাষার জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত যে প্রকৃতি মজ্জাগত হইয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই আপাতবিরোধী ভঙ্গির সর্বতোমুখী সমন্বয় ঘটিয়াছে; এবং বাংলা ভাষা একাধারে গাম্ভীর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, সংযম ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপন প্রাণধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ভাষার যে ক্রমবিকাশ, তাহা এই অপূর্ব সমন্বয়েরই ইতিহাস।"

এই সমন্বয়ের তত্ত্ব চলতি ভাষার প্রয়োগকালে আমরা প্রায়শ বিস্মৃত হই, আর তারই ফলে চলতি ভাষা-চর্চার নামে কিম্ভূত এক ভাষাভঙ্গিকে প্রশ্রয় দিতে আজকাল আর কারও বাধে না। সে এমন এক ভাষাভঙ্গি যার অতীত নেই, আশ্রয়ভূমি নেই, যা শুধু মুখের কথার অনুসরণ ক'রে

শূন্যে ঝুলে আছে। গত সংখ্যায় রম্যরচনার আলোচনা-প্রসঙ্গে যে-জাতীয় ভাষারীতির সমালোচনা করা হয়েছে, তা প্রধানত এই ভাষার কোঠায়ই পড়ে। মুখের কথার হুবহু অনুসরণ করলেই স্বাভাবিক ভাষা হ'ল, এমন মনে করবার কারণ নেই। এইটি আমাদের বিশেষ ভাবে বোঝা দরকার, কেন-না এটি না বোঝার ফলেই আধুনিক বাংলা-ভাষার ক্ষেত্রে যত বিপত্তির উদ্ভব হয়েছে। স্বাভাবিকতার নামে স্বেচ্ছাচার ক্রমাগত প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে। মৌখিক ভাষা-ভঙ্গিম চলতি রচনাবিন্যাসের মধ্যে এমন একটা তারল্য ও চটুলতার সুর আছে যে, সূক্ষ্ম ধ্বনিসচেতন কানে তা খট্ ক'রে বাজে। ভাবের আশ্রয় শব্দ, শব্দের আশ্রয় ধ্বনি। ধ্বনিসম্পদে চলিত রীতির রচনা এতই দীন যে, শুধু এই কারণেই তাকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। গম্ভীর ভাবকে আটপৌরে ভাষার বেশ পরাতে গিয়ে আমরা শুধু যে তার সৌন্দর্যের হানি করি তাই নয়, তার স্বরূপেরও বদল ঘটাই। ডক্টর সুশীলকুমার দে যথার্থই বলেছেন "প্রাকৃত (চলিত) বাংলার মজ্জাগত শৈথিল্য ও দুর্বলতা, ইহার লঘু শব্দবিন্যাস, কেবল ওজস্বিতার নয়, রচনার সুষমা ও সামর্থ্যের অন্তরায়" (সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৯)।

সুন্দর, গভীর-গম্ভীর কথার উপর আটপৌরে ঘরোয়া ভাষার খোলস চড়ালে তার রূপের কী নিদারুণ হানি ঘটে, তার সবিনয় প্রমাণ-প্রমথ চৌধুরীর রচনা। একটি নমুনা দিই—

"কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো-কোনো কথায় মন ভেজে; এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মশার গুনগুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায়—অবশ্য যদি মশারির ভিতর শোওয়া যায়; আর দিনের আলোর সঙ্গে কাক-কোকিলের ডাক মানুষকে জাগিয়ে তোলে।"—"সবুজ পত্রের মুখপত্র," 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, উদ্ধৃত রচনাংশের ভাষাভঙ্গির মধ্যে আর যা-ই থাক্, ধ্বনিমাধুর্য নেই। এ ভাষার গড়ন বড় বেশি চাঁছাছোলা, বড় বেশি রিক্ত। ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যে ঝঙ্কার

নেই, কাঠিন্যের ভাব আছে। মুখের কথার আদল আনতে গিয়ে স্পষ্টতই রচনার মধ্যে তারল্যের সুর আমদানি করা হয়েছে। রসিকতার নামে চটুলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বেশি। হঠাৎ মনে হতে পারে, আমাদের বক্তব্য প্রতিপাদনের সুবিধার্থে উদ্দেশ্যের সহায়ক জুৎসই একটি বিক্ষিপ্ত অংশ এখানে তুলে দেখানো হয়েছে। তা নয়। এ রকম নমুনা বীরবলের রচনাবলীর মধ্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গ বর্জিত হওয়ার প্রশ্নও এ ক্ষেত্রে ওঠে না, কেন-না ভাবের নমুনা দেখাবার জন্য এ উদ্ধৃতি নয়, মুখ্যত ভাষার নমুনার জন্যই এ উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতিটির একটি অংশ প্রণিধানযোগ্য—"শব্দের শক্তি অপরিসীম"। অথচ আমরা জানি, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যে শব্দের শক্তি-সম্ভাবনা নির্মমভাবে অবহেলিত হয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত শব্দসম্ভারের ভিতর অর্থের যাথাযথ্য আছে, যুক্তিশৃঙ্খলা আছে, ব্যঞ্জনা-গুণ নেই। সংস্কৃতভাষাসুলভ উদাত্ত ধ্বনিময়তার অভাবে চৌধুরী মহাশয়ের প্রাকৃত বাংলা কেমন যেন শুষ্কভাষী ঠেকে। এ যেন গল্পবর্ণিত 'নীরসো তরুবরঃ পুরোতঃ ভাতি' আর 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'-র পার্থক্যকে কেবলই স্মরণ করিয়ে দেয়। শব্দঝঙ্কার প্রাথমিক গণ্যে নেই বললেই চলে। তাঁর কাব্যেও সুললিত পদের একান্ত অভাব। উদ্ধৃতির শেষাংশে মশার গুনগুনানির দ্বারা মানুষকে ঘুম পাড়ানোর কথা আছে। মনে হয়, কথাটির মধ্য থেকে বাচ্যার্থের অতিরিক্ত সূক্ষ্ম অর্থ চেষ্টা করলে নিষ্কাষণ করা যায়। ঘুমপাড়ানি গানের বদলে মশার গুনগুনানির সাহায্যে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলে কি ফল হতে পারে, সহজেই অনুমান করা চলে।

সাধু ভাষার তুলনায় চলিত ভাষাকে যাঁরা প্রাঞ্জলতর বলেন, বুঝতে হবে আমাদের সনাতন গদ্যরীতির সঙ্গে তাঁদের তেমন যোগ নেই। সাধু ভাষার রচনারীতির ভিতর যদি কোন আড়ষ্টতা থেকে থাকে, সে হচ্ছে সংস্কৃত শব্দের আধিক্যজনিত আড়ষ্টতা (এ আড়ষ্টতা শক্তিমানের লেখনীতে অনায়াসে নিরাকৃত হওয়া সম্ভব), সম্প্রসারিত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে স্বাভাবিকতার এতটুকু ব্যত্যয় সেখানে হয় না। 'করছে' বা 'খাচ্ছে'-র স্থলে 'করিতেছে' বা 'খাইতেছে' লিখলেই যেন

ভাল শোনায়। শেষোক্ত ক্রিয়াপদদ্বয়ের মধ্যে ধ্বনির ও ছন্দের যে সঙ্গতি আছে, স্পষ্টতই প্রথমোক্ত পদদ্বয়ের মধ্যে তা নেই। লিখিত ভাষায় 'যাচ্ছে-যাচ্ছে'-র ব্যবহার ত্রস্ত-ব্যস্ততার পরিচায়ক, খানিকটা সময় নিয়ে পদকে ছড়িয়ে বলার আয়েস তাতে পাওয়া যায় না। সংলাপের ভিতর ব্যস্ততা বেমানান ঠেকে না, কিন্তু বর্ণনাংশের মধ্যে সনাতন ক্রিয়ার রূপটিই যেন খোলে ভাল। সাধু ভাষাভঙ্গি, বিশেষ সাধু ক্রিয়ার ভঙ্গির মধ্যে একটা গাম্ভীর্যের আশ্বাস আছে, বলাই বাহুল্য এ গাম্ভীর্য চলতি রীতিতে পদে পদে ব্যাহত হয়।

একটা জিনিস ভাষামনস্কদের মধ্যে অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, যাঁরাই বাংলা ভাষায় সাধু রীতি বিলোপের পক্ষপাতী তাঁরাই আবার বাংলা-ভাষার কাঠামো থেকে সংস্কৃতকে ছেঁটে ফেলতে উদ্যমশীল। যোগাযোগটি আকস্মিক নয়। সংস্কৃতের সঙ্গে অবনিবনার থেকেই সাধারণত সাধু ভাষার সঙ্গে অবনিবনার সূত্রপাত। অধুনা নবীন-বয়সীদের মধ্যে সংস্কৃতের প্রতি যে সাধারণ বিমুখতা দেখা যায়, প্রায়ই তার ছাপ গিয়ে পড়ে তাঁদের রচনারীতির উপর। ফল হয় এই যে, তাঁদের লেখা সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্যবর্জিত মুখের কথারই একটা সংস্করণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা সাধু রীতির সঙ্গে যে লেখকের যত দূরবর্তী সম্পর্ক, তাঁর লিপিপদ্ধতিতে তারল্যের প্রভাব তত বেশি। মুখের কথার আদলে রচিত অতি সুন্দর ভাব-পরম্পরার মধ্যেও চটুলতার আমেজ থেকে যায়। এ কথার প্রমাণ পূর্বোল্লিখিত চৌধুরী মহাশয়ের গদ্য, অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের গদ্য এবং এখনকার অন্য দুই-চারিজন শক্তিশালী লেখকের গদ্য। এঁদের রচনায় ইংরেজীর প্রভাব যত সক্রিয়, বাংলা-ভাষার নিজস্ব সাধু রীতির প্রভাব তার সিকির সিকিও নয়। অথচ এ কথা কে না জানে যে, ঐতিহ্যানুমোদিত ভাষারীতির সঙ্গে যোগ ছিন্ন হ'লে ভাষার বুনিয়াদ পাকা হতে পারে না। বাংলা-গদ্যের ভঙ্গি, বিশেষ উনিশ শতকীয় গদ্যের ভঙ্গি, বিধিমতে আয়ত্ত না হ'লে বোধ করি চলিত ভাষা নিয়ে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত হয় না। সাধু ভাষার গাম্ভীর্য এবং চলিত ভাষার প্রবহমানতা দুই একত্র সম্মিলিত হ'লে তবেই

শুধু যথার্থ প্রাঞ্জল গদ্যরীতির উদ্ভাবনা সম্ভব। গোড়ায় যে কথা বলেছি সে কথায় ফিরে আসি—সাধু ভাষা ভালমত রপ্ত না হ'লে চলতি ভাষায় যদৃচ্ছা লেখনী চালনার অধিকার জন্মায় না। শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর-গুলিতে কথাটি আরও বিশেষ ভাবে খাটে। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু ১৯৫১ সালের নভেম্বর সংখ্যা *The Teachers' Journal*-এ যে কটি মূল্যবান কথা লিখেছেন, তা এখানে উদ্ধারযোগ্য ব'লে মনে করি। তিনি বলছেন—

"আজ বিশ-পঁচিশ বছর শিক্ষকতা করছি, এই দীর্ঘকাল ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে, বিদ্যালয়ে চলিত ভাষা প্রবর্তিত হওয়ায় ছাত্রদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। তারা ভাষা-শিক্ষায় অগ্রসর না হয়ে যেন ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে—শিখছে কম, ভুল করছে বেশি—আগের চেয়ে পরীক্ষায় ফেলও করছে বেশি। অধিকাংশ ছাত্রেরই শব্দসম্পদ অত্যন্ত অল্প, রচনাভঙ্গীও অতিমাত্রায় দুর্বল ও শিথিল আর বহু দোষে দুষ্ট। এ দুরবস্থার অন্যান্য কারণ যত-কিছুই থাক্, চলিত ভাষা চর্চা করবার এবং চলিত ভাষায় হালকা চালে লেখা অভ্যাস করবার প্রয়াস যে একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

বসু মহাশয়ের উক্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই সময় 'শনিবারের চিঠি'র "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯) সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছিল, সেটিও বক্ষ্যমাণ উপলক্ষে কম প্রণিধানযোগ্য নয়। মন্তব্যের অংশবিশেষ এইরূপ : "শুনিয়াছি, সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বাংলা-ভাষাতেই সাহিত্য-সৃষ্টিতে ভাষার দুই রূপ ব্যবহৃত হয়, সাধু ও চলিত। ইহার ফল শক্ত ও শিক্ষিতের বেলায় যেমন সুফলপ্রসূ ও অভিনব হইয়াছে, তেমনই অপটু ও অক্ষমের বেলায় হইয়াছে মারাত্মক ও সাংঘাতিক। পদ্যকবিতা পারঙ্গম হইলে যেমন গদ্যকবিতায় হাত খোলে, তেমনই সাধু ভাষার প্রয়োগে দড় হইলেই তবে চলতি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা যায়। সুতরাং এই কথাটাই আমরা বলিতে চাই যে, গোড়ার দুই-তিন ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাষা

যেন সাধু হয়। গোড়াপত্তন ঠিকমত না হইলে ভবিষ্যতে সমূহ বিপদ।*

অত্যন্ত খাঁটি কথা, এবং এই খাঁটি কথাটা ভাষা-প্রয়াসীদের মনে মুদ্রিত ক'রে দেবার জন্যই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। ভাষা সাহিত্যের বহিরঙ্গ মাত্র, ভাবই হ'ল আসল। তবু যে ভাববিচার ছেড়ে আপাতত ভাষাবিচারের উপর জোর দিতে হ'ল সে এই কারণে যে, ভাষা নিয়ে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে নিতান্ত স্বেচ্ছাচার চলছে। এই অনাচার আশু প্রতিরুদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা চলিত ভাষার বিরুদ্ধাচারী নই, শুধু এই আমাদের কামনা, যে ভাষায় আমরা মনোভাব প্রকাশে উদ্যত তার রূপটি যেন চটুলতাবর্জিত হয়, সৌম্য হয়। মৌখিক বাক্যরীতির অন্ধ অনুসরণ দ্বারা আমরা যেন বাংলা-গদ্যের গভীর-গম্ভীর রূপটির বিকার না ঘটাই। ইংরেজীতে মৌখিক ও লৈখিক ভাষারীতির মধ্যে বৈয়াকরণ-সুলভ পার্থক্য নেই, তার কারণ শিক্ষিত ইংরেজের মুখের কথা আর লিপির কথায় প্রভেদরেখা তেমন সুচিহ্নিত নয়। অথবা এমনও হতে পারে, ইংরেজের লিখিত ভাষা তাদের মুখের ভাষাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে দুই রীতির মধ্যে পার্থক্য ঘনীভূত হবার অবসর মেলে না। অতি লঘু মেজাজের ইংরেজী রচনায়ও ভাষার যে দৃঢ়সংবদ্ধতা ও সংযম লক্ষ্য করি, আধুনিক বাংলা চলতি রচনায় তা প্রায়শ দুর্লভ। চলতি বাংলা গদ্যের কাঠামোর উপর মৌখিক বাক্যরীতির অতিরিক্ত প্রভাবই এ জন্য দায়ী ব'লে মনে হয়। নিছক মুখের কথার অনুকরণে চলিত ভাষা লিখিত হচ্ছে ব'লে ভাষাব্যবহারে অনাচার কেবলই প্রশ্রয় পাচ্ছে। এ থেকে দুইটি বিকল্প সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। হয় মৌখিক বাক্যভঙ্গি থেকে লিখিত বাক্যভঙ্গিকে কথঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে আনতে হবে, নয়তো আমাদের খোদ মুখের কথারই কিঞ্চিৎ সংস্কার প্রয়োজন। বাস্তবসঙ্গতির খাতিরে যদি মুখের কথার অনুসরণেই চলিত ভাষার রূপায়িতকরণ সাব্যস্ত হয়, তা হ'লে বাঙালীর প্রচলিত কথ্যভঙ্গির পরিমার্জন ছাড়া গত্যন্তর দেখা যায় না।

নারায়ণ চৌধুরী

আত্মস্মৃতি

তৃতীয় প্রবাহ—নবম তরঙ্গ

কুয়াশা ও আশা

বহু বৎসর পূর্বে একবার ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। শীতকাল। বেলা দেড়টায় ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জ ছাড়িল। আকাশ প্রশান্ত নির্মেঘ নীল। মৃদুতরঙ্গস্পন্দিত নদীজলের উপর নির্মল প্রসন্ন রৌদ্র মার্জিত রৌপ্যপাতের ন্যায় ঝলমল করিতেছিল। সেই তরল ভাস্বরতার দিকে একটানা চাহিয়া চাহিয়া চোখ অবসাদগ্রস্ত হইতেই কেবিনে গিয়া গা এলাইয়া দিলাম। ইচ্ছা ছিল, তারপাশায় উঠিয়া ক্ষীর ও গরম রসগোল্লা খাইব। কখন তারপাশা পার হইয়া গেল, রৌপ্য কখন বিগলিত স্বর্ণের রূপ লইয়া শেষ পর্যন্ত নিকষ কালোয় পরিণত হইল, কিছুই জানিতে পারিলাম না; হঠাৎ একটা রূঢ় ধাক্কায় চকিত হইয়া জাগিতেই অনুভব হইল, চারিদিকে ক্রন্দন-কোলাহল শুরু হইয়াছে। সভয়ে বাহিরে আসিয়াই দেখি, দূরে কাছে কোনদিকে দেখিবার কিছু নাই, আমরা নিবিড় কুয়াশার আঁধির মধ্যে পড়িয়াছি। ষ্টীমারের অত্যুজ্জ্বল হেডলাইট গাঢ় শ্বেত যবনিকার সম্মুখভাগ মাত্র আলোকিত করিতেছে, পশ্চাদ্‌ভাগ মৃত্যুর মত রহস্যাবৃত অন্ধকারে বিলীন। অসহায় যাত্রীদের অধিকাংশ ইষ্টনাম ভুলিয়া আর্তনাদ করিতেছে। প্রবীণ-প্রবীণা দুই-চারজনের ইষ্টনামও কানে আসিল। কোথায় আসিয়াছি, কি হইয়াছে—কিছুই ঠাহর হইল না; এইটুকু মাত্র বুঝিলাম, দিশাহীন কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রষ্ট ষ্টীমার চড়ায় ঠেকিয়াছে। হাতঘড়িতে সময় দেখিলাম, রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে, এতক্ষণে প্রায় গোয়ালন্দ পৌঁছিবার কথা। কিন্তু সূচীভেদ্য কুয়াশায় বিপথে পরিচালিত হইয়া বন্দর হইতে কত দূরে অবস্থান করিতেছি জানিবার উপায় নাই। যাত্রীদের বিশৃঙ্খলা এবং সারেঙের চট্টগ্রামী ভাষা ভেদ করিয়া যাহা জানিলাম, তাহা আশাপ্রদ নহে। বাতাস স্তব্ধ; ভিতরের ভয় এবং বাহিরের গুমোটে প্রাণ যখন কণ্ঠাগত, সহসা বায়ুমণ্ডলে আলোড়ন আরম্ভ হইল; তীব্র ক্ষুরধার হিমেল হাওয়া দেখিতে দেখিতে ঝড়ের মূর্তি ধরিতে লাগিল। কুয়াশা নিমেষমধ্যে অপসারিত হইতেই বিস্মিত পুলকে বুঝিতে পারিলাম, বন্দর

অভি নিকটেই। গোয়ালন্দের আলোকমালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কুয়াশার অন্তরাল হইতে যেন হাসিয়া উঠিল। যাত্রীরা সমবেতভাবে জয়ধ্বনি করিল। মুহুর্মুহু বিপদসূচক বংশীধ্বনিতে বায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইতে না হইতেই ছোট-বড় দুই-তিনখানা ষ্টীমার আমাদের উদ্ধারসাধনে ছুটিয়া আসিতেছে দেখা গেল। শীতের বাতাস উপেক্ষা করিয়া যাত্রীরা পাটাতনে দাঁড়াইয়াই আনন্দ-কোলাহলে মত্ত হইল। নিরাপদ বন্দরে পৌঁছিতেও দেরি হইল না।

'প্রবাসী'-বন্দর ছাড়িয়া 'বঙ্গশ্রী'-বন্দরে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বেই আমাকেও কুয়াশার আঁধিতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই, বন্দর নিকটেই। দিশাহীন তমসার মাঝখানে যখন ছটফট করিতেছি, প্রথম বরাভয়-হস্তপ্রসারণ করিলেন দুই দিক হইতে দুইজন—সঙ্গীত-যাদু-প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত ও সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকার। বন্ধুবর সুবলচন্দ্রের মারফৎ বিমলের সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল এবং আমাদের পরস্পরের নিজগুণে ঘনিষ্ঠতা হইতেও বিলম্ব হয় নাই। এমন প্রত্যুৎপন্নমতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, চৌকস মানুষ আমি দেখি নাই; এমন সহৃদয় বন্ধুও নয়। বন্ধু বিপদে পড়িয়াছে শুনিলেই হইল, তাহার নিজের ক্ষমতা থাকুক নাই থাকুক, নানা যোগাযোগ ঘটাইয়া সে বন্ধুকে উদ্ধার করিবেই। সে অসঙ্কোচে যেমন লইতে পারিত, অকুণ্ঠচিত্তে তেমনই দিতেও জানিত। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর অনেকগুলি অপোগণ্ড ভাইবোনকে সে যেভাবে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, ঠিকমত লিখিতে পারিলে তাহা একটা মহাকাব্য হইবে। ভাইবোনেদের জন্য খাটিতে খাটিতে জোয়ালে-জোতা অবস্থাতেই অর্থাৎ উড়িষ্যার এক স্টেটে ম্যাজিক দেখাইতে দেখাইতে আমাদের এই উদারহৃদয় বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু হয়।

আমার আথিক বিপদ প্রণিধান করা মাত্র বিমল বলিল, তুই তো গান বাঁধতে পারিস, হাসির গান বা সুর দিয়ে গাইবার মত কবিতাও তোর অনেক লেখা আছে। নতুন গান লেখ্, আর পুরনোগুলো নিয়ে আয়। মুদ্রিত-অমুদ্রিত বই-খাতা, সাময়িক পত্রের ছেঁড়া পাতা ও টুকরা কাগজ

এক গাদা তাহার নিকট দাখিল করিলাম। সে বিশল্যকরণী বাছার মত বহু কষ্টে কয়েকটা গান বাছিয়া লইয়া সুর দিতে বসিল এবং অচিরাৎ একদা দ্বিপ্রহরে আপার চিৎপুর রোডের উপর অবস্থিত "হিজ মাস্টার্স ভয়েস" কোম্পানির মহড়াগারে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা একজন ভট্টাচার্য মহাশয়ের দরবারে আমাকে স্বয়ং হাজির করিল। আয়নার মত ঝকঝকে টাক এবং তীক্ষ্ণখড়্গনাসা মুখ, বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। শুনুন ভট্চায মশাই।—বলিয়াই হারমোনিয়াম টানিয়া লইয়া বিমল আরম্ভ করিয়া দিল। এমন দরদ দিয়া বিমল গাহিল যে, ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'না' বলিবার উপায় রহিল না। আমি পরীক্ষায় পাস করিয়া গ্রামোফোন কোম্পানির গানের কথার জোগানদার-শ্রেণীভুক্ত হইলাম। দর—মৃত্যু-বিরহ-দীর্ঘশ্বাস-ভক্তি-ভালবাসা ও স্বদেশপ্রেম বিষয়ক গান পিছু পাঁচ টাকা, হাসি-কৌতুকের গান ও মজাদার কেচ্ছা পিছু দশ টাকা। প্রথম দিনের নির্বাচনেই পঁয়ত্রিশ টাকা রোজগার হইল।

কাজী নজরুল তখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে হেড কম্পোজার ও ট্রেনার। স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংস বলিয়া তখন কোম্পানিতে তাহার অসম্ভব খাতির। সে পানের পিক ফেলিবে জানিলে স্বয়ং ভটচায মশাই পিকদান হাতের কাছে না পাইলে নিজের টাকটাই পাতিয়া দিতে পারেন। কাঁচা পরিচয়ের প্রেমে সেও সর্বতোভাবে আমার সহায় হইল। স্বয়ং আর্মার কয়েকটি গানে সুর দিয়া আমার প্রতিষ্ঠাও বাড়াইয়া দিল। ফলে আমার একটা ভাল আয় দাঁড়াইয়া গেল। অব্যবহিত পরে বিমল গ্রামোফোন কোম্পানির "টুইন" বিভাগের সেরা ওস্তাদ নিযুক্ত হইলে আয়ের অঙ্ক আরও একটু বাড়িল। প্রায় এই সময়েই কলের গান সংক্রান্ত সামগ্রীর প্রখ্যাত ব্যবসায়ী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "মেগাফোন কোম্পানি" স্থাপন করিয়া রেকর্ড প্রস্তুত ও বিক্রয়ের কাজে অবতীর্ণ হইলেন। বিমল সেখানেও ট্রেনার বা ওস্তাদের কাজ পাইল। মেগাফোন-ছাপে আমারও গান বাহির হইতে লাগিল।

আয় তো বাড়িলই, নিরবচ্ছিন্ন অবসর যাপনের অবকাশ, সোজা বাংলায়—ঢালাও আড্ডা দিবার সুযোগ পাইয়া সেই অস্রাবহ বেকার

অবস্থায় যেন বাঁচিয়া গেলাম। দ্বিপ্রহরে চিৎপুর রোডের গ্রামোফোন কোম্পানির এবং সন্ধ্যায় হ্যারিসন রোডের মেগাফোন কোম্পানির শিক্ষাকেন্দ্রের বিস্তৃত ফরাসে দেহ এলাইয়া আড্ডা ও বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে চোখ ও কানের বিবিধ উপরি খোরাক জুটিত। কখনও কখনও এই সকল স্থানেই রেকর্ডের জন্য ফরমায়েসী গান অথবা 'শনিবারের চিঠি'র জন্য প্রবন্ধ কবিতা গল্প লিখিতাম। কাজী নজরুল এই সময়ে একদিন মেগাফোনের আড্ডায় তাহারই "কাণ্ডারী হুঁসিয়ার"কে ব্যঙ্গ করিয়া লেখা আমার "ভাণ্ডারী হুঁসিয়ারে" সুর দিয়া গাহিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। গানটি বিমল দাশগুপ্তের কণ্ঠে মেগাফোন রেকর্ডে বিধৃত হইয়াছিল। প্রথম দুই লাইন এই—

চোর ও ছ্যাঁচড় ছিঁচকে সিঁধেলে দুনিয়া চমৎকার,
তল্পিতল্পা-সহবিল নিয়ে ভাণ্ডারী হুঁসিয়ার।

বিমল তৎকালীন প্রধান সমস্যা—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া লিখিত আমার "আলু ও পেঁয়াজ" কবিতাটির প্রথমাংশে কীর্তন ও শেষাংশে গজলের সুর যোজনা করিয়া ও স্বয়ং গাহিয়া বহু আসর মাত করিয়াছিল। ভটচায মহাশয়ের আগ্রহে গানটি একটি গ্রামোফোন রেকর্ডের দুই পিঠে স্থায়িত্বলাভ করিয়াছিল। গানটির বিষয়বস্তু আজিও পুরাতন ইতিহাস হইয়া যায় নাই, জীবন্ত বর্তমানেরই সামিল হইয়া আছে বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছি—

আলু। মিনতি করি, শোন কালু মিয়া,
ভিন্দালু রাঁধ যদি আমারে নিয়া,
শোন দোহাই তব
বেশি কি আর কব,
আহা ফুটিফাটা বেদনায় বিদরে হিয়া।
মোরে যা খুশি রাঁধ
শাক বাঁধনে বাঁধ—
শুধু জাতটি মেরো না পল-অণু দিয়া।
দেখ হদিসে যদি সে তব হদিস পাকে,
মোরে কল্মা পড়ায়ে দিও কল্মি-শাকে।

দিও টম্যাটো-ওলে
ফুল- কপির ঝোলে,
দিও কচুর সাথেতে মোর নেকাহ্-বিয়া।
ফেলে পেঁয়াজে মোরে
মেরো নাকো বেঘোরে,
ওগো হ্যা হও তা হও তুমি সুন্নি-শিয়া।
খাসী- মাংসে ফেলিয়া মোরে বানিও কাবাব,
দিও চপ-কাটলেটে তাতে ক্ষতি নাহি সাব,
হীন বেসনে ফেলে
তুলো ভাজিয়া তেলে,
রব ফাউলে বাউল হয়ে কারি বনিয়া।
নীচ পিঁয়াজের সাথ
মোরে ক'রো না বেজাত,
মোরে প্রাণে মারো, মেরো নাকো জাত মারিয়া।
পিঁয়াজ। হরি ঠাকুর শোনো, তেরা টিকিব কিরে,
মোরে অম্বলে দিও দিয়ে কোড়ন জিরে,
লাগে খোদার কসম
যদি রাঁধ আলু দম,
মোরে দিও না তাহাতে ফেলে দু ভাগে চিরে।
মোর করিও ভাজি,
তাতে নহি নারাজী,
শুধু ফেলো না কাফেরী-ফেরে কলিজা ছিঁড়ে।
তব শাস্ত্রে যদিবা কিছু আস্থা থাকে,
মোরে শুদ্ধি করিয়া দিও মূলোর শাকে।
শোন তোমায় বলি,
দিবে কাঁচা কদলী
বেঁধো শুক্তো অথবা ফেলো ঘণ্ট-ভিড়ে।
গোল আলু-ভাগাড়ে
ফেলে মেরো না হারে—
দিও থেঁৎলে বরং মেরে মুগুর শিরে।
ফেলে মাংসে পাঁঠার রেঁধো ঘুগ্‌নি-দানা,
দিও কুমড়ো-ছোকায় আমি করি না মানা;

তব দোহাই ঠাকুর,
মোরে ভেজো চানাচুর—
শুধু মেরো না আমার জাতি-ধরমটিরে।
সব সহিতে পারি
পারি ছাঁটিতে দাড়ি
শুধু আলু-চুঁৎ হ'লে ভাসি নয়ন-নীরে॥

শ্রীহরি ঠাকুর আর কালু মিঞা,
একই দেহ দুই রূপ দেখ বুঝিয়া।

এই গানটির জন্য আমি ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। সে যুগে সে এক মস্ত সম্মান। যাহা হউক, গান ও "অভিজ্ঞতা"র সঞ্চয় প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল, অর্থ তো পাইলামই; বহু প্রখ্যাত গায়ক-গায়িকা ও বাজিয়েদের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মিল।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকারও আমার আয়ের পথ সুগম করিবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। তখন কলিকাতার বেতার-প্রতিষ্ঠান বেসরকারী অথবা আধা-সরকারী, নাম ছিল মার্কনি ওয়ারলেস অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং বা এই ধরনের একটা কিছু। তখন কর্তা ছিলেন একজন স্টেপলটন সাহেব, ছোট কর্তা—নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, খ্যাতনামা ক্ল্যারিওনেট-বাদক। নলিনীকান্ত নৃপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কাজেই তাঁহার প্রয়াসে কাজ হইল। বেতারে মাসে অন্তত একবার শনিমণ্ডলের আসর বসিতে লাগিল। এক ঘণ্টার প্রোগ্রাম বাবদ পরিচালক হিসাবে আমি পঁচাত্তর টাকা করিয়া পাইতে লাগিলাম। নলিনীকান্ত আমার গৃহরঞ্জন করিবার জন্য মাসিক সামান্য ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে একটি বেতার যন্ত্রেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—আমার দুই প্রিয় সোদরোপম ঘনিষ্ঠ সাহিত্যবন্ধু—এই আসরের দৌলতেই তাঁহাদিগকে পাইয়াছিলাম। এখানেও কাজী নজরুল আমার সহায় হইয়াছিল। শনিমণ্ডলের আসর অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। তখন সুবিধা ছিল, স্ক্রিপ্ট বা লেখা আগাম দাখিল করিতে হইত না, মাইকের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বক্তব্য প্রস্তুত করা চলিত। 'শনিবারের চিঠি'

হইতে পাঠ-আবৃত্তি-গানই হইত বেশি। রেডিওর এমনই একটি আসরে কাজী আমার 'পথ চলতে ঘাসের ফুলে'র কয়েকটি গান গাহিয়াছিল।

এই সময়কার 'শনিবারের চিঠি'র আপিসের একটি চিত্র "পুরাতনী" নাম দিয়া ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর ডিসেম্বর, 'শনিবারের চিঠি' বৎসর-কালের অজ্ঞাতবাসের শেষে সদ্য স্থাপিত নিজস্ব ছাপাখানা "শনিরঞ্জন প্রেস" হইতে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় পাকাপাকি রকম ডেরা বাঁধিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি' আপিসে প্রত্যহ নিয়মিত আড্ডা জমিতেছে—প্রায় নন্-স্টপ্, তবে তেজটা সন্ধ্যার ঝোঁকেই বেশি। দীর্ঘ বিরোধের পর কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন হইয়াছে। তিনি প্রায় আসিতেছেন এবং হাসি গান ও পানের পিকে আসর সরগরম করিয়া তুলিতেছেন; পাশেই অবস্থিত চায়ের দোকানটি কাজেই দ্রুত ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তখন আমাদের ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইডের কাজ করিতেছেন। মনিটার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' আপিসের চাকুরি-অন্তে বৈকালে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের মুখে দৈনিক রোদ সারিয়া চলিয়া গেলে আমাদের নিশীথ মজলিস বসিত, শত্রুরা অভাব করিয়া বলিত—ভৈরবী-চক্র। নলিনীকান্ত সরকার প্রায়শই প্রথমার্ধের উৎসাহ বর্ধন করিয়া দ্বিতীয়ার্ধে কাটিয়া পড়িতেন, রাত্রির গভীরতার সঙ্গে আমাদের সাহিত্য-সাধনা নিবিড়তর হইত, পাশেই বস্ত্রহীন ছাপাখানার দুই হাতের কম্পোজের কাজ চলিতে থাকিত।

একদিনের বৈকালিক সভা, তারিখ ঠিক মনে নাই; এইটুকু স্মরণ আছে—অসহযোগ আন্দোলন প্রশমনের জন্য সরকার কি একটা কঠিন আইন জারি করিয়াছেন, সেই দিন প্রাতেই দুঃসংবাদ দৈনিকপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্র মৈত্র খালি গায়ে একটি মোটা কম্বল চাদরের মত জড়াইয়া খবরের কাগজ বগলে প্রবেশ করিলেন, হাতে কলেজ স্ট্রীট প্রাঙ্গণ হইতে সদ্যকেনা একটি বই—রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবনী ও অনেকগুলি কৌতুকাবহ পাদপূরণ কবিতার সংগ্রহ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নূতন মেরুন-রঙের ক্রাইসলার গাড়ি হইতে তাম্বূলরাগবঞ্জিতবক্ষ কাজী নজরুলের প্রবেশ এবং হুঙ্কার, "দে গরুর গা ধুইয়ে।" এটি তাঁহার সন্ধ্যা ভাষায় চায়ের হুকুম। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পাশের দোকান অভিমুখে ছুটিলেন। রবি তখনও কম্বলের খোলস ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার মুখখানা বজ্রবর্ষী মেঘের মত থম্ থম্ করিতেছিল। চা আসিতেই সর্বাগ্রে একটি বাটি টানিয়া লইয়াই তিনি বোমার মত ফাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, আবার এই নতুন নাগপাশের জ্বালায় ছেলেরা আর কেউ বাঁচবে না। আমরা চায়ের বাটিতে হাত রাখিয়া প্রশ্নাতুর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতেই তিনি বজ্রনির্ঘোষে নূতন আইনের সংবাদ ঘোষণা করিয়া টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত

করিয়া বলিলেম, প্রতিবিধান নশ্চেষ্ট ব'সে থাকবে তোমরা! নজরুল এই অবসরে রবির সংগৃহীত বইখানির পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেম, বেশ, কাজে লেগে পড়া যাক। রসসাগরের পাদপূরণ পদ্ধতিতে আমরা এর প্রতিবাদ করি এস। বলিয়াই তিনি শুরু করিলেন—

পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল আজ
ভাগো ভাগো, মীন-বৎস!

আমি জুড়িয়া দিলাম—

আসিয়াছে যত জাঁদরেল জেলে
সাবাড় করিতে মৎস্য।

উভয়ের সমবেত চেষ্টায় শেষটা এইরূপ দাঁড়াইল—

কাজী। ফেলিয়া খ্যাপলা জাল জেলে-দল
ধরিযাছে রুই-কাৎলা,
আমি। চুনোপুঁটি সব মাবিবে এবাব
পুকুর করিবে পাতলা।
কাজী। পুকুবের জল ঘোলা ক'রে তোরা
ভরালি আঁশটে গন্ধে,
আমি। এইবার এসে ঢোকো একে একে
জেলেব গিঁঠানো রন্ধ্রে।
কাজী। লাফাইতে গেলে কোপাইয়া দেবে
হয়তো বা আঁশ-বঁটিতে,
আমি। অথবা ধরিয়া ঘাড় মুচড়িযে
ভবিবে কোঁচড়ে কটিতে।
কাজী। কাদা খেয়ে আর খাবি খেয়ে ছিলি
বাঁচার অধিক মরিয়াই,
আমি। জেলের খাঁচাতে তড়কা ধরিয়া
মবিযা যাইবি তবিয়াই।...

এই পাদপূরণ খেলায় রবির ক্রোধ অনেকখানি প্রশমিত হইল।...

এই আড্ডায় শ্রদ্ধেয় শরৎ পণ্ডিত দাঠাকুর মহাশয় প্রায়ই আসিতেন। কাজী নজরুল ও আমার মাথামাথি বন্ধুত্ব লইয়া তিনি একটি অতি সরস, আমাদের পক্ষে ড্যামেজিং, ছড়া বাঁধিয়া তখন সকলকে শুনাইতেন।

'বসুমতী'র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার একেবারেই পরিচয় ছিল না। 'প্রবাসী' ছাড়ার পর দুই-তিন মাস

অতিক্রান্ত হইয়াছে, অবস্থা সঙিন। বারান্দায় শীতের রোদে-পিঠ দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, সদর রাস্তায় মোটর কার থামিবার শব্দ এবং পরক্ষণেই আমাদের গলিতে ক্রমাগ্রসরমাণ এক জোড়া পদশব্দ শুনিলাম। কেহ আমারই সন্ধান করিতেছেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং গাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে না কাটিতেই 'দৈনিক বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গ" নামক সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখকরূপে মাসিক এক শত টাকা বেতনে বাহাল হইয়া গেলাম। আমাকে কোথায়ও যাইতে হইবে না, প্রত্যুষে দৈনিক পত্রগুলি আসিবে, সেগুলিরই সংবাদ বা মন্তব্যের উপর প্যারার মত করিয়া মন্তব্য লিখিয়া দিতে হইবে, বেলা দশটা নাগাদ সাইকেল-পিয়ন আসিয়া লইয়া যাইবে। বেতনও লোক-মারফৎ আসিবে। গ্রামোফোন-রেডিওর অনিশ্চিত আয়ের বিষম ধকলের মধ্যে খানিকটা শক্ত মাটির আশ্রয় মিলিল। সতীশচন্দ্র আমার নিদারুণ দুরবস্থার কথা কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন কি না জানি না, তাঁহার অপ্রত্যাশিত সাহায্য দেবতার কৃপারূপেই গ্রহণ করিলাম।

কুয়াশার আঁধি ছিন্নভিন্ন করিবার সুবাতাস সতীশচন্দ্রই সঙ্গে আনিলেন—আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। নিয়মিতই লেখা জোগাইয়া চলিলাম, কখনও গাফিলতি হয় নাই। বাংলা ২৬এ চৈত্র, ১৯৩২এর এপ্রিল মাসের কোনও একটি দিন বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান উপলক্ষে তাঁহারই সম্বন্ধে "সাময়িক প্রসঙ্গ" লিখিলাম। সুবাতাস তাহা বহন করিয়া বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সুদক্ষ পরিচালক, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের দৃষ্টিপথে লইয়া গেল। আমি তখন কিছুই জানিতে পারিলাম না, কুয়াশার মধ্যেই হাঁপাইতে লাগিলাম।

হাঁপাইতে লাগিলাম, কারণ হঠাৎ 'বসুমতী'-লব্ধ দম ফুরাইল। "সাময়িক প্রসঙ্গে"র এক কিস্তিতে বাংলা দেশে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুনারীহরণের উপর একটি কঠিন গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বসিয়াছিলাম। তাহাতে দণ্ডবিধি আইন ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগে প্রমাণ-

করিয়াছিলাম যে, ধর্ষণকারী অথবা ধর্ষণেচ্ছু ব্যক্তিকে হত্যা করিলে কোনও অপরাধ হয় না এবং তাহাই করা উচিত। বাংলা দেশে মুসলমানী শাসন তখনও প্রবল না হইলেও তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কাজেই 'দৈনিক বসুমতী' আইনের কবলে পড়িল। বিচারে জমার টাকার (তখন বিদ্রোহী পত্রিকাগুলিকে রাজদ্বারে দুই-দশ হাজার টাকা জমা রাখিতে হইত) মধ্যে এক হাজার জব্দ হইবার হুকুম হইল। সতীশচন্দ্র ভয় পাইলেন এবং আমিও তাঁহার স্নেহাশ্রয়চ্যুত হইলাম। আমার অত্যন্ত দুঃসময়ে সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

কুয়াশার মধ্যে আরও দুই দিক হইতে সুবাতাস বহিয়াছিল। হেমন্তবালা দেবীর কথা বলিয়াছি। তিনি আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বিরূপ রবীন্দ্রনাথকে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতেছিলেন। নিতান্ত অবসর বিনোদনের খেলা—চিঠি লেখার খেলায় তিনি তখন রবীন্দ্রনাথকে অবিরত যোগ দিতে আহ্বান করিতেন। তাঁহার আশেপাশে প্রত্যহ দুঃখকর বা কৌতুককর যাহা কিছু ঘটিতেছে, বিশেষ করিয়া আমার গলিপথ দিয়া কখন কি ধরনের সাহিত্যিক আমার সহিত সমাগত হইবার জন্য আসিতেছেন, তাঁহাদের চলন বলন চেহারা ধরন প্রভৃতি খুঁটিনাটির নিখুঁত বর্ণনা মাসীমা নিয়মিত পাঠাইতেন, এবং রবীন্দ্রনাথকে তাহা হজম করিতে হইত। আমার অনেক পারিবারিক—মায় চাল-ডাল-নুন-তেলের খবরও রবীন্দ্রনাথকে শুনিতে হইত। মাসীমার ছেলে-মানুষিও অনেক ছিল। যেমন, এত সব সাহিত্যিক সজনীকান্তের কাছে আসেন, আপনি কেন আসিবেন না? এই সকল চিঠির নকল ও রবীন্দ্রনাথের জবাব আমি পরে দেখিয়া কৌতুক ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। উপরের প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, কেন আসিব না, সজনীকান্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেই যাইব। মাসীমা রবীন্দ্রনাথের কাছে কাঞ্জীর টাকের এবং পানখাওয়ার ধরনের একটি অপরূপ বর্ণনা দাখিল করিয়াছিলেন। বারম্বার আঘাতে রবীন্দ্রনাথের শক্ত বিরাগের ভিত্তিমূল মাসীমা নিশ্চয়ই শিথিল করিয়া আনিয়াছিলেন,

নতুবা কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহ আবার লাভ করিলাম কেমন করিয়া?

ঠিক এই রবীন্দ্র-বিরাগ-কালে দাদামহাশয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহও কম আশা যোগায় নাই। এই সময়েই তাঁহার সহিত নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ঘটে। তিনি কি চোখে আমাদের দেখিয়াছিলেন তাঁহার "স্মৃতিকথা" (১৩৫০) হইতেই তাহা উদ্ধার করিয়া শুনাইতেছি—

"স্বামীহারা ভাগ্যহীনা অকালবিধবা যেমন তার একমাত্র শিশুপুত্রটিকে নাড়াচাড়া ক'রে আশার আলোক সৃষ্টি ক'রে দুঃখের পথ অতিক্রম করে, আমরাও জ্ঞানে হোক্ অজ্ঞানে হোক্, বুঝে হোক্ না-বুঝে হোক্, সাহিত্যকেই দুঃখের দিন কাটাবার উপায়ের মত গ্রহণ করেছিলুম। তাতে কোন্ সুখ আছে, সে আমাকে কি দেবে—কেউ আমাদের ব'লে দেন নি। সাহিত্য তাকে নিজেই টেনেছিল।

দেখি বালকেরাও পল্লীতে পল্লীতে, হাতে লিখে পত্রিকা বার করছে। বিদেশেও যেখানে বিশ ঘর বাঙালী আছেন, সেখানেও এই হাওয়া বইছে। যুবকদের মধ্যে তো থাকবেই—থাকবার কথাই। সে সব ছাপার অক্ষরে পাকা দলিল হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেবার ইচ্ছা-আগ্রহের ত্রুটি নাই। কিন্তু একটি অভাব লোকের নজরে পড়ে—সেবা যেন দায়িত্ব-ভোলা। এতে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে, সাহিত্যনিষ্ঠ চিন্তাশীলেরা বিচলিত হন।

তরুণেরাই যে ভবিষ্যতের ভরসা, উত্তরাধিকারী—child is the father—সাহিত্য যে নিজত্ব খোয়াবে, জাতীয় বিশেষত্ব হারাবে। কিন্তু এই আকস্মিক novelty'র স্রোতকে বাধা দেওয়াও সহজ নয়, তারও মোহ আছে, সে নূতন যে। এবং যথাসময়ে মোড় ফেরাবার প্রয়াস ও যত্ন পাওয়াই সমীচীন। তখন সেটা বিবেচনা ব'লে বিজ্ঞতার বাধার মধ্যে ঠেকে থাকে, অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বাইরের বিরোধ মাথা পেতে নেবে কে। মানুষ অনেক কিছু পারে, কিন্তু যেচে নিন্দাভাজন হতে চায় না।

এই অবস্থায় সহসা তাঁরা অযাচিতভাবে যাঁকে পান, তিনিই আমাদের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। ১৩।১৭ বৎসর পূর্বে বীরভূমের এই বীর যুবকটি ছিলেন আমাদের অপরিচিত। ক্রমে আত্ম-প্রকাশে তাঁকে পেলুম প্রবল aggressive সাহিত্যপ্রেমিকরূপে, যৌবন-ধর্ম-সুলভ উগ্র ও ব্যগ্র কর্মী।

তাতে বিবেচকরাই বেশি চমকে যান, কিন্তু মনে মনে অনুচ্চারিত স্বাগতম্‌ও জানান।

আমাদের রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী-উৎসবে [১১ই পৌষ, ১৩৩৪] কলিকাতা যাই ও ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার অধুনা ৺ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য স্বীকার করি। দয়া ক'রে অনেকেই দেখা করতে আসতেন। সেই ভাগ্যলব্ধ প্রবাহের সুমধুর দানের মত একদিন দুই বন্ধুর আগমন হয়। তাঁরা সরাসরি সাহিত্যের কথা আরম্ভ ও প্রায়

দেড় ঘণ্টায় শেষ করেন। এমন সাহিত্যরসপুষ্ট উচ্ছ্বসিত সাহিত্য-কথা পূর্বে শুনি নাই। মগ্ন প্রেমিক, সাহিত্যই ধ্যানজ্ঞান। পরিচয়ের আদানপ্রদান বা অন্য কথা—অবান্তর।

অবাক হয়ে উপভোগ করছিলাম, অপরেশবাবুও উপস্থিত ছিলেন। আগের কথাটা শেষে পেলুম, একজন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, দ্বিতীয় আমার প্রিয় প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। তাঁরা আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রে গেলেন।

অপরেশবাবু বহুদর্শী লোক ছিলেন, বললেন, 'এঁরাই একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধক,—দেশকে অনেক কিছু দিতে এসেছেন, দিয়ে যাবেন।' তিনি আজ এ রঙ্গভূমে নাই, কিন্তু সেই অভিজ্ঞ প্রবীণের কথা সার্থক হয়েছে। থাকলে কত আনন্দই পেতেন।"

সুনিবিড় কুয়াশার মধ্যে চড়ায় ঠেকা অবস্থায় আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল না যে, 'বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গে" বঙ্কিমচন্দ্রের তমোনাশী প্রভাব তখনই আমার উদ্ধারসাধনে কার্যকরী হইয়াছিল, বন্দরাগত সমধর্মী বন্ধুদের প্রসারিত কর শিথিল হইবার পূর্বেই স্থায়ী চাকরির আকারে তাহা দেখা দিল। কিন্তু মজার কথা এই যে, যোগাযোগ ঘটিল একটু তির্যকভাবেই। ভট্টাচার্য চৌধুরী কোম্পানি তখন মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে 'উপাসনা' প্রেস খরিদ করিয়াছেন এবং শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বন্দোবস্তে তাঁহার 'উপাসনা' পত্রিকাটিকে ঢালিয়া সাজিতেছেন। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত 'উপাসনা'র সাড়ম্বর ঢক্কা-নিনাদী বিজ্ঞাপনকে কঠিন ব্যঙ্গ করিয়া আমি 'শনিবারের চিঠি'র "সংবাদ-সাহিত্যে" কিছু মন্তব্য লিখিয়াছিলাম। একনায়কত্বে অভ্যস্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়কে উত্তেজিত করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। আজ বুঝিতে পারি, তিনি আমার ধৃষ্টতায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, জীবিত বা মৃত আমাকে ধরিয়া আনা চাইই। হয় শির লইবেন, নয় শিরোপা দিবেন। আমার ভাগ্য সবে সুপ্রসন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই শিরোপাই আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে লইবার জন্য রথ আসিতেছিল। চীনাংশুক-কেতনের মত পুরোগামী হইয়া সাহিত্যিক শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীকিরণকুমার রায় একদা আমার আবাসে দর্শন দিলেন। [ক্রমশ]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বিচার

আপিসের অভিধানে 'বিস্ময়' ব'লে কোনও শব্দ নেই। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত একঘেয়ে কলম-পেশা, পানের সঙ্গে দোক্তা নয় তো জর্দার ছিটের মত মাঝে মাঝে রসাল আলোচনা, মধ্যে মধ্যে বড়বাবু, নয় তো বড় সাহেবের হাঁকডাক—পরিণতির এইটুকু বাঁধা রাস্তা ধ'রেই দিনের পর দিন তথা মাস ও বছর কেটে যায়। এ হেন জায়গায় সেদিন দস্তুরমত কৌতূহল সৃষ্টি করল পুরন্দর। বেলা তখন বারোটা বাজে কি বাজে নি। দ্বিপ্রাহরিক রোঁদ থেকে ঘুরে এসে প্রথমে হরেনের, তার পর আরও দুজনের পিঠে ঠেলা দিয়ে বললে, শুনেছ?

এ রকম ধাক্কা দিয়ে শোনানো অভ্যাস আছে পুরন্দরের। হরেন ঝাঁকিয়ে উঠে বললে, এনেছ তো গুল। ধাক্কাধাক্কি না ক'রে সোজা ব'লে ফেলো না বাবা। খালি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল পুরন্দর। হেসে আবার বললে হরেন, কি? ডিয়ারনেস বাড়ছে, না, স্কেল রিভাইজ্‌ড্ হবে? এ নিয়ে অন্তত দশবার হ'ল।

না না, ও-সব কিছু নয়। তোমাদের মিস ওনিলের বিয়ে যে। বাস্তবিক চমক ছিল খবরটায়।

দূর থেকে ধমক দিয়ে উঠলেন বড়বাবু, ওখানে ভিড় করছ কেন হে? যাও, যে যার সীটে গিয়ে ব'স। বিশেষ কেউ সরল না দেখে নিজেই এগিয়ে এলেন বড়বাবু। সেই ফাঁকে কে একজন তাঁকে শুনিয়ে বললে, মিস ওনিলের বিয়ে সার্।

আপিসের রিসিভিং সেকশনে কাজ করত ওনিল। মেয়েদের সরকারী আপিসে ঢোকবার বয়সের বিশেষ কোন বাছবিচার ছিল না তখন। মুখে পঁয়ত্রিশ বললেও গালের চামড়া কুঁচকে ঝুলে এসেছিল ওনিলের। কালো ফিরিঙ্গীর বব্‌ড্ চুলের বারো আনার ওপর সাদা হয়েও গিয়েছিল। তবুও লিপষ্টিক মাখত ঠোঁটে, রুজের ছোঁয়া লাগাত গালে। সমবয়সী সহকর্মীদের এড়িয়ে চললেও অল্পবয়সী ছেলেদের ডেকে ডেকে গল্পও শোনাত।

আস্তে আস্তে সীটে গিয়ে বসলেন বড়বাবু। তেরো-চোদ্দ বছরের বিপত্নীক জীবনে হাসির একটু বাজে খরচ ক'রে বললেন, একবার দেখেই এস না কেউ। এখানে জটলা ক'রে কি হবে?

তখনও যুগের হাওয়া পালটায় নি। বাঙালী মেয়েদের আপিসে তো দূরের কথা, ড্যালহাউসি স্কোয়ার বা ক্লাইভ স্ট্রীট এলাকাতে ভুলেও কোনদিন দেখা যেত না। সরকারী বেসরকারী আপিসের কেরানীদের গতানুগতিক জীবনে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের ছিটেফোঁটা মিশিয়েই কোন-রকমে দশটা পাঁচটা সই করতে হ'ত। সরকারী আপিসের সাধারণ মাইনের স্কেলে রূপযৌবনসম্পন্না কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বরাননা নিজের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জড়াতে চাইত না।

দেহসৌন্দর্যের হীনাবস্থাবশতই হয়তো মিস ওনিল সরকারী আপিসে কাজ করতে এসেছিল। যথার্থ রসিক বা উচ্চরুচিসম্পন্ন, তা ছেলেই হোক আর বুড়োই হোক, কোনদিনই ষোল আনা মন নিয়ে দেখে নি ওনিলকে। কেন বিয়ে হয় নি, কোনদিন হবার আশা আছে কি না—ওনিল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ছিল এ সব জিজ্ঞাসা। ভারী বয়স, মেদবহুল দেহ, অপেক্ষাকৃত বেঁটে বেঁটে হাত-পা, কাঁচা-পাকা চুল, ওপর ঠোঁটের ওপর মোটা একটা কালো তিল—সব কিছু মিলিয়ে একটা অনাবশ্যক সৃষ্টি ওনিল।

বড়বাবুকে আর দেখে আসতে লোক পাঠাতে হ'ল না। এক হাতে তাড়াবন্দী কাগজ, এক হাতে রেজিস্টার নিয়ে ঘটনাস্থলে নিজেই এসে হাজির হ'ল ওনিল।

এস এস মেমসায়েব। তুমি কাগজ বিলি করতে? ব্যাপার কি?—নিয়ার-ভিশনের চশমাখানার ফাঁক দিয়ে চেয়ে বললেন বড়বাবু।

বিনা নিমন্ত্রণে চেয়ার টেনে ব'সে বড়বাবুর টেবিলে কাগজ খাতা নামিয়ে রাখল ওনিল। বললে, গুড আফটারনুন বোস। আই হ্যাভ গট এ পিস অফ গুড নিউজ ফর ইউ অল। আই অ্যাম গেটিং ম্যারেড।

দেখতে দেখতে ছেলে-বুড়োর বেশ একটা ভিড় দাঁড়িয়ে গেল বড়বাবু আর ওনিলের চারপাশে। তদানীন্তন রাজভাষাভাষিণী হ'লেও ইংরেজীতে কোনদিন কথা বলত না ওনিল।

বেশ বেশ, এ তো সুখের কথা। তা আমাদের খাওয়াটা হচ্ছে কবে?—পুরন্দর বললে।

নিশ্চয়ই হবে। তোমাদের সকলকে নেমন্তন্ন করব।—মোলায়েম ধরনের হাসি হেসে চোখ বুজে কি ভাবল ওনিল। প্রকাণ্ড হলঘরের মৃদু বাতাসে যেন একটা হাল্কা কৌতূহল এনে ছেড়ে দিয়েছে ওনিল, প্রজাপতির মত ডানা মেলে সিলিং ফ্যানের বাতাসে যদৃচ্ছা ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে। একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। ওনিলের কপালেও বর লেখা থাকে?

বয়স তোমার কত হ'ল মেমসাহেব?—ভিড়ের ভেতর থেকে প্রশ্ন উঠল। জিজ্ঞাসাটা উচ্চাঙ্গের না হ'লেও এই ধরনের একটা কিছু সকলের মনেই ছিল। বড়বাবুও গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেললেন।

সবাই যা চাইছিল সে ধরনের উত্তর দিল না ওনিল। মুখস্থ পঁয়ত্রিশ ছেড়ে দিয়ে বললে, আমার বয়েস এই পঞ্চাশ চলছে। বাট মাই হাজব্যাণ্ড ইজ ইয়ং। তার বয়স এখনও চল্লিশ হয় নি। সাচ এ লাভলি ফেলো! আবার চোখ বুজল ওনিল। ও যেন আজ ডুবেই থাকতে চায়।

বল কি মেমসায়েব্? তোমার চেয়ে যে অনেক ছোট!

মেয়েরা বুড়ো চায় না বোস্। দে অলওয়েজ লাভ ইয়ং হাজব্যাণ্ডস।

আর বেটাছেলেরা বুঝি বুড়ী চায়?—বড়বাবু বললেন।

একগাল হেসে ছোট মেয়ের মত এদিক ওদিক মাথাটা বারকতক হেলিয়ে বললে ওনিল, লাক—লাক। পিওর লাক বোস। জোর ক'রে বড়বাবুর হাতটা টেনে নিয়ে হ্যাণ্ড শেক ক'রে চ'লে গেল ওনিল।

দিন কতক পরেই দু মাসের ছুটির দরখাস্ত দিল ওনিল, ও এক মাস যেতে না যেতেই ওনিল সকলের মন থেকে হারিয়ে গেল। ওনিলের আবার বিয়ে, তার আবার আলোচনা! কিন্তু পুরন্দরের মনে কোন জিনিসই একেবারে তলিয়ে যেত না। তখনও ওনিলের জয়েন করতে দিনকতক দেরি আছে, প্রথম দিনের মত খবর আনল পুরন্দর, ওনিলের বরকে আজ দেখলাম, সত্যিই ইয়ংম্যান—সম্বা চওড়া বেশ সুপুরুষ।

তাকে আবার কোথায় দেখলে, আর চিনলেই বা কি ক'রে?

আমিই না তাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিলাম। পেমেণ্ট ব্রাঞ্চে সব খোঁজ নিচ্ছিল। ওনিলের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে কত জমেছে। তা দেখলাম,

মন্দ নয়। খেয়ে না-খেয়ে মাগী জমিয়েছে ভাল। বারো হাজার কত টাকা। ব্যাটার প্রবৃত্তিকে বলিহারি যাই।

বারো হাজার টাকায় প্রবৃত্তি তোমারও আসবে পুরন্দর। তা ছাড়া ওনিলের সেভিংস্ ব্যাঙ্কেও বেশ কিছু আছে। বিয়ে হবে না জেনে প্রাণ ভ'রে টাকা জমিয়েছে বেটী।

দিনকতক পরেই চাকরিতে জয়েন করল ওনিল। আপিসের কাজ ছেড়ে আবার সবাই তাকে ঘিরে ধরল। অনেকে বললে, একেবারে ফাঁকি দিলে মেমসায়েব! এই কি তোমার নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ানো?

এতদিনের রূপযৌবনহীনা ফিরিঙ্গী মেয়েটি একেবারে বদলে গেছে। পোশাকপরিচ্ছদ মামুলি হ'লেও মুখের ওপর রঙের ঘটাটা চেপেছে বেশি। কিন্তু তার সবটুকু রুজের লাল কি বহুদিন-আগে-হারিয়ে-যাওয়া-যৌবনের লালিমা, ঠিক ক'রে বলা কঠিন। মনের খুশিতে আর প্রাণের উচ্ছ্বাসে বিগতযৌবনা কুরূপাও যে মোটামুটি মনোজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে, চোখে দেখে অনেকেরই ঠিক বিশ্বাস হ'ল না।

খাওয়ানোর কথার উত্তরে হেসে বললে ওনিল, আই অ্যাম সো সরি। তোমাদের খাওয়াতে পারলাম না। বিয়েটায় বড্ড ট্রাবল গেল কি না!

ট্রাবলটা আবার কি?—প্রশ্নটা শুনে ওনিলের চোখ দুটো যেন নিবে এল। তারপর বললে, মাই হাজব্যাণ্ড ওয়াজ অলরেডি ম্যারেড। আইনে উইদাউট ফল্ট্ তো ডিভোর্স হয় না। আমাদের এক বউ থাকতে আর একটা বিয়েও চলে না, তাই আমার হাজব্যাণ্ড ম্যাহোমিডান হয়ে সে বউকে তালাক দিয়ে তবে না আমাকে বিয়ে করেছে।

তা হ'লে তুমি এখন বেগমসাহেবা। আর মেমসায়েব নও!

ইয়েস। আই অ্যাম বেগম হামিদা খাতুন।

আপিসের কেরানীদের মাছিমারা ইত্যাদি দুর্নাম থাকলেও আসলে তারা ভদ্রসন্তান ও মোটামুটি শিক্ষিত। ওনিলকে নিয়ে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করলেও, বিশেষ অশ্রদ্ধা তাকে কেউ কোনদিন করে নি। আজ ওনিলের এই নির্লজ্জ স্বীকারোক্তিতে অনেকের মনের মধু যেন আপনা হতেই বিস্বাদ হয়ে গেল।

কিন্তু কাজটা কি ভাল হয়েছে?—একজন বললে।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে ওনিল, ভাল তো হয়ই নি। এমন জানলে আমি ওকে বিয়ে করতে রাজী হতাম না। না, কখনও নয়। দেখতে দেখতে ওনিলের ফুলো-ফুলো গাল দুটো প্রত্যাখ্যানের দৃঢ়তায় শক্ত হয়ে উঠল। একটু পরে সে ভাবটা কাটিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বলতে লাগল ওনিল, বাট কিউপিড ইজ ব্লাইণ্ড। হ্যারি আমাকে সত্যি সত্যিই ভালবেসেছে। দেয়ার ওয়াজ নো ওয়ে আউট।

সে বাসুক আর না-বাসুক, তুমি যে বেসেছ তাতে কোনও সন্দেহ নেই।—মন্তব্যটা করলে পুরন্দর।

হোয়াই নট? এ ওম্যান মে লভ আপটু দি লাস্ট ডে অফ হার লাইফ।—অতৃপ্তবাসনা বর্ষীয়সী নারীর মুখ থেকে তার প্রথম প্রণয়ের উচ্ছ্বাস শুনে অনেকের মুখে হাসি এলেও চেপে গেল অনেকে।

এর পর থেকে ওনিল নিয়মিত আপিসে আসে, কিন্তু আপিসের কাগজপত্রে নিজের নাম পরিবর্তনের কোনও চেষ্টাই করে না। একটু ব্যতিক্রমে সে সেক্‌শন-ইন-চার্জের বিরক্তিভাজন হয়ে উঠল। চাকরি-জীবনের নিয়মানুগ শৃঙ্খলায় নিষ্ঠা ছিল ওনিলের। কিন্তু দেখা গেল, আপিসে হাজিরা দিতে তার নিত্যই দেরি হয়। কোনদিন আধ ঘণ্টা, কোনদিন এক ঘণ্টা, এমন কি দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টাও মাঝে মাঝে। এক মাস পরে দেখা গেল, হাজিরা-খাতায় তারিখের পর তারিখ তার নামের পর পর লাল কালির চেড়া। শেষ পর্যন্ত ইন-চার্জ রমেশবাবু তাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, বারণ করলে শুনবে না। দেখ তো আমি এখন কি করি? বড় সাহেবের কানে গেলে তোমার আর চাকরি থাকবে?

সেদিন সবে ঘণ্টা দুই দেরি ক'রে আপিসে এসেছে ওনিল। ইন-চার্জের সামনে ব'সে উত্তরটা যোগাতে পারল না ওনিল। অধিকন্তু মুখখানা তার আপনা থেকেই বুকের ওপর নেমে এল। ওনিলের দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন রমেশবাবু। অপরিসীম ক্লান্তিতে ঘুম জড়িয়ে আছে তার চোখ দুটোয়, বয়োধর্মের ক্ষয়িষ্ণুতার সঙ্গে অবসাদের কালি মিশে কদিনের মধ্যেই শুষতে আরম্ভ করেছে সমস্ত লাবণ্য।

রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি অসুখ করেছে ওনিল ?

অসুখ ? কই, না তো।—বলতে বলতে রমেশবাবুর টেবিলের ওপর দু হাতে মাথা রেখে চুপচাপ প'ড়ে রইল ওনিল। হাজিরা-খাতাখানা গুটিয়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন রমেশবাবু। দেখতে দেখতে সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু ওনিল আর মাথা তুলল না। নাম ধ'রে বার দুই ডাকতেই সোজা হয়ে ব'সে চোখ মুছতে লাগল ওনিল। রমেশবাবু বললেন, যাও, নিজের জায়গায় গিয়ে ব'স। আপিসে আর ঘুমিয়ো না। কখন কে দেখতে পাবে!

আপিসে ব'সে ঘুমনো বরাবর আমি হেট করি রমেশবাবু। কিন্তু দেখুন, চোখ চাইতে গেলেই আমার চোখ যেন জুড়ে আসে। আর চোখ বুজলেই কত রকম স্বপ্ন দেখি—কত রকমের রঙ!

বুড়ো বয়সে কি তুমি আপিং ধরলে না কি ?—

বাই হোলি ঘোস্ট, রমেশবাবু, নেশা আমি কোনদিন করি না।

তা হ'লে প্রেমের নেশা। স্বামী জোয়ান হ'লেও নিজের বয়সটা বুঝে চল ওনিল। মরা পেটে বেশি ঘি কি সয় ?

এতক্ষণে জড়তা কেটে গিয়ে চোখ-মুখ লজ্জায় মাখামাখি হয়ে গেল ওনিলের। মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে সে বললে, স্যারি লাভস মি ডিয়ারলি। আমি কিন্তু খাইদাই আর সংসার দেখি।—বলতে বলতে চুপ করল ওনিল। ভাবার্থটা ঠিক ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন রমেশবাবু, তা হ'লে তোমার স্বামীকে দেখে কে ?

কেন ? বার্থা—আমার সতীন। আমাকে বিয়ে করবার দশ বছর আগে তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তাকে তাড়িয়ে আমি সর্বেসর্বা হয়ে থাকব ? সেটা কি ভাল হয় ? ভগবান নেই ?

রমেশবাবু অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওনিলের মুখের দিকে চাইলেন। বয়স্থা হ'লেও নারীধর্মের মূলপ্রবৃত্তি পর্যন্ত ভুলে গিয়ে এতটা উদার হওয়ার মানে তিনি বোঝেন না।

তোমার সতীনকে আনল কে ? তুমি, না, তোমার স্বামী ?

সে নিজেই এসেছে। আসবে না তো যাবে কোথায় ? মাদার অফ

থি চিল্‌ড্রেন। হ্যারি তো নিতেই চায় না। আমি অনেক ব'লে ক'য়ে রাখলাম। তা লোকটা নেহাত মন্দ নয়। আমাকে খুব ভালবাসে, কত কি খাবার ক'রে খাওয়ায়।

সময় নষ্ট না ক'রে ওনিলকে যেতে ব'লে কাজে মন দিলেন রমেশবাবু।

দ্বিতীয় মাসে গুপ-অফিসার ডেকে পাঠালেন ওনিলকে। হাজিরার দেরি আরও বেড়ে গেছে। অধিকন্তু আপিসের বেশির ভাগ সময় সে ঘুমিয়েই কাটায়। চলাফেরায় এতটা জড়তা এসেছে যে, মনে হয়, সে চলতে চলতেই ঘুমুচ্ছে। ওনিলকে বললেন গুপ-অফিসার, তুমি এবার রিটায়ার কর মেমসায়েব। আমি তোমার ফাইল দেখেছি। পঁচিশ বছরের ওপর তোমার চাকরি হয়েছে।

কথাটা শুনেই দু হাতে চোখ ঢাকল ওনিল, তার পর হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল। কান্নার স্বরে চারিদিক থেকে কৌতূহলী লোক ছুটে এল। গুপ-অফিসার একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। বললেন, চুপ কর, চুপ কর মেমসায়েব। কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

আপনিও বলছেন সার্? হ্যারিও আমাকে রোজ এই কথাই বলে। কেন? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? কী আমার বয়স?

চার-পাঁচ মাস আগেও যে কাজকর্ম ও ডিসিপ্লিনের দিক দিয়ে যথেষ্ট সংযত ছিল, তার এই হঠাৎ মানসিক বিকারে অনেকেই দুঃখিত হ'ল। বিশেষ ক'রে গুপ-অফিসার। তিনি বললেন, যাও, তুমি কাজ কর গে। তোমাকে রিটায়ার করতে হবে না। মন দিয়ে কাজ কর, আর সময়মত আপিসে এসো।

একে একে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখল ওনিল। সে দৃষ্টি যে কতখানি শূন্য ও অসহায়তায় ভরা, সবাই বুঝল। তারপর সে বললে, তোমাদের সঙ্গে কতদিন কাজ করছি। তোমাদের ছেড়ে চ'লে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব?

দুদিন আগে সদ্য-বিবাহিতা ওনিলের স্বামীগর্ব দেখে হেসেছিল সবাই। অপ্রাপ্য সৌভাগ্যসুখ পেয়েই হয়তো তার মাথার ঠিক ছিল না, এইটেই ছিল সকলের ধারণা। পাশ থেকে একজন ব'লে ফেললে, তোমার

শরীরটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে মেমসায়েব। তুমি দিনকতক ছুটি নাও। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে ওনিল, ছুটি নিয়ে কি করব? বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখব আর একটা মেয়েমানুষ নিয়ে আমার হাজব্যাণ্ড প্রেম করছে! তোমার বউ যদি ও-রকম করে, তোমার সহ্য হয়?

তা হ'লে তুমি অমন স্বামী ছেড়ে দাও না কেন? দরকার কি ও-লোকের ঘর ক'রে?—গ্রুপ-অফিসার বললেন।

হাসির ভেতর কান্না ঢেলে দিয়ে বললে ওনিল, তা আর হয় না সার্। যে অফ বেঙ্গলে যে গ্যাঞ্জেস এসে মিশে গেছে, সে কি আর হিমালয়ে ফিরতে পারে? হ্যারি হয়তো আমাকে টাকার জন্যেই ভালবেসেছে, বাট আই লাভ হিম।

কিন্তু এ ভালবাসায় তোমার কি লাভ? এতে কি আশা আছে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে ওনিল, কি করব! আমারও যে আর বয়স নেই।—বলতে বলতেই দু চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে ফোঁটাকতক জল ঝ'রে পড়ল ওনিলের। আবার একটা কান্নার পালা হয় ভেবে ভয় পেয়ে গেলেন গ্রুপ-অফিসার। ওনিল চোখ দুটো মুছে ফেলে সকলকে নমস্কার ক'রে নিজের জায়গায় চ'লে গেল।

দিনকতক এ নিয়ে জোর আলোচনা চলল আপিসে। দেহসর্বস্ব এ যুগের ভালবাসাকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে চেরাই-ফাঁড়াই ক'রে ছাড়ল অনেকে। কিন্তু যাকে নিয়ে এত বিতর্ক, সেই ওনিল আপিসে আসা বন্ধ ক'রে দিল। কেউ বললে—তার অসুখ, কেউ বললে—সে পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু আপিসের দপ্তরে একখানা ছুটির দরখাস্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছল না। সরকারী নিয়মমত দু-তিনখানা রেজিস্টার্ড চিঠি গেল তার ঠিকানায়। তারও প্রত্যেকটা অবিলি হয়ে ফিরে এল। দেখতে দেখতে আপিসের বিলপত্তর থেকে তার নামটা একেবারে মুছে গেল।

আপিসে সেদিন রবীন্দ্র-জয়ন্তী নিয়ে তোড়জোড় চলছিল। যে যার সই ক'রে দু-একখানা আরজেণ্ট ফাইল সেরে গল্পগুজব নয় তো এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল। ফুল আনা, চা-খাবারের যোগাড় করা, কে কে বক্তৃতা করবে, কে কি আবৃত্তি করবে, কে কি গান গাইবে—

ছেলে-ছোকরার দল এই সব নিয়েই ব্যস্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ও বৃদ্ধেরা অনেকেই কোথায় কি সুবিধা সস্তা পাওয়া যায় সেই ফিকিরেই ঘোরাফেরা করছিলেন। হঠাৎ হরিহরবাবু ড্রয়ার টেনে পানের কৌটো বের ক'রে শেষ দুটি পান মুখে দিয়ে কৌটোটা ঝোলার মধ্যে পুরে ফেললেন। এটা যে আপিস-ত্যাগের প্রস্তুতি সবাই বুঝেও চুপ ক'রে রইল। কিছুদিন হ'ল পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় সংসার করেছেন।

সময় বুঝে একজন বললে, দাদা কি বাড়ি যাচ্ছেন নাকি?

মুখখানা একটু ঘুরিয়ে বললেন হরিহরবাবু, ভাল কথা। ইদিকে শুনেছ? তোমাদের ওনিল যে মারা গেছে।

মারা গেছে?—সকলেই প্রায় চমকে উঠল।

জান না? তার হাজব্যাণ্ড, সেই স্কাউণ্ডেল লটা যে এখানে এসেছিল। তার জি. পি. এফ., গ্র্যাটুইটি, বাকি মাইনে সমস্ত আদায়ের তদ্বির করতে। যা বুঝলাম, স্রেফ মার্ডার—স্লো পয়সনিং।

আহা! মারা গেল বেচারী! লোকটা কিন্তু বড় ভাল ছিল। সাধারণ আলোচনার সঙ্গে আন্তরিক দুঃখ মিলিয়ে প্রায় সকলেই এই রকমের মন্তব্য করল। নিরবচ্ছিন্ন কর্মজীবনে অবজ্ঞার পাত্রী হ'লেও অশ্রদ্ধা পাবার কোনও কাজ করে নি ওনিল।

ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে ঝোলাটা সাপটে নিয়েছেন হরিহরবাবু। রুমালে কসের পানের দাগ মুছে নিয়ে বললেন, ভাল ছিল, না, কচু। ভাল থাকলে আর বুড়ো বয়সে মরতে যায় বিয়ে করতে? বলে, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। পঞ্চাশ বছরের বুড়ী গেছে জোয়ান লোককে পাকড়াও করতে

ওনিলের দুর্মতির সঙ্গে সমগ্র নারীজাতির মানসিক অবনতির কথা চিন্তা করতে করতেই সন্তবত বাড়ির দিকে রওনা হলেন হরিহরবাবু।

শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়

—

পূজা

সেই পূজাটাই সত্যি—
কাঙাল পেলেই অন্নবস্ত্র রোগী পেলেই পথ্যি।

খড়

গ্রামের নাম জোড়াশাঁখ। এখানে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা প'ড়ে এসেছে। একটি অল্প উঁচু ফাঁকা জমিতে তাঁবু খাটানো সাব্যস্ত হ'ল। গরুর গাড়ি থেকে তাঁবুর বাণ্ডিলগুলো সেখানে এনে জড়ো করলুম আমরা। অন্যান্য মালপত্রও নামানো হ'ল একে একে। ক্লান্ত বলদগুলোকে ছেড়ে দিয়ে গাড়োয়ানরা অনতিদূরে বটগাছতলায় ব'সে বিশ্রাম করতে থাকে। বাহাদুর ও শশাঙ্ক সুরজিতের নির্দেশমত তাঁবু খাটাবার আয়োজন করে।

দেখতে দেখতে আমাদের কেন্দ্র ক'রে বেশ বড় একটি জনতা ভিড় ক'রে দাঁড়ায়। তাদের চোখে কৌতূহল যত না, ততোধিক বিস্ময়—সন্দেহও কম নয়। বিস্ফারিত চোখে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কার্যকলাপ দেখতে থাকে।

বড় তাঁবু খাটানো হ'লে পর ছোট তাঁবু দুটি খাটাতে শুরু করে বাহাদুর ও শশাঙ্ক। আমি ও সুরজিৎ দুজনে মিলে ধরাধরি ক'রে আমাদের জিনিসপত্র তাঁবুর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে গোছাতে শুরু করি।

নীরব জনতা হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে। পাগলী আ গয়ী, পাগলী!—সমস্বরে ক'জন চেঁচিয়ে ওঠে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখলুম, একটি বুড়ী গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। তার পরনে শতচ্ছিন্ন একটি ময়লা কাপড়, জট-পাকানো চুল, আমসির মত শুকনো মুখে মৃদু হাসি, নিঃসঙ্কোচ তার আশ্চর্যরকম জীবন্ত চোখ দুটির দৃষ্টি—অতি সন্তর্পণে এক আঁটি খড় সে বুকের ওপর চেপে ধ'রে আছে। কোনও দিকে না তাকিয়ে সে সোজা চ'লে গেল মাটির ওপর শুইয়ে রাখা গরুর গাড়ি দুটির দিকে।

গাড়ি দুটিতে দু-চার আঁটি খড় ছিল। ক্ষুধার্ত বলদ চারটি সেই খড়ে মুখ ডুবিয়ে খেতে শুরু করেছে। খড় ও বলদগুলোর দিকে কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থেকে বুড়ী হঠাৎ তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, হামার পোয়াল, হামার পোয়াল!

বলতে বলতে সে বলদগুলোকে কিল চাপড় মেরে হটিয়ে দিয়ে খড়ের গাদা থেকে খড় তুলে নিতে শুরু করল।

হতভম্ব গাড়োয়ানেরা মারমুখো হয়ে তেড়ে এল। তাদের দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালো বুড়ী—আঁটি দুটি অবশ্য ততক্ষণে সে তুলে নিয়েছে।

বুড়ী চ'লে যেতে আমি গাড়োয়ানদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'পোয়াল কি?

খড়ের গাদার দিকে আঙুল দেখিয়ে তাদের একজন বললে, ওহি বা।

ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে একজন বললে, উ পাগলী বা সাহেব—দুনিয়াভরকা পোয়াল চুঁড়কে ঘরমে লে যাওৎ।

ছোট তাঁবু দুটোও খাটানো শেষ হ'ল। উনুন ধরাতে থাকে বাহাদুর। জল আনতে যায় শশাঙ্ক। ভাড়া চুকিয়ে দিতে গাড়োয়ানরা বিদায় নেয়। কৌতূহলী জনতার ভিড় ক'মে আসে। সন্ধ্যা নামে।

পরদিন সকালে জোড়াশাঁখের চারদিকে প্রাথমিক ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে বের হলাম। পর্যটন শেষ ক'রে জোড়াশাঁখে ফিরতে ফিরতে বেলা দুটো বেজে যায়। গ্রামের সীমানায় এসে পৌঁছতেই চাপরাসী শশাঙ্ক বললে, আমার ও বাহাদুরের পেতে শোবার জন্যে কিছু খড় নিয়ে যেতে হবে সাহেব। বরদবাটিয়া থেকে আনা খড়গুলো প'চে গেছে।

বেশ তো।—আমি বললাম, দেখো, কোথায় পাও।

বড় রাস্তার ওপরে ছোট একটি কুটীরের প্রাঙ্গণে একটি মস্ত খড়ের স্তূপের দিকে আমাদের নজর পড়ল। শশাঙ্কর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এয়ানে অনেক খড় আছে সাহেব।—সোচ্ছ্বাসে ব'লে ওঠে শশাঙ্ক।

বিক্রি করবে কি না খোঁজ কর গিয়ে।—সুরজিৎ বললে, যত দরকার কিনে নাও।

রাস্তা থেকে নেবে কুটীরের দিকে এগিয়ে গেল শশাঙ্ক। রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর ব'সে পড়লাম আমরা।

খড়ের গাদাটি সত্যি দেখবার মত—একটি পাহাড়প্রমাণ স্তূপ। দেখলে বোঝা যায় যে, বহু বৎসর ধ'রে জমানো হয়েছে। অধিকাংশই প'চে হেজে গেছে অবশ্য।

খড়ের গাদাটির কাছে কুটীরের দাওয়ার ওপর একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ব'সে ছিল একটি যুবতী। আমাদের দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হ'ল শিশুর দৌরাত্ম্যে। কাছাকাছি

আর কেউ ছিল না, কাজেই খড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে শশাঙ্ক তাকেই জিজ্ঞেস করল, বেচেগা ?

যুবতীটি কয়েক সেকেণ্ড শশাঙ্কের মুখের পানে চেয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর ইতস্তত সতর্ক দৃষ্টিপাত ক'রে সে এগিয়ে এল।

কেতনা চা।হয়ে ?—চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি।

এই আট আঁটি ?—শশাঙ্ক বললে।

একঠো এক আনা করকে।

শশাঙ্ক আমাদের মুখের পানে তাকাল মূল্যের মঞ্জুরির জন্য।

ঠিক হায়, দে দো।—আমি যুবতীটিকে বললুম।

কোল থেকে শিশুটিকে মাটিতে নামিয়ে যুবতীটি আর একবার চার দিকে তাকিয়ে নিল, কেউ আছে কি না তাই দেখবার জন্য বোধ হয়। তারপর অতি সন্তর্পণে খড়ের গাদায় হাত দিল সে। স্তূপের ধারে টাটকা কিছু খড় জড়ো করা ছিল, সেখান থেকে টেনে টেনে এক এক আঁটি ক'রে বের ক'রে আনতে থাকে সে।

এমন সময় দড়াম ক'রে খুলে গেল কুটীরের দরজা। আলুথালু বেশে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক বুড়ী, দেখেই চিনতে পারলুম, কালকের সেই পাগলী—খড়ের খোঁজে যে গিয়েছিল আমাদের তাঁবুতে।

যুবতীটির হাত থেকে খড় ছিনিয়ে নিয়ে আকাশ-ফাটানো চিৎকার করতে থাকে বুড়ী, হামার পোয়াল বেচৎ বা! কুত্তী কাঁহাকা! তুকো মার্ ডালব হাম, কাট্ ডালব।

গোলমাল শুনে কুটীরের পেছন থেকে একটি যুবক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, তার দু হাত গোবরমাখা, সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর। যুবতীটির আনত মুখের পানে চেয়ে নিয়ে বুড়ীকে উদ্দেশ ক'রে সে বললে, ক্যা ভওল মায়ী ?

ছেলেকে দেখে বুড়ী হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে সানুনাসিক স্বরে বলতে থাকে সে, তোহার বহু ফিন্ বেচনে লাগিস হামার পোয়াল।

সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি বোমার মত ফেটে পড়ে, ক্যা রে মোতিকা মাতারি, তুকো না মানা করলকে হাম! মায়ীকা পোয়ালমে ফিন হাত দিহিন তু ?

জবাব দেবার জন্য মেয়েটি প্রস্তুত হয়েই ছিল। বিশুদ্ধ দেহাতী হিন্দীতে এক গাদা অনেক কিছু তীরবেগে ব'লে গেল সে। তার সার মর্ম হ'ল এই যে, এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড সে বাপের বয়সে দেখে নি। এই রাজ্যের পাহাড়-প্রমাণ খড় দিয়ে কার শ্রাদ্ধ হবে কে জানে! প'চে হেজে গেছে, দুর্গন্ধে টেকা দায়! ওই জঞ্জাল থেকে না হয় দুটো তুলে নিয়ে সে বেচতে গেছে, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ল! ওই পাগলী ডাইনী বুড়ীর খেয়াল-খুশিমত এমন নোংরামির প্রশ্রয় কেন দেবে সে? পরিশেষে তার বাবা মা তার হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে না দিয়ে এখানে কেন বিয়ে দিলেন সেই অনুশোচনায় কান্নার সূত্রপাত করল সে।

যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে গোবরমাখা হাত দিয়ে বিরাশি সিক্কার একটি চড় স্ত্রীর গালে বসিয়ে দিয়ে গর্জন ক'রে ওঠে, চুপাই মার্, কুত্তী কাঁহাকা!

আমাদের সকলের সামনে মার খেয়ে মেয়েটির মুখখানা তার সিঁথির সিঁদুরের মতই রাঙা হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে সে ছুটে পালাল কুটীরের মধ্যে।

বুড়ীর মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটে ওঠে। হাত তুলে যুবকটির মারের অনুকরণ ক'রে সে বললে, আওর মার্, আচ্ছাসে মার্।

এমন সময় আমাদের দিকে নজর পড়ল যুবকটির। সলজ্জ মুখে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে আভূমি নত হয়ে সেলাম করল সে। তারপর ভীরু দৃষ্টি তুলে একটু ইতস্তত ক'রে সে বললে, আমাদের এই খড় তো বেচতে পারব না, মাফ করুন সাহেব।

বেচতে পারবে না তো কি করা যায়!—আমি বললুম, অন্য কোথা থেকে না হয় কিনে নেব।

না না সাহেব, আপনাদের আর কষ্ট ক'রে খুঁজতে হবে না। খড় আপনাদের আমিই অন্য কোথাও থেকে যোগাড় ক'রে এনে দেব। ওই তাঁবুর মালিক তো আপনারাই? যদি হুকুম করেন খড় আপনাদের তাঁবুতেই পৌঁছে দিয়ে আসব।

বেশ তো, দিয়ো।—ব'লে আমরা প্রস্থানোদ্যত হলাম।

বিকেলের দিকে যাব সাহেব।—যুবকটি বললে।

যুবকটি তার কথা রাখল। বিকেলে তাঁবুর বাইরে চা-পানান্তে ব'সে আছি, সুরজিৎ নতুন-শেখা অতুলপ্রসাদের একটি গান গুন গুন ক'রে গাইতে শুরু করেছে, নিঃসঙ্গ বনবাসে সঙ্গীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে চোখ বুজে ভাবছি আমি, এমন সময় মস্ত বড় খড়ের বোঝা মাথায় ক'রে এসে দাঁড়াল যুবকটি। বোঝাটা নামিয়ে সেলাম ক'রে সে বললে, নিয়ে এসেছি আপনাদের খড়। তারপর মাথায় ফেটি ক'রে বাঁধা গামছাটি খুলে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে সে বললে, বড্ডো চড়া রোদ। অঘ্রাণ শেষ হতে চলল, জুৎমতো শীত পড়ছে না তবু।

গানে বাধা পড়ায় ঈষৎ রুষ্ট হয়ে উঠেছিল সুরজিৎ। অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে লোকটার মুখের পানে চেয়ে সে বললে, খড়ের দাম কত? কত দিতে হবে তোমাকে?

জিভ কেটে যুবকটি বললে, ছি ছি, দাম দেবেন কেন? ও-খড়ের দাম আছে নাকি? ধান কাটা এই তো সবে শেষ হ'ল—খড়ের কি কমতি আছে এখন?—ব'লে সে মাটির ওপর ব'সে পড়ল।

তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমাদের মুখের পানে চেয়ে থেকে যুবকটি বললে, আচ্ছা সাহেব, পাগলামি কি চিকিৎসা ক'রে সারানো যায়?

যাবে না কেন?—আমি বললুম, রাঁচিতে পাগলদের হাসপাতাল রয়েছে, সেখানে পাগলামির চিকিৎসা হয়।

সেখানে চিকিৎসা করালে আমার মাও তো সেরে উঠতে পারেন?—যুবকটি আগ্রহভরা দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে বললে।

পারেন বই কি।

আচ্ছা, আপনারা তো আমার মাকে দেখেছেন! ওঁর পাগলামি কি সারানো যাবে ব'লে মনে হয় আপনাদের?

সে ডাক্তাররা ভাল বলতে পারবেন, তবে যতদূর জানি একেবারে গোড়ার দিকে সারিয়ে তুলতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। তোমার মার পাগলামি কত দিনের?

ম্লান হয়ে ওঠে যুবকটির মুখ। ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে, সে অনেক দিনের—কমসে কম বারো বছর।

একটু আঁতকে উঠলুম আমি, বারো বছর! তা হ'লে তো—

সারবে না বলছেন সাহেব? বড় করুণ শোনাল যুবকটির কণ্ঠস্বর।

না না, সারবে না—তা কি বলতে পারি? আচ্ছা—ইয়ে—তোমার নামটা কি যেন?

সুখাই।

আচ্ছা, তোমার মার পাগলামিটা কি বংশগত? মানে, তোমার দাদামশাই দিদিমা বা তাঁদের বাপ মা কেউ পাগল ছিলেন নাকি?

না সাহেব।

তবে তাঁর এমন হ'ল কেন?

বারো বছর আগে আমাদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই থেকে তিনি এমনি হয়ে গেছেন।

কি দুর্ঘটনা?—সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল সুরজিৎ।

সুরজিতের প্রশ্নে সুখাইয়ের ভুরু দুটি কুঁচকে ওঠে, দু হাতের আলগা আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ হয়—অন্তহীন বেদনার পাশাপাশি দুনিবার ঘৃণা ও বিদ্বেষ তার মুখে চোখে যেন ফেটে পড়তে চায়।

কিন্তু সে এক সেকেণ্ডের জন্য। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা বলি আপনাদের। বারো বছর আগের কথা—আমার বয়স তখন বারো কি তেরো। আমাদের বাড়ির উঠোনে ওই যে খড়ের গাদাটা দেখে এসেছেন সাহেব, আবার বাবা ঠিক সেই জায়গাটিতে ধান লুকিয়ে রাখতেন সেলামি ফাঁকি দেওয়ার জন্যে। খাজনা আদায়ের পর প্রতি দশ মণে আধ সের ক'রে ধান তখনকার জমিদার জগদীশ সিং সেলামি হিসেবে নিতেন। এই অন্যায্য সেলামি যতটা সম্ভব কম দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করতেন বাবা। তাই খাজনা দেওয়ার পর অনেকখানি ক'রে ধান উঠোনের ওই খড়ের গাদার মধ্যে চালান ক'রে দিতেন তিনি। ঘরে ঘরে গিয়ে ওই সেলামি আদায় করত জমিদারের গোমস্তা ও পাইকরা। আমাদের গোলা থেকে আদায় হ'ত না বিশেষ। ফসল কাটা হয়ে গেলে সকলের ঘরের উঠোনেই খড়ের গাদা থাকে, সে গাদার দিকে বিশেষ নজর পড়ে না

কারুর। প্রথম প্রথম জমিদারের সন্দেহ হয় নি। কিন্তু পরে যখন জগদীশ সিং নিজে কার কত জমি—সেই হিসেবে কার কাছ থেকে কত ধান সেলামি হিসেবে আদায় হওয়া উচিত সে হিসেব করতে শুরু করলেন, তখন বাবা যে ফাঁকি দিচ্ছেন তা টের পেয়ে গেলেন তিনি। একদিন তিনি নিজে গোমস্তা-পাইক-পেয়াদা নিয়ে এসে হাজির হলেন আমাদের বাড়িতে। মনে আছে, মায়ের পাশটিতে ব'সে তখন আমার নতুন-কেনা জামাটি নেড়ে চেড়ে দেখছিলাম। আমার দু মাসের ছোট্ট বোনটিকে মা ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। বাবা গোয়ালে বলদগুলোকে খাওয়াতে ব্যস্ত। হৈ-হল্লা করতে করতে পাইক-পেয়াদা নিয়ে আমাদের বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়য়ে জমিদারবাবু বাবার নাম ধ'রে হাঁক-ডাক শুরু ক'রে দিলেন। বাবা গোয়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই জমিদার বাঘের মত গ'র্জে উঠলেন, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ধান—বল্ শিগগির। হাত জোড় ক'রে জবাব দিলেন বাবা, ধান তো লুকিয়ে রাখি নি মহারাজ্। আমার সব ধান গোলার মধ্যে! গোমস্তাবাবু দেখে গেছেন। ওজন ক'রে দশ মণে আধ সের ক'রে সেলামিও নিয়ে গেছেন। বাবার কথায় জমিদারের বিশ্বাস হওয়ার কথা নয়। তিনি তাঁর পাইকদের ডেকে লুকোনো ধানগুলো খুঁজে বের করতে হুকুম দিলেন। পাইকরা ঘরের ভেতরে, উঠোনের আনাচে-কানাচে, গোয়ালের ভেতরে বাইরে, গোলার চারদিকে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজলে—কিছু পেল না অবশ্য। তখন জমিদারবাবুর নজর খড়ের গাদার ওপর এসে পড়ল। এত বড় খড়ের গাদা!—জমিদার চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, নিশ্চয়ই ওর মধ্যে ধান লুকোনো আছে। জমিদারের হুকুমে পাইকরা খড়ের গাদাটার দিকে এগিয়ে যেতেই লাঠি হাতে বাবা খড়ের গাদাটা আগলে দাঁড়ালেন। মা ছুটে এসে বাবার হাত ধ'রে কেঁদে-কেটে বিস্তর কাকুতি-মিনতি করেছিলেন স'রে আসবার জন্যে। বাবা তাঁর কোন কথা কানে তোলেন নি। পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু বলেছিলেন, স'রে যা সুখাইয়ের মা। অনেক জুলুম সয়েছি, আর না—প্রাণ থাকতেও ছুঁতে দেব না এই খড়ের গাদা। জমিদারের পাইকদের একা অনেকক্ষণ

আটকে রেখেছিলেন বাবা—তাঁর মত পাকা লেঠেল এ তল্লাটে কেউ ছিল না। আরও অনেকক্ষণ লড়তে পারতেন হয়তো, কিন্তু হঠাৎ জমিদারের হাতের সড়কি এসে বিঁধে গেল তাঁর বুকে। তার পরের ঘটনাগুলো অস্পষ্ট আবছা হয়ে আছে আমার মনের মধ্যে। স্পষ্ট শুধু মনে পড়ে, ধান বের ক'রে নেওয়ার পর খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল জমিদারের লোকেরা—সেই আগুনে বাবার সৎকার হয়েছিল। আর মনে পড়ে মার বুকফাটা কান্না। বাবার দেহটিকে ওরা আগুনে ফেলে দিলে, তখনি আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। অনেক রাতে যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, তখন আগুন নিবেছে। জমিদার বা তাঁর লোকজনদের আশেপাশে কোথাও দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, তারা চ'লে গিয়েছে। উঠোনময় ছাইয়ের ছড়াছড়ি। যেখানে খড়ের গাদাটা ছিল সেখানে ছাই ও পোড়াকাঠের স্তূপ। তার কাছে আমার বাচ্চা বোনটিকে কোলে নিয়ে ব'সে থাকতে দেখলাম মাকে। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি হঠাৎ বোনটিকে মাটির ওপর ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চারদিকে চেঁয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন তিনি, এক আঁটি বিচালিও নেই! সব পুড়ে গেছে! ধানগুলো লুকিয়ে রাখতে হবে না? এক শো মণ ধান! ব'লে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ছুটে কোথায় চ'লে গেলেন, হদিস পেলাম না। পরদিন ভোরবেলা অনেক খড় নিয়ে ফিরে এলেন তিনি—যেখানে বাবা ধান লুকিয়ে রাখতেন সেখানে এনে জড়ো করলেন সবটা। সেদিন থেকে শুরু ক'রে দিনের পর দিন আঁটি আঁটি খড় এনে ওখানে জড়ো করেছেন মা, গাঁময় ঘোরাঘুরি ক'রে খুঁজে পেতে, মাঝে মাঝে চুরি পর্যন্ত ক'রে খড় এনে বারো বছরে ওই প্রকাণ্ড গাদা বানিয়ে তুলেছেন। গাদাটা তো আপনারা দেখেই এসেছেন সাহেব।

এই পর্যন্ত ব'লে সুখাই থামল।

তোমার বোনটির কি হ'ল?—সুখাই থামতেই বললুম।

বাবা মারা যাওয়ার তিন দিন বাদে মেয়েটা মারা গেল। ওই দুর্ঘটনার পর মা ওকে এক ফোঁটা দুধও দেন নি।

এমন সময় মৃদু হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখলুম,

অনতিদূরে সুখাইয়ের মা এসে দাঁড়িয়েছে। জড়ো করা খড়ের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে সে বললে, কেতনা পোয়াল রে সুখাই! লে চল্।

চমকে উঠে দাঁড়াল সুখাই। পাগলীর হাত ধ'রে সে বললে, হিয়াঁসে চল্ মায়ী। তুকো বহুৎ পোয়াল দেবো হাম।—ব'লে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল সে। বুড়ী পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে শুনতে পেলুম, হামার পোয়াল! হামার পোয়াল!

শ্রীসঙ্কর্ষণ রায়

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

তবু জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জীর থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে? [ঘুমের ঘোরে]

ভগবানের সঙ্গে তবু যা-হোক-একটা বোঝাপড়া ক'রে কবি-চেতনা যখন সমাজের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন ভোগলোলুপ ভণ্ড ও বিলাস-ব্যভিচারী মানুষের প্রতি ব্যঙ্গবাণ-বর্ষণে কবি-গাণ্ডীবী একেবারে সব্যসাচীর মূর্তি ধারণ করেছেন। 'মরুশিখা'র "দেশোদ্ধার" ও 'মরুমায়া'র "ফেমিন-রিলিফ" কবিতায় ভণ্ড জনসেবকদের উদ্দেশে তাঁর বিদ্রূপবাণ ক্ষান্তিহীন। এ যুগের সম্ভোগবাদী প্রমোদ-প্রমত্ত কপটাচারী মানুষের কামকেলিক্লিন্ন জীবনের 'লীলাকীর্তনে' তাই কবির ক্রোধ ও ঘৃণা যেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করেছে।—

তনুর ভাঁটিতে অশ্রু-লাবণি, ফেনায়ে উঠে যা সস্তা,
লক্ষ সূক্ষ্ম পরশের নলে চুঁয়াই তা হতে মদ্য।
করি নব নব ফন্দি,—
ফুলের বাহির করিয়া গন্ধে করি তারে শিশি-বন্দী।
অরূপ-কোঠায় উঠিতে রূপের চোরাসিঁড়ি রাখি লাগায়ে;
যৌবনমধু লেহিয়া লেহিয়া প্রেমতৃষা রাখি জাগায়ে।***
দু চোখে কুড়ায়ে শারদ-স্বর্ণ-সারাহ্ন-সৌন্দর্য,
সন্ধ্যা ভ'রে প্রাণ-বন্ধুরে দিই বন্ধকী কর্জ।***

অজানিতা-হৃদি-হরণ-কারণে ভাগীরথী হতে ভল্‌গা
স্বর্ণমৃগীর সোয়ার ছুটি গো বাগারে লোহার বল্‌গা।
লীলাবিলাসী এ মানস আমার কভু গৃহকোণে তুষ্ট—
অনামিকামূলে নামজপ শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।
অপাওয়া প্রিয়ার রূপায়ণ করি কত রূপকের ছন্দে,—
মনের পুকুর পদ্ম ভরাই ফুটাইতে মুখ-পদ্মে।

সম্ভোগবিলাসী মানুষের জীবনে ব্যভিচারের এই বীভৎস মূর্তি দেখে কবি যেমন রুদ্রকণ্ঠ হয়েছেন, জীবনে এই ভ্রষ্টাচারের অভিশপ্ত পরিণাম দেখে তেমনই তাঁর ক্ষোভেরও পরিসীমা নেই। কবি-কল্পনায় মহাভারতের মহানায়িকা দ্রৌপদী নারীশক্তির অগ্নিমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আধুনিক সভ্যসমাজে সেই নারীত্বের বহ্নিশক্তিকে বারনারী বেশে দেখে কবি আক্ষেপের সুরে বলছেন—

অজেয় অতনু ফুলধনু টানি' এসেছিল তব পাশ,
রুষিয়া ভস্ম কর নি, আছে সে দ্বারে বাঁধা ক্রীতদাস।
মায়ার অতীত অগ্নি মায়াবিনি, কতই না রূপ ধরো;
যৌবনখানি বসনের মতো খুলে রাখো, তুলে পরো।***
হে বহ্নি! ওই লালসা লইয়া পুড়ে পতঙ্গদল;
সমিধ্ যোগালে জ্বলিত তোমাতে উজ্জ্বল হোমানল।

এই বহ্নিকে শুধু নারীর মধ্যেই নয়, বিশ্বের মধ্যেই কবি ধ্যান করেছেন। দুঃখের অশ্রুসায়রে ভাসতে ভাসতে কবি যেন সারাজীবন এই বহ্নিমন্ত্রই জপ করেছেন। ষড়ঋতুর মধ্যে নিদাঘই তাই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। বহ্নিস্নানে বিশ্বাসী কবি তাই নবযৌবনে বসন্ত-লীলা পরিহার ক'রে নিদাঘ-মহোৎসবেই যোগ দিয়েছিলেন। 'সায়ম্' গ্রন্থে "চিরবৈশাখ" কবিতায় কবি তাঁর সেই জীবন-সাধনার নিগূঢ় ইতিহাস ব্যক্ত ক'রে বলছেন—

দিগন্তহারা অন্তরে মম বালুর শয্যা পাতি'
আগুনের খেলা করে হবে ব'লে কাটাইনু দিন রাতি।
মাঝে মাঝে তার ঝলিয়া উঠিবে গগনপরশী শিখা,
দিকে দিকে তার ভুলাতে চাহিবে মায়াময়ী মরীচিকা।***
জগৎকেন্দ্রে প্রাণধারা যার বহিছে অনলস্রোতে,
যার দুর্বার অগ্নিত্বরিতা ছুটেছে আলোক-রথে।

আনন্দ যার বহ্ন্যুৎসবে নাচে উচ্ছিখা,
যার চরণের ঘূর্ণাছন্দ নীহারিকা-বুকে লিখা।
মহাসুষেরা যে-বৈশাখের শঙ্খধ্বনি শুনে,
অন্তরীক্ষ ভরি'-নব নব জগতের বীজ বুনে।
আনন্দের সে অগ্নিমূর্তি ভালবেসেছিনু ব'লে
মন উঠে নিকো এই বাংলার শ্যামল স্যাঁতালো কোলে।

'মরীচিকা'-'মরুশিখা'-'মরুমায়া'র কবির জীবনে মরু-কল্পনা কেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল,—তা যে কবির এক উৎকট বিলাসমাত্রই ছিল না, তাঁর জীবন-সাধনারই অঙ্গ ছিল,—"চিরবৈশাখ" কবিতায় তা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া শ্মশানেশ্বর শিব যাঁর উপাস্য দেবতা, বহ্নিমন্ত্রই সে-কবির চিরদিনের সাধনমন্ত্র।

জগদীশ ভট্টাচার্য

—

"নূতন ব'লেই সাহিত্যের মধ্যে কোন জিনিস স্থায়ী হয় না। সাহিত্যিক মাত্রেরই একান্ত বাসনা নূতন কথা নূতন ভাবে বলা। সাহিত্যের ইতিহাসে তরুণের এই প্রচেষ্টার সাফল্যের উদাহরণও যেমন আছে, তার বিফলতার নিদর্শনও প্রচুর। এ যুগের তরুণ সাহিত্যের মধ্যে সাধারণ হিসাবে নিশ্চয়ই ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু এখনও এমন মহৎ কিছু দেখা যায় নি, যাতে দম্ভ করা যায়। এই সাহিত্যের সর্বত্রই নূতন কিছু বলবার চেষ্টা যতটা পরিস্ফুট, জীবনের মধ্যে সেই নূতনের গূঢ় অথচ প্রত্যক্ষ অনুভূতি তেমন জীবন্ত নয়। ব্যষ্টিগত জীবনের সমষ্টিই সমাজ। যে সমস্যা সমাজে আজও প্রকট নয় জীবনে তা সত্য না হতে পারে; আর সাহিত্যে তার প্রকাশ হয়তো বিলেতের আমদানী বায়স্কোপের মতই অসার্থক।.....সমাজ ও রুচিকে আঘাত দিলেও সাহিত্য হতে পারে—এ কথা সত্য; কিন্তু তাদের আঘাত দিলেই সাহিত্য হয় না—এ কথা ততোধিক সত্য।"—যতীন্দ্রনাথ: "তরুণের লজ্জা," 'শনিবারের চিঠি,' পৌষ ১৩৩৪

আমার সাহিত্য-জীবন

পনরো

১৯৪৩ সনের পূজা-সংখ্যায় বের হয়েছিল 'মন্বন্তর'।

'মন্বন্তর' প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার আছে। আমার সাহিত্য-কর্মের মধ্যে কালের বিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিলীয়মান গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বিশেষ ধারার ব্যক্তিত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। এ সব আমার নিজের চোখে দেখা। ক্রমশ-বিলীয়মান জমিদার-শ্রেণী আমার সাহিত্যে খুব বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। যখন ফ্যাসিবিরোধী দলের সঙ্গে প্রীতি ছিল, তখন তাঁরা পঞ্চমুখে এর প্রশংসা করেছেন। আবার মতবিরোধের ফলে স'রে আসতে তাঁরা এই নিয়েই অর্থাৎ জমিদার-শ্রেণীর প্রতি মমতা-পোষণের অপরাধে গালাগাল করেছেন এবং করেন। জমিদার-শ্রেণী ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনা করবার প্রেরণাই হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল, বোধ করি, এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ ক'রে আগে লেখেন নি বা লেখেন না ব'লে। সামাজিক পেশার প্রভাবে এরা সচরাচর মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ও অভিনব হয়ে ওঠে। এ থেকেই আর একটি দিক আমার দৃষ্টি-গোচর হয়েছিল। সেটি সমসাময়িক বিশেষ ঘটনা; যা সমাজ-জীবনকে প্রভাবান্বিত করে; ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পুরাতনকে সেই প্রভাব পরিবর্তিত করে। এর সূচনা বলতে গেলে "তারিণী মাঝি" থেকে। সেবার ময়ূরাক্ষীতে প্রলয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল। যাকে বলে, হড়পা বান। তাতে কত ক্ষতি যে হয়েছিল, কত মানুষ যে ভেসে গিয়েছিল তার হিসেব কেউ রাখে নি। সে সময়কার খবরের কাগজেও এ নিয়ে বিশেষ কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নি। সেই কারণেও এই বন্যার ভয়ঙ্করী এবং মর্মান্তিক ধ্বংস-লীলার কথা দেশের চোখের সামনে ধরবার জন্যই "তারিণী মাঝি" গল্প লিখেছিলাম। গল্পটি সেই বারেরই 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হয়।

এর বোধ হয় বছর দুয়েক পর নিদারুণ অনাবৃষ্টিতে বীরভূমে প্রায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল; সে ঘটনা নিয়ে একটি গল্প লিখেছিলাম, সেটিও

'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হয়েছিল ; "তিনশূন্য" গল্পটিও সেই দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা, সেটি 'দেশ' পত্রিকায় বের হয়েছিল। "সমুদ্রমন্থন" গল্পটি পরে 'ধাত্রী দেবতা' উপন্যাসের অঙ্গীভূত হয়েছে। আমাদের দেশে সেকালে কলেরার প্রকোপ ছিল খুব। দু-তিন বৎসর অন্তর, বিশেষ ক'রে অনাবৃষ্টির বৎসরে কলেরা লাগত। এ নিয়ে মানুষের শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কথা 'ধাত্রী দেবতা'র মধ্যে আছে, 'আরোগ্য নিকেতনে'র মধ্যে আছে। "মহামারী" ব'লে স্বতন্ত্র একটি গল্পও আছে। সেটিও 'দেশে' প্রকাশিত হয়েছিল। মোট কথা, সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে মানুষের জীবনের বিচিত্র প্রকাশকে ধরা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৩ সনের মার্চ বা এপ্রিলে একদিন সজনীকান্তের মোহন-বাগান রোর আপিসে সন্ধ্যার মুখে আড্ডা জমেছে। ব'সে আছি। এমন সময় এলেন শ্রীরামপুরের বনফুল-সাহিত্য-সমিতির স্নেহাস্পদ শ্রীঅমিয় গঙ্গোপাধ্যায়। অমিয় তখন ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টে কাজ করতেন। তিনি সজনীকে বললেন, চলুন। শুনলাম, গণেশ অ্যাভিন্যুতে 'পূর্বাশা' আপিসে একটি সাহিত্যিক আলোচনা-সভা আছে। আলোচ্য বিষয়—যুদ্ধকালীন সাহিত্য। শুনলাম প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, মানিক, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতি সকলেই আসবেন। আমার নিমন্ত্রণ ছিল না। সজনীর অনুরোধে এবং অনেকের সঙ্গে দেখা হবে এই আকর্ষণে বিনা নিমন্ত্রণেও গেলাম। সঙ্গে অমিয় ছাড়া আরও এলেন অধ্যাপক শ্রীযোগেশ ভট্টাচার্য। সেখানে গিয়ে শ্রীমন্মথ সান্যালকেও দেখলাম। অচিন্ত্য শুধু এসেও এলেন না। কি জানি, নীচে থেকে ফিরে গেলেন। সেখানে সত্য বলতে আলোচনাটা খুব সরল বা প্রাঞ্জল হ'ল না। শুধু সজনীকান্ত সোজা ভাষায় বললেন, যুদ্ধকালীন সাহিত্য মানে ইংরেজ সরকারের বরাতী সাহিত্য ; সোজা কথায় কিছু অর্থাগম। অর্থাৎ এক কথায় বাতিল ক'রে দিলেন। কথাটার মূলে ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্ট সম্পর্কে ইঙ্গিত ছিল। তখন ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্ট থেকে কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের রচনা ছিল। কথাটা আমার অসঙ্গত মনে হ'ল।

কয়েকজন স্বেচ্ছায় প্রচারকার্য করেছেন ব'লে এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যে দেশের এই নিদারুণ অবস্থা নিয়ে সাহিত্য রচনা হয় না, এ কেমন কথা? সর্বশেষে সেই কথাই আমি বললাম। ফেরবার পথে মনের মধ্যে 'মন্বন্তর' রচনার বীজটি নিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। লিখতে শুরু ক'রে দিলাম।

কলকাতার নাগরিক জীবন নিয়ে সেই আমার প্রথম প্রচেষ্টা, এবং সাধু ভাষার বদলে চলিত ভাষাতে রচনাও সেই প্রথম। একসঙ্গে তখন দুখানি উপন্যাস লিখছিলাম—'মন্বন্তর' ও 'পঞ্চগ্রাম'। আগেই বলেছি, 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'গণদেবতা'র সঙ্গে বইয়ের আকারে প্রকাশিত 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে'র প্রথম আশি পৃষ্ঠা ছাড়া আর বাকি অংশ সম্পূর্ণ পৃথক—নতুন ক'রে লেখা। 'মন্বন্তর' যখন খানিকটা অগ্রসর হয়েছে, তখন একদিন শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকার মশায়ের সঙ্গে কোথায় যেন দেখা হ'ল। তিনি 'আনন্দবাজার' পূজা-সংখ্যায় উপন্যাসের জন্য বললেন। আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, একসঙ্গে সবটা কিন্তু দিতে পারব না। এখন খানিকটা দেব, বাকিটা ক্রমে ক্রমে দিয়ে যাব। তবে আপনাদের অসুবিধা করব না নিশ্চয়।

যুদ্ধের প্রভাবে সমাজে, বিশেষ ক'রে ব্যবসায়ী মহলে, যে সর্বনাশা বিকৃত ক্ষুধা কুম্ভকর্ণের রূপ নিয়ে জেগে উঠেছে, এবং অন্য দিকে দরিদ্র মানুষ ক্ষুধার দায়ে অসহায় ভাবে যে আত্মবিক্রয় করছে, সেই কথাটাই বলবার কথা ছিল। এই পটভূমিতে পড়ন্ত ধনীর ঘরের বিকৃত রূপ যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে এক দিকে, অন্য দিকে বাঁচবার চেষ্টায় একাংশ প্রাণপণে চেষ্টা করছে। ছেলেটি ছিল কম্যুনিস্ট। স্বাভাবিক ভাবে তখন প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা সবই ছিল কম্যুনিস্টদের হাতে। এইটেই চোখে সেদিন দেখেছি। তাঁরা সেদিন যে তৎপরতার ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন তার প্রশংসা শ্রীযোশীর কাছে লেখা পত্রে করেছি, আজও করছি। বিশেষ ক'রে দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এঁদের কর্মীরা। সে সময় সেইটেই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তখন সঠিক বুঝতে পারি নি যে, আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বা রাশিয়ার প্রতি

আনুগত্যের খাতিরে দেশের সংগ্রামের বিরোধিতা করার অপরাধ এই একমাত্র আবরণ দিয়ে আবৃত করা ছাড়া এঁদের উপায় ছিল না। 'মন্বন্তরে' নায়ক নায়িকা এই দলের হ'লেও বিরোধীমতাবলম্বী গুণদা-দাদা এবং তাঁর পরিবারের যে চিত্র আছে, তাঁরা প্রধানতম না হ'লেও কম উজ্জ্বল, কম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ফোটেন নি।

যাই হোক, 'আনন্দবাজারে' 'মন্বন্তর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সেদিন একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এক দিকে নিন্দা, অন্য দিকে প্রশংসা—দুইই প্রায় সমান উচ্চ হয়ে ঘোষণা তুলেছিল। তবে নিন্দার থেকে প্রশংসা বেশি এই হিসাবে বলব যে, বিষয়বস্তুতে আমি কম্যুনিস্টদের ভাল বলেছি এ নিন্দা যাঁরা করেছেন, তাঁরাও রচনাশক্তির প্রশংসা করেছেন এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এখন 'মন্বন্তরে' আমি কম্যুনিস্টদের ভাল বলেছি ব'লে যে অভিযোগ, তার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। আমার নায়ক নায়িকা কম্যুনিস্ট—বিজয়দাদা কম্যুনিস্ট নায়ক, তারা পরস্পরকে কমরেড বলেছে এ কথা সত্য, কিন্তু তারা কি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কম্যুনিস্টদের সগোত্র, এক দলের এক বিশ্বাসে বিশ্বাসী? সে দিন কম্যুনিস্ট-বিরোধী মনোভাব-হেতু অনেকেই ক্রোধ এবং ক্ষোভ বশত ভাল ক'রে বিচারও করেন নি। আমার কম্যুনিস্ট নেতা অহিংসার গুণগানে উদ্বেলিতচিত্ত। কম্যুনিস্ট যিনি, তিনি অহিংসাবাদের গুণগান করবেন? 'মন্বন্তরে'র শেষ অধ্যায়ে নেতা বিজয়বাবু ডায়েরিতে লিখছেন—

"পৃথিবী যাই বলুক, ভারতের চিরন্তন সাধনার ধারা জয়যুক্ত হয়েছে। বশিষ্ঠের পুণ্যফল আজও নিঃশেষিত হয় নাই। অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মির মত মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এ যেন বর্ণশোভার মহা সমারোহ ঘ'টে গেল। সত্য হ'ল জয়যুক্ত। আত্মদহনের হোমশিখা আত্মাকে দহন করলে না, সে শিখা আত্মার জ্যোতিতে পরিণত হয়েছে।··· বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ মানুষের সমাজে মহা মন্বন্তর। এই মন্বন্তরে ওই পুণ্যফল আমাদের সর্বোত্তম ভরসা। আমাদের কর্মশক্তি সঞ্জীবিত হবে ওই পুণ্যে।"

অন্যত্র আছে, "আমার মৃত্যু হয় হোক। দুর্যোগের মানুষই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমি বেঁচে থাকলে আত্মনিয়োগ করব সেই কাজে। বেঁচে থাকব মানুষের মুক্তি-প্রত্যাশায়।"

কম্যুনিস্ট পার্টির আদর্শ ও বিশ্বাস আজ আর কারুর কাছে অবিদিত নয়; সে দিনও চিন্তানায়কদের অবিদিত ছিল না। আমি তাঁদের পার্টির বিদেশের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি অভিযোগের কথা তুলছি না। আমি বলছি, বশিষ্ঠ, পুণ্যফল, আত্মা, আত্মদহন প্রভৃতির প্রতি তাঁদের মনোভাব ও বিশ্বাসের কথা। এগুলির প্রতি যাঁর বা যাঁদের বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা আছে, তাঁরা আর যাই হোন, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য বা সক্রিয় কর্মী নন। এমন বিশ্বাস যাঁর বা যাঁদের, তিনি বা তাঁরা যত বড় কর্মী ও জ্ঞানী গুণী হোন, কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁকে বা তাঁদের অবিলম্বে প্রতিক্রিয়াশীল ও অবিশ্বাসী ব'লে বের ক'রে দেবেন। এই কয়েক দিন আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৫৩ সনের নবেম্বর পর্যন্ত, সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়াতে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অহিংসার আদর্শ সম্পর্কে যে তথ্য ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ ছিল, ভারত সরকার তার প্রতিবাদ করবার জন্য সংবাদটি জনসাধারণের সুবিদিত। তার অর্থ—মহাত্মা গান্ধী ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল, তিনি বার বার বিপ্লবোদ্যত জনসাধারণের হাত থেকে অহিংসার দোহাই দিয়ে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন। প্রকারান্তরে আরও হীন মন্তব্য করা হয়েছে। এতে ইংরেজেরই স্বার্থ সাধিত হয়েছে বলেছেন তাঁরা। অহিংসার প্রতি বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গাত্মক উক্তি আছে ব'লে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, হয়তো বা নূতন উপলব্ধিতে গান্ধীজীর সত্য স্বরূপ বুঝে সোভিয়েট সরকারের নির্দেশে এ মন্তব্য বর্জন ক'রে নূতন মন্তব্য লিখিত হবে। হয়তো এর পর ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি গান্ধীজী সম্পর্কে সেই নূতন মন্তব্য অনুযায়ী মত প্রকাশ করবেন এবং প্রবন্ধ রচনা করবেন। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত তাঁরা মহাত্মা সম্পর্কে যে মত প্রকাশ ক'রে এসেছেন, তা সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়ার পূর্বের মত ও মন্তব্যের প্রতিধ্বনি। এ নিয়ে অজস্র প্রবন্ধ নানা পত্রিকা ও পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

'ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' গ্রন্থে সোভিয়েট নেতা স্টালিন লিখে গেছেন, "গান্ধীর মতবাদ আর কৌশল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে।"

ইংলণ্ডের কম্যুনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্ত গান্ধীবাদকে জনস্বার্থ-বিরোধী এবং মুখোশ ব'লে অভিহিত করেছেন। গান্ধীজীকে "বিরামহীন বিপর্যয়ের সেনানায়ক" আখ্যায় আখ্যাত করেছেন।

এ নিয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ এখানে রচিত হয়েছে, তা এই উক্তিগুলির প্রতিধ্বনি। বহু প্রবন্ধ। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ম্যানিফেস্টো বের করেছেন। তার একটির একটি উক্তি আমার চোখের কাছে রয়েছে, যুদ্ধের সময় জনযুদ্ধের আন্দোলনকে প্রবল করবার আবেদনের মধ্যে বলেছিলেন "In which camp does Indian freedom lie—of Bose, Tojo and Hitler? or of Nehru, Chiang and Stalin? Think hard and act quick. Break with the agents of Bose, the hirelings of the Axis."

চিয়াংকাইশেক আজ তাঁদের শত্রুই, কিন্তু সেদিন তাঁর দোহাই তাঁরা পেড়েছিলেন। স্টালিনের সঙ্গে নেহরুর নাম করেছিলেন একসঙ্গে। কিন্তু নেহরুর গুরু ও প্রকৃতপক্ষে পরিচালক গান্ধীজীর নাম উল্লেখ পর্যন্ত তাঁরা করেন নি। তার অর্থ সুস্পষ্ট। মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে তাঁরা স্টালিন, দত্ত প্রভৃতি বিদেশী নেতাদের মনোভাব পোষণ করতেন। সুতরাং মহাত্মাজী ও অহিংসা আদর্শ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল 'মন্বন্তর' বইয়ের রাজনীতিক কর্মী বিজয়বাবু কম্যুনিস্ট হ'লেও এই ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য নন। আমার অহিংসার প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও গান্ধীজীর প্রতি আনুরক্তিই তার উপর আরোপিত হয়েছে।

এ ছাড়া 'মন্বন্তরে'র আর একটি দিক—গুণদাবাবুর দিক অর্থাৎ কংগ্রেস কর্মীর দিক। সেই দিকের কথা একটু উল্লেখ করলে আরও স্পষ্ট হবে।

খবরের কাগজের আপিসে গুণদাবাবু কানাইকে বলছেন, "কানাই ভাই, বিজয়কে আমি জানি, এক সময়ে একসঙ্গে কাজ করেছি। তুই তার চ্যালা। তোকে একটা কথা বলি। **রাশিয়ার জয় হোক**

ভাই। কিন্তু সে জয় উপলক্ষ ক'রে যখন নাচতে যাই তখন হাতে-পায়ের শিকলের বাঁধন যে ঝনঝন ক'রে বেজে ওঠে। সে বেদনা কোন্ মন্ত্রে জয় করলি বলতে পারিস ?"

গুণদাবাবুকে পুলিস অ্যারেস্ট করার সময়ের বর্ণনায় রয়েছে—"গুণদাদা এককালের প্রচণ্ড শক্তিমান বিপ্লবী কর্মী। কিন্তু ইদানীং, বিশেষ ক'রে আগস্ট মুভমেণ্টের পর, বেদনাহত অন্তরে স্তব্ধ হয়ে দ্রষ্টার মত ব'সে ছিলেন। তবুও পুলিস তাঁর বিগত ইতিহাসের কথা স্মরণ ক'রে তাঁকে গ্রেপ্তার না ক'রে নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। ওই গাড়ির মধ্যে আরও যাঁদের কানাই দেখছে, তাঁরাও ওই গুণদাদাদার শ্রেণীর মানুষ। **বাংলার মাটির শ্রেষ্ঠ ফুল।**"

গুণদাবাবুর স্ত্রীর বর্ণনায়, আরও অনেক জায়গায় আছে, যেখানে কম্যুনিস্ট-বিরোধী-মনোভাবসম্পন্ন পাত্রপাত্রীদের উপর অকপট গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা আছে। এ ছাড়া, আগস্ট-বিপ্লব সম্পর্কে গোটা 'মন্বন্তরে'র মধ্যে কোথাও বিরোধী বা বিরুদ্ধবাদী উক্তি নেই। 'মন্বন্তরে'র মধ্যে ক্ষোভ আছে কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের উপর, ইংরেজরাজশক্তির বিরোধী মনোভাবই তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। পচনশীল বিলাসীর গৃহের পতন তার বিষয়বস্তু।

'মন্বন্তর' 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরেই পরম শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু পরলোকগমন করেন। পার্ক সার্কাসে সীতা দেবীর বাড়িতে তখন তিনি থাকতেন। তাঁর তিরোধান-সংবাদ পেয়ে পার্ক সার্কাসে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখা হয়েছিল শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত—জংলী-দাদা নামেই বিশেষভাবে খ্যাত। দোষে-গুণে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি। স্পষ্টভাষিতায় রূঢ় সত্য বলতেও তাঁর দ্বিধা নেই; আবার কোন নূতনকে স্বীকার করতে তাঁর মত অগ্রণী খুব বেশি নেই। এই প্রসঙ্গে একটি পুরনো কথা মনে পড়ছে। 'দেশ' পত্রিকায় আমার প্রথম গল্প "নারী ও নাগিনী"। বোধ করি যেবার "তারিণী মাঝি" 'আনন্দবাজার' পূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, সেইবারেই পূজা-সংখ্যা 'দেশে' "নারী ও নাগিনী"

প্রকাশিত হয়েছিল। তখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসে আমার এক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া কারুর সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও নবাগত নাম ঘোচে নি। "নারী ও নাগিনী" গল্পটি প'ড়ে প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, এ গল্প বিদেশী শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে স্থান পাবার যোগ্য। তারপর গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে পরিচয় গাঢ় হয়েছে, তাঁকে দাদা বলেছি, তিনি ভাই ব'লেই তুমি বলেছেন। সেদিন অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর মৃত্যু-দিবসে সীতা দেবীর বাড়ির সামনে, তিনি আমাকে দেখে 'এই যে তারাশঙ্কর ভাই' ব'লেই ডাকলেন এবং বললেন, খুব শেষরক্ষা করেছ ভাই। গান্ধীজীর অনশন নিয়ে ওই শেষটার অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ অদগ্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছ। বাঁচিয়ে দিয়েছে তোমাকে।

আবার হেসে বলেছিলেন, তবে কম্যুনিস্ট আঁকতে তুমি পার নি। ওরা আর যাই করুক, অহিংসায় বিশ্বাস করে না।

সেদিন সেখানে ৺কিরণশঙ্কর রায় মশায়ও উপস্থিত ছিলেন। ফেরবার সময় তিনি সেদিন তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ি গিয়ে সাহিত্যিক কিরণশঙ্করবাবুকে চেনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সূক্ষ্ম রসিকতায় সুরসিক ব্যক্তিটিও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন।

'মন্বন্তর' সম্পর্কে এই এক দিক। আর একটা দিকও আছে। সেটা হ'ল এই যে, সেদিন আমি ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘের সমাদরে সমারোহে নিশ্চয়ই আচ্ছন্ন অনেকটা হয়েছিলাম বইকি। তাঁদের সাহিত্যবিচারবুদ্ধি-পদ্ধতি থেকে বেশ কিছু শিক্ষা এবং জ্ঞানও সঞ্চয় করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে অনেক বড় পণ্ডিত আছেন, এবং তাঁদের তত্ত্ব ও জীবনবাদের মধ্যে অনেক কিছু সত্য আছে।

মার্কসবাদসম্মত সমাজ-পরিকল্পনা পৃথিবীর শাস্ত্রে একটি মহত্তম আবিষ্কার। সে সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান তাঁদের কাছে পেয়েছি। এ কথা আগেই বলেছি। এই কল্পনা-রূপায়ণের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আমার সঙ্গে মতবিরোধ। প্রথম যখন ধনবাদী প্রাচীন সমাজে ও রাষ্ট্রে এ রূপায়ণের কল্পনা হয়েছিল, তখন রক্তাক্ত বিপ্লব ব্যতিরেকে অন্য পথ—

কল্পনা কেউ করতে পারেন নি, এ কথা সত্য। বাস্তবে হয়তো তা সম্ভবপরও ছিল না, বিশেষ ক'রে ইউরোপের মত জড়বাদপ্রধান মহাদেশে। কিন্তু তারপর যখন একটি বিশেষ দেশে এই রূপায়ণ সম্ভবপর হ'ল, এই আদর্শবাদ রূপপরিগ্রহ করল, তখন এই হিংসার পথই একমাত্র পথ; একমাত্র রক্তাক্ত পথ ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না—এ ধারণা কখনই একমাত্র সত্য হতে পারে না। অন্তত মানবসভ্যতা উপলব্ধি ও মানসবিকাশের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বহু তন্ত্র অতিক্রম ক'রে গণতন্ত্রে যখন উপনীত হয়েছে তখন। এই সর্বহারার বিপ্লব বুদ্ধিবাদী হৃদয়বাদী উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হওয়ার পরও এ কথা বলা চলে না। মঙ্গলকর মহত্বপূর্ণ নূতন সত্যকে মানুষ গ্রহণ করতে চিরদিনই ব্যগ্র। সে ব্যগ্রতা আজকের কালের মানস-বিকাশের বিপুল উদারতায় প্রশস্ততর এবং উর্বরতর। এ ছাড়া, আমাদের দেশে আমরা যখন মানসলোকে অন্তত হিংসা থেকে অহিংসায় উত্তীর্ণ হয়েছি তখন আমাদের দেশে এ ধারণা অবশ্যই সংকীর্ণ অপ্রশস্ত এবং অন্ধবিশ্বাস ও উগ্রতায় আচ্ছন্ন। বুদ্ধের আবির্ভাবের পর অসত্য কুটিল ও হিংসার পথে কোন কল্যাণে উপনীত হতে অন্তত আমার অন্তরাত্মা চিৎকার ক'রে ওঠে। ১৯৫৪ সনের নভেম্বর পর্যন্ত অনেক পরিবর্তন হয়েছে জগতে; রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিরও হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এই দু-তিন দিন আগে মঁসিয়ে মলোটভের উক্তি তার সাক্ষ্য বহন করছে। যাঁরা কূটনীতিবিদ তাঁরা এ উক্তিকে কূটনৈতিক ছলনা মনে করেন করুন, আমি করি না। আজ সার্বজনীন সম-অধিকারসমন্বিত সমাজের আদর্শ ও মহত্ত্ব পৃথিবী অন্তরে অন্তরে স্বীকার ক'রে নিয়েছে এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র—সকল গঠনকর্মই আজ সেই মুখী। গত অধ্যায়ে আমি বলেছি, এই সার্বজনীন সম-অধিকারসমন্বিত সমাজ কোন একটি নামীয় তন্ত্রের একচেটিয়া আদর্শ বা কল্পনা নয়। দলগত ও নামগত মোহ ও বিদ্বেষ এই দুটিকে অতিক্রম করতে পারলেই কোন বিরোধ থাকবে না—অথচ সেই আদর্শেই সকল সমাজ ও রাষ্ট্র এসে পৌঁছে যাবে। সকল দেশেই

রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধিবিধান—সেই কল্যাণ ও আদর্শকে সামনে রেখে তৈরি হচ্ছে। সুতরাং রক্তাক্ত বিপ্লব আজ অনতিক্রম্য, এ কল্পনা বা ধারণা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। মলোটভের উক্তির মর্মার্থও তাই। রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রয়োজন আর হবে না, মার্কসরাদের সমাজপরিকল্পনার আদর্শ জগতে গৃহীত হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে। সে হয়তো এক নামে হবে না। আজ সেখানেই সত্য ও অহিংসা সগৌরবে জয়যুক্ত হয়েছে; নিঃসন্দেহে মানুষের মানসলোক উত্তরায়ণ করেছে সেই স্তরে। এই সত্য ও অহিংসাই দেবে তাকে আত্মিক ও মানসতৃষ্ণার অমৃতরস। লৌকিক জগতে দেহগত স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ মেটাবার পর তার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

যাই হোক, সেদিন তাঁদের কাছে পেয়েছি অনেক, এবং এই পাওয়ার জন্যই প্রীতিবশত সেদিন আমার কল্পনার সাম্যবাদী কর্মীকে তাঁদের দলের কর্মী হিসাবে কল্পনা করেছিলাম। আমার কল্পনা ও প্রীতি আরোপ ক'রে আমার নায়ক-নায়িকাকে সাধারণ পাঠক সমাজে প্রীতিভাজন করার চেষ্টার মধ্যে তাঁরাই সে প্রীতির অধিকারী হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। এই কারণে বুদ্ধিমান সাহিত্যিক পণ্ডিত 'মন্বন্তরে'র উপর বিরূপ হয়েছিলেন। এ বিরূপতার ন্যায্যতা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। 'মন্বন্তর' থেকে ভারতীয় কম্যুনিস্ট-পার্টির উপকার হয়েছিল কি হয় নি—এ কথা আমি বলব না; শুধু বলব, গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতা এবং ভারতীয় সত্য ও অহিংসার প্রতি বিশ্বাস সত্ত্বেও, 'মন্বন্তরে'র নায়ক-নায়িকা ও কর্মী বিজয়বাবুদের তাঁদের দলের লোক ব'লে মেনে নিতে এতটুকু প্রকাশ্য মৌখিক আপত্তি করতে দেখি নি বা শুনি নি।

পূজার পর ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে একদিন আসর বসল। পূজা-সাহিত্যের সমালোচনার আসর। সে আসরে 'মন্বন্তর' ও "ময়দানব" সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন সকলে। এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমার জীবনে সেই নূতন ও প্রথম। এর মধ্যেই কিন্তু প্রথম স্বপ্নভঙ্গ হ'ল আমার। স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ সম্পর্কে একটি উক্তি

আমার সমস্ত আনন্দকে কাচের বাসনে লৌহদণ্ডের মত আঘাত করলে। সেবার বিভূতিভূষণ একটি গল্প লিখেছিলেন কোন একটি পত্রিকায়। তার বিষয়বস্তু ছিল অপরূপ মধুর। যত দূর মনে পড়ছে উত্তমপুরুষ ছিল গল্পটির বক্তা। মন কি কারণে বিষণ্ণ। সে বিষণ্ণতা ক্রমে ক্রমে যেন বিশ্বপ্রকৃতিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল। আকাশের নীলে লাগল সে বিষণ্ণতা, বাতাসের স্পর্শে লাগল, আলোয় লাগল; আলো হতে লাগল ম্লান, খাদ্যবস্তু স্বাদ হারাল, সঙ্গীত মাধুর্য হারাল। বক্তা সমস্ত দিনটা অবর্ণনীয় অকারণ দুঃখের মধ্যে পীড়ন অনুভব ক'রে প্রায় আত্মহারা হয়ে গেল। সেই অবস্থায় সে এসে বসল কার্জন পার্কে। পার্কে খেলা করছিল ছেলে-মেয়েরা। চারপাশে ফুলের সমারোহ। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, প্রাণে অদম্য প্রাণোচ্ছ্বাস, ছেলেগুলি কলরব ক'রে মাতামাতি ক'রে ছুটছে। হাসি আর উল্লাস। একটি ছেলে এল তার কাছে। অকারণ অর্থহীন বকবক ক'রে গেল। কত সুন্দর ফুল! কত সুন্দর সূর্যাস্তের লাল আলো! কত সুন্দর তুমি! কত সুন্দর আমি! কত মজা, কত সুখ, কত আনন্দ চারদিকে! বক্তার বিষণ্ণতা কেটে গেল, যেন যাদুমন্ত্রে কেটে গেল। আকাশ সুন্দর হ'ল, সূর্যাস্ত সুন্দর হ'ল, ফুল সুন্দর হ'ল। আনন্দে ভ'রে উঠল পৃথিবী। আনন্দময় জগৎ প্রতিভাত হ'ল সম্মুখে।

এই গল্পটি সম্পর্কে একজন সমালোচনা ক'রে বসলেন, এটা কি লিখেছেন বিভূতিবাবু? এ সব যে কেন লেখেন তিনি?

আশ্চর্যের কথা, এ সম্পর্কে কেউ প্রতিবাদ করলেন না।

আমি বললাম, গল্পটি কিন্তু আমার ভাল লেগেছে।

ভাল লেগেছে?—বিস্মিত হলেন বক্তা।

বিস্মিত সকলেই হলেন।

প্রশ্ন উঠল—কেনই বা মন বিষণ্ণ তার কারণ অবশ্যই আছে, কিন্তু কই, তার বিশ্লেষণ কই? এবং ছেলেগুলির কলরব-আনন্দে তার সেটা ঘোচেই বা কি ক'রে? কারণ বিষণ্ণতার উদ্ভব যে কারণে, তার নিরসন না হ'লে ওই ছেলেদের আনন্দের ছোঁয়াচে যায়ই বা কি ক'রে? তা

ছাড়া আজকের দিনে যখন দেশে চারদিকে দুঃখ দুর্দশা দুর্ভিক্ষ মড়ক চরমে উঠেছে, মানুষ যখন জীবন-মরণ যুদ্ধে লড়াই করছে, তখন কি সাহিত্যিক এই নিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন ?

তর্কমুখর হয়ে উঠল সভা। আমাকে নীরব হতে হ'ল।

পথে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে গল্পটি এমন ভাল লাগল ?

আমি বললাম, বোঝাতে পারব না। কারণ আমার আনন্দ এখানে অকারণ বললে আপত্তি করব না।

ধাক্কা সেই দিন প্রথম খেলাম। কিন্তু আমাকে যে প্রশংসার সমারোহ দিলেন তাঁরা, তার মোহ তো কম নয়!

এর কিছুদিন পর, বোধ করি মাস কয়েক পর, তখন প্রেমেন্দ্র সভাপতি হয়েছেন—একখানি পুস্তিকা আমার হাতে পড়ল। ১৯৪৪ সনের মাঝামাঝি বোধ হয়। বইখানির নাম 'Facts and Forgery'। তার মধ্যে পেলাম "Bose—the hireling of the Axis" এবং আরও অনেক কথা। এই সময় থেকে পার্টির নেতৃবৃন্দকে সভার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখলাম। আমি তখন সভাপতি নই, তবুও ওঁরা ডাকেন, আমি যাই। সমিতির সভ্যও বটে। দেখলাম, রাজনৈতিক কর্মীরা সভা-পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করছেন। আরও একটি ঘটনা ঘটল। [ক্রমশ]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রম-সংশোধন : ১৯১ পৃষ্ঠার ২৮ লাইনে ১১ই পৌষ ১৩৩৪এর স্থলে ১৩৩৮ হইবে।

সংবাদ-সাহিত্য

ভারতের কওহরলাল চীনের চাউ-চাউ খাইয়া আসিয়াও ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের কষিয়া গালি দিয়াছেন, শ্রীশ্রী অচিন্ত্যকুমার শ্রীশ্রী ভাগবতী তনু-ত্যাগ করিয়াছেন, ভিসিনিস্কি হঠাৎ মারা গিয়াছেন, অন্ধ্রে ডেমক্র্যাটিক শাসন টলমল করিতেছে, টেক্সট বুক লইয়া যাবতীয় ছাপাখানা হিমসিম খাইতেছে এবং সর্বোপরি বিনোবাজী বাংলা দেশের মাটি ধরিতে আসিতেছেন—পর পর এই সকল ব্যাপার আমাদের অসুস্থ মস্তিষ্ক জট পাকাইয়া আমাদিগকে "সংবাদ-সাহিত্য" রচনায় অক্ষম করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দরুন স্থানাভাব গৌণ কারণ।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ২৮৩৮

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শনিবারের চিঠি
২৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৬১

মুক্তিস্নান

ফ্রান্স

দ্রাক্ষা-কুঞ্জ দিয়ে দেখ 'রাইন' বহে ধেয়ে,
সুন্দরী 'ভিঞ্জেন নগরী' তার পানে রয় চেয়ে।
জলের বুকে কাঁপায় ছায়া ওক-পাইনের সারি,
বনচ্ছায়ে চাঁদের আলোয় নাচে নরনারী।—
সাঙ্গ হঠাৎ রঙ্গ-খেলা, আনন্দ উৎসব,—
অদৃষ্টেরই পাশা-খেলায় পাল্‌টে গেল সব।
কারা-ভাঙার পাগলা ঘণ্টা, শোণিতধারা ক্ষয়,
এক-শ বছর লড়েছে ফ্রান্স, খণ্ড-প্রলয় হয়।
অগ্নি-বৃষ্টি করে শত্রু ঘরের মট্‌কাতে,
মানুষ মরে মহামারী বড়ে ঝট্‌কাতে।
কুকুর কাঁদে নতুন গোরে, ঐ ডাকে হাড়গিলে।—
টিকে ছিল ভায়ে-ভায়ে প্রাণে-প্রাণে মিলে।
রক্ত-মাখা ধূলায় ঢাকা ফ্রান্স-ভাগ্যাকাশে
পূর্ণ সূর্য এক-শ বছর ছিলেন রাহুর গ্রাসে।
'রাইন'-'সীনে'র মুক্তধারায় তরল 'রুবি' বয় —
আকাশ-পাতাল ওলট-পালট, আসন্ন প্রলয়।
শৈল-চূড়ায় প্রতিধ্বনি, অভিমানের তূর্য,
গৌরবিত ব্যূহ-সাজায় ফরাসীদের শৌর্য।
বক্ষে তাদের অস্ত্র-ক্ষত, পৃষ্ঠ অ-ক্ষত,
পরদেশীদের নির্যাতনে করবে না শির নত।
অবরুদ্ধ-দুর্গ হতে বেরোয় অশ্বারোহী,
শহীদ হতে কি আগ্রহ, বুভুক্ষু বিদ্রোহী।
পুরুষেরা বর্মে সাজে, গর্জে শিরে বাজ।
গ্রামে-গ্রামে কুচ-কাওয়াজ ঐ কামানের আওয়াজ।—
মুক্ত হব, শক্তি আছে, ধায় বীরেন্দ্র-দল,
করলে দেরি হাতে বেড়ি, কটিতে শৃঙ্খল।

মুক্তি পাবে বন্দী-জাতি সারা ধরিত্রীর।
রাষ্ট্র হবে নিষ্কলঙ্ক, অকুতোভয় শির।
পথ-ঘাট হউক নিরঙ্কুশ, 'ভিসা' নাহি চাই।—
পাহাড়ে সুড়ঙ্গ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাব ভাই।
জাগো রে ভাই, জাগো সবাই, নইলে তাহাজডুবি।
ডাক দিতেছে তোপের ভাষা, ডিণ্ডিম-দুন্দুভি।
বেরিয়ে এস, সঙ্গে মেশ, চাই গো দিতে জান,
রক্ত-তিলক পরব মোরা দেশের সু-সন্তান।
আমরা সবাই জন্ম-স্বাধীন, অন্যায়ের হন্তা,
পিতৃগণের মান রাখিব, ধরব তাঁদের পন্থা।
সংগ্রামেই শান্তি পাব ঘুমিয়ে কবরে,
অটল রব, না ডরিব সঙ্গিন-খর্পরে।
বর্শা হাতে সৈনিকেরা ঘোড়ার পিঠে ছোটে,
রৌদ্রে স্বর্ণ-শিরোমুকুট ঝকমকিয়ে ওঠে।
হাটে-বাটে মাথার খুলি, ছড়ানো কঙ্কাল,
দিগম্বরের রুদ্র নটন উড়িয়ে জটা-জাল।
'জোয়ান-অ-আর্কে'র কীর্তি-উষাস্ফুরন্তী,
দেশ-বিদেশে বরণীয়ার যশো-জয়ন্তী।
মানুষ হ'ল ফরাসীরা, উৎকোচ-গ্রহণ
ফ্রান্স হইতে নির্বাসিত জন্মের মতন।
বিজয়-লক্ষ্মী পরাজিতে হলেন প্রসন্ন।
ফলিল রক্তিম মাঠে নব গোধূম-অন্ন।
তৃপ্ত হ'ল জাতির ক্ষুধা রুটি-মাঠায় তা'র।
ঘরে ঘরে ঝঙ্কারিল আলাপিনীর তার।
ফুসফুসে তার তাজা-বাতাস আবার এল ফিরে।
আবার ভালবাসল প্রিয়া তাহার প্রণয়ীরে।
সাহিত্যই যুদ্ধ-ছবি, জাতিই তো সাহিত্য।
রণক্ষেত্রে রক্ত ঢেলেই মেলে শান্তি-বিত্ত।
অধঃপতিত জাতিরাই জুয়া-খেলায় মত্ত,—
মুক্ত হব, স্বর্গ হয়ে যাবে আবার মর্ত্য।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মস্মৃতি

তৃতীয় প্রবাহ—দশম তরঙ্গ

"কি ছিল বিধাতার মনে"

ব্যাপারটা একটু খোলসা করিয়া বলাই দরকার।

'প্রবাসী'র চাকরি ছাড়া ও 'রঙ্গশ্রী'র চাকরি ধরা অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের কার্তিক হইতে ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত চোদ্দ মাস 'শনিবারের চিঠি'তে অবিশ্রান্ত বেপরোয়া ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার আক্রমণ চালাইয়া আমি বস্তুত নিজের ভাগ্যের সঙ্গেই পাঞ্জা লড়িতেছিলাম। নিজের প্রতি নিষ্ঠুর হইবার সাধনায় অন্যের সুখ-দুঃখ মান-অপমান গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতাম না; নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিতে গিয়া খাপ-খোলা তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাহাকে সম্মুখে পাইতাম তাহাকেই আঘাত করিয়া বসিতাম। 'শনিবারের চিঠি'র সেই পুরাতন সংখ্যাগুলির পাতা উল্টাইয়া উপলব্ধি করিতেছি যে, আমার ব্যক্তিগত সঙ্কটজনিত অস্থিরচিত্ততা সেখানে আত্মঘাতী শ্মশান-বৈরাগ্যরূপেই প্রকট হইয়াছিল। বিড়াল কোণা লইলে যেমন রুখিয়া দাঁড়ায়, আমিও সেইরূপ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ভয়ে ও আশঙ্কায় মুহ্যমান অবস্থায় ভূতভয়গ্রস্তের রামনাম জপার মত কেবলই জপিতেছিলাম—আমি, আমি, আমি; বলিতেছিলাম—

ঈর্ষাক্ষুব্ধ নদীনীর তরণী ছুলিছে অবিশ্রাম,
আকাশে মেঘের মায়া, রহি' রহি' বিদ্যুৎ-ভ্রূকুটি;
বজ্রের গর্জনমাঝে উচ্চে তুলি আপনার নাম,
দৃঢ়হস্তে ধরি হাল, রুদ্ধ ঝড় মরে মাথা কুটি'।

সম্মুখে রচিছে পথ পিছে মানুষের ইতিহাস,
বিপুল আমার বক্ষে যুগে যুগে স্তম্ভিত পৃথিবী;
পিছনে গর্জিয়া আসে সময়ের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস,
ততবার উঠি জ্বলি' যতবার যাই নিবি' নিবি'।

প্রশস্ত ললাটে মোর নিজহস্তে রচি জয়টীকা,
বিক্ষুব্ধ-তরঙ্গাহত তরণীর আমি কর্ণধার;

অধোমুখী কভু নহে তিমিরে প্রদীপ্ত দীপশিখা,
নিজেরে যে করে মতি সে লভে সবার নমস্কার।

আমি ধরিয়াছি হাল, এ দুর্যোগে নাহি করি ভয়,
আপনি গাহিয়া চলি উচ্চকণ্ঠে আপনার জয়।

শির, তামেচা, বাহেরা—যথাযথ বজায় রাখিয়া 'শনিবারের চিঠি' এই কালে অদ্ভুত মারের কৌশল দেখাইয়াছিল। লক্ষ্য ছিল সর্বগ্রাসী—রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ, প্রমথ প্রভৃতি প্রবীণ হইতে প্রায়-সদ্যোজাত তরুণ পর্যন্ত কেহই বাদ যান নাই। মোহিতলালের গুরুগম্ভীর ভারী ভারী প্রবন্ধ, ব্রজেন্দ্রনাথের বহু বিচিত্রতথ্যপূর্ণ পুরাতনী গবেষণা সমবেত-ভাবেও আমাদের পৌরাণিক ও আধুনিক সুতীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত শস্ত্রপ্রয়োগের সঙ্গে তাল রাখিতে পারে নাই। রবি মৈত্র এবং আমি—মাত্র এই দুইজনেই তুলকাম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছিলাম। আমাদের দুইজনেরই তখন উদ্‌ভ্রান্তিযোগ; এই ভয়াবহ ভাঙনের মধ্যে স্থায়ী কিছু সৃষ্টির আবেগে আমরা যাহাকে বলে—থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলাম। এই উদ্দাম চাঞ্চল্য যে বৃথা যায় নাই, রবির ক্ষেত্রে তাহা অচিরাৎ প্রকাশ পাইল; তিনি পরে পরে অত্যল্পকালমধ্যে 'ঘৃতকুম্ভ' ও 'মানময়ী গার্লস স্কুল' রচনা করিতে বসিলেন। আমি অতি নগণ্য "টুক্‌রি" দিয়া শুরু করিয়া 'রাজহংসে'র "কে জাগে" কবিতায় আসিয়া স্থির হইলাম।

আমাদের এই দক্ষযজ্ঞের যুগে শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "উপাসনা প্রেসে"র হস্তান্তর এবং 'উপাসনা' পত্রিকার নবকলেবর-ধারণ-বিজ্ঞপ্তি লইয়াই কাণ্ডটা ঘটিল। অপরাধ তেমন মারাত্মক কিছু নহে, বিজ্ঞাপন দিবার কালে সকলেই রাজা-উজিরমারী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, 'উপাসনা'র নূতন কর্মকর্তা "ভট্টাচার্য চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং" তাহাই করিয়াছিলেন। অকারণেই আমরা ক্ষেপিয়া উঠিলাম। চৈত্রের (১৩৩৮) 'উপাসনা'র বিজ্ঞাপন লইয়া জ্যৈষ্ঠের (১৩৩৯) 'চিঠি'তে সোরগোল তুলিয়া বলিলাম—

'উপাসনা'র ভাগ্য ভাল, মকরধ্বজ ও ধুতুরা পাতার ব্যবস্থার পরিবর্তে ভট্টাচার্য চৌধুরী কোং অবধৌতিক মতে ইহার চিকিৎসা সুরু করিয়াছেন।...দুধটি মারিয়া যেমন ক্ষীর,

ক্ষীরটি মারিয়া যেমন চাঁচি—তেমনি ব্যাসদেবের মহাভারতের পর যথাক্রমে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং তৎপরেই উপাসনা···সাহিত্যে ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রবেশ করিলে চক্ষুলজ্জা কি এতখানিই ত্যাগ করিতে হয়?

এইটুকু নিরাপদ গালি, কিন্তু এই সঙ্গে ভট্টাচার্য চৌধুরী কোং পরিচালিত মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোং সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনর্থক খোঁচা ছিল। তাহা বরদাস্ত করিবার মত অহিংস ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন না। তিনি যখন আমার শাস্তিবিধানের জন্য আইনজ্ঞের পরামর্শ লইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে মাসাধিককাল পূর্বে 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশিত আমার বঙ্কিম-প্রশস্তি তাঁহার নজরে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আইনের বাঁধনের পরিবর্তে চাঁদির বাঁধনের কথা তাঁহার মনে হইল। সাবিত্রীপ্রসন্নকে সরাইয়া অপরাধী আমাকেই সম্পাদকীয় সিংহাসনে বসাইবার সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হইল। এই সকল মনস্তাত্ত্বিক সংবাদ তখন আমি কিছুই জানিতাম না, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ধরা দিলাম। পূর্ব ইতিহাস পরে স্বয়ং ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখেই শুনিয়াছিলাম।

আমি না জানিলেও আমাকে মনোনয়ন সংবাদটা 'উপাসনা' আপিসে চাউর হইয়াছিল। সাবিত্রীপ্রসন্নের সহকারী তখন শ্রীকিরণকুমার রায়। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন শৌখিন সাহিত্যিক, কিন্তু চাকুরি-জীবনে তাঁহার তুল্য দক্ষ নিষ্ঠাবান সহকারী সম্পাদক আমি আর দেখি নাই। তিনি পরিহাস করিয়া নিজেকে বলিতেন—শাশ্বত সহকারী সম্পাদক, বোঁটারূপে তাঁহার অবস্থান চিরস্থায়ী, ফুলের অর্থাৎ সম্পাদকের পরিবর্তন বার বার ঘটিতে পারে। ঘটিয়াছিলও তাই, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের পরে সজনীকান্ত দাস এবং তাহারও পরে শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার 'উপাসনা'-'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক হইয়াছিলেন; কিন্তু ধ্রুবতারার মত কিরণকুমার রায়—কি. কু. রা. অটুট ও অটল ছিলেন। কিরণকুমার অসামান্য সাহিত্যরস-বোধের অধিকারী ছিলেন; তারাশঙ্কর তাঁহার 'আমার সাহিত্য-জীবন' গ্রন্থে বহু নিদর্শন দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারই মধ্যস্থতায় আমি

তারাশঙ্কর, শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীপরিমল গোস্বামী প্রভৃতি সাহিত্যিকের ও শিল্পী শ্রীঅরবিন্দ দত্তের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম।

'উপাসনা'র আপিস ও ছাপাখানা ভট্টাচার্য চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং পরিচালিত বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ঠিক দক্ষিণে ৫৬ ধর্মতলা স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। হেড আপিস ছিল ২৮নং পোলক স্ট্রীটে। হেড আপিসে কানাঘুষা উঠিতেই বোঁটা কিরণকুমার সরোজকুমার সমভিব্যাহারে স্কুলের পরীক্ষা লইতে আসিলেন। নিছক সাহিত্যপ্রসঙ্গে আলাপ হইল; সরোজকুমারের মিঠা হাতের গল্পের আমি ভক্ত ছিলাম। কথায় কথায় জানা গেল, তিনিও বনফুল ও আমার মত ১৯১৮ সনের ম্যাট্রিকুলেট। অল্প আলাপেই বন্ধুত্বে পাক ধরিয়া দানা বাঁধিতে লাগিল। আলাপচারি করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন, কি বুঝিলেন জানি না; আমি কিন্তু আসল রহস্যের বাহিরেই রহিয়া গেলাম।

এই কাহিনী আপাতত এখানেই স্থগিত রাখিয়া 'শনিবারের চিঠি'র প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। ১৩৩৮ সাল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি' একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল; কেন চাহিল, আজ তাহার সঠিক জবাব দিতে পারিব না। হয়তো তাহার মনের আকাশে চকিত বিদ্যুৎরেখাবৎ পরিবর্তিত ভবিষ্যতের একটা আভাস উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিংবা হয়তো ক্লান্ত চরণে আরও পথ অতিক্রম করিবার দুঃসাধ্য সাধনায় একবার নিজের মনেই বোঝাপড়া করিয়া লইতেছিল। সেই আত্মগত চিন্তার স্বরূপ ছিল এই—

১৩৩৮ সাল শেষ হইল।

মহাত্মা গান্ধী জেলে বন্ধ আছেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তীব্র দৃষ্টি আজ কারাগারের কন্দরান্তর্গত পথে পরিত্যক্ত পরশমণি খুঁজিতে ব্যস্ত—ভারতবর্ষে যাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানার্হ বলিয়া জানিতাম, বিধানচন্দ্র রায় ও নলিনীরঞ্জন সরকার ব্যতীত তাঁহাদের আর সকলে লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কি? রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত এই সত্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা প্রাতে চায়ের পেয়ালা এবং চুরুটের টিন লইয়া অত্যন্ত কাতরভাবে পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতেছি এবং কিছুক্ষণ এইভাবে

দৃষ্টিবিনিময় করিতে করিতে হঠাৎ কেন জানি না উত্তেজিত হইয়া বলিতেছি—"দাদা গো, যাহা হইবার হইয়াছে, ভাবিয়া লাভ কি? তাহার চাইতে আইস একপাত্র খাওয়া যাক, অথবা চল 'নটীর পূজা' দেখিয়া আসি।" দৃষ্টি-বিনিময় বেশি হইলে মন আরও একটু উদার হয়। ফলে, মদের দোকান ও সিনেমা-হাউসগুলি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বালাই লইয়া জলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী জেলে, গতকল্য রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার বাংলা'র রবীন্দ্রনাথ, 'দেশ দেশ নন্দিত'-করা রবীন্দ্রনাথ, 'জনগণমন-অধিনায়ক' রবীন্দ্রনাথ এরোপ্লেনে চড়িয়া ভারতের বাণী শুনাইতে পারস্য যাত্রা করিলেন। অর্ধবস্ত্রপরিহিতা ভৈমী পথভ্রান্ত হইয়া একাকী অসহায় অবস্থায় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যপ্রদেশে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে আর নিষধপতি নল ঋতুপর্ণ রাজার সহিত বিমানচারী রথে চাপিয়া গান্ধাররাজদুহিতার স্বয়ম্বর-সভায় বরমাল্যের লোভে যাত্রা করিয়াছেন—এরূপ ঘটনা যে মহাকাব্যের বিষয় হইত, রবীন্দ্রনাথের পারস্য-যাত্রার মধ্যে আমরা সেই মহাকাব্যিক মহিমা দেখিতে পাইলাম।

আর অকালবৃদ্ধ শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত'-এর জীবন কাটিতেছেন। শ্রীকান্তের সৌভাগ্য যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য ইন্দ্রনাথ আজ জীবিত নাই। দেখিতেছি, দরজিপাড়ার আমাদের সেই 'ঠুন-ঠুন পেয়ালা' দাদাটি আজিও অধীর আগ্রহে মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করিতেছেন বলিয়া শরৎচন্দ্র থামিতে পারিতেছেন না।

প্রবীণ প্রভাতকুমার লজ্জায় দেহরক্ষা করিয়াছেন; বাঁচিয়া আছেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। তবু আছেন বলিয়া এখনও শুনিতে পাই—"বহু বাক্যব্যয় করা নিষ্ফল হতে পারে। কিন্তু বোবা হবার যে কোনও মাহাত্ম্য আছে, এ যুগে আমরা তা মানি নে।... আর এ প্রবৃত্তি যে অমর, অন্তত বাংলাদেশে, তার প্রমাণ বাংলায় নিত্য নতুন লেখক আবির্ভূত হচ্ছে।" অর্থাৎ যুগন্ধর প্রমথবাবু বলিতেছেন, বাংলাদেশে এটা 'টকি'র যুগ। 'সাইলেন্ট' যাঁহারা, তাঁহারা সরিয়া পড়িতেছেন।

সুতরাং বৎসরের শেষে আমরাও নিজেদের কথা কিছু বলিতেছি, যুগধর্মের কথা ভাবিয়া সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন।

ইহাই ছিল তৎকালীন পরিবেশ। 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্যের কথাও এইভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে—

সাহিত্যের নামে কিছুকাল যাবৎ যাহা সুরু হইয়াছে তাহাকে সাহিত্য বলিয়া গণ্য না করিলেই চলিত কিংবা ঠাট্টা তামাসা করিয়া উড়াইয়া দিলেই যথেষ্ট হইত—শনিবারের চিঠি'র প্রথম প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল তাহাই। কেবল সাহিত্য নয়, আধুনিক সমাজে যাহা কিছু মেকী ও মিথ্যা বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাই লইয়া রঙ্গ করা তাহার অভিপ্রায় ছিল, এবং সেই রকমের আমোদে নিজেদের খোশখেয়াল চরিতার্থ করিবার সুযোগ আমরা প্রথমে লইয়াছিলাম। কিন্তু সহসা সেই সময় সাহিত্যের আদর্শ লইয়া একটা বিতর্ক আরম্ভ হয়

এবং তাহার ফলে দেখা গেল—যাহাকে সাহিত্যের ধূলাখেলা বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং সেই খেলায় ধূলামাটি কোনও রূপে গায়ে না লাগিলেই যথেষ্ট বলিয়া কোনও আশঙ্কার কারণ ঘটে নাই, সেই ধূলাখেলায় প্রবীণ ব্যক্তিগণের যোগ আছে এবং তাহাকে তাঁহারা বর্তমান যুগের সাহিত্য-সাধনার নূতন ধারা বলিয়া তাহার জয় ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাঁহাদের সৃষ্টিশক্তি দূরের কথা, রসবোধের পরিচয়ও কখনও পাই নাই, অথচ যাঁহারা সাহিত্যস্রষ্টা বা সাহিত্যসমজদার বলিয়া পরিচিত হইতে চান, তাঁহারাই আপন আপন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা আবেগ চরিতার্থ করিবার জন্য এই অপোগণ্ড সাহিত্যের ওকালতনামা গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম" লইয়া যে ব্যক্তিগত অভিমান ও ঈর্ষার স্রোত প্রবাহিত হইল, এবং তাহার ফলে যে পাঠক সম্প্রদায় অতি অপথ্য গল্প ও উপন্যাস এতদিন গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করিতেছিল তাহাদের রুচিহীন ক্ষুধার অতঃপর যে রুচিজ্ঞান সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা হইল, তাহাতে সাহিত্যের জন্য কোনও চিন্তার কারণ না থাকিলেও, পারিবারিক ও সামাজিক নীতির জন্য চিন্তিত হইবার কারণ ছিল। তথাপি এই রুচির সংশোধন 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য ছিল না। যে যুগে যাহা অনিবার্য তাহা ঘটিবেই—যে সকল কারণে সমাজে ও সাহিত্যে এই অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার নিরাকরণ কোনও পত্রিকার সাধ্যায়ত্ত নয়। ক্রমাগত কুপথ্য সেবন করিলে স্বাভাবিক নিয়মেই তাহার প্রতিক্রিয়া আসিবে। এজন্য 'শনিবারের চিঠি' কোনও প্রকার সংস্কার-কর্মে ব্রতী হয় নাই। কিন্তু যে মিথ্যা নীতির প্রচার এই সকল তথাকথিত সাহিত্য-পণ্ডিতেরা সদম্ভে করিয়া চলিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ—কোনও নীতির পক্ষ হইতে নয়—স্বভাবের নিয়মেই অপরিহার্য। 'শনিবারের চিঠি' সেই স্বভাবধর্মেরই অভিব্যক্তি। যাহা মিথ্যা বলিয়া জানি তাহাকে অচেতন জড়বৎ যাহারা সহ্য করিয়া থাকিতে প্রস্তুত নয়—তাহারাই 'শনিবারের চিঠি'র লেখক ও পরিচালক। সংস্কারমূলক গঠনকার্য নয়, একটা বলিষ্ঠ ও প্রাণপূর্ণ প্রতিবাদই এই আশাহীন কর্মের উদ্যমস্বরূপ তাহাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

আশ্চর্য এই যে, এই সুগভীর আত্মচিন্তাজনিত স্বগতোক্তির অব্যবহিত পরেই উদ্দেশ্য-বদলের আভাস দেখা যাইতে লাগিল, প্রাণপূর্ণ প্রতিবাদেই আর সে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিল না। সংস্কারমূলক গঠনকার্য না হউক, সৃষ্টিধর্মী গঠনকার্যের দিকে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। যাঁহারা কোদালকুড়ুলধারী ভাঙনের মজুর ছিলেন, তাঁহারা হাঁকডাক পাড়িয়া গড়নের মজুরদের আহ্বান জানাইলেন। কুরুক্ষেত্রের শ্মশানভূমির উপরেই নূতন ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল। কারবালার মরুভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ৩২।৫।১

বীডন ষ্ট্রীটের বিশুষ্ক আবহাওয়া রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীটের সমান্তরাল ভাবে নিত্য-প্রবহমান খালের শীকরকণাস্পর্শে সরস হইতে বিলম্ব হইল না। অন্তরালবর্তিনী মা গুরু-শিষ্যের মধ্যবর্তিনী হইয়া আগাইয়া আসিলেন। দুস্তর ব্যবধানের উপর ক্ষীণ হইলেও মিলনের সেতু রচিত হইল।

পারস্তভ্রমণ শেষে ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ (৩ জুন, ১৯৩২) কবি দেশে ফিরিলেন। কলিকাতার অনতিদূরে বৈষ্ণবতীর্থভূমি খড়দহে গঙ্গার ঠিক গা-ঘেঁষিয়া নির্মিত একটি প্রাসাদে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। ছেলের উপর মায়ের হুকুম হইল, কবিকে লেখা একটি জরুরী চিঠি লইয়া খড়দহ যাইতে হইবে।

মুশকিলে পড়িলাম। জয়ন্তীর পর হইতে কয়েক সংখ্যা ধরিয়া কবিগুরুর মুণ্ডপাত করিয়া হাতের সুখ করিতেছিলাম, হঠাৎ এ কী নিদারুণ আদেশ! 'না' বলিবার উপায় ছিল না, মা পুত্রবধূ মারফৎ হুকুম জারি করেন; সুধারাণীর নিকট প্রেরিত তাঁহার চিরকুটগুলির মর্যাদা প্রায় বাদশাহী পাঞ্জার সমান। সুতরাং যাইতে হইল। খড়দহে তখন মোহিতলালের এক সাহিত্যরসিক বন্ধু থাকিতেন, মোহিতবাবুর দৌলতে তাঁহার সহিত আলাপও হইয়াছিল। তিনি বাঙালীর 'বেঙ্গলিটি'র বড় পাণ্ডা ছিলেন। ভোরে রওয়ানা হইয়া প্রথমে তাঁহার গৃহেই দর্শন দিলাম। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা পাকা করিয়া গৃহস্বামীর এক বিদুষী কন্যা সমভিব্যাহারে কবি-সন্দর্শনে যাত্রা করিলাম, ইচ্ছা ছিল সঙ্গিনীকে অগ্রবর্তিনী করিয়া দিয়া কোনও প্রকারে সঙ্কোচ ও লজ্জার দায় এড়াইব। সংবাদ মিলিল, কবি দ্বিতলে আছেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ভূ-তলে দ্বার রক্ষা করিতেছেন; তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায় নাই। রথীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মনোনিবেশসহকারে এক খণ্ড মসৃণ চামড়ার উপরে একটি লৌহশলাকার সাহায্যে ফুল তুলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলাম, সেই চাহনিতেই ভড়কাইয়া গিয়া আমার সঙ্গিনী অন্তর্ধান হইতেছেন। তখন আর উপায় নাই। বসিয়াই রহিলাম। রথীন্দ্রনাথ খুব ধীর শান্ত কণ্ঠে ছোট্ট একটি প্রশ্নের চিমটি কাটিলেন—কি, খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন? আমার

'শনিবারের চিঠি'র মেজাজ সঙ্গে সঙ্গেই চাড়া দিয়া উঠিল, বলিয়া ফেলিলাম, আজ্ঞে, তার জন্যে এত কষ্ট ক'রে এতখানি পথ আসবার দরকার ছিল না, আপনাদের সব খবর বাজারেই পাওয়া যায়। শর-নিক্ষেপ করিয়াই লজ্জা হইল; শান্ত কণ্ঠেই বলিলাম, দেখুন, আমি দূত, সুতরাং অবধ্য। রথীন্দ্রনাথের মুখে মৃদু প্রসন্ন হাসি দেখা দিল, বলিলেন, উপরে খবর গেছে, আপনি বসুন। অনতিবিলম্বে সংবাদবাহী ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া কবি-সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। প্রণাম সারিয়া তাঁহার হাতে হেমন্তবালা দেবীর পত্রখানি দিলাম। নতমুখ নীরব রবীন্দ্রনাথ যেন একটা অবলম্বন পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন।

হঠাৎ-অপ্রসন্নতার ধাক্কা কাটাইয়া কবি যখন কথা আরম্ভ করিলেন, প্রথমে মনে হইল—তিনি একা বসিয়া স্বগতোক্তি করিতেছেন। তিনি যেখানে পূর্বমুখী হইয়া বসিয়া ছিলেন তাহার পিছনেই একটি জানালা, সেই জানালা-পথে গঙ্গার আবিল গৈরিক জলধারা চোখে পড়িতেছিল। শীর্ণকায়া নদীর ভীমামূর্তি দেখিয়া আমার মুখে-চোখে বিস্ময় ফুটিয়া থাকিবে। তিনি বলিলেন, এই নদীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ নাড়ীর যোগ, আমি গঙ্গার সন্তান। এই গঙ্গা যেখানে পদ্মা হয়েছে, সেখান থেকে দক্ষিণে পাবনা পর্যন্ত এক সময় আমার বিচরণক্ষেত্র ছিল, একটু এগিয়ে এসে নীচে চেয়ে দেখ আমার সে যুগের বিশ্বস্ত বাহন 'পদ্মা'র সংস্কার হচ্ছে। ওই 'পদ্মা'য় আমি দীর্ঘকাল বাস করেছি, ওকে আমি ভালবাসি, তাই ছাড়তে পারি নে। ও জীবনভোর অনেক খেটেছে, ওকে ছুটি দেওয়াই উচিত ছিল।

পরে শ্রীহরিহর শেঠের যত্নে ও আহ্বানে চন্দননগরে যেবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাঁহাকে ওই পুনঃসংস্কৃত 'পদ্মা' বোটেই অধিষ্ঠান দেখিয়াছিলাম। খড়দহের সেই 'গঙ্গার সন্তান' কথাটি স্মরণ করিয়াই তখন আমি আমার 'পঁচিশে বৈশাখে'র "গাঙ্গেয়" কবিতাটি লিখিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়া চলিলেন, আমি সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতুম। আত্রাই-পদ্মায় কখন যে বোট থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব তা নিজেও

জানতুম না। পুরোনো মাঝিমাল্লারা আমার মুখচোখের চেহারা দেখে টের পেত, ডিঙি নিয়ে তৈরি থাকত তারা। যতক্ষণ দম থাকত মাথা তুলতুম না, শরীর অবশ হয়ে এলিয়ে এলে একটা হাত বাড়িয়ে দিতুম জলের ওপরে, মাঝিরা তৎপরতার সঙ্গে এসে আমাকে ডিঙিতে তুলে নিত। এই ছিল আমার দৈনন্দিন খেলা, সর্বনেশে খেলা, কি বল? ডুবে যে কেন যাই নি আজও তাই ভাবি, ওই মাঝিমাল্লাদের দয়াতেই।

পর পর এমনি অনেক গল্প। প্রায় দুই ঘণ্টা মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছিলাম; সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গে একটিও কথা হয় নাই। ওই দিনই বলিয়াছিলেন, আমি খুব ভোগী, লোকের এমন একটা ধারণা আছে। কথাটা সত্যি নয়। ছেলেবেলা থেকে যে ভাবে আমরা মানুষ হয়েছিলুম তাতে ভোগের স্থান ছিল না। আমার মতন কৃচ্ছ্রসাধনাও বুঝি কেউ করে নি। দিনের পর দিন শুধু মুগের ডালের সুরুয়া খেয়ে কাটিয়েছি। সে সময় ছোটগল্প আর কবিতার বান ডেকেছিল আমার মনে।

রথীন্দ্রনাথ নীচে হইতে খবর পাঠাইলেন, কবির স্নানাহারের সময় হইয়াছে। আমি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সম্ভবত তিনি সেই দিন প্রথম আমার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, হেমন্তবালার লেখার শক্তি অসাধারণ, ভাষা সাবলীল, আর্টিস্টের ডিট্যাচমেণ্ট (নির্লিপ্ততা) যদি ও লেখায় আনতে পারে স্থায়ী নাম রাখতে পারবে।

শরতের মেঘের মত হালকা মনে প্রসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরিলাম। এই সাক্ষাতের মধ্যে অপূর্ব বা অসাধারণ কিছুই ছিল না, অথচ আমি দূরবিসর্পিত নূতন পথের সন্ধান পাইলাম।

মোহিতলাল তখন প্রত্যেক মাসের প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপর নির্মমভাবে ছুরি চালাইতেছিলেন। আমারও তাহাতে সায় ছিল, কিন্তু আমার মতির পরিবর্তন হইতে লাগিল। রবীন্দ্র-প্রশংসিত হেমন্তবালা দেবীর লেখা সংগ্রহ করিয়া যে মাসে ছাপিতে আরম্ভ করিলাম (অগ্রহায়ণ ১৩৩৯), সেই মাসেই অকস্মাৎ ভট্টাচার্য চৌধুরী কোম্পানির ডাক আসিল। সত্যবাণী দেবী এই বেনামে মাসীমার

লেখা পর পর ছাপা হইতে লাগিল—'শনিবারের চিঠি'তে সমাজ ও ধর্ম বিষয়ক নূতন সুর যোজিত হইল।

পূর্বেই বলিয়াছি, আসল পরিবর্তন দেখা দিতে লাগিল রবি মৈত্রের ও আমার লেখায়। রবি তাঁহার সমস্যামূলক সামাজিক উপন্যাস 'ঘৃতকুম্ভ' রচনায় হাত দিলেন, জ্যৈষ্ঠ হইতেই তাহা ধারাবাহিক ভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে বাহির হইতে লাগিল। আমিও ওই মাসে "টুকরি"তে ভরিয়া গালাগালিনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ নূতন ধরনের পাঁচমিশালি মাল সরবরাহ করিলাম। বৈশাখের "টুকরি"র ধরন জ্যৈষ্ঠেই আমূল বদলাইয়া গেল। এইখানেই আমার কাব্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত। কৈফিয়ৎ ছিল এই—

গোবর নহেক, হে সখি, আমার
কাব্য-বাঁশের টুকরিটায়,
ছন্দ আমার আজিও কেন যে
চলিতে মিলের হুমড়ি খায়।
অনেক কষ্টে রাশটা আলগা করি,
চোখে দেখি নাকো কি যে টুকরিতে ভরি—
মনের নদীতে চলিছে ডুবিছে তরী,
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়িছে বসিছে
ঘুঘু চরিতেছে মন-ভিটায়।
তারি দু-একটা টুকরি-ছন্দে
ভরিতেছি সখি, টুকারটায়।

জ্যৈষ্ঠের (১৩৩৯) 'শনিবারের চিঠি' হইতেই আমার এই মনের যাত্রাবদলের কয়েকটি নমুনা দিয়া এই তরঙ্গ শেষ করিতেছি। এই টুকরা কবিতাগুলি আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 'আত্মস্মৃতি'তে মোড় ফিরিবার প্রমাণ হিসাবে দাখিল করিলে খুব অন্যায় হইবে না—

উমা

মামার বাড়িতে গিয়াছিল উমা, ফিরিয়া আসিয়া কহে,
সবাই সেখানে রহিয়াছে বাবা, তুমি কেন সেথা নাই?

কথা যাই হোক, ভাবটা তাহার এই—
দুই বৎসর পূর্ণ হয় নি আজো।
কি জবাব দেব, ভাবিয়া হইনু সারা।
চুপ ক'রে থেকে কহিলাম আমি শেষে—
সেথা যদি থাকি, উমারে আমার আনিতে যাইবে কেবা?

খোকন

পাশের মাঠেতে ডন-বৈঠক করে
পাড়ার যতেক মাসেল-লোলুপ ছেলে।
প্রাচীরের গায়ে পাহাড়প্রমাণ কাঠ
তারি বোঝাজল বর্ষার জ্বরে মাঠ,
জল নহে যেন লাল রক্তের ধারা;
খোকা কহে, আজ ডন নয় বাবা, রক্তে করিব স্নান—
আকাশে চাহিয়া বলি তারে চুপি চুপি—
এখনো সময় হয় নি খোকন, ঘোচে নি সর্দি-জ্বর।

বড় হ'লে

আমি বড় হ'লে, তুমি মোরে বাবা কেমন লইবে কোলে,
কঠিন প্রশ্ন, সহজ জবাব তার,
কোলে তুলে নিয়ে, চুমু খেয়ে মুখে, কহিলাম খোকনেরে—
তুমি বড় হ'লে আমিও যে বড় হব।
বাঃ!—বলিয়া খোকা কোল হতে নেমে গিয়ে
দ্বিধা-বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, তাই যদি হবে বাবা,
ঠাকুরদা কেন নেয় না তোমার কোলে?
মনে মনে নেয় হয়তো—খোকাকে কহিলাম মনে মনে,
মন হতে তবু গেল নাকো সংশয়।

পুতুল

উমার বিষম ভাবনা হয়েছে মনে,
কাঠের ছেলেটি দুদিন খায় নি মাই—
বুকে নিয়ে তারে, ঘোরে পাগলের মত,
যারে ছাখে তারে বলে, ওরে মাই দাও।

এগারোটা বেই বাজে—
কাঠের পুতুল উঠানে ফেলিয়া উমা মার কাছে গিয়ে—
দু বাহু বাড়ায়ে, 'মা' বলে কাঁদিয়া উঠে,
বুকের বসন টানিয়া মুখটি বুকেতে লুকাতে চাহে।
আমি ভাবি শুধু উমার মায়ের কথা,
উমারে ফেলিয়া সেও কি কখনো খুঁজিছে মায়েরে তার!

অপু

অপু ও অপুর্ণার—
একের সৃষ্টি যেন অপরের লাগি।
কোথা লীলা তবু তাই ভেবে কাঁদে কেন যে অপুর মন,
রাণু দিদি গাঁয়ে ঘাটে জল নিতে চলে।
মামার বাড়িতে অনাদরে তার কাজলের চোখে জল—
এ দুর্ভাবনা নহে তো অপর্ণার।
সে আজো কোথায় ব'সে আছে পথ চেয়ে,
অপু চ'লে গেছে অকারণ রাগ করি।
কাঁদিবার লাগি থাকে নাকো সংসারে,
বাঁচিবার লাগি আসে না অপর্ণারা।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরেতে ঢুকেই রাসমোহনেরে ডাকে,
—ধোঁয়ানো গরম একটি পেয়ালা চা—
সিগারেট তার পরে হয় ভাল, না হ'লে বিড়িই সই।
তারো পরে নহে কলিকাতা দমদম।
বারাকপুরের বনে,
যেটুর গন্ধে বায়ু হ'ল মন্থর,
থরে থরে ফোটা ওড় কলমির ফুল,
ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়া নামহীন কত পাখী,
মাছরাঙা-বসা রেল-লাইনের তার—
তারো পরে ফিজি, দিয়াছেন কথা পণ্ডিতজী* তো কবে,
হিন্দী একটু শিখিয়া নিলেই হবে—
জেনেছে সেথায় গাছেদের কিবা নাম।

---

* পণ্ডিত বারাণসী দাস চতুর্বেদী বিভূতিভূষণকে কথা দিয়াছিলেন, ফিজি দ্বীপপুঞ্জে লইয়া যাইবেন।

বাস্তব

থরে থরে মেঘ জমেছে আকাশ-কোলে,
রহিয়া রহিয়া গুরু গরজায় বাজ,
বিদ্যুৎ-অসি চকিতে ঝলসি উঠে,
ঘুর বনচূড়া সাজে অপরূপ সাজে।
বস্তি-মালিক কবিতা-লিখন-রত,
উড়ো উড়ো চুলে লাগিছে জলের গুঁড়া—
তেতলার ঘরে বউ শুয়ে এক পাশে,
'আহা' 'উহু' করে, আর পড়ে 'গৃহদাহ'।
নীচে বস্তির চালে চালে খোলা কখন সরিয়া গেছে,
মেঝে ছাপাইয়া ছুটিছে জলের ধারা।
কোনো ঘরে কারো তিন বছরের শিশু
ধুঁকিছে, হয়েছে ডবল নিউমোনিয়া।
বুকে নিয়ে শিশু, চাল ফুটো জল হইতে বাঁচাতে তায়
জননী এখানে ওখানে সরিয়া বসে—
রেডিওতে চলে গান—
রবি ঠাকুরের, 'বর্ষারাতের শেষে'।

[ক্রমশ]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

চলতি পাহাড়ী কবিতা

এখানে পাহাড় দুর্গের মত গিরিখাত আঁকাবাঁকা,—
এখানে মেঘের স্থপতি-শিল্প জলকুয়াশায় ঢাকা।
নীলতব কোন্ সুন্দর পাখি আনে স্বর্গের রেশ,
এক পসলার বৃষ্টির শেষে হাসছে হরিৎ দেশ।
ওধারে কুয়াশা বনের ভিতরে ক্ষণ-বিশ্রাম করে,
রঙীত নদী একটি রেখায় শুধু রূপ হয়ে ঝরে।
যেন খাজুরাহ মন্দির-চূড়া উর্ধ্বে উঠছে ক্রমে,—
নীচে পৃথিবীর যত স্নেহপ্রেম সাদা মেঘ হয়ে জমে।

রাত্রিতে কত অশরীরী পায় দীর্ঘ তরুর কায়া—
যেন আসন্ন এই যুগান্ত উদ্যত ফেলে ছায়া।

এখানে পাহাড় সারাদিনভোর কাঁদে সূর্যের শোকে,
সোনালী বিড়াল চেয়ে থাকে এক অতি পাংশুল চোখে।
গুম্ গুম্ কোথা পাহাড়ের কোণে শব্দ বিরামহারা—
যন্ত্রের চাপে ওঠে ঘূর্ণিত জলবিদ্যুৎধারা।
কত না যুগের বধির আঁধার নীচে অরণ্যতলে—
মাটি ও পাথরে লতার শিকড়ে কোন্ সংগ্রাম চলে!

এখানে মানুষ কঠিন পাথরে ক্ষুধার অন্ন তোলে,
বাঘের সঙ্গে ভাগাভাগি করে বাঁচে পৃথিবীর কোলে।
পাহাড়-ফাটানো বজ্রের ডাকে ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝা ঘোরে—
সারারাত ধ'রে কাঠের কুটিরে তারা প্রার্থনা করে।
শুধু তিনজন অতিকায় লামা জেগে থাকে অবিচল—
মুদ্রিত চোখে বুদ্ধের ছবি শাশ্বত উজ্জ্বল।

আহা, টুংস্থং আঁকাবাঁকা পথ পাহাড়ের কোলে কোলে,
পিঠে-বাঁধা-শিশু পাহাড়ী মেয়ের স্তনশোভা গেল চ'লে!
কষ্টিপাথর মসৃণ করে বরফ-গলার গান,
একটি ডাঁটায় ফুলের পেয়ালা মেলেছে অমর প্রাণ।

ক্রমে কুয়াশার নীল সমুদ্র সব দিল ঘুমে ঢেকে—
আহা, মানুষের ঘরসংসার কিছু কি গেল না রেখে!
মুছে গেছে সব আগামী-অতীত—শুধু তুষারের ঘ্রাণ,
তুমি আর আমি চলেছি কেবল আঁধারে বেপথুমান।
এই কুয়াশায় হারালে তোমায় আর তো পাব না প্রিয়ে,
উঁচুনীচু পথ বাকিটা জীবন বাঁচব বল কি নিয়ে!
তোমার চোখের রঞ্জন-আলো মেলাক আমার দিশা,
তোমারি হাতের উষ্ণ পরশে মেটাব রৌদ্র-তৃষা।

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

বন্ধু নীরেন বসু

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে সানাই বাজতে শুরু করেছে। ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকার বিছানায় শুয়েই সহসা কি একটা হিসেব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিয়ের মাস। প্রকাশকের দোকানে ভিড় জমতে আরম্ভ করছে। কত বই বিক্রি হ'লে কত টাকা রয়েলটি আসবে, তার হিসেব তিনি করছেন গত কাল থেকে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে হিসেবের অঙ্ক কষছেন তিনি। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর ছাদের ওপরে সামিয়ানা টাঙানো হচ্ছে। কাল দুপুরবেলা কলেজ স্ট্রীটে প্রকাশকের দোকানে যাবার পথে তিনি দেখেছেন, এক শো ত্রিশ নম্বর বাড়ির সামনে তিনখানা ঠেলাগাড়ি। গাড়ি-ভর্তি চেয়ার। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক চেয়ার আসবে। বড়লোকের মেয়ের বিয়ে। শ পাঁচেক লোক নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন খাবেন। প্রত্যেকের হাতে থাকবে উপহার। কাপড়-গয়নার সঙ্গে ভদ্রলোকেরা দু-দশখানা উপন্যাস কি আনবেন না? নিশ্চয়ই আনবেন, ভাবলেন অভয়পদ সরকার। ভাবতে ভাবতে তিনি ভুল ক'রে প্রায় ট্রামে উঠে পড়েছিলেন। বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে কলেজ স্ট্রীটে যাবেন ব'লে। নিজের সঙ্গে গল্প করতে করতে কয়েক মাইল রাস্তা হাঁটা এমন কিছু কষ্টের কাজ নয়। ঠেলাগাড়িতে এতগুলো চেয়ার দেখে এবার তিনি রাস্তা হাঁটবার ভাল কাজ পেলেন। প্রতি বিয়েতে যদি গড়ে পাঁচখানা ক'রে তাঁর উপন্যাস বিক্রি হয়, তা হ'লে পুরো অগ্রহায়ণ মাসটায় ভাগ্য তাঁর কেমন যাবে? শতকরা কুড়ি টাকা তাঁর রয়েলটি। বুড়ো আঙুলটা বাকি চারটে আঙুলের মাথায় ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে তিনি রয়েলটি হিসেব করছেন আর আধ ঘণ্টায় সতেরো শো ষাট গজ রাস্তা অতিক্রম করছেন। এক ঘণ্টা পরে গলা শুকিয়ে এল অভয়পদবাবুর। পকেট থেকে দু কোয়া কমলালেবু বার করলেন তিনি। ছ পয়সা দিয়ে তিন দিন আগে লেক মার্কেট থেকে একটি কমলা কিনেছিলেন। নাগপুরের বাগানে কমলালেবুটি জন্মেছে ব'লে এর দাম ছ পয়সা। দার্জিলিঙের কমলা দু আনার কমে কেনা যায় না। দার্জিলিং আমাদের গ্রীষ্মকালের রাজধানী। সরকারী আভিজাত্যের সার পেয়ে প্রতিটি কোয়ার মধ্যে দু

পয়সার বেশি রস জমায়। তার ওপরে গভর্মেণ্টের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমৃদ্ধি রয়েছে দার্জিলিঙের কোয়ায়, ভাবলেন অভয়পদ সরকার।

সন্ধ্যের একটু আগেই তিনি এসে পৌঁছলেন কলেজ স্ট্রীটে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফটক দিয়ে ছাত্র এবং ছাত্রীরা বেরিয়ে আসছে দেখে অভয়-বাবু গায়ের চাদরটা ঘোমটার মত ক'রে কপাল পর্যন্ত টেনে দিলেন। কেউ যদি চিনে ফেলে তা হ'লে আর লজ্জার সীমা থাকবে না। লজ্জা তবু তিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। ঈস্ট বেঙ্গল সোসাইটির জুতো-বিভাগের সামনে দেখা হয়ে গেল অধ্যাপক কল্যাণ মিত্রের সঙ্গে। আধুনিক বাংলার বড় পণ্ডিত কল্যাণবাবু। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ভারতবর্ষে মেয়েরা কি ধরনের অলঙ্কার পরতেন তাই নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন।

আরে, অভয়পদ যে! মাথায় ঘোমটা দিয়েছ কেন?—জিজ্ঞাসা করলেন অধ্যাপক কল্যাণ মিত্র।

লজ্জা করছে তোমাদের ফটকের সামনে দিয়ে যেতে।—জবাব দিলেন অভয়পদ সরকার।

কেন, লজ্জা কিসের? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটা কি তোমার পছন্দ নয়? এর স্থাপত্য-শিল্প ভারতীয় ঐতিহ্য বহন করছে।

আমি দেখি নি।

কেন?—খুবই বিস্মিত বোধ করলেন কল্যাণবাবু।

মাথার চাদরটা ভুরুর ওপর পর্যন্ত টেনে দিয়ে অভয়পদ সরকার বললেন, নিজের মুখের স্থাপত্য এত বেশি ভাঙাচোরা যে, কোন পণ্ডিতই ধরতে পারেন না আমি খ্রীষ্টপূর্ব কোন্ শতাব্দীতে জন্মেছিলাম। সেই জন্যে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে যাই। ইদিকপানে একটু স'রে এসো, তোমাদের ছাত্রীরা সব জুতো-বিভাগে ঢুকছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কল্যাণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, নতুন বই কি লিখছ?

বই লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

সংসার চলছে কি ক'রে?

বছরে তিনখানা ক'রে উপন্যাস তৈরি করি। আচ্ছা, এবার আমি যাই। প্রকাশকের দোকানে একটু কাজ আছে। বিয়ের সিজন্ শুরু হয়েছে কি না।

ও, হ্যাঁ, অগ্রহায়ণ মাস এটা। সুলতার জন্যে বাবা বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। গত পাঁচ বছর থেকে আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু সুলতা কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। এবার আমরা ওর বিয়ে দেবই। মাঘ মাস পেরুতে দেব না। তুমি কবে বিয়ে করছ হে অভয়পদ?

তিনশোখানা উপন্যাস তৈরি করতে পারলে বিয়ের তারিখ আমি বলতে পারব। সুলতাকে ব'লো, একদিন যাব দেখা করতে।

এলে এ মাসের মধ্যেই এস। আমরা নতুন বাড়িতে উঠে যাব। অভয়পদ, সুলতা বলেছিল যে, তোমার নায়ক-নায়িকারা আজকাল কেউ বিয়ে করছে না। সবাই নাকি বছরের পর বছর অপেক্ষা ক'রে থাকছে? কিন্তু সুলতা কার জন্যে অপেক্ষা করছে বলতে পার?

দেখি, ভেবে দেখি। এবার আমি চলি।—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকার ঢুকে পড়লেন শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে।

প্রকাশকের দোকানে এসে তিনি দেখতে পেলেন, কাউন্টারের ওপর রঙ-বেরঙের উপন্যাস প'ড়ে রয়েছে। তাঁর নিজের বই কখানাও তিনি দেখলেন। প্রবীণ এক ভদ্রলোক বই কিনতে এসেছেন। দোকানের সামনে মস্ত বড় গাড়ি। ইচ্ছে-করলে তিনি অভয়পদ সরকারের লেটেস্ট উপন্যাস 'ফাল্গুনের চাঁদ' বইখানার একটা গোটা সংস্করণই কিনতে পারেন। ত্রিশ অশ্বশক্তির গাড়িখানার পক্ষে একটা সংস্করণের দু হাজার বই বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া খুব কিছু অসুবিধে হবে না। অভয়পদ সরকার সহসা মনে মনে দু হাজার 'ফাল্গুনের চাঁদে'র রয়েলটি হিসেব করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে সেল্‌স্‌ম্যান কালীপদ একখানা 'ফাল্গুনের চাঁদ' ভদ্রলোকটির হাতে গুঁজে দেবার জন্যে বক্তৃতা শুরু করল, বিয়ের উপহারের জন্যে লেখক এই বইটি বিশেষ যত্ন নিয়ে লিখেছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনের পক্ষেই বইটি ভাল হবে স্যার। খবরের কাগজের সম্পাদকরা বলেন, শরৎবাবুর পরে

সাহিত্যসম্রাট হওয়ার একমাত্র যোগ্য লোক হচ্ছেন অভয়পদ সরকার। এঁর বই দু মাসে একটা ক'রে সংস্করণ হয়। খুব কাটতি স্যার। দিয়ে দি এক কপি?

না। হেমিংওয়ের বই দিন। দু মিনিটে এক লাখ ক'রে বিক্রি হয়।

তা হয়, কিন্তু আমাদের দেশ তো ততটা শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে নি। এখানে এক লাখ বছরে দুজন ক'রে মানুষ বই পড়তে শেখে। হেমিংওয়ের কি বই দেব স্যার? 'কিলিমাঞ্জারো পর্বত-শৃঙ্গে বরফ'? আমেরিকার কাণ্ডই আলাদা। যেমন গাড়ি বিক্রি, তেমন বই বিক্রি। বিক্রির হার মিনিট হিসেবে চলে। আমাদের বিক্রি শতাব্দী গুনে গুনে। এই নিন হেমিংওয়ে। ক্যাশমেমো কাটব? সঙ্গে একখানা 'ফাল্গুনের চাঁদ' দিয়ে দেব কি?

অভয়পদ সরকার একটা আলমারির পেছনে ব'সে সংস্করণ-রহস্যের কথা ভেবে ঘেমে উঠছিলেন। স্নায়ুতন্ত্র তাঁর ক্রমশই অবশ হয়ে আসছিল। আত্মহত্যায় পাপ না থাকলে তিনি আজ লজ্জার দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলে পড়তেন প্রকাশকের দোকানে। সোনার বাংলা নাকি ভারতবর্ষের সবচেয়ে শিক্ষিত প্রদেশ!

প্রকাশকের দোকান থেকে ফিরতে তাঁর একটু বেশি রাতই হয়ে গিয়েছিল। দূর তো কম নয়, কলেজ স্ট্রীট থেকে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। নতুন গল্পের প্লট ভাবতে ভাবতে দু-এক মাইল হাঁটা যায়। কিন্তু ছ-সাত মাইল রাস্তা হাঁটতে গেলে এপিক উপন্যাসের প্লট ছাড়া কোন্ আহাম্মক পথ চলতে পারে? কলেজ স্ট্রীটের আশেপাশে মাথা গোঁজবার মত পাঁচ বর্গ ফুটের একটা গর্ত থাকলেও তিনি কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের এক-ঘরের ফ্ল্যাটে তাঁকে ফিরে আসতে হ'ল। হাড়ের ওপর বুভুক্ষার ছ্যাতলা পড়েছে, তবু তাঁর বুর্জোয়ারোগ সারল না। রাজপুত্র গোলাম মহম্মদের ক্রোড়ে তিনি ফিরে এলেন।

ফিরে এসে বাকি রাতটুকু তিনি আর ঘুমুতে পারেন নি। অনিদ্রা রোগটা আজ আর রোগ ব'লে মনে হয় না। ঘুম না এল তো

ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকারের ব'য়েই গেল। ঘুমকে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন, জয় করেছেন বস্তুজগতের আরাম-আকাঙ্ক্ষা।

একতলার এই ঘরখানা তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন পাঁচ বছর আগে। তখন সবেমাত্র তাঁর প্রথম বই বেরিয়েছে। হৈ-হৈ, রৈ-রৈ ব্যাপার। বাংলার সাহিত্য-মরুভূমিতে এ কোন্ মরূদ্যান? সেই সুযোগে তিনি প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের ঘরখানা ভাড়া করতে গেলেন। বাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম?

অভয়পদ সরকার।

কি করা হয়?

কি জবাব দেবেন ভাবছিলেন অভয়পদবাবু। দরজার আড়াল থেকে বাড়িওয়ালার গিন্নী স্বামীকে বললেন, তুমি না এম. এ. পি-এইচ. ডি.? অভয়পদ সরকারের নাম জানো না?

না তো।

উনি হচ্ছেন গিয়ে লেখক অভয়পদ সরকার।—বলতে বলতে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। অভয়পদবাবু হাত তুলে নমস্কার করলেন।

আপনার উপন্যাসখানা আমি পড়েছি। পুঁটির বিয়েতে কে যেন উপহার দিয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় বইখানা আমি রেখে দিয়েছিলাম। চমৎকার লাগল। আর কি বই লিখছেন? আজ আসুন না সন্ধ্যের সময়, চা খাবেন।

ঘরখানার ভাড়া কত?—জিজ্ঞাসা করলেন অভয়বাবু। এবার বাড়িওয়ালা বললেন, ত্রিশ টাকা। সঙ্গে আপনার মেয়েছেলে নেই?

আজ্ঞে না।

বলেন কি!—বাড়িওয়ালা যেন ভোরবেলা তৃতীয় মহাযুদ্ধের ঘোষণা শুনলেন, বলেন কি! বিয়ে করেন নি?

না। বয়স আমার মাত্র পঁচিশ। তা ছাড়া ঘর যা দেখলুম, তাতে দুজনের পক্ষে নড়াচড়া করা খুবই অসুবিধে হবে।

ভদ্রমহিলা বললেন, বাড়ির পেছন দিকে ঘর। বাড়িটা ছিল

আমার স্বর্গীয় শ্বশুরের। ভাড়া দেবেন ব'লে তিনি বাড়ির প্ল্যান করেন নি। আসলে ওই ঘরখানা ছিল রান্নাঘর। আপনার মত রোগা মানুষের পক্ষে খুব খারাপ হবে না।

আজ্ঞে না। আসলে আমি তো পুরো নই, আদ্ধেক মানুষ।

আপনার সংসারে আর কে আছেন?—জিজ্ঞাসা করলেন বাড়িওয়ালা।

আমার সংসারে?—একটু ভেবে নিয়ে অভয়পদ বাবু বললেন, সংসারে আমার কাগজ আছে, কালি আছে—আছে আদর্শ এবং স্বপ্ন। নেই কেবল প্রোটিন।

ভদ্রমহিলা এবার আনন্দের সুরে ব'লে উঠলেন, খুব ভাল। উপন্যাস লেখবার পক্ষে ঘরখানা একেবারে আইডিয়েল।

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইন্ ফ্যাক্ট, উপন্যাস লেখবার জন্যে ঘরের দরকারই হয় না। দক্ষিণ-খোলা ঘরের দরকার হয় কেবল উপন্যাস পড়বার জন্যে। ছ মাসের ভাড়াটা তা হ'লে আগাম দিয়ে দিই?

তারপরে পাঁচটা বছর কেটে গেছে রাজপুত্র গোলাম মহম্মদের গলিতে। পেছন দিকের ঘর ব'লে উপন্যাস লিখতে অসুবিধে হয় নি তাঁর। ছখানা উপন্যাস ওই ঘরখানা থেকেই বেরিয়েছে। চারদিক বন্ধ ব'লে স্বপ্ন কিংবা আদর্শের কোন ক্ষতি হয় নি অভয়পদ সরকারের। ক্ষতি যা হয়েছে সবটুকুই তাঁর স্বাস্থ্যের। রয়েলটির টাকায় উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন তিনি আজও কিনতে পারেন না। ছোট ভাই তারাপদ মেডিকেল কলেজে পড়ছে। তার হস্টেল এবং কলেজের সব খরচাই তাঁকে প্রতি মাসে যোগাড় ক'রে দিতে হয়।

এম. এ. পি-এইচ. ডি. বাড়িওয়ালার এই ঘরখানা থেকে পৃথিবীর কোন আওয়াজই শুনতে পান না অভয়পদ সরকার। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যখন বাংলা দেশের আকাশ দিয়ে ছুটতে থাকে, তখন কেবল বজ্রপাতের আওয়াজ তিনি শুনতে পান। ভগবানের লীলা বোঝা মুশকিল। সেই জন্যেই তিনি আজও বুঝতে পারেন নি; কেন

এবং কি পুণ্যের ফলে আজও এই ঘরখানার ওপর ছোটখাটো বজ্রের আঘাত এসে লাগে নি।

ভোরবেলা থেকে আজ তিনি সানাইয়ের সুর শুনতে পাচ্ছেন। বিয়ের সিজন্ শুরু হয়েছে। শিক্ষিত বাঙালী একজন হেমিংওয়ে কিনলেন ব'লে দুঃখ করবার কি আছে? অশিক্ষিত লোকের অভাব কিছু নেই। বই তাঁর বিক্রি কিছু হবেই। শীতের মুখে একটা গরম কোট তাঁর কিনতে হবে। তারাপদ গেল-বছরও সুতির কোট প'রে কলেজ করেছে। ছোট ভাইটাকে যদি তিনি একটা রেডিমেড গরম কোটও কিনে দিতে না পারেন, তা হ'লে উপন্যাস লিখে লাভ হবে কি? বাংলার বাতাসে সানাইয়ের সুর ভাসল ব'লে অভয়পদবাবু কেন যাবেন স্বপ্ন দেখতে?

তবু স্বপ্ন তাঁকে দেখতে হয়। ধ'রে রাখতে হয় আদর্শের বিক্ষত অস্তিত্বটাকে। ধ'রে রাখতে হয় ব'লেই সুলতাকে ছেড়ে দিতে হ'ল। অভয়পদবাবুর সহসা মনে হ'ল, সানাইয়ের সুরটা যেন রাজা বসন্ত রায় রোডের দিক থেকে ভেসে আসছে। সুলতারা থাকে সেই রাস্তাটায়। কল্যাণ কাল বলছিল যে, ওরা নাকি নতুন বাড়িতে উঠে যাচ্ছে। ঠিকানাটা জেনে রাখলে ভালই হ'ত।

সুলতাকে ভালবাসতেন অভয়পদবাবু। বিয়ে করবেন ব'লেই তিনি ওকে ভালবেসেছিলেন। উপন্যাসের প্লট তৈরি করবার জন্যে তিনি কল্যাণের বোনকে নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করেন নি। আজ পাঁচ বছর পরে তাঁর ভালবাসার রূপ গেছে বদলে। বদলাতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। যে ঘর থেকে ছখানা উপন্যাস বেরিয়েছে, সে ঘরে তিনি সুলতাকে এনে রাখতে পারেন নি। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি সুলতাকে বিয়ে করতে পারতেন। কল্যাণদের মত একটি ভদ্র পরিবারের মধ্যে তিনি অশান্তির বীজ বপন ক'রে দিয়ে আসতে পারতেন অতি অনায়াসে। কিন্তু তা তিনি করেন নি। অভয়পদ সরকার শিল্পী, দুঃখ বহনের ধৈর্যশীল সাধনার মধ্যে রয়েছে তাঁর সাহিত্যের চরম প্রেরণা, রয়েছে তাঁর জীবনের বিমুগ্ধ প্রণতি। তিনি নিজে যা পারেন, সুলতা তা

পারবে কেন? তবু সুলতাকে তিনি আজও ভালবাসেন। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, শিল্পীও তেমনি বাঁচে না ভালবাসার ধর্ম ছাড়া। কিন্তু এ ভালবাসার ফ্রেমের মধ্যে সুলতার দেহটা আজ আর খুব স্পষ্ট নয়। বিয়ের প্রশ্ন পাগলের প্রশ্নের মত হাস্যকর ব'লে ভাবেন তিনি।

সানাইয়ের সুরটা ক্রমশই করুণ হয়ে উঠছিল। সুরের মধ্যে বিবাহের বিজ্ঞপ্তিটা যেন খুবই অস্পষ্ট ব'লে মনে হ'ল তাঁর। কান পেতে ভাল ক'রে শুনতে লাগলেন অভয়পদ সরকার। কে যেন ডাকছে তাঁকে। সুলতা নয় তো?

প্রথম বই বেরুবার পরে কল্যাণদের পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয় অভয়বাবুর। চা খেতে গিয়েছিলেন প্রথম সন্ধ্যায়। তারপরে গল্প করতে গেলেন সুলতার সঙ্গে। গল্প শেষ হওয়ার পরে শুরু হ'ল ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সংবাদ-বিনিময়। ওঁদের দেখা হতে লাগল রাজা বসন্ত রায় রোডের বাইরে বিভিন্ন ঠিকানায়। ভালবাসার শেষ সংবাদ-বিনিময় হতে তিন বছর কাটল। ততদিনে অভয়বাবু তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছেন।

ফোর্ট উইলিয়ামের পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অভয়বাবু সুলতাকে বললেন, আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে লাভ নেই সুলতা।

কেন? তোমার উপন্যাসের নায়িকারা তো অপেক্ষা করছে?

কেন করছে জানি না, কিন্তু তুমি অপেক্ষা করবে কেন? উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের টাকার দরকার হয় না। তোমার হবে। তুমি রিয়েল, নায়ক-নায়িকারা রিয়েল নয়।

তবে বই লেখ কেন?—জিজ্ঞাসা করল সুলতা।

বিয়ের সিজ্‌নে বিক্রি হবে ব'লে। বই আমি লিখি না, বই তৈরি করি। কেবল প্রথম বইখানাই আমার লেখা।

শ্রাবণের গঙ্গা অনেকটা চওড়া দেখাচ্ছে। তার ওপরে জোয়ার এসেছে ব'লে জলের লেভেল উঁচু হয়ে উঠেছে অনেকটা। অভয়বাবু আর সুলতা এসে দাঁড়ালেন আউটরাম ঘাটের কিনারে। জলের দিকে চেয়ে

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সবচেয়ে প্রিয়জনকে যদি ডুবতে দেখ, তা হ'লে তুমি কি করবে?

রক্ষা করব।—জবাব দিল সুলতা।

যদি সাঁতার না জান? আশেপাশে যদি কাউকে দেখতে না পাও?

আমি তবু ঝাঁপিয়ে পড়ব।

আমার নায়িকারাও ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাই ওরা বাস্তব চরিত্র নয়। কিন্তু তুমি? তুমি তো রিয়েল সুলতা, তুমি কেন ঝাঁপ দিয়ে মরতে যাবে?

তা হ'লে তুমি কি কোনদিনও সংসার করবে না?

শিল্পীর সংসারকে বিশ্বাস করতে নেই। তাঁদের স্বপ্নের সংসারে সবই পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না কেবল প্রোটিন। তোমাকে বাঁচতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের। তোমার বাবার অফিসের বেয়ারা যা পারে, আমি তা পারি না। সংগ্রাম করবার ধৈর্য আমাদের জন্মগত গুণ। সংসারের সবাই ধৈর্য হারাতে পারে, আমরা পারি না। পারি না এই জন্যে যে, জগতের বৃহত্তম শিল্পের মধ্যে রয়েছে ধৈর্যের সাধনা। চোখ বুজে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সবচেয়ে ধৈর্যশীল শিল্পী হচ্ছেন ভগবান। পৃথিবীটাকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলতে তাঁর কত কোটি বছর লেগেছে?

হয়তো অনেক কোটি বছর।—শাড়ির আঁচলটা দাঁতের ফাঁক থেকে টেনে নিয়ে সুলতা বললে, সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এত কোটি বছর পরেও বাবার অফিসের বেয়ারা যা পারে তুমি তা পার না। তোমার দোষ নেই, ধৈর্য আছে। কিন্তু বাংলা দেশটাকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্যে একদিনও আর অপেক্ষা করা উচিত নয়।

কি করবে? রিভলিউশন? সেও একদিনে আসবে না। যদি কখনও আসে, আমার আর বিয়ে করবার সময় থাকবে না। অতএব লাবণ্যের মত আমাকেও বলতে হচ্ছে:

"গ্রহণ করেছ যত
ঋণী তত করেছ আমায়
হে বন্ধু বিদায়—"

রাত হয়ে গেছে। তোমার বাবা হয়তো ভাবছেন। রাজা বসন্ত রায় রোডের দক্ষিণ-খোলা বাড়িগুলোতে যেন রিভলিউশন না আসে—সেই প্রার্থনা আমার ভেসে বেড়াক গঙ্গার হাওয়ায়। সুলতা, আমরা আজ এই রাস্তার মোড় থেকে দুজনে বিপরীতমুখী বাসে চেপে বসব। তুমি যাবে বালিগঞ্জের দিকে, আমি যাব শ্যামবাজারের চৌরাস্তায়। কলেজে পড়তে যাচ্ছ ব'লে লুকিয়ে আমার সঙ্গে আর দেখা করবার দরকার নেই। কলকাতার ভিড়ের মধ্যে যদি হঠাৎ কখনও দেখা হয়ে যায়, তা হ'লে তোমায় চিনি না ব'লে আমি মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যাব না। সুলতা, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, তোমার সঙ্গে যেন আমার পরবর্তী সাক্ষাৎ ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে, এবং তা যদি শ্যামবাজারের চৌরাস্তায় ঘটে তো সোনায় সোহাগা। যে-প্রেম পিতামাতার সামনে ব্যক্ত করা যায় না, তা যদি প্রজাপতির শিরে চেপে রাজা বসন্ত রায়ের এলাকা অতিক্রম করে, আমি তাও সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারব না। প্রোটিনের অভাবটাই আমার চরমতম ট্রাজেডি নয়। তিনখানা প্রথম-শ্রেণীর উপন্যাস লেখবার পরেও বাংলা দেশের কোন পিতাই আমায় জামাই ব'লে গ্রহণ করলেন না! তোমার বাবার অফিসের বেয়ারা যা পারে আমি তা পারি নে। সে তার শ্বশুরের পায়ের ধুলো নিতে পারে, অথচ আমার জীবনে তেমন সুযোগ এল না। অতঃপর আধ ডজন প্রকাশকের বারোটি পায়ের তলায় মাথা গুঁজে রয়েলটি গণনা করা ছাড়া আমার আর কাজ নেই। এর চেয়ে বড় রিভলিউশনের কথা তুমি ভাবতে পার সুলতা?

না, সুলতার পক্ষে ভাবা অসম্ভব। সুলতার বাবা কিংবা ডক্টর উপাধিওয়ালা দাদা কল্যাণ মিত্রও ভাবতে পারেন নি। বাংলার শিক্ষিত সমাজের কেউ পারেন না ভাবতে।

তার পরে আরও দুটো বছর কেটে গেছে। সানাইয়ের সুর তিনি প্রতি বছরই শোনেন। কিন্তু আজকের সুর শুনে ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকার বড্ড বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এ সুরের মধ্যে তিনি নতুন

ভাষা শুনতে পাচ্ছেন। বিয়ের সিজন্ শুরু হওয়ায় বই বিক্রি তাঁর বাড়বে। কিন্তু তাতে এতটা চঞ্চল হয়ে ওঠার কোন কারণ ছিল না। কাল কিংবা পরশু প্রকাশকের কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি পাবেন। তা দিয়ে তারাপদর জন্যে একটা রেডিমেড গরম কোট কেনবার ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছেন অভয়বাবু। তবে?

বিছানায় শুয়েই তিনি দেখতে পেলেন, মেঝের ওপর একখানা চিঠি প'ড়ে রয়েছে। কাল বিকেলে বোধ হয় দরজার ফাঁক দিয়ে পোস্টম্যান চিঠিখানা ফেলে দিয়ে গেছে। অভয়বাবু চিঠিখানা খুলে ফেললেন। তাঁরই বাল্যবন্ধু নীরেন বসুর চিঠি। তারিখ দেখে বুঝলেন, চিঠিখানা চার দিন আগের। এ কদিন চিঠিখানা তাঁর নজরে পড়ে নি। চিঠিতে বিশেষ কিছু লেখা ছিল না। বন্ধু তাঁর জানিয়েছেন যে, দিল্লী থেকে তিনি কলকাতায় পৌঁছবেন দু-তিন দিনের মধ্যেই।

বিছানায় শুয়েই অভয়বাবু অনুমান করলেন, বেলা হয়েছে। কসবার আকাশ পেরিয়ে সূর্য বোধ হয় এতক্ষণে উঠে এসেছে বালিগঞ্জ রেল-স্টেশনের মাথার ওপরে। সানাই বাজানো বন্ধ হ'ল।

দশ বছর পেছনে ফিরে গেলেন তিনি। নীরেন বসু আর অভয় সরকার বি. এ. পাস করলেন। নীরেন বসু ছেলেবেলা থেকেই প্রথম হয়ে পরীক্ষাগুলো সব পাস ক'রে এসেছেন। অভয়বাবু পাস করলেন সাধারণ-ভাবে। একদিন সন্ধ্যেবেলা দুই বন্ধুতে এসে বসলেন লেকের ধারে। বর্তমান নিয়ে আলোচনা হ'ল না। ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিলেন ওঁরা।

অভয়বাবু বললেন, কষ্ট পাব জানি, কিন্তু সাহিত্যের বাইরে জীবিকার সন্ধান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তোর ভাবনার কোন কারণ নেই নীরেন, তোর মত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে বাংলা দেশে কটা আছে? বড় চাকরি তুই পাবিই।

তা পাব। দিল্লীতে ইণ্টারভিউ পেয়েছি। চাকরি পাওয়ার পরে তোকেও আমি সেখানে নিয়ে যাব অভয়। না না, কোন আপত্তি আমি শুনব না। সব সাহিত্যিকই তো চাকরি করেন।—শেষের কথাটা নীরেন বসু বেশ জোর দিয়েই বললেন।

না, আমার পক্ষে তা আর সম্ভব নয়। গোটা অস্তিত্বটাকে যদি সাহিত্যের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে না পারি, তা হ'লে সাধনায় সিদ্ধি আসবে কেন? আদর্শের পায়ে আত্মসমর্পণ একেবারে শর্তহীন হওয়া চাই নীরেন। কষ্টের কথা বলছিস? কষ্ট ছাড়া শিল্পীর তো সত্যদর্শন হয় না। আজকের এই জড়বাদসর্বস্ব মানবসভ্যতায় আদর্শের কোন স্থান নেই জানি, তবুও বলব—পৃথিবীতে যদি দু-চারজন লোকও আদর্শের মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখতে না পারেন, তা হ'লে ডার্ক এজের সঙ্গে এ যুগের পার্থক্য রইল কি? দিল্লীতে গিয়ে চিঠি দিস, তুই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। দিল্লী-কলকাতার দূরত্ব যেন আমাদের আত্মীয়তাকে ভাঙতে না পারে।

তা হ'লে আমার একটা কথা রাখ্ অভয়। রাখবি তো?

বল্।

আমি যদি তোকে কোনদিন সাহায্য করতে চাই, ফিরিয়ে দিস না।

দেব না, যদি সাহায্যের দরকার হয়।

নীরেন বসু দিল্লীতে চাকরি পেয়েছেন আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে। বড় চাকরি। দুই বন্ধুর মধ্যে যোগাযোগ কখনও ছিন্ন হয় নি। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অব্যাহত রয়েছে দশ বছর ধ'রেই। কলকাতায় এসে নীরেন বসু অভয়বাবুর সঙ্গে দেখাও ক'রে গেছেন কয়েকবার। সাহিত্যক্ষেত্রে যে অভয় সরকারের নাম হয়েছে, তার সব খবরই তিনি রাখেন। দিল্লীর ঘোষ কোম্পানির বইয়ের দোকান থেকে নীরেন বসু অভয়পদ সরকারের বিখ্যাত উপন্যাসগুলো কিনে কিনে বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের বিয়েতে উপহারও দিয়েছেন। বই কিনে উপহার দেওয়া ছাড়া তিনি বন্ধুকে আর কোন রকমেই সাহায্য করতে পারেন নি। অভয়পদ সরকারের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি কৌশল ক'রে প্রতি বছরই পাঁচ শো টাকার মনি-অর্ডার পাঠাতেন। ঔপন্যাসিক অভয়বাবু তা কখনও গ্রহণ করেন নি। মনি-অর্ডার ফেরত পাঠিয়ে দিতেন।

তিন দিন আগের চিঠিখানা বিছানায় শুয়েই অভয়বাবু দ্বিতীয়বার পাঠ করলেন। কি ব্যাপার? নীরেন আবার কলকাতায় আসছে

কেন? প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের ঘরখানার দারিদ্র্য পর্যবেক্ষণ করতে নাকি? অনেক রকমের প্রশ্ন তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। হাসি এল অভয়বাবুর। তিনি ভাবলেন, নীরেন কেবল তাঁর ঘরের দারিদ্র্যই দেখে যাবে, মনের ঐশ্বর্য তাঁর সে দেখতে পাবে না। এবার হয়তো সে একসঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে। সাহায্য করবার জন্যে নীরেনটা এবার পাগলামি করবে নিশ্চয়ই।

এম.-এ. পি-এইচ. ডি. বাড়িওয়ালার একতলার পেছনের ঘর থেকে দিনের আলো এক রকম দেখাই যায় না। দুপুরবেলা মনে হয় সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই। অভয়পদবাবু তাঁর ঘরের একমাত্র দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনুমান করলেন, বেলা বোধ হয় এগারোটার কম নয়। অগ্রহায়ণ মাসের সূর্য এতক্ষণে গড়িয়াহাটা বাজার অতিক্রম করেছে নিশ্চয়ই। দেশপ্রিয় পার্কের মাথার ওপরে সূর্য এলে, তিনি জানেন বারোটা বাজবে। পার্কের পশ্চিম দিকের গলিটার মধ্যে মাদ্রাজীদের গোটা তিনেক হোটেল আছে। অভয়বাবু পার্কের দিকে মুখ ক'রে এরই একটা হোটেলে ব'সে চার আনায় মধ্যাহ্ন-আহার শেষ করেন। আজ একটু তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে পড়লেই ভাল হয়। নীরেন হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে।

ঘরের বাইরে এসে তিনি দরজাটা ভাল ক'রে বন্ধ করলেন। তালাটা টেনে দেখলেন, ঠিকমত লাগল কি না! ঘরের দরজা খোলা পেলে নীরেন হয়তো পাঁচ হাজার টাকার চেকখানা বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে যাবে। রাত দশটার আগে আজ আর তিনি রাজপুত্র গোলাম মহম্মদের ক্রোড়ে ফিরে আসবেন না ব'লে মনস্থ করলেন। প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা রেডিমেড কোট কিনে তিনি যাবেন তারাপদর হস্টেলে। কাল ভোরে কলেজে যাবার সময় ছোট ভাইটা গরম কোট পরতে পারবে।

গলিটার মোড়ে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল। ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন নীরেন বসু। পেছন দিকে রাস্তা আছে মনে ক'রে অভয়পদ সরকার স'রে পড়তে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পেছন দিকে রাস্তা কই? কলতলা।

একতলার গুটি কয়েক ভাড়াটিয়াদের জন্যে সেখানে একটা চৌবাচ্চা তৈরি করিয়েছেন এম. এ. পি.-এইচ. ডি. ভদ্রলোক। ভাড়া দেবেন ব'লে তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেব বাড়ির প্ল্যান তৈরি করেন নি। অভয়বাবু পেছন দিকে ছুটতে গিয়ে চার ফুট উঁচু চৌবাচ্চার সঙ্গে ধাক্কা খেলেন।

কি রে, কোথা যাচ্ছিস?— জিজ্ঞাসা করলেন নীরেনবাবু।

এদিকে তো রাস্তা নেই, যাব আর কোথায়? ভাবছিলুম চান করব। তার পর, হঠাৎ কলকাতায়?—হাসবার চেষ্টা করলেন অভয়পদ সরকার।

দাদা গাড়িতে ব'সে আছেন। আমার চিঠি পাস নি?

পেয়েছি।

আজ আমার বিয়ে অভয়। দাদার বাড়ি থেকে রওনা হব সন্ধ্যে সাড়ে ছটায়। তুই আসবি বেলা চারটেতে। হ্যাঁরে, দাদা তোকে বিয়ের চিঠি পাঠিয়েছেন, পাস নি?

কই, না তো!

পোস্টে পাঠিয়েছেন, বিকেলের ডাকেই হয়তো এসে পৌছবে।

বিয়ের চিঠি না পেলেও তোর বিয়েতে যাব।

অনেক কাজ এখনও বাকি রয়েছে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হ'ল। এখন চলি। তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। হ্যাঁরে অভয়, মাথার চুল যে তোর সব পেকে গেল! ছি ছি, এ কি চেহারা হয়েছে তোর? জানি, আমার সাহায্য তুই নিবি না। তবুও তোর জন্যে আমি পাঁচ হাজার টাকা আলাদা ক'রে রেখেছি। অভয়, মা তোর জন্যে একখানা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবি পাঠিয়েছেন। সন্ধ্যের সময় প'রে আসিস। চললুম।—নীরেন বসু অভয়বাবুর হাতে একটা কাগজের প্যাকেট গুঁজে দিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসলেন।

বেলা চারটের সময় অভয় সরকারের ঘরে রাত বারোটার মত অন্ধকার নেমে আসবার কথা। আজ যেন কোথা দিয়ে খানিকটা আলো এসে ঢুকে পড়েছে ঘরে। শান্তিপুরের তাঁতের ধুতিখানা পরতে তাঁর ভাল লাগছিল। সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে দেবার পরে অভয়-বাবুর মনে হ'ল, ঘরের অন্ধকার যেন সবই কেটে গেছে। কোটি কোটি

যক্ষ্মা-বীজাণু আলোর আক্রমণ সহ্য করতে পারছে না। আবদ্ধ ঘর-খানাতে রিভলিউশন এসেছে।

খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে পিওন একটা চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। নীরেনের বিয়ের চিঠি। চিঠিখানা খুললেন তিনি। চিঠি-খানা হাতে নিয়ে অভয়বাবু রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। একবারে চিঠিখানা পড়তে ভাল লাগবে না তাঁর। ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ তিনি পড়বেন। বিনা খরচায় বিলম্বিত রোমাঞ্চের স্বাদ গ্রহণ করবেন তিনি। বহু বছর হয়ে গেছে কারো কাছ থেকেই তিনি বিয়ের চিঠি পান নি। নীরেনের বিয়ের চিঠিখানা হাতে নিয়ে অভয়বাবু কোন এক অজ্ঞাত আনন্দের উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলেন। পরনে শান্তিপুরের ধুতি, গায়ে জাপানী সিল্কের পাঞ্জাবি। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকার।

চারটে বেজে গেছে নিশ্চয়ই। নীরেনের কাছে চারটের মধ্যে গিয়ে পৌছবার কথা। চিঠিখানা এবার প'ড়ে ফেলা যাক। পড়তে পড়তে অভয়বাবু পাথরের মত শক্ত হয়ে গেলেন। সিল্কের পাঞ্জাবিটা যেন গণ্ডারের চামড়ার মত খসখসে হয়ে উঠল। তাঁর উপন্যাসের নায়িকারা প্রেমাস্পদের জন্যে অপেক্ষা করেন, কিন্তু সুলতা আর অপেক্ষা করে নি। নীরেনের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে।

নীরেনদের বাড়িতে যাওয়ার আর তাড়া নেই। তিনি এসে ব'সে পড়লেন চৌকির ওপর। ভাবতে লাগলেন ব'সে ব'সে। কিন্তু ভাবনার এতে কি আছে? আর কতদিন সুলতা অপেক্ষা করবে? প্রকারান্তরে সুলতাকে অপেক্ষা করাবার জন্যেই কি তিনি তাঁর লেটেস্ট উপন্যাসের নায়িকাদের অপেক্ষা করিয়ে রাখেন নি? সুলতা রিয়েল, তাই সে আজ অভয়বাবুকে যোগ্য উত্তর দিয়েছে। এবার তিনি তাঁর কাল্পনিক ভালবাসার ধর্ম পালন করতে পারবেন জীবনের বাকি কটা দিন। সুলতা জিতেছে। হেরে গেছে অভয়বাবুর উপন্যাসের নায়িকারা।

একটু পরে তিনি স্বাভাবিক হয়ে এলেন। পাথরের মত শক্ত দেহটা নরম হয়ে এল। এবার তিনি ভাবলেন, সুলতা ঠিকই করেছে।

অপেক্ষা ক'রে ক'রে মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। নিজে ডুবেছেন ব'লে সুলতাকেও তিনি ডুবতে সাহায্য করছিলেন কেন? অভয়পদবাবু ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এই ব'লে যে, তিনি সুলতার মনে সৎ বুদ্ধি দিয়েছেন। সুলতা আর নীরেন যেন সুখী হয়। জীবনে তিনি আজ প্রথম নীরেনের সাহায্য গ্রহণ করলেন। এত বড় সাহায্যের কাছে পাঁচ হাজার টাকার মূল্য বোধ হয় কানাকড়িও নয়।

কখন যে সূর্য অস্ত গেছে অভয়বাবু তার খবর রাখলেন না। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের কোথাও আর এক বিন্দু আলো নেই। সন্ধ্যে পার হয়ে রাতের শুরু হ'ল। অভয়বাবু এবার রওনা হবেন। নীরেন এতক্ষণে বিয়ে-বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। চিঠিখানা থেকে তিনি সুলতাদের নতুন ঠিকানাটা দেখে নিলেন। নিউ আলিপুর যেতে হবে। নীরেনের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। সুলতাকে বিয়ে ক'রে সে সত্যিকারের বন্ধুত্ব দেখিয়েছে। নীরেনের সাহায্য তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রাখবেন।

মনে রাখবার সুবিধে পেলেন না অভয়পদ সরকার। ট্যাক্সি থেকে নেমে এল সুলতা। গায়ে গয়না, পরনে বেনারসী শাড়ি, চোখে জল। মানব-সভ্যতার প্রথম প্রভাতে যে-নারী তার প্রেমাস্পদকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তার সঙ্গে সুলতারও কোন পার্থক্য নেই। শিল্পী অভয়পদ সরকার সুলতাকে চিনে ফেললেন এক মুহূর্তে।

সুলতা বললে, বাবা এবং দাদাকে আজ জানিয়ে এসেছি। জেনেছেন নীরেনবাবুও। চল—

কোথায়?—জিজ্ঞাসা করলেন অভয়বাবু।

নিউ আলিপুর।—চোখের জল মুছে জবাব দিল সুলতা।

দ্বিতীয় ট্যাক্সি এল। কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে এলেন নীরেন বসুও। কেউ কোন কথা বলবার আগে, বাংলা দেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকার বললেন, তোর সাহায্যের কথা আমি চিরকাল মনে রাখব নীরেন।

দীপক চৌধুরী

আমার সাহিত্য-জীবন

ষোল

১৯৪৪।৪৫ সনে এই ধারার সাহিত্য-সমালোচনার বৈঠক ফ্যাসি-বিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘে অনেক হয়েছে, এবং এই সমালোচনার ধারাই সেখানে ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। এখন যেটি তথাকথিত বামপন্থী বা মার্ক্সবাদসম্মত সমালোচনা ব'লে সাহিত্যক্ষেত্রে চলিত হয়েছে, তার প্রথম প্রবর্তন বলতে গেলে ওইখানেই। কিন্তু সমালোচনার এই ধারাটির সত্য মূল্য যাই থাক্ (অবশ্যই কিছু আছে; বিশেষ ক'রে সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস-বিশ্লেষণে মূল্য যথেষ্ট আছে), বামপন্থী রাজনৈতিকদল-নিয়ন্ত্রিত পত্র-পত্রিকার এবং দলভুক্ত সমালোচকের সমালোচনার মূল্য কিছুই নেই। এই দলকে সমর্থন যতক্ষণ যিনি করবেন, ততক্ষণ তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এঁরা পঞ্চমুখ হবেন; এবং সমর্থন করা যে মুহূর্তে বন্ধ করবেন, সেই মুহূর্তেই তাঁর অভিধান হবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং কদর্য ভাষায় রূঢ় সমালোচনায় তা প্রতিপন্ন করবেন। একই বইয়ের দু রকম সমালোচনা একই পত্রিকায় হয়তো একই সমালোচকের নামে প্রকাশিত হয়। আমার 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র এমনই সমালোচনা দুটি-চারটি নয়, অনেক হয়েছে এঁদের বামপন্থী কাগজে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ১৯৪৬ সনের পূজা-সংখ্যা 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সনে আগস্ট মাসে হিন্দু-মুসলমানের ভারক্ত-বিচ্ছেদী দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দাঙ্গার জন্য 'আনন্দবাজার' পূজার সময় বাজারে বের হয় নি বা হতে পারে নি, বের হয়েছিল কয়েক মাস পরে, বোধ হয় ডিসেম্বরে। ১৯৪৬ সনের আগেই এঁদের সঙ্গে আমার মত-পার্থক্য রূঢ়ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৫ সনে মহম্মদ আলি পার্কে ফ্যাসি-বিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘের যে বাৎসরিক অধিবেশন হয়, তার সমারোহ ঐতিহাসিক বললে অত্যুক্তি করা হবে না। এই অধিবেশনেই ফ্যাসি-বিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘের নাম পরিবর্তন করা হয়। নাম হয়—প্রগতি সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘ। এই

অধিবেশনের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি হয়েছিলেন শৈলজানন্দ। আরও কে কে ছিলেন মনে নেই, তবে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন—এ কথা মনে আছে। সেই সময় আমার বাড়িতে পানবসন্তের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সেই কারণ দেখিয়েই আমি মূল অধিবেশনের দিন যাই নি। মনের মধ্যে তখন গ্লানি এমনই পুঞ্জীভূত হয়েছে যে, নিদারুণ পীড়া অনুভব করছি অন্তরে অন্তরে। বহু মত-পার্থক্যের মধ্যে একটি বিশেষ কারণের কথা মনে আছে। সেটি হ'ল গঙ্গাধর অধিকারীর ভারত ও পাকিস্তান গঠন সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির তরফের মতামতের ভিত্তির উপর লিখিত একখানি পুস্তিকা। এই পুস্তিকাখানির কথা সর্বজনবিদিত। তার আলোচনার স্থান এ ক্ষেত্রে নেই। শুধু একটি মানচিত্রের কথাই উল্লেখ করব। কম্যুনিস্ট পার্টির পরিকল্পনাসম্মত মানচিত্র। তাতে সমগ্র বাংলা ও আসাম, সমগ্র পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর এবং ভারতের মধ্যস্থলে সমগ্র হায়দ্রাবাদ নিয়ে পাকিস্তান-গঠন-পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। তখন ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রধানেরা সংঘের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছেন। এই সব কারণে এঁদের সঙ্গে সকল সংস্রব চুকিয়ে দিতেই সংকল্প করছি তখন। এই সংকল্পের জন্যই মহম্মদ আলি পার্কের সভায় আমি প্রথম দিন যাই নি। দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিন অর্থাৎ সমাপ্তির দিন কেউ যেন এসে আমাকে প্রায় ধ'রে নিয়ে গেলেন—বিশেষ বন্ধুস্থানীয় কেউ। সভামণ্ডপের প্রবেশ-দ্বারের পাশেই দেখলাম শ্রীভবানী সেন, শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ব'সে রয়েছেন। ভিতরে জনাব মুজফ্‌ফর আহম্মদ সাহেবকেও দেখলাম। সভায় সেদিন শৈলজানন্দ ছিলেন না। সভাপতিত্ব করছিলেন সত্যেনদা—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সভাস্থলেই বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হীরেন মুখোপাধ্যায়ের এবং শ্রীযুক্ত সুধী প্রধানের বক্তব্যের সঙ্গে আমার মতবিরোধ ঘটল। আমি তাঁদের বক্তব্যের প্রতিবাদ ক'রে এলাম, ব'লে এলাম, আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। যাই হোক, মতপার্থক্য সত্ত্বেও সংস্রব সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করা সম্ভবপর হয় নি। তাঁরা আমাকে

ছাড়েন নি বা ছাড়তে চান নি। ১৯৪৬ সনে যখন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রকাশিত হ'ল, তখন যে প্রশংসা এঁরা করলেন তা প্রায় আকাশস্পর্শী। মনে আছে, একদিন এঁদের প্রধান কয়েকজন এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। একজন বললেন, এমন মশগুল হয়ে অনেক দিন লেখেন নি।

মনে পড়ছে, একদিন বেলা দশটা নাগাদ কি প্রয়োজনে কলেজ স্ট্রীটের দিকে গিয়েছিলাম। পথে কাত্যায়নী বুকস্টলে নেমে কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেঁটে এগিয়ে আসছি শ্যামবাজারের দিকে, হেদুয়ার মোড়ে দুটি তরুণ সাহিত্যিক একখানা ডালহৌসি বা ধর্মতলা-গামী ট্রাম থেকে নামলেন। নামলেন আমাকে দেখেই। আমার কাছে এসে বললেন, আপনার ওখানেই গিয়েছিলাম। আপনাকে না পেয়ে ফিরে আসছি। 'হাঁসুলী বাঁক' প'ড়ে পাগল হয়ে গেছি। তারপর হেদুয়ার ভিতর তিনজনে ব'সে 'হাঁসুলী বাঁক' নিয়ে আলোচনা হ'ল। আলোচনা মানে—উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এঁদের একজন এখন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক এবং বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি একটি সমালোচনাও লিখে এনেছিলেন। সেটি পড়া হ'ল। দীর্ঘ সমালোচনা। সমালোচনাটি সত্যেন্দ্রনাথের 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে যখন এঁদের সঙ্গে সংস্রব একেবারে ছিন্ন হ'ল, তখন এই সমালোচকই 'হাঁসুলী বাঁক' সম্পর্কে এক কঠোর সমালোচনা করলেন—বইখানি কদর্য, বইখানি অশ্লীল এবং লেখক উচ্চবর্ণের ধর্মানুযায়ী নিম্নবর্ণের অপমান করেছেন—উদ্দেশ্যমূলকভাবে। একটি লাইন ছিল, লেখক উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে রাগে ফেটে পড়লেন না কেন?' এমন বিরূপ সমালোচনা ('হাঁসুলী বাঁকের'ই) আজও শেষ হয় নি। 'হাঁসুলী বাঁক' সম্পর্কে প্রসঙ্গ তুলে আজও গালাগাল দিয়ে থাকেন এঁরা। সভায় সমিতিতেও সাহিত্যবিচার করতে গিয়ে বক্তারা কটূক্তি ক'রে থাকেন। বিচিত্র বিশ্লেষণের কথাও কানে আসে। হাওড়ায় প্রগতি সাহিত্যিক সংঘের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন মানিকবাবু। সভায় বইখানিকে বিশ্লেষণ ক'রে বলা হয়েছিল, এটা

সাহিত্যই নয়, এটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস রোমান্টিসিজ্‌ম্ বা রোমান্টিক অ্যাড্‌ভেঞ্চারিজ্‌ম্ এমনি কিছু।

অথচ 'হাঁসুলী বাঁক' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, এঁদের সঙ্গে তখনও যখন সংস্রব সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নি, তখন এঁদেরই সুপারিশে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ওখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান 'হাঁসুলী বাঁক' অনুবাদ করবার প্রস্তাব জানিয়ে পত্র লেখেন। পত্রালাপ যা হয়েছিল, তার কিছুটা তুলে দিচ্ছি। এঁদের প্রথম পত্রখানি নেই। প্রথম পত্রের উত্তরে আমি যে উত্তর দিয়েছিলাম, তার নকল রয়েছে। তা থেকেই স্পষ্ট হবে যে, আমি প্রস্তাব ক'রে পাঠাই নি। তাঁরাই প্রস্তাব জানিয়েছিলেন।

Mr. Gustav Bernau.
Literary agent, Nadpopelkon 2414,
Prague XVI, Chechoslovakea.

Dear Mr. Bernau,

I thankfully acknowledge the receipt of your letter of the 18th March '48. I am glad that one of your best publishers has been particularly interested in my book Hanauli Banker Upakatha....

A copy of the book in question has been sent to you in seperate cover.

Yours faithfully
Tarasankar Banerjee

এর উত্তর পেলাম মে মাসে। তাঁরা লিখলেন—

Dear Bandopadhya

Thank you...

I have passed the book on to Messrs ELK of Prague. They now have to find an expert who is able to read it. Has this book been already translated into any of the Western languages? If so, a copy of an English or French Version would help a lot since it could be reviewed by some of the reliable readers who co-operate with ELK.

Hoping to hear from you soon I am,

Yours sincerely
Gustav Bernau

ব্যঙ্গ বা শ্লেষাত্মক রসিকতা করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। সে আমি কখনও করি না, এবং গালিগালাজ বা দোষারোপ করাও আমার ধর্মবিরুদ্ধ। আমি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করবার অভিপ্রায়ে বা কম্যুনিস্ট-দলভুক্ত সাহিত্যিকদের হেয় প্রতিপন্ন ক'রে প্রকারান্তরে গালিগালাজ দেবার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করি নি। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে এইটুকুই বলতে চাই যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ওঁরা বইখানির নাম শুনলেন কি ক'রে? কে জানাল? বাংলা দেশের কার কথা তাঁদের কাছে নির্ভরযোগ্য হ'ল? চেকোশ্লোভাকিয়া কম্যুনিস্ট-শাসিত দেশ। সেখানকার সঙ্গে এখানকার কার যোগাযোগ? এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই মার্ক্সীয়! তাঁদের সমালোচনা বা সাহিত্য-বিচারের সঙ্গে যে কোন দেশের মার্ক্সীয় সাহিত্যবিচারের মিল থাকা অবশ্যই উচিত, অবশ্যই তাঁরা এখানকার কোন মার্ক্সপন্থী সমালোচকের সুপারিশের উপর নির্ভর করেছিলেন। যাই হোক, চেকোশ্লোভাক ভাষায় 'হাঁসুলী বাঁকে'র অনুবাদ শেষ পর্যন্ত হয় নি। হয় নি, কারণ এ দেশে ইতিমধ্যে 'হাঁসুলী বাঁকে'র সম্পর্কে নূতন কথা বলা শুরু হয়েছিল। তার জের আজও চলছে।

এখন যে কথা বলতে শুরু করেছিলাম—সেই কথা বলি। কম্যুনিস্ট-দলভুক্ত সাহিত্যিকের কাছে সাহিত্যের চেয়ে দল বড়। সুতরাং দলের স্বার্থ বড় ক'রে দেখতে গিয়ে সাহিত্যবিচারকে খর্ব করা, ক্ষুণ্ণ করা—এটা তাঁদের প্রায় জীবনধর্মে পরিণত হয়েছে। এক সময় এঁদের ভাল ব'লে কেউ সাহিত্য রচনা করলে অন্য পক্ষেরাও ক্ষুব্ধ হয়েছেন, বিরূপ সমালোচনা করেছেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সভ্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ 'মন্বন্তরে'র কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। কম্যুনিস্ট-পার্টি-বিরোধী অন্য এক বামপন্থী নেতা 'মন্বন্তরে'র জন্য আমাকে ব্রিটিশের অর্থ-পুষ্ট দেশদ্রোহীও বলেছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিভঙ্গি বলতে গেলে রাজনৈতিক দলের কর্মী সাহিত্যিকদের স্বভাবের একটি দিক। কিন্তু তবুও কিন্তু আছে। কিন্তু এই দলের কর্মী-সাহিত্যিকদের মতো অন্যেরা আজকের মতের বিরুদ্ধ মত কাল প্রচার করেন না। এ শুধু আমার

কথাই বললাম। আরও অনেক লেখক সম্পর্কে এঁদের স্ববিরোধী মতামত প্রচারের নজির অনেক আছে। এই কিছুদিন আগে ডাঃ জয়সূর্য মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে এঁদের মতামত পরিবর্তনের কথার উল্লেখ করেছেন। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে এঁরা যে সব বিচিত্র মতামত প্রচার করেছেন, তা সাময়িক পত্রে ছড়ানো আছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এঁদের রাজনৈতিক দলগত স্বার্থ ও দলীয় প্রধানদের নির্দেশের কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই হেতুই যাঁদের কাছে সাহিত্য-সত্য বা সাহিত্য-ধর্ম বড়, তাঁদের এঁদের বন্ধনে বদ্ধ থাকা অসম্ভব। এঁদের বন্ধনের বিশেষত্ব হ'ল এই যে, এঁদের বন্ধন সজীব, একবার একটি বন্ধনের গ্রন্থি প'ড়েই ক্ষান্ত হয় না—গ্রন্থির পর গ্রন্থি পড়তে থাকে, অবশেষে একদা শক্তিহীন হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়। সাহিত্য এঁদের কাছে শ্রেণী-সংগ্রামের বা বিপ্লবের হাতিয়ার। এ কথা এঁরা ঘোষণা ক'রেই বলেন। এই সমস্ত স্পষ্ট উপলব্ধি করতে আমার দেড় বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। এঁদের দলগত বন্ধন ছিন্ন করতে লেগেছে তার চেয়ে অনেক বেশি দিন। আমাকে গালিগালাজ ক'রেও বার বার এঁরা আমার কাছে এসেছেন। তাই বলছিলাম, এঁদের গ্রন্থি একবার প'ড়েই থামে না, গ্রন্থির পর গ্রন্থি যেন পর পর প'ড়ে প'ড়ে যায়। সভায় সমিতিতে বার বার ডেকেছেন। অনেক সময় ছদ্মনামের অন্তরালে উদ্যোক্তাদের চিনতে পারি নি, সরল বিশ্বাসে গিয়েছি। গিয়ে বিব্রত হয়েছি। একবারের কথা বলি।

বাড়িতে ব'সে কাজ করছি, এমন সময় বাইরে কেউ প্রশ্ন করলে, তারাশঙ্করবাবু আছেন? চমকে উঠলাম। কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। গল্পে উপন্যাসে বহুজনে লেখেন, আমিও লিখি—কণ্ঠস্বরে সকলে চমকে উঠল, যেন বাঘের ডাক। সত্য সত্যই সে আওয়াজ শুনে ওই উপমা ছাড়া অন্য উপমা মনে আসে না। এমন ভরাট ভারী গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর শুনেছি ব'লে আমার মনে পড়ে না। বিস্মিত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, জানলায় মুখ বাড়ালাম। আওয়াজের মালিককে দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। হ্যাঁ, এ আওয়াজ এই মানুষেরই যোগ্য বটে।

চেহারাও বাঘের মত। চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি। হাতের মুঠো বাঘের থাবার মতই, মাথাটা ওই অনুপাতেই বড়। পল্লীগ্রামে এমন মাথার উপমা দিয়ে বলে, দশ-সের-জল-ধরা ঘড়ার মত। মুখে চোখে পল্লীগ্রামের ছাপ, রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণাভ। সত্যি বলতে কি, কণ্ঠস্বর ও চেহারায় দুর্লভ বলশীলতার পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ঘরে ডাকলাম। লোকটির নাম মনে নেই, জাতিতে মুসলমান, বাড়ি বোধ হয় বর্ধমান জেলায় কুড়মুন-পলাশী; বললেন, 'ফোক্ টেল্‌স্ অব বেঙ্গল' এবং 'বেঙ্গল পেজ্যাণ্ট লাইফে'র রচয়িতা রেভারেণ্ড লালবেহারী দের বাড়ি ছিল কুড়মুন-পলাশী। আমি সেখান থেকে আসছি। তাঁর জন্মোৎসবের আয়োজন করেছি। আপনাকে যেতে হবে, সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে। প্রধান অতিথি হবেন স্কটিশ চার্চের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড কেলাস।

এমন চেহারার মানুষটিকে প্রথম দর্শনেই আমার ভারি ভাল লেগেছিল। তার উপর যখন শুনলাম, তিনি মুসলমান হয়েও রেভারেণ্ড লালবেহারী দের জন্মোৎসবের আয়োজন করছেন, তখন শ্রদ্ধার আর সীমা রইল না। এক কথায় সম্মতি জানিয়ে বললাম, নিশ্চয় যাব।

দিন তারিখ জানিয়ে তিনি বললেন, এই দিন এই ট্রেনে যেতে হবে। হাওড়া স্টেশনে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

ট্রেনে চ'ড়ে দেখলাম, রেভারেণ্ড কেলাস ছাড়া আরও দুজন চলেছেন—একজন সাংবাদিক ও অন্যজন অধ্যাপক। একজন সদ্য রাশিয়া থেকে ফিরেছেন, অন্যজন কিছু দিন আগে চীন থেকে প্রত্যাগমন করেছেন। একটু সন্দিগ্ধ হলাম। সন্দেহ দৃঢ় সত্যে পরিণত হ'ল বর্ধমান স্টেশনে নেমে। সেখানে একজন তরুণের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, তিনি সিনেমা-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—হয় ক্যামেরাম্যান বা ক্যামেরাম্যান-ডিরেক্টার একাধারে দুইই, তাঁর সঙ্গে দুজন কি তিনজন সংগীত ও নৃত্য-শিল্পী—গণনাট্য-সংঘের সভ্য। শুনলাম, পরের কোন ট্রেনে আরও এক দল ওই সংঘের সভ্য আসছেন, সভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। অস্বস্তি বেড়ে গেল। তারপর মনে হ'ল, এ আমার মিথ্যা অস্বস্তি। অধ্যাপক এবং সাংবাদিক দুজন চীন ও রাশিয়া গিয়েছেন,

কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হ'লেও তাঁরা আসলে অধ্যাপক ও সাংবাদিক ; রেভারেণ্ড লালবেহারী দের জন্মোৎসবে তাঁরা যা বলবেন, তার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকবে না, এবং গণনাট্য-সংঘ সম্ভবত 'ফোক্ টেল্‌সে'র কোন গল্পের নাট্যরূপ দেখাবেন। গণনাট্য-সংঘ রাজনৈতিক প্রচারকার্যে সব শক্তি নিঃশেষিত না করলে, বাংলার নাট্য-আন্দোলনে একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করতে পারেন। তাঁদের শক্তি ও অভিনয়-শিল্পবিজ্ঞানে পারঙ্গমতার প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। ইংরিজী মতে টুপি খুলে অভিনন্দন জানানোর প্রথা আছে। আমি নগ্নমস্তক বাঙালী, মাথা নুইয়ে অভিনন্দন অভিবাদন জানাই। শ্রীবিজন ভট্টাচার্য, শ্রীশম্ভু মিত্র, শ্রীগঙ্গাপদ বসু, শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র অভিনয়-শক্তিতে দুর্লভ প্রতিভা ধরেন। এঁরা কেউ সে দলে না থাকলেইও, সে দলের সভ্য যখন এঁরা, তখন নিশ্চয় নাটকাকারে নূতন কিছু যা রেভারেণ্ড লালবেহারী দের রচনা বা যা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক তাই দেখব।

সভা আরম্ভ হ'ল। প্রথমে উঠলেন সাংবাদিক। মুখবন্ধে তিনি ঘোষণা ক'রেই বললেন, আমি সদ্য রুশ দেশ দেখে এসেছি। এই সভার উদ্যোক্তারা আমাকে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি সেই বিস্ময়কর দেশের কথা বলব। তা-ই তিনি ব'লে গেলেন, সমগ্র বক্তৃতার মধ্যে রেভারেণ্ড লালবেহারী দের নামোল্লেখও করলেন না।

তারপর উঠলেন অধ্যাপক বন্ধু। তিনিও এইভাবেই চীনের কথা ব'লে গেলেন। শেষে লাইন চারেক বললেন, 'বেঙ্গল পেজ্যাণ্ট লাইফে'র গ্রন্থকার লালবেহারী দে পরিতৃপ্ত হবেন সেই দিন, যেদিন এ দেশ চীনের মত প্রগতিশীল হয়ে উঠবে।

এর পর রাশিয়া-প্রত্যাগত সিনেমা-কর্মীর পালা। কিন্তু ওদিকে বর্ধমান ফিরে ট্রেন ধরা যাবে না ব'লে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হ'ল যে, তিনি রেভারেণ্ড কেলাস ও আমার বক্তৃতার পর বক্তৃতা করবেন, কারণ রাত্রে তিনি ওখানেই থাকবেন, গণনাট্য-সংঘের অভিনয় পরিচালনা করবেন এই স্থির ছিল। রেভারেণ্ড কেলাস রাজনৈতিক উত্তাপতপ্ত সভায়

রেভারেণ্ড দের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচনা করলেন। তারপর আমার পালা কোন রকমে সেরে বর্ধমান ফিরলাম। আসবার সময় শুনে এলাম, গণনাট্য-সংঘ তাঁদের পুরনো বই করবেন, নূতন কিছু নয়। চীনের কথা, রাশিয়ার কথা শুনতে আমার কোন আপত্তি নেই। তাঁদের দেশ নূতন সংগঠনে সমৃদ্ধির পথে চলেছে; কিন্তু রেভারেণ্ড লালবেহারী দের স্মৃতিসভার আয়োজন ক'রে, তাঁর নামে সভা আহ্বান ক'রে, তাঁকে উপেক্ষা ক'রে চীন-রাশিয়ার কথা কেন? আড়াল কেন? এ আড়াল আমার কাছে, এবং আমার বিশ্বাস, সাধারণের কাছে চাতুরী বা মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়।

এমন অজ্ঞাতসারে অতর্কিতভাবে বার বার জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু যেখানে বুঝতে পেরেছি, অনুমান করতে পেরেছি, সেখানে সাবধান হয়েছি। তাই যখন ১৯৫১ সনে প্রথম রাশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাশিয়া দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ পেলাম, তখন সে নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। তার আগেই কম্যুনিস্ট পার্টির উপর বেআইনী-ঘোষণা-আজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে, এবং পার্টি আইনসম্মত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কয়েকজন সভ্য আমার কাছে এসে আলাপ ক'রে যান। দলের ভ্রান্তি প্রকারান্তরে স্বীকার করেন এবং এই নিমন্ত্রণের কথা জানান। তাঁরা যদি আগে না জানাতেন, তবে হয়তো মোহবশে ভুল করতাম। ভাবতাম, এ সাদর নিমন্ত্রণ সেখান থেকেই আসছে। কিন্তু তাঁরা বলবার পর এ নিমন্ত্রণ আসায় আমার 'হাঁসুলী বাঁকে'র অনুবাদ-প্রস্তাবের কথা মনে প'ড়ে গেল। রাশিয়া চীন দেশ সম্পর্কে আগ্রহ আমার কারও থেকে কম নয়; এই নববিধানসমৃদ্ধ দেশগুলির জীবন-দর্শনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও আমি পোষণ করি। এ দেশ থেকে সরকারী নেতৃত্বে কোন সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে ও-দেশ ভ্রমণের সুযোগ পেলে সানন্দে গ্রহণ করব; নিজেকে ধন্য মনে করব; কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের সুপারিশে আমি সেদিন যাই নি, ভবিষ্যতেও যাব না। কারণ তার বিনিময় দিতেই হবে। ও-দেশের যা ভাল দেখে আসব তা বলতে আপত্তির জন্য নয়, সে আপত্তি আমার কখনই নেই, কিন্তু তার সঙ্গে

আমার উপর বিনিময়ের দাবিতে এখানকার দলের নিষেধাজ্ঞা জারি হবে, এ দেশ সম্পর্কে ভাল কিছু বলতে পাব না। এ অভিযোগ আমার একার নয়, শ্রীনেহরুও এই অভিযোগ বার বার করেছেন।

১৯৫১ সনে দিল্লী থেকে চিঠি পেলাম—

Embassy of the Union of Soviet Socialist Republics
Travancore House, Curzon Road
New Delhi
3rd April 1951

Dear Mr. Banerjee,

On behalf of Soviet writers I have the honour to invite you to take part in an Indian delegation to visit the Soviet Union for acquainting yourself with the life of the Soviet people and the work of Soviet writers....

Yours sincerely
S. Shundenco
Representative of VOKS and the first Secretary of the Embassy

শরীর খারাপের অজুহাতেই আমি এ নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। ভুল এর আগে করেছিলাম, তার জের টেনে চলতে হচ্ছিল। কিন্তু এবার আর ভুল করি নি। এর পরই নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

এর পর কয়েকটি কথা ব'লেই এ অধ্যায় শেষ করব।

অধ্যায়ের প্রারম্ভে এবং মধ্যে বার বার বলেছি, এঁদের মধ্যে বিপুল পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেছি, তাঁদের কাছে অনেক শিখেছি। বহু প্রীতিভাজন বন্ধু পেয়েছিলাম এঁদের মধ্যে। কিন্তু আমার দেশের ধর্ম—অহিংসা এবং সত্যের সঙ্গে এঁদের দলগত দর্শনের প্রভেদের জন্য একসঙ্গে পথ চলা সম্ভবপর হ'ল না। আমার অহিংসা ও সত্যের উপর বিশ্বাস 'ধাত্রী দেবতা' থেকে 'মন্বন্তর' পর্যন্ত সর্বত্র সুস্পষ্ট। 'মন্বন্তরে'র অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয় 'পঞ্চগ্রাম'। 'পঞ্চগ্রামে'র মধ্যে আমার ধ্যান-কল্পনা সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট। 'পঞ্চগ্রামে'র শেষে আছে—

"মানুষ বাঁচিতে চায়। মানুষের প্রাণ কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই। সেই দিনের দিকে চাহিয়াই মানুষ দুঃসহ বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। নিজেরা দুঃখের মধ্যে জীবন শেষ করিয়াও সযত্নে রাখিয়া চলিয়াছে, পালন করিয়া চলিয়াছে আপন বংশপরম্পরাকে।...সে যাহা বুঝিয়াছে বলিয়া যাইবে। বলিবে, তোমরা মানুষ, তোমরা মরিবে না, মানুষ মরে না।...মুক্তি আসিবে। সেদিন মানুষের যাহা সত্যকারের পাওনা, তাহা তোমরা পাইবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অন্ন বস্ত্র ঔষধ পথ্য আরোগ্য অভয় এ মানুষের পাওনা। আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা শোন; আমি কাহারও চেয়ে বড় নই, কাহারও অপেক্ষা ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমাকে বঞ্চিত করিবারও অধিকার কাহারও নাই।"

শেষে নায়ক দেবু, ভারতের চিরন্তন কল্পনার কাল সত্যযুগকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। "সত্যযুগের আমন্ত্রণ। নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ভাষায়, নূতন আশায়, নূতন পরিবেশে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভরা ধর্মের সংসার। ...পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার **ন্যায়ের সংসার; সত্যের সংসার; ধর্মের সংসার; সুখের সংসার।** সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই, **অন্যায়** নাই, **মিথ্যা** নাই, অন্নবস্ত্র ঔষধপথ্য আরোগ্য [redacted] শক্তি সাহস অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তি [redacted] দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না। শোষণ থাকিবে না।... [redacted] বলশালী, পরিপুষ্ট সবলদেহ, আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে, বুকের পাটা হইবে এতখানি। নূতন করিয়া গড়িবে ঘর দুয়ার পথঘাট। ঝকঝকে বাড়ি... সুসমান সুগঠিত পথ।"

ন্যায় ধর্ম সত্যের পর আমি সুখের কথা বলেছি। 'পঞ্চগ্রামে'র ন্যায়রত্ন নায়ক নন, কিন্তু ওই চরিত্রটিই বিরাটতম চরিত্র। মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের এই পরমৈশ্বর্য যদি যুক্ত করতে পারতেন এই পণ্ডিতেরা, রাজনৈতিক দার্শনিকেরা, তবে পৃথিবীর জীবনদর্শনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় যোজিত হ'ত। রাশিয়াকে বুঝি, চীনকে বুঝি। তাদের দেশের রক্তাক্ত বিপ্লবকে বুঝি, জানি, সেখানে এ অবশ্যম্ভাবী।

তার জন্য বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই আমার। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাশ্চাত্ত্যমতের পণ্ডিতদের মত আমি বুঝি না, কিন্তু ভারতীয় মতে বুঝি। ভারতবর্ষের কুরুক্ষেত্র আমার চোখের সামনে। গীতার "যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"—এই বাণী আমার কানের পাশে বাজে। সুতরাং তাঁদের দর্শন অনুযায়ী তাঁরা যে শ্রেণীকে দুষ্কৃতিকারী মনে করেন, সেই শ্রেণীকে যদি ধ্বংস করতে চান বা ক'রে থাকেন, তবে তাঁদের দর্শন অনুযায়ী ভ্রান্ত বা অত্যাচারী বলব না। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কুরুক্ষেত্রেই ও-পর্যায় অতিক্রম করেছি। আমাদের মানস-চৈতন্য ও-স্তর থেকে নূতন স্তরে উপনীত হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগে। গীতার ওই "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"-বাণীর পর পরবর্তী অবতার অস্ত্রের পরিবর্তে ভিক্ষাপাত্র হাতে আবির্ভূত হয়ে বলেছেন, "মা হিংসী।". পাপীকে উচ্ছেদ ক'রে পাপকে উচ্ছেদ করা যায় না। পাপকে বিগলিত করতে হবে। Elemination নয়, sublimation। আড়াই হাজার বছর ধ'রে এই সাধনা [redacted] ভারতবর্ষে। বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মা জীবন দিয়ে প্রমাণ ক[redacted] ভারতের এই সাধনার অব্যাহত প্রবহমানতা। ভারতীয় দৃষ্টিতে এই ভারতের ইতিহাসের উপলব্ধি। পাশ্চাত্ত্যমতে ইতিহাস-ব্যাখ্যাতা আমাকে ভ্রান্ত, এমন কি অজ্ঞও বলতে পারেন, বলুন।

এরই জন্য আমার পথ তাঁদের থেকে ভিন্ন, এবং এই জন্যই মনে হয় রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতের সাধারণ মানুষের সৌহার্দ্য-প্রীতি অনেক গাঢ়তর হ'ত, যদি মাঝখানে নিজের দেশের ধর্মদর্শনে অবিশ্বাসী এঁরা তাদের সন্দিগ্ধ না ক'রে তুলতেন।

[ক্রমশ]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডানা

(পূর্বানুবৃত্তি)

খুব ভোরেই কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল ডানার। তখনও অন্ধকার কাটে নি। উঠে বসল সে বিছানার উপর। ব'সেই মনে হ'ল, শরীরের ক্লান্তি একটুও দূর হয় নি। সমস্ত রাত সে কেবল চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে ছিল, সত্যিকার ঘুম আসে নি। একটা অস্বস্তি সারা মন জুড়ে রয়েছে। ঘরের ভিতর সাপ ঢুকেছে খবর পেলে যে ধরনের অস্বস্তি হয় অনেকটা তেমনি। রূপচাঁদই কি এর একমাত্র কারণ? না, অন্য কিছু? চিড়িয়াখানার বন্দী পাখিগুলো? তাদের অসহায় অবস্থা গোড়া থেকেই পীড়া দিচ্ছে তাকে। পাখিগুলোকে দেখে মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের কথা মনে পড়ে, যাদের বিরুদ্ধে কোনও দোষ প্রমাণ করা যায় নি, এমন কি যাদের বিচারালয়ে বিচার পর্যন্ত হয় নি, তাদের চেয়েও নিরপরাধ এই পাখিগুলো। একটা বড়লোকের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য তাদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে আর তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার পাহারাদার। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাকে এই নিষ্ঠুর কর্ম বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে ব'লেই কি এই অস্বস্তি? আবার তার মনে হ'ল, তার নিজের টাকা যদি থাকত কিছু, তা হ'লে সে বোধ হয় এমন অশান্তি ভোগ করত না। নির্ভরযোগ্য কোন নিজের লোকও যদি থাকত কেউ!...হঠাৎ একযোগে সমস্ত পাখিগুলো ডেকে উঠল। ফরসা হয়ে এল বোধ হয়। ঘোর গ্রীষ্মেও সে সাহস ক'রে জানলা খুলে শুতে পারত না। দু-একদিন চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। শুধু রূপচাঁদের ভয় নয়, সে ভয়ও অবশ্য ছিল খুব, কিন্তু অন্য ভয়ও ছিল, বিশেষ ক'রে সাপের ভয়। গঙ্গার ধারে প্রায়ই বড় বড় সাপ বের হয়। কপাট খুলে বেরিয়ে এল সে। চাকরটাকে উঠিয়ে দিলে চা করবার জন্য। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখলে যে, অত ভোরেও একটা দোয়েল এসে নদীর-ধারে-পোঁতা উঁচু বাঁশের ডগাটার উপর ব'সে পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে গান শুরু ক'রে দিয়েছে। পূর্বাকাশ ঊষারাগরঞ্জিত। মনে হ'ল, ও যেন পাখি নয়, বৈদিক যুগের কোনও ঋষি, ঊষা দেবীকে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছে স্বতঃ-উৎসারিত সঙ্গীতের

মন্ত্র দিয়ে। বহু উষাকে অনুসরণ ক'রে যে নূতন উষা আজ এসেছে, অনন্তের যাত্রাপথে চলতে চলতে কিছুক্ষণের জন্ত যে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর পূর্বতোরণে, তার সম্বন্ধে আর সবাই উদাসীন, কিন্তু ওই দোয়েল নয়। অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। সমস্ত পৃথিবীর হয়ে ওই ক্ষুদ্র পাখিটি যে কর্তব্য পালন করছে, তার জন্ত তার অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু একটু পরেই তাকে চমকে উঠতে হ'ল আর একটা পাখির ডাকে, যেন সুরের ছোট্ট তুবড়ি ছুটিয়ে উড়ে চ'লে গেল একটা টুনটুনি পাখি। তার পরই পাশের পুটুস ফুলের ঝোপটাতে টিক-টিক-টিক শব্দ ক'রে খুব ছোট একটা পাখি তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। দরজি পাখি কি? বেশিক্ষণ ভাববার অবসর কিন্তু পেলে না, এক জোড়া ঘুঘু তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে। পাশাপাশি এসে বসল তারা অশ্বত্থগাছের কাঠের বাক্সটার উপর। এই বাক্সটা অমরেশবাবু টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যদি কোনও পাখি ওতে বাসা বাঁধে এই আশায়। কোনও পাখি এখনও পর্যন্ত বাঁধে নি। ঘুঘু পাখি দুটোকে বসতে দেখে ডানার একটু আশা হ'ল, বাসা বাঁধবে কি ওরা? পর-মুহূর্তেই কিন্তু উড়ে গেল পাখি দুটো। উড়ে অনেক দূর চ'লে গেল। অনেক গাছে অনেক বাক্স টাঙিয়ে দিয়ে গেছেন অমরেশবাবু, অনেক রকম আকারের বাক্স, কিন্তু এক ওই তালগাছে টাঙানো বাক্সটায় ছাড়া অন্ত কোনও বাক্সে কোনও পাখি বাসা বাঁধে নি। মানুষকে পাখিরা এখনও তত বিশ্বাস করে না। ওই বাক্সগুলোকে তারা ফাঁদ ভাবছে। বাক্সগুলোর অভিনবত্ব যখন লোপ পাবে, পুরনো হয়ে যাবে ওগুলো যখন, প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যাবে, তখন হয়তো ওগুলোতে বাসা বাঁধবে পাখিরা। অভিনবত্বকে ওরা ভয় করে, অভিজ্ঞতার ধোপে না টিকলে ওরা কোনও জিনিসকে গ্রহণ করে না। মানুষের মত দ্রুত আধুনিক হওয়ার দিকে ওদের প্রবণতা কম। অনেক বিদেশী বিজ্ঞানী পাখিদের আধুনিক ক'রে তোলবার চেষ্টা করছেন, তাদের জন্ত বৈঠকখানা বাসা প্রভৃতি বানিয়ে দিচ্ছেন, এক ভদ্রমহিলার টাইপ-রাইটারের উপর ছোট্ট একটি পাখির ছবিও সে একবার দেখেছিল অমরেশবাবুর একখানা বইয়ে;

কিন্তু ওই বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেছেন যে, পাখিদের বিশ্বাস উৎপাদন করানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ডানার এ চিন্তাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পেল না একদল শালিকের চিৎকারে। একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে হ'ল, শালিকগুলো চেঁচাচ্ছে কেন! দেখল, একটা নেউল বেরিয়েছে। তাকে দেখেই নেউলটা ঢুকে পড়ল একটা ঝোপে তার পরই চোখে পড়ল, সন্ন্যাসী চর থেকে ফিরছেন। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপরই মনটা অস্বস্তিতে ভ'রে উঠল আবার। যতক্ষণ পাখিদের নিয়ে মন নিযুক্ত ছিল ততক্ষণ নিজেকে সে ভুলেছিল, সন্ন্যাসীকে দেখেই নিজের কথা মনে হ'ল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল সন্ন্যাসীর উপর একটু অভিমান তার মনের প্রত্যন্তলোকে সঞ্চিত হয়েছে। আবিষ্কার ক'রে সে একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল নিজের কাছেই। সন্ন্যাসী তো তার সঙ্গে কোনদিন কোনও অভদ্র ব্যবহার করেন নি, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কই বা কতটুকু, কোনও দাবিই তো নেই, তবে অভিমান কেন? অভিমানকে প্রশ্রয় দেবার জন্য সামান্য একটু প্রেমের সম্পর্ক থাকা দরকার—তা সে সম্পর্ক যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেটুকু সম্পর্কও তো তার হয় নি। সন্ন্যাসী ইচ্ছা করলে হয়তো হতে পারত, কিন্তু সন্ন্যাসী সে ইচ্ছা করেন নি। বরং বিপরীত ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন তিনি, নারীসঙ্গ তিনি পরিহার করতে চান। ডানার মনে হ'ল, এই জন্যই অভিমান হয়েছে তার। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে মনে মনে সে কি যেন একটা প্রত্যাশা করেছিল, ঠিক যে কি সে সম্বন্ধে যদিও স্পষ্ট কোন ধারণা নেই তার, কিন্তু প্রত্যাশা একটা ছিল মনে মনে, এখনও আছে। সে যেন মনে মনে নির্ভর ক'রে আছে ওই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটির উপর, তার নিভৃত অন্তরবাসী সত্তাটির দৃঢ় প্রত্যয়—ওই লোকটিই সত্য পথের সন্ধান পেয়েছেন, ইচ্ছে করলে তারও সমস্যার সমাধান করতে পারেন, কিন্তু করছেন না। এই জন্যই অভিমান হয়েছে বোধ হয়। আর একটা কারণও সম্ভবত আছে, যদিও সেটা নিজের কাছে এতদিন স্বীকার করতে বেধেছে তার। কিন্তু প্রশান্ত প্রভাত-আলোকে সত্যটা স্পষ্ট

হয়ে উঠিল তার মনে। সে বুঝতে পারল যে, তার অহঙ্কার ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লেই রাগ হয়েছে; এও সে বুঝতে পারল যে, ওই সন্ন্যাসীর দুর্নমনীয় সংযমকেও তার নারী-প্রকৃতি সুচক্ষে দেখছে না, মনে হচ্ছে ওটা একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বা পরিখা যা তাকে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে। মনে পড়ল আর একটা ভোরের কথা। সে দিন সে রূপচাঁদের ভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সন্ন্যাসীর ওই ভাঙা ঘরটাতে। সন্ন্যাসী ঘরে ছিলেন না, একটু পরে ফিরে এসে যা যা বলেছিলেন তা এখনও মনে আছে তার। একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে আছে— "পালিয়ে আসার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই। পালিয়ে এলে তো তার কাছেই নতি-স্বীকার করা হ'ল!" সে তো সবার কাছ থেকেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এমন কি ওই সন্ন্যাসীর কাছ থেকেও। কে কি বলবে, পাছে সন্ন্যাসী কিছু মনে করেন, এই সব ভেবে সে সন্ন্যাসীর সঙ্গ এড়িয়ে এসেছে, ইচ্ছে থাকলেও যায় নি তাঁর কাছে। ইচ্ছে করলে সে কি ঘনিষ্ঠ হতে পারত না? তার ঘনিষ্ঠতা কি উপেক্ষা করতে পারতেন উনি? তার যে আকর্ষণী শক্তি আছে এর অনেক প্রমাণ পেয়েছে সে জীবনে। অমরেশবাবু, আনন্দবাবুর মত লোকও আকৃষ্ট হয়েছেন তার প্রতি। রূপচাঁদ তো হয়েইছেন।...হঠাৎ অনেকদিন পরে আবার মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরী আর ভাস্কর বসুর কথা। এরা দুজনেও আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি। রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুকে তার নিজেরও ভাল লেগেছিল। জাপানীরা বোমা ফেলে যদি রেঙ্গুন বিধ্বস্ত ক'রে না দিত, তা হ'লে হয়তো ভাস্কর বসুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যেত। কথাবার্তা তো প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেছে। সৌম্যদর্শন ভাস্কর বসুর মুখটা মনের উপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। কোথায় আছে এখন সে? বেঁচে আছে কি? তার মন কিন্তু ভাস্কর বসুকে নিয়ে, অতীতকে নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে চাইল না, সন্ন্যাসীই এসে মনটা জুড়ে বসলেন আবার। সন্ন্যাসী ক্রমশ এগিয়ে আসছিলেন তার দিকে, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল ভূমিতে। তাঁর ভূমি-নিবদ্ধ-দৃষ্টি তার অহঙ্কারকে ক্রমাগত

আঘাত করতে লাগল যেন। ডানা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছিল, উনি চোখ তুলে চাইবেন এবং তাকে দেখে মৃদু হেসে বলবেন কিছু। কিন্তু উনি সে সব কিছুই করলেন না, ওঁর বাইরে যে একটা জগৎ আছে সে জগতের সম্বন্ধে উনি যেন সচেতনই নন মনে হ'ল। নিজের ভাঙা ঘরের মধ্যে যখন তিনি ঢুকে পড়লেন, তখনও ডানা দাঁড়িয়ে রইল। তারও চোখে বাইরের পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য, সমস্ত অন্তর সন্ন্যাসীময় হয়ে গিয়েছিল। চাকরটার ডাকে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল।

চা ভিজিয়ে দিয়েছি মা, আপনি আসুন।

ভিজিয়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

তুমি ভেজাতে গেলে কেন? আমাকে ডাকলেই পারতে। ভেজাবার আগে টী-পটটা গরম জলে ধুয়ে নিয়েছিলে তো?

নিয়েছিলাম। ভরতি ভরতি দু চামচ চা দিয়েছি।

দুধটা গরম করেছ?

করেছি।

নিরর্থক জেনেও চাকরের সঙ্গে উপরোক্ত আলাপ সে করল নিজেকেই কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকবার বাসনায়। কিছুতেই সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না, কি করলে সে আর পাঁচজনের মত বেশ স্বচ্ছন্দ হতে পারবে। ত্রিশঙ্কুর মত কতদিন আর সে কাটাবে এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে? চা খেতে খেতে সে ঠিক করলে, ওই সন্ন্যাসীর কাছেই সে পরামর্শ চাইবে আর একবার গিয়ে। তাঁকে গিয়ে বলবে, আপনি দয়া ক'রে আমাকে একটা সহজ পথ ব'লে দিন। আপনার আধ্যাত্মিক উপদেশ অত্যন্ত ধোঁয়াটে মনে হয়, ঠিক বুঝতে পারি না। যতটুকু পারি ততটুকুও অনুসরণ করতে পারি না। কখনও মনে হয় হাস্যকর, কখনও মনে হয় অসম্ভব। সেদিন উঞ্ছবৃত্তির কথা বলছিলেন, এ যুগে ব্যাপারটা কি বেমানান নয়? মনে মনে সন্ন্যাসীকে সামনে বসিয়ে মনে মনেই কথাগুলো বললে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মনে। কি ছুতোয় সে যাবে তাঁর কাছে? তাঁর দিক থেকে আমন্ত্রণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও তো সে পায় নি কোনদিন। এমন ভাবে যাওয়াটা কি শোভন? কথাটা আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে না গিয়ে পারে নি। এর কারণ সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ভাল লাগে, তাঁর সান্নিধ্যে এমন একটা কি জিনিস আছে যা অনির্বচনীয়, যার অপরূপত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। সন্ন্যাসীর কাছে নিজের সমস্যার কথা সে তো পেড়েছিল কয়েক দিন আগে, সন্ন্যাসী বিরক্ত হন নি। বলেছিলেন, যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। কিন্তু সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে ভাবনাকে একটা বিশেষ পথ অনুসরণ করতে হবে। সেই পথের কথাই জিজ্ঞাসা করবে এবার গিয়ে। একটা নির্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হয়ে তার মন যেন একটু শান্ত হ'ল। পর-মুহূর্তেই চাকরটা এসে বললে, কাল দুপুরে যখন আপান বাইরে গিয়েছিলেন, তখন পিয়ন এসে ওই পার্সেলটা দিয়ে গেছে। আপনি রসিদ সই ক'রে দিন, পিওন এসে আজ নিয়ে যাবে। খুব ছোট একটা পার্সেল রত্নপ্রভা পাঠিয়েছেন। ডালা খুলে দেখলে, তার মধ্যে একটা চাবি রয়েছে আর একটা চিঠি।—

"ডানা,

আমাদের লাইব্রেরি-ঘরের চাবিটা তোমাকে পাঠালাম। মাঝে মাঝে গিয়ে বইয়ের শেল্‌ফ্‌গুলোর একটু তদারক ক'রো। অনেক সময় উই লাগে। কোনও বই যদি পড়তে ইচ্ছে কর, প'ড়ো। তুমি যদি আমাদের বাড়িতে এসে থাকাই স্থির কর, সুখন পাঁড়েকে বললেই সে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। তাকে ব'লে এসেছি। তুমি যে সব ভয় করছ তা অলীক। আমি যতটা করবার ক'রে এসেছি। কোনও ভয় নেই। পাখিগুলোর খবর দিও মাঝে মাঝে। কাল আমরা সিমলা যাচ্ছি। সেখানকার ঠিকানা গিয়ে পাঠাব। বকুলবালার জন্যে একটা এ-বছরের হলদে পাখি কিনেছি টেরেটি বাজার থেকে। কারও সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। আগে থাকতে তাকে ব'লো না যেন কিছু। পৌঁছলে তারপর খবর দিও। আশা করি, ভাল আছ। ভালবাসা নিও। ইতি রত্নপ্রভা"

মুক্তোর মত গোটা গোটা অক্ষরগুলোর দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর উঠে পড়ল। নূতন ধরনের একটা কাজ পেয়ে বেঁচে গেল যেন সে। ঠিক করলে, আগে লাইব্রেরিতে যাবে, তারপর চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানা যাবার পথে খোঁজ নিয়ে যাবে সন্ন্যাসীর। একটা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ঠিক হয়ে যাওয়াতে তার মনের অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেল।

লাইব্রেরিতে গিয়ে নূতন একটা জগৎ আবিষ্কার করলে সে। তাদের বাড়িতেও বেশ বড় লাইব্রেরি ছিল, কিন্তু তাতে ছিল প্রধানত আইনের বই। যখন কলেজে পড়ত, তখন কলেজ-লাইব্রেরির বই সে নিত মাঝে মাঝে। প্রায়ই কাজের বই নিত, পড়ার বই বা যে সব বই পড়লে পরীক্ষা পাস করবার সুবিধা হয় সেই সব বই। তার সঙ্গে আনন্দের বিশেষ কোনও যোগ ছিল না, কলেজ-লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে তা নিয়ে কোনও দিন মাথা ঘামায় নি সে। অমরেশবাবুর ছোট্ট লাইব্রেরিটি কিন্তু তাকে অনাস্বাদিতপূর্ব এক আনন্দের সন্ধান দিলে। তার অবলম্বনহীন ক্ষুধিত মন যেন একসঙ্গে অবলম্বন এবং খাবার পেয়ে গেল নানা রকম। কত রকম বই! পাখির বই-ই যদিও বেশি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ইংরেজী বাংলা নানা রকম মাসিক পত্র, গ্রীক নাটকের একটা পুরো সেট, ইংরেজী নভেল, বাংলা নভেল, নক্ষত্রের বই, পাকপ্রণালী, ইতিহাসের বই দু-চারখানা, কয়েকটা অভিধান—নানা রকম বই রয়েছে। ডানা একটা চাকরকে দিয়ে ঘরের জানলাগুলো খুলিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে ফেললে। পরিষ্কার করাবার সময় একটা খাতা বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। সাধারণ একসারসাইজ বুক। উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'পক্ষীপর্যবেক্ষণ' বাই গণেশ। খাতা খুলে আরও অবাক হয়ে গেল ডানা। চণ্ডীর বন্ধু গণশার খাতা, গত বছরের ডায়েরির মত, সম্ভবত অমরেশবাবুর উৎসাহে পাখি দেখতে উৎসাহিত হয়েছিল গণেশ। যা যেমন দেখেছিল, লিখে রেখেছে।

১লা কার্তিক, ১৩৫৬ঃ বেনেবউ পাখির ডাক শোনা গেল, সকাল প্রায় আটটা নটার সময়। প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি পাখিগুলোকে।

একটা আর একটার পিছনে তাড়া করছিল। একটা ফিঙে ডাকছিল, চমৎকার মিষ্টি ডাক, প্রায় নটা দশটার সময়।

২রা কার্তিক : আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনতে পেলাম কোকিলরা ডেকে উঠল। তার একটু পরে—প্রায় ছটার সময়—একটা দোয়েলের শিস শুনতে পেলাম। বেরিয়েই কিন্তু দেখতে পেলাম কয়েকটা গোশালিককে, দোয়েলটাকে দেখা গেল না। আর একটা ছোট্ট পাখি দেখলাম—টোইট্ টোইট্ টোইট্ এইরকম ডাকছে। ওই কি দরজি পাখি? অনেক রকম পাখি দেখলাম আজ। টিয়া এক ঝাঁক, একটা বেনেবউ, কয়েকটা গোছা-ভরত—অমরেশবাবু এদের ইংরেজী নাম বলেছিলেন টি-পিপিট, হলদে খঞ্জন একটা, চিল, বুক-সাদা মাছরাঙা; বসন্তবউরির ডাকও শুনলাম : স্যাকরা পাখিও (ছোট বসন্ত-বউরি) ডাকছিল—টংক, টংক, টংক।

৩রা কার্তিক : একটা ঘুঘু ঠিক আমাদের চালের উপর ব'সে ডাকছিল আজ ভোরে।

৪ঠা কার্তিক : কোকিল : ঘুঘু।

৫ই কার্তিক : তেমন কিছু দেখি নি। ঘুঘুর ডাক শোনা গেছে।

৬ই কার্তিক : অমরেশবাবু যে নূতন পাখিটা চিনিয়ে দিয়েছেন, সেটাকে আবার আজ দেখলাম—রেডস্টার্ট। দেশী নাম খিরখিরা। আতাগাছে ব'সে ছিল।

পাতার পর পাতা লিখে গেছে গণেশ। খাতাটার শেষ পাতায় অমরেশবাবু লিখেছেন—খুব খুশি হলাম; ছেলেটির পড়ার ব্যবস্থা যাতে ভাল হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে; রত্নাকে দেখাতে হবে খাতাখানা। অমরেশবাবুর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। খাতাখানা রেখে দিয়ে আর একটা শেল্‌ফের দিকে এগিয়ে গেল ডানা। চোখে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী রয়েছে। একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল, হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল 'কর্মযোগ'। তাতেই মগ্ন হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে যতটা পড়া সম্ভব ততটা প'ড়ে শেষকালে একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়তে লাগল সে। মনে হ'ল, তার প্রশ্নের উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গেছেন বহুকাল আগে। উৎসাহিত হয়ে উঠল। উৎসাহের আর একটা হেতুও ছিল। এই প্রবন্ধটা পড়বার পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করাটা সহজ হয়ে মনে হ'ল। উনিও আলাপের সূত্র পাবেন কিছু। 'কর্মযোগ' পড়তে পড়তে সন্ন্যাসীর কথাটাই ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগল। উনি নিশ্চয় পড়েছেন এসব, ওঁর নাম কি, বাড়ি কোথা? বাধা পড়ল একটু পরে। আনন্দবাবুর চাকর একটি চিঠি নিয়ে হাজির হ'ল। চিঠির গোড়াতেই কবিতা একটা।—

'আমি আছি,' 'আমি নেই' এ দুটোই সত্য,
'ছিলাম,' 'ছিলাম না' তা-ও নয় মিথ্যে,
'থাকব না,' 'থাকব' দুইই খাঁটি তথ্য—
সব জানি তবু হায় সুখ নেই চিত্তে।
কোথায় যে আছে সুখ কিসে যে ভরিবে বুক
তারই লাগি অহরহ হয়ে আছি উন্মুখ,
চিরে তর্কের চুল গাছে কি ফুটেছে ফুল,
প্ল্যান ক'রে হয়েছে কি মহাসাগরের কূল,
মোদের জীবন তবে অপূর্ণ কেন রবে
দর্শন-মন্থনে সুখ কে পেয়েছে কবে!
যাহাতে ভরিবে বুক কোথায় সে চিরসুখ
যেখানেই থাক্ না সে নিত্যে অনিত্যে
তাহারই ঠিকানা চাই সুখ নেই চিত্তে।

উল্লিখিত কবিতাটি প'ড়ে তোমার যদি মনে হয়, আমি দর্শনশাস্ত্রকে বিদ্রূপ করেছি, তা হ'লে মারাত্মক ভুল হবে তোমার। দর্শন নয়, অদর্শনই আমার ক্ষোভের কারণ। যিনি আমার আসল মনিব তিনি এসেছেন, সুতরাং আপিস কামাই করা সম্ভব হচ্ছে না। ভাবছি,

ছুটির ক্ষেত্রটাকে কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলে কেমন হয়? অর্থাৎ গৃহিণীর সঙ্গে তোমার যদি আলাপ করিয়ে দিই, তা হ'লে সমস্যার সমাধান হবে কি? এ বিষয়ে তোমার যদি অমত না থাকে, তা হ'লে আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে যেয়ো। যদি অমত থাকে, জানিয়ে দিও সেটা। অমরেশবাবুর কাছারির অনেক পুরনো দলিলের পদোদ্ধার করছি। অর্থাৎ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র করছি একটা। তুমি যদি একটু সাহায্য কর, প্রয়োজনীয় কর্তব্যটা মনোরমও হয়ে উঠবে। সন্ধ্যার সময় আসবে কি না এক লাইন লিখে জানিও। ইতি

আনন্দমোহন

ডানা ভুরু কুঁচকে ভাবলে একটু স্মিতমুখে, তারপর এক টুকরো কাগজে লিখে দিলে—যাব নিশ্চয়ই; আমি নিরামিষ খাই সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছি।

[ক্রমশ]

"বনফুল"

প্রসঙ্গ কথা

চলছে

জীবনশিল্প

শিল্পসাধনা ও জীবনসাধনা পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু যদি কখনও এই দুই আদর্শের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তা হ'লে কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দান করব? শিল্প বড়, না, জীবন বড়? প্রবণতাভেদে এ প্রশ্নের উত্তরে মতবৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, শিল্পপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমরা জীবনের অনুকূলে রায় দেব। জীবন শিল্পের চাইতে অনেক—অনেক বড়। কেন, সে কথা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

জীবন ও শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব-লঘুত্বের প্রশ্নে প্রথমেই যে কথাটি মনে পড়ে তা হচ্ছে, জীবনের পরিধি শিল্পের পরিধির তুলনায় অনেকগুণ বিস্তৃততর। এটি পরিমাণগত বিচার, তবে এরও সার্থকতা আছে।

জীবনের বহু বিচিত্র দিক, পক্ষান্তরে শিল্প জীবনের একটি দিক মাত্র। জীবনের পরিকল্পনার মধ্যে শিল্পকে অনায়াসে ধরানো যায়, কিন্তু জীবনকে শিল্পের বেড়ের মধ্যে ধরাতে গেলে শিল্পের অপ্রতুলতা অচিরাৎ প্রকট হয়ে উঠবে।

এ রকম ঘটবার কারণ এই যে, শিল্পসাধনা মূলত সৌন্দর্যের সাধনা। কিন্তু জীবনসাধনার মধ্যে নীতি জ্ঞান ধর্ম কর্ম সৌন্দর্য সবই বিধৃত রয়েছে। বহু বিচিত্র প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টার নামই জীবনসাধনা। জীবনে যিনি বড় হতে চান তাঁকে শুধু সৌন্দর্য নিয়ে প'ড়ে থাকলে চলে না, তাঁর জীবন নীতি বুদ্ধি ধর্ম এবং কর্মাদর্শের দ্বারাও বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া দরকার। শিল্পীর কর্মপ্রেমিক না হ'লেও চলে—বরং অনেক ক্ষেত্রে কর্ম শিল্পী-কবি-ভাবুকের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে এবং সে কারণ তাঁদের সাধনায় বিঘ্ন জন্মায়—কিন্তু জীবন-সাধকের পক্ষে কর্মিষ্ঠ না হ'লেই নয়। কর্মে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তি পাকা হয় না, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। কর্মশূন্য জীবন জীবন্মৃত অবস্থার দ্যোতক।

নীতি ধর্ম জ্ঞান এ সকল বিষয়েও শিল্পের অপূর্ণতা প্রকট। শিল্প-সাধনার তলায় তলায় নীতিজ্ঞান অনুস্যূত থাকলেও শিল্পচর্চার সঙ্গে নীতিচর্চার যোগ আবশ্যিক নয়। বরং সমালোচকেরা সচরাচর নীতিকে সৌন্দর্যসৃষ্টির পরিপন্থী ব'লে মনে করেন। সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার কলায় নীতিজ্ঞানের অতিরিক্ত প্রাধান্যে রসিকচিত্ত পীড়িত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির অনবদ্য নিদর্শন, সেই তুলনায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কিংবা 'বিষবৃক্ষ' নিম্নস্তরের শিল্পসৃষ্টি এই কারণে যে, অত্যুচ্চারিত নীতিকথার রূঢ় হস্তাবলেপে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সৌন্দর্য কতকাংশে মলিন হয়ে পড়েছে। সাহিত্যের সঙ্গে নীতিবাদের সম্পর্ক তবু বরং কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার ক'রে নেওয়া চলে, কিন্তু সঙ্গীত প্রভৃতি বিমূর্ত (abstract) শিল্পকলার সঙ্গে নীতির সম্পর্ক একেবারে নেই। সঙ্গীতের মূল কথা হ'ল—রস; সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া সঙ্গীতের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। কোন রন্ধ্র পথেই নীতি এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না।

কিন্তু নীতিবোধশূন্য জীবন অর্থহীন। ন্যায়-অন্যায়ের বোধ, পাপ-পুণ্যের বোধ জীবনের মর্মমূলে নিহিত। কোন কোন দার্শনিক—যেমন কাণ্ট—নীতিজ্ঞানকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতির মর্যাদা দিয়েছেন। কাণ্টের চক্ষে নীতি ধর্মেরও উৎসস্থল। নীতিকে ধর্মের কেন্দ্রমূলে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি ধর্ম থেকে ভাবালুতাকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। নীতির মধ্যে একটি সুনিশ্চিত ঔচিত্যের বোধ আছে, এই ঔচিত্যই মানুষকে ফলপ্রত্যাশাবিহীন কর্তব্যকর্মে প্রণোদিত করে। কর্তব্যনিষ্ঠায় জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা। প্রাচ্যের দুই শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বুদ্ধ ও কনফুসিয়াস্—তাঁরাও জীবনের সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে নীতিবোধকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করেছেন। নীতিহীন জীবন কর্ণধারহীন তরণীর মত সতত টলমল, সুতরাং বিনাশধর্মী।

ধর্মের সঙ্গে শিল্পের যোগ থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে; কিন্তু ধর্মবিরহিত জীবন কল্পনা করা যায় না। এক সময়ে ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নিগূঢ় ছিল; প্রত্যেক দেশের প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সেই সেই দেশের ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে সাহিত্যের রূপ ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যের ইতিহাসকার লিখেছেন, "ধর্ম ভিন্ন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।"* কিন্তু এ কথা আধুনিক যুগের পূর্বে পর্যন্ত সত্য ছিল, আধুনিক যুগে এসে এ প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়েছে ব'লে মনে হয়। এখন আর ধর্ম শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে অপরিহার্য নয়। অন্তত, আনুষ্ঠানিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্মের বোধ থেকে যে সাহিত্য বহু দূরে চ'লে এসেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন অনেকাংশে ধর্মের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে রাজনীতি। মানুষের চিন্তায় রাজনীতির প্রভাব ক্রমবর্ধমান, সে-কারণ শিল্প-সাহিত্য আজ সুস্পষ্টরূপে রাজনীতির পরিধির অন্তর্গত। রাজনীতি যে পরিমাণে সাহিত্যে আসর জাঁকিয়ে বসেছে, ধর্ম সে পরিমাণ সাহিত্য থেকে অন্তর্ধান করেছে। স্পষ্টতই শিল্পরাজ্যে ধর্মের পূর্বতন মর্যাদা আর

* দীনেশচন্দ্র সেন: 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

নেই। এক-একটি ধর্মান্দোলনের দ্বারা সাহিত্যের গতি পূর্বে যে ভাবে নির্দিষ্ট হ'ত, এখন আর তেমন হয় না। ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত অন্যূন আট শত বৎসরের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস বিচিত্র ধর্মদ্বন্দ্বের এক অবিচ্ছিন্ন ইতিবৃত্ত; কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা-সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়। উনিশ শতকের শেষার্ধের বাঙালী মানসিকতায় জাতীয়তাবাদ ছিল প্রধান; সেইটেই এখন বিশ শতকের মধ্যভাগে আন্তর্জাতিকতায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। প্রতিষ্ঠানগত ধর্ম বা এক-প্রতিষ্ঠানগত ধর্মের সঙ্গে অন্য-প্রতিষ্ঠানগত ধর্মের ভেদ এখন আর সাহিত্যকে বিশেষ বিচলিত করে না। এ কথা সকল দেশের আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কেই অল্পবিস্তর প্রযোজ্য।

কিন্তু জীবন? ধর্মবোধহীন জীবনের কোনই অর্থ হয় না। ধর্মের ভিত্তি নীতি কিংবা ভক্তি, এ নিয়ে জ্ঞানীজনদের মধ্যে বিতর্ক চলতে পারে; কিন্তু এ কথা সর্ববাদিসম্মত যে, মানুষের জীবন কোন না কোন আকারে ধর্মবোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হওয়া চাই, নইলে জীবন লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে। ধর্মের আশ্রয়শূন্য জীবন বায়ুশূন্য হাউইয়ের মত অচিরাৎ চুপসিয়ে যেতে বাধ্য। বাহ্যদৃষ্টিতে আধুনিক কালের মানুষের জীবনযাপন-প্রণালীর মধ্যে গভীর ধর্মবোধের পোষকতার সন্ধান মেলে না; কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে যে, সমাজের ভাল-মন্দ আজও মুখ্যাংশে সহজাত ধর্মবোধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্মবোধ আমাদের স্বভাবে অন্তর্লীন হয়ে আছে। আধুনিকতাগর্বী মানুষ জীবন-পরিকল্পনা থেকে ধর্মকে ছাঁটতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, এক অনতিক্রম্য নিয়তির মত ধর্ম মানুষের জীবনের সঙ্গে লেপ্টে আছে। এ নিয়তি থেকে ভবিষ্যতের মানুষেরও নিষ্ক্রমণের উপায় নেই, কেন-না এইটেই মানুষের বিধিলিপি। সমাজে যাঁরা বড় হন, তাঁরা ধর্মের পথ অনুসরণ ক'রেই বড় হন; অধর্মাচারীরা যুগে যুগে অধঃপতনের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে—এই মানুষের অভিজ্ঞতা।

ধর্মের মূলাধার ঈশ্বর-বিশ্বাস। কিন্তু এখনকার কালের প্রগতিবাদী বিজ্ঞানসিদ্ধ মানুষের কানে নাকি 'ঈশ্বর' কথাটা সেকেলে শোনায়, তাই

মনে মনে স্বীকার ক'রে নিয়েও অনেকে তাকে বাইরে কবুল করতে চান না। বেশ, ঈশ্বরে যদি এতই আপত্তি, ঐহিক সংসারের পরিভাষা দিয়েই ধর্মকে বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধর্ম আসলে কি? সুগভীর মানবপ্রেম নয় কি? মানবপ্রেমের চর্চায় অহং-এর বিলুপ্তি ও পরার্থপরতার উন্মেষ। প্রেম প্রীতি স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা করুণা আত্মত্যাগ—এ সব হ'ল মানবপ্রেমের বহুবিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি প্রধান অভিব্যক্তি। এগুলির উপযোগিতা পূর্বে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। ধর্ম মানুষকে ঊর্ধ্বগামী করে। এ ঊর্ধ্বগামিতার প্রয়োজন কোন সময়েই ফুরোবে না। তা যদি হয়, ধর্ম বাদ দিয়ে জীবনগঠনের কল্পনা মূঢ়তা মাত্র। সত্যিকার জীবনসাধক নিশ্বাস-বায়ুর মতই নিজ জীবনে ধর্মের প্রয়োজন অনুভব করেন।

যদি বলেন, শিল্পই বা এই মানদণ্ডে কোন্ ধর্মবিহীন? তার উত্তরে বলব, প্রশ্নটি লাগসইও বটে, আবার লক্ষ্যভ্রষ্টও বটে। ধর্মের অর্থ যদি মানবতাবাদ হয়, তা হ'লে শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কে অস্বীকার করতে পারে? বরং এই অর্থে শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক দিন দিন বাড়ছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয় সমকালীন সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হ'ল মানবতাবাদ। রলাঁ-প্রমুখ এ যুগের কতিপয় শিল্পীপ্রধান 'Art for Art's sake'-তত্ত্ব বাতিল ক'রে 'Art for Humanity's sake'-তত্ত্ব প্রচার করেছেন। ইউরোপীয় বামপন্থী রাজনৈতিক ভাবাদর্শের খাতে প্রবাহিত উদার মানবতাবাদের স্রোত সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের তটে এসে আঘাত হানছে। আধুনিক সাহিত্যের রাজনৈতিক প্রবণতার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের পর্ব থেকে যাত্রারম্ভ ক'রে রাজনীতি তার অভিযান ক্রমেই প্রসারিত ক'রে চলেছে। মার্ক্সবাদ আধুনিক রাজনীতির একাংশ জুড়ে আছে। দলবিশেষের নিকট মার্ক্সবাদ ধর্মেরও বাড়া। এই দলের প্রচারিত সাহিত্যে মার্ক্সবাদের অনুকূলে যে উদ্যম পরিলক্ষিত হয়, তা মধ্যযুগের ধর্মযোদ্ধাদের উদ্যমকেও বুঝি লজ্জা দেয়। এই মানদণ্ডে শিল্প-সাহিত্য আজও ধর্মীয় উন্মাদনার লক্ষণমুক্ত হতে পারে নি, সে কথা সত্য।

কিন্তু আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি একটু অভিনিবেশ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা দেখতে পাব, এই যে মানবতাবাদ, এই যে মার্ক্সীয় চেতনা—এ সাহিত্যের বহিরঙ্গ মাত্র। মধ্যযুগের সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মানুভূতি যেরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল, ধর্মের স্থলাভিষিক্ত রাজনৈতিক চিন্তার আন্দোলনগুলি তেমন ক'রে বুঝি শিল্প-সাহিত্যকে কখনও কুক্ষিগত করতে পারবে না। বর্তমান শিল্প-সাহিত্যের উপর রাজনীতির সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একটা জায়গায় এসে এই প্রভাব-প্রক্রিয়া থেমে যেতে বাধ্য, তার কারণ ইতিমধ্যে নন্দনতত্ত্বের (Aesthetics) আদর্শের প্রসার ঘটেছে, শিল্পরচনাকে এখন রসোত্তীর্ণ হতে হ'লে উৎকর্ষের দুরূহ মান অতিক্রম করতে হয়। পূর্বে ধর্মীয় সাহিত্যের অধ্যায়ে রামায়ণ-মহাভারতের যে কোন প্রকারের অনুবাদই আমাদের দেশে সাহিত্য ব'লে গণ্য হয়ে এসেছে; বাংলা লৌকিক কাব্যে এক মনসাদেবীর উপাখ্যানেরই (পদ্মাপুরাণ) যে কত বিভিন্ন সংস্করণ আছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু এখন যুগধর্মের পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পীর উপর শিল্পের দাবি আজ অতি-প্রচণ্ড, ক্ষমাহীন। মানবতাবাদের লক্ষণাক্রান্ত হ'লেই সাহিত্য জাতে উঠল—এ রকম সুবিধা পাওয়ার উপায় আর নেই। নকল আর শৌখিন মজদুরির দ্বারা সাহিত্যের খ্যাতি কিছুকালের জন্য আত্মসাৎ করা যেতে পারে, কিন্তু সত্য মূল্য না দেওয়ার এই ফাঁকি সৌন্দর্য-বিচারের কঠিন পরীক্ষায় দু দিনেই ধরা প'ড়ে যেতে বাধ্য। আমরা শিল্পসংস্কৃতির পথে যত এগিয়ে চলেছি, শিল্পবিচারের মানদণ্ড তত কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। অব্যভিচারী সৌন্দর্যতত্ত্বের সূত্রের দ্বারা এক্ষণে শিল্প-সাহিত্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তেমন-তেমন ভাবে দেখলে শিল্পের স্বক্ষেত্র বলতে সৌন্দর্যায়ন ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতিই বুঝি আজ অঙ্গুলিনির্দেশ করা চলে না।

এর পর জ্ঞানের কথা। শিল্প জ্ঞানের দ্বারা সংচালিত হতে পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু জীবনে জ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য। শিল্পের লক্ষ্য সৌন্দর্যসন্ধান; জ্ঞানের লক্ষ্য সত্যসন্ধান। বাল্মীকি ব্যাস

কালিদাস শেক্সপীয়র গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কতিপয় মহাকবির মধ্যে সৌন্দর্য এবং জ্ঞান-সাধনা একীভূত হয়ে গেছে দেখতে পাই, কিন্তু এটি আমাদের উপরন্তু লাভ। সকল শিল্পীর পক্ষে এ কথা খাটে না। শিল্পের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগের দৃষ্টান্ত বিরল ও দীর্ঘছেদযুক্ত। এ যোগ বাস্তব, কিন্তু অবধারিত নয়। অধিকাংশ কাব্য নাটক উপন্যাস ছোটগল্প জ্ঞানবিযুক্ত হয়েও শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্যের দাবিতে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সাহিত্যের উপাদান জ্ঞানগর্ভ হ'লে ভাল কথা, না হ'লেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সৌন্দর্যের আদর্শ থেকে তার কোন মতেই ভ্রষ্ট হওয়া চলবে না। শিল্পের ভাববস্তু (content) এবং রূপকারুর (form) তুল্যমূল্যের প্রশ্নে রূপকারু ক্রমশ ভাববস্তুর উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে চলেছে। ভাব অপেক্ষা ভাবের বাস্তবায়িতকরণের (externalization) সমস্যা ক্রমেই শিল্পের প্রধান সমস্যা হয়ে উঠছে।

কিন্তু জীবনের ক্ষেত্র আলাদা। সেখানে জ্ঞানের দাবি অপ্রতিরোধ্য। জ্ঞানের দাবি অপ্রতিরোধ্য এই কারণে যে, জ্ঞান ছাড়া সত্য পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। জীবনের পথে চলতে গিয়ে কোন্ পথ গ্রহণীয়, কোন্ পথ বর্জনীয়; দুঃখ-কষ্ট জয় করার কী উপায়; সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হতে হ'লে আমাদের কী করা দরকার—এ-সব প্রশ্নের যথার্থ সমাধান একমাত্র জ্ঞানের আলোকেই হওয়া সম্ভব। নীতি বা ধর্মের বোধ মানুষের মধ্যে সহজাত, এই বোধ আছে ব'লেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। কিন্তু রিপু বা দুঃখ-জয়ের বাস্তব কৌশল উদ্ভাবনায় এই বোধ থাকাই বোধ করি যথেষ্ট নয়। তার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন। আমাদের ভারতীয় চিন্তায় যাকে প্রজ্ঞা বা বোধি বলে, তা জ্ঞানসাধনারই পরিণাম-ফল মাত্র। এই অবস্থা একবার আয়ত্ত হ'লে সুখদুঃখের বোধ সমান হয়ে দাঁড়ায়, মানুষের উপর রিপুর আর কোন প্রভাব খাটে না। সমদর্শিতা বা সমদৃষ্টিই হ'ল জ্ঞানসাধনার মূল কথা। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত জ্ঞানীর উদয় হয়েছে, তাঁরা মুখ্যত এই সম্যক্ ও সমদর্শিতারই চর্চা ক'রে গেছেন। জ্ঞান শুধু বিদ্যা বা অভিজ্ঞতার সংগ্রহ নয়; জ্ঞান হ'ল আচার, ব্যবহার-বিধি। বিনয়ের শিক্ষা, সদ্ধর্মের শিক্ষা, সংযমের

শিক্ষা আমরা জ্ঞানের দ্বারাই লাভ ক'রে থাকি। জ্ঞানচর্চার সঙ্গে জীবনচর্যার যোগ অতি ঘনিষ্ঠ।

জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের এই ঘনিষ্ঠতার কারণে জীবনসাধনায় জ্ঞানচর্চা একটি মস্ত বড় জায়গা জুড়ে আছে। শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার কলায় জ্ঞানের প্রয়োজন এমন অসংশয় ভাবে কখনও অনুভূত হয় না। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মচিন্তায় জীবনের সার্থকতার উপায় হিসাবে আত্মসমাহিত জ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ্ এবং বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হ'ল—জ্ঞান। সাংখ্য এবং বেদান্ত-দর্শনের উপলব্ধি মুখ্যত জ্ঞানেরই উপলব্ধি। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং পরবর্তী কালের দার্শনিকদের মধ্যে স্পিনোজা যে পথ বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন, সেও এই জ্ঞানের পথ। যাকে বলে understanding বা প্রদীপ্ত বুদ্ধি, সেই জ্ঞানালোকের পথেই তাঁরা জীবনের তাবৎ সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন এবং অপরকে খুঁজতে বলেছেন। যুক্তিজ্ঞানকে তাঁরা জীবনের একেবারে কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বাকি রইল সৌন্দর্য। জীবনে সৌন্দর্যের প্রয়োজন কে অস্বীকার করতে পারে? সৌন্দর্যের দাবি শিল্পের বেলায় যেমন ষোল-আনা সর্বগ্রাসী, জীবনের বেলায় তেমন না হতে পারে; কিন্তু এ কথা কোন-ক্রমে অস্বীকার করা যায় না যে, জীবনের রূপ মাধুর্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে, কমনীয় ক'রে তুলতে জীবনেও সৌন্দর্য-অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। সৌন্দর্যচর্চার একটি মস্ত লাভ এই যে, তা থেকে অফুরন্ত আনন্দ পাওয়া যায়। এ শুধু চক্ষুর বা শ্রবণের তৃপ্তিজনিত আনন্দ নয়, এর সঙ্গে হৃদয়ের ক্ষুধার নিবৃত্তির আনন্দও জড়ানো আছে। বিভিন্ন বস্তুর শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য-পূর্ণ বিন্যাসের মধ্যে যে ছন্দ বর্তমান, তা যেমন আমাদের আনন্দ দেয়, তেমনি হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের ঐক্যের অন্তর্নিহিত ছন্দও আমাদের মনকে আনন্দে পরিপ্লুত ক'রে তোলে। সৌন্দর্যের এক দিকে হ'ল রূপরস-গন্ধশব্দস্পর্শের আনন্দ, অন্য দিকে হৃদয়রঞ্জনী আনন্দ। অর্থাৎ এক দিকে প্রকৃতি, অন্য দিকে প্রেম। এ দুয়ে মিলে সৌন্দর্যের বৃত্ত পূর্ণ।

শোভনতা-বর্জিত জীবন যেমন অর্থহীন, তেমনি প্রেমহীন জীবনও অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের ভিতরের কথাটা এই যে, সৌন্দর্য ও প্রেম-শূন্য জীবন যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত, সুতরাং ব্যর্থ। জীবনের মূলে ভালবাসারূপা যে হ্লাদিনী শক্তি আছে, নন্দিনী তারই প্রতীক। এই যদি জীবন সম্পর্কে অন্যতম সার কথা হয়, তা হ'লে কিসের জোরে আমরা জীবন-পরিকল্পনা থেকে সৌন্দর্যকে বাদ দেব? শিল্পের প্রধানতম—নাস্তরত একতম—আশ্রয় সৌন্দর্য; তা ব'লে সেটি শিল্পেরই একচেটিয়া বস্তু নয়। জীবনেও তার প্রয়োজন কিছু কম নয়। অন্য কতিপয় প্রবণতার সঙ্গে সৌন্দর্যের প্রবণতাও জীবনের মূলে প্রাণরস জোগাচ্ছে। সৌন্দর্যের ক্ষুধা শুধু শিল্পীস্বভাবে নয়, মনুষ্যস্বভাবে চিরন্তন।

তা ছাড়া, আর কোন কারণে যদি না-ও হয়, নিছক সুরুচির জন্যই জীবনের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য-সাধনার প্রয়োজন আছে। যাকে আমরা শালীনতা বলি, শোভনতা বলি, পরিমার্জিত আচরণ বলি, তার উদ্ভব সৌন্দর্যবোধ থেকে। আমাদের মধ্যে ছন্দ এবং পারিপাট্যের ধারণা সহজাত ব'লেই বাক্যে আচরণে চিন্তায় কেউ শোভনতার গণ্ডী অতিক্রম করলে আমাদের মনের তার কেটে যায়। বেশে ভূষায় গৃহসজ্জায় পরিবেশ-রচনায় সর্বত্রই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে রুচিনিষ্ঠা প্রত্যাশা করি। সর্বপ্রকার অভব্য আচরণ ও বিসদৃশ দৃশ্যে আমাদের যে চিত্তক্লেশ, তার মূলে নীতিবাদ অপেক্ষা সৌন্দর্যবোধের প্রভাব সমধিক সক্রিয় ব'লে মনে হয়।

কাজেই নীতি জ্ঞান ধর্ম কর্ম সৌন্দর্য—এ সবই সার্থক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। শিল্পের একটি মাত্র ফ্রন্ট—সৌন্দর্যায়নের ফ্রন্ট; পক্ষান্তরে জীবনকে একই কালে নানা ফ্রন্টে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। একটি বা দুটি ফ্রন্টের উপর মনোযোগ ন্যস্ত ক'রে অন্য ফ্রন্টগুলিকে আলগা দিলে সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার চেতনায় জীবন ভ'রে উঠতে পারে না। বেশির ভাগ মানুষই আমরা খণ্ডিত জীবন যাপন করি। প্রবণতাভেদে কেউ কর্মের উপর, কেউ জ্ঞানের উপর, কেউ ভক্তির বা নীতির উপর ঝোঁক দিই। অধিকতর শক্তিমান কারও কারও মধ্যে একাধিক প্রবণতার

সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। কিন্তু এর কোনটাই সামগ্রিক জীবনচর্যার আদর্শের কোঠায় পড়ে না। সত্যিকার জীবনসাধক তিনি, যিনি ওই সব কটি প্রবণতার মধ্যেই সামঞ্জস্যবিধানের সাধনায় নিরত। এ যে কী কঠিন সাধনা তা সহজেই অনুমান করা চলে। জীবনের যে-কোন একটি দিকে কাজ-চালানো-গোছের নৈপুণ্য অর্জন করাই অতি দুরূহ ব্যাপার, সে স্থলে এই সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের অভিযানের দুরূহতা কল্পনীয়। শিল্পের দৃষ্টি খণ্ডিত, পক্ষান্তরে অখণ্ডত্বই বিচিত্রপথগামী জীবনসাধনার মর্মবস্তু। শিল্পসাধনার তুলনায় এ সাধনা অনেক বেশি কঠিন।

জীবন-সাধনার দুরূহতার আরও একটি কারণ নির্ণয় করা চলে। প্রথমত, বিচিত্র পথে অভিযানের ক্ষমতাটাই অতিশয় বিরল ও অসাধারণ; তার উপর সেই অভিযান আরও কঠিন হয়, যদি পথগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধিতার ভাব নিহিত থাকে। মুশকিল হয়েছে এই যে, জ্ঞান কর্ম সৌন্দর্য নীতি এই সব বৃত্তি মানুষের জীবনে প্রায়শ পরস্পরবিরোধী প্রবণতার আকারে দেখা দেয়। এগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য টানো অতি কঠিন ব্যাপার। জীবনে জ্ঞানের আদর্শকে মর্যাদা দিতে গেলে কর্মাদর্শকে মর্যাদা দেওয়া হয় না, আবার সৌন্দর্যের পূজারী হতে গেলে প্রায়শ-সমাজের স্বীকৃত নীতিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। প্রবলনীতিজ্ঞানবিশিষ্ট হয়েও অন্তরে প্রবল সৌন্দর্যতৃষ্ণার তাড়না অনুভব করেন—এমন মানুষ সংসারে খুব বেশি চোখে পড়ে না। উল্লিখিত বৃত্তিগুলি প্রায়ই যেন একটি অন্যটির সঙ্গে প্রতিকূলতার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে চলতে ভালবাসে। একটির বিপরীত প্রান্তে প্রক্ষিপ্ত না হ'লে যেন অন্যটির স্ফূর্তি জাগে না। সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সৌন্দর্যনিষ্ঠার বিরোধে জীবনসাধকের চিত্ত সতত আলোড়িত। এই আলোড়নের ছাপ আমরা একাধিক সাধকের জীবনেতিহাসের মধ্যে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন-বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টাকে সব চাইতে কঠিন সাধনা বলেছেন এবং এই মানদণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসাবে নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন—এইটেই হচ্ছে সামগ্রিক জীবনচর্যার সার কথা। আজকালকার

মানুষ অধিকাংশই কম বেশি খণ্ডিত এই কারণে যে, সামগ্রিক জীবনচর্যার আদর্শ জগৎ-সংসার থেকে লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে। বিজ্ঞান এবং কারুবিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমরা অল্পবিস্তর স্পেশালাইজেশনের ভক্ত হয়ে উঠেছি। জীবনকে অখণ্ডভাবে বিচার ও গ্রহণের কথা কেউ আর আজকাল বলে না। বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধান থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষুদে-মাপের শিক্ষাব্রতী সবাই স্পেশালাইজেশনের খুঁরে মাথা মুড়োবার জন্য ব্যস্ত। যে শিক্ষায় জীবনের অখণ্ডত্বের ধারণা হয়, যে দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে সমন্বয়ের ইঙ্গিত বহন করে, সে শিক্ষার আদর্শ এক্ষণে সর্বসাধারণের নাগালের বহির্ভূত উচ্চ শিকায় সংরক্ষিত। স্পেশালাইজেশন-এর আদর্শের অপূর্ণতা তার নামের মধ্যেই নিহিত। স্পেশালাইজেশন মানেই হ'ল—বিশেষীকৃত অর্থাৎ খণ্ডিত বিষয়ের অন্বেষণ।

উক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী শিল্পও এক ধরনের স্পেশালাইজেশন। শিল্পে গভীর অভিনিবেশ গভীর প্রযত্নের প্রয়োজন হয়, তবে সবটুকুই একবর্ত্মাভিমুখী। মুখ্যাংশে সৌন্দর্যের খাত বেয়ে শিল্পীর অভিনিবেশের বিস্তার। এমন কথা কখনই বলব না যে, শিল্পে সাফল্য লাভ করতে হ'লে দুরূহ পরীক্ষার ক্লেশ সইতে হয় না—হয়; তবে অখণ্ড জীবনসাধনায় ব্রতী কোন ব্যক্তির প্রচণ্ড দ্বন্দ্বসংঘাতের ক্লেশের সঙ্গে সে ক্লেশের তুলনা হয় না। কেউ কেউ বলবেন, শিল্পীর কাজ সৃষ্টিমূলক; অখণ্ড জীবনসাধনার মধ্যে পরিমাণ বা ব্যাপ্তিগত উৎকর্ষ থাকলেও গুণগত উৎকর্ষের বিচারে শিল্পের দাবিই বোধ হয় অগ্রগণ্য। এ যুক্তিও টেকে না। কেন-না, প্রকৃত জীবনসাধকের হাতে জীবনটাই একটা মস্ত বড় রচনা। জীবন-সাধক বিচিত্রপথগামী জীবনযাপনের দ্বারা জীবনকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করেন। তিনি জীবনকে শিল্পরূপ দেন। বোধ করি খতিয়ে দেখতে গেলে জীবনশিল্প সব শিল্পের সেরা। জীবনশিল্প সংরচনের মধ্যে যে মহত্ত্ব বিরাটত্ব সৌন্দর্যোৎকর্ষ প্রকটিত, লৌকিক শিল্পগুলিতে তার শতাংশের একাংশও প্রকটিত হয় কিনা সন্দেহ।

নারায়ণ চৌধুরী

পাগল

তখন সবে কলেজ থেকে বার হয়েছি। কি খেয়াল হ'ল, গেলাম পাগলা-গারদ দেখতে। কলকাতার সীমান্তে অবস্থিত 'চিন্ময়ী উন্মাদ-আশ্রম।' আগে অবশ্য ছাপ-মারা পাগল দেখতে যাই নি, যা দেখেছি চেনাশোনা লোকের মধ্যেই। তাই যথেষ্ট কৌতূহল নিয়ে নিখিলের সঙ্গে উন্মাদ-আশ্রমে হাজির হলাম। নিখিল আমার চেয়ে বয়সে বড় হ'লেও সহপাঠী ছিল। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে সে পড়াশুনা করেছিল যথেষ্ট। পাগলা-গারদ দেখে বেড়ানো তার ছিল নেশা, বলতে গেলে সে-ই আমাকে এখানে টেনে এনেছিল।

নিখিল আগে এখানে এসেছিল, তাই উন্মাদ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হালদার আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, অনেকদিন বাদে এলে নিখিল।

ব্যস্ত ছিলাম। এটি আমার বন্ধু।

ডাক্তার হালদারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। কথায় কথায় হেসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বন্ধুটির ফ্রয়েড-বাতিক এখনও আছে, না, গেছে?

হাসলাম, ও তো সারাদিনই তাই পড়ছে আর আমাদের বোঝাচ্ছে।

নিখিল বলে, একদিন বুঝবেন, সাইকো-অ্যানালিসিস বাদ দিয়ে পাগলের চিকিৎসা মোটেই হতে পারে না।

ডাক্তার হালদার হো-হো ক'রে হেসে ওঠেন, ওসব চিকিৎসা হ'ল বড়লোকদের জন্যে, আমাদের গরীব দেশে ওর কোন মূল্য নেই। যে দেশে রাস্তায় ঘাটে পাগলরা প'ড়ে থাকে, তাদের নিজ্ঞান মন আর সজ্ঞান মন খুঁজে বার করার চেয়ে দু বেলা দু-মুঠো ভাল খেতে দিতে পারলে, একটা বিছানায় শুতে দিতে পারলে তাদের যথেষ্ট উপকার হবে।

নিখিল বাধা দেয়, সেটা তো চিকিৎসা নয়।

ডাক্তার হালদার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, সেইটাই চিকিৎসা। আজ লাইনে আমি কুড়ি বছর আছি। এই যে হাসপাতাল দেখছেন, এর এক একখানা ক'রে ইঁট আমায় গাঁথতে হয়েছে, কেউ সাহায্য করে নি,—এ হতচ্ছাড়া দেশে কেউ সাহায্য করেও না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এই সব লক্ষ্মীছাড়া পাগলদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কে?

কি মনে হ'ল বললাম, কেন, আপনি।

ডাক্তার ম্লান হাসলেন, নিখিল বলে নি বুঝি! এ লাইনে আমিও হয় তো আসতাম না, যদি না আমার স্ত্রী পাগল হয়ে যেতেন। সব কিছু ছেড়ে তাঁকে সারাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম। পরে মনে হ'ল, আমার স্ত্রীর মত কত হতভাগ্য নারী পুরুষ এ দেশে আছে, তাদেরও সারাবার চেষ্টা করি না কেন? সেই থেকে শুরু হ'ল আমার পাগলা-গারদের চিকিৎসা, এই কুড়ি বছরের সাধনা।

আপনার স্ত্রী সেরে উঠেছেন তো?

পুরো সারাতে আর কই পারলাম, মাঝে মাঝে গোলমাল হয়।

এ বিষয়ে আর কথা হ'ল না। নিখিলের তাড়া ছিল, আমরা পাগলা-গারদ দেখতে গেলাম। খুব বড় নয়, মাঝারি আকৃতির একতলা বাড়ি, মাঝখান দিয়ে চলাফেরার রাস্তা। দু পাশে ঘর, লোহার ফটক দেওয়া। আমাদের ঢুকতে দেখে পাগলরা অনেকেই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বেশির ভাগ চুপ ক'রে থাকে; কয়েকজন চেঁচায়। তাদের মধ্যে একজন ডাক্তারের হাত ধ'রে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে, আমি একদম ভাল হয়ে গেছি ডাক্তারবাবু, আমার কোন রোগ নেই। এবার আমায় ছেড়ে দিন।

শিগগির আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

আমাকে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিন, নয়তো তাকেই এখানে নিয়ে আসুন।

ডাক্তার তাকে আশ্বস্ত ক'রে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে চলেন। বলেন, এই হ'ল এর পাগলামি, সারাক্ষণ বউয়ের কাছে থাকতে চায়। কিছুতেই স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না। এই ধরনের কেস আমরা পৃথক ক'রে একটা কামরায় রাখি।

সিঙ্গল বেড কটা আছে?

চারটে। একটু ভাল হ'লে দুজনকে এক ঘরে রাখা হয়; আরও ভাল হয়ে উঠলে সাত-আটজন এক ঘরে থাকে। সঙ্গ সকলেই চায় বুঝলেন না, নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা বলে।

এ বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে আমার ভাল লাগে না। এ মানুষগুলোকে মানুষ ব'লে চেনা যায় না। বড় করুণ এদের মুখ। মাঠে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ডাক্তার কয়েকটা ছোট ছোট গাছ দেখিয়ে বলেন, ওই হচ্ছে আমাদের ফেমাস চন্দ্রা বা সর্পগন্ধা। এই গাছের শিকড় থেকে পাউডার তৈরি করে এদের খাওয়ানো হয়, খুব উপকার পাওয়া গেছে।

নিখিল বলে, কদিন আগে কাগজে পড়ছিলাম বটে। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোন রকম শক-থেরাপি করেন না।

না, ভয় দেখিয়ে পাগলামি সারানো খুব উপকারী নয়। কত সময় অন্য রোগ এসে পড়ে। জানেন, আমাদের সাবেক কালে শক-থেরাপি ছিল?

কি রকম?

রোগীর কাছে পোষা হাতী এনে ভয় দেখানো হ'ত, হাতী যেন তাকে পিষে মারতে যাচ্ছে। আজকাল যা ইউরোপে ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে করার চেষ্টা করছে আমাদের দেশে তা ওই ভাবে করত।

ডাক্তার হালদারের কথাবার্তায় আমি সত্যি খুশি হয়েছিলাম। ভদ্রলোকের মধ্যে প্রাণ আছে। বললাম, চব্বিশঘণ্টা এই পাগলের মধ্যে থাকেন কি ক'রে? আমি তো এই ক ঘণ্টায় হাঁপিয়ে উঠেছি।

এ আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে আপনারা এলে কথা ব'লে বাঁচি।

সেই দিনই কথা দিয়ে এলাম, সময় পেলে আসব। আমি এখান থেকে খুব দূরে থাকি না।

প্রায় মাসখানেক বাদে সকালের দিকে ডাক্তার হালদারের কাছে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক শুধু-গায়ে লুঙ্গি প'রে ব'সে বই পড়ছিলেন। হেসে বললাম, আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।

খুব ভাল করেছেন। ভদ্রলোক রসিকতা ক'রে বললেন, কিন্তু একটা অনুরোধ, পাগলা-গারদের কথা তুলবেন না। ফুটবলম্যাচ, রাজনীতি, আর যা খুশি আমি আলোচনা করতে রাজী আছি।

নানা রকম কথা চলল, দেখলাম ডাক্তার হালদার বেশ সব বিষয়েই গল্প করতে পারেন। প্রশংসা ক'রে বললাম, আপনার সঙ্গে কথা ব'লে সুখ আছে।

ডাক্তার প্রাণ খুলে হেসে বললেন, অথচ বনবাসে প'ড়ে আছি মুশাই, দুটো কথা বলার লোক নেই।

আপনার বাড়ির সকলে এখানেই থাকেন তো?

হ্যাঁ, তবে আমাদের সংসার খুব ছোট। আমি, আমার স্ত্রী—তাঁর কথা তো আগেই বলেছি, একটি ছেলে, এম. এ. পড়ছে আর দুটি মেয়ে। বড়টির বিয়ে হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেটিকে ডাক্তারি পড়ালেন না কেন, আপনাকে সাহায্য করতে পারত।

মানুষ যা চায় ঈশ্বর তা চান না—এই তো চিরকেলে নিয়ম। আমি নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতাম, তার সঙ্গে মোটামুটি কবিরাজী বিদ্যা শিখেছিলাম। এই পাগলের লাইনে এসে সব রকম শিখতে হয়েছে। নিজের চেষ্টায় উন্মাদ-আশ্রমকে দাঁড় করিয়েছি। ভেবেছিলাম, ছেলে ভাল ডাক্তার হয়ে বেরুবে, দরকার হ'লে বিলেত আমেরিকা পাঠিয়ে দেব এ বিষয়ে পড়তে। ইচ্ছে ছিল, আমার মত সেও এই হতভাগ্যদের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করবে। কিন্তু হ'ল না। ভগবান জানেন এম. এ. পাস ক'রে ও কি করবে।

শেষের দিকে কথাগুলো বড় করুণ শোনায়। ছেলের ব্যবহারে তিনি যে যথেষ্ট ব্যথা পেয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বললাম, কোন ডাক্তার জামাই পেলেন না?

না, বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে অনেক দিন। তখন আমার কিছুই বিশেষ ছিল না। জামাই ইস্কুল-মাস্টার।

তাতে কি হয়েছে, ছোট জামাই ডাক্তার খুঁজুন।

ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, সে আশা নেই। আমার ছোট মেয়ে যখন জন্মায়, ওর মা সুস্থ ছিল না। আমি জানি, ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তা ছাড়া ওর স্বাস্থ্যও ভাল নয়।

ডাক্তারের জন্ত সহানুভূতিতে আমার মন ভ'রে যায়, ভদ্রলোক এতকাল একলা যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু আর কি পারবেন ?

সেই দিনই ওঁর ছেলে বিভাসের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। সুদর্শন যুবক, বয়স বছর বাইশ হবে। ডাক্তার হালদার ভিতরে গিয়েছিলেন, আমি সেই অবসরে বিভাসের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করি। কিন্তু বিভাস মোটেই মিশুক লোক নয়, কথা বলতে এতটুকু ভালবাসে না। ধুতির ওপর গেঞ্জি প'রে বাইরে এসেছিল ডাক্তার হালদারকে ডাকতে, উনিই আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। বাংলায় এম. এ. পড়ে জেনে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা শুরু করি।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য আপনার কেমন লাগে ?

বিভাস মুখ কুঁচকে উত্তর দেয়, একরকম।

চর্যাপদ, মহাজন-পদাবলী ?

আমার ভাল লাগে না।

আশ্চর্য হলাম। সাহিত্যের ছাত্র, অথচ এসব ভালবাসে না। মুখ ফসকে জিজ্ঞেস করলাম, তবে বাংলা নিলেন কেন এম. এ.তে ?

বিভাস অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দেয়, কিছু তো পড়তে হবে।

ডাক্তারি কেন পড়লেন না ?

ডাক্তারি ! কি, পাগলের ডাক্তারি ? একটু থেমে বিভাস জিজ্ঞেস করে, বাবা বলছিলেন বুঝি ?

ঠিক বলেন নি, তবে আপনি ডাক্তার হ'লে—

অনেক শুনেছি, ওসব কথা থাক্। বিভাস বিড়বিড় ক'রে বলে, এরা আমায় পাগল ক'রে দেবে। পাগল !

আর কোন রকম কথা না ব'লে বিভাস ঘরের মধ্যে চ'লে গেল।

এর পরও দু-তিন দিন আমি ডাক্তার হালদারের বাড়ি গেছি। আমাকে পেলে উনি সত্যিই খুশি হন, কথা ব'লে বাঁচেন। পাগল রুগীদের জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। ওঁর ছোট মেয়ের সঙ্গেও একদিন দেখা হয়েছিল। বছর তেরো বয়স, মুখশ্রী

মন্দ নয়, কিন্তু বিকলাঙ্গ। পা দুটো ভীষণ বাঁকা, ভাল ক'রে হাঁটতে পারে না। ওরই সম্বন্ধে ডাক্তার বলেছিলেন, শান্তাকে আমি সব চেয়ে ভালবাসি, অথচ কি গ্রহের ফের বলুন তো?

বেশ চালাক মনে হ'ল, কথাবার্তা তো ভালই বলে।

বোঝে সব, বাড়িতে পড়াশুনোও করেছে। কিন্তু ওর মাথা ঠিক খারাপ হয়ে যাবে। ডাক্তারের চোখ সজল হয়ে ওঠে।

যে কদিন উন্মাদ-আশ্রমে এসেছি, রোজই প্রায় বিভাসের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু একদিনও সে ভাল ক'রে আমার সঙ্গে কথা বলে নি, সব সময় এড়িয়ে গেছে।

বিভাস সম্বন্ধে আশ্চর্য হওয়ার আরও বাকি ছিল। কয়েকদিন বাদে এক সিনেমা-হলে তার সঙ্গে দেখা। কি ছবি দেখতে গিয়েছিলাম মনে নেই, ইণ্টারভ্যালে আলো জ্বলতে দেখি আমার তিন রো আগে বিভাস একটি মেয়েকে নিয়ে ব'সে আছে। সে আমাকে দেখতে না পেলেও আমি তাকে বরাবর লক্ষ্য করলাম। মেয়েটির সঙ্গে খুব সহজভাবে সে গল্প করছে। তাকে দেখলে চেনাই যায় না সেই গম্ভীর বিভাস ব'লে, যাকে দেখেছি ডাক্তার হালদারের বাড়িতে।

সিনেমা শেষ হবার পর বাইরে এসে দেখি, মেয়েটিকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে বিভাস বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে। আমি গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে বিভাস থতমত খেয়ে যায়, নিজে থেকেই কৈফিয়তের সুরে বলে, মেয়েটি আমাদের সঙ্গে এম. এ. পড়ে।

বললাম, তাই নাকি। চলুন, কোথাও চা খাওয়া যাক।

না, থাক্।

কেন, চলুন না।

একরকম জোর ক'রেই বিভাসকে নিয়ে রেস্তরাঁয় ঢুকলাম। বিলিতী রেস্তরাঁ, ঠাণ্ডা ঘর, চা আর স্যাণ্ডউইচ আনতে বললাম। ছবি সম্বন্ধে দু-একটা টুকরো কথা হ'ল। বিভাস বললে, এ ধরনের হাসির বই দেখতে আমার ভাল লাগে।

আপনাকে দেখলে কিন্তু মনে হয় না, যে রকম গম্ভীর মানুষ।

গম্ভীর! না, গম্ভীর আমি নই। ওই বাড়িতে থাকলে আমি ওরকম হয়ে যাই।

কেন?

কি জানি! আমার কি মনে হয় জানেন?

কি?

আমিও না পাগল হয়ে যাই।

কেন?

জানেন তো আমার মা পাগল?

তাতে কি হয়েছে?

যার মা পাগল, তার তো পাগল হবার সম্ভাবনা থাকবেই।

আপনি এত ভবিষ্যতের কথা ভেবে মাথা খারাপ করেন কেন?

বিভাস চুপ ক'রে যায়, চোখে সেই শূন্য দৃষ্টি। চা খেতে খেতে এক সময় বলে, বাবার কাছে চিত্রার কথা বলবেন না কিন্তু।

কে চিত্রা?

ওই মেয়েটি, যার সঙ্গে ছবি দেখছিলাম।

না না, আমি বলব কেন?

যদি বাবা কিছু সন্দেহ করেন, তাই—

সেদিনও আমি বিভাসকে বুঝতে পারি নি, বড় অদ্ভুত লেগেছিল।

এরও দিন পনেরো বাদে এক রবিবার সকালে আমি ডাক্তার হালদারের বাড়িতে যাই। শান্তা বাইরের ঘরে কোচের ওপর ব'সে ছিল। বললে, বাবা বাড়ি নেই।

কখন ফিরবেন?

আধ ঘণ্টার মধ্যেই।

আমি তা হ'লে একটু অপেক্ষা করি। দাদা নেই?

না।

আমি ঢুকতেই এক ভদ্রমহিলা উঠে ভেতরে চ'লে গেলেন। বয়স হ'লেও বোঝা যায় এক কালে তিনি সুন্দরী ছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, উনি কে ?

মা।

এখন ভাল আছেন ?

এমনিতে তো ভালই থাকেন, মাঝে মাঝে চিৎকার, চেঁচামেচি করেন। সেই সময় মাকে আলাদা ক'রে রাখা হয়।

তখন কোথায় থাকেন ?

লোহার-দরজা-দেওয়া একটা ঘর আছে দোতলায়।

সে ঘরে তোমরা যাও না ?

না, শুধু বাবা যান।

তখন ভয় করে ?

শান্তার চোখ জলে ভ'রে আসে, বলে, মা আমাদের খুব ভালবাসেন।

এ কথার মধ্যেই আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলাম।

কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তার হালদার ফিরলেন। আমাকে দেখেই বললেন, চলুন, হাসপাতালটা ঘুরে আসি, দেখি রোগীরা কেমন আছে। সকালে যাওয়া হয় নি।

দুজনে এসে গারদের ভেতর ঢুকলাম। একটা ঘরে দেখলাম, একজন রোগী ধ্যান করছে, মুখময় দাড়ি-গোঁফ।

জিজ্ঞেস করলাম, নতুন এসেছে বুঝি ?

হ্যাঁ, এক সপ্তাহ। মেলানকোলিয়ায় ভুগছে, সারাক্ষণ চুপচাপ থাকে। এদের সারানো বড় শক্ত।

কেন ?

এরা কিছু বলতে চায় না। দুঃখটা মনে পুষে রাখে। এই ভদ্রলোক পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি করতেন, হঠাৎ একদিন মৌনী হলেন। সেই থেকে কথা বলেন না। এখানে এসে কথা বলতে শুরু করলেন বটে, কিন্তু খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিলেন। এসব কেস সম্পূর্ণ সারানো বড় শক্ত।

তা হ'লে আর এখানে এনে লাভ কি ?

লাভ আছে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখলে অনেকটা উপকার হয়।

এমন সময় পাশের ঘর থেকে একটি রুগী চিৎকার শুরু করে—আমাকে ছেড়ে দাও, বাড়ি যেতে দাও। এখানে আমি বাঁচব না।

কাছে গিয়ে দেখলাম সেই লোকটি, প্রথম দিন যে স্ত্রীর কাছে যেতে চাইছিল। ডাক্তার বললেন, এ লোকটা সেরে যাবে। চেঁচামেচি করছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মনের দরজাও খুলে যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, এসব রুগী সারতে কতদিন লাগে?

প্রায় তিন মাস।

সব রোগী দেখে ডাক্তার যখন বেরিয়ে এলেন, তখনও সেই পাগলটি চিৎকার করছে—আমাকে ছেড়ে দাও, বাড়ি যেতে দাও। এখানে আমি বাঁচব না।

ডাক্তার ধমকে উঠলেন, চুপ করুন, চেঁচাবেন না।

পাগল কি উত্তর দেয় শোনা যায় না। আমরা বাড়ির দিকে ফিরছি। জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের আয়ুর্বেদে কি পাগলামির অনেক রকম ওষুধ আছে?

আছে বইকি। এই ধরুন না মুষ্টিযোগ। যে চড়াই পাখির ডানা ওঠে নি তাকে বেটে দুধে মেড়ে খেলে খুব উপকার হয়। আমি এখানে ব্যবহার ক'রে দেখেছি।

কথা হয়তো চলত, শান্তার চিৎকারে তা থেমে যায়।

বাবা শিগগির এস, মা কি রকম করছেন!

শুনেই ডাক্তার উদ্বিগ্নমুখে ছুটে যেতে যেতে বলেন, আবার বোধ হয় শরীর খারাপ হ'ল।

আমি পেছু পেছু গেলাম। শুনতে পেলাম, বাড়ির ভেতর থেকে শান্তার মা চিৎকার করছেন। ডাক্তার তাঁকে ব'কে ধমকে কোন রকমে ওপরে নিয়ে গেলেন। শান্তা চুপ ক'রে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ মার শরীর খারাপ হ'ল কেন?

ওই রকম হয়। শান্তা আমার দিকে না তাকিয়ে বলে, ওই যে পাগলটা চেঁচাচ্ছে, শুনতে শুনতে কেমন আনমনা হয়ে গেলেন।

সেদিন আর বেশিক্ষণ ওখানে ছিলাম না। চিন্তান্বিত মনে বাড়ি ফিরে এলাম, ডাক্তারের জন্য সত্যিই দুঃখ হচ্ছিল।

ঠিক এই সময় অনেকগুলো কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম, তাই যাব যাব ক'রেও ডাক্তার হালদারের সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। বাসে ক'রে একদিন ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে আসছিলাম। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে দেখলাম, রিকশায় বিভাস আর সেই সিনেমায় দেখা মেয়েটি। তাদের সঙ্গে রয়েছে কতকগুলো ঠোঙা, বোধ হয় বাজার ক'রে ফিরছে। বিভাসকে দেখে মনে হ'ল, উন্মাদ-আশ্রমের খবর নেওয়া উচিত, বিশেষ করে, বিভাসের মা পাগল হয়ে যাবার পর আর আমি যেতে পারি নি।

প্রথম অবসরেই ডাক্তার হালদারের বাড়ি গেলাম, উনি বাইরেই ব'সে ছিলেন। চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। চোখের তলায় কালি পড়েছে, চুলগুলো যেন খুব তাড়াতাড়ি সাদা হয়ে গেছে। এই কদিনেই প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? এভাবে বসে রয়েছেন?

ডাক্তার হালদার অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে গাঢ় গলায় বললেন, বিভাস চ'লে গেছে।

তার মানে?

সে বিয়ে করেছে।

বিয়ে?

হ্যাঁ; আমাদের ছেড়ে নিজের সংসার পেতেছে।

আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল?

না, সে কিছু জানানো দরকার মনে করে নি। আমি অন্য লোকের কাছে খবর পেলাম।

ডাক্তারের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, বলেন, আমি কিসের জন্যে এত সব করলাম! এই বাড়ি, এই হাসপাতাল কে দেখবে! স্ত্রী পাগল, মেয়েটা চিররুগ্ন, ছেলেটা চ'লে গেল! সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল—

বাধা দিয়ে বললাম, বিভাস যদি তার স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আসতে চায়, আপনি আপত্তি করবেন?

মোটেই না, বিভাস নিজেও তা ভাল ক'রে জানে।

ওর ঠিকানাটা আমায় দিন।

শুনেছি ও শ্বশুর-বাড়িতে থাকে।—ভদ্রলোক ঠিকানা লিখে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললেন, গিয়ে কোন ফল হবে না।

সেই দিনই বিকেলে বিভাসের শ্বশুর-বাড়ি গেলাম। দক্ষিণ কলকাতায় তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট, কড়া নাড়তে এক বিধবা ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, বিভাস বাড়ি আছে? বললেন, না, ওরা বেরিয়েছে। এখুনি আসবে।

অপেক্ষা করব, না, চ'লে যাব এই কথা ভাবছি, ভদ্রমহিলাই বললেন, ভেতরে এসে বসুন, আমি চিত্রার মা।

হাত তুলে নমস্কার করলাম। সামনের ঘরেই আমায় বসালেন। ছোট ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক দিকে ছোট খাট পাতা, তারই সামনে তিনখানা চেয়ার আর একটি ছোট টেবিল। বিছানা-ঢাকা, টেবিল-ঢাকা, জানলার পর্দা সবই এক রঙের। চারদিক দেখলেই মনে হয় গৃহস্বামিনীর রুচিবোধ আছে। কিছুক্ষণ বাদেই বিভাসেরা ফিরে এল।

আপনি!—আমাকে দেখে বিভাসের মুখ শুকিয়ে যায়।

হাসবার চেষ্টা করলাম, এই এলাম খবর নিতে।

বাবা পাঠিয়েছেন বুঝি?

না।

তবে?

কয়েকটা কথা বলতে চাই।

বিভাস একবার দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, এখানে নয়, অন্য কোথাও চলুন।

চলুন।

বিভাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাছেই এক সিনেমা-সংলগ্ন রেস্তরাঁয় ঢুকলাম। বললাম, চা দিতে বলি?

আপনি খান, আমি কিছু খাব না।

কি ভাবে কথা শুরু করব ভেবে নিয়ে বললাম, আপনাদের বাড়িতে আজ গিয়েছিলাম।

বিভাস চট ক'রে জিজ্ঞেস করলে, শান্তা কেমন আছে?

তার কিছু হয়েছে নাকি? ডাক্তার হালদার তো কিছু বললেন না।

উনি নিজে থেকে বলবেন না।

কথাটা হেঁয়ালীর মত লাগল। বললাম, আপনার বাবার চেহারা খুব খারাপ দেখলাম। কদিনেই বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। হবারই কথা, আপনি তাঁর একমাত্র ছেলে—পাগলা-গারদ, সংসার, সব কিছুর দায়িত্ব—

বিভাস বাধা দিয়ে বলে, ওসব কথা অনেক শুনেছি, আপনি কি বলতে চান তাই বলুন।

আপনি সস্ত্রীক বাড়ি ফিরে চলুন।

অসম্ভব।

কেন?

আমার স্ত্রীকে আমি পাগল করতে চাই না।

তার মানে?

ওইখানে থেকে আমার মা পাগল হয়ে গেছেন, আমার স্ত্রীও সহ্য করতে পারবে না।

ওদিকে আপনার বাবা যে পাগল হয়ে যাচ্ছেন, ওঁর ওপর—

বাবা! বিভাস ম্লান হাসে, বিড়বিড় ক'রে বলে, না, উনি পাগল হবেন না। এত দিনেও যখন হন নি—

পরিষ্কার ক'রে বললাম, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বিভাসবাবু।

বিভাস কি যেন ভাবছিল, চমক ভেঙে বললে, ওখানকার কথা আমাকে বলবেন না। আমি ভুলে যেতে চাই, বাঁচতে চাই। ওখানে থাকলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। বিশ্বাস করুন, আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না।

বিভাসকে ক্রমশ উত্তেজিত হতে দেখে আমি তাকে শান্ত করার জন্য বললাম, অত মাথা গরম করছেন কেন?

আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও তাই করতেন। আমার মা পাগল, বোন বিকলাঙ্গ, তার মাথার গোলমাল শুরু হয়েছে।

কবে থেকে ?

সেই দেখেই আমি পালিয়ে এসেছি। আর বাবা, তাঁর ওপর আমার বিশ্বাস নেই, ভক্তি নেই। এর মধ্যে কেউ বাঁচতে পারে ?

বাড়ির লোক যদি পাগল হয় তাতে তো আপনার বাবার কোন দোষ নেই। বরং তাঁর উপর আরও সহানুভূতি থাকা উচিত।

আমি আমার বাবাকে ছেলেবেলায় খুব ভালবাসতাম, ভক্তি করতাম। কিন্তু আমার যখন বছর চোদ্দ বয়স—। এই পর্যন্ত ব'লেই বিভাস থেমে যায়।

কি হ'ল বলুন ?

বিভাস আমার ডান হাতটা চেপে ধরে, বলে, বলব ? আমি এতদিন কাউকে বলি নি। আপনি কাউকে বলবেন না ?

না, নির্ভয়ে বলুন।

আমার তখন চোদ্দ বছর বয়েস, কেন জানি না সন্দেহ হয় মার পাগলামি সম্বন্ধে—তিনি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন, না, তাঁকে পাগল করা হয়েছে ?

চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কি বলছেন ?

হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, মা এমনিতে ঠিক থাকেন, কিন্তু পাগলা-গারদের পাগলদের চেঁচামেচি শুনলে তাঁর পাগলামি দেখা দেয়। এর কারণ কি ? সেই থেকে পাগলামি সম্বন্ধে অনেক বই আমি পড়তে শুরু করলাম। মা যখন সুস্থ থাকতেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকম প্রশ্ন করতাম। তা ছাড়া একজন পুরনো মালী ছিল, তার কাছ থেকেও কিছু খবর পাই। সব কিছু থেকে জানতে পারি, মার পাগলামি থেকে বাবার পাগলের চিকিৎসা শুরু নয়—

আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

বাবা প্রথমে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতেন, তাতে বিশেষ সুবিধে হয় না। পরে পাগলের চিকিৎসা শুরু করেন, এইতেই পয়সা হয়। মা তখন বাবাকে সব সময় সাহায্য করতেন, রোগীদের পরিচর্যা করতেন। এই মহৎ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

এতদূর ব'লে বিভাস থেমে যায়।

ব'লে যান।

সেই সময় একজন রুগীকে এনে পাগলা-গারদে বন্ধ ক'রে রাখা হয়। সে সব সময় চিৎকার করত—আমাকে ছেড়ে দাও, এরা আমার সঙ্গে জোচ্চুরি করছে। বাবা তাকে খুব বকতেন। কিন্তু মাকে সেই পাগল সব কথা বুঝিয়ে বলে। তার বাড়ির সকলে সম্পত্তির লোভে যুক্তি ক'রে একে পাগল ব'লে এখানে চালান দিয়েছে, আসলে সে পাগল নয়। বাবা টাকার লোভে তাদের ঘৃণ্য প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। মা প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু মালীকে পাঠিয়ে রুগীর বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখেন, সব কথাই ঠিক। সেই থেকে মা পাগল হয়ে গেছেন।

বললাম, এ সব কথা যে সত্যি তা কি ক'রে জানলেন?

বিভাস তখন অনেকটা শান্ত হয়েছে। বললে, জানি, আমি সব জানি, আমার প্রাণটা ছটফট করছিল, কাউকে এতদিন প্রাণ খুলে বলতে পারি নি। আজ আপনাকে ব'লে ফেলে আমি শান্তি পেয়েছি। ও-জায়গায় আর আমায় ফিরে যেতে বলবেন না।

এ কথার উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু বললাম, আপনার বাবা—

তিনি তাঁর ব্যবসা নিয়ে ঠিক থাকবেন। এতে যে অনেক টাকা রোজগার, তার ওপর খ্যাতি। একটু থেমে বিভাস আবার বলে, আমি টাকা চাই না, খ্যাতি চাই না। বাঁচতে চাই।

সেদিন বিভাসের পিঠে হাত রেখে সমবেদনা প্রকাশ করেছিলাম, বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। বুঝেছিলাম, পিতাপুত্রের মিলন ঘটানো সম্ভব নয়।

পরদিন নিখিলের বাড়ি গিয়ে মোটামুটি আলোচনা করলাম। সব কথা সে মনোযোগ দিয়ে শুনে বললে, ডাক্তার হালদার সত্যিই হতভাগ্য। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সকলকেই এক রোগে ধরল। বিভাসের কেসকে ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে প্যারানইয়া—সব জিনিসেই এরা সন্দেহ করে, ভাবে, সকলেই তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।

শুনে আশ্চর্য হলাম, বললাম, তোমার মতে বিভাসও পাগল?

সে তো বটেই, সাইকো-অ্যানালিসিস্ ছাড়া এদের পাগলামি সারানো যায় না, অথচ এ-পদ্ধতির ওপর ডাক্তার হালদারের বিশেষ আস্থা নেই।

বংশের সবাই পাগল, কি সাংঘাতিক বল তো?

এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে?

জিজ্ঞেস করলাম, তা হ'লে ডাক্তার হালদার এখন কি করবেন?

মতের মিল না থাকলেও ও-মানুষটার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস, জানি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রোগীদের পাগলামি সারাবার চেষ্টা করবেন, যাতে আর কেউ না তাঁর মত দুঃখ পায়।

বিভাসের কথায় মনের মধ্যে যে মেঘ জমা হয়েছিল, নিখিল তা পরিষ্কার করে দিল। ডাক্তার হালদারের উদ্বেগভরা মুখখানা মনে পড়ল। আশ্চর্য, যে মানুষটা সব কিছু ত্যাগ ক'রে, বনবাসে থেকে, একনিষ্ঠ মনে সাধনা করছে অপরের দুঃখ দূর করার জন্যে, তাকে ভুল বুঝলাম কি ক'রে?

এ কথা মনে হতেই নিজেকে বড় ছোট মনে হ'ল।

শ্রীতরুণ রায়

সমাজ ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞানীর সম্বন্ধে এ অভিযোগ অনেক দিনের যে, তাঁরা নাকি সর্ব-সাধারণের থেকে তফাতে চলেন। দূরত্বের মাধ্যমে সুরক্ষিত তাঁদের এই কৌলিন্য ক্রমশ মানুষের পক্ষে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মানুষও, তাই বিজ্ঞানের নাম শুনলে চোখ দুটো কপালে তুলে হতাশ শ্রদ্ধায় মিইয়ে পড়েন। ঠিক তেমনি আশ্চর্য হন তখন, যখন দেখেন সেই বিজ্ঞানীই রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমেছেন, সমাজ সম্বন্ধে দু কথা বলছেন, এমন কি জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা নিয়েও ভাবতে চেষ্টা করছেন। এই আশ্চর্য হওয়ার পেছনেও আছে ব্যবধানমূলক মনোবৃত্তি, ভাবটা যেন, 'তোমার কর্ম তুমি কর না বাপু, কি দরকার তোমার আমাদের ব্যাপারে মাথা গলানোর!' জাহাজের ব্যাপারী ব'লে

একবার যাঁদের টঙে তুলে ধরা হয়েছে, তাঁরাই আদার খবর নিতে এলে বরদাস্ত হয় না আমাদের।

কিন্তু কথা হচ্ছে, সে যুগ কি আর আছে? আমরা বলব, না, দিন পালটেছে। নেপিয়ার তাঁর লগারিথ্‌ম্‌-এর পাহাড়প্রমাণ তালিকা নিয়ে ডুবে রইলেন, আঁতুড় ঘরে সেই যে ঢুকলেন—বেরুলেন কফিনে চড়ে (কতকটা তাই নয় কি?)। আজকের বিজ্ঞানী তেমন অসূর্যম্পশ্য থাকতে পারেন না কোনও মতেই। প্রথমত আজ বিজ্ঞান এমন স্তরে এসে পৌঁছেছে যেখানে স্বতন্ত্রভাবে একক গবেষণার সাহায্যে কোনও সামান্যতম সমাধানেও উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞান আজ হাইসেনবার্গের মত জ্ঞানীকে যেমন চায়, তেমনি চায় অসংখ্য কর্মীর উদ্যম ও প্রেরণা। অন্তত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞান-যোগ ও কর্মযোগের সম্মিলন ঘটেছে। নির্জনকন্দরবিহারী বিশুদ্ধ বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমাদের হাল-আমলের কর্মীদের তফাত আকাশ-পাতাল। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের পরিসর গেছে বেড়ে। যে বিজ্ঞান একদিন গুটিকতক আধা-পাগলের চিত্তবৈকল্যের খোরাক জুটিয়ে এসেছে, আজ সে প্রলয়ঙ্কর। ক্ষমতা বাড়লেই দায়িত্ব বাড়বে—এ হ'ল স্বাভাবিক নিয়ম। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী যদি বলেন—ছেড়ে দাও আমাকে, ও আমি জানি নে, তবে অন্যে শুনবে কেন?

এ সব ছাড়াও আছে বিজ্ঞানের মূলগত উদ্দেশ্যের প্রশ্ন। বিশুদ্ধ জ্ঞান কথাটা শুনতে অবিশ্যি ভারি চমকপ্রদ, কিন্তু আরও অনেক জিনিসের মতই বিজ্ঞান বুঝি আর বিশুদ্ধ রইল না। সত্যি কথা বলতে কি, বিশুদ্ধ জ্ঞানলিপ্সা অনেক ক্ষেত্রে প্রেরণা জোগালেও, এ কথা কোনও মতেই ভোলা যায় না যে; জ্ঞানের সঙ্গে মানুষের স্বার্থও জড়িত রয়েছে বিশুদ্ধভাবে। এতে দোষের কিছু দেখি না। মধ্যযুগে সমস্ত দেশেই চণ্ডরূপী ফলিত ধর্মতত্ত্ব (Applied Theology) যে প্রচণ্ড খাতির পেয়ে এসেছে তাতে যদি আশ্চর্য না হয়ে থাকি, তবে বিজ্ঞানের ফলিতরূপকেই বা দূরে ঠেলব কেন? বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটাকে অস্বীকার করব তখনই, যখন বিজ্ঞানের গোড়াকার সাধনার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অভাব সূচিত হবে।

গলদ কিন্তু সেখানেও নয়। আমরা কথায় কথায় যত সহজে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে থাকি, বস্তুত বিজ্ঞান আজও আমাদের জীবনে ততদূর সত্য হয়ে ওঠে নি। বদ্ধ ঘরে, অন্ধকারে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়ে যাঁরা মনে করেন, বিজ্ঞানীর চরম কর্তব্য সমাপন করলেন, একটা বিশেষ অর্থে তাঁরাও হলেন ভাববিলাসী কবি। বিজ্ঞান আরও অনেক বড়, অনেক বেশি কঠোর তার সাধনা। যতদিন না বিজ্ঞানকে সর্বজনের আদরণীয় সামগ্রী ক'রে তোলা যায়, যতদিনে না বিজ্ঞানের সুফলকে সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায়, ততদিন তার বন্ধ্যা দশা ঘুচবে না, আমাদেরও মোহমুক্তি ঘটবে না।

বিজ্ঞানকে সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তোলা বলতে আমরা কি বুঝি? সে কি শুধু আরও ক্লাস খুলে ডিগ্রী দেওয়া, আরও গুটিকতক টেকনিক্যাল গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা? হ্যাঁও বটে, আবার নাও বটে। বিদ্যার যেমন একটা পুথিগত দিক আছে, ব্যাবহারিক দিক আছে, তেমনি এও বলব যে, বিদ্যা বিনয় দান করে। বৌদ্ধশাস্ত্রে বিনয় শব্দের অর্থ হ'ল—ট্রেনিং। বিদ্যা মানুষের মনকে সুগঠিত করে, এইখানেই তার সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব ও প্রয়োজন। পুথিলব্ধ জ্ঞানের অনেকটাই ধোপে টেঁকে না, বিশ্বকর্মার আছাড়ে সংসারবারিধির জলে ধুয়ে মুছে যায়। যেটুকু টেঁকে, সে হ'ল এই বিনয়। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের দিকে চেয়ে আছে এই আশায় যে, সে তার মনকে শান্ত সংযত ক'রে তুলবে, বুদ্ধিকে মুক্ত করবে অসংখ্য ভয় ও মিথ্যা আনুগত্যের (false allegiance) কবল থেকে। মানুষের মধ্যে একটি চিরন্তন শিশু আছে, সে একান্ত অসহায়। সেকেলে পাদ্রী থেকে শুরু ক'রে একালের কেতাবী ধুরন্ধরেরা পর্যন্ত সকলেই সেই শিশুটিকে নিয়ত চোখ রাঙাচ্ছে। বিজ্ঞান তাকে বলবে, ভয় নেই, সত্যকে জান, মিথ্যা আপনি যাবে স'রে। এমন কি, তোমার নিজের মধ্যেকার ওই যে রামগরুড়ের ছানাটি, ওকেও ভয় ক'রো না।

এ কথা যখন ভাবি যে বিজ্ঞান চিরকাল দেখা দিয়েছে বিদ্রোহীর মূর্তি নিয়ে, তখন মনে হয় তার এই বিপ্লবী রূপটি একান্তই সর্ব—

জনীন। যেখানেই সে চিরাচরিতের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেখানেই মানুষের সরল শুচি মনের সঙ্গে তার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছে। বিজ্ঞানের গোড়াকার কথাই এই যে, কারও মুখের কথায় সে চলবে না। পরের মুখে ঝাল আর যিনিই খান, বিজ্ঞানী নৈব নৈব চ। অ্যারিস্টটলের দেওয়া পাঁচফোড়ন একবার হজম হয়ে গিয়েছিল, সেই ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব (Geocentric cosmology) আর বিকৃত বলবিদ্যা, তার ঠেলা সামলাতে কুল্লে দু হাজার বছর লাগল, সেই দু হাজার বছর ধ'রে বিজ্ঞানের নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। তারপর যখন চলতে আরম্ভ করল, তখন ইউরোপে বুদ্ধির বন্ধনমুক্তি ঘটছে, মোহ-মেধ যজ্ঞ হচ্ছে রেনেসাঁর যজ্ঞশালায়। হোম করছেন নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সমাজ—স্বয়ং বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। সেখানেও ওই একই কথা—দেখব আগে, মানবো তার পর। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যে ধারাটি চ'লে আসছে, তা যেমন বিচিত্র তেমন বেগবান্। যে দিন থেকে বিজ্ঞানী বললেন, অ্যারিস্টটল দেখেছেন ব'লে নয়, আমি দেখছি ব'লেই বিশ্ব অস্তিত্বশীল, সেদিন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু।

বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞান আবার থমকে দাঁড়িয়েছে। এবারে তার এই জড়িমার কারণ জড়ত্ব নয়, বরং তার উল্টো। বিগত শতাব্দীতে কারও কারও মনে হয়েছিল, বুঝি বা বিজ্ঞান পৌঁছল তার চরম জানার সিংহদ্বারে। আজ দেখছি, বিজ্ঞানের সব চেয়ে বেশি সন্দেহ তার নিজেকে। বৈজ্ঞানিক অনির্দেশ্যবাদের কথা বলছি না, সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তার গোড়ায় ঘা দিয়েছে গুটিকতক সুদূরপ্রসারী ঘটনা। তার মধ্যে একটি হ'ল আমাদের অতিপরিচিত জড়বস্তুর মধ্যে অপরিসীম শক্তির আবিষ্কার এবং সে শক্তির অবাঞ্ছনীয় প্রয়োগ। এমন যে বিজ্ঞান—বিশুদ্ধ জ্ঞান—হঠাৎ দেখছি তারও প্রয়োজন লাগামের। ছাড়া পেয়ে বিজ্ঞানই হয়ে উঠেছে মারাত্মক রকম অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের এই সংহারমূর্তি বড় সর্বনাশা—দানবের হাতে অস্ত্র পড়লে তা দেবতাদেরও চিন্তান্বিত ক'রে তোলে।

রাজনীতি আর সমাজশোষণের অস্ত্র হিসেবে শুধু বিজ্ঞানের নয়,

বিজ্ঞানীর ব্যবহার আজ নতুন নয়। আর্কিমিডিস যেদিন অতসী কাচ দিয়ে শত্রুদের ভস্ম করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন, সেদিন তিনি জানতেন না 'ওক রিজে'র আণবিক কারখানার পথ তিনিই দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। অন্য দেশের কথা জানি না, আমেরিকার কথাই সর্বাগ্রে মনে আসে। ১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের *Scientific American* পত্রিকায় দেখতে পাই—

"The scientist has faced an increasingly perplexing choice : whether to go into basic science, which he would usually prefer, or into applied science (i. e. private industry), where the economic rewards are more attractive."...The problem is complicated by the fact that applied science takes workers away from pure science, the well spring of technological progress."

অস্যার্থ : বিজ্ঞানী আজ এক প্রচণ্ড বিভ্রান্তিকর সমস্যার সম্মুখীন—স্বভাবত রুচিকর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চাই তাঁর পক্ষে সমধিক কাম্য, না, অপেক্ষাকৃত অর্থকরী ফলিত বিজ্ঞান তাঁর সেব্য? সমস্যাটি আরও জটিল হয়েছে এই জন্য যে, ফলিত বিজ্ঞান বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা থেকে কর্মীদের ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিচ্ছে, যার ফলে দেখা দিয়েছে যান্ত্রিক সমুন্নতির অভিযান।

আমেরিকায় আজ লক্ষ্মী কুবেরের বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন, সেখানকার কথাই বললুম। আজ এ শুধু একটা বিশেষ দেশের সমস্যা নয়, সর্ব দেশেরই সমস্যা। এই যে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ বা প্রাইভেট ইন্‌ডাষ্ট্রি ক্রমশ ফলিত বিজ্ঞানকে গ্রাস করছে, তার ফলে মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণী ফুলে ফেঁপে উঠছে, দশজনের বোঝা বাড়ছে। আমাদের মত ইতরজনেরা চেয়ে চেয়ে দেখছে, ভাবছে, বাঃ, বেশ তো হ'ল। এই কপট কল্যাণ-প্রচেষ্টা, এই ধামাধরা বিজ্ঞান, এর সর্বনাশা রূপটি আমাদের চোখে পড়ছে না। সাধনা করবার সুযোগ আর উপকরণ দিয়ে

বিজ্ঞানীর স্বাতন্ত্র্যটুকু কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এ যে কত বড় ক্ষতি, এর ফলে বৃহত্তর মানবতার ওপর কি দারুণ বজ্র যে নেমে আসবে, আজ সে কথা আমরা ভাবছি না, কিন্তু একদিন ভাবতে হবে।

আজকের দিনে যে সন্দেহ সর্বপ্রথম মনে আসছে, তা হ'ল এই—জ্ঞানের জন্য যে প্রস্তুতি, যে আত্মশোধন দরকার তা কি আমাদের হয়েছে? হয়তো হয় নি। আমাদের গোড়াকার বিশুদ্ধ-জ্ঞানলিপ্সার পেছনে হয়তো ধরাবাঁধা কোনও পরিকল্পনা ছিল না, তাই যে-আগুন মশাল হয়ে পথ দেখাতে পারত, সেই আগুনই জীববিশেষের লেজকে আশ্রয় ক'রে লঙ্কাদহন ঘটাচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখতে পাই, জ্ঞান যখনই সীমাবদ্ধ হয়েছে, 'এসোটারিক' হয়েছে, তখনই তা প্রজাসাধারণের অকল্যাণ ঘটিয়েছে। এই অকল্যাণে বিজ্ঞানীর সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলেও সমাজ বিজ্ঞানীকে ক্ষমা করবে না। বিজ্ঞানী তাঁর জ্ঞানবৃক্ষের ফল নিজের হাতে তুলে না নিলে অন্যে তা নেবে এবং বিষ মিশিয়ে বিতরণ করবে। সে ক্ষেত্রে মনে হয়, অন্তত জনকতক বিজ্ঞানীর এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তাঁরা বলুন যে, নিভৃত সাধনায় যেমন আমাদের মন্ত্রদীক্ষা, তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সহজাত নির্ভীকতাও আমাদের আছে। এ কাজ যাঁরা করবেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক সাধনায় ছেদ পড়লেও তাঁরা এমন কিছু দিয়ে যেতে পারবেন, যা এই সব অমানুষিক বিজ্ঞানী আর অবৈজ্ঞানিক মানুষেরা দিতে পারে নি।

বিজ্ঞানকে আজ আবার নতুন ক'রে শপথ নিতে হবে। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হ'লেও সে মানবনিরপেক্ষ হবে না। মানুষকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের কোনও সাধনাই চলবে না। জ্ঞান যদি কল্যাণের পথ না ধরে, তবে বিধাতার অমোঘ বিধানে তাকে একদিন অকল্যাণের পথই ধরতে হবে। সে সম্ভাবনা চিন্তারও অতীত।

আর এই কল্যাণ এমন বস্তু, যার দাবি অনেক। দূর থেকে, উঁচু মঞ্চের ওপর থেকে কারও মঙ্গল করা যায় না, তার জন্য নীচে নেমে আসতে হয়, মানুষকে জানতে হয়। মানুষের এ এক আশ্চর্য স্বভাব—

অনাত্মীয়ের দেওয়া উপকার তার সইবে না। আমরা বলি, উপায় যখন নেই, তখন তাই কর না কেন, মানুষকে ডেকে নাও কাছে। বিজ্ঞানী হয়তো বলবেন, সে কি! আমার সময়, আমার থিসিস, আমার ডক্টরেট? আমরা বলব, থাক্ না ওসব, যাক না দুটো প্রহর। সামনে আবহমান কাল প'ড়ে রয়েছে, অনেক নিউটন, অনেক ফ্যারাডে, অনেক প্লাঙ্ক আসবেন। তোমরা শুধু তাঁদের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে দিয়ে যাও, তোমরা—শুধু তোমাদের মধ্যে কয়েকজন—একটু কালক্ষেপ ক'রে মানুষকে বাঁচাও চিত্তবিক্ষেপ আর মহাকালের হাত থেকে।

শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

—

আবর্তন

বার বার ঘুরে ঘুরে আসে দিন
ক্ষ'য়ে-যাওয়া জীবনের রিক্ততায় ক্ষীণ,
নীল বাষ্পে রুদ্ধশ্বাস ঘরে
বিষাক্ত ফেনিল রক্ত স্বেদ আর ক্লেদ হয়ে ঝরে
ব্যাকুল ক্ষুধিত আত্মা কেঁদে মরে প্রহরে প্রহরে—
তবু তার মাঝে আসে দিন,
বসন্ত নিশ্বাস-ফেলা ফুলের-পাপড়ি-মেলা আশ্চর্য রঙিন
সেই দিন।

সেই দিন আসে ফিরে ফিরে
জীবনের কান্না আর যৌবনের হতাশ্বাস ঘিরে,
স্বেদ আর ক্লেদ দিয়ে পঙ্কিল পিচ্ছিল রক্তপথে,
সোনার-ঝলক-লাগা আশ্চর্য আলোতে।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

স্ট্যাটিস্‌টিক্স

[সম্পাদকীয় : যমদণ্ডের স্ট্যাটিস্‌টিক্স বহুদিন পাই নাই, এই কারণে তাঁহার জন্য একটু চিন্তিত ছিলাম। হঠাৎ একদিন ব্রহ্মদত্তের আবির্ভাব হইল, এক গোছা লেখা কাগজ নাকের উপর ধরিয়া বলিল, এই নিন যমদণ্ডের নূতন স্ট্যাটিস্‌টিক্স। ইহাকে কাটিয়া কুটিয়া যোগ-বিয়োগে তছনছ করিয়া তবে ছাপিবেন। লোকটার ভারি দেমাক হইয়াছে, ভাবেন তিনি মহলানবিসকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কাটছাঁট করিলেই জব্দ হইবেন। ব্রহ্মদত্ত তো হুকুম দিয়া চলিয়া গেল। যমদণ্ডের পাণ্ডুলিপি টানিয়া পড়িতে বসিলাম। গোড়াতেই তিনি সম্পাদকের উপর যে টিপ্পনী ঝাড়িয়াছেন, তাহাতে আর কাটাকুটি করিতে ভরসা হইল না। যদিও তাহার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। যাহা হউক, শুধু "বেরিয়ে যাবার বয়স" শিরোনামার গবেষণাটি বাদ দিয়া বাকিটা যথাযথ (অবশ্য বানান ভুল সংশোধন করিয়া) ছাপিলাম—মায় গোড়ার টিপ্পনী সহ। টিপ্পনীটি এই—

গোহত্যানিবারণী জলুস দেখিবার জন্য বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে ব্রহ্মদত্তর সঙ্গে দেখা। ব্রহ্মদত্ত দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—জিতা রহো স্ট্যাটিস্‌টিক্স! আমি ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই সে আপন মনে গড় গড় করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল—জান? পুনায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসে স্ট্যাটিস্‌টিক্সের জয়-জয়কার। মূল সভাপতি ছিলেন একজন স্ট্যাটিস্‌টিক্সের লোক, তিনি আবার ভারতীয় মন্ত্রিসভার স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অ্যাডভাইসার; মন্ত্রীদের বয়সের ভ্যারিয়েশন আশানুরূপ না হওয়ায় মন্ত্রীদের রদবদল করিবার উপদেশ তিনি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে দিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার পর ব্রহ্মদত্ত বলিল, তোমার কি হইয়াছে? আর স্ট্যাটিস্‌টিক্স সম্বন্ধে গবেষণা বাহির কর না কেন? আমি বলিলাম, সম্পাদক আর ছাপেন না বলিয়া লিখি না। ইহাতে ব্রহ্মদত্ত বলিল, লেখা তুমি দাও; ছাপাইবার ভার আমার উপর। ব্রহ্মদত্তের কথায় উৎসাহিত হইয়া তাহাকে এই লেখা দিলাম—দেখি কত দিনে ছাপায়, বা বে-মালুম লোপাট করিয়া নিজ নামে চালায়, যেমন দাদামহাশয় কেদারনাথ বাঁড়ুজ্জের বেলায় হইয়াছিল। অনেকবার ঠকিয়াছি, এবার না হয় আর একবার ঠকিব। ইংরেজীতে আছে Nothing ventured, nothing gained। সবচেয়ে বিপদ হইতেছে যে, আমার নামেও ছাপাইল, আর লেখার মধ্যে নিজের কথা, নিজের মতবাদ ঢুকাইয়া দিল—তারপর মর তুমি প্রতিবাদ লিখিয়া বা সংশোধনীপত্র জুড়িয়া।—যমদণ্ড]

ঠাকুর-দেবতার লোকপ্রিয়তা

হিন্দুর ঠাকুর-দেবতা সংখ্যায় নাকি তেত্রিশ কোটি! এই তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর নামও কেহ জানে না বা কোথায় কোন পুরাণে, উপ-পুরাণে, পাঁচালী গানে ইঁহাদের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাও অনেক সেকেলে ও একেলে ভট্টাচার্যদের জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই।

এই সকল ঠাকুর-দেবতার মধ্যে যাঁহাদের পাঁজিতে নাম দেখিতে পাই বা যাঁহাদের মন্দির ঠাকুরতলা চোখে পড়ে তাঁহাদের লোকপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ঠাকুর-দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মার কোনও মন্দির বাংলা দেশে দেখি নাই। এক বারোয়ারী পূজার সময় ব্রহ্মার মূর্তি গড়িয়া পূজা দেখিয়াছি কলিকাতার সন্নিকট পাণিহাটি গ্রামে। অন্যান্য গ্রামে বারোয়ারী পূজায় অন্যান্য দেবদেবীর পূজা হয়, ব্রহ্মারও পূজা হয়—কিন্তু ব্রহ্মার পূজা খুব কম। শতকরা দুই-তিন ভাগের বেশি নয়।

বিষ্ণুর পূজা নানা মূর্তিতে, শালগ্রামে বাংলা দেশে বিশেষ প্রচলিত। বিষ্ণুর বহু অবতারের মধ্যে রাম ও কৃষ্ণ অবতারের পূজাই প্রচলিত। অন্যান্য অবতারের পূজা একেবারেই নাই বলিলেই চলে। রাম অবতারের পূজা খুবই কম। হাজারে একটি হয় কি না সন্দেহ। পাঁজিতে এক রামনবমীর পূজা ছাড়া রামের অন্য পূজার বিশেষ উল্লেখ নাই। অথচ বঙ্গভাষার আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এক কালে বাংলায় রামের পূজা খুবই প্রচলিত ছিল। আমরা শুনিতে বসিয়া শুনি—রাম, দুই, তিন। কবিরাজী ঔষধের মধ্যে রামবাণ একটি মহৌষধ। বড় ছেলের নাম রাখি রামচন্দ্র। আগে যখন ঠাকুর-দেবতাদের নামে ছেলেপুলের নামকরণ হইত তখন রামনামের কিছুটা লোকপ্রিয়তা ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ নাম—নামের ভ্যারাইটি বাদ দিয়া শুধু কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ এই নামের সহিত রামনামের সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিয়াছি যে রাম : কৃষ্ণ = ৭ : ১৭। কোন জিনিসের বৃহদায়তন বা বিশিষ্টতা বুঝাইবার জন্য বলি—রামদা, রামছাগল, রামগরু ইত্যাদি। কোন বিষয়ে আপত্তি বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবার জন্য বলি—রাম! রাম! যদিও আমাদের হিন্দুস্থানী ভ্রাতারা দেখা হইলে 'রাম রাম' বলিয়া অভিবাদন করেন ও মৃতদেহ বহন করিবার সময় হরিবোলের পরিবর্তে বলেন, রাম নাম সত্ হ্যায়। বাঙালীর নিজস্ব মিষ্টান্নের মধ্যে সন্দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ; এই সন্দেশের নানান প্রকার। সোদপুরের রামচাকি

সন্দেশ নাটোরের রাঘবশাহীর চেয়েও বিখ্যাত। রামনবমীতে খাঁটি বাঙালীর নূতন খাতা হইত—এখনও দুই-এক জায়গায় হয়।

শ্রীকৃষ্ণের অনেকগুলি পূজা—ঝুলন, জন্মাষ্টমী, গোপাষ্টমী, রাসযাত্রা ও দোল। রাধাকৃষ্ণের পূজা খুবই ব্যাপক—প্রায় প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু গ্রামে রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। উৎসব কোথাও ঝুলন উপলক্ষে, কোথাও রাস উপলক্ষে বা কোথাও দোল উপলক্ষে। ইহার মধ্যে আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে রাসযাত্রায় ধুমধাম বেশি ও সংখ্যায় প্রায় দোলের উৎসবের সমান। ঝুলন উৎসব ধুমধামে ও সংখ্যায় খুব কম। জন্মাষ্টমীর ধুমধাম অপেক্ষাকৃত কম হইলেও জন্মাষ্টমীর পূজা খুব ব্যাপক। অনেকেই জন্মাষ্টমীর উপবাস করেন।

শালগ্রামে বিষ্ণুপূজা এককালে, এমন কি শত বৎসর পূর্বেও, খুব ব্যাপক ছিল। যে ব্রাহ্মণ-বংশের গৃহে শালগ্রাম নাই তাঁহারা নিষ্ঠাবান কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইত। যে সম্পন্ন কায়স্থের বাটীতে শালগ্রাম নাই তাঁহারা বুনিয়াদী বংশ কি না এ সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকিত। এখন গৃহে গৃহে শালগ্রামপূজা উঠিয়া যাইতেছে। পল্লী অঞ্চল হইতে ভদ্রলোকেরা কলিকাতায় চলিয়া আসিতেছেন। দুই-চারি বৎসর বিধবা জেঠাইমারা, পিসিমারা শালগ্রামের পূজা চালাইলেন। তাহার পর গৃহদেবতা উঠিলেন পুরোহিতের বাড়ি বা স্থানীয় ঠাকুরবাড়িতে। গৃহস্থ পূজার খরচ বলিয়া কিছু কিছু মাসিক বা বার্ষিক দিতে লাগিলেন। পরে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। বছর কুড়ি আগে আমডাঙার করুণাময়ী কালী দেখিতে যাই। কালী-মন্দিরে একটা কাঠের বাক্সয় দুই-তিন শত শালগ্রাম রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এত শালগ্রাম কোথা হইতে আসিল? পূজারী বলিলেন যে, এই স্থানের আশেপাশে পূর্বে ভদ্রলোকদের বাটীতে শালগ্রামপূজা হইত; তাঁহারা যখন কলিকাতায় চলিয়া গেলেন বা মরিয়া হাজিয়া গেলেন, তাঁহাদের শালগ্রাম কালীবাড়িতে জমা হইতে লাগিল। যাঁহারা খরচ পাঠান, শালগ্রাম আলাহিদা নামে সঙ্কল্প করিয়া পূজা হয়—এইরূপ শালগ্রাম গুটিপাঁচেক। যাঁহারা খরচ পাঠান না তাঁহাদের শালগ্রাম এই বাক্সে উঠিয়াছে—ইঁহাদের পূজা একসঙ্গে কালীমায়ের খরচায় হয়।

খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে লক্ষ শালগ্রামশিলা সংগ্রহ করিয়া রত্নবেদী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৮০,০০০ শালগ্রামশিলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শিলা-সংগ্রহ বন্ধ হইয়া যায়, কাজেই রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বিষ্ণুর অনন্ত শয়ন, ত্রি-বিক্রম ও গোপাল মূর্তিতেও বহু পূজা হয়। এইরূপ মূর্তির পূজা সংখ্যায় রামের পূজাপেক্ষা বেশি হইলেও রাধা-কৃষ্ণের পূজার অপেক্ষা ঢের কম। শতকরা পাঁচের বেশি নয়। ইহার মধ্যে গোপালের পূজাই বেশি।

এইবার আমরা শিবপূজার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শিবমন্দিরে শিবপূজা খুবই ব্যাপক। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরদের প্রতিষ্ঠিত দুইটি ১০৮-শিবমন্দির আছে—একটি বর্ধমানের সন্নিকট তালিতগ্রামে; অপরটি কালনায়। কলিকাতা হইতে উত্তর মুখে ভাগীরথীর উভয় তীরে বহু শিবের দ্বাদশমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার অধিকাংশই কলিকাতার কায়স্থগণের প্রতিষ্ঠিত। তাহার পর জোড়ামন্দির, চারমন্দির, পঞ্চমন্দির প্রভৃতি বহু শিবমন্দির আছে। খড়দহের বিশ্বাসদের চব্বিশমন্দির আছে। কলিকাতায় দুইটি যুথ বড়শিব আছেন,—একটি নিমতলায় মদন দত্তের শিব; অপরটি ভূকৈলাসের রাজাদের রক্তকমলেশ্বর শিব। দুইটিতেই ঘড়াঞ্চি দিয়া উঠিয়া মাথায় গঙ্গাজল ঢালিতে হয়। ইহার মধ্যে মদন দত্তের শিব উচ্চতায় বেশি; ভূকৈলাসের শিব বেড়ে বেশি বলিয়া মনে হয়।

অশ্বত্থতলায় নুড়ি-শিবের দেখা যত্রতত্র পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বহু গৃহস্থ বাণলিঙ্গের বা মৃত্তিকানির্মিত শিবের নিত্যপূজা করিয়া থাকেন। সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে শিবপূজাই খুব বেশি জনপ্রিয়। মন্দিরের সংখ্যাও রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরের সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশি। শিবরাত্রির উপবাস ও পূজা জন্মাষ্টমীর উপবাস ও পূজা অপেক্ষা যেন বেশি জনপ্রিয় বলিয়া মনে হয়। ইহার একটি কারণ এই যে শিবপূজায় খরচ কম হয়; শিবপূজা সহজ, শিব ফুল-বেলপাতায় সন্তুষ্ট।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আমাদের জাতীয় পূজা। তিন দিন ধরিয়া পূজা

আর কোনও দেবতার বা দেবীর হয় না। পূজা বলিতে দুর্গাপূজাকেই বুঝায়। কিন্তু গৃহস্থবাড়িতে দুর্গাপূজার চলন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। অনেক বাড়িতে দুই-তিন শত বৎসরের পূজাও বন্ধ হইতেছে। নূতন করিয়া দুর্গাপূজা আরম্ভ করিতে কাহাকেও দেখি না। ইহার মূল কারণ, আমাদের ভক্তির অভাব ও অর্থের অভাব। অবশ্য "সার্বজনীন" দুর্গা-পূজার সংখ্যা কি কলিকাতায়, কি সুদূর গণ্ডগ্রামে বাড়িতেছে। "সার্বজনীন" দুর্গাপূজায় মায়ের ধ্যানোক্ত মূর্তি অপেক্ষা মায়ের তথাকথিত নব নব কলা-কল্পিত মূর্তির প্রাদুর্ভাবই বেশি। তদপেক্ষা বেশি পাড়ায় পাড়ায় "সার্বজনীন" দুর্গাপূজা লইয়া মতভেদ ও দলাদলি। দলাদলি এক-এক জায়গায় এমন উৎকট যে বোমা-ছোঁড়াছুঁড়িও হয়।

দুর্গাপূজার পরই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, তাহার পর কালীপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা। "সার্বজনীন" লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজা দেখিয়াছি; কিন্তু "সার্বজনীন" জগদ্ধাত্রীপূজা দেখি নাই। জগদ্ধাত্রীপূজার প্রচলন এক এক স্থানে খুব বেশি—যেমন চন্দননগরে। কার্তিকপূজার প্রচলন এককালে অন্যান্য পূজার ন্যায় খুবই চলতি ছিল—বিশেষ করিয়া কলিকাতায় সোনাগাছি, গরাণহাটা ও হাড়কাটা অঞ্চলে। এখন এই সব অঞ্চলে কার্তিকপূজার সংখ্যা একেবারে কমিয়া গিয়াছে, প্রায় নাই-ই।

তথাপি আমরা এই সব পূজার জনপ্রিয়তার একটা আন্দাজ দিব। আমাদের পাড়ায় দুই-তিন ঘর কুম্ভকার ঠাকুর গড়েন। গত বৎসরে উঁহাদের তৈয়ারী বিভিন্ন ঠাকুর যাহা বিক্রয় হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হইতেই বিভিন্ন ঠাকুরের জনপ্রিয়তা বুঝা যাইবে।

শ্রীশ্রীদুর্গা—	৩৫		শ্রীশ্রীসরস্বতী—৮০ (তৈয়ারী থাকিলে আরও বিক্রয় হইত)
শ্রীশ্রীলক্ষ্মী—	১০		
শ্রীশ্রীকালী—	৩৭	১০০	গণেশ—১টিও বিক্রয় হয় নাই।
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী—	৮		শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা—৬
কার্তিক ঠাকুর—	১০		শ্রীশ্রীবাসন্তী—৩টি (অর্ডার পাইয়া)

বর্তমান কালে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের আগমনের পর হইতে মনসার মূর্তি-পূজার চলন হইতেছে। খুব বিক্রয় হয়। অনেকে আবার পূজা না করিয়া

খেলানাস্বরূপ কিনিয়া থাকেন। এ জন্য ইহার সংখ্যা দিলাম না। পশ্চিমবঙ্গে মনসাপূজার চলন বাড়ি বাড়ি থাকিলেও মনসার মূর্তিপূজার রেওয়াজ ছিল না। বিশ্বকর্মাপূজায় আজকাল মূর্তিপূজার চলন হইতেছে। প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন বা কারখানার লোকেরা বিশ্বকর্মা-পূজা করিয়া থাকেন। গত বৎসর এইরূপ মূর্তির ৮টি অর্ডার উপরোক্ত কুম্ভকারেরা পাইয়াছিলেন।

কালী-মন্দিরের সংখ্যা বেশি, তবে রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরের অপেক্ষা কম। অনেক গ্রামের গ্রাম্যদেবতা হইতেছেন কালী ঠাকুর। ইঁহাদের অনেকেরই মন্দির নাই, আছে কালীবাড়ী। সরস্বতী নদীর দুই কূল হইতে সাত-আট ক্রোশের মধ্যে বিশালাক্ষীদেবী অনেক গ্রামের গ্রাম্যদেবতা।

দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী ঠাকুরেরই পূজার প্রচলন বাংলা দেশে খুব বেশি। তৃতীয়া মহাবিদ্যা ষোড়শীর মন্দির ও পূজা খুব কম প্রচলিত আছে। তারা মায়ের ও বগলার পূজা আরও কম। অন্যান্য মহাবিদ্যার প্রচলন তো নাই-ই। শীতলা মাতার মন্দির ও ঠাকুরঘর অনেক স্থানে আছে। তবে ইনি গ্রাম্যদেবতা হিসাবে পূজিতা হন না। পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর পূজা স্থানে স্থানে আছে।

গাঁজাখোরের সংখ্যা

আফিম খাইতে হইলে আজকাল রেশন কার্ড করিতে হয়। সুতরাং সরকারী দপ্তরখানায় আফিমখোরের হিসাব পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে নাকি ১,০২,০০০ আফিমখোর আছে। কিন্তু গাঁজা-খোরের সংখ্যা কত? ছেলেবেলায় একটি ছড়া শুনিতাম যে—গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে, সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে। গাঁজাখোরের সংখ্যা বাংলায় বরাবরই কম। আজকাল সরকার কর্তৃক গাঁজার দর ক্রমাগত বাড়ানোর ফলে কেহ আর নূতন করিয়া গাঁজা খাইতে শিখিতেছে না। দেশবিভাগের ফলে নওগাঁয়ের গাঁজা আর পশ্চিমবঙ্গে আসে না। নীমচ হইতে গাঁজা আসে, কিন্তু এই গাঁজার নাকি তেমন ঝাঁজ নাই। রংপুরের গাঁজার এক কলিকা নীমচের গাঁজার তিন কলিকার

সমান—ইহা আমাদের পাড়ার বিখ্যাত গাঁজাখোর হরিঠাকুর ও মোহিতবাবু বলিতেন।

কলিকাতায় যত গাঁজার দোকান আছে তত দোকান ২৪-পরগনা, হাওড়া ও হুগলী এই তিন জিলায় নাই। আর গাঁজার বিক্রয় নাকি খুব বেশি। কলিকাতায় কত গাঁজাখোর আছে বাহির করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের মোট গাঁজাখোরের একটা হিসাব পাওয়া যাইবে। এই ভার ভারত-ধর্ম-রত্ন আমার উপর দেন। আজকাল স্ট্যাটিস্‌টিক্সের স্যাম্‌প্লিং-এর যুগ চলিতেছে। আমিও স্যাম্‌প্লিং করিলাম।

নিমতলার শ্মশানে ভূতেশ্বরমন্দিরে বৈকাল চারটা হইতে রাত্রি আটটা অবধি তিন দিন ঘুরিলাম। দেখিলাম ৫৬ জন গাঁজাখোর আসে—গাঁজা ভূতেশ্বরকে নিবেদন করিয়া কলিকা কলিকা উড়ায়। কিন্তু কাহাকেও ৩ ছিলিমের বেশি উড়াইতে দেখিলাম না। বেশির ভাগই এক ছিলিম। ৭।৮ জন ২ ছিলিম; ৩।৪ জনকে ৩ ছিলিম টানিতে দেখিলাম—তাহাও রোজ নহে। কাশী মিত্রের ঘাটে গাঁজা খাইতে বড় একটা দেখি নাই। চারবার গিয়াছিলাম। শনিবার ২ জনকে, রবিবার ১ জনকে, বুধবার ও বৃহস্পতিবার কাহাকেও গাঁজা টানিতে দেখিলাম না। রতনবাবুর ঘাটে এক জন নিয়মিত গঞ্জিকা-সেবী আছেন—তিনি নাকি সারা দিনে ৭ ছিলিম গাঁজা উড়ান। এইটি কিন্তু আমার শোনা কথা। কেওড়াতলার শ্মশানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিমন্দিরের দাওয়ায় বসিয়া বহু দলে বিভক্ত বহু গাঁজাখোর দেখিয়াছি। ৪।৫।৬ জন করিয়া এক-একটি দল। মোট সংখ্যা গড়ে ৯৯ জন, অনেককেই ২ ছিলিম গাঁজা উড়াইতে দেখিয়াছি। এই সব তথ্য হইতে কলিকাতায় গাঁজাখোরের সংখ্যা আমার মতে ৭৮৯ জন। আর দক্ষিণ কলিকাতায় লোকসংখ্যার অনুপাতে গাঁজাখোরের অনুপাত উত্তর কলিকাতা অপেক্ষা ৩ গুণ বেশি। কিন্তু উত্তর কলিকাতায় যেমন ৩ ছিলিম টানিতে দেখিয়াছি, দক্ষিণ কলিকাতায় তেমন পাকা গাঁজাখোর নাই। উত্তর কলিকাতার গাঁজাখোরদের মধ্যে উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী বেশি; বাঙালী গাঁজাখোর খুব কম।

কিন্তু দক্ষিণ কলিকাতায় অবস্থা অন্যরূপ; বেশির ভাগ গাঁজাখোরই বাঙালী, গলায় পৈতা দেখিয়া মনে হয় ব্রাহ্মণ। উড়িয়াও আছে; তবে হিন্দুস্থানীর সংখ্যা খুবই কম। উত্তর কলিকাতায় হিন্দুস্থানী গাঁজাখোররা প্রায় সকলেই সাধুবেশধারী।

বিশ-পঁচিশ বৎসর আগেকার তুলনায় সাধু-সন্ন্যাসীরা গাঁজায় দম দেওয়া ছাড়িয়া দিতেছেন বলিয়া মনে হয়। আর বাঙালীদের মধ্যে গাঁজাখোরের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। তবে হালুইকর ঠাকুরেরা বড় কাজে লাগিবার আগে মাঝে মাঝে গাঁজায় দম লওয়ার অভ্যাস এখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

যমদত্ত

জীবনে কাব্য বাতিল বন্ধু

কবিতা কি আর আছে এ জীবনে?—মিছা যে বন্ধু খেদ;
সমন্বয়ের যুগে কোথা আর গদ্যে পদ্যে ভেদ?
জীবন-যুদ্ধে মোরা মারমুখ,—নিয়ত শস্ত্রপাণি;
মুড়ি মিশ্রীর মূল্য সকলে তুল্য বলিয়া মানি।
বিশ্বে বিরল রহস্য—নাই ঢাকাঢাকি কিছু আজ;
স্রষ্টারে মোরা জানি সৃষ্টির চরম ধাপ্পাবাজ।
সমীক্ষাগারে চিত্তবৃত্তি করিয়া বিশ্লেষণ—
বাতুলে কবিতে পেয়েছি আমরা প্রায় সমলক্ষণ।
আছে গালভরা বাঁধাবুলি, ফাঁকা আওয়াজ ও বক্তৃতা;
জীবনে কবিতা বাতিল বন্ধু, ক্ষোভ পরিতাপ বৃথা।

কাব্য কোথায়—বিপর্যয়ের যেথা বহ্ন্যুৎসব,
পদে পদে যেথা জোটে বঞ্চনা ঘটে শুধু পরাভব?
প্রাণের প্রবাহ যেথায় আবিল,—আবর্তসঙ্কুল,
জীবনের বিকিকিনির হিসাবে ঠিকে যেথা সদা ভুল?

কাব্য কোথায়—বুভুক্ষু লাগি লোষ্ট্র যেথায় জোটে,
ব্যর্থ আশায় ভুয়া আশ্বাসে ভাঙা মন ভুঁয়ে লোটে,
নীতিবোধ যেথা জৈবিক প্রয়োজনের সূত্রে গাঁথা,
চাহে রক্তের বদলে রক্ত, মাথার বদলে মাথা!
মানুষ যে আজ যন্ত্র বন্ধু, যুগ এ যে যান্ত্রিক!
কাব্য কোথায়—প্রাণ যেথা নয় সুরলয়মাত্রিক!

জীবন বহে না মন্দাক্রান্তা,—অবসর নাহি আর;
হিয়ায় হিয়ায় ক্বচিৎ কখনো ঘটে কোন কারবার:
কোথা বনবীথি, কোথায় গন্ধবিধুর বকুলতল,
কোথা সে চটুল চোখের চকিত চাহনি বিচঞ্চল!
কোথা দিন, যবে কাব্য-আসরে তন্ময় হয়ে লোক—
মুগ্ধ চিত্তে শুনিত বসিয়া কবিকণ্ঠের শ্লোক?
মুকুতার মালা আনিত প্রাণের বহি অভিনন্দন,
স্বর্ণপাত্রে আসিত সুরভি স্রুক্ চুয়া চন্দন!
আজো আছে বটে বসন্ত দিন, রয়েছে মাধবী রাতি;
মরমী পরাণ হয়তো আজিও খোঁজে মরমের সাথী!
বর্ষামেদুর আষাঢ় দিবস বৃষ্টিধারার রোলে—
বিরহী জনের আকুতি আজিও হয়তো জাগায়ে তোলে!
আজিও হয়তো আছে হাসিগান, আছে আনন্দমেলা,—
গোপন মনের গভীরে রয়েছে রহস্যময় খেলা!
ঘননীল চোখে হয়তো আজিও স্বপন ঘুমায়ে রয়;
কবির ভাগ্যে ঘনায়ে কেবল এসেছে দুঃসময়!
পরাণের গান থামে না যে সমে, পায় না যে খুঁজে মিল—
জীবনের পথ বন্ধুর যেথা,—জটিল; বিসর্পিল!

রয়েছে দম্ভ, শব্দচয়ন মাখিয়া অভিধান;
সৃজনশক্তি অভাবে রয়েছে ধ্বংসের অভিযান!

চরণছন্দে জাগে সংশয়, দ্বিধার অসঙ্গতি ;
মিথ্যারে দিতে সত্যের রূপ আছে ঘোর দুর্মতি !
আছে প্রচারের গতানুগতিক চির অপকৌশল ;
শুধু নাই সেই সাধনা নিষ্ঠা প্রত্যয় অবিচল !
কাব্যলক্ষ্মী বিমুখ যে তাই ;—শোভাযাত্রার রোলে,
সভা-সমিতির বাগাড়ম্বরে ভবী কি কখনো ভোলে ?
জীবনে টলিল আসন যাহার রাস্তার মোড়ে মোড়ে—
চলচঞ্চল নিচোলপ্রান্ত কোথায় বা তাঁর ওড়ে ?

শ্রীঅজিতকুমার সেন

হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

৬ষ্ঠ দৃশ্য। দুর্গপ্রাসাদের অপর এক কক্ষ

[হোরেসিয়ো ও জনৈক পরিচারকের প্রবেশ]

হোরে। আমার সঙ্গে যারা দেখা করতে চায় তারা কে ?

পরি। নাবিক। তারা বলছে, আপনার নামে চিঠি এনেছে।

হোরে। ভিতরে নিয়ে এস। [পরিচারকের প্রস্থান]

হ্যামলেট ভিন্ন আর কে আছে, আমায় পত্র লিখবে ?

[নাবিকগণের প্রবেশ]

১ম নাবিক। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

হোরে। তোমাদেরও মঙ্গল করুন।

১ম না। সবই তাঁর ইচ্ছা। আপনার একখানি পত্র আছে। যে রাজদূত ইংলণ্ডে যাচ্ছিলেন তিনিই দিয়েছেন। আপনার নামই শুনলাম হোরেসিয়ো ?

হোরে। (পাঠ করিতে লাগিলেন) 'হোরেসিয়ো, এই চিঠি পাঠ করার পর পত্রবাহকেরা যাতে রাজার সাক্ষাৎ লাভ করে তার ব্যবস্থা ক'রো। রাজার নামেও চিঠি আছে। সমুদ্রযাত্রার দু দিনের মধ্যে এক দুর্ধর্ষ জলদস্যুর দল আমাদের পিছু নেয়। আমাদের জাহাজের গতিবেগ কম থাকায় অগত্যা সাহস সঞ্চয় করতে হ'ল ; ধস্তাধস্তির সময় আমি-

তাদের জাহাজে লাফিয়ে পড়ি। ঠিক সেই মুহূর্তে দস্যুজাহাজ আমাদের জাহাজ ছেড়ে দূরে চ'লে যায়; ফলে কেবল আমিই তাদের বন্দী হলাম। তারা দস্যু হয়েও আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করেছে। তাদের একটা উদ্দেশ্যও ছিল। তাদের ব্যবহারের প্রতিদান আমার কর্তব্য। রাজার নামে যে চিঠি দিলাম তা যেন তাঁর হস্তগত হয়। তার পরই তুমি ক্ষণবিলম্ব না ক'রে মরণতাড়িতের ন্যায় তড়িৎগতিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। গোপনে তোমায় যে কথা জানাব তাতে তুমি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সে কথার গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এই পত্রবাহকেরাই তোমায় আমার কাছে পৌঁছে দেবে। রোজেনক্রানজ আর গিলডেনস্টার্ন সিধে ইংলণ্ডে চলেছে। তাদের সম্পর্কে তোমায় বলবার অনেক কথা আছে। এখন এই পর্যন্ত। তোমারই হ্যামলেট'

চল, তোমাদের চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা এখনি করছি। তার পরই তোমরা আমায় গন্তব্য জায়গায় পৌঁছে দিও। [প্রস্থান]

৭ম দৃশ্য। দুর্গপ্রাসাদের অপর এক কক্ষ

[রাজা ও লেয়ার্টিসের প্রবেশ]

রাজা। এখন শুনিলে সবই, বুঝিলেও সব;
হত্যা যে করিল তব শ্রদ্ধেয় পিতারে
সে চাহে আমারও প্রাণ।
আমি যে নিরপরাধ
এখন তো হ'লে নিঃসংশয়?
বন্ধু বলি' গণ্য তবে করহ আমারে।

লেয়া। বুঝিতেছি। তবু আমি চাহি জানিবারে
এতবড় অপরাধ, জঘন্য উৎকট,
কোন্ শাস্তি হ'ল না তো তার;
আত্মরক্ষা, রাজধর্ম, কিংবা সুবিচার
যে দিক হইতে দেখি
সে শাস্তি তো প্রাপ্য ছিল তার।

রাজা। ছিল দুটি বিশেষ কারণ ;
তোমার নিকটে তাহা তুচ্ছ হতে পারে,
মোর কাছে অতি গুরুতর।
রাণী তার মাতা,
বাঁচিয়া আছেন তিনি তারই মুখ চেয়ে ;
গুণ দোষ যাই বল
আমিও তো সে রাণীর মায়ায় মোহিত,
নিজকক্ষপথে বাঁধা নক্ষত্রের মত
তারে ছাড়া গতি মোর নাই।
দ্বিতীয় কারণ,—
প্রকাশ্য বিচারে মোর হয় নি সাহস ;
প্রজাসাধারণ তার এত অনুরাগী,
ভক্তিরসে দোষ তার গুণ হয়ে যেত ;
আমারি নিক্ষিপ্ত বাণ তারে না বিঁধিয়া
বিপরীত বায়ুভরে হানিত আমায়।

লেয়া। তা হ'লে, এমনিভাবে,
হারালাম স্নেহময় পিতা,
একমাত্র ভগিনীর হ'ল বুদ্ধিনাশ,
যার তুল্য গুণবতী
কোন যুগে কোন দেশে দেখে নাই কেহ।
বেশ, এর যোগ্য প্রতিহিংসা আমিও লইব।

রাজা। এ নিয়ে ক'রো না নিজ নিদ্রার ব্যাঘাত।
এই সব অপমান সহিব নীরবে
হেন অপদার্থ আমি নই।
আরও কিছু অচিরাৎ পাইবে শুনিতে।
পিতা তব শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন আমার,
নিজেরেও শ্রদ্ধা করি আমি।
এ হতে বুঝিতে পার,—

[দূতের প্রবেশ]

কী ব্যাপার? সংবাদ কি?

দূত। কুমারের পত্র মহারাজ;
এই পত্র আপনার, এখানি রাণীর।

রাজা। কুমারের পত্র! কে আনিল?

দূত। শুনিলাম, নাবিকেরা; আমি দেখি নাই।
ক্লডিয়ো দিল মোরে;
সে পেয়েছে কয়জন নাবিকের হাতে।

রাজা। লেয়ার্টিস, পত্রমর্ম তুমিও শুনিবে।
যেতে পার। [দূতের প্রস্থান]

(পত্র পাঠ করিতেছেন)

"প্রবলপ্রতাপেষু,

আপনার রাজ্যমধ্যে আমি উলঙ্গ অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। কাল ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শনের আশা রাখি। অনুমতি পাইলে আমার এই আকস্মিক ও ততোধিক বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তনের সমস্ত ব্যাপার আপনাকে জ্ঞাত করিব।—হ্যামলেট"

অর্থ কি ইহার? সকলেই ফিরেছে কি?
অথবা এ প্রতারণা, কোন ভিত্তি নাই!

লেয়া। হস্তাক্ষর পরিচিত তব?

রাজা। হ্যামলেটের হস্তাক্ষর। "উলঙ্গ!"
পুনশ্চের মাঝে লেখা রয়েছে—"একাকী"!
তোমার কি মনে হয়?

লেয়া। এ তো মোর বুদ্ধির অতীত মহারাজ!
কিন্তু, আসুক না ফিরে,
আমার জিঘাংসু চিত্ত
মুখের উপর স্পষ্ট কহিবে তাহারে
'এ কীর্তি তোমারই!'

রাজা। কি ভাবে সে ফিরে এল, এল কি এল না,

বুঝি না কিছুই।
যাই হোক লেয়ার্টিস,
চলিবে কি মোর মতে?

লেয়া। আপত্তি কি মহারাজ,
যদি আমি শান্তিপথে না হই চালিত।

রাজা। তোমারই স্বস্তির পথ।
সে যদি ফিরিয়া থাকে
না মানিয়া আমার নির্দেশ,
পুনরায় ফিরে যেতে নাহি চাহে যদি,
বুদ্ধি করি অন্য পথে লইব তাহারে
যা হতে নিষ্কৃতি তার নাই।
মৃত্যুর কারণ তার রটিবে না বাতাসেরও শ্বাসে,
তাহার জননী নিজে হবে নিঃসংশয়
মরিল সে দুর্ঘটনাবশে।

লেয়া। আপনারই পথে তবে নিশ্চয়ই চলিব, মহারাজ!
আরও ভাল হয়
আমারে করেন যদি নিমিত্ত কারণ।

রাজা। বিধিরও নির্দেশ যেন তাই।
বিদেশে যাওয়ার পর হতে
তোমারই কথাই কহে সবে;
একটি বিষয়ে নাকি জুড়ি নাই তব।
হ্যামলেটও শুনেছে তাহা,
শুনিয়া অবধি ঈর্ষা জন্মেছে তাহার
অযোগ্য অন্যায়।

লেয়া। কী বিষয়ে মহারাজ?

রাজা। দুই মাস হ'ল গত নর্ম্যাণ্ডি হইতে
এসেছিল একজন।
ফরাসীরা অশ্বপৃষ্ঠে দক্ষ অতিশয়,

স্বচক্ষে দেখেছি আর ভুক্তভোগী আমি।
কিন্তু এরে দেখি মনে হ'ল যাদুবিদ্যা জানে;
জিনের উপর যেন প্রোথিত গ্রথিত,
অপূর্ব কৌশলে অশ্ব ঘুরিছে ফিরিছে
অশ্ব আর অশ্বারোহী অভিন্নশরীর।
দেখে মনে হ'ল,
এ হ'তে অদ্ভুত কিছু হতেই পারে না।

লেয়া। নর্ম্যাণ্ডির লোক?

রাজা। নর্ম্যাণ্ডিরই লোক।

লেয়া। তা হ'লে সে ল্যামণ্ড, নিশ্চয়।

রাজা। ঐ নামই বটে।

লেয়া। তারে খুব জানি; সমস্ত দেশের রত্ন
মুকুটের মণি।

রাজা। তার মুখে শুনিলাম প্রশংসা তোমার।
শতমুখে বাখানিয়া শৌর্য বীর্য তব
কহিল সে,—অসিযুদ্ধে সমকক্ষ নাই।
তব সহ অসিরণে যে কোন নর্ম্যান
সহসা ভুলিয়া যায়
সঞ্চালন, নিবারণ, সন্ধান-কৌশল।
এ কথা শুনিয়া
ঈর্ষাবিষে জর্জর হ্যামলেট
ভাবে সদা কবে তুমি ফিরিবে স্বদেশে,
কবে বা সে আহ্বানিবে দ্বন্দ্বরণে তোমা।
তা হ'লে, এ হতে,—

লেয়া। এ হতে কী মহারাজ?

রাজা। লেয়ার্টিস, তোমার পিতাকে তুমি ভালবাসিতে কি?
না, তুমি নিতান্ত কোন পটে আঁকা ব্যথা,
প্রাণহীন রঙিন মুখোশ?

লেয়া। এই প্রশ্ন কেন করিলেন ?
রাজা। পিতাকে বাস না ভাল সে কথা বলি না।
কিন্তু আমি জানি নিজ অভিজ্ঞতা হতে
ভালবাসা হ্রাস পায় যত দিন যায় ;
যে পলিতা ধরি জ্বলে প্রেমের প্রদীপ
তারি মুখে বাড়ে সুখে শিখার কালিমা।
অতি-ভাল বহে বুকে নিজ ধ্বংস-বীজ।
কিছুই শাশ্বত নহে ; করি করি ক'রে
করিবার ইচ্ছা ক্রমে ক্ষয় পেয়ে যায়।
সে যা হোক, হ্যামলেট আসিছে ফিরিয়া।
তুমি যে পিতার পুত্র,
কী প্রমাণ দেবে তার, কথা নয়, কাজে ?
লেয়া। সে যদি আশ্রয় লয় দেবতা-মন্দিরে
তথাপি ছেদিব কণ্ঠ তার।
রাজা। হত্যাকারী বধ্য বটে যেখানে লুকাক ;
প্রতিহিংসা সর্বত্র অবাধগতি জানি।
কিন্তু বৎস লেয়ার্টিস, শুনিবে কি মোর কথা ?
আমি বলি, নিজ গৃহে রহ লুকাইয়া ;
হ্যামলেট আসিলে
তাহাকে জানানো হবে তুমিও ফিরেছ।
তোমার যশের কথা দ্বিগুণ করিয়া
শোনানো হইবে তারে।
যথাযোগ্য পণ রাখি
অসিক্রীড়া করিও দুজনে।
সে খুবই অমনোযোগী
অসন্দিগ্ধ উদারহৃদয়,
ভাল ক'রে দেখিবে না অসির ফলক।
তুমিও সুযোগ বুঝে, হাতের কৌশলে

বাছিয়া লইবে এক খরমুখ অসি
ক্রীড়াযুদ্ধে নিষিদ্ধ যা ;
যুদ্ধকালে লঘুহস্তে অন্যায় আঘাতে
পিতার হত্যার তব লবে প্রতিশোধ।

লেয়া। সম্মত হলাম আমি।
উদ্দেশ্য সাধিতে মম, অসিমুখে মাখাইব বিষ।
এ বিষ কিনেছি এক হাতুড়ের কাছে,
এত তীব্র,
কিছুমাত্র পশে যদি মানব-শোণিতে
বাঁচাতে পারে না তারে ধন্বন্তরী আর।
সেই বিষমাখা অসি
বারেক স্পর্শিতে যদি পারে অঙ্গ তার
মৃত্যু তবে ধ্রুব।

রাজা। আরও ভাবা যাক।....
এ বুদ্ধি হইলে ব্যর্থ নৈপুণ্য অভাবে
দ্বিতীয় কৌশল কোন হাতে থাকা ভাল।
থাক্, ভেবে দেখি। উভয়ের নৈপুণ্য বিচারে
নিশ্চয় ধরিব পণ শপথ করিয়া।
হয়েছে!
উদ্দেশ্যসিদ্ধির তরে দেখো যেন ক্রমে
যুদ্ধবেগ হয়ে উঠে প্রচণ্ড ভীষণ ;
তা হ'লে বাজির শেষে শুষ্ককণ্ঠ হয়ে
অবশ্যই হ্যামলেট চাহিবে পানীয়।
তার তরে যে পানীয় রাখিব প্রস্তুত
একটি চুমুকই তার যথেষ্ট হইবে।
তোমার অসির বিষে যদি রক্ষা পায়
তবু জেনো কার্য সিদ্ধ হবে।

[রাণীর প্রবেশ]

রাণী। দুঃখের পিছনে দুঃখ আসে দ্রুতপদে ;
লেয়ার্টিস, ভগ্নী তব ডুবে মারা গেল।

লেয়া। ডুবে মারা গেল ! কোথায় গো ?

রাণী। নদীটির ঢালু পাড়ে ছিল এক বকুলের গাছ,
কাচস্বচ্ছ জলে নাচে ঘন পত্রচ্ছায়া ;
আকন্দ, ভাণ্ডীর, বেলি, চাঁপা, কুরুবক
নানা ফুলে গাঁথি ল'য়ে অদ্ভুত মালিকা
বালিকা চলিয়াছিল ডাল বেয়ে বেয়ে
শাখাশীর্ষে পরাইতে মালা।
সহসা প্রশাখা ভাঙি
প'ড়ে গেল কুলুস্বনা স্রোতস্বতী-নীরে।
প্রসারিত বসনের ভেলার আশ্রয়ে
কিছুক্ষণ ভাসি স্রোতে, জলদেবী সম,
সুনিশ্চিত মরণের মুখে উদাসীনা
পুরানো গানের কলি লাগিল গাহিতে।
মনে হ'ল জলেই বসতি বুঝি তার।
কিছু পরে, সিক্ত পরিচ্ছদভারে,
কণ্ঠ ভরি সুরে, তলাইয়া গেল দুর্ভাগিনী
পঙ্কময় অতল মরণে।

লেয়া। তা হ'লে সে ডুবে মারা গেল ?

রাণী। ডুবেই সে মারা গেল, ডুবে মারা গেল।

লেয়া। অভাগিনী ওফেলিয়া,
অথই অগাধ জলে দিলি তুই প্রাণ
তাই এ চোখের জল ফিরাইতে চাই।
কিন্তু সে যে মানে না বারণ,
মানুষের এই দুর্বলতা
চক্ষুলজ্জা পারে না ঠেকাতে।

এ অশ্রু ফুরায়ে গিয়ে—
কবে মোর নারীত্ব ঘুচিবে ?
মহারাজ, বিদায় এখন।
জ্বলিয়া উঠিতে চাহে অগ্নিময় বাণী,
পোড়া নয়নের জল দেয় নিবাইয়া। [প্রস্থান]

রাজা। পিছু পিছু আমরাও যাই পার্থ ভ'।
যে রোষ করিনু শান্ত প্রচুর আয়াসে
জ্বলিয়া উঠিল বুঝি পুনঃ।
চল চল, আমরাও যাই। [প্রস্থান]

[ক্রমশ]

অনু° যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সংবাদ-সাহিত্য

আচার্য বিনোবা ভাবে পদব্রজে বঙ্গদেশের সীমানা অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি বাঁকুড়া হইতে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া উড়িষ্যা যাইবেন। আগামী ১৭ই-১৮ই জানুয়ারি তিনি খড়্গপুরের নিকটবর্তী বলরামপুর আশ্রমে অবস্থানকালে বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের সহিত মিলিত হইতে চান। তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী আমরা বাংলা দেশের যাবতীয় সাহিত্যিককে আহ্বান জানাইতেছি, তাঁহারা যেন যথাসময়ে দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিনোবাজীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। যাঁহাদের প্রয়োজনের অধিক আছে তাঁহারা, যাঁহাদের একেবারেই নাই তাঁহাদিগকে জমি দিবেন—ভূদান-যজ্ঞের সহজ সাধারণ অর্থ ইহা হইলেও ইহাকে কার্যকরী করিতে হইলে যে তপস্যা ও যজ্ঞের প্রয়োজন, স্রষ্টা শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাজ তাহার মর্ম ও মহিমা উপলব্ধি করিবেন—বিনোবাজী সম্ভবত তাহাই চান। এই ক্ষণিক ও সাময়িক ঘটনাকে তাঁহারাই শাশ্বত ও চিরন্তন গৌরবে মণ্ডিত করিতে পারেন। তাহা করিতে তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হউন

আর নাই হউন, এই যজ্ঞের হোতাকে তাঁহারা দেখিবেন, তাঁহার কথা শুনিবেন তাহাও কম লাভ নয়। সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আশা করি, সকলেই তাহা গ্রহণ করিবেন।

—

জনশ্রুতি আছে, লক্ষ্মণাবতীর এক বাদশাহ পথের কুকুরদের শীতার্ত দেখিয়া নিজের গায়ের শাল-দোশালা পরাইয়া দিতেন। এই নিদারুণ শীতের মধ্যে যে সকল সাহিত্যিক সেখানে সমবেত হইতেছেন তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর জীব। শাল-দোশালার আশা না থাকিলেও বিবিধ পুলক তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। বাঙালীর (সংস্কৃতির) ইতিহাসের সহিত সংস্কৃতির রূপান্তর এবং তৎসহ পরমপুরুষের সমন্বয় যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা ভাগ্যবান। বাঈজীর নৃত্য ফাউ। বস্তুগত লভ্য যাহা তাহা অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় বাদশাহী আমলে দরিদ্রের ক্রন্দন তুলিয়া লাভ করিয়া বসিয়া আছেন। অবশিষ্ট আছে কিঞ্চিৎ মজা। আশা করি, সাহিত্যিকদের ভাগ্যে সেটুকু জুটিবে।

—

আমাদের পূজ্যপাদ রাজাজী দক্ষিণমেরুতে আণবিক বোমাগুলি বিসর্জন দিয়া আমেরিকা ও রুশিয়াকে পৃথিবীকে ভয়শূন্য করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। বেদের ঋষিরা "মা মা হিংসীঃ" বলিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব অহিংসা প্রচার করিয়াছিলেন, যীশুখ্রীষ্ট বাম গালে চড় খাইলে ডাহিন গাল পাতিয়া দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, গান্ধীজী অহিংসার জন্য প্রাণ দিয়াছেন এবং জওহরলাল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। এই সকলই ধোঁয়াটে আবেদন। রাজাজী ধোঁয়া-পছন্দ করেন না, তিনি একেবারে বস্তু ধরিয়া টান মারিয়া ফেলিতে চান। শিশুরা বহুকষ্টে-অর্জিত খেলনা আঁকড়াইয়া আছে, চড় মারিয়া কাড়িয়া না লইলে তাহারা তাহা ছাড়িবে না। শুধু কথায় চিঁড়া ভিজে—এখন পর্যন্ত তাহা প্রমাণিত হয় নাই। হইলে বুদ্ধ-যীশু-গান্ধীর প্রচারের পর পৃথিবী দেবস্থান হইয়া যাইত। চড় না মার, চড়ের

ভয় দেখাও। পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিরা সমবেতভাবে সেই চেষ্টা করিতেছেন। রাজাজীর কাছে আমাদের অনুরোধ, তিনি নজরটাকে কিঞ্চিৎ নামাইয়া ঘরের দিকে নিক্ষেপ করুন। বিহারে বাঙালী ও বাংলা-ভাষার উপর যে অত্যাচার চলিতেছে, তাহা আণবিক বোমা প্রয়োগ অপেক্ষাও ভয়াবহ। আমেরিকা-রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও রুশিয়া-জওহরলালকে অনুরোধ করিয়া তিনি যদি তাহা নিবারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বদেশের সর্বাধিক কল্যাণ করিবেন। একচক্ষু অতুল্য ঘোষের কাতর আর্তনাদ তাঁহার একচক্ষুতে নিশ্চয়ই পড়িয়া থাকিবে। যিনি গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সঙ্কটে পথনির্দেশ করিয়া আসিতেছেন, একদা তাঁহার শাসিত বাংলার—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি বাংলার এই নিদারুণ লাঞ্ছনা তিনি কি বিহারী রাজেন্দ্রপ্রসাদের মুখ চাহিয়া উপেক্ষা করিবেন? সীমানা-নির্ধারণ-কমিশনের ন্যায়পরতাকে বানচাল করিবার জন্য যে কদর্য ষড়যন্ত্র বিহারে হইতেছে, তাহার স্বরূপ ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সমঝাইবার উপযুক্ত লোক একমাত্র তিনিই আছেন। তাঁহার বিশ্বপ্রসারী দৃষ্টিকে সংহত করিয়া একবার ভারতের পূর্বাঞ্চলে তিনি নিক্ষেপ করুন, যে অন্যায়-অবিচার সেখানে ঘটিতে যাইতেছে, সময় থাকিতে তাহার প্রতিকার করুন—তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা। তাঁহার উদার দৃষ্টি নিউইয়র্ক, মস্কো পর্যন্ত ধাওয়া করিয়াছে, ইহা দেখিয়াই আমরা তাঁহার শরণাগত হইতে ভরসা পাইতেছি।

—

হিসাব করিয়া দেখিলাম, গত ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পক্ষকালের মধ্যে ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক, আন্তঃপ্রাদেশিক, সাহিত্য-শিল্পকলা-সঙ্গীত-নাট্য-নৃত্য এবং অন্যান্য বিষয়ক তিন শত একচল্লিশটি সম্মেলন বসিয়াছে। কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা জানা অসম্ভব নয়, কিন্তু কত বাক্যব্যয় হইয়াছে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিসের শরণাপন্ন না হইলে তাহা জানিবার উপায় নাই। শব্দ যদি ব্রহ্ম হন, তিনি এই পনের দিনেই ব্রহ্মদৈত্য হইয়া মানুষের ঘাড়ে ভর করিবার জন্য উসখুস করিতেছেন। অতঃপর সভা-সমিতির বক্তাদের সন্দেহের

চক্ষে দেখিয়া কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন করিলে আমরা বুদ্ধিমানের কাজ করিব।

—

চিন্ময় শ্রীমনোজ বসু রুশিয়া দেখিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ মৃন্ময় হইয়াছেন দেখিয়া আমরাও আশ্বস্ত হইলাম। অগ্রহায়ণের 'মাসিক বসুমতী'তে "চীন দেখে এলামে"র কিস্তিতে দেখিতেছি তিনি লিখিয়াছেন—

"এক প্রান্তে নিরিবিলি একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে—এই যে বলা হয় ভিখারি নেই মোটে এদেশে—শতচ্ছিন্ন পোশাক-পরা বুড়োমানুষটা কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাই। লোকটা সরে গেল; অদূরে এক বাড়ির উঠানে গিয়ে উঠল। সেখান থেকেও অমনি তাকাচ্ছে। কিন্তু পরদেশে বাড়ির উঠান অবধি হামলা দিয়ে দয়া দেখাতে সাহসে কুলায় না। হাজার দুই ইউয়ান (ইয়েন?) দোভাষির হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, দিয়ে এসো লোকটাকে—"

বাঁচা গেল, সোনার নূতন চীনে তাহা হইলে আমরাও আছি। সোনার সবটা সোনা নয়, খাদও আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা যাহা আছে তাহা দেখিয়া আমরা—পাবলিশাররা পুলকিত হইয়াছি। নয়া চীন আর কিছু হউক না হউক, পাবলিশারদের স্বর্গ। মনোজ ভায়া লিখিয়াছেন—

"লেখকেরা রয়ালটি পান ওখানে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট। এবং শুধুমাত্র বই লিখে চলে না, অন্য কিছু করতে হয়। আমার বাংলা দেশের লেখকের অবস্থা এর চেয়ে ভাল বই মন্দ নয়।"

প্রকাশক মনোজ বসু সাফাই গাহিবার জন্য এই মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন কিনা জানি না, বিড়াল কিন্তু থলি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শতকরা দশ যদি বাংলা দেশে শোষণ হয়, নয়া চীনে নয় কেন? দরিদ্র লেখকদের শোষণ করিয়া নয়া চীনেও পাবলিশাররা যদি ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে, তাহা হইলে আফিম ছাড়িয়া, টিকি কাটিয়া, ছোট পা বড় করিয়া কি লাভটা হইল? প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়—হাউ মাউ সে তুং?

—

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি যদিও লিখিয়াছেন, "দেশে দেশে কলত্রাণি, দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ," কিন্তু দেখিতেছি 'দেশে' তারাশঙ্করের বান্ধব নাই। থাকিলে যে স্থান প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, প্রবোধ, প্রতিভার পুরাতন স্বনির্বাচিত গল্পের উচ্চপ্রশংসায় মুখর, তারাশঙ্করের স্বনির্বাচিত প্রসিদ্ধ গল্পগুলিই বা সেখানে নিন্দিত হয় কেন? শ্রী ত্যাগ করিবার কালে আমরা তারাশঙ্করকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলাম, যে নিজে শ্রী ত্যাগ করে তাহার ভাগ্যে লাঞ্ছনা আছেই। শ্রীহীন তারাশঙ্করের গল্পগুলিকে বিগতশ্রী বলিয়া 'দেশ' তাহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিয়াছেন।—আমরা খুশি হইয়াছি।

—

ভারতবর্ষের নারীরা যে এখনও আক্ষরিক পুথি-বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষাকেই চরম শিক্ষা বলিয়া মনে করেন না, শ্রীমা সারদা দেবীর জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবে তাহা দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষিতা মহিলারা দলে দলে ইহাতে যোগ দিয়া বক্তৃতা ও ভাষণের মধ্য দিয়া অকুণ্ঠভাবে ইহাই প্রচার করিয়াছেন যে, সহজ পারিবারিক সামাজিক ধর্মবুদ্ধি লইয়াও নারী আত্মিক শক্তিবলে সর্বজনপূজিত হইতে পারেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের দেশের শিক্ষিত নারীদের এই স্বীকারোক্তি উনবিংশ শতাব্দীর একপেশে আদর্শকে অনেকখানি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

—

কবি যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গত সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে ("১৩ই আষাঢ় ১২৯৪") আমাদের অজ্ঞতাবশত পুস্তক-তালিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। প্রথমে বহরমপুরের শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস এবং পরে কবির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সুনীলকান্তি এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা লিখিয়াছিলাম—কবির 'গান্ধী-বাণী-কণিকা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ঠিক নয়। বহরমপুরের "নিরীক্ষা প্রকাশনী" হইতে শ্রীউমানাথ সিংহ এই পুস্তক প্রকাশ করেন। শ্রীমান উমানাথকে

লেখামাত্র তিনি এক খণ্ড পুস্তক পাঠাইয়া সন্দেহ নিরসন করিয়াছেন ও ওই সঙ্গে পুস্তিকা-রচনার কাহিনীও বিবৃত করিয়াছেন।

এই পুস্তকটি আমাদের গত সংখ্যায় প্রকাশিত গ্রন্থতালিকায় তৃতীয় অর্থাৎ "অনুবাদ ও অনুসরণ" বিভাগের প্রথম এবং ক্রমিক সংখ্যার নবম গ্রন্থ হইবে, সুতরাং পরের দুইটি গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যার বদল হইবে। 'গান্ধী-বাণী-কণিকা'র জ্ঞাতব্য তথ্য এই :—

৯। গান্ধী-বাণী-কণিকা [কাব্য], প্রকাশক শ্রীউমানাথ সিংহ, নিরীক্ষা প্রকাশনী, বহরমপুর (পশ্চিম বাঙলা)। পৃ. ৪+৩+৪৪।

কবিতার সংখ্যা—ভূমিকা "হে রাম" ও পরিশিষ্ট "গান্ধীজীর ইংরেজী বিবৃতি হইতে ছন্দে সঙ্কলিত", "শেষ অনশন" লইয়া মোট ৬২। আশ্বিন ১৩৫৫ [১৯৪৮], দেড় টাকা।

এই পুস্তকের রচনা সম্পর্কে শ্রীমান উমানাথের বিবৃতি এই—

গান্ধীজীর তিরোধানের পর এক সন্ধ্যায় কবির কাছে (বহরমপুরের বাড়িতে) গেছি নিরীক্ষার পাঠকদের জন্য কিছু চেয়ে আনতে। অনেক কথাই হচ্ছে। আমি হঠাৎ বললাম, "আচ্ছা, গান্ধীজীর উপর আপনি একটি কবিতা লিখুন। অনেক কবি অনেক কিছু লিখেছেন—আপনি তো কিছু লেখেন নি।"

কবি বললেন, "কি যে লিখব মাঝে মাঝে আমি তা ভাবি। আমার কাব্য-মানসের মধ্যে গান্ধীজীকে ঠিক ধরতে পারি না তাই বোধ হয় সঠিক কাব্যরূপও মনের মাঝে ভেসে ওঠে না।"

আমরা দুজনেই চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরেই তিনি বলে উঠলেন, "তা ছাড়া কি বলব, গান্ধীজীকে? শিবের পরিচয় দিতে গেলে বলব মহাদেব—মহাদেবের পরিচয়ে বলব শিব। তাতে লাভটা কী হবে।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, আপনাকে আমি একখানা বই পড়তে দেব। সে বইখানা পড়লে আমি বিশ্বাস করি আপনার কাব্যমানস গান্ধীজীর রূপ ঠিক তৈরী করে ফেলবে।"

কবি বললেন, "কী বই?"

বললাম, "গান্ধীজীরই রচনা। এক-একটি বিষয় নিয়ে।"

কবি বলে উঠলেন, "কালকেই আমাকে বইখানা দেবে।"

পরের দিন আমার বইখানা পৌঁছে দিয়ে এলাম।

দিন কয়েক পর। আবার গেছি কবির কাছে। কবি বললেন, "উমানাথ, এ তো তুমি কাব্য দিয়ে গেছ আমাকে। তিন-চার পৃষ্ঠার বেশী আমি পড়তেই পারি-নি।"

বাইরে বসে ছিলেন। ঘরের ভিতর ঢুকে তিনি বললেন, "এসো, ঘরে এসো—দেখ কী কাণ্ড করেছি।"

এই বলে তিনি একটি খাতা বের করে আমাকে একটার পর একটা গান্ধী-বাণীর কাব্যানুবাদ শোনাতে লাগলেন।

কবি বলে উঠলেম, "এ-কাব্য তুমিই আমাকে দিয়ে সৃষ্টি করিয়েছ। তোমাকেই দেব—প্রকাশ ক'রো। প্রচ্ছদপটের উপর এই লাইনগুলো যেন থাকে।" বলে তিনি পড়ে শোনালেন—

"সর্বমানবে বুকে পাইবার
সাধনা যদি গো না পুরে এবার
মিটিবে মিটিবে সে সাধ আমার
কোনো জন্মান্তরে।"

বললাম, "বেশ, তাই হবে।"

দপ্তরীর ঘর থেকে প্রথম দশ কপি বই নিয়ে এসে তুলে দিলাম তাঁর হাতে।

তিনি প্রচ্ছদপটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, "গান্ধীজী নিজেই কাব্য।"

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে হেমচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী (বাঁধানো দুই খণ্ডে এবং 'বিবিধ' সমেত প্রত্যেকটি গ্রন্থ আলাদা আলাদা) বাহির হইয়াছে—ইহা একটি সাহিত্যিক সংবাদ। হেমচন্দ্রের প্রচলিত খণ্ড-কাব্যগুলিতে ও বিবিধ প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীগুলিতে নানা কারণে অনেক ভুল অনুপ্রবেশ করিয়াছে। পরিষৎ হেমচন্দ্রের জীবিতকালের সকল সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া যত দূর সম্ভব নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'বিবিধ'-খণ্ডে কবির ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ও এতাবৎ-পুস্তকাকারে-অপ্রকাশিত বহু কবিতা পরিচয় সহ প্রকাশিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের স্মৃতি এতদিনে যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া পরিষৎ বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

—

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্র-বিচিত্র' ও অবনীন্দ্রনাথের 'মাসি' বাংলা-সাহিত্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সাম্প্রতিক "অবদান"। 'চিত্র-বিচিত্রে'র পরিচয়ে প্রকাশক বলিতেছেন—

"'সহজ পাঠ' রচনার সমকালে (পৌষ ১৩৩৬) ছোটো ছেলেমেয়েদের আনন্দপ্রদ ও পাঠোপযোগী এমন কতকগুলি কবিতা লেখা হয় যেগুলি এপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই। প্রধানতঃ ঐ কবিতা ও 'সহজ পাঠ'এর কবিতা মিলাইয়া, সেই সঙ্গে কবির অপরিচিত বা অল্পপরিচিত অন্য কতকগুলি রচনা সাজাইয়া, 'চিত্র-বিচিত্র' প্রকাশিত হইল।"

'নন্দলালের অনেক ছবি বইখানির বৈশিষ্ট্য।

'মাসি' অবনীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায় তিনটি কথা-কাহিনীর সমষ্টি। কাহিনীগুলির নায়ক অবু অর্থাৎ স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ। শ্রীপরিতোষ সেন-চিত্রিত।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় শ্রীপুলিন সেন-সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যে'র যে নূতন সংস্করণটি বাহির করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অনেক লুপ্ত অথচ অপরিহার্য সংবাদ দিয়া সেন মহাশয় বইখানিকে সাহিত্যসেবীমাত্রেরও অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছেন, অনেক পরিত্যক্ত অথচ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ আমরা ফিরিয়া পাইতেছি, সেন মহাশয়কে ধন্যবাদ।

—

অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধের বই গত কিছুকালের মধ্যে বাহির হইয়াছে, বাংলা-সাহিত্যকে সেগুলি শুধু সমৃদ্ধ করিতেছে তাহা নয়, তাহার প্রসারও বৃদ্ধি করিতেছে। শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য' (দীপায়ণ, কলিকাতা) এইরূপ একখানি বই। গ্রন্থকার বহু যত্নে প্রচুর সহানুভূতির সহিত উর্দু হিন্দী মৈথিলী ওড়িয়া অসমীয়া তামিল তেলেগু কানাড়ী পাঞ্জাবী মালয়ালম্ সিন্ধী কাশ্মীরী গুজরাতী মারাঠী প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্যের সহিত বাঙালীর পরিচয় সাধনের প্রয়াস করিয়াছেন। অবহেলার দ্বারা অপরিচয়ের যে ব্যবধান এতকাল সৃষ্ট হইয়াছে, শ্রীমান শান্তিরঞ্জন তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া সকল বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। তাঁহার গ্রন্থের বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বহুধাবিস্তৃত, সুতরাং প্রথম সংস্করণে কিছু অসম্পূর্ণতা, কিছু ত্রুটি থাকিবারই কথা। পরবর্তী

সংস্করণে সেগুলি নিশ্চয়ই দূর হইবে। উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ, সেখানে সম্পূর্ণতা আসিতে বিলম্ব হইবে না।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পালের 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী) এইরূপ আর একখানি বই। গ্রন্থকার পারস্যভাষায় দক্ষ, ব্রাউন সাহেবের উপর নির্ভর করিয়াই কাজ সারেন নাই। অনেক নূতন এবং অনেক প্রয়োজনীয় খবর তিনি সরবরাহ করিয়াছেন। ইরানের সহিত বাংলার যোগ বহুকাল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। পাল মহাশয় পুনঃ যোগ-স্থাপনের একটা উপায় করিলেন।

এই পর্যায়ে আর একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস-সংকলিত 'বিজ্ঞান-ভারতী বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান' (এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ)। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানরচনায় ও বিজ্ঞানের গ্রন্থপাঠে বইখানি সকলের সহায় হইবে। এইরূপ একখানি বইয়ের অভাব আমরা দীর্ঘকাল অনুভব করিতেছিলাম।

ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'টি. বি. সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য'ও এই বাংলা-সাহিত্য-প্রসারের পর্যায়ে পড়ে। যে ব্যাধি জাতির মজ্জায় প্রবেশ করিয়া দিনে দিনে তাহাকে হীনবল করিতেছে, সেই ব্যাধির সূত্রপাত, ক্রমবিকাশ, পরিণতি ও প্রতিকার সম্পর্কে সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করিয়া ডাঃ দাশগুপ্ত জাতির হিতৈষীদের শ্রেণীভুক্ত হইলেন। রোগী এবং অরোগী সকলেরই এই বই পড়িয়া দেখা উচিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত ডেভিড রিকার্ডোর পৃথিবীখ্যাত গ্রন্থ 'অন্ দি প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব পলিটিকাল ইকনমি অ্যাণ্ড ট্যাক্সেশন' গ্রন্থের অনুবাদ 'অর্থনীতি ও করতত্ত্ব'ও এই পর্যায়ে পড়ে। অনুবাদক শ্রীসুধাকান্ত দে। ৫০০ পাতার এই বইখানি দে মহাশয় বহুযত্নে মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করিয়া বাংলার অর্থনীতি-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

—

নিছক বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা-গ্রন্থও এই কালে কম বাহির

হয় নাই। সর্বাগ্রে নাম করিতে হয় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের (ক্যালকাটা বুক হাউস)। মঙ্গলকাব্যের বৃহৎ ইতিহাস লিখিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় আজ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। লোক-সাহিত্য বিষয়ক বর্তমান গ্রন্থখানি তাঁহার প্রতিষ্ঠা আরও বাড়াইয়া দিবে। অধীত বিদ্যার উপরেই লেখকের বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত নহে, তিনি বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এবং প্রয়োজন হইলে ভারতবর্ষের বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হাতে-কলমে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন আলোচ্য বইখানি তাহারই ফল। সুতরাং কৌতূহলী পাঠক এবং গবেষক সকলেরই নির্ভরযোগ্য। ভট্টাচার্য মহাশয় প্রবাদ ও পুরাকাহিনীকেও তাঁহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বইখানিকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন।

মধুভক্ত ও মধুস্মৃতিরক্ষায় আবাল্য যত্নবান স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের দীর্ঘকাল-অপ্রাপ্য 'মধুস্মৃতি'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বাঙালী সাহিত্যরসিক মাত্রেই উল্লসিত হইয়াছেন। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দুষ্প্রাপ্য 'Captive Ladie'র সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের ইংরেজী বাংলা অনেক ভাল জীবনী থাকা সত্ত্বেও 'মধুস্মৃতি' সাহিত্যিক মাত্রেরই নিত্যব্যবহার্য, ইহাকে মধুসংবাদের আকরও বলা চলে। নূতন সংস্করণে বহু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সংশোধিত ও পূর্ণ হইয়াছে।

গোপাল হালদারের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' (এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ) বাংলা-সাহিত্যের প্রাক্-উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যযুগের সুললিত সুন্দর কাহিনী, ইহা পাঠে সাধারণ পাঠক মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিবেন। হালদার মহাশয়ের রচনার মধ্যে পলিটিক্স একটু আধটু উঁকি মারিলেও ধারাবাহিক কাহিনী কোথাও ক্ষুণ্ণ বা ব্যাহত হয় নাই। কাব্যনিদর্শনগুলিও সুনির্বাচিত হইয়াছে।

'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (মিত্র ও ঘোষ) এবং 'রবীন্দ্র-বিচিত্রা' (ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি) রবীন্দ্র-প্রবেশক-সাহিত্যে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর নূতনতম সংযোজন—সক্ষম ও সুন্দর সংযোজনও বটে। 'ছোট-গল্পে'র শেষে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের তথ্যমূলক পরিশিষ্ট প্রমথনাথের

বিশ্লেষণের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 'রবীন্দ্র-বিচিত্রা' রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও বিবিধ রচনা সম্পর্কে কয়েকটি সরস অথচ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রমথনাথের তীক্ষ্ণ অথচ মধুর লিখনভঙ্গি পাঠককে অতিসহজে বিষয়বস্তুর মর্মস্থলে পৌঁছাইয়া দেয়। এই দুইটি গ্রন্থেও সেই গুণ পরিলক্ষিত হইল।

—

বলা বাহুল্য, বৎসর যখন শেষ হইতে চলিল তখন বিবিধ ডায়েরিও পাইয়াছি। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ-এর বড়, মেজো, সেজো ও ছোট; এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ-এর বড়, সেজো, ছোট; রসময় প্রিন্টিং হাউসের প্লাষ্টিকের খোলেভরা ছোট; বেঙ্গল কেমিক্যালের ছোট; কিরীট অ্যাড ভার্টাইজিং এজেন্সির মেজো, ছোট—সকলগুলির কল্যাণে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমরা নিজেরা তো নিয়মানুগ ও সভ্যানুগ হইয়াছিই, আরও পাঁচজনকে বিলাইয়া ওইরূপ হইতে সাহায্য করিয়াছি। কোম্পানিগুলির জয়জয়কার হউক।

—

শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশার্থে যে সব রচনা আমাদের হাতে জমিয়া আছে এবং এখনও জমিতেছে, যথাসত্বর সেগুলির সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। প্রেরকগণ ঘন ঘন তাগাদার বদলে ধৈর্য ধরিয়া আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিলে সব দিক দিয়া সুবিধা হয়।

———

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ২৮৩৮

শনিবারের চিঠি
২৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৬১

নতুন বছরের ডাইরি

আশা

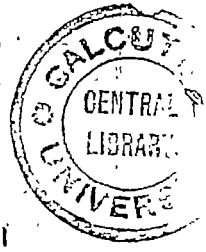

বন্ধ দুয়ার খোল্ রে হৃদয়, খোল্
উষর মরুভূ পার হয়ে এল নতুন হাওয়ার দোল।
বয়স হয়েছে অনেক যদিও পেকেছে যদিও চুল
পদে পদে আজও অসাবধানীর ঘটিতেছে বহু ভুল।
সেইটুকু তোর আশা—
বেদান্ত আর সাংখ্য পারে নি ভুলাইতে ভালবাসা।

জীবন-নদীতে এখনো পাতিয়া কান
শুনিবারে পাস্ শিশু-নিঝরের কুলুকুলু কলগান।
উপল-চপল হাসিতে তাহার ডোবে সাগরের ডাক,
ভোরের রাগিণী সন্ধ্যার রাগে করিতেছে নির্বাক।
সেইটুকু তোর আশা—
কাঁচাইয়া দিল সব পাকা ঘুঁটি শেষ দানে তোর পাশা।

চিত্তনিরোধ বৃথাই করিছ কবি,
একেলা বসিলে দেখ না নয়নে ভাসে এলোমেলো ছবি!
কত ক্ষণিকের চকিত চাহনি শাশ্বত দিঠি মেলে,
ভেঙে-জোড়া-লাগা বক্ষ আবার দীর্ঘনিশাস ফেলে।
সেইটুকু তোর আশা—
সব শান্তিরে অশান্ত করি' জাগেন সর্বনাশা॥

মানুষ

আধেক স্বপ্ন; আধ জাগরণ—তাই বিভ্রম লাগে,
স্বপ্নের ঘোরে বাহিতে হেরি জেগে থাকি অনুরাগে।
হায় অসহায়, হায় রে মানুষ,
নয় নঠন—জাপানী ফানুষ,

নাহি দেয় আলো, ক্ষণ শোভা ধরি' জ্ব'লে যায় শেষাশেষি,
জড়প্রকৃতির জলুষে তাহার দাম নয় এর বেশি।

যন্ত্রী চালায় যন্ত্রেরা চলে—এইটুকু ইতিহাস
যন্ত্রের গলে রসিক যন্ত্রী পরান স্বপ্ন-ফাঁস।
থর থর কেঁপে ভাবে অচেতন,
সেই তো চালায়, সে করে সৃজন;
অলক্ষ্যে রহি মালিক তখন টানেন সুতাটি ধরি,
পুতুল মানুষ সেই টানে টানে ফিরিছে নৃত্য করি।

আধেক স্বপ্ন, আধ জাগরণে মানুষে করি সৃজন
"আমি-আমি" এই অভিমানে তার ভ'রে যিনি দেন মন,
সে মহাকবিরে জানাই প্রণাম,
চিনি না তাঁহারে নাহি জানি নাম;
পরিণাম শুধু জানা আছে, খেলা তাঁহাতেই পাবে লয়,
মাঝখানে বৃথা অভিমান ক্ষোভ, বৃথা মায়া মোহ ভয়।

সৃষ্টিরহস্য

পুষ্পকোরকে রসিক ভ্রমর মাঝে মাঝে বসে আসি।
ফুলের বিকাশ লক্ষ্য কি তার? মধু লোভে তারে ভজে।
রসপানে ভোর মত্ত ভ্রমর সুখের সাগরে ভাসি
কুসুমে নিষেক ক'রে যায় তার বহে-আনা পরাগে।
অতি সাধারণ লালসায় ফুল ক্রমে ফল হয়ে ওঠে,
প্রকৃতির এই মহারহস্য কে বোঝে অর্থ তার?
মন্ত্রবিহীন মিলনে নিখিল-কুসুম-চিত্ত ফোটে
কাননোদ্যান-অরণ্যে শোভে থরে থরে ফলভার।
প্রাচীনা ধরার এই ইতিহাস, উদ্ভিদ প্রাণীভেদে
কামনা সফল হয় শেষাশেষি নিষ্কাম ফল দিয়ে,

বন্দনা-গান গেয়েছে ঋষিরা উপনিষদে ও বেদে
ষট্‌পদ-পদে পদে পদে গড়া বিশাল সৃষ্টি নিয়ে।
বিবশ কামনা ফললাভে হয় সজ্ঞান চেতনা যে,
মাতৃস্তন্যে সেই কামনাই অমৃত হইয়া ক্ষরে;
প্রেম হয় জয়ী মানবেতিহাসে, কাম ম'রে যায় লাজে—
চিরন্তনের লীলা হয় জয়ী ক্ষণিকের খেলাঘরে॥

সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ

আকাশের তারা—আছে অনন্তকাল
তব মুখপানে নীরবে চাহিয়া আছে;
ঘোরা রজনীতে ঘেরিলে তমসাজাল
প্রকাশ তাহারা পাইবে তোমার কাছে।
তারা চিরদিন তব প্রতীক্ষা করে
আলোর জলুসে তুমি আছ দিশাহারা,
যবে প্রবেশিবে গুহাশায়ী অন্তরে
আকাশে উজল হইবে হাজার তারা।
আঁধারে আলোকে চিরব্যবধান জানি।
আঁধারে তারায় শাশ্বত ভালবাসা,
প্রগাঢ় তিমিরে গাঢ়তর কানাকানি—
তারাহারে হাসে নিশীথ সর্বনাশা।
আঁধারে নিজেরে লুকাইতে পার যদি
গভীর ভাবের তিমিরে ডুবিতে পারো,
জ্ঞানের তারকা অন্তরে নিরবধি
জ্বলিবে তোমার—কাটিবে অন্ধকারও॥

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

জলদান ছেড়ে মেঘ হ'লে নীল আকাশের আবরণ,
মুক্তি তাহার কভু ঘটিবে না। গগনের প্রাঙ্গণ

মেঘ-বিদ্যুতে ঝলকিবে শুধু ; কাঁদিবে আর্তস্বরা
তৃষায় কাতর শস্যোন্মুখী ঊষর বসুন্ধরা।
চিরদিন তারে উড়ায়ে মারিবে ঊনপঞ্চাশ বায়ু
সলিল-নিষেকে নিজে না মরিলে। স্তম্ভিত-পরমায়ু
মনোহর মেঘ হইবে ভীষণ, ধরণীর অভিশাপ,
আপন ধর্মে নিধনও শ্রেয় যে, পরের ধর্ম পাপ।
এই সংসারে মানে না মানুষ আপন ধর্মটাই,
স্বস্থানে কেহ থাকিতে চাহে না, বদলাতে চায় ঠাঁই।
কবি করিতেছে রাজনীতি, লেখে কাব্য রাষ্ট্রনেতা,
সংসারী যিনি তিনি ধরিছেন সন্ন্যাসীদের কেতা।
যার যা ধর্ম, যার যা কর্ম—করে যেবা নিষ্ঠায়
তারি নাম থাকে অক্ষয় হয়ে ইতিহাস-পৃষ্ঠায়।
তবু ভুল ঘটে, জলভরা মেঘ বর্ষণ নাহি করি,
স্বধর্মে মোরা বাঁচিতে চাহি না, পরধর্মেই মরি।

পোস্টাফিস-পরিক্রমা

সেকালে যখন ছাপাখানা ছিল না, তখন ব্রহ্মচর্য-পালনের দ্বারা স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে যাবতীয় গ্রন্থ—মায় অভিধান পর্যন্ত—মুখস্থ করার রেওয়াজ ছিল। একালে ছাপাখানা হওয়ার দরুন ব্রহ্মচর্য-পালনের বালাই ঘুচে গেছে। কিন্তু মুখস্থ করার সমস্যা একেবারে ঘোচে নি। যেমন, এই কলকাতার চল্লিশটি পোস্ট-অফিসের 'জোনাল নম্বর' মনে রাখা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে নীচের কবিতাটিতে। প্রত্যেকটি পোস্ট-অফিসের আদ্যক্ষর জোনাল নম্বর অনুযায়ী যথাক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে একাধিক পোস্ট-অফিসের নামের আদ্যক্ষর একই—যথা, কাশীপুর কালী-ঘাট, বাগবাজার বালীগঞ্জ, আমহার্স্ট স্ট্রীট আলিপুর, বড়বাজার বরিষা বড়তলা বরাহনগর, বেলিয়াঘাটা বেলগাছিয়া বেহালা প্রভৃতি—সে-সব স্থলে পার্থক্য-নিরূপণের জন্য গোড়াকার দুটি অক্ষরও নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি সংস্কৃত ছন্দের মতো লঘু-গুরু উচ্চারণ-ভেদে পঠিতব্য। প্রতি চরণে ষোলটি মাত্রা হিসেব ক'রে ছন্দোরক্ষা করতে গিয়ে দু-চারটে পোস্ট-অফিসকে সন্ধির বন্ধনে বাঁধতে হয়েছে; যেমন, আম্+বে=আম্বে, এন্+ট্যা=এণ্ট্যা, বালী+এ=বাল্যে, কালী+আ=কাল্যা প্রভৃতি। "বেহ্" শব্দের "হ্"-টি লুপ্ত অ নয়, লুপ্ত হ।

জেকাবাশ্যা হাবিববর্ষা।
আম্বেনাবৌ ধরএণ্ট্যাপা॥
সাবড়বাল্যে ফোহেখিদগা।
ভকাল্যাদরা ঘুঘুঢাযাটা॥
বেহ্আল্ বর্বেল্লাশাতিরিজে।
পোস্টাফিসশ্চ চত্বারিংশঃ॥

১। জে=জেনারেল পোস্ট-অফিস; ২। কা=কাশীপুর; ৩। বা=বাগবাজার; ৪। শ্যা=শ্যামবাজার; ৫। হা=হাটখোলা; ৬। বি=বিডন স্ট্রীট; ৭। ব=বড়বাজার; ৮। বর্ষা=বরিষা; ৯। আম্=আমহার্স্ট স্ট্রীট; ১০। বে=বেলিয়াঘাটা; ১১। না=নারিকেলডাঙা; ১২। বৌ=বৌবাজার; ১৩। ধর=ধরমতলা; ১৪। এণ্=এণ্টালি; ১৫। ট্যা=ট্যাংরা; ১৬। পা=পার্ক স্ট্রীট; ১৭। সা=সার্কাস; ১৮। বড়=বড়তলা; ১৯। বালী=বালীগঞ্জ; ২০। এ=এলগিন রোড; ২১। ফো=ফোর্ট উইলিয়ম; ২২। হে=হেষ্টিংস; ২৩। খিদ্=খিদিরপুর; ২৪। গা=গার্ডেন রিচ; ২৫। ভ=ভবানীপুর; ২৬। কালী=কালীঘাট; ২৭। আ=আলিপুর; ২৮। দ=দমদম; ২৯। রা=রাসবিহারী অ্যাভিনিউ; ৩০। ঘুঘু=ঘুঘুডাঙা; ৩১। ঢা=ঢাকুরিয়া; ৩২। যা=যাদবপুর; ৩৩। টা=টালিগঞ্জ; ৩৪। বেহ্=বেহালা; ৩৫। আল্=আলমবাজার; ৩৬। বর্=বরাহনগর; ৩৭। বেল্গা=বেলগাছিয়া; ৩৮। শা=শাহপুর; ৩৯। তি=তিলজলা; ৪০। রিজে=রিজেণ্ট পার্ক।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

আমার সাহিত্য-জীবন

সতরো

আমার সাহিত্য-জীবনের পালায় এবারের মত এইখানেই ছেদ টানব। সাহিত্য-সাধনার প্রারম্ভে একদিন জেলখানা থেকে সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিলাম যে, বাংলার রাজনৈতিক কর্মীজীবনের কথা সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ করব। জীবন—অন্তত মানুষের মধ্যে প্রাণশক্তি—বিপ্লবধর্মী প্রগতিশীল; প্রতি মুহূর্ত সে তার অতীতকে অতিক্রম ক'রে ভবিষ্যতের পানে নূতন উপলব্ধির পথে চলেছে; সে উপলব্ধি নূতন সত্যের উপলব্ধি, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, মহৎ থেকে মহত্তর সৎ-এর উপলব্ধি। সমাজগত জীবনে, জাতিগত জীবনে এই পথের প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে ভেঙে চুরে অনুকূল ও সমতল করার কর্মের মধ্যে তার অভিব্যক্তি। এক এক সময় এক-একটা ক্ষেত্রের বাধা কঠিন এবং রূঢ় হয়ে ওঠে। তখন প্রাণশক্তির সকল বেগ একত্রিত হয়ে তাতে আঘাত করে। সমাজগত বা জাতিগত জীবনের মধ্যেই তখন ব্যক্তিজীবনযুদ্ধ সম্মিলিত হয়ে বৃহৎ ও মহতের সৃষ্টি করে।

মহিষাসুরের অভ্যুদয়ে চণ্ডীতে আমরা পাই—বিভিন্ন দেবমহিমা ও শক্তি একত্রিত হয়ে মহাশক্তির সৃষ্টি করেছিল এবং সকল দেবতাই তখন ওই পূর্ণতার মহিমার মধ্যে অনাস্বাদিত মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিল। তেমনই একটি মহিমার আভাস আমি অনুভব করেছিলাম এ জীবনের প্রারম্ভে—এবং তারই মহিমাকীর্তনের ও রূপের অপরূপ প্রকাশ-সৌন্দর্যের কথা বলবার একদা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছিলাম। তাই, ১৯৪৭ সনে যেদিন ভারতবর্ষ পরাধীনতার অসুরকে পরাজিত ক'রে মহামহিমায় প্রকটিত হলেন, সেই দিনই প্রকৃত পক্ষে এক পালা শেষ হ'ল। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত সাহিত্য-জীবনের প্রায় কথাই বলেছি। ঘটনার কথা অন্তত বলেছি। কিন্তু মানুষের কথা বলা হয় নি। সে কথা অনেক। জাতির জীবনে যে মহিমা দেখলাম, যে ক্ষুদ্রতা দেখলাম, তা মানুষেরই মহিমা, মানুষেরই ক্ষুদ্রতা। ক্ষুদ্রতার চেয়ে মহিমাই বড়। অন্তত আমার চোখে তাই পড়েছে।

মানুষের মহিমাকে প্রণাম জানাই। রবীন্দ্রনাথ অপরূপকে দুই চোখ ভ'রে সর্বত্র দেখে গেছেন। মানুষের মহিমার মধ্যেও সেই অপরূপেরই প্রকাশ। মানুষের ক্ষুদ্রতা, তাকেও প্রণাম করি। আমার কুলধর্মে আমি জেনেছি, শ্রদ্ধা-কান্তি মেধা পুষ্টি প্রেম ত্যাগ তৃপ্তির মধ্যে যাঁর প্রকাশ, অপ্রেম অশ্রদ্ধা হিংসা প্রভৃতির মধ্যেও তাঁরই প্রকাশ। যিনি সত্যরূপিণী, তিনিই ভ্রান্তিরূপিণী। মানুষের প্রথম মিথ্যা ভ্রান্তিবশে। মাতৃদেবতাকে প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রান্তিরূপিণীকেও প্রণাম করতে হয়।

এই ভ্রান্তিরূপিণী মহাশক্তির প্রকাশের বিচিত্র রূপ আমার একবার দেখবার একটি যোগ এসেছিল জীবনে। সেই যোগ আমার জীবনের এক শ্রেষ্ঠ যোগ। বোধ করি সকল পুরস্কারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, সকল তিরস্কারের তীব্রতম তিরস্কার।

ঘটনাটি ঘটেছিল স্বাধীনতা-লাভের অব্যবহিত পরেই; সুতরাং যেখানে ছেদ টানতে চাই, সেখানকার স্থানকালবিচারে বাহুল্য হবে না। আমার 'সন্দীপন পাঠশালা'র চিত্ররূপ নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনার কথা বলছি।

প্রথমেই বলব যে, ভ্রান্তির সূত্রপাত করেছিলাম আমিই। কারণ বাংলার অন্যতম প্রগতিশীল মাহিষ্য সম্প্রদায় ও চাষী-কৈবর্ত যে এক সম্প্রদায় তা আমি ঠিক জানতাম না। পুণ্যবতী রাণী রাসমণি, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমল, মাতঙ্গিনী হাজরা এবং বাংলার আরও বহু গুণবান ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের লোক, আমার স্বগ্রামের কাছাকাছি গ্রামের চম্পাদিদি ও তার ভাইয়েরা যে সেই একই সম্প্রদায়ের লোক, তা আমি জানতাম না। চম্পাদিদিরা নিজেদের চাষী-কৈবর্ত বলতেন, মাহিষ্য বলতেন না। ১৯২৭।২৮ সনে বীরভূমে যে সেটেলমেণ্ট হয়েছে তার রেকর্ডে এঁরা এঁদের নাম লিখিয়ে নিজেদের দাস উপাধির পাশে বন্ধনীর মধ্যে লিখিয়েছেন, কৈবর্ত। ঠিক এইভাবে—কালিপদ দাস (কৈবর্ত)। আমাদের অঞ্চলে এঁদের আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত দীন এবং সমাজেও এঁরা তেমনই অবজ্ঞাত। এক দাস উপাধি ছাড়া অন্য উপাধি শুনি নি। আমার ভ্রান্তির মূল ওইখানেই। লেখবার পূর্বে সমাজতত্ত্ব জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে

আমার অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। কিন্তু আমার রচনায় কোথাও চাষী-কৈবর্ত নায়কের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ আমি করি নি। বরং সমাজ যে অবজ্ঞা প্রকাশ করে তারই প্রতিবাদ করেছিলাম আমি। জাতি ও জন্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞার মত পাপ আর হয় না। তবুও আমার ভ্রান্তি থেকেই অন্ত পক্ষেরও ভ্রান্তিরই উৎপত্তি হ'ল। 'সন্দীপন পাঠশালা' ছবিঘরে মুক্তি পাবামাত্র ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন শক্তি। কয়েক দিনের মধ্যেই মাহিষ্য-সমাজের একাংশে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল। নানা কুৎসিত পত্র পেতে আরম্ভ করলাম। নানা ভীতিপ্রদ পত্র এল। সংবাদপত্রের চিঠিপত্রের স্তম্ভটি পত্রে ভ'রে উঠল। আমি বললাম স্পষ্ট ক'রে—মাহিষ্য সম্প্রদায় ও আমার বইয়ের নায়ক এক সম্প্রদায় নয়। বাদে-প্রতিবাদে জাতিতত্ত্ব, পুরানো সেন্সাস রিপোর্ট ইত্যাদির উল্লেখ হতে লাগল। পুলিস কমিশনার এর জন্ত ছবিখানি দেখলেন। তিনি রিপোর্ট দিলেন—যদি কোন সম্প্রদায়ের আপত্তি করবার থাকে তো সে আছে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের, মাহিষ্যদের নয়।

ঘটনার তারিখ ২৭শে চৈত্র। বোধ হয় রবিবার। হাওড়ায় একটি ব্যায়াম সংঘের পঁচিশ বৎসর পূর্তির উৎসব। আমি সভাপতি, স্বর্গীয় উপেনদা প্রধান অতিথি, 'আনন্দবাজারে'র খেলাধুলা-বিভাগের সম্পাদক ব্রজবাবু বিশেষ অতিথি। ঘটনার দিনের আগের দিন শনিবার সকালে গিয়েছিলাম রামপুরহাট, রাত্রেই রামপুরহাট থেকে রওনা হয়ে সেই দিনই সকালে কলকাতা পৌঁছেছি। সারারাত্রি ট্রেনে দাঁড়িয়ে আসতে হয়েছে। ইচ্ছা ছিল সকালেই প্রাতঃকৃত্য সেরে বিশ্রাম করব। কিন্তু সে দিন সকালেই এসে উপস্থিত হলেন, হিন্দী-সাহিত্য-সংঘের সম্পাদক বি. এম. সিংহী। তাঁদের ওখানে যাবার কথা ছিল। সেখানে গিয়ে বাড়ি ফিরলাম বারোটায়। স্নানাহার সেরে অগাধ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, আমার ছেলে ডাকলে। হাওড়া থেকে গাড়ি নিয়ে লোক উপেনবাবুকে নিয়ে এসেছে। অপেক্ষা করছে।

বেশ মনে পড়ছে, ঘুম ভেঙেই মনে হ'ল, যাব না। তার কারণ যতঃ

কুৎসিত অশ্লীল গালিগালাজপূর্ণ ভীতিপ্রদ চিঠি পেয়েছি, তার নব্বুই ভাগই এসেছিল হাওড়া থেকে। মনে হ'ল সভাতে বাদ-প্রতিবাদের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। এ ছাড়াও, একজন শিক্ষক-বন্ধু আমাকে ব'লে গিয়েছিলেন, হাওড়ায় তিনি এক ছাত্রের ওখানে তাদের কারখানায় শঙ্কাজনক কথাবার্তার আভাস পেয়ে এসেছিলেন। সব এক মুহূর্তে মনের মধ্যে খেলে গেল। মুখে এল—ব'লে দাও, শরীর খারাপ, যাব না। কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে হ'ল, সে কি? এ ভয়কে প্রশ্রয় দিলে এর শেষ কোথায়? তখনই বিছানা ছেড়ে উঠে কাপড় পাল্টে তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেলাম। মনের মধ্যে যেটুকু সংশয় ও শঙ্কা ছিল তার সবটুকুই সদানন্দময় রসিকচূড়ামণি উপেনদার হাস্য-পরিহাসের মধ্যে কোথায় ভেসে গেল। সেখানে সভার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধতার আভাস পেলাম না। কিন্তু ফেরবার পথে অকস্মাৎ মুহূর্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর মূর্ত হয়ে উঠল। একটা রাস্তার মোড় ফিরেই গাড়ি আটকে গেল। রাস্তাটা গোটা বেঞ্চ-টুল-কাঠকাটরা দিয়ে ব্যারিকেড ক'রে আটকানো। গাড়ি থামতেই রাস্তার দু পাশের গলির ভিতর থেকে—এখান ওখান থেকে—বোধ করি আড়াই শো তিন শো লোক বেরিয়ে এল। গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। পথের ইলেকট্রিক বাতির ঈষৎ রক্তাভ আলো তাদের ক্রুদ্ধ মুখের ওপর পড়েছে। চোখে তাদের ক্রোধ। মুখ থমথম করছে। আশ্চর্য, কোলাহল ছিল না প্রথমটা। উপেনদা পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ। ব্রজবাবু নির্বাক। আমি সম্মুখে দেখলাম, জনতার বিরাট আকারের মধ্যে মৃত্যুর আকার।

প্রথম একজন প্রশ্ন করলেন, কই তারাশঙ্কর?

ড্রাইভার বললে, তিনি এ গাড়িতে নেই। পিছনে আসছেন।

আমি এবং উপেনদা পিছনের সীটে পাশাপাশি ব'সে। আমার দিকে গাড়ির পাশে যাঁরা ছিলেন আমি তাঁদের প্রশ্ন করলাম, কি বলছেন বলুন? আমি তারাশঙ্কর।

জানি না কোন্ পুণ্যবল আমার ছিল, হয়তো সে পিতৃপুরুষের, হয়তো সে আমার ইষ্টদেবীর অভয় আশীর্বাদ, যার ফলে আমি তখন ভয়শূন্য,

আমি প্রতীক্ষা করছি একটি চরম আঘাতের। আমার চোখের সম্মুখে অন্তত পাঁচ শোর বেশি ক্রুদ্ধ চোখের নিষ্করুণ হিংসাতুর দৃষ্টি জ্বলছে। আমার কথার উত্তরে একজন খালি-গা রোদে-পোড়া গৌরবর্ণ গোঁফদাড়ি-কামানো ব্যক্তি বললেন—এ রকম বই লিখতে কোথায় শিখেছ? সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজার জানলা দিয়ে মুখের উপর পড়ল একটি প্রচণ্ড ঘুষি। ডান দিকের ঠোঁটটা কেটে ফাঁক হয়ে গেল। আবার পড়ল ঘুষি ডান চোখের পাশে হনুর উপর। চশমাটা ছিটকে গাড়ির মধ্যেই প'ড়ে গেল। আবার পড়ল ঘুষি। যিনি ঘুষি মারছিলেন—তিনি ব্যায়ামপারদর্শী, শরীরের গঠনে শুধু স্বাস্থ্যবানই নন—রীতিমত বক্সিংয়ে পারঙ্গম। ঈষৎ খর্বকায়, চওড়া কাঁধ, চওড়া বুক, রঙ কালো তাঁর মুখও মনে রয়েছে আমার। এর মধ্যেই ড্রাইভার একটু পথ ক'রে প্রায় ফুটপাথ ঘ'ষে খানিকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু অল্প—হাত বিশেক যেতে না যেতেই দু ধার থেকে জনতা এসে আবার ঘিরে ফেললে গাড়ি। কয়েকটা ঢেলা এসে পড়ল গাড়ির গায়ে।

—কই তারাশঙ্কর?

এবার আমি হাতের চশমাটা (কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এর মধ্যে) উপেনদার হাতে দিয়ে অন্য হাতে গাড়ির হ্যাণ্ডেল ধরলাম। বললাম, বলুন কি বলছেন? আমি নামছি। ঢেলা ছুঁড়বেন না। আমি ছাড়া অন্য কাউকে আঘাত তো করতে চান না আপনারা!

জীবনে ভুলব না। একটি পরম স্নেহস্পর্শময় কোমল উষ্ণ হাতের ঈষৎ চাপ অনুভব করলাম। উপেনদা আমার হাতে চাপ দিয়ে আমাকে যেন কিছু বলতে চাইলেন। ফিরে তাকালাম, দেখলাম স্থিরদৃষ্টি নিষ্কম্প মূর্তিটির মাথাটি বারেকের জন্য নড়ল। বললেন, না।

ওদিকে পিছনে গাড়ির কাচখানা প্রচণ্ড আঘাতে ঝনঝন শব্দ ক'রে ভেঙে পড়ল আমাদের মাথার ওপর। একখানা ইট এসে পড়ল। সামনের জানলা দিয়ে একজন প্রৌঢ় একটা শক্ত কিছু দিয়ে আমার মাথায় কপালে আঘাত করতে লাগলেন।

গাড়ি আবার পথ ক'রে নিয়ে চলল, এবং কোন একটা সংকেতে

জনতা স'রে গেল। খানিকটা এসে গাড়ি আবার আটকাল। জনতা ঘিরে ধরল। এবার বাড়ির দরজায় বারান্দায় লোক দেখলাম। একজন বললেন, আপনি নেমে আসুন।

আমার জামার সামনেটা তখন রক্তে রক্তাক্ত। ঠোঁট কপাল মাথা থেকে রক্ত পড়ছে? কিন্তু ভয় আমার নেই। আমি বললাম, গাড়ি থেকে আমি নামব না। আমাকে খুন করতে চান, বাইরে থেকেই ছুরি মেরে গাড়ির ভেতরে খুন করুন। আমার দেহটা পায়ের চাপে ধূলোয় মিশিয়ে যেতে আমি দেব না।

উত্তরে একটি শীর্ণকায় তরুণ আমাকে বললে, ফার্স্ট এড দোব আমরা।

আমি বললাম, তার প্রয়োজন নেই। যদি আমার ওপর আর কোন অত্যাচারের অভিপ্রায় না থাকে, তবে গাড়ি ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি গিয়ে ফার্স্ট এড নেব। আর অন্য অভিপ্রায় থাকলে আমি বলেছি, যা করবার করুন, আমি গাড়ির ভিতরে থাকব।

উপেনদা আমার হাত ধ'রে ব'সে আছেন। স্তব্ধ নির্বাক।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ড্রাইভার কিন্তু কলকাতা এল না। বললে, মালিকের কাছে এই অবস্থা না দেখিয়ে সে নিয়ে যেতে পারবে না।

সেখানে ডাক্তার এল, পুলিস এল।

বলতে ভুলেছি গাড়ির ভিতর থেকে পাওয়া গেল—এক পাটি জুতো, একখানা ইট। ওই জুতোটা দিয়েই আমার মাথায় দ্বিতীয়বার আঘাত করেছিলেন কেউ। ইটখানা দিয়ে পিছন থেকে কাচ ভেঙেছিল।

এরই মধ্যে আমি আমার সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমার কোন অভিযোগ নেই, কারুর উপর নেই। কেন থাকবে? এরা তো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের আক্রোশে আমাকে আক্রমণ করে নি! এরা তো কম ভাল আমাকে বাসত না! আমি নিশ্চয়ই এদের মর্মে আঘাত দিয়েছি। এ তারই প্রতিঘাত। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সুবর্ণবাবু নিজে এসেছিলেন। তাঁকেও আমি এই কথাই বলেছিলাম। এর কয়েক মাস পরে পুলিস কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ক'রে একটা

মামলাও করেছিল। তার মধ্যে প্রথম দুজন নিশ্চয় ছিলেন। আমি চিনতেও পেরেছিলাম, কিন্তু সনাক্ত করি নি। কারণ তাদের ওপর কোন অভিযোগ আমার ছিল না। ভ্রান্তিবশে আমিই আঘাত করেছি আগে।

ঘটনাটি আমার মুখের উপর চিহ্ন রেখে গেছে। অন্তরে কোন দাগ নেই, ফেলতে পারে নি। ভ্রান্তিরূপিণী সেদিন ভয়ঙ্করী মূর্তিতে দেখা দিয়ে আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ প্রসাদ দিয়ে গেছেন। আমিই তাঁকে জাগ্রত করেছিলাম আমারই ভ্রান্তি দিয়ে। কয়েকটি জিনিস আমি সযত্নে রেখে দেব সংকল্প করেছিলাম। আমার রক্তমাখা ছেঁড়া জামাটি, ওই আঘাত-করা জুতোর পাটিটা, ইটখানা এবং রুমাল একখানা —সেখানাও রক্তমাখা। কিন্তু রুমালখানা ছাড়া অন্যগুলি পুলিস নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয় নি।

আবার মাহিষ্য-সম্প্রদায়ের একটি অংশের যে উদার এবং সস্নেহ প্রকাশ দেখেছি, সেও আমার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এ সম্পর্কে দুখানি চিঠির কিছু তুলে দিচ্ছি। এক পক্ষের ক্ষোভের সে যে কি তীব্রতা, তা এই চিঠিখানিতে রয়েছে। চিঠিখানি আমাকে লেখা নয়। মাহিষ্য-সম্প্রদায়ের একজন নেতাকে লেখা চিঠি। চিঠিখানি বিচিত্রভাবে আমার কাছে এসেছিল। কেউ ওই চিঠিখানি ওই নেতার বাড়ি থেকে আমার কেয়ারকে রিডাইরেক্ট ক'রে পাঠিয়ে দেন। বোধ হয় আমার অবগতির জন্যই পাঠিয়েছিলেন। তখন সব মিটে গিয়েছে। কিন্তু কেস মেটে নি। বোধ হয় কেসের তদন্তে সুবিধার জন্যই পাঠিয়েছিলেন তিনি। চিঠিখানি আমি কিন্তু পুলিসের হাতে দিই নি। সেই কারণেই এখানেও পত্রখানি কাকে লেখা এবং কে লিখেছে, তা প্রকাশ করলাম না।

"মাননীয়েষু, ...বাবু, আমি একজন মাহিষ্য সংবাদপত্রসেবী এবং সমাজের হিতৈষী। সন্দীপন পাঠশালার লেখক তারাশঙ্করের মার-খোরের কথা শনিবার ৩রা বৈশাখের বসুমতী কাগজে দেখিয়াছেন। সাপের মাথাখানে পা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নি...আমার হাওড়াবাসী

বন্ধুদের উচিত ছিল যে তারাশঙ্করকে এ সংসার থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় দেওয়া।...ইতি...”

আর একখানি পত্র—

“পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,...এই সংবাদ শ্রবণে আমরা যে কি প্রকার মর্মাহত হইয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যাইবে না। আমাদের সংঘের অধিকাংশ কর্মী মাহিষ্য। আমি নিজে একজন মাহিষ্য যুবক, সেই জন্য সর্বাগ্রে আপনার নিকট নতজানু হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।... এ গ্লানি মুছিবার নহে।...ইতি—শ্রীশম্ভুনাথ দাস, ভারতী সংঘের সম্পাদক (কামারকুণ্ডু)।”

কলকাতায় টালিগঞ্জ থেকে একদল মাহিষ্য যুবক যে সস্নেহ পত্র আমাকে লিখেছিলেন, তার কথা আজও আমি ভুলতে পারি নি। চিঠিখানি নেই, হারিয়ে গেছে।

এই তো মহারুদ্রের বামরূপ ও দাক্ষিণ্যভরা কল্যাণরূপ। সেই অপরূপের দুই চোখে দুই দৃষ্টি। মুখের বাম দিক ও দক্ষিণ দিক। এই দর্শন জীবনের শ্রেষ্ঠ দর্শন। ভ্রান্তিরূপিণী প্রশান্ত হয়ে মাতৃরূপিণী হয়ে আবির্ভূতা হলেন।

ঠিক এই কারণেই মানুষের মহিমাই আমার কাছে বড়।

এই মহিমা দেখেছি নানা ভাবে। জাতিগতভাবে, সম্প্রদায়গতভাবে ব্যক্তিগতভাবে। ব্যক্তি যাঁদের দেখেছি, তাঁরা কত ভালবাসাই না বেসেছেন! স্নেহে শ্রদ্ধায় প্রীতিতে জীবন-পাত্র পরিপূর্ণ ক'রে দিলেন—পাত্রে ধরল না, উপচে পড়ল।

কত জনের কাছে কত পেলাম! আমার জীবনে পথ-চলার মধ্যে সময়ে-অসময়ে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কতজন হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, পড়বার মুখে রক্ষা করেছেন, সংশয়ের মধ্যে আশ্বাস ফিরে পেয়েছি; আবার দ্রুত চলেছি যখন, তখন তাঁরাই উৎসাহ দিয়েছেন; কতজন পাশে থেকে তৃষ্ণার জল মুখে তুলে দিয়েছেন, যার ফলে দ্রুতগতি দ্রুততর করেছি। আমার মুখে হাসি দেখে তাঁরা খুশি হয়েছেন, চোখে জল দেখে জল ফেলেছেন।

এঁদের অনেকের কথা বলেছি, অনেকের কথা বলা হয় নি। যাঁদের কথা বলেছি তাঁদের মধ্যে আবার একবার নাম করব সজনীকান্তের। আমার জীবনের প্রধান ও প্রথম বন্ধু; সহোদরের মত সুখ-দুঃখের ভাগী; সমবয়সী শিক্ষকের মত প্রীতির সঙ্গে কত শিখিয়েছেন। আমার কত রূঢ় আচরণ, রূঢ় বাক্য হাসিমুখে সহ্য করেছেন। আমি পথ চলেছি, যতটুকু চলতে পেরেছি—আমার চলার পথের দণ্ড তিনি, তাঁর উপর নির্ভর ক'রে চলেছি। তাই তাঁর কথা সব শেষে আবার বলছি।

যাঁদের কথা বলা হয় নি, তাঁদের কথা অনেক। তাঁদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র মজুমদার আজ স্বর্গত। কত প্রীতি, কত সাহায্য তিনি দিয়েছেন। তাঁর কথা স্মরণ ক'রে প্রতিটি স্মরণ-মুহূর্তে নমস্কার জানাই তাঁকে। স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্নেহ স্মরণ করছি।

বাংলা দেশের সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ বাংলার সাহিত্যিকদের যে সমাদর ও শ্রদ্ধা করেন, সাহিত্যিকদের পাথেয়ের মধ্যে তাই হ'ল সমগ্র পাথেয়ের বিশেষ অংশ। 'অমৃতবাজারে'র 'যুগান্তরে'র শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু লেখক ও সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ হিসেবেই নয়; দশ বৎসর ওঁদের প্রতিবেশী হিসেবে বাস করেছি। কত ঋণ ওঁদের কাছে!

'আনন্দবাজার' 'হিন্দুস্থান' 'দেশে'র কর্তা স্বর্গত সুরেশবাবুর নাম করেছি; স্বর্গত প্রফুল্ল সরকার মশায়ের কথা আগে বলেছি। বাংলার খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন তিনি। বর্তমান কর্তা প্রিয়ভাষী শ্রীঅশোক সরকার বাংলার সাহিত্যিকদের প্রতি সেই শ্রদ্ধাই পোষণ করেন।

'বসুমতী'র শ্রীভবতোষ ঘটক বিচিত্র প্রাণবান মানুষ, সামাজিক সহৃদয়তায় ভবতোষবাবুর মত খাঁটি বাঙালী দেখি নি। তাঁর কাছে আমার অনেক ঋণ। বিপদে আপদে, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে, খবর পেলে নিজে ছুটে এসেছেন, বুক দিয়ে কাজ উদ্ধার ক'রে দিয়ে গেছেন। মুখে তাঁর মধুর ভাণ্ডার। বাংলা-সাহিত্যে খ্যাতিমান শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক—শ্রদ্ধাবান তরুণ। সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের প্রতি তাঁর প্রীতি অকপট অকৃপণ। প্রাণতোষই প্রথম 'দৈনিক বসুমতী' আমাকে শ্রদ্ধা সহকারে নিত্য দেবার ব্যবস্থা করেন।

সংবাদপত্রের কর্মী যাঁরা, তাঁরাও অনেকেই সাহিত্যিক। সাহিত্যিকেরা অনেকেই সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে সংবাদপত্রকেই অবলম্বন ক'রে সাহিত্য-সাধনা করেন। তাঁরা বন্ধু, তাঁরা সমধর্মী, তাঁরা জ্ঞাতি। 'অমৃতবাজারে'র শ্রীরবি চৌধুরী আমার পরম হিতৈষী প্রীতিভাজন বন্ধু। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গুণমুগ্ধ বন্ধু আমি। শ্রীবিজয় দাশগুপ্ত অন্তরঙ্গ জন। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রীতিভাজন। 'যুগান্তরে'র দক্ষিণারঞ্জন বসু দশ বৎসর প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁর বাসা এবং আমার বাসায় মাত্র চার-পাঁচ ফুটের ব্যবধান। দক্ষিণারঞ্জন বন্ধু নন, আমার আত্মীয়। এক সময় ডাঃ ধীরেন সেন, শ্রীমোহিত মৈত্র 'অমৃতবাজারে' ছিলেন, তাঁদের প্রীতি জীবনে আমায় কম পাথেয় দেয় নি। 'আনন্দবাজার'-'হিন্দুস্থানে'র শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু। শ্রীমন্মথ সান্যাল প্রীতিভাজন; শ্রীসুবোধ ঘোষ সম্ভ্রমের পাত্র। শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত আমার আত্মিক সাধনার উপদেষ্টা, অন্তরঙ্গ। শ্রীকানাই সরকার একাধারে স্নেহ-প্রীতির অধিকারী। কানাইবাবুর দাদা আমাদের ভজু ডাক্তার সত্যকারের মিতা। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক পরম বৈষ্ণব শ্রীবঙ্কিম সেনকে প্রণাম। শ্রীমান সাগরময় আমার স্নেহের পাত্র।

আর একজন—শ্রীঅমল হোম, আমার অমলদা; অমলদার বাক্যে মধু, প্রকৃতিতে মধু, আকৃতিতে বেশে ভূষায় আচারে আচরণে দাদা আমার চিরতরুণ মনোহর; রসবিচারে ক্ষুরধার বুদ্ধি, রস উপভোগে সুরসিক। বোধ করি পাঁচ বছরেরও বেশি নিত্য সকালে দাদার ঘরে চা খেয়েছি, খবরের কাগজ পড়েছি; তার রসরসিকতার মধুর আস্বাদ নিয়ে দিনের কাজ আরম্ভ করেছি। অমলদার ভাই ব'লেই নীহাররঞ্জনের নামটি তাঁর পরেই মনে আসছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—বিশ্বের দরবারে তাঁর খ্যাতি। কিন্তু পাণ্ডিত্যের প্রশংসা আমি করছি না। করবার আমি কে? তাঁর আমার প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতির কথা বলছি। অমলদার মতই নীহাররঞ্জনও চিরতরুণ। অন্তরের অম্লান পুষ্প-শোভায় ঝলমল-

করা তারুণ্য-তরুর মাধুর্য বাইরে ফুটে আছে তাঁর আকৃতিতে। প্রকৃতির কথা আগেই বলেছি। ডাঃ নীহার রায় আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' প'ড়ে আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীরাজশেখর বসু, আচার্য যদুনাথ সরকারের অকৃত্রিম স্নেহ পেয়েছি, আশীর্বাদ পেয়েছি। নূতন কালের সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রজতুল্য নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্তের মধ্যে এক সত্যবান মানুষকে দেখেছি। সাবিত্রীপ্রসন্ন শৈলজানন্দ প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্যকুমার মনোজ বসু আমার জীবনের পরম প্রীতিভাজন। অচিন্ত্যবাবুই আমাকে প্রথম বই দিয়েছিলেন। 'পরমপুরুষ'-রচয়িতার অন্তর-সাধনার সঙ্গে একটি আন্তরিক যোগসূত্র আছে আমার। প্রেমেন্দ্র আমার বেদনার মুহূর্তে সান্ত্বনাদাতা। বেদনার দিন তাঁর ওখানে ছুটে যাই। তাঁর ওখানে পেয়েছি আনন্দময় ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। প্রমথ বিশী অকৃত্রিম সুহৃদ, উৎসাহদাতা, রসের ভাণ্ডারী এই ছোট মানুষটি কত যে দিলেন—খাতায় তার হিসেব নেই, পাতায় কুলোয় নি।

অনুজদের মধ্যে সর্বাগ্রে নমস্কার জানাই অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যকে। জগদীশ আমাকে অনেক শিখিয়েছেন। বলতে গেলে আমি ছাত্রত্ব বরণ করেছি তাঁর কাছে। আজও তা চলছে। শ্রীবিভূতি চৌধুরীর কথা মনে পড়ছে। তাঁর সঙ্গে আজ সম্পর্ক ক্ষীণ, কিন্তু এক সময় বিভূতি আমাকে অনেক উৎসাহ দিয়েছে। গজেন মিত্র, সুমথ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর—এরা আমার কাছে আমার আপন জন। সাহিত্য-সেবাতেই শুধু নয়, আমার জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল কাজে ঘরের মানুষ। আমার প্রতি জন্মদিনে সেই ঢাকুরিয়া থেকে এরাই আসে সর্বাগ্রে। দলের আগে থাকে গজেন। ওদের কাছে দুঃখে কাঁদতে আমার লজ্জা নেই; উল্লাসে হাসতে সঙ্কোচ অনুভব করি না।

আমার আর একজন ঘরের মানুষ ছোট ভাই ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত—নাট্যকার, শিশু-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নীহার গুপ্ত। 'সন্দীপন পাঠশালা'র আঘাতের পর একটা সময় এসেছিল যখন আমি নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম—মৃত্যুর জন্য। দেহ ভেঙে পড়ছে দ্রুতবেগে, নিত্য ওজন

কমছে, অন্য দিকে বাড়ি তৈরী ক'রে অকস্মাৎ আর্থিক অনটনে পড়েছি। একখানা ছেলেদের বই ছিল, সেখানা নিয়েই গেলাম নীহারের ওখানে। নীহার আমাকে দেখে চমকে উঠল।—এ কি চেহারা হয়েছে দাদা? বললাম সব কথা। নীহার নতুন প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জোর ক'রে আমাকে দিয়ে গেল, কণ্ট্রাক্টে সই করালে। নিজে আমার চিকিৎসার ভার নিলে। দু বেলা দেখতে লাগল। সারিয়ে তুললে। বাঙালী তরুণ সাহিত্যিক কত শ্রদ্ধাবান—নীহার তার প্রতীক।

অধিকাংশ নবীনেরাই এমনই প্রাণবান। তাঁরা শক্তিমান, তাঁরা নূতন ধারা নিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। অনেক স্থলে মতভেদ রয়েছে আমার, তবুও সম্ভ্রমের সঙ্গে স্বীকার করি তাঁদের শক্তিকে। এ ক্ষেত্রে সে বিচার অবান্তর। শুধু ভালবাসার কথা আমি স্মরণ করি। নারায়ণ চৌধুরী আজ আমার প্রায় নিত্য-সঙ্গী। এমন নিষ্ঠাবান জ্ঞানতপস্বী আর দ্বিতীয় আমি দেখি নি যদি বলি, তবে অন্যেরা ক্ষুব্ধ হবেন না। নরেন মিত্র, সন্তোষ ঘোষ, নীরেন চক্রবর্তী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক, রূপদর্শী গৌর ঘোষ সাহিত্যিক হিসেবে, অনুজ হিসেবে সাহিত্যিক দানে ও অনুজের শ্রদ্ধায় ভ'রে দিয়েছে জীবন-পাত্র। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা আগে বলেছি। এই সেদিন আলাপ হয়েছে সমরেশ বসুর সঙ্গে। তার 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' বইখানির মধ্যে অমৃতের আগ্রহ অনুভব করেছি। তার সংস্পর্শে অপরূপ মিষ্টতার স্বাদ পেয়েছি। আজ অজিত গুপ্ত, আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্র দুগার, সুনীল ধর—এরা আমার অতি আপন জন।

প্রণাম এবং প্রীতি জানাই 'জাতিস্মর'-প্রণেতা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসিক ও সুমার্জিত সাহিত্যরচনাকার পরম অন্তরঙ্গ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং শিল্পীপ্রবর বলিষ্ঠ মানুষ দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীকে। তাঁদের পত্রগুলি আমার সম্পদ, আমার সান্ত্বনা। দূরান্তরে থেকেও তাঁরা নিকটতম বন্ধু। পত্রের আদানপ্রদান নেই—তবুও মধ্যে মধ্যে রাত্রে স্বপ্নে তাঁদের সঙ্গে আলাপ চলে। আর একজন সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক নয়—শুধু সাহিত্যিকদের ভালবেসেই

খুশি ; এ মানুষটি আমার সাহিত্যিক জীবনের অনেক দুঃখের ভাগ নিয়েছে, সুখের দিনে অযাচিতভাবে এসে হেসে গেছে। আর একজন পাটুদা—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আমার গোপন মনের ভাণ্ডারী, সকাল-বেলা ওঁকে দেখে আমার দিন ভাল যায়। আর একজন শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। তাঁকে আমি আশীর্বাদ জানাই, তিনি দীর্ঘজীবী হোন।

সবাইকে প্রণাম। সকলের আশীর্বাদে—আমার সাহিত্য-সাধনার পরে জীবন-সাধনা সার্থক হোক।

যাঁদের সঙ্গে স্বল্পপরিচয়, আলাপ নেই, সর্বশেষে তাঁদের উদ্দেশ্যেই আমার শেষ প্রণাম জানিয়ে এ পালায় ছেদ টানলাম। সকলের মধ্য দিয়েই আসুক আমার জীবন-সাধনার পরম সার্থকতা।

[সমাপ্ত]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেণ্ট মেরীর গীর্জা থেকে ভেসে আসছে চার্চবেলের অতি মৃদু ধ্বনি, বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কোথাও হয়তো ঝ'রে পড়ল রাত্রিশেষের কয়েক ফোঁটা শিশির, উচ্চতা যেখানে ক্রমশই উচ্চতর হচ্ছে, শৈলশিখরের সেই প্রকৃতিময় পরিবেশে অধ্যাপিকা রমা বসু চিঠি লিখে চলেছেন রাতের পর রাত। ফেলে আসা অতীতের ব্যর্থ জীবনকে স্মরণ ক'রে শুধু হতাশার দীর্ঘশ্বাসই নয়, চিঠি কথানিতে তাঁর বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আত্মোপলব্ধি উদ্ঘাটিত হয়েছে।

রমা বসু যা চেয়েছিলেন তা পান নি—যা চান নি তাই পেয়েছিলেন। সংসার-জীবনের সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিতা এক অধ্যাপিকার জীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী

দীপক চৌধুরী রচিত

এই গ্রহের ক্রন্দন

আগামী ফাল্গুন সংখ্যা থেকে 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

আত্মস্মৃতি

তৃতীয় প্রবাহ—একাদশ তরঙ্গ

"কে জাগে ?"

আমার স্মৃতিকথায় বন্ধুবর ডাক্তার বিরিঞ্চিবিলাস রায়ের প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই গত ১৯এ পৌষ (৪. ১. ৫৫) তাঁহার ইহলৌকিক জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। যে বয়সে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখন এইরূপ দুর্ঘটনা অনিবার্য ; জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গীরা একত্রে পথ চলিতে চলিতে একে একে বিদায় লইবেন, হতভাগ্যতম যাত্রীকে একেলা মহাপ্রস্থানের পথে চলিতে হইবে—ইহাই ভবিতব্য। যাঁহাদের সহিত সাহিত্য-যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পথেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনা এই যে, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রত্যেকেই কীর্তিমান হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন, আমার ব্যক্তিগত শোক সমগ্র বাঙালী জাতির শোকের দ্বারা লঘু হইয়াছে। কিন্তু বিরিঞ্চিবিলাসের ক্ষেত্রে সে সান্ত্বনা নাই, তিনি আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য সহযাত্রী হইলেও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই, তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ একা আমাকেই বহন করিতে হইতেছে। বিমল দাশগুপ্তের বেলাতেও প্রায় তাহাই ঘটিয়াছে।

একজন শ্রদ্ধেয় শুভানুধ্যায়ী অনুযোগ করিতেছিলেন, ইদানীং 'আত্মস্মৃতি'তে "আমি"র প্রাবল্য ঘটিতেছে। হয়তো ঘটিতেছে। যাত্রার প্রারম্ভে ক্ষুধিত মন চারিদিক হইতে রসদ সংগ্রহ করিতেছিল ; যে সকল মহাজনের চিন্তা ও সাহিত্য-রসে পুষ্ট হইতেছিলাম, আমার লক্ষ্যপথে তাঁহারাই খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছিলেন। বেড়াটাই মুখ্য ছিল, গাছটা গৌণ। তাহার পর গাছ কখন বড় হইয়াছে, চরম পরিণতির দিকে শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারণ করিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে নিজেই তাহা জানিতে পারে নাই ; সংরক্ষণী বেড়ার কথা আর তাহার মনেও নাই। অবোধ গাছ আপন মহিমাতেই মুগ্ধ। নানা দিগ্দেশ হইতে

পক্ষিকুলকে আহ্বান জানাইতেই সে ব্যগ্র। আত্মপরিণতির চিন্তা-লেশহীন ঔদ্ধত্য হয়তো তাহার শালীনতা ও বিবেচনা-বুদ্ধি খণ্ডিত করিয়াছে। আমি দুঃখিত অসাবধানতার জন্য।

১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠের "টুকরি"ই আষাঢ়ে "পান্থ-পাদপ" হইয়া দেখা দিল। রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে হিমালয় কল্পনা করিয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাহার পরে ইহা আমার নবকাব্য অভিযানের দ্বিতীয় ফসল, 'রাজহংসে'র অন্তর্ভুক্ত। আমার একমেবাদ্বিতীয়ম্ উপন্যাস 'অজয়ে'র নায়ক যে কয়জন নারীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, পান্থপাদপ তাঁহারাই; তাঁহাদের সহিত আরও কয়েকজন যুক্ত হইয়াছেন, সকলেই নিষিদ্ধ নাটকের অভিনেত্রী, শুধু একজন ছাড়া, যাঁহার সম্পর্কে মন্ত্রের সমর্থন আছে। নায়ক বলিতেছেন—

ফেল ক'রে ক'রে করিলাম বি. এ. পাস,
ভারি কল্যাণে জীবন-যাত্রা আজো করি নির্বাহ,
আপনার ভুলে বাহিরের বিষে জর্জর হয়ে ফিরি,
স্নেহ-সুধারসে নূতন জীবন লভি।
আকাশের মেঘ নহে এ তো, নহে মেঘেতে বিজলি-রেখা,
পদ্মাও নহে, নহে কাঞ্চননদী,
হিমালয় নহে, সাগরের তটে ওঠে আর ভাঙে ঢেউ,
নহে ঝড়, নহে অবিরল জলধার।
ঘন অরণ্য নহে এর পটভূমি,
এ নহেকো ধূধূ মরুময় প্রান্তর—
চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ-দীপ নহে।
যে গাঁয়ে আমার বহু পুরুষের ভিটা,
যেথায় একদা হঠাৎ আসিয়া বিস্ময়ে আঁখি মেলি
বিচিত্র এই ধরণীর পেনু অপরূপ পরিচয়,
সে গ্রামের সে যে অতি-পরিচিত ছায়া-সুশীতল দীঘি,
কূলে কূলে ভরা কাকের চক্ষু জল।
তীরের বাতাস বনফুলে মধুময়,
অসীম-যাত্রী পথিক-পাখীর পাতা-ছাওয়া নীড়খানি।
বাহির-বিশ্বে বাড়ে আর জলধারে—
হিমালয়-চূড়ে, উত্তাল-ঢেউ অসীম সাগর-বুকে,

মেঘ-বিদ্যুতে বিচিত্র ওই অগাধ শূন্য মাঝে—
বহুবল্লভী পতঙ্গ মন, খুঁজে ফিরে বিস্ময়;
বিস্ময় যবে টুটে, মনখানি ভ'রে যায় অবসাদে—
আতপতপ্ত ধূলিধূসরিত ঘামে ভিজে ওঠে মন,
শীতল দীঘিতে ডুবিয়া শীতল হই,
পাতা-হাওয়া নীড়ে যাপি কালো নিশীথিনী।
গ্রামের কুটীরে স্তিমিত প্রদীপখানি—
সন্ধ্যা ঘনায়, স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত করে মন।
কিছু নাই বিস্ময়?
কে জানিত এই গাঁয়ের দীঘিতে এতখানি বিস্ময়!
বহু বিচিত্র পসরা লইয়া নিথর সরসী-বুকে
একটি একটি করিয়া নয়ন মেলে শিশু-শতদল,
পাতা-হাওয়া নীড়ে শাবক-কাকলি শুনি,
স্তিমিত প্রদীপে স্নেহরস তারা ঢালে।
অবাক হইয়া রহি—
নিরুদ্দেশের যাত্রী পথিক, যাত্রা ভুলিল তার।

কিন্তু যাত্রা-ভোলা পথিকের কাহিনীর শেষ এখানেই নয়। আরও আছে এবং সেই আরোর মধ্যেই তাঁহার কবি-জীবনের আসল রহস্য নিহিত আছে। তিনি উপসংহারে বলিতেছেন—

তোমরা সবাই সত্য আমার অঙ্কের ইতিহাসে,
সবাই মিথ্যা ছায়াছবি পরদায়—
অনাদি অসীম যাত্রা আমার তার ইতিহাস নাই।
মরুপথে যেবা চলিতেছে সখী, মরীচিকা শুনে শুনে
প্রহর গনিয়া চলা কি তাহার সাজে?
আঁখি আসে আর আঁখি স'রে স'রে যায়—
ধূধূ মরুভূমি প'ড়ে থাকে সীমাহীন।
তোমরা এসেছ, তোমরা গিয়েছ স'রে,
একে একে সখী, সব ছায়া রোদ হবে,
সব আঁখি পিছে পথের মতন পিছনে রহিবে প'ড়ে।
জননীর কোল হতে যে নেমেছে ভূঁয়ে,
প্রিয়ার আঁচল বাঁধে তারে কত দিন!

চির-পথিকের অজানা যাত্রাপথে
তোমরা, হে সখী, ছায়াসুশীতল পাদপ হইতে পার,
আঁধার মাটিতে শিকড় গাড়িয়া আছ।
আমার জীবনে শুধু
তোমা সবাকার খণ্ড খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।
এর বেশি কিছু নহে,
আমি তোমাদের নহি—
চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।

এইবার আসল কাহিনীতে আসা যাক। পোলক স্ট্রীটের মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের হেড অফিসে আমার সম্পূর্ণ অগোচরে আমাকে হত্যা অথবা হজম করিবার যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, কিরণকুমার এবং সরোজকুমারের আগমন যে তাহারই ফাতনা-আন্দোলন, তাহা বুঝিতে পারিলাম আসল ছিপটি যখন দৃষ্টিগোচর হইল। নানা বৈষয়িক বৈগুণ্যের ফলে ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া সদ্য-সমাগত শীত-শিহরিত অগ্রহায়ণের (১৩৩৯) এক প্রভাতে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের কম্পোজ-ঘরের টুলে একা বসিয়া প্রাতরাশ হিসাবে মুড়ি ভক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের হাঁকডাক শুনিলাম; চির-হৈহৈ-বিলাসী শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয়ের পুরুষোচিত উচ্চকণ্ঠে "সজনী" আহ্বান শুনিয়া একটু চমকিত হইলাম বইকি! নলিনাক্ষ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু, প্রবাসী অফিসেই তাঁহার সহিত আলাপ সম্বোধনের মধ্যপর্যায়ে নামিয়াছিল। আমার আহ্বানে ঘরে ঢুকিয়াই তিনি হরফ-কেসের উপর রক্ষিত সান্‌কি হইতে এক খাবলা মুড়ি লইয়া মুখে দিতে দিতে প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতে বলিলেন, জামা গায়ে দিয়ে এস, আমার সঙ্গে যেতে হবে। কোথায় এবং কেন, প্রশ্ন করিবার দিন আমার তখনও আসে নাই। যে ভাবে কিছুদিন পূর্বে বিরিঞ্চিবিলাসের অনুগমন করিয়াছিলাম, ঠিক সেইভাবেই নলিনাক্ষের অনুগমন করিয়া সদর রাস্তায় আসিলাম। একখানি সুবৃহৎ মোটরকার অপেক্ষা করিতেছিল, নলিনাক্ষের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া যেখানে নীত হইলাম সেটা পোলক স্ট্রীট—এবং পোলক স্ট্রীটের ২৮ নম্বর বাড়ি। বহু খণ্ডপ্রতিষ্ঠান-নদীর মিলন-

সমুদ্রস্বরূপ সেই আটাশ নম্বরের এক সুবৃহৎ এবং সুসজ্জিত কক্ষে অনন্তনাগ-শয্যায় নারায়ণের মত সকল শাখা-প্রতিষ্ঠানের প্রায় সর্বময় কর্তা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় সগৌরবে আসীন ছিলেন, বঙ্গলক্ষ্মী যে অলক্ষ্যে তখন তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন তাহাও অনুভব করিলাম। তখন মহামতি হিটলারের সম্যক প্রাদুর্ভাব ঘটে নাই, ঘটিলে হিটলারের কথাই মনে হইত। কদমছাঁটে মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া কাটা, মুখের মধ্যে শঙ্করাচার্যের এবং নীরোর মুখভাবের একটা সমন্বয় যেন চকিতে নজরে পড়িল। আমাকে দেখিয়াই ঘূর্ণ্যমান চেয়ারে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া একটা সিগারেট-কেস খুলিলেন, লক্ষ্য করিলাম সিগারেটগুলি দুই ভাগে কর্তিত হইয়া কেসে অবস্থান করিতেছে। তাহারই একটি তুলিয়া মুখে লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে করিতে প্রশ্ন করিলেন, 'দৈনিক বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গ" আমি লিখি কি না! সংক্ষেপে জবাব দিলাম, আগে লিখিতাম, এখন লিখি না। গত ২৬এ চৈত্রের কাগজের কথা তোলাতে বলিলাম, "বঙ্কিমপ্রসঙ্গ" আমারই লেখা। ব্যবসায়ী সচ্চিদানন্দ একেবারে সরাসরি কাজের কথা পাড়িলেন। 'উপাসনা' পত্রিকাকে তিনি চালিয়া সাজিতে চান, আমি সম্পাদক হইতে রাজী আছি কি না! ইতস্তত না করিয়া বলিলাম, রাজী আছি। তবে সঙ্কোচের সঙ্গে সাবিত্রীবাবুর চাকরির কথাও উল্লেখ করিলাম। ভট্টাচার্য মহাশয় আশ্বাস দিলেন, সে বিষয়ে চিন্তার কারণ নাই। আমাকে 'উপাসনা' সম্পাদনা ও পরিচালনার অনুমানিক ব্যয়সহ একটি খসড়া প্রস্তুত করিতে বলা হইল, এবং আরও বলা হইল যে, পত্রিকার নাম, সহকারী নিয়োগ, লেখক ও চিত্রশিল্পীদের দক্ষিণা ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা আমার থাকিবে। সেদিন ছিল পয়লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার। আমি সাত দিনের সময় প্রার্থনা করিলাম।

একটি দুই পয়সার একসারসাইজ বুকে প্রায় খেলাচ্ছলে কবিজনোচিত একটি পরিকল্পনা রচনা করিলাম; খেলাচ্ছলে, কারণ তাহা যে গৃহীত হইবে সে বিশ্বাস আমার ছিল না। মুমূর্ষু রোগীও শয়ন উপবেশন ঔষধপথ্যসেবন ব্যাপারে স্বাধীনতা চায়; মৃত্যু-পথযাত্রী আমারও

অবাধ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে দ্বিধা হইতেছিল। চাকরিটা যাহাতে না হয় পরিকল্পনায় তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। 'উপাসনা' নাম বদলাইয়া খসড়ায় নাম দিলাম 'বঙ্গশ্রী,' নিজের বেতন ধরিলাম মাসিক তিন শত টাকা। লেখকদের দক্ষিণা ধরিলাম 'প্রবাসী'র আকারের কলম-পিছু দুই টাকা, বড় ও ছোট ভেদে কবিতা পাঁচ টাকা ও দুই টাকা; ত্রিবর্ণ চিত্রের দশ, একবর্ণ চিত্রের পাঁচ এবং কার্টুন ছবির জন্য দুই টাকা করিয়া ধার্য করিলাম। 'প্রবাসী'র অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব কাজে লাগাইলাম।

সাত দিনের দিন অর্থাৎ ৭ই অগ্রহায়ণ (২৩ নবেম্বর, ১৯৩২) বখাটে ছোকরার কলেজ যাওয়ার ভঙ্গিতে একসারসাইজ বুক হাতে প্রায় শিস দিতে দিতে ২৮নং পোলক ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলাম। যাওয়া মাত্র ডাক পড়িল। আমি খাতাখানি ভট্টাচার্য মহাশয়ের হাতে গছাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, একটা সিগারেট ধরাইব কি না। নলিনাক্ষ সান্যালের উপস্থিত বাধা দিল। চুপ করিয়া বসিয়া সামান্য শীত সত্ত্বেও ঘামিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য মহাশয় মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, শুনেছি আপনার খরচের হাতটা একটু বড়, অনেক দেনাও আছে। চমকাইয়া উঠিলাম, ভয় হইল, চর লাগান নাই তো? আমার ভয় যে মিথ্যা নয়, পরে প্রমাণিত হইয়াছিল। ভট্টাচার্য মহাশয়ের সিক্রেট সার্ভিস বিভাগ খুব দক্ষ ছিল। ভোলানাথ দত্ত অ্যাণ্ড সন্স, প্রবাসী অফিস ও স্বয়ং কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁহারা ধাওয়া করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমাকে চমকাইতে দেখিয়া ভট্টাচার্য মহাশয়ের চাঁচাছোলা মুখে একটু হাসি দেখা দিল, বলিলেন, আপনার মাইনে যদিও মাসে তিন শো টাকাই গ্রাহ্য হ'ল, আপনাকে এখন দু শো টাকার বেশি দেওয়া হবে না। এক শো টাকা ক'রে জমা থাকবে। আপনারই কাজে লাগবে। আপনার খসড়ার অন্যান্য বিষয়ে আমি রাজী। আপনি একটু ব'সে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার নিয়ে যান।

আমার কিছু বলিবার বা করিবার শক্তি ছিল না। এ কি হইল? ঘুঁটি কাচাইবার সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে

ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যক্তিগত সচিব প্রবোধবাবু দুইখানি টাইপ-করা কাগজ আমার সামনে ধরিলেন, দেখিলাম, পরদিন ২৪এ নবেম্বর হইতে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে শ্রীসজনীকান্ত দাস 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক ও মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন; ৫৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে তাঁহাকে বসিতে হইবে। বাড়তি এক শত টাকার উল্লেখ কাগজে কলমে কোথাও ছিল না। সেটা মুখের কথাই থাকিল।

একটা অত্যাশ্চর্য যোগাযোগের কথা বলি। আমার ডাইরিতে দেখিতেছি, নিয়োগপত্র হাতে পাইয়া আমি কিঞ্চিৎ অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, আমার সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতাকে আমি টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিলাম। সরাসরি বাড়ি ফিরিতে পারি নাই, কোনও বন্ধুর সঙ্গও কামনা করি নাই। পকেটে কি কিৎঅর্থ ছিল, সন্নিকটবর্তী ব্ল্যাকবার্ন লেনের চীনা হোটেল ন্যানকিং-এ তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে রাত্রি দশটা নাগাদ উটরামঘাটের জেটিতে গিয়া বসিলাম। কৃষ্ণপক্ষের নবমী সেদিন।

"সে কি রাত্রি! সে কি অন্ধকার!

মনে হয়েছিল এ রাত্রি কোন কালে শেষ হবে না। অনন্ত এক রাত্রির অস্তিত্ব যেন অনুভব করেছিলাম। আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে ছিলাম, সীমাহীন অনন্ত আকাশ যেন রাত্রির সঙ্গে নেমে এসেছিল আমার চারিদিকে। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীতে এক শোকাহত আমি ছাড়া আর কেউ কোথাও নাই; অসীম অনন্ত অন্ধকার অকূলের মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছি।"

আমার ডাইরি হইতে এ উদ্ধৃতি নয়, যদিও সেই রাত্রে ঠিক ইহাই আমার মনের কথা ছিল। উপরের উদ্ধৃতি তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য-জীবন' হইতে; ওই একই দিনে একই সময়ে আরও মর্মান্তিক, আরও গভীরতর কারণে তিনি দিশাহারা হইয়াছিলেন—প্রিয় কন্যা বুলুর আকস্মিক বিয়োগে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"বুলু মারা গেল ৭ই অগ্রহায়ণ রাত্রে। রাত্রি দশটায়। পরের দিন সূর্য উঠল। আলো হ'ল। কিন্তু আমার তখন অধীর অস্থির অবস্থা। মনে হচ্ছে পালিয়ে যাই। কোথায় যাই!...দ্বিতীয় দিন সকালে উঠেই কাজ আছে ব'লে কলকাতা চ'লে এলাম।"

হাওড়াব যখন পৌঁছলাম তখন বেন জ্বর আসছে মনে হ'ল। ষ্টেশন থেকে এসে উঠলাম 'উপাসনা' আপিসে ধর্মতলা ষ্ট্রীটে। এসে দেখি অভাবনীয় ব্যাপার। 'উপাসনা' উঠে যাচ্ছে। সাবিত্রীপ্রসন্ন বিদায় নিচ্ছেন। 'উপাসনা'র স্থানে 'বঙ্গশ্রী'র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সজনীকান্ত দাস আসর জাঁকিয়ে বসেছেন।"

২৪এ নবেম্বর অর্থাৎ ৮ই অগ্রহায়ণ আমি নূতন চাকরিতে যোগ দিই। উপরের ঘটনা ২৫এ নবেম্বরের। আমার তখন সেখানে সসেমিরা অবস্থা, মোটেই আসর জাঁকাইয়া বসি নাই। স্বাধীনতার বিয়োগে আমিও মুহ্যমান, পালাই-পালাই করিতেছিলাম। অথচ পলায়নের পথ যে রুদ্ধ, মোটেই তাহা নয়। আমার নিজের দোষে সাময়িকভাবে আর্থিক বিপর্যয় ঘটিলেও সহৃদয় বন্ধুদের সহায়তায় তাল প্রায় সামলাইয়া লইয়াছি। 'শনিবারের চিঠি'র যশ ও আয় উত্তরোত্তর উন্নতির পথে। একটু চেষ্টা করিলেই তাহাকে তরণী করিয়া জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া কঠিন হইত না। সাবিত্রীপ্রসন্নও 'উপাসনা'তে "শনি-মণ্ডল" সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন—

"'শনিবারের চিঠি'র যাঁহারা লেখক এবং উৎসাহদাতা তাঁহাদের লইয়া রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীটে একটি প্রাতষ্ঠান আছে। শ্রীসজনীকান্ত দাস ইহার মধুচক্র, তাঁহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিয়া ফেরেন শ্রীযোগানন্দ দাস, শ্রীপ্রমথনাথ রায়, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, ডাঃ সুশীল দে, ডাঃ সুনীত চট্টোপাধ্যায় ইহার পৃষ্ঠপোষক। বেতারে ইঁহাদের কার্যাবলী মাঝে মাঝে শোনা যায় ইহা সকলেই জানেন।"

ইহা ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয়। যোগানন্দ-অশোক-হেমন্ত তখন অন্তর্ধান হইয়াছেন; সুনীতিবাবু পৃষ্ঠপোষক আছেন কিন্তু বড় একটা আসেন না। মোহিতলাল, সুশীলকুমার ঢাকা হইতে নিয়মিত লিখিতেছেন, শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী কলিকাতা হইতে। গবেষণা-ব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং কার্টুন ছবিতে বনবিহারী-প্রফুল্লচন্দ্র (পি.সি. এল.) অবিশ্রান্ত সহায়তা করিয়া চলিয়াছেন। ইতালীয় ভাষাবিদ্ প্রমথনাথ রায় তখন উন্মাদ হইয়া রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে আমার হেপাজতে ছিলেন বটে। কিন্তু আসলে তখন 'শনিবারের চিঠি' আসর মাৎ করিতেছিল রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' ও 'ঘৃতকুম্ভ', প্রমথনাথ বিশীর 'মন-জুয়ান' ও 'বিদ্যা-সুন্দর',

সদ্যসমাগত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'জামাইষষ্ঠী' এবং আমার অজস্র অফুরন্ত ব্যঙ্গ ও গম্ভীর গদ্য-পদ্য রচনার দ্বারা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে রবীন্দ্রনাথের নিয়োগ এবং সাতান্ন বর্ষ বয়সে শরৎ-জয়ন্তী প্রধানত আমাদের লেখনী-কণ্ডুয়নের উদ্দীপনা যোগাইয়াছিল। তথা-কথিত অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা তখন ছত্রভঙ্গ। আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির দিকেই আমরা নজর দিয়াছিলাম বেশি; অস্পৃশ্যতা ও অশিক্ষা দূরীকরণই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ফলে 'শনিবারের চিঠি' শুধু সাহিত্যিক সমাজের কৌতূহলোদ্দীপক পত্রিকা হইতে ধীরে ধীরে একটা সর্বজনীন রূপ লইতেছিল।

ঠিক এই অবস্থায় 'বঙ্গশ্রী'র শ্রীসম্পাদনে আমার অন্তরের সায় ছিল না। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক আমি থাকিতে পাইব না—চাকরির এই শর্ত আমার মারাত্মক মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল। চাকরিতে যোগ দিয়া যথারীতি কর্মাধ্যক্ষের আসনে বসিতেছিলাম, সহায়ক সাহিত্যিক মণ্ডলী অনুগ্রহ করিয়া ভিড়ও করিতেছিলেন, কিন্তু আমি দিনের চাকরির শেষে এক রকম উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছিলাম। সেই নিদারুণ বিষাদযোগে রবীন্দ্র মৈত্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ আমাকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার অবকাশ আমি পাইয়াছিলাম, কর্মাধ্যক্ষরূপে প্রথম কয়েক দিন কাগজপত্রে কয়েকটা সাহমাত্র করিতে হইয়াছিল, পৌষের অর্থাৎ শেষ সংখ্যা 'উপাসনা' বাহির করিবার দায়িত্ব ছিল সাবিত্রীপ্রসন্নের। তিনি আমাকে লেখার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি একটি কবিতা দিয়া ছুটি পাইয়াছিলাম। আমার মনের অব্যবস্থার কথা ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ জানিতেন না; অফিস ছুটি হইবার মুখেই দেখিতাম তাঁহাদের দুইজনের একজন হাজির হইয়াছেন, কোনও কোনও দিন দুইজনই। ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরমুখো মানুষ, কিঞ্চিৎ কর্মযোগ আওড়াইয়া বিদায় লইতেন, রবি আমাকে ধরিয়া লইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসিত, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে তাহার নানা পরিকল্পনার কথা বলিয়া আমাকে

উৎসাহিত করিত। 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলের' অভিনয়-সাফল্য সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ ছিল এবং ইহা দ্বারা শুরু করিয়া বাংলা রঙ্গমঞ্চে সে নূতন প্রাণ-সঞ্চার করিবে—এ কথাও জোরের সঙ্গে বলিত। শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় আর্ট থিয়েটারে (স্টার) তখন 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র মহড়া চলিতেছিল। আমি 'বঙ্গশ্রী'র ভার গ্রহণ করিলে 'শনিবারের চিঠি' চালাইবার সমস্ত দায়িত্ব সে লইবে—এই আশ্বাস দিয়াছিল, যদিও আমার নূতন চাকরির দ্বিতীয় দিনেই শ্রীপরিমল গোস্বামী উক্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ পরে বলিব।

যাহা হউক, রবির উৎসাহ ও আশ্বাসে আমি বাহিরে ধীরে ধীরে স্থৈর্য লাভ করিতে লাগিলাম, কিন্তু মনের গহনে আমার কবিসত্তা অশান্ত হইয়াই রহিল। তারাশঙ্করের দেওয়া বাহিরের এই বর্ণনা নিখুঁত—"'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্তকে ঘিরে নতুন কালের সাহিত্যরথীর সমাবেশ হয় নিত্য নিয়মিত। গল্পগুজবে, হাস্য-কৌতুকে, আলাপে আলোচনায়, চায়ে পানে, সিগারেটে বিড়িতে মধ্যে মধ্যে মুড়ি-বোঁদেতে, ভাজা চিনাবাদাম ছোলাতে মিশিয়ে সরগরম মজলিস।" কিন্তু যাহাকে কেন্দ্র করিয়া মজলিস, তাহার বুকে আদর্শচ্যুতির হাহাকার, বন্দী খাঁচার পাখির অসহায় অন্তর্দাহ। মনে হইত, চাকরির শর্তপত্রে সর্ববিধ স্বাধীনতার উল্লেখ কথার কথামাত্র, আসলে 'বঙ্গশ্রী'র পায়ে বঙ্গবাণীকে আত্মনিবেদন করিতেই হইবে। উপাসনার শেষ সংখ্যার জন্য (পৌষ ১৩৩৯) সাবিত্রীপ্রসন্নকে যে কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে অজ্ঞাতসারে অন্নপূর্ণাকে জাগাইবার জন্য কাতর আহ্বান ছিল। শিব ক্ষুধায় কাতর। অন্নপূর্ণা জাগো—অন্নপূর্ণা না জাগিলে কি ঘটিবে সে ইঙ্গিতও ছিল—

জানি একদিন সতীহারা শঙ্কর
চমকি জাগিবে প্রলয়ঙ্করূপে,
ফেলে বাঘছাল নাচিবে দিগম্বর,
কাঁপন লাগিবে মৃত-কঙ্কাল-স্তূপে।
আজো আসে নাই সেই ঘোর দুদিন,
শিবের ঘরণী গাঢ় নিদ্রায় লীন,

জাগে মহাকাল শঙ্কিত দীনহীন—
'জাগো প্রিয়া জাগো' ডাকিতেছে চুপে চুপে।
সে ডাকে বিশ্ব কাঁপিয়া উঠেছে মাগো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

শিল্পীবন্ধু শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় একটি রঙিন ছবিতে এই ভাবকে রূপ দিয়াছিলেন, ফাল্গুনের 'বঙ্গশ্রী'র মুখপাত হিসাবে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

মনের এই অবস্থায় নূতন অফিসে সাহিত্যিক হৈ-হৈ হট্টগোলের মজলিসের পর এক-একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে একা পথে বাহির হইয়া পড়িতাম, পায়ে হাঁটিয়া কখনও গঙ্গার ধার, কখনও বালিগঞ্জের লেক পর্যন্ত চলিয়া যাইতাম, অনেক রাত্রে শ্রান্তক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে ফিরিয়া আসিতাম। ফিরিবার পথে মনে হইত, এই কর্মব্যস্ত নগরী, এমন কি নিখিল চরাচর নিদ্রামগ্ন, আমিই একা জাগিয়া আছি। রসা রোড রাসবিহারী অ্যাভেনিউ জংশনের কাছে একদিন দেখিলাম, পৌষের নিদারুণ শীতের মধ্যে চারিজন শববাহক কাঁধের বোঝা লইয়া ক্লান্ত চরণে চলিয়াছে, বিবিধ জড়তার মধ্যে তাহাদের "বল হরি হরিবোল" অতি ক্ষীণ ও করুণ শুনাইতেছিল। আমার মন এমনিতেই চড়া সুরে বাঁধা ছিল। আমি তাহারই মধ্যে সমস্ত জীবন ও জগৎকে ব্যঙ্গ করিয়া মহাকালের অট্টহাসি শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, ইহাই শেষ, ইহাই সমাপ্তি; ইহার পরে আর কিছু নাই; নিঃশেষ মৃত্যুই মানুষের অনিবার্য পরিণতি। অকস্মাৎ নিকটের কোনও দোতলা হইতে সদ্যোজাত শিশুর তীব্রতীক্ষ্ণ ক্রন্দন উত্থিত হইয়া নগরীর ধূম্রধূলিকুয়াশা-লাঞ্ছিত আকাশমণ্ডলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিমূঢ় জড়তাগ্রস্ত আমার চিত্তে বিদ্যুদ্দীপ্তিবৎ নূতন চেতনার সঞ্চার হইল, আমার দেবতা যেন এক নিমেষে আমাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন—মাভৈঃ, এই অনন্ত অখণ্ড প্রবাহের শেষ নাই। প্রতিমুহূর্তেই ধ্বংস ও মৃত্যুকে উপহাস করিয়া নবজাতকের নূতন জন্ম হইতেছে, নবীন কিশলয় শুষ্ক গলিত পত্রের স্থান লইতেছে। সেই এক মুহূর্তে আমার ব্যর্থ ব্যথিত হতাশ জীবনের নবজন্মান্তর ঘটিল, আমি মরিতে মরিতে আবার বাঁচিয়া গেলাম।

সেই রাত্রেই লিখিলাম "কে জাগে ?" লিখিলাম—

শহরে সবাই ঘুমে অচেতন, জেগে আছে পেট্রোল,
বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল—
কারো আঁখি লাল, কারো চোখ দুধ-সাদা।
আর জেগে রয় রাস্তার মোড়ে বীটের পুলিস যত।—
পৌষের শীত রাত্রি ঝুপুর বাজে।

* * * *

জাগিয়া রয়েছে কবি,
গগনে গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়,
মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ—
সবারে ঢাকিয়া সেই সুর যেন নিখিল ছাপিয়া উঠে,
নয়ন ভাসিয়া যায়।

আর জাগে ভগবান—
জাগে নির্গুণ পরমব্রহ্ম, জাগেন নির্বিকার ;
ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর,
অঙ্কুর মেলে পাতা, সেই পাতা শুকায়ে ঝরিয়া পড়ে—
তারে তিনি দেন কালে।
জাগে অশস্ত সর্বশক্তিমান—
জাগ্রত ভগবান !

শুধু হাসে মহাকাল—
হা-হা সেই হাসি শুনিলাম যেন রজনী-দ্বিপ্রহরে,
শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াশা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসা রোড—
চলে চারিজন ক্লান্ত চরণে ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ,
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে !
সে ক্রুর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়
নবজাত শিশু কঁকিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল।

এই কবিতার আকারে অভয় আসিয়া আমার সকল ভয় হরণ করিল, আমার মনের 'রাজহংস' ডানা মেলিয়া আকাশে উড্ডীন হইল,

নূতন চাকরি যে জগদ্দল পাথরের বোঝা আমার বুকে চাপাইয়াছিল, শরতের মেঘের মত তাহা লঘু হইয়া গেল, নিঃশঙ্ক দৃঢ় চিত্তে নূতন কর্মভার গ্রহণের জন্য আমি প্রস্তুত হইলাম। সাবিত্র্যপ্রসন্ন 'উপাসনা'র শেষ সংখ্যা বাহির করিয়া তখন বিদায় লইয়াছেন, পৌষের মাঝা-মাঝিকালে অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি' "কে জাগে" বক্ষে বাহির হইয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছে, পরিমল গোস্বামী সকল দায়িত্ব লইয়া সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, ১৫ই পৌষ সন্ধ্যায় 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র প্রথম অভিনয়ের অভাবনীয় সাফল্য রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শনিমণ্ডলকে জয়যুক্ত করিয়াছে, নূতনের অর্থাৎ 'বঙ্গশ্রী'র জন্মের সকল আয়োজন এ দিকে সম্পূর্ণপ্রায়। মায়ামন্ত্রবলে আমার জীবনের হতাশা ও অবসাদ নূতন সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমার দ্বিতীয় পর্যায় কবিজীবনের ভিত্তি 'রাজহংসে'র নাম-কবিতায় এই সময়েই আমার মুক্ত মনের অবাধ আনন্দ-বিহারের প্রকাশ এইভাবে হইয়াছে—

উড়িয়াছে রাজহংস মেঘাস্তৃত সুনীল আকাশে
দুই পক্ষ বিস্তারিয়া শূন্যে করি স্থিতির নির্ভর—
গতির নির্ভর কবি আকাশের লঘু বায়ুস্তরে,
কবে সে করেছে যাত্রা, ছাড়িয়াছে মাটির
আশ্রয়,
কবে উত্তরিবে গিয়া তারো নাহি জানে সে
ঠিকানা।
টলমল গাঢ়নীল হিমবক্ষ মানসের তীরে।
উপলমুখর সেই মেঘচুম্বী পাহাড়ের কোলে
নীড়ের আশ্রয় তার।
সে আশ্রয়ে নীড় আর শাবকের মাঝে
দিশাহীন নভোযাত্রা ক্ষণকাল রহে তার
স্থির;
বাহিরের স্থূল ডানা হয়তো ধূলায় মিশে যায়,
অন্তরের সূক্ষ্ম পক্ষ যুগে যুগে চলে ঝাপটিয়া।
শত শত জন্ম-বিবর্তনে—
সেথা তার নাহিক বিশ্রাম,
ক্লান্তি নাই, ক্ষোভ নাই তার।
ধরণীর রাজহংস জীবনের অনন্ত প্রতীক—
উড়িছে অনন্তকাল মহাকাল-আকাশ-সাগরে,
নিম্নে কাল-কালিন্দীর তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ
ডাকিতেছে যুগে যুগে ঝাঁপ দিতে সে
তিমিরনীরে।
ধরিতে পারে না তারে, ঊর্ধ্বে তার বিরাট
প্রয়াণ।
উচ্চে-নীচে চলে দুই গতির প্রবাহ,
চলিবে অনন্তকাল, মিশিবে না কভু একেবারে।
কোটি কোটি গ্রহ-চন্দ্র কোটি তারা পাইবে
বিলয়,
লক্ষ সৃষ্টি ধ্বংস হবে, জন্ম লবে সৃষ্টি নবতন।

[ক্রমশ]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

প্রসঙ্গ কথা

নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ত্রিংশৎ অধিবেশন হয়ে গেল। এককালীন প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন এক্ষণে প্রবাস-বাস ত্যাগ ক'রে নিখিল-ভারতীয়ত্বের পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করেছে—এটি সম্মেলনের অগ্রগতির পরিচায়ক। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, এই অগ্রগতির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ মসৃণ নয়। এক কালে—এক কালে কেন, এই সেদিন পর্যন্ত—সম্মেলনের কার্যকর্তাদের পরিচালন-ব্যবস্থার ভিতর আমরা সরকার-ঘেঁষা মনোভাবের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করেছি। 'প্রবাসী'-নামধেয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে সেই সব ব্যক্তিরই আধিপত্য ছিল, যাঁরা উচ্চ সরকারী চাকুরি বা অনুরূপ ভারগর্ভ পদাধিকারের সূত্রে বিশেষ ক্ষমতার ধারক এবং সেই সূত্রে সাহিত্যের উপরও প্রভাববিস্তারপ্রয়াসী। এ রকম একাধিক ব্যক্তির প্রভাবাধীনে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন অনেক কাল পর্যন্ত সাহিত্য-সম্মেলনের আবরণে সামাজিক সম্মেলন মাত্র ছিল, যথার্থ সাহিত্য-সম্মেলন আখ্যায় তাকে আখ্যাত করবার উপায় ছিল না। যেখানে পদাধিকারজাত কৌলিন্য এবং সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তিটাই আসল কথা, সেখানে সাহিত্য-সম্মেলনের এই পরিণামে বিস্ময়ের কিছু নেই। সম্মেলনের এই রূপটির সঙ্গেই আমরা এতাবৎ পরিচিত ছিলাম এবং তাতে অভ্যস্তও হয়ে গিয়েছিলাম। গত বৎসর জয়পুর অধিবেশনে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রায় অজ্ঞাতপরিচয় এক আই.সি.এস. রাজপুরুষকে ধ'রে এনে যখন মূল সভাপতির পদে বৃত করা হয় আমরা বিস্মিত হই নি, শুধু কর্মকর্তাদের প্রত্যাশিত মূঢ়তার অপ্রত্যাশিত বহর দেখে কিছু পরিমাণে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আই. সি. এস.-শাসিত বঙ্গ-সাহিত্যের পরিণাম চিন্তা ক'রে মনে কিঞ্চিৎ আশঙ্কার উদয় হয়েছিল, সে কথা গোপন করব না।

এবারকার অধিবেশনের যাঁরা কর্মকর্তা, তাঁদের মতিগতি ছিল অন্যরূপ। তাঁরা সম্মেলনের দক্ষিণপন্থী রূপ ঘোচাবার জন্যে রাতারাতি তাকে একটি উগ্র বামপন্থী সম্মেলনে রূপান্তরিত করবার চেষ্টায় মেতে-ছিলেন। তাঁদের মনে হয়তো এই অভিপ্রায় ক্রিয়া ক'রে থাকবে যে,

[শেষাংশ ৪৪৪ পৃষ্ঠায়]

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা

অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন লোকাতীত প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী। শিক্ষা-লাভের জন্য তাঁহার পিতা স্বনামখ্যাত ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ তাঁহাকে সাত বৎসর বয়সে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর কাল তথায় ইংরেজ পরিবারে থাকিয়া তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আঠার বৎসর বয়সে অরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। সেই পরীক্ষায় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তিনি 'রেকর্ড' নম্বর পাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ক্লাসিক্‌স্ ট্রাইপস্ (Classics Tripos) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ইংরেজী ভাষায় একজন সুলেখক ও সুকবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সুধী-সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল বিলাতে থাকার দরুন অরবিন্দ মাতৃভাষা বাংলা প্রায় ভুলিয়া যান; তিনি বাংলায় ভাল করিয়া কথাও বলিতে পারিতেন না। যিনি মাতৃভূমিকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন, তিনি কখনও মাতৃভাষা সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারেন না। একুশ বৎসর বয়সে অরবিন্দ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু তাঁহাকে প্রায় বারো বৎসর বাস করিতে হইয়াছিল বাংলার বাহিরে বরোদা রাজ্যে। এই সমুদয় প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও অরবিন্দ বরোদায় বাসকালে মাতৃভাষা শিখিয়াছিলেন। বাংলা ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিলেই ঠিক হইবে। তৎকালে তিনি সংস্কৃত ভাষাও শিখেন। বরোদায় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের নানাবিধ গ্রন্থ—বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, কালিদাসের কাব্য ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। তৎসঙ্গে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যয়নও চলিল। বঙ্কিম-সাহিত্যের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির গ্রন্থাবলী তিনি ভাল করিয়াই পড়িয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺দীনেন্দ্রকুমার রায় অরবিন্দকে বাংলা শিখাইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বরোদায় গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে কিছুকাল একত্রে বাস করিয়া তাঁহাকে বাংলা শিখাইয়াছিলেন। বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, তিনি কিরূপ যত্নের সহিত বঙ্কিম-সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অরবিন্দ বাংলা ভাষায় লিখিতে এবং কথাবার্তা বলিতে পারিলেও কোনদিন

জনসভায় বাংলায় ভাষণ দান করেন নাই। সেজন্য তিনি প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশও করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সনের ১২ই এপ্রিল তিনি ৺বিপিনচন্দ্র পাল, ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতির সহিত ২৪পরগনার বারুইপুরে এক স্বদেশী সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বাংলায় না বলিয়া ইংরেজীতে বলিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি আরম্ভেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। বাংলা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করা সত্ত্বেও তিনি যে জনসভায় কোনদিন বাংলায় বক্তৃতা দেন নাই, তাহার প্রধান কারণ, উচ্চারণের ত্রুটী বলিয়াই অনুমান হয়। অরবিন্দের সহিত একাধিক বার বাংলায় কথাবার্তা বলার এবং তাঁহাকে বাংলায় কথাবার্তা বলিতে শোনার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। যদিও তাঁহার কথাবার্তায় ভাষাগত কোন ভুল থাকিত না, কিন্তু উচ্চারণ শুনিয়া মনে হইত না—বাঙালীর মুখে বাংলা শুনিতেছি।

শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগও ছিল গভীর। সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তিনি বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলায় লিখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য হইল প্রসাদ-গুণ। জটিল দার্শনিক বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত বাংলা প্রবন্ধগুলিও দর্শনশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন অসুবিধা হয় না। তাঁহার প্রত্যেকটি রচনাই চিন্তাশীলতায় সমৃদ্ধ। অরবিন্দের লেখনীর গতি বিভিন্নমুখী ছিল। বিষয়-ভেদে তাঁহার রচনা-শৈলীও পরিবর্তিত হইত। তাঁহার বাংলা গদ্য-রচনার পরিচয় মিলিবে এই কয়েকখানা পুস্তক হইতে—(১) 'অরবিন্দের পত্র,' (২) 'কারাকাহিনী,' (৩) 'ধর্ম ও জাতীয়তা,' (৪) 'জগন্নাথের রথ' ও (৫) 'অরবিন্দ মন্দিরে'। ওই সমুদয় পুস্তক প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন চন্দননগরের প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস। এই জন্য প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায়ের নিকট বাংলা ও বাঙালী কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী। প্রথম পুস্তকের "নিবেদন"-এ শ্রীমতিলাল রায় লিখিয়াছেন—

"এই পুস্তিকায় প্রকাশিত পত্র তিনখানি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট অরবিন্দবাবুর বাসায় যখন থানাতল্লাসী হয়, সেই সময়ে পাওয়া যায়। পরে এগুলি আলিপুরের বোমার মামলায় আদালতে উপস্থিত করা হয়। বিচারে এই পত্র কয়েকখানি হইতে তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা

হইয়াছিল। "এই পত্রগুলিতে গোপনে তিনি যে কথা তাঁর স্ত্রীকে বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত জীবনটাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।..."

পূর্বোল্লিখিত পুস্তিকায় প্রকাশিত তিনখানি পত্র লিখিত হইয়াছিল—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর। প্রথম পত্রখানি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ।

'কারাকাহিনী'তে বর্ণিত হইয়াছে আলিপুর বোমার মামলার এবং বন্দী-জীবনের আংশিক বিবরণ। শ্রীঅরবিন্দের মাসতুত ভগিনী স্বর্গীয়া কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' মাসিক পত্রে ১৩১৬ সালে (১৯০৯ খ্রীঃ) 'কারাকাহিনী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কাহিনী সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি গোপনে পণ্ডীচেরীতে চলিয়া যান। অসমাপ্ত রচনাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "কারাগৃহ ও স্বাধীনতা" নামক যে প্রবন্ধটি 'কারাকাহিনী' পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা ১৩১৬ সালের 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ধর্ম ও জাতীয়তা' পুস্তকে গ্রথিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকায় একই বৎসর অর্থাৎ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। তৎকালে তাঁহার সম্পাদনায় 'কর্মযোগিন' নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইতেছিল। আলিপুর বোমার মামলায় মুক্তিলাভের কিছুকাল পরে তিনি ওই সাপ্তাহিক পত্রিকা দুইখানি প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। তাঁহার গোপনে বাংলা দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার পর 'ধর্ম' এবং 'কর্মযোগিন' বন্ধ হইয়া যায়। 'ধর্ম ও জাতীয়তা' পুস্তকের প্রবন্ধাবলীর গ্রন্থন হইয়াছে দুই খণ্ডে। "ধর্ম" খণ্ডে এগারটি প্রবন্ধ এবং "জাতীয়তা" খণ্ডে নয়টি প্রবন্ধ রহিয়াছে। "ধর্ম" খণ্ডের প্রবন্ধগুলি এই :—আমাদের ধর্ম, গীতার ধর্ম, সন্ন্যাস ও ত্যাগ, মায়া, অহঙ্কার, নিবৃত্তি, উপনিষদ, পুরাণ, প্রাকাম্য, বিশ্বরূপ-দর্শন, স্তব-স্তোত্র। প্রবন্ধগুলির নাম হইতেই বুঝা যায় যে, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিষয় লইয়াই ওই সমুদয় লিখিত হইয়াছে। "জাতীয়তা" খণ্ডের প্রবন্ধ হইল এইগুলি—নবজন্ম, জাতীয় উত্থান, অতীতের সমস্যা, স্বাধীনতার অর্থ, দেশ ও জাতীয়তা, আমাদের আশা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, ভ্রাতৃত্ব, ভারতীয় চিত্রবিদ্যা। 'জগন্নাথের রথ' লিখিত হইয়াছে পণ্ডীচেরীতে। ইহাতে গ্রথিত

হইয়াছে তিনটি প্রবন্ধ—জগন্নাথের রথ, আর্য আদর্শ ও গুণত্রয়, স্বপ্ন। 'প্রবর্তক' মাসিক পত্রে ওই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল॥ 'অরবিন্দ মন্দিরে' পুস্তিকায় শ্রীঅরবিন্দের যে সকল উক্তি, মতামত, মন্তব্য, উপদেশ, বাণী ইত্যাদি সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, ওই সমুদয় তাঁহার লেখনী-প্রসূত নহে সত্য,—কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বলিয়া রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে রহিয়াছে অমূল্য রত্নমালার সঞ্চয়ন। বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে ওই রত্নমালা পরাইয়া দিয়াছেন প্রবর্তক-সঙ্ঘের শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক ও শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত।

অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের পূর্বোল্লিখিত বাংলা রচনাবলী হইতে উদ্ধৃতি দিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে ওই সমুদয় আস্বাদন করিবার সুযোগ দিব। তাঁহার সহধর্মিণী স্বর্গীয়া মৃণালিনী দেবীকে লিখিত প্রথম পত্রখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"...তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহস্র লোকের মধ্যে দশ জন অসাধারণ, দশ জনের মধ্যে এক জন কৃতকার্য হয়। আমার কর্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখদুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, দুঃখই দেয়।"

ইহার পর "হিন্দুধর্মের প্রণেতৃগণ" স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও কর্তব্য সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দিয়া তিনি লিখিয়াছেন:—

"স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী, তিনি যে-কার্যই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য নির্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।

"এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্মের পথ ধরিবে, না, নূতন সভ্যধর্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ, সে তোমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও

কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটবেই ছুটবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না, তার সঙ্গেই ছুটবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্ম স্কুলে পড়িয়া থাক, তবু তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে।"

এখন শুনাইব 'কারাকাহিনী'র অংশবিশেষ। ইহার মধ্যে আছে নানা ব্যক্তি, বস্তু ও বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা। ব্যক্তি ও বস্তুর বিবরণের মধ্যে এমন রচনা-নৈপুণ্য রহিয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে যেন চোখের উপর ভাসিয়া উঠে নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত একখানি আলেখ্য। আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেলে যে নির্জন কারাগৃহে অরবিন্দকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, উহার বিবরণ দিয়া তৎপর তিনি লিখিতেছেন—

"আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজ-সরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহৃদয় কর্তৃপক্ষ অতিথি-সৎকারের ত্রুটী করেন নাই। একখানা থালা ও একটি বাটী উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্বস্ব স্বরূপ থালা বাটির এমন রূপার ন্যায় চাকচিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে 'স্বর্গজগতে' নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্ট্যান্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটিই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিষ ছিল। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্বকার্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে, জজ, শাসনকর্তা, পুলিস, শুল্কবিভাগের কর্তা, মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবা মাত্র হইতে পারে,—যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগকর্তা, পুলিস, বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষের কৌন্‌সিলীরও এক শরীরে এক সময়ে প্রীতিসম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য, আমার আদরের বাটিরও তদ্রূপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটিতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকার্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগসাধনের উপায়-স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিত্যাগের এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইব?

নির্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে যখন আমাদের এক সঙ্গে রাখা হয়, তখন আমার সিভিলিয়ানের অধিকার পৃথকীকরণ হয়,—কর্তৃপক্ষেরা শৌচক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত্র উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু এক মাস কালে এতদ্দ্বারা এই অযাচিত ঘৃণা সংযম শিক্ষালাভ হইল। শৌচক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই যেন এই সংযম শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত।"

অরবিন্দ যে কিরূপ পরিহাসপটু ছিলেন, তাহা পূর্বোল্লিখিত থালা-বাটির রসাল বর্ণনা হইতে কতকটা বুঝা যাইতে পারে। আর একটি বস্তু সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণনা শুনাইতেছি—

"৫টার সময় গরাদ খোলা হয়, আমি হাতমুখ ধুইয়া আবার ঘরে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে লফ্‌সী আমার দরজায় হাজির হইল, কিন্তু সেইদিন তাহা খাই নাই, কেবল তাহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হইল। ইহার কয়েক দিন পরে প্রথম বার এই পরমান্ন ভোগ হয়। লফ্‌সীর অর্থ ফেনের সহিত সিদ্ধ ভাত, ইহাই কয়েদীর ছোট হাজরী। লফ্‌সীর ত্রিমূর্তি বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন লফ্‌সীর প্রাজ্ঞভাব, অমিশ্রিত মূল পদার্থ, শুদ্ধ শিব শুভ্রমূর্তি। দ্বিতীয় দিন লফ্‌সীর হিরণ্যগর্ভ, ডালে সিদ্ধ, খিচুড়ি নামে অভিহিত, পীতবর্ণ, নানা ধর্মসঙ্কুল। তৃতীয় দিনে লফ্‌সীর বিরাট মূর্তি, অল্প গুড়ে মিশ্রিত, ধূসর বর্ণ, কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যের ব্যবহার-যোগ্য। আমি প্রাজ্ঞ ও হিরণ্যগর্ভ সেবন সাধারণ মর্ত্য মনুষ্যের অতীত বলিয়া ত্যাগ করিয়া ছিলাম, এক একবার বিরাটের দুগ্রাস উদরস্থ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের নানা সদ্‌গুণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ দরের humanitarianism ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইতাম। বলা উচিত লফ্‌সীই বাঙ্গালী কয়েদীর একমাত্র পুষ্টিকর আহার, আর সবই সারশূন্য। তাহা হইলেও বা কি হইবে? তাহার যেরূপ স্বাদ, তাহা কেবল ক্ষুধার চোটেই খাওয়া যায়, তাহাও জোর করিয়া, মনকে কত বুঝাইয়া তবে খাইতে হয়।"

মামলার প্রাথমিক শুনানীকালে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লির আদালতে যে ভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হইয়াছিল, অরবিন্দ উহার প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার "অনেকবার এই কল্পনা মনে উদয় হইত যে···বৃটিশ বিচারালয়ে না বসিয়া কোন নাটকগৃহের রঙ্গমঞ্চে বা কোন কল্পনাপূর্ণ ঔপন্যাসিক রাজ্যে বসিয়া" আছেন। সরকার পক্ষের কৌন্সিলি নর্টন সাহেবের যে-চিত্র অরবিন্দের লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা শুধু জীবন্ত নহে, উপভোগ্যও বটে। সমগ্র বর্ণনাটা রসে টইটুম্বুর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নহে। তবে যেটুকু দিব, তাহা হইতেও পাঠক-পাঠিকারা কতকটা রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। অরবিন্দের বর্ণনায় আছে—

"এই নাটকের প্রধান অভিনেতা সরকার বাহাদুরের কৌন্সিলী নর্টন সাহেব ছিলেন। তিনি প্রধান অভিনেতা কেন, এই নাটকের রচয়িতা, সূত্রধর (Stage manager) এবং সাফাই স্মারক (prompter) ছিলেন,—এমন বৈচিত্র্যময় প্রতিভা জগতে বিরল।—

"হলিনশেদ, হল ও প্লুটার্ক যেমন সেক্সপিয়রের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পুলিস তেমনি এই মোকদ্দমা-নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের নাটকের সেক্সপিয়র ছিলেন নর্টন সাহেব। তবে সেক্সপিয়র নর্টনে এক প্রভেদ দেখিয়াছিলাম। সেক্সপিয়র সংগৃহীত উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিতেন, নর্টন সাহেব ভালমন্দ সত্যমিথ্যা সংলগ্ন অসংলগ্ন অশোরগ্নীয়ান, মহতো মহীয়ান্ যাহা পাইতেন একটিও ছাড়েন নাই; তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাসৃষ্ট প্রচুর suggestion, inference, hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর plot রচনা করিয়াছিলেন যে সেক্সপিয়র, ডেকো ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাস-লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নিন্দুক বলিতে পারেন যে, যেমন ফলষ্টাফের হোটেলের হিসাবে এক আনা খাদ্য ও অসংখ্য গ্যালন মদ্যের সমাবেশ ছিল, তেমনই নর্টনের plotএ এক রত্তি প্রমাণের সঙ্গে দশ মণ অনুমান ও suggestion ছিল। কিন্তু নিন্দুকও plotএর পারিপাট্য ও রচনাকৌশল প্রশংসা করিতে বাধ্য। নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সবিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের Paradise Lostএর সয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের plotএর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold bad man. আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পাতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, অরবিন্দ ঘোষ।..."

এইবার শ্রীঅরবিন্দের 'ধর্ম ও জাতীয়তা' হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি। "আমাদের ধর্ম" প্রবন্ধটি ওই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ; উহা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"...আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম প্রচার, সনাতন ধর্মাশ্রিত জাতিধর্ম ও যুগধর্ম অনুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী, আর্য-জাতির বংশধর, আর্য-শিক্ষা ও আর্য-নীতির অধিকারী। এই আর্য-ভাবই আমাদের কুলধর্ম ও জাতিধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম আর্য-শিক্ষার মূল; জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্য-চরিত্রের লক্ষণ। মানব-জাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার-চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্যজাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্মের চরিতার্থতা। আমরা ধর্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্মসঙ্কর ও ভ্রান্তিসঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়া আর্য-শিক্ষা ও নীতি-হারা। আর্যজাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্রধর্মস্বরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবল-পদ-দলিত

ও দুঃখপ্রবণতা-প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্তব্য। জাতি-রক্ষার উপায় আর্যচরিত্রের পুনর্গঠন। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী, শক্তিমান, বিনীত হয়, সমস্ত জাতিকে, বিশেষতঃ যুবক-সম্প্রদায়কে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ ও আকর্ষণ-উদ্দীপক কর্ম-প্রণালী দেওয়া আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। এই কার্যে কৃতার্থ না হওয়া পর্যন্ত সনাতন ধর্মপ্রচার উষর ক্ষেত্রে বীজবপন মাত্র।..."

পরাধীন ভারতে জাতির জন্য ঋষি শ্রীঅরবিন্দ যে জীবনাদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, স্বাধীন ভারতেও উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই জীবনাদর্শকে সার্থক করিবার জন্য তিনি যে পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন, স্বাধীন ভারতবাসীর তাহা অনুসরণ করিয়া চলা কর্তব্য।

'ধর্ম' পত্রিকার প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র। কিন্তু প্রত্যেকটিকে রত্নের আকর বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। অল্প পরিসরে অনেক মূল্যবান কথা বলা শ্রীঅরবিন্দ-প্রতিভার একটি বিশেষত্ব। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র এই চারিটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি—নিবৃত্তি, উপনিষদ্, পুরাণ, প্রাকাম্য। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিচার-বিশ্লেষণ, ভাব ও মননশীলতার সম্পদে প্রতিটি সন্দর্ভ পূর্ণ,—"Infinite riches in a little room" অর্থাৎ "ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে অসীম ধন" বলা যাইতে পারে। 'নিবৃত্তি' হইতে ছোট একটি বাণী শুনাইতেছি—

"...সমস্ত জীবন ধর্মক্ষেত্র, সংসারও ধর্ম। কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোচনা ও ভক্তির ভাব ধর্ম নহে, কর্মও ধর্ম। আমাদের সমস্ত সাহিত্য ব্যাপ্ত করিয়া এই মহতী শিক্ষা সনাতন ভাবে রহিয়াছে—এষ ধর্ম সনাতনঃ।"

'উপনিষদ্' প্রবন্ধ হইতেও যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি—

"...ঋগ্বেদের বক্তা ঋষিগণ ঐশ্বরিক প্রেরণায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান শব্দ ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, উপনিষদের ঋষিগণ সাক্ষাদ্দর্শনে সেই জ্ঞানের স্বরূপ দেখিয়া অল্প ও গম্ভীর কথায় সেই জ্ঞান ব্যক্ত করিলেন। অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি কেন, তাহার পরে যত দার্শনিক চিন্তা ও বাদ ভারতে, য়ুরোপে, এশিয়ায় সৃষ্ট হইয়াছে, Nominalism, Realism, শূন্যবাদ, ডারুয়িনের ক্রমবিকাশ, কম্‌তের Positivism, হেগল, কান্ত, স্পিনোজা, শোপনহাওর, Utilitarianism, Hedonism, সকলই উপনিষদের ঋষিগণের সাক্ষাদ্দর্শনে দৃষ্ট ও ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যত্র যাহা খণ্ডভাবে দৃষ্ট, সত্যের অংশমাত্র হইয়াও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচারিত, সত্য মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া বিকৃত ভাবে বর্ণিত, তাহা উপনিষদে সম্পূর্ণভাবে, নিজ প্রকৃত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, শুদ্ধ অভ্রান্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।..."

'ধর্ম ও জাতীয়তা' পুস্তকে গ্রথিত প্রবন্ধাবলী লিখিত হইয়াছিল স্বদেশী-আন্দোলনের যুগের অন্ত্যপর্বে। "জাতীয়তা" খণ্ডের প্রবন্ধমালা সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—স্বাধীনতা-সংগ্রামের মহানায়ক অরবিন্দের অগ্রগামী রাজনীতিক চিন্তাধারায় ও দূরদর্শিতায়। "অতীতের সমস্যা" প্রবন্ধের শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"...ভগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার জ্বালাময়ী শক্তি জাতির শিরায় শিরায় খরতর বেগে বহিতে লগিল। তাহার সহিত স্বদেশপ্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবকবৃন্দকে অভিভূত করিল। আমরা পাশ্চাত্য জাতি নহি, আমরা এশিয়াবাসী, আমরা ভারতবাসী, আমরা আর্য। আমরা জাতীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয় ভাব পরিস্ফুট হয় না। সেই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা। যে দিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান বাহেন্দ্রির অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেই দিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ ভগবান জাগিল, মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ইষ্ট দেবী, এই বেদান্ত-শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ।"

বাংলা ভাষার উপর অরবিন্দের কিরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহার কতক পরিচয় পূর্বোক্ত প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশেও মিলিবে। প্রবন্ধটির ভাষা এমন ওজস্বিনী ও আবেগপূর্ণ যে, সহজেই প্রাণকে স্পর্শ করে।

অতঃপর 'জগন্নাথের রথ' এবং 'অরবিন্দ মন্দিরে' হইতে উদ্ধৃতি দিয়া শ্রীঅরবিন্দের গদ্য-রচনাবলীর আলোচনা সমাপ্ত করিব। ওই পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধ "জগন্নাথের রথ"এর আরম্ভ এইরূপ—

"আদর্শ সমাজ মনুষ্য-সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। ঐক্য স্বাধীনতা জ্ঞান শক্তি সেই রথের চারি চক্র।

"মনুষ্যবুদ্ধির গঠিত কিম্বা প্রকৃতির অশুদ্ধ প্রাণ-স্পন্দনের খেলায় সৃষ্ট যে সমাজ, তাহা অন্য প্রকার। এটি সমষ্টির নিয়ন্তা ভগবানের রথ নহে, মুক্ত অন্তর্যামীকে আচ্ছাদিত করিয়া যে বহুরূপী দেবতা ভগবৎ-প্রেরণাকে বিকৃত করে, ইহা সমষ্টিগত সেই অহঙ্কারের বাহন। এটি চলিতেছে নানা ভোগপূর্ণ লক্ষ্যহীন কর্মপথে, বুদ্ধির অসিদ্ধ অপূর্ণ সঙ্কল্পের টানে, নিম্ন প্রকৃতির পুরাতন বা নূতন অবশ প্রেরণায়। যতদিন অহঙ্কারই কর্তা, ততদিন প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব,—লক্ষ্য জানা গেলেও সেদিকে সোজা রথ চালান অসাধ্য। অহঙ্কার যে ভাবগত পূর্ণতার প্রধান বাধা এই তথ্য যেমন ব্যষ্টির, তেমনই সমষ্টির পক্ষেও সত্য।"

'জগন্নাথের রথ' পুস্তিকার "স্বপ্ন" নামক শেষ লেখাটিকে প্রবন্ধ বলিলে ঠিক

হইবে না। গল্পের পটভূমিকায় একটি জটিল দার্শনিক তত্ত্বকে সরল করিয়া বুঝাইয়া বলা হইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্বটি হইল—"মনের অবস্থায় সুখ, মনের অবস্থায় দুঃখ। সুখ দুঃখ মনের বিকার মাত্র।" গল্পের পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে, গল্প বলার ভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক। দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া কথাকে প্রবন্ধে রূপান্তরিত করা হয় নাই কিংবা কথার রসালতা নষ্ট করা হয় নাই।

'অরবিন্দ মন্দিরে' শ্রীঅরবিন্দ বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারই একাংশ এখন শুনাইতেছি—

"...বাংলায় ভাবকে সহজেই পাওয়া যায়, ভাবের পাগল অনেক হয়েছে, ভাবের সঙ্গে জ্ঞানের মিশ্রণ চাই, তাই বাংলাকে বেদান্ত চর্চা করতে হবে; ভাব ভক্তির দ্যোতক, ভক্তি থাকিলে ভগবানের কার্য করবার শক্তির অভাব হবে না, কিন্তু জ্ঞানের বিকাশ এতদ্বারা হবে না। জ্ঞান না এলে বৃহৎ সৃষ্টি অসম্ভব; জ্ঞানেই ভগবানকে অনন্তভাবে অবধারণ করা যায়, অনন্ত বৈচিত্র্য একত্র সমাহার করতে না পারলে ক্ষুদ্র সৃষ্টিই অনিবার্য হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্রতা ভাগবত ইচ্ছার বিরোধী ধর্ম, উহা প্রতি আঘাতে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তোমরা বৃহৎ হও, জ্ঞানকে পুরোভাগে ধারণ কর। জ্ঞানের অনুগামী সমতা—সমতাই বৃহৎ সৃষ্টির বীজ মন্ত্র।"

জ্ঞান-তপস্বী মাতৃভক্ত অরবিন্দ মাতৃভাষার চর্চা করিতে যাইয়া যে বাংলা কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার রচিত আটটি কবিতার অস্তিত্বের কথা সাধারণ্যে প্রথম প্রচারিত হইল আলিপুর বোমার মামলার প্রায় ৪৬ বৎসর পরে। গত জুন মাসে (১৯৫৪ খ্রীঃ) কলিকাতায় ইডেন গার্ডেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে শ্রীঅরবিন্দের হস্তলিপি প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, তাহাতে ওই কবিতাষ্টকের প্রতিলিপিও (ফোটো) প্রদর্শিত হইয়াছিল। অরবিন্দের সহধর্মিণী স্বর্গীয়া মৃণালিনী দেবীকে লিখিত পত্রাবলীও প্রদর্শিত বস্তুর মধ্যে ছিল। অরবিন্দের ৪৮ নং গ্রে স্ট্রীটের (কলিকাতা) বাসভবনে খানাতল্লাসীর কালে ওই পত্র কয়খানি এবং কবিতাগুলি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত পুলিস হস্তগত করে। পত্র কয়খানি ও কবিতাগুলি অরবিন্দের হস্তলিখিত বলিয়া মামলায় প্রমাণিত হয় এবং সরকার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণে ব্যবহৃত হয়। কবিতাগুলি ইতঃপূর্বে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। সেজন্য আমরা প্রদর্শনী দেখিবার সময় আটটি কবিতাই অবিকল টুকিয়া লইয়াছিলাম। জনৈক বন্ধুর মুখে কথা-প্রসঙ্গে শুনিলাম, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কবিতাগুলি বারীন ঘোষের

লেখা। তদ্দরুন দ্বিতীয় বার প্রদর্শনীতে গেলাম কবিতা ও পত্রের হস্তলিপি মিলাইয়া দেখিবার জন্য। হস্তলিপি-বিশারদের সাহায্য ব্যতীতই বলা যায় যে, পত্র কয়খানি ও কবিতাগুলি একই হাতের লেখা। বিশেষত মামলায় ওইগুলি সম্বন্ধে সরকার পক্ষের প্রমাণের পর অরবিন্দের কৌঁসুলি যখন কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, তখন কোন তর্ক উঠিতেই পারে না। শ্রীবারীন্দ্র-কুমার ঘোষের মতামত জানিবার জন্য আমরা গত ৩রা জুলাই বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি বলিলেন যে, কলিকাতায় তিনি কোনদিনই সেজদার (অরবিন্দের) সঙ্গে বাস করেন নাই। সুতরাং তাঁহার (বারীন ঘোষের) হাতের লেখা কোন পাণ্ডুলিপি অরবিন্দের বাস-ভবনে পুলিসের হস্তগত হইতে পারে না। তিনি এ কথাও বলেন যে, অরবিন্দ বরোদায় থাকাকালেই বাংলা কবিতা লিখিতেন এবং তিনি অরবিন্দের লেখা বাংলা কবিতা সেখানেই পড়িয়াছিলেন। নিম্নে আটটি কবিতা প্রকাশিত হইল। দুই-এক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন ব্যতীত কোন পরিবর্তনই করা হয় নাই। যে যে স্থলে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই, সেখানে (…) বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

এক।

"কে বলে মা কাঙালিনী মিশড়-চরণা
যার পুত্র শিখ জাঠ রাজপুত সেনা।
বন্দে মাতরং গান বঙ্গে করে শক্তিদান
আজও মহারাষ্ট্রে জাগে শিবাজী গরিমা।
পর্বত পঞ্জরে যার কোটি সুত তুলি বার
ভীল খন্দ খারোয়ার নেপাল আধীমা
মালিয়া খাসিয়া গারো কত বর্ণিব রে আর
মোগল পাঠান নাগা—সিন্ধু বালি কণা
অক্ষয় যে খনিময়-জননী জঠর হয়
সিন্ধু গঙ্গা বয় মা ধান্যবসনা।
আজও ঋক সাম ধ্বনি বিন্ধ্যহিমাচলে শুনি
আজও মা অভ্রভেদীশৈলসরিৎ দুর্গমা।"

দুই।

"তুষার শিখরে হের…স্বর্ণময়ী নারী
ত্রিংশ কোটি আর্যতেজে জনমি ভারতেশ্বরী
ছুটে শ্যাম গিরিরেখা ছুগ্ধধারা নদীলেখা
মণিস্বর্ণখনিময় এ দেশ চণ্ডীর পুরী

ওরে এ যে ধর্মরণভূমি ক্ষীরোদ শয়নখানি
হেথা ঘোষেণ শ্রীহরি শক্তি বীর অংশে অবতরি।
শিখাতে মানবে কর্ম প্রচারিল কর্ম মন্ত্র দশভুজে অসি বর্ম
কেশরী বিপদরূপে বাহন হয়েছে তারি
সিংহ-বিঘ্ন উতরিয়ে সে শ্বেত চরণ ছুঁয়ে
শক্তি জাগে হৃদে ভুজে মানবে দেবতা করি
ভীমার্জুন পৃথ্বীরায় সে জহরব্রতা নারী
শিবাজী গোবিন্দগুরু সবে শক্তিঅংশধারী
ত্যজরে তামস জড় কর্মবলে হও বড়
হওরে সন্তানসেনা অন্যায়ের ধ্বংসকারী
কোটি পুত্র মা জাগিলে মা মা বলে না ডাকিলে
জাগে না অম্বিকা কভু রণরঙ্গিণী সে নারী।"

তিন। "ভারতের মাটি এ নহে মৃত্তিকা এ নহে গো স্থূল ওষধিময়
বাল্মীকি নারদ দেহরজে গড়া তাদেরি মাহাত্ম্য প্রকাশময়।
এ নহে সরিৎ ও নহে অচল
বীর তেজ অংশে মহা আখণ্ডল
হিন্দু-সতীত্বের পূত অশ্রুজল
শিলা অম্বুরূপে বিভাত রয়।
সাগর মেখলা নহে পদে মার
ধ্রুব ভূত-কাল অনন্ত সঞ্চার
অগণ্য যোগীর পাদ্য অর্ঘভার
মণিগর্ভা হয়ে ওঙ্কার গায়।
অয়স্কান্ত নহে নহে ও রতন
নহে রবি শশী দীপ্ত তারাগণ
মাতার সহস্র স্নেহ নয়ন
করুণায় অত উজল হয়।
নহে শীত গ্রীষ্ম বর্ষাসার নহে
নয়রে হিল্লোলে বায়ু ও বা বহে
ও নহে সুরভি মার ··· দশ
সপ্রেমে সন্তানে জুড়ায়ে দেয়।"

চার। "হের আর্যপুত্র আজি ভিখারী সেজেছে রে।
'দেহি অন্ন' রবে কার দ্বারে হাসা দে'ছে রে

যাহার কুলের সতী ছেড়েছে রণ দিত নিতি
তারাই কি এরা, এত ক্রন্দন শিখেছে রে।
লিখিত আপন লীলা অসি যার ভেদি শিলা
যে জাতি তারাই কিরে শিরে জুতা নেছে রে,
রচিত রে সাম গান ব্রহ্মজ্ঞান জগতে
যে ঋষি তাদের কুলে এরা জন্ম কি হয়েছে রে।

পাঁচ। "মায়ের নামে দীন হয় বলীয়ান
সে নামে নাচেরে অসি নাচে খড়্গ খরসান।
ঘুচে দ্বেষ হিংসারেশ
ক্ষুদ্রতা যায় চলে
পাপের ভরা যায় রে ভরা
বীর্যানল জ্বলে
শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে খুলে কারাগার ঝনঝন
কর্মযোগে হয় রে যোগী
সাহসে হয় ভীষ্ম সুররাজ
পুণ্যেতে দেবতা হয় রে ছেলে কালান্তক বাজ
মায়ের সরম ঘুচাইতে দলেরে পীড়ক প্রাণ।"

ছয়। "জননীর ক্রোড় সুখে ভরা স্তন,
নবীন বধূর প্রণয় চুম্বন
দ্বিজ আশীর্বাদ ও নহে কখন।
স্বদেশ আনন্দ উহারে কয়।
এ মৃত চৈতন্য শবের উপর,
আসীন হে হিন্দু তুমি যোগীশ্বর,
জাগাও মাতারে মাগ শক্তিবর
হও মন্ত্রসিদ্ধ অরাতি ভয়।"

সাত। "নমি মা তোর রাঙ্গা পায়,
ও চরণকমলরেণু ত্রিতাপ জ্বালা জুড়ায়।
মম হেতু যেন পদে
কুশাঙ্কুর নাহি বিঁধে
শোণিত সিন্দুর সম যেন গো সীমন্তে ভায়।
নমি মা তোর রাঙ্গা পায়।

স্বদেশ মূরতি তব ধ্যানে ভাবা না জুরায়
কবিত কাঞ্চন সমা
আর্যাশক্তি অনুপমা
যেন তুয়া কারণে প্রাণ জনমে জনমে যায়।
তোর মত দয়াময়ী কে আছে না এ ধরায়?
তস্করে লুটিছে নিতি
তবু ধন শস্যবতী
আজও ত্রিশ কোটি পুত্রে তোরি অন্ন বাঁটি খায়।
সে — সন্তান ভুলেছে তোমা আত্মস্বার্থ মদিরায়
তারা মাতৃহত্যা পাপভাগী
তবু সে তনয় লাগি
শতইন্দুনিভাননে গলে স্নেহ অবিরায়।"

আট। "কালো আঁখি তার
যথা উষা-বাপী-কোল
তালহারে গাঢ়তর
তেমনি অগাধ কালো
মধুভাবে থরথর
সে ঘোর বরণে আছে কত দীপ্তি ধায়।
পাতা দুটি তার
কুলরূপসীর দুটি
কর্ণ অবগুণ্ঠন
টানিয়া লুকায় করে
সে লাবণ্যে কি শোভন।"

শেষ কবিতাটি যে কাহার উদ্দেশে লিখিত তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল না। অন্যান্য সাতটি কবিতার মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেমের পূতধারা প্রবহমান। এই সমুদয় কবিতা যে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে লিখিত হইয়াছিল, তাহারও নিদর্শন আছে। প্রথম কবিতাটির একটি ছত্রে আছে—"বন্দে মাতরং গান বন্দে করে শক্তি দান।" পঞ্চম কবিতাটির বাম ধারে খালি জায়গায় ১৯০৬ সনের ১৭ই এবং ১৮ই জানুয়ারি তারিখের খরচের হিসাব টুকিয়া রাখা হইয়াছে। সেই সময়ে অরবিন্দ কলিকাতায় থাকিতেন এবং স্বদেশী আন্দোলনও চলিতেছিল

পূর্ণবেগে। আটটি কবিতাই কাগজের ছোট ছোট স্লিপে লেখা হইয়াছিল। অরবিন্দ আটটির অধিক কবিতা লিখেন নাই বলিয়া অনুমান করাটা ঠিক হইবে না। কেন না, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বারীনবাবু বরোদায় থাকাকালে অরবিন্দের বাংলা কবিতা পড়িয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার বছর তিনেক পূর্বে তিনি তাঁহার সেজদা অরবিন্দের সঙ্গে বরোদায় বাস করিতেন। কিন্তু সেই সকল কবিতার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা প্রবন্ধ ও কবিতা এবং বাংলা কথোপকথন হইতে তাঁহার ভাবসম্পদের প্রাচুর্যের পরিচয় মিলিবে, শব্দসম্পদও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। মাতৃভাষার চর্চা তিনি ঐকান্তিকতার সহিতই করিতেছিলেন। বঙ্গজননীর সুশীতল আশ্রয় ছাড়িয়া যাইবার পর সেই চর্চা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল। তবু বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে আমরা দেখিতে পাইতাম, অরবিন্দের রচিত আরও কত সুষম ও সুরভি মাল্য। তাঁহার কি ইংরেজী কি বাংলা রচনার এই বিশিষ্ট্য ছিল যে, তাহাতে কখনও দুঃখ দৈন্য, লজ্জা বা শঙ্কার সুর শোনা যায় নাই। অরবিন্দ-রচনাবলীর মাধ্যমে আমরা শুনিয়াছি—আশা আনন্দ ও মুক্তির কথা, মুক্তি-সাধনার অভয়-বাণী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি—

"...ভারতের বীণাপাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝঙ্কার,—
নাহি তাহে দুঃখ তান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস।..."

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

নাই কোনো মিল

আমার এখানে এক আশ্বিনের হিমেল বিকেল।
শেফালীর ডালে ডালে রাতজাগা কামনার স্বাদ,
থরে থরে ফুটে ওঠা স্থলপদ্মে চুম্বন-আভাস ভ্রমরের।
আকাশের নীলে আর ধরণীর নিবিড় সবুজে
মাখামাখি হয়ে গেল সায়াহ্নের গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা,
শুরু হ'ল হৃদয়ের গানে গানে কত জাল বোনা।

এখন তোমার বনে হেমন্তের পাতা-ঝরে-পড়া
সোনালী পাটল পীত ধূসর সবুজে যেন মোড়া দ্বিপ্রহর।
শিরশিরে হাওয়া আর ধূসরের ডাক,
বুনো ভীরু শশকের লঘু সঞ্চরণ
বার্চের ছায়ায় ছায়ায়।

কেমনে পড়িল বাঁধা মম সন্ধ্যা তব দ্বিপ্রহরে?
বিস্ময়-শিহর মোর মনে।
কবে কোন্ জনতার ভিড়ে
আকুল হারায়ে-যাওয়া মুগ্ধ দুটি চোখ,
আবেশ-নিবিড় স্পর্শ, সুকুমার কুমারী অধরে
থরোথরো চুম্বনের বেদনার রঙে রাঙা কী মধুর হাসি!
তৃণে তৃণে ছায়াচ্ছন্ন অর্ধস্ফুট ছোট ছোট কলি
ভীরু কামনায় ভরা সুরভিত লিলি অব ভ্যালি
এনেছে আমার ঠোঁটে লবণাক্ত সমুদ্রের স্বাদ।
নাহি পাওয়া চুম্বনের মতো
সাগর-বিহগ নাড়ে ফেনা-ধোয়া রোদ-মাখা ডানা,
বালুচরে মুগ্ধ প্রসাধন,
উত্তাল তরঙ্গ-দোলে মগ্ন তার মন,
কাকলীতে দিগন্তের নেশা।

কোথা টুনটুনি-ডাকা আশ্বিনের পড়ন্ত বিকেল?
কোথায় বা বার্চের ছায়া-আলিম্পন,
সুনীল ঢেউয়ের মাঝে সিন্ধু-পাখি ডাকে,
মর্মরিত শিহরিত মিঠেকড়া শান্ত দ্বিপ্রহর?

কোনখানে নাই কোনো মিল
বিদিশার বন্ধু মোর,
কোনখানে নাই কোনো মিল!

কল্যাণী প্রামাণিক

সিকি-দেবী

১

বিবেকানন্দ রোডের ভজহরি সরখেল তস্য বন্ধু নরহরির মেসে গিয়া তাহার সহিত নানা কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিল, কাল রবিবার। চল না, কোথাও একটু ঘুরে আসা যাক।

নরহরি বলিল, আমার যাওয়া হবে না।

কেন?

আমি কাল বিকেলে লেকে বেড়াতে যাচ্ছি।

হঠাৎ?

মোটেই কোন রোমান্স নয়। বয়স হচ্ছে, একটু ধর্ম-কর্ম—

তা লেকে কেন?

সেখানে সম্প্রতি একজন সিকি-দেবীর আবির্ভাব হয়েছে।

আবির্ভাব?

হ্যাঁ, অমন হয়। গীতায় আছে, যদা যদা হি ধর্মস্য—জান তো? বিশেষ ক'রে, মানুষের বয়সটা যখন মাঝ-বয়স ছাড়িয়ে যায়, তখন তার মনের কোণে কেমন একটা আলোড়ন, একটা চুলবুল ভাব, একটা উসখুস ভাব, একটা আড্ডা-পরায়ণতা, একটা ক্লৈব্য, একটা আত্মসমর্পণেচ্ছা এসে পড়ে এবং মনটা মা-মা কিংবা বাবা-বাবা করতে থাকে। ইকনমিক্সের চাহিদা ও সরবরাহ নিয়মানুসারে পাড়ায় পাড়ায় দুই-এক জন ক'রে মা বা বাবা আবির্ভূত হয়ে থাকেন এবং এই সকল তৃষিত প্রাণে শান্তি-বারি সিঞ্চন ক'রে থাকেন।

ভজহরি বলিল, তোমার মনটা কবে থেকে মা-মা করছে? কই, এর আগে তো কোন লক্ষণ দেখি নি!

সেদিন আমাদের মেসের একজন দেখে এসেছেন এবং প্রসাদ পেয়ে এসেছেন। তারপর থেকেই আমার মনটা কেমন যেন—

তা হ'লে যাবেই ঠিক করেছ?

হ্যাঁ।

কখন যাবে?

চারটে থেকে তাঁর দর্শন আরম্ভ হয়।

ও। আচ্ছা, নামটা সিকি-দেবী হ'ল কেন?

মানে, উনি বিকেল চারটে থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত, এই ছ ঘণ্টা দেবী। বাকি আঠারো ঘণ্টা মানবী।

তা হ'লে উনি তিন-এর চার মানুষ, আর এক-এর চার দেবতা?

তা বলতে পার।

আচ্ছা, তা হ'লে আমিও একবার যাব তোমার সঙ্গে।

বেশ, চল।

ভজহরি বলিল, এ কথা শুনলে বেলাও কিন্তু নেচে উঠবে।

তা ওঁকেও নিয়ে চল। কণিকাও চলুক।

আচ্ছা, তা হ'লে প্রস্তুত থেকো। আমি বেলা ও কণিকাকে নিয়ে এখানে আসব। এখান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।

তাই ঠিক রইল।

২

লেকের দক্ষিণ পাড়। আমগাছের নীচে বহু লোকসমাগম হইয়াছে। বেলা পাঁচটায় ভজহরি, নরহরি, বেলা ও কণিকা আসিয়া পৌঁছিল। রাস্তায় গাড়ি রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমতলায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইল, একটি মোটা মূল্যবান পারসিয়ান কার্পেট, তাহার উপরে একটি সুদৃশ্য সূচীকাজ-করা মখমলের তাকিয়া। পাশে তেমনই একটি পাশ-বালিশ। মাথার কাছে একটি রূপার কুঁজা। বালিশের অপর পাশে একটি রূপার পিকদানি। তাকিয়ার সঙ্গে হেলান দেওয়া দুইটি প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া। তাকিয়ায় ঈষৎ হেলান দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া বা শুইয়া আছেন একটি অপরূপ সুন্দরী। হাত পা মুখ চমৎকার রঙ দিয়া ঢাকা, ভ্রূ তুলি দিয়া আঁকা, ওষ্ঠাধর লাল-বর্ণে রঞ্জিত। রেশমের কাঁচুলি, ভয়েলের ব্লাউজ, লাল টকটকে সায়া। একখানি সূক্ষ্ম ভয়েলের শাড়ি সমস্ত দেহলতাটিকে আলগোছে লেপটাইয়া আছে। গলায় লকেট-হার, বাঁ-হাতে রিস্টওয়াচ, ডান হাতে এক-গাছি লাল কাচের চুড়ি। প্রসন্ন মুখে প্রসন্নতর হাসি।

ভজহরি এবং নরহরি মুগ্ধনেত্রে মাকে দেখিতে লাগিল।

বেলা বলিল, এস, ওইদিকে গিয়ে একটু বসা যাক।

তাহারা চারজনে সমবেত জনতার মধ্যেই এক পাশে একটু স্থান করিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহাদের পাশে বসিয়া আছে একটি পরিবার। মাতা, কন্যা ও পুত্রবধূ। তাহাদের কথাবার্তায় বুঝা গেল, বধূটির ডাক-নাম রাঙা-বউ, ননদটির নাম কেতকী। মাতাটিকে আমরা গৃহিণীই বলিব।

রাঙা-বউ মন্তব্য করিল, এত সাজের ঘটা কি ভাল?

গৃহিণী বলিলেন, যার যেমন মন। তুমি খালি সাজটাই দেখছ। ওঁর মধ্যে যে আগুন রয়েছে, তাই দেখতে হয়। ওঁর আবার সাজ! ওঁর কাছে বেনারসীও যা, চটের থলেও তাই। তবে কি না লোক-হিতার্থে—

রাঙা-বউ কেতকীর গা একটু টিপিয়া নিম্নস্বরে বলিল, মানে, পুরুষ মানুষগুলোর মাথা-ঘোরানার্থে—

কেতকী বলিল, ভারি টিপ্পনী কাটতে শিখেছ রাঙা-বউ। একটু থাম না। ওই দেখ, আবার কে পান্তুয়ার হাঁড়ি নিয়ে এল। ইস্, কত বড় হাঁড়ি দেখেছ।

রাঙা-বউ বলিল, কটা হাঁড়ি হ'ল এরই মধ্যে?

কেতকী বলিল, তা পঞ্চাশ-ষাটটা হবে।

কি হবে অত পান্তুয়া?

গৃহিণী বলিলেন, থামো না বউমা। কথায় বলে, আরের মন আরের দিক, চোরের মন কোঁচ্‌কার দিক। খালি পান্তুয়াই দেখছ। কতখানি ভক্তি থাকলে, অতবড় হাঁড়ি ভ'রে পান্তুয়া আনে, তার কিছু বোঝ?

রাঙা-বউ শাশুড়ীর কথার কোন উত্তর দেয় না।

পিঁক করিয়া একটি মোটরের হর্নের শব্দ কানে আসিতেই সকলে উৎকর্ণ হইয়া রাস্তার দিকে চাহিল। একখানা বিরাট আট-সিলিণ্ডার গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। সমবেত জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জনের

ঢেউ খেলিয়া গেল। এসেছেন, ওই যে এলেন, আজ দেখছি একটু সকালেই এলেন, এই, একটু সরুন না, ইত্যাদি নানা প্রকার অভ্যর্থনা-সূচক কথাবার্তায় সমস্ত জনতা গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

একটি আধুনিক সাহেবী-পোশাক-পরা আধবয়সী ভদ্রলোক স্মিতমুখে জনতার মধ্যে অতি সসম্ভ্রমে একটু পথ করিয়া লইয়া মায়ের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া একেবারে লম্বা হইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ মাথাটা মাটিতে ঠেকাইয়া মাথাটা একটু উঁচু করিয়া মায়ের একটি পায়ের বুড়া আঙুলটিকে জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া তাঁহার পায়ের নিকট বসিলেন।

কণিকা বেলাকে বলিল, দেখেছ, কত বড় ভক্ত?

কিসে বুঝলে? প্রণাম করা দেখে?

দেখেছ গাড়িখানা! অতবড় গাড়িতে কত বড় ভক্ত আসতে পারে, তা অনুমান করা কি কঠিন? তা জামাইবাবু, আপনাকে অমনি একখানা গাড়ি কিন্তু কিনতেই হবে।

বেলা বলিল, থামো না। একটু ব'স চুপ ক'রে।

সিকি-মা স্মিতমুখে ভক্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি, কেমন আছিস?

রাঙা-বউ ফোঁস করিয়া উঠিল, একটুখানি একটা মেয়ে, বয়স তো বাইশ পেরোয় নি, অত বড় একটা মানুষকে তুই বলছে!

গৃহিণী বলিলেন, আহা-হা, মায়ের কাছে ছেলে চিরদিনই ছোট। ছেলে কখনও মায়ের চেয়ে বড় হয় নাকি! না বোঝ, চুপ ক'রে থেকো। অমন যা-তা ব'লো না।

ভদ্রলোক বলিলেন, হ্যাঁ, শারীরিক ভালই আছি। তবে মনটা—

সিকি-মা বলিলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। জামিনে ছাড়া পেয়েছ না?

হ্যাঁ, অনেক কষ্টে। ডিফালকেশন কেসে শুধু জামিন পেতেই লাখ টাকা বেরিয়ে গেল। তা ছাড়া আরও দুটো কেস আছে কি না!

আরও দুটো কেস?

হ্যাঁ সিকি-মা। একটা খুনের আর একটা খোরপোষের। দুটোরই আসামী।

তাই তো ছেলে! তা ভাবিস নি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আজ আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারব না। অনেক জায়গায় যেতে হবে।

আচ্ছা, এস।

ভদ্রলোকটি সিকি-মায়ের পায়ের কাছে একখানি গিনি রাখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেলেন। পিক করিয়া হর্ন দিয়া মোটর চলিয়া গেল।

কণিকা ভজহরিকে বলিল, কবে অমনি একখানা গাড়ি কিনছেন, বলুন?

আচ্ছা, সে হবে 'খন।

না। বলুন, কবে?

আচ্ছা, আসছে সপ্তাহেই অর্ডার দোব। এখানে পাওয়া যাবে না। আমেরিকা থেকে আনাতে হবে।

কণিকা নরহরিকে বলিল, পাস্তুয়া এনেছেন?

না।

তা হ'লে? কিছু দিতে হবে তো?

ভজহরি ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া কণিকার হাতে দিল। বলিল, আমাদের সবাকার হয়ে তুমি এটা দিয়ে এস।

কণিকা গলবস্ত্র হইয়া অগ্রসর হইয়া সিকি-মায়ের পায়ের কাছে নোটখানি রাখিয়া প্রণাম করিয়া স্বস্থানে আসিয়া বসিল।

রাঙা-বউ শাশুড়ীকে বলিল, মা, সবাই দিচ্ছে। আমরা কি দোব?

গৃহিণী বলিলেন, যাও না বউমা, এই আনিটা দিয়ে প্রণাম ক'রে এস।

রাঙা-বউ বলিল, গিনির পাশে আনি! আমি পারব না।

গৃহিণী কন্যাকে বলিলেন, যা না কেতু, যা, প্রণাম ক'রে আয়। মায়ের কাছে সবই সমান। গিনিও যা, আনিও তাই।

কেতকী বলিল, আচ্ছা, দোব 'খন একটু পরে। আরো দু-একটা আনি-টানি পড়ুক।

রাঙা-বউ বলিল, আনি কেউ দেবে না।

এমন সময়ে একটি বিধবা মহিলা এক পাশ হইতে উঠিয়া গিয়া একটি পয়সা দিয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

কেতকী বলিল, কেমন, দেখলে তো? এই কথা বলিয়া সেও আনিটি দিয়া প্রণাম করিয়া আসিল।

টাকা আনি প্রভৃতি অনেকে দিলেও, অন্যান্য দ্রব্যও মাঝে মাঝে আসিতেছিল। কেহ প্রণাম করিতেছে একখানি শাড়ি দিয়া, কেহ ব্লাউজ দিয়া, কেহ কাঁসার থালা দিয়া, কেহ একটি সিন্দূরের কৌটা দিয়া, আবার কেহ বা একটি সরু মফ-চেন দিয়া। ব্যাপারটা প্রায় নূতন বধূ-দর্শনের মত দাঁড়াইয়াছে।

রাঙা-বউ কেতকীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, আমাকে অমনি ক'রে সাজিয়ে গড়ের মাঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে একদিন শুইয়ে দিতে পার, তা হ'লে তোমাদের সংসারের আর কোন ভাবনা থাকবে না।

গৃহিণী বলিলেন, অমন কথা বলতে নেই বউমা। সবাই কি দেবী হতে পারে? যারা দেবী, তারাই দেবী হয়। দেব দেবী নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই।

৩

একটু দূরে একটি ভদ্রলোকের চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে। বেলা ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, উনি কাঁদছেন কেন?

কণিকা বলিল, কাঁদবেন কেন! চোখের ও-জলটা হচ্ছে ভক্তি-অশ্রু। বেশি ভক্তি হ'লে অমন হয়। উনি তো আমাদের পাড়াতেই থাকেন। নাম হচ্ছে ভবতারণ কি-যেন, ডি. এস-সি.।

ডি. এস্-সি.র অমন দশা কেন?

অমন দশা মানে? বয়সটা দেখছ না, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। এই বয়েসেই তো মা-বাবার জন্যে মনের ব্যাকুলতা আসে। দেখছ না, এই যে ব'সে আছেন ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলারা, এত বয়স হয়েছে, তবু সবারই কেমন একটা খোকা-খোকা খুকু-খুকু ভাব, মায়ের কোলের জন্যে যেন পাগল।

পিঁক করিয়া মোটর-হর্নের একটা শব্দ হইতেই আবার সকলে সচকিত হইয়া উঠিল। আবার গুঞ্জন উঠিল। কেহ বলিল, সভাপ্রতি আসছেন, কেহ বলিল, ওই ঢাকগোবিন্দবাবু আসছেন, কেহ বলিল, সঙ্গে ঢোলগোবিন্দবাবুও আছেন। দেখা গেল, সভাপতি ঢাকগোবিন্দবাবু প্রধান অতিথি ঢোলগোবিন্দবাবুর সঙ্গে সভায় উপনীত হইলেন। সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। উঁহারা দুইজনে সিকি-দেবীর দুই পাশে কার্পেটের উপর গিয়া বসিলেন।

সভাপতি মহাশয় সবিনীত নমস্কার করিয়া সমবেত জনতাকে কৃতার্থ করিলেন। বলিলেন, সাধারণত সভাপতির কাজ বক্তৃতা করা। কিন্তু এটা বক্তৃতার স্থান নয়। ভক্তির স্থান। সুতরাং আমি কোন বক্তৃতা করব না। শুধু আপনাদের কাছে এই কথা নিবেদন করব যে, আপনারা এই সিকি-দেবীর পূজা ক'রে, এঁকে শ্রদ্ধা ক'রে, ভক্তি ক'রে, নিজেরা ধন্য হোন এবং সকলকে ধন্য করুন।

প্রধান অতিথি মহাশয় বলিলেন, আমিও বক্তৃতা করতে আসি নি। তবে কোন স্থানে জনতা সমবেত হ'লেই সেখানে সভা হয়, এবং সভা হ'লেই সেখানে সভাপতি এবং প্রধান অতিথির প্রয়োজন। তাই এখানে আসা। ধর্মস্থানে মিথ্যা বলব না। আমি এখানে এসেছি এর মূল কারণ এই যে, কাল খবরের কাগজে আমার নাম দেখতে পাব। শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, ধর্ম বলুন, রাজনীতি বলুন, সঙ্গীত বলুন, চারুকলা বলুন, কোন বিষয়েই আমার এতটুকু মুরোদ নেই, যার জন্যে আমার নাম কেউ জানতে পারে। তাই এই সব সুযোগ উপেক্ষা করতে পারি নে। তা ছাড়া ঢাক-ঢোল এঁদেরও দরকার। এই সকল কথা বিবেচনা ক'রে আপনারা আমার বক্তৃতায় অক্ষমতা সত্ত্বেও প্রধান-অতিথিত্ব মার্জনা করবেন।

এই কথা কয়টি বলিয়া ঢোলগোবিন্দবাবু নীরব হইলেন। একজন ভক্ত ভজহরিকে বলিলেন, দেখলেন, কি বিনয়! আহা, এমন না হ'লে কি এই সব সভায় মানায়!

সিকি-দেবী একটু হাসিয়া ঢাকগোবিন্দবাবুকে বলিলেন, আজকের রিপোর্টটা—

ঢাকবাবু বলিলেন, কিছু ভাববেন না। 'ধূমকেতু' কাগজের ভার আমি নলুম।

চোলগোবিন্দবাবু বলিলেন, 'ত্র্যহস্পর্শ' কাগজের জন্যে আপনার ভাবনা নেই।

আরও দুই-একটা কথাবার্তার পর উঁহারা সিকি-দেবীকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

৪

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। জনসমাগমও বাড়িতে লাগিল। কেহ কেহ উঠিয়া গৃহে ফিরিলেন; আবার নূতন অভ্যাগতেরা সেখানে আসিয়া বসিলেন। সিকি-দেবীকে ঈষৎ ক্লান্ত মনে হইতে লাগিল। তিনি দুই-একবার এপাশ-ওপাশ করিলেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি মহিলা কুঁজা হইতে একটি গ্লাসে জল ভরিয়া দেবীকে খাইতে দিলেন।

রাঙা-বউ বলিল, সঙ্গে ঝি আছে দেখছি।

গৃহিণী বলিলেন, ঝি কেন হবে? ও একজন সাধিকা। দেব-দেবীদের বিষয়ে অমন ঝি-টি বলতে নেই।

সাধিকাটি উঠিয়া আসিয়া দেবীর পায়ের নিকট সঞ্চিত টাকা, গিনি, নোট প্রভৃতি একত্র করিয়া বালিশের নীচ হইতে একটি সলমা-চুমকি-বসানো রেশমের গোল থলি বাহির করিয়া তাহাতে রাখিয়া দিল এবং পুনরায় স্ব-স্থানে গিয়া স্থির হইয়া বসিল।

সাড়ে নয়টার পর হইতে লোক সংখ্যা কমিতে লাগিল। রাঙা-বউ বলিল, আমরাও এবার উঠি।

শাশুড়ী বলিলেন, হ্যাঁ মা, চল। যাও, তোমরা দেবীকে একবার প্রণাম ক'রে এস।

রাঙা-বউ ও কেতকী উঠিয়া দেবীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, হয়েছে, আর প্রণাম করতে হবে না। মুখটা রাঙা-বউয়ের কানের কাছে লইয়া বলিলেন, আমাকে চিনতে পার নি। আমি সিমলের বিভা। মনে নেই, এক সঙ্গে ক্লাস নাইনে

পড়তুম। যাক, রাত হয়েছে। এখন বাড়ি যাও। এতদিন পরে দেখা। দুটো কথাও বলতে পারলুম না।

পার্শ্বে উপবিষ্ট সাধিকাকে দেবী বলিলেন, একটা বড় দেখে পান্তুয়ার হাঁড়ি দাও তো এঁদের।

পান্তুয়ার হাঁড়ি লইয়া ইহারা বিদায় লইলেন।

রাঙা-বউ কেতকীকে বলিল, আরে, ও তো আমাদের বিভা।

কেতকী বলিল, হোক না বিভা। যাক না আর দুদিন, তোমাকে চিনতেও পারবে না।

সভাস্থল প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে। ভজহরিরাও উঠিয়া পড়িল। এই পাড়াতেই এক বাড়িতে একটু দেখা করিয়া যাইবে বলিয়া তাহারা মোটরে উঠিয়া পড়িল।

দশটা বাজিতেই সভা জনহীন হইয়া গেল। দেবীও মানবী হইলেন। অদূরে হাফ-প্যাণ্ট ও ক্যাম্বিসের জুতা-পরা একটি ভদ্রলোক দুইখানি হাত-গাড়ি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। একটি গাড়িতে প্রকাণ্ড একটি গামলা। সমস্ত পান্তুয়াগুলি হাঁড়ি হইতে তাহাতে ঢালা হইল। তারপরে অন্যান্য জিনিসগুলি গুছাইয়া লইয়া একটিতে ভদ্রলোক গিয়া বসিলেন এবং আর একটিতে দেবী গিয়া বসিলেন।

এ পাড়ায় সাক্ষাতের কাজ সারিয়া ভজহরিরা যখন ট্রাম-লাইন পার হইতেছেন তখন দেখিতে পাইলেন, একটি ময়রার দোকানের একটি দরজা খোলা এবং দুইজনে একটি পান্তুয়ার গামলা ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ভজহরির গাড়ি চলিয়া গেল।

বাড়ি পৌঁছিয়া ভদ্রলোক জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন, এই ভাবে চললে বছরখানেকের মধ্যেই একটা আশ্রম খোলা যাবে, কি বল?

বিভা বলিল, তা যেতে পারে। দেশে মা ও বাবার চাহিদা ক্রমশ যেমন বেড়ে চলেছে, তাতে খুবই আশা আছে।

সিকি-দেবী মানবী-বিভায় পরিবর্তিত হইয়া ঘরকন্নার কাজে মন দিলেন।

"ভাস্কর"

ঐতিহাসিক চাংতাই

চাংতাই শুধু বিখ্যাত ঐতিহাসিকই নন, অত্যন্ত উঁচুবংশের মানুষ। ধবধবে দীর্ঘাঙ্গ মানুষটির বয়স বোঝা যায় শুভ্র রজতরঙের চুলে। তাঁর স্ত্রী মাই-আনও সুন্দরী, তন্বী এবং মাধুর্যময়ী। আর সেক্রেটারি য়ুয়ান্‌কী খুব বিশ্বস্ত যুবাপুরুষ। দুটি পুরুষ আর একটি নারী। বিশ্বের প্রথম লিপির চেয়েও আদিম, সেই চিররহস্যের ত্রিভুজ।

পশ্চিম দেশে এই পরিস্থিতিকে ত্রিভুজ ব'লেই অভিহিত করা হয়। কিন্তু ড্রাগনের দেশ হ'ল চীন, তাই তারা একে বলে—রহস্য-গ্রন্থি। মানুষের ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন এর নাম দেওয়া হ'লেও এ সমস্যা চিরন্তনী, সব দেশের। এ সমস্যা যার জীবনে দেখা দেবে তাকেই এর সমাধান ক'রে নিতে হবে, কোন অভিধানেই এর সহজলভ্য উত্তর নেই।

লোকে বলাবলি করত, চাংতাই বিশ্বের জাহাজ হ'লে হবে কি, সাধারণ জ্ঞানটা কিছু কম ভদ্রলোকের। হান্-সম্রাটদের প্রত্যেকের জীবন ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে লম্বা-লম্বা বক্তৃতা দিতে পারেন, হয়তো নিখুঁত-ভাবে দু-হাজার বছরের রাজপরিবারের প্রত্যেকটি রাণীর অসংখ্য প্রেম-কাহিনীও নখাগ্রে, তবুও দুঃখের কথা, নিজের ঘর সম্বন্ধে একেবারে হাবা। সেখানে কি ঘটছে না-ঘটছে তার কোন খবরই রাখেন না।

যারা এই ধারণা পোষণ করত তারা ভুলই করত বলব। সংসারের সব সংবাদই জানতেন, চোখ বুজে থাকলেও কোন ব্যাপার এড়িয়ে যেত না—এর পরিচয় বহুদিন পরে সবাই জেনেছিল। মহাসমাধির পরিত্যক্ত প্রান্তরে একদিন নিজের জীবনের সমস্যা যেভাবে তিনি সমাধান ক'রে দিয়েছিলেন তার প্রতিটি চিন্তা বহু আগে থেকেই ঠিক ক'রে নেওয়া।

"শত সমাধির উপত্যকা" চাংতাই-এর নিজের আবিষ্কার। হান্-যুগের ইতিহাস নিয়ে জীবনব্যাপী তাঁর যে গবেষণা, এ উপত্যকা তার পুরস্কারস্বরূপই বলা যায়। হ্যাড়া পাহাড়ের নীচে যে অব্যবহার্য নির্জন পরিত্যক্ত উপত্যকা, সেখানেই হান্-রাজাদের শত সমাধির দীর্ঘ প্রান্তর। দু-হাজার বছরের প'ড়ে-থাকা প্রান্তরে কারও পদচিহ্নই পড়ে নি। এই অবহেলিত অন্তরালে ব'সেই চাংতাই গবেষণা চালাচ্ছিলেন, একান্ত

নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ দস্যুদের আক্রমণে ভীত হয়ে গবেষণায় বাধা পড়ে, প্রাণভয়ে তাঁকে চ'লে আসতে হয় সাময়িকভাবে—তারপর দস্যুরা বিতাড়িত হ'ল। যেমন অতর্কিতে এসেছিল, তেমনি পালাল বাধা পেয়ে। চাংতাই আবার তাই গবেষণা শুরু করতে মনস্থ করলেন। যে ভূভাগ দু-হাজার বছর ধ'রে নির্জীব হয়ে প'ড়ে আছে, ঐতিহাসিক চললেন সেখানে নব-আবিষ্কারের প্রেরণায়।

পরিচিতদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু হ'ল স্ত্রী আর সেক্রেটারিকে সঙ্গে নিয়ে। কয়েক দিন চলার পর এলেন এক শহরে। সেখান থেকে লোকজন সমবেত ক'রে পশ্চিমাভিমুখে পা চালালেন পাহাড়ী বালিয়াড়ীর সড়ক ধ'রে।

একদল চা-ব্যবসায়ীর সঙ্গে যাওয়াই ঠিক হ'ল। কুলি সংগ্রহে, খাবার সংগ্রহে, ঘোড়া সংগ্রহে ব্যস্ত রইলেন চাংতাই দিনকতক।

দশ দিনের দিন আবার শুরু হ'ল যাত্রা। বহু প্রাচীন পথ দিয়ে যেতে হচ্ছে—এসব পথ তৈরি করেছিলেন চেংগিস্ খাঁ। পথের দূরত্ব বুঝে নেবার জন্যে মাঝে মাঝে পাথরের ঢিবি।

তিনটি মানুষের জন্যেই যেন এই পথের সৃষ্টি। এই দুর্গম পথেও চাংতাই সদাহাস্যময়। মাই-আনের রঙ-করা মুখে যেন থমথমে চাপা আক্রোশ, কালো চোখে ঝড়ের সংকেত। এই দুর্গম পথে টেনে এনে স্বামী প্রভুত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন, এ আক্রোশ তারই বিরুদ্ধে। য়ুয়ান্‌কীও চুপচাপ, চোখে তার ভয়ের ছাপ, সতর্কতার দৃষ্টি সর্বদাই।

সাঁইত্রিশটি পাথরের ঢিবি পেরিয়ে তাঁরা সদাগরদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেন। এখন তাঁদের অন্য পথ। এখন পথ দক্ষিণমুখী। পাহাড়ের পেট চিরে সরু মসৃণ পথ ধ'রে দুর্গম তীর্থযাত্রা। এখন পাহাড় উঠেছে খাড়া। রৌদ্র-রুক্ষ জলন্ত প্রান্তর পার হলেন তাঁরা। মাটি ও পাথরের পথ হ'লেও অত্যন্ত কষ্টের। জল গাছ প্রকৃতির কোন দয়া নেই এখানে।

এই নির্জন ভয়াবহ জায়গায় ভাই প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধও শিথিল। মানুষের সমাজ পেছনে প'ড়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু গাধার পিঠে বাঁধা জলপাত্রগুলোর জল-কল্লোলের শব্দ উঠছে।

মাই-আনের রাগ প'ড়ে এসেছে, রাগের বদলে এখন দেখা দিয়েছে ভয়। রঙ-করা ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে মাই-আন শিউরে উঠে তাকালেন য়ুয়ান্‌কীর পাংশু মুখের দিকে, তারপর চোখ ফেরালেন স্বামীর কঠিন ভাবলেশহীন চেহারার দিকে।

এমনিভাবে সাত দিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর তাঁরা পৌঁছুলেন মহাসমাধিক্ষেত্রের তীর্থে।

কিছুই পালটায় নি দেখছি, সবই তেমনি আছে।—ব'লে চাংতাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। দস্যুগুলো তা হ'লে কোন সন্ধান পায় নি ধন-রত্নের। সীমাহীন জলহীন নিষ্ঠুর মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন মাই-আন্। একটা অজানা ভয়ে মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। অজ্ঞাতে বার বার শিহরণ জাগছে মনে। কতদিন থেকে নিজের এই আতঙ্কের কথা প্রিয় য়ুয়ান্‌কী-কে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু সুযোগ হয় নি বলার। স্বামীর দীর্ঘছায়া যেন তাঁদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রচনা ক'রে এসেছে এতদিন।

চাংতাই-এর আদেশে তাঁবু খাটানো হ'ল তাড়াতাড়ি। তাঁর তাঁবু হ'ল মাঝখানে, তার এক পাশে স্ত্রীর আর অন্য পাশে সহকারীর তাঁবু পড়ল। খেয়ে-দেয়ে আজ পূর্ণ বিশ্রাম; অন্য কোন কথা নয়, অন্য কোন কাজ নয় আর। কাল সকালে উঠে যা হয় হবে।

খুব ভোরে সহকারীর ভয়ার্ত চিৎকারে চাংতাই-এর ঘুম ভাঙল।

ব্যাপার কী? কী হয়েছে য়ুয়ান্?

ভয়ে য়ুয়ান্‌কীর দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। শরীর কাঁপছে থরথর ক'রে।—শিগ্রি আসুন, ডাকাতে সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে, এমন কি একটা জলাধারও রেখে যায় নি আমাদের জন্যে। তা ছাড়া, আমাদের লোকজনও ভয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে, এখন উপায়? হায় হায়! কখন মাই-আন্‌ও এসে যোগ দিয়েছেন, বলছেন, আমরা এবার মারা গেলাম। রাত্রের অন্ধকারে সর্বস্ব খোয়া গেল, এখন এই প্রেতপুরীতে না খেয়ে শুকিয়ে মরব। হায় স্বামী, কেন এমন সর্বনাশ করলে আমাদের!

চাংতাই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, চুপ কর তোমরা।

কাঁদছ কেন? কি হয়েছে? লোকজন পালিয়েছে কে বললে? কেউ পালায় নি, আমিই তাদের চ'লে যেতে বলেছি।

কেন? কেন তাদের চ'লে যেতে বললে?—মাই-আন্ ভয়ে নীল।

প্রয়োজন ছিল।—কেটে কেটে চাংতাই উচ্চারণ করলেন, একটা সমস্যার সমাধান করতে চাই, তাই যেতে বলেছি। আমাদের ঘরোয়া কথা তারা শুনবে এটা আমি চাই না, বুঝলে?

এতক্ষণে ব্যাপারটা মাই-আন্ বুঝতে পারেন একটু। বিচিত্র এক অনুভূতি তাঁকে যেন বিকল ক'রে দিল। য়ুয়ানও বুঝেছে, তবে তার মুখ ভাবলেশহীন। ঠোঁট কামড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

খোলাখুলিই আলোচনা হোক তা হ'লে।—বলেন ঐতিহাসিক। কিছুদিন থেকে আমার ঘরে নাকি অনাচার ঢুকেছে শুনছি! লোকে বলে, চাংতাই-এর বউ মাই-আন্ বিয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতিনা হয়েছে। শাণিত চোখে তিনি তাকালেন স্ত্রীর দিকে,—তুমি কি বল? এ কথা সত্যি?

মিথ্যে, মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে।—অকস্মাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন মাই-আন্। আমি বলছি, এ সব মিথ্যে কথা, ভগবানের নামে শপথ ক'রে—। হঠাৎ স্বামীর চোখে চোখ পড়ায় স্তব্ধ হয়ে যান।

তুমি? য়ুয়ানের দিকে তাকান এবার, তুমি কি বল? য়ুয়ান যুবক, তা ছাড়া নির্ভীক, এক লহমা কি ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়, সত্যি। এ কথা সত্যি যে আমাদের মধ্যে ভালবাসা হয়েছে। মাই-আন্ প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সে থামল না—এ কথা অস্বীকার করব না, কিন্তু সে অপরাধ আমাদের কারো নয়। আমারও নয়, মাই-আনেরও নয়। প্রভু তাও-এর নামে শপথ ক'রে বলছি, এ ইচ্ছে তাঁর দান। আমাদের প্রেম ভগবানের দান।

বটে? ভগবানের দান?—তেতো গলায় খেঁকিয়ে ওঠেন চাংতাই, ভালবাসা ভগবানের দান, নয়? কিন্তু সে ভালবাসা কি আমিও তোমায় দিই নি য়ুয়ান? আমার প্রেমের দরজা কি তোমাকে খুলে দিই নি আমি? ভাগ দিই নি আমার জ্ঞানের? আজীবন তপস্যার?

ছেলের মত একই যশের ভাগীদার হবার জন্যে তোমাকে সস্নেহে কাছে ডাকি নি? তবে?

য়ুয়ান লজ্জায় অধোবদন, মুখ লজ্জায় আবীর-রাঙা হয়ে উঠল। চাংতাই ব'লে চলেন, আর মাই-আন! তোমাকেও কি দিই নি, বল? তুমি স্বণ্য গরিবের ঘরের মেয়ে, তোমায় আভিজাত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নি আমি? কি নিয়ে এসেছিলে আমার ঘরে? তোমার শূন্য ঝুলিকে কত দিক দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছি বল তো। ভালবাসা, ঐশ্বর্য, মর্যাদা, খ্যাতি—কী নয়? আর তার প্রতিদানে কিনা তুমি আমার জীবনে নোংরা জট পাকালে, আমার জীবন দুর্বিষহ করলে। একটু দম নিয়ে আবেগকম্পিত স্বরে বললেন, আমার পারিবারিক কলঙ্ক ঘোচাতে চাই আজ। মনে পড়ে মাই-আন, সেই লম্বা তলোয়ারখানার কথা, যার গায়ে খোদাই করা আছে: 'বরং সম্মানের সঙ্গে মরবে, তবু অপমান নিয়ে বাঁচবে না।'

কান্নায় শতধা হয়ে মাই-আন ভয়ে শুধু বলেন, তুমি, তুমি আমাকে খুন করবে? না না, দুটি পায়ে পড়ি—। কাঁপতে কাঁপতে তিনি ব'সে পড়েন।

য়ুয়ান এতক্ষণে বিমূঢ় ভাবটুকু কাটিয়ে একপা একপা ক'রে এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, দোষ যদি হয়ে থাকে তো আমার শাস্তি আমাকে দিন, আমি প্রস্তুত। মাই-আনের প্রাণের বদলে আমার প্রাণ নিন, আমার কোন দুঃখ নেই।

চাংতাই নরম হলেন না একটুও।—সে তো একটা কথা নয় য়ুয়ানকী। সে হতে পারে না, যে জট মাই-আন পাকিয়েছে তার গিঁট তাকেই খুলতে হবে। মাই-আনের হাতেই তোমার ভাগ্য নির্ধারণের ভার দোব। সেই বলবে—তুমি বাঁচবে, না, মরবে!

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে দুটি নারী পুরুষ। চাংতাই গম্ভীর মুখে তাঁবুতে চ'লে গেলেন, তারপর ফিরে এলেন একটি জলপাত্র নিয়ে।

শোন, এই নির্জন উপত্যকায় আমরাই শুধু তিনজন জীবন্ত লোক। আর কেউ নেই, তা ছাড়া উদ্ধারের আশা তো নেই-ই। লোকজন

পালিয়েছে, লুকিয়ে আমি এই জলপাত্রটি রেখেছিলাম। সাবধানে খরচ করলে আমাদের যে কেউ একজন লোকালয়ে যেতে পারবে কষ্টেসৃষ্টে। এখন মাই-আনকে মীমাংসা করতে হবে, এ জলাধার নিয়ে কে প্রাণ বাঁচাবে। মনে রেখো, এটা যদি য়ুয়ান্‌কী পায় তো সে এখুনি আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবে বাড়ি। তুমি আর আমি পিপাসায় ছাতি ফেটে মারা যাব তিল তিল ক'রে। আর আমাকে যদি দাও তো আমিও ওই একই পন্থা অনুসরণ করব। তোমরা দুজন এই মৃত্যু-গুহায় প'ড়ে থাকবে। এখন তোমার ইচ্ছে কি, বল ?

জলাধারটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে মাই-আন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, অশ্রুতে সমস্ত মুখ ভিজে, ভয়ে কাঁপছেন থরথর ক'রে।

ভাল ক'রে ভেবে দেখো, তোমার হাতেই জীবন-মরণ নির্ভর করছে। অবশ্য তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নেই, পরে জানিও তোমার ইচ্ছে।

কি বলতে গিয়েও বলা হ'ল না মাই-আনের। কান্না চেপে দ্রুতপায়ে তাঁর তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কাছেই একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে ব'সে চাংতাই নির্বিকার চিত্তে পাইপ ধরালেন। আর য়ুয়ানকী মাটির ওপর স্থির হয়ে ব'সে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে লাগল।

সেই বিশাল মৃত্যু-প্রান্তরে প্রাণের কথা নেই, শুধু মৃত্যু আর ভয় যেন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে।

আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন পাহাড়ের আড়ালে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে যেন পৃথিবীকে গ্রাস করতে, পাহাড় আবছা আলোয় স্বপ্নময়।

য়ুয়ানকী চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ডাকতে লাগল, মাই-আন, মাই-আন, এবার বল, আর দেরি ক'রো না লক্ষ্মীটি।

কোনও সাড়া নেই—য়ুয়ানকী আবার বললে কথা কটি, তারপর আরও চেঁচিয়ে। সাড়া না পেয়ে তাঁবুতে গিয়ে দেখে, মাই-আন নেই।

পাগলের মত অপ্রকৃতিস্থ হয়ে য়ুয়ান চেঁচিয়ে উঠল, মাই-আন পালিয়েছে চাংতাই, মাই-আন পালিয়েছে আমাদের ফেলে। ছুটতে ছুটতে এসে এই গুরুতর খবর দিল গুরুকে। মাই-আন আমাদের ফেলে পালিয়েছে, আমরা একটুও জানতে পারি নি।

আমি জানি, সে কখন পালিয়েছে।—শান্তস্বরে চাংতাই বলেন, আর সে শুধুহাতে যায় নি য়ুয়ান, খোঁজ ক'রে দেখ জলাধারটিও সঙ্গে নিয়েছে।

অবসাদে ভেঙে পড়ল য়ুয়ান। বললে, আপনি দেখলেন তাকে পালাতে, তবুও কিছু বললেন না? আমরা দুজন মরব আর সে চোরের মত পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবে?

শুকনো হাসি হাসলেন চাংতাই।—হ্যাঁ, য়ুয়ানকী, মাই-আন্ সবচেয়ে ভালবাসে নিজেকে। বৃদ্ধ বা ছোকরা, সুপুরুষ বা কুৎসিত যে কোন পুরুষের চেয়ে সে নিজেকেই ভালবাসে বেশি, এ প্রমাণ আগেও পেয়েছি। কিন্তু ভয় পেয়ো না, মাই-আন অবশ্য জেনে গেল যে, আমরা তৃষ্ণায় বুক ফেটে মারা যাব এই নির্জন পাহাড়ে। কিন্তু তার অনুমান মিথ্যে।

য়ুয়ানকী বিস্মিতভাবে শুধু বললে, আপনি জানতেন তা হ'লে? আপনি জানতেন মাই-আন এমনি বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমাদের সঙ্গে?

নিশ্চয়ই।

য়ুয়ান নতজানু হয়ে ব'সে আস্তে আস্তে বললে, আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে শাস্তি দিন।

দু হাতে তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন চাংতাই, তোমাকে শাস্তি দেবেন ভগবান। আজও তুমি ছেলেমানুষ, তাই বুদ্ধিও কাঁচা। তুমি জান না বোধ হয় মানুষের বুদ্ধি একদিনে পাকে না। তার বুদ্ধি একটু একটু ক'রে আসে সূর্য-কিরণের মত।

তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আর না, এবার আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক। হান-বংশের প্রথম সম্রাটের কবর খুঁড়ে দেখা যাক, ইতিহাসের কোন্ সম্পদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে! আমাদের অভিজ্ঞতা পৃথিবীকে উপহার দেব প্রথম। মহাচীনের গ্রামে গ্রামে মাই-আনের মত সুন্দরী হয়তো মিলবে, কিন্তু একটা জীবনের মধ্যে এত বড় আবিষ্কারের গৌরব বার বার আসবে না য়ুয়ানকী। এ বড় দুর্লভ জিনিস, এ বড় দুর্লভ আবিষ্কার।

শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

---

* প্রাচীন চীনা গল্প থেকে।

হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য। গির্জার প্রাঙ্গণ

কোদালি হস্তে দুইজন বিদূষকের প্রবেশ

১ম বি। আচ্ছা, আপ্তহত্যের মড়া, রীতিমত মাটি দেওয়া চলে?

২য় বি। আপ্তহত্যে নয়, শিগ্‌গির মাটি খোঁড়। জস্ সাহেব আয় দিয়েছে রীতিমত মাটি দেওয়া হবে।

১ম বি। তা কি কোরে হয়? নিজের পরাণ বাঁচাবার জন্য যদি ডুবে মারা যেত, তা হোলে কথা ছিল না।

২য় বি। দূর। এ হোল জস্ সাহেবের আয়।

১ম বি। কিন্তু শাস্তর কি বলছে? যদি কেউ আপমজি ডোবে, তবে তার ডুবে মরার ইশ্‌ছে ছিল; ইশ্‌ছে ছিল তাই জান্ গেল, তবেই হোল আপ্তহত্যে।

২য় বি। না রে না, কথাটা হচ্ছে—

১ম বি। আরে আমার কথাটাই শোন্। এই খানে ধর পানি, কেমন? আর এই খানে নোক, বেশ? নোকটা যদি পানিবরাবর যায় আর ডুব মারে, তবেই হোল আপ্তহত্যে। আর যদি পানি এগিয়ে এসে ডুবিয়ে নেয়, তা হোলে বটে আপ্তহত্যে হয় না।

২য় বি। রাইন কি তাই?

১ম বি। রাইন ত তাই বলে।

২য় বি। তা হোলে বলতে হয়, ভদ্দর ঘরের জেনানা বোলেই জস্ সাহেবের আয়ে রীতিমত মাটি দেওয়া হচ্ছে; তোমার আমার ঘরে এমনডা হোত না।

১ম বি। এই বার ঠিক বলেছিস্। এখন কোদাল ধরা যাক। মালী, কুমোর আর গোর-খুঁড়নেওয়ালা, এরা ছাড়া আর বনিদী ভদ্দর নোক আছে কে? এরাই ত বিশ্ করমের নাম বজায় রেখেছে।

২য় বি। সেও কি ভদ্দর নোক ছিল?

১ম বি। সেই ত হোল পেরথম ভদ্দর নোক রে। কোদাল চালাত।

২য় বি। তখন কোদাল পেল কোথা?

১ম বি। দূর মুখ্যু, শাস্তর জানিস নে? শাস্তর বলছে কি? 'বিশ্‌করম ঠাকুর মিস্তিকে খুঁড়িলেন'। কোদাল না থাকলে মাটি খুঁড়বে ক্যামনে? আচ্ছা, তোকে আর একটা কথা শুধুই।

২য় বি। শুধো।

১ম বি। রাজ-মিস্তিরি আর ছুতোর-মিস্তিরি, এদের চেয়েও বেশি টেঁকসই কাজ কে করে বল্ দেখি?

২য় বি। যারা ফাঁসীকাঠ বানায়। এক এক কাঠে হাজারো মক্কেল ঝুলবে, তবু তার খেয়ানৎ নেই।

১ম বি। বাঃ বাঃ, বেশ বলিছিস্। কিন্তু ফাঁসীকাঠ কি গির্জেঘরের চেয়ে বেশি টিকবে? আর একটু ভেবে ছাখ্।

২য় বি। রাজ-মিস্তিরি আর ছুতোর-মিস্তিরি, এদের চেয়েও বেশি টেঁকসই কাজ কে করে?

১ম বি। হ্যাঁ, বল্ দেখি।

২য় বি। এইবার বলছি।

১ম বি। বল্।

২য় বি। পারলাম না। [দূরে হ্যামলেট ও হোরেসিয়োর আগমন।]

১ম বি। তোর ওই গোবরপোরা মাথায় পেরেক ঠুকলেও এ ঢুকবে না। এর পরে যদি কখনও একথা ওঠে ত বলবি,—গোর-খুঁড়নে-ওয়ালার কাজ বেশি টেঁকসই। যে ঘর আমরা বানাই তা টিকবে কদ্দিন, জানিস? পেল্লয়ের পর যখন শেষ বিচের হবে তখন পর্যন্ত। ধাঁ কোরে মল্লিকের দোকান থেকে এক ভাঁড় তাড়ি নিয়ে আয় দেখি।

[২য় বিদূষকের প্রস্থান]

(মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে গান)

যৈবনকালে পীরিত আমার
লাগত বড় মিঠা,—রে!
মক্ষির মুখে যেমনতা ওই
চিটাগুড়ের ছিটা,—রে!

হ্যাম। কবর খুঁড়তে খুঁড়তে গান! লোকটার হৃদয় ব'লে কিছু নেই নাকি?

হোরে। জীবনভোর এই কাজ ক'রে ক'রে সব ঘাটা প'ড়ে গেছে।

হ্যাম। তা ঠিক। যার কাজ করতে হয় না, তার হাতই কোমল থাকে।

১ম বি। (গান) বয়েস এসে শুটি শুটি
ধরলে টুঁটি ঠেসে,—রে!
টেনে এনে ফেললে শেষে
এমন মজার দেশে,—রে!

(একটা মড়ার মাথা উপরে ছুঁড়িয়া দিল)

হ্যাম। এই মাথাটারও একদিন রসনা ছিল, গান করত। বুড়োটা কি জোরে এটা ছুঁড়ে ফেলল, যেন একটা খুনীর মাথা! তা কোন চক্রান্তকারীর মাথাও হতে পারে; সে হয়তো পাকেচক্রে স্বয়ং ভগবানকেও এড়িয়ে যেতে চাইত! কি বল তুমি?

হোরে। তা হতে পারে।

হ্যাম। কিংবা কোন সভাসদের; প্রতি প্রাতঃকালে বলত, 'সেলাম হুজুর! হুজুরের মেজাজ সরীফ?' আবার এও হতে পারে ইনি স্বয়ং একজন হুজুর, আর এক হুজুরের ঘোড়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন কারণ ওই ঘোড়াটা তাঁর চাই! হতে পারে না?

হোরে। খুব হতে পারে।

হ্যাম। আর এখন ইনি কীটরাণীর সম্পত্তি, চোয়ালহারা হয়ে কোদালের ঠোক্করে গড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। চমৎকার বিবর্তন! মানুষের মাথা নিয়ে ভাঁটা খেলা। ভাবতেও আমার মাথা কেমন করে।

১ম বি। (গান) গাঁইতি কোদাল, গাঁইতি কোদাল,
আচ্ছাদনের চাদর,—রে,
মাটি কেটে খাদ বানা তুই,
হোক কুটুমের আদর,—রে!

(আর একটি মড়ার মাথা ছুঁড়িয়া দিল)

হ্যাম। এই যে আর একটি। এটি হয়তো উকিলের মাথা। কোথায় গেল মামলা মকেল, ক ধারা, খ ধারা? একটা নোংরা লোক তার নোংরা কোদাল দিয়ে এখন ঠুকছে। হয়তো জমির নেশাতেও ধরেছিল। তা হ'লে দলিল-দস্তাবেজ, পাট্টা কবুলতি, ইত্যাদির আর খবর রাখেন না। এক রসিদে ডবল আদায়ও আর হয় না। অমন মাথাটি খাসা ধুলোয় ভর্তি। হস্তান্তর পত্র কয়টি রাখবারও স্থান হবে না। এঁর উত্তরাধিকারীর দশাও কি এই রকম হবে নাকি?

হোরে। তা ছাড়া আর কি হবে কুমার?

হ্যাম। আচ্ছা, দলিলের কাগজ ভেড়ার চামড়ায় তৈরি নয়?

হোরে। হ্যাঁ কুমার, বাছুরের চামড়া দিয়েও হয়।

হ্যাম। ভেড়া কি বাছুরের উপর যাদের এতটা ভরসা, তারাও ঐ ভেড়া-বাছুরেরই সামিল। লোকটার সঙ্গে একটু কথা কই। ওহে, এটা কার কবর?

১ম বি। এজ্ঞে, আমার।

(গান) মাটি কেটে খাদ বানা তুই
হোক কুটুমের আদর,—রে!

হ্যাম। তুমি খুঁড়ছ ব'লে কবরটা তোমার হ'ল? মড়ার কবর হয়, জীয়ন্তের কি কবর হয়? কার জন্য কবরটা খুঁড়ছ? পুরুষ না স্ত্রীলোক?

১ম বি। পুরুষও নয় স্ত্রীলোকও নয় কত্তা। আগে ছিল বটে স্ত্রীলোক, এখন গিয়েছে মরে।

হ্যাম। আচ্ছা, কতদিন তুমি এ কাজ করছ?

১ম বি। যদি সঠিক খবর চান ত বলি—যেদিন বুড়ো রাজা হ্যামলেট বুড়ো ফর্টিনব্রাসকে হারিয়ে দিল, সেই দিন থেকে।

হ্যাম। সে কত দিন হ'ল?

১ম বি। তাও জানেন না কত্তা? এ কথা ত মুখ্যু লোকেও জানে। সেই দিন যে রাজপুত্তুর হ্যামলেটের জন্ম হোল গো। যে এখন উর্‌মাদ হোয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছে।

হ্যাম। বটে। তা সে ইংলণ্ডে গেল কেন?

১ম বি। কেন? উন্মাদ হোয়েছে ব'লে। সেখানে তার পাগলামি সেরে যাবে। আর যদি নাই সারে, ক্ষতি ত নেই।

হ্যাম। কেন?

১ম বি। সেখানে তার পাগলামি ত ধরা পড়বে না; সে দেশে যে সবাই পাগল।

হ্যাম। ওঃ! আচ্ছা, সে পাগল হ'ল কেন?

১ম বি। সে এক আশ্চয্যি বেয়াপার! মাথা খারাপ হোয়ে পাগল হোয়ে গেল।

হ্যাম। কোথা থেকে এমন মাথা খারাপ হ'ল?

১ম বি। এই ডেনমার্ক থেকে গো। আমি যে এখানে দেড় কুড়ি বছর কবর খুঁড়ছি।

হ্যাম। আচ্ছা, মাটির তলায় কতদিন থাকলে মানুষ পচে যায়?

১ম বি। যদি মরার আগেই পচে যায়, তবে আলাদা কথা। এমনটা হয় কিনা, ওই মায়ের দয়া হোলে; তখন তাকে মাটিতে শোয়ানই যায় না। নইলে আট কি ন বছর টেঁকে। চামাররা ন বছর টিঁকবে।

হ্যাম। চামার বেশি টিঁকবে কেন?

১ম বি। বোঝেন না কত্তা, সে যে হলো চামারের চামড়া, জল পেরবেশ করতে দেরি লাগে। ওই জলেই মড়া পচে। এই দেখেন, আর একটা মাথা। এটা মাটির মধ্যে রয়েছে এক কুড়ি তিন বছর।

হ্যাম। এটা কার মাথা ছিল?

১ম বি। সে ছিল এক বেজাতক খ্যাপা। আচ্ছা বলেন দেখি সে কে?

হ্যাম। আমি তো জানি নে।

১ম বি। শালার মুখে মারি ঝাঁটা। শালা একবার আমার মাথায় এক কলসী মদ ঢেলে দিইছিল। ঐ যে গো, বুড়ো রাজার ভাঁড় ঈয়রিক; এটা হ'ল তারই মাথা।

হ্যাম। তাই নাকি?

১ম বি। তা নইলে বলছি কি?

হ্যাম। দেখি। (মাথাটা হাতে লইয়া) বেচারা ঈয়রিক!

হোরেসিয়ো, আমি একে জানতাম। সে ছিল রসের সাগর। হাজার বার আমি তার কোলে পিঠে চড়েছি, আর এখন এটাকে দেখে শিউরে উঠছি, বমি আসছে। এইখানে ছিল তুটি ঠোঁট, কত চুমু খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। কি গো, কোথায় গেল তোমার হাসি বিদ্রূপ, লম্ফ-ঝম্প, ফুর্তির গান? সভাশুদ্ধ সবাই যে হেসে খুন হতো। এই বিকট দন্ত বিকাশের মধ্যে সে হাসির কোন চিহ্নই তো আজ পাইনে। সুন্দরীর সজ্জাকক্ষে ঢুকে একবার ব'লে আসতে পার—দেবি, যত পুরু ক'রেই রং লেপন কর, পরিণাম হলো এই। দেখ না, তাতে তার হাসি আসে কি না। আচ্ছা হোরেসিয়ো, একটা কথা বলতে পার?

হোরে। বলুন কুমার।

হাম। তোমার কি মনে হয় মাটির তলায় আলেকজান্দারের পরিণামটাও এই ধরনের হয়েছিল?

হোরে। তাই তো হবার কথা।

হাম। আর এই রকম গন্ধ? ছিঃ! (মাথাটা ফেলিয়া দিলেন)।

হোরে। তাই সম্ভব কুমার।

হাম। হোরেসিয়ো, আমাদের কত হীন পরিণতিই না হতে পারে? আলেকজান্দারের মহান দেহাবশেষ দিয়ে মদের পিপের ফুটো বন্ধ করা হচ্ছে—কল্পনায় এটা অনুমান করা যায় না?

হোরে। সেটা একটু কষ্টকল্পনা হয় না কি?

হাম। মোটেই না। বেশ সহজ পথেই এর অনুসরণ চলে। আলেকজান্দার দেহত্যাগ করলেন; আলেকজান্দার কবরস্থ হলেন; ধূলোর আলেকজান্দার ধূলোয় মিশিয়ে গেলেন; ধূলোই মাটি, মাটি থেকেই কাদা, আর ঠিক সেই কাদা দিয়ে মদের পিপের ফুটো বন্ধ হয় নি কে বললে?

পরাক্রান্ত সিজারের মৃতদেহ মিশাল মাটিতে,
সেই মাটি লেপা হলো কোন কুটিরের ফাটা ভিতে।
সারা বিশ্ব একদিন ছিল ত্রস্ত যে মাটির দাপে,
দেওয়ালের রন্ধ্রে আজ সেই মাটি শীত বায়ু চাপে।

ওহে, আড়ালে যাই চল; রাজা আসবেন যে।

[পাদরী সহ শবযাত্রা ; ওফেলিয়ার শবদেহ, লেয়ার্টিস এবং শবযাত্রীদল, রাজা রাণী ও তাঁহাদের অনুচরগণ]

রাণী। সভাসদগণ। কার শবদেহ ?
শবযাত্রা বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠানহীন।
মনে হয়, কেন যেন মরিয়া হইয়া
নিজ হস্তে নিজ প্রাণ করিল গ্রহণ।
সম্ভ্রান্তও বটে। কিছুক্ষণ রহি অন্তরালে
লক্ষ্য রাখি, চল। [হোরেসিয়োর সহিত অন্তরালে গমন]

লেয়া। আর কোন অনুষ্ঠান নাই ?
হ্যাম। এ ত লেয়ার্টিস, অতিশয় মহৎ যুবক।
যাই হোক দেখে যাও।
লেয়া। আর কোন অনুষ্ঠান নাই ?
১ম পাদরী। শাস্ত্রে যতটুকু লেখে
তারও বেশি করেছি আমরা।
সন্দেহজনক মৃত্যু ;
রাজ-আজ্ঞা শাস্ত্রবিধি করিল দমিত,
নচেৎ অনন্তকাল সমাহিত রহিত এ দেহ
সর্বপ্রায়শ্চিত্তহীন।
শান্তি স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র নাহি উচ্চারিয়া
নিক্ষেপিতে হ'ত শুধু লোষ্ট্র ও প্রস্তর।
তা না ক'রে দিয়েছি বিধান—
কুমারীর প্রাপ্য যত শুভ অনুষ্ঠান,
কুসুমে চন্দনে শঙ্খে,
সকলি সে পাবে এই অন্ত্যেষ্টিসময়ে।
লেয়া। তা হ'লে কিছুই আর করিবার নাই ?
১ম পা। কিছুই আর করিবার নাই।
যে আত্মা শান্তির পথে মহা যাত্রা করে

স্বতন্ত্র তাহার মন্ত্র ;
এর আত্মা সে মন্ত্রের নহে অধিকারী,
অপরাধ হবে যদি করি উচ্চারণ।

লেয়া। তবে তারে শোয়াও মাটিতে।
সুন্দর কলঙ্কহীন এই তনু হতে
দলে দলে ভুঁইচাঁপা যেন উঠে ফুটি।
ক্ষুদ্রমনা পুরোহিত, জেনে রাখ তুমি
ভগ্নী মোর দেবীরূপে যাবে স্বর্গবাসে,
তুমিই নরককুণ্ডে করিবে চীৎকার।

হ্যাম। তবে ও সুন্দরী ওফেলিয়া!

রাণী। ফুলের উপরে দিই ফুল,
বিদায়! বিদায়! (ফুল ছড়াইলেন)
ভেবেছিনু হ্যামলেটের বধূ হবে তুমি,
তোমাদের ফুলশয্যা সাজাব যতনে ;
তা না হয়ে, ওরে মোর মায়ার পুতলি,
সাজাতেছি সমাধি তোমার!

লেয়া। ওরে ও ত্রিবিধ তাপ! শতগুণ হয়ে
তাপিত কর গো সেই অভিশপ্ত শির
যার পাপকর্ম ফলে হারাল বালিকা
বিধাতার শ্রেষ্ঠদান—হিতাহিত জ্ঞান।
এখনও ফেলো না মাটি,
আর একবার তারে বুকে লব আমি।
(কবরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন)
এইবার চাপা দাও মৃতে ও জীবিতে এক সাথে
এই সমভূমি,
পর্বতপ্রমাণ হয়ে যাক না ছাড়ায়ে
নভোস্পর্শী হিমাচল, উত্তুঙ্গ সুমেরু!

হ্যাম। (অগ্রসর হইয়া)
এত বাড়াবাড়ি শোক, মানুষটা কে?

কার দুঃখনিবেদন নক্ষত্রমণ্ডলী
স্তব্ধ হয়ে শুনিতেছে বিস্ময়বিহ্বল ?
আমিও এসেছি, হ্যামলেট ডেনমার্কবাসী।
(কবরের ভিতর লাফাইয়া পড়িলেন)

লেয়া। জাহান্নমে যাও! (তাঁহাকে জাপটাইয়া ধরিলেন)

হ্যাম। শবপার্শ্বে এ কি আচরণ ?
কথা শোন, গলা ছেড়ে দাও ;
সহজে হয় না মোর ক্রোধের উদ্রেক,
নহি আমি হঠবুদ্ধি ; কিন্তু জেনো
মোর মাঝে এমন ভীষণ কিছু আছে
যারে ভয় ক'রে চলা ভাল।
হাত খুলে নাও।

রাজা। দাও দাও ছাড়াইয়া দাও।

রাণী। হ্যামলেট, হ্যামলেট!

সকলে। ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন।

হোরে। কুমার কুমার, শান্ত হোন্।

(সকলে মিলিয়া তাহাদের ছাড়াইয়া দিল, উভয়ে সমাধি হইতে উপরে আসিলেন)

হ্যাম। জেনে রাখ, এ ব্যাপার লয়ে
যুঝিব উহার সাথে
যতক্ষণ চক্ষে মোর রহিবে পলক।

রাণী। কী ব্যাপার লয়ে পুত্র ?

হ্যাম। ওফেলিয়া ; তারে আমি বাসিতাম ভাল।
লাখো ভাই দেয় যদি নিজ নিজ প্রেম
আমার প্রেমের মূল্য হয় না তাহাতে!
তার লাগি কি করিতে চাস ?

রাজা। উন্মাদ ও লেয়ার্টিস্!

রাণী। দোহাই তোমার, উত্তেজিত ক'রো না উহারে।

হ্যাম। বল্ কি করিবি ?
কাঁদিবি ? যুঝিবি ? রবি পূর্ণ অনশনে ?
খণ্ড খণ্ড করিবি নিজেরে ?
গণ্ডুষে কি শুষিবি বারুণী ?
নক্র ধরি করিবি ভক্ষণ ?
আমি সবই পারি।
এসেছিস নাকী কান্না কাঁদিতে এখানে !
কবরে লাফায়ে পড়ি জিনিবি আমায় ?
জীবিতে প্রোথিত হবি এই শব সাথে ?
আমিও তা হব।
যদি তোর সুমেরুর করিস বড়াই,
আমাদের দেহ ঢাকি দিক না চাপায়ে
লক্ষ কোটি যোজন মৃত্তিকা,
শীর্ষ তার ঠেকি সূর্যে
বিন্ধ্যাচলে ক'রে দিক ক্ষুদ্র তিল সম।
যদ্যপি কহিতে চাস বড় বড় কথা,
জানি আমি তোরই মতো প্রলাপ বকিতে।
রাণী। এ সকলই উন্মাদের কথা।
কিছুক্ষণ চলিবে এভাবে ;
তার পর শান্তনীড়ে পক্ষীমাতা সম
যাপিবে দিবস মৌন অনুশোচনায়।
হ্যাম। লেয়ার্টিস্, মোর প্রতি
কি হেতু করিলে আজ হেন ব্যবহার !
চির প্রিয় তুমি মোর।
যাক্, কথায় কি ফল ?
স্বয়ং ভার্গব এসে যত চেষ্টা করুক না হায়,
বিড়ালে বিড়াল ডাকে, পথের কুকুরও দিন পায়।

[প্রস্থান]

রাজা। হোরেসিয়ো, দেখ ওরে সাথে সাথে রহি।

[হোরেসিয়োর প্রস্থান]

(লেয়ার্টিসের প্রতি)

গত রজনীর কথা স্মরি ধৈর্য ধর;
কার্যে পরিণত তারে করিব সত্বর।
প্রিয়ে গার্ট্রুড্, লক্ষ্য রাখ পুত্রের উপর।
ত্যাগপূত হ'ল এই সমাধির স্মৃতি।
অচিরেই শান্তি মোরা পাইব নিশ্চয়,
ততক্ষণ কার্যপথে ধৈর্য যেন রয়। [প্রস্থান]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুঃ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ডানা

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' পড়তে পড়তে ডানা নূতন জগতে নীত হ'ল। সন্ন্যাসী তাকে যে জগতের আভাস দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দও তাকে সেই জগতেই নিয়ে গেলেন। সে জগতে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, কিন্তু উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। সকলেই সেখানে স্ব-স্ব মর্যাদায় সমান মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সে জগতে রাজায় এবং মেথরে, সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থে সম্মানের কোন তারতম্য নেই। সকলেই সেখানে ভগবানের কাজ করছেন, নিজের নয়। তাই কর্মই সে জগতের একমাত্র অবলম্বন, কর্মফল নয়, আকাঙ্ক্ষা নয়, অহঙ্কারও নয়। সে জগতে সামান্য পক্ষী-পরিবারও তাই অতিথি সেবার জন্য আত্মবিসর্জন করতে ইতস্তত করে না, সন্ন্যাসী হেলায় প্রত্যাখ্যান করতে পারে রাজ্যেশ্বরী রূপসী রাজকন্যাকে। সে জগতে কর্তব্যই সব চেয়ে বড়, আত্মসুখ নয়, পরার্থপরতাই সেখানকার মন্ত্র, স্বার্থপরতা নয়। এই নূতন জগতে নীত হয়ে ডানা খানিকক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মনে হ'ল, সে কি আদর্শ গৃহস্থজীবন যাপন করতে

পারবে? এমন পুরুষ কি এদেশে আছে, পরের মঙ্গলের জন্য যে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেবে? সে-রকম পুরুষ না পেলে তো আদর্শ গৃহস্থালী স্থাপনই করা যাবে না। সে নিজেও কি পারবে? বইটা বন্ধ ক'রে উঠে পড়ল সে। কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত করলে নিজেকে। শেলফ গোছাতে গোছাতেও কিন্তু ওই একই কথা ভাবতে লাগল—আদর্শ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করবার উপায় আছে কি এ যুগে? সকলেই যে যুগে স্বার্থপর, যে যুগে পরার্থপরতার অর্থ বোকামি বা পাগলামি, সে যুগে এ সব কথা ভাবাও কি সঙ্গত? কোথায় আছে সে রকম পুরুষ, যে সংসার পাতবে নিজের জন্য নয়, পরের জন্য? যদি সে রকম পুরুষ দুর্লভ হয়—হবেই—তা হ'লেই বা তার কর্তব্য কি? সন্ন্যাসীর কাছে এ প্রসঙ্গ তুললে তিনি এর কি উত্তর দেবেন, শোনবার জন্য তার মন আগে থাকতেই উৎসুক হয়ে উঠল। একটু পুলকিতও হ'ল সে। কল্পনায় সে সন্ন্যাসীর বিব্রত ভাবটা উপভোগ করতে লাগল। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তার। 'কর্মযোগ' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে সন্ন্যাসীর কথা বর্ণনা করেছেন, যিনি সুন্দরী রাজকন্যাকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান ক'রে বনের মধ্যে পালিয়ে গেলেন, এ সন্ন্যাসীরও কি তেমনি মনের জোর আছে? বেগতিক দেখলে ইনিও কি অমনি অন্তর্ধান করবেন? করতে পারবেন? হঠাৎ তার কল্পনা বিঘ্নিত হ'ল। চিড়িয়াখানার চাকর মুন্সী এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল।

মাইজি, পাখীদের দানা ফুরিয়েছে। গোটা দশেক টাকা দিন, কিনে আনি। হরেওয়াদের জন্যে কিছু ঝাড়-জঙ্গলও আনাতে হবে। মিহিপুরার একটা বাগানে আছে খবর পেয়েছি। আমাকে যদি একবেলা ছুটি দেন, আমিই গিয়ে কেটে আনতে পারি, তা না হ'লে একটা মজুর পাঠাতে হবে—তার আবার মজুরী লাগবে।

ডানা সহসা যেন আর এক জগতে এসে হাজির হ'ল। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে নীরবে চেয়ে রইল সে মুন্সীর দিকে। তারপর তার মনে পড়ল, হরবোলা পাখীরা লোরেনথাস্ (Loranthus) ফুল খেতে ভালবাসে। এগুলো একরকম পরগাছার ফুল, সাধারণত আমগাছের

উঁচু ডালে হয়। অমরবাবু একবার তাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন মনে পড়ল। পরপর তার মনে হ'ল, মুন্সী যে প্রস্তাবটি এনেছে তার অন্তরালে মুন্সীর চতুর একটা মতলবও যেন লুকিয়ে আছে। যে টাকাটা সে দানা কেনবার জন্যে চাইছে তার সবটা হয়তো সে দানা কেনবার জন্যে খরচ করবে না। কিছু বাঁচাবে নিশ্চয়ই। আর যে মিহিপুরার বাগানে সে লোরেনথাস্ ফুল আনতে যাচ্ছে সেই মিহিপুরা গ্রামেই তার শ্বশুর বাড়ি, তার যুবতী বধূ সেখানে আছে। ডানা ইচ্ছে করলে একজন গোমস্তাকে দিয়ে পাখীর দানা আনিয়ে নিতে পারে, একবার হুকুম করলেই মিটে যাবে ব্যাপারটা। এ বাড়ির কোনও চাকরকে ফরমাশ করলে লোরেনথাস্ ফুলও অনায়াসে এসে যাবে। অমরেশবাবুর আস্তাবলে ঘোড়া নেই কিন্তু সহিস আছে, তাকে রত্নপ্রভা বরখাস্ত করেন নি, পেন্সন দিয়েছেন। সে ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে উৎসুকও, তাকে বললেই সে সানন্দে লোরেনথাস ফুলগুলি এনে দেবে। ডানা আর একবার মুন্সীর মুখের দিকে চাইল, দেখল তার চোখ দুটো মিটমিট করছে। মায়া হ'ল। মনে হ'ল বেচারার আশা ভঙ্গ ক'রে তার কোন লাভ হবে না, হয়তো তার অনুচ্চারিত অভিশাপ তার অনিশ্চিত জীবনকে আরও অনিশ্চিত ক'রে তুলবে। অদেখা বধূটির প্রত্যাশাভরা পথ চাওয়াটাও সে যেন দেখতে পেল কল্পনায়। তার নিজের মনের ভিতরই কে একজন যেন বধূটির হয়ে সুপারিশ করতে লাগল। ডানা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে দশটাকার নোট বার করলে একটি।

পাখীর দানা কিনে আন। ভাল জিনিস কিনো, আর ওজন ঠিক ঠিক দেখে নিও। দানা কিনে নিয়ে চল তুমি চিড়িয়াখানায়। সেখানে পাখীদের খাইয়ে তারপর মিহিপুরা যেও। আমিও যাচ্ছি এখুনি।

মুন্সী সানন্দে চ'লে গেল।

চিড়িয়াখানায় অনেকরকম পাখী ছিল। একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরকে প্রথমে দেওয়াল দিয়ে এবং পরে তার দিয়ে ঘিরে অমরেশবাবু নিজের যে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন—এখনও যদিও তা সম্পূর্ণ হতে অনেক

দেরি কিন্তু যতটুকু হয়েছে ততটুকুই ডানাকে হিমসিম খাওয়াবার পক্ষে যথেষ্ট। বেশির ভাগ পাখী পাখীওলারাই দিয়েছে। মুনিয়া, তিতির, বটের, দামা, দোয়েল, হরবোলা, বুলবুলি, চাতক, শামা, বেনেবউ, নীলকণ্ঠ, বুনোচড়াই, গাংশালিক, পাহাড়ি ময়না, রেডস্টার্ট (কবি যার নামকরণ করেছেন ফুলকি), ভিংরাজ, টিয়া, চন্দনা, কিঙে প্রভৃতি পাখীকে বড় বড় খাঁচায় রাখা হয়েছে, একটা পুকুরে কিছু পানকৌড়ি এবং এক জোড়া ডাহুককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, হুতোমপ্যাঁচাও রাখা হয়েছে খাঁচার ভিতরে, কতকগুলো ভরদ্বাজ পাখাও ছাড়া আছে ঘাসের জঙ্গলে, দর্জিপাখী, টুনটুনি, সাধারণ চড়াই, ছাতারে, এসব তো আছেই। কিছুদিন আগে রেডস্টার্টগুলোকে ডানা ছেড়ে দিয়েছিল। একটা পেঁচা মারা গেছে, আর একটাও মরমর। এইটের জন্যেই ডানা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে, ভাবছে এটাকেও ছেড়ে দেবে কি না।

মুন্সী দানা নিয়ে আসতেই ডানা জিগ্যেস করলে, পেঁচাটা কিছু খেয়েছে ?

একটা গোঁটা মাছ খেয়েছে হুজুর।

ভালই আছে তা হ'লে ?

চোখ খোলেনি কিন্তু হুজুর। পিছু ফিরে ব'সে মাছটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলে, তারপর থেকে চোখ বুজে ব'সে আছে।

ডানা প্যাঁচাটার খাঁচার সামনে এগিয়ে গেল। সত্যিই রোগা হয়ে গেছে বেচারা।

কত বড় মাছ দিয়েছিলি—

বেশ বড় পুঁটি একটা। তা আধপোয়াটাক হবে।

ডানা কেটুপা প্যাঁচার প্রধান বৈশিষ্ট্যটা আবার ভাল ক'রে লক্ষ্য করছিল, পায়ে মোটে পালক নেই। হঠাৎ প্যাঁচাটা চোখ খুলে একবার চাইলে, বড় বড় গোল গোল চোখ দুটোর দৃষ্টি ডানার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল ক্ষণকাল, তারপর পিঠ ঘুরিয়ে বসল। ভাবটা যেন, তোমাদের মতো পাষণ্ডদের মুখদর্শন করাও পাপ। ডানা মুচকি হেসে এগিয়ে গেল মুন্সীর দিকে। মুন্সী শামা পাখীটার খাঁচায় কিছু মাংসের কিমা, আর

কিছু মরা ফড়িং দিচ্ছিল। ডানা কাছে আসতেই সে বললে, এগুলো আরশোলা খুব ভালবাসে। পুরোনো গুদাম ঘরটায় অনেক আছে কিন্তু নায়েব মশাই সেখানে ঢুকতেই দেন না আমাকে। আপনি যদি একটু ব'লে দেন—

আচ্ছা বলব। গুদোম ঘরে অনেক জিনিসপত্তর আছে কি না, তাই সে ঘরের চাবি-কাউকে দিতে চান না তিনি। আমি কাল চাবি চেয়ে রাখব, তুমি আমার সামনে কিছু আরশোলা ধ'রে এনো—

প্রস্তাবটা মুন্সীর খুব মনঃপুত হ'ল না। সে গম্ভীর মুখে নীলকণ্ঠ, ভীংরাজ, দোয়েল প্রভৃতি মাংসাশী পাখীদের কিমা আর ফড়িং দিতে লাগল। হঠাৎ শামা পাখীটা খুব জোরে শিস দিয়ে উঠল আর লাফালাফি করতে লাগল খাঁচার ভিতরে।

ওর পেট ভরে নি বোধ হয়। ওকে আর একটু কিমা দাও মুন্সী।

মুন্সী আদেশ পালন করলে, কিন্তু মন্তব্য করলে, ওর পেট কি ভরাতে পারবেন আপনি মা, রাক্ষস একটা। দশটা ফড়িং ওকে দিয়েছি।

নীলকণ্ঠটাও চিৎকার সুরু করল। ভীংরাজ দোয়েলেরও আর্তকণ্ঠ শোনা গেল। ডানার মনে হ'ল, কোন বড়লোকের বাড়িতে যেন কাঙালী বিদায় হচ্ছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বটের পাখীটা ব'লে উঠল—ঠিক, ঠিক তো!

আমি চললুম। তুই এদের খাইয়ে মিহিপুরায় চ'লে যাস। আজই ফিরবি তো?

নিশ্চয়। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব।

ডানা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। বন্দী পাখীগুলোর দুর্দশা অতিষ্ঠ ক'রে তুলল তাকে।

সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ডানা একটা অপ্রত্যাশিত জিনিস দেখলে। সন্ন্যাসী পান খাচ্ছেন! কাছেই খান দুই শালপাতা দেখে সন্দেহ হ'ল, হয়তো বাজার থেকে খাবার কিনেও খেয়েছেন। ডানাকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন একটু, কোন কথা বললেন না। কিন্তু ওই মৃদু হাসির মধ্যেই এমন একটি সূক্ষ্ম অভ্যর্থনা ছিল যা ডানার মর্ম স্পর্শ করল।

রোজই ভাবি আপনার কাছে আসব কিন্তু সাহস পাই না। আজ জোর ক'রে চ'লে এলাম, যদি এটাকে অন্যায় মনে করেন বকুন আমাকে, আমি তৈরি হয়েই এসেছি।

বকতে যাব কেন শুধু শুধু। তুমি এলে তো ভালই লাগে।

আপনি যে পথের পথিক সে পথে তো আমরা বাধা, নিজেই তো বলেছেন একথা।

কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু পথের বাধাকে অতিক্রম করবার শৌর্য যে আমার আছে তা যাচাই করব কি ক'রে যদি বাধা না থাকে? তাই বাধাটা অনাবশ্যক নয়, ওরও প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া যা অনিবার্য তাকে কি নিবারণ করা যায়। বাধা হিসাবে তুমি দুস্তরও নও, ভয়ঙ্করও নও।

কথাগুলি ব'লে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনি ডানার দিকে।

পান পেলেন কোথা? উঞ্ছবৃত্তিধারীরা পানও কুড়িয়ে পায় না কি!

না। কিনেছি। শুধু পান নয়, কচুরি এবং রসগোল্লাও।

পয়সা পেলেন কোথা?

আমি তো নিঃস্ব নই। পোস্টাফিসে আমার টাকা আছে কিছু।

এখানকার পোস্টাফিসে?

হ্যাঁ—

ডানা যুগপৎ বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে উকিলের মেয়ে, তার বাবা নামজাদা উকিল ছিলেন বর্মায়, জেরা করবার সহজ শক্তি তার অন্তরের মধ্যেই ছিল সম্ভবত। সে জেরা করতে লাগল।

এখানে এসে পোস্টাফিসে টাকা জমা করেছিলেন?

না। টাকা অনেক আগে থাকতেই ছিল।

আগে তা হলে আপনি আর একবার এসেছিলেন এখানে?

সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন হাসিমুখে। তারপর আর একটু হেসে বললেন, আমার সম্বন্ধে এ কৌতূহল কেন তোমার?

বাঃ, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আপনার পরিচয় জানতে চাইব না।

আমার পরিচয় তো জেনেছ, আমি সন্ন্যাসী। সংসারী লোকের কাছে এর বেশি পরিচয় দেওয়া নিরর্থক।

আমি কিন্তু ঠিক সংসারী লোক নই। আপনাকে তো সব কথা বলেছিলুম একদিন। আমার নিজের লোক বলতে কেউ নেই। ঘটনাচক্রে আমিও সংসার থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছি। তাই বোধ হয় আপনার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা অনুভব করি। আপনি আমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোক, নারীর সান্নিধ্য আপনি পছন্দ করেন না। এসব জেনেও তবু তাই আপনার কাছে আসি। আপনার পরিচয়ও জানতে তাই আগ্রহ হয়।

সন্ন্যাসী হঠাৎ উঠে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। একটা মাটির সরা আর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে ক'রে বেরিয়ে এলেন আবার। ডানার সামনে সেগুলো নামিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও তাহ'লে—

কি?

আমার পরিচয়। এককালে খুব খাইয়ে ছিলাম। কদিন থেকে রসগোল্লা, গরম কচুরি আর মিঠে পান খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিছুতেই একাগ্র হতে পারি না, ভগবৎ চিন্তার ফাঁকে ফাঁকেও লোভটা এসে উঁকি মারে দুষ্টু ছেলের মত। আজ সর্বকর্ম পরিত্যাগ ক'রে তাই ওটাকে শান্ত করলুম আগে। কিছুদিন বিরক্ত করবে না আর।

অকৃত্রিম সরল হাস্যে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সন্ন্যাসীর। ডানাকে বললেন, নাও, তুমিও খাও।

এখন তো আমি গিয়ে ভাত খাব। এখন খেলে দুপুরের খাওয়াটা নষ্ট হবে।

সঙ্গে নিয়ে যাও তা হ'লে।

আপনিই রেখে দিন না, বিকেলে খাবেন।

আমি আর খাব না। লোভকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়াও ভাল নয়। ওগুলো নিয়ে যাও তুমি।

আমি না এলে কি করতেন?

কাককে কুকুরকে খাইয়ে দিতাম। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমার নেই।

পোস্টাফিসে টাকা তো সঞ্চয় করেছেন।

আমি করি নি। আমার পূর্বপুরুষরা করেছেন।

কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না সন্ন্যাসীর, কথার পিঠে বেরিয়ে পড়ল। জেরার মুখে আরও অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল।

আপনার পূর্বপুরুষরা? তাঁরা এখানকার পোস্টাফিসে টাকা জমালেন কি ক'রে!

তাঁরা এই অঞ্চলেই ছিলেন এককালে। আমারও ছেলেবেলাটা এখানেই কেটেছে!

এইবার ডানা আকাশ থেকে পড়ল।

অমরবাবু আনন্দবাবুর সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল আপনার?

এঁরা অনেক পরে এসেছেন। আমরা এখানে ত্রিশ বছরেরও আগে ছিলাম। আমি যখন এখান থেকে চ'লে যাই তখন আমার বয়স পাঁচ বছরেরও কম।

আর আসেন নি?

এসেছিলাম একবার পোস্টাফিসের খাতাটা ঠিক করিয়ে নেবার জন্যে। চার পাঁচ দিন ছিলাম মাত্র।

পোস্টাফিসের খাতা আপনার নামেই ছিল?

আমার নামেই ছিল। এখনও আছে।

এখানে আপনার পূর্বপরিচিত লোক আছেন নিশ্চয় তা হ'লে?

বেশি নেই। দু একজন আছেন। না থাকলে টাকা বার করা যেত না। কারণ এখন যিনি পোস্টমাস্টার তিনি আমাকে চেনেন না। তাঁদের একজনকে ডেকে আনলাম গিয়ে, তার পর টাকা পেলাম।

ডানার ভারী মজা লাগল, রসগোল্লা, লুচি আর মিঠে পান খাওয়ার জন্য ভদ্রলোক এত কাণ্ড করেছেন! লোকটির চরিত্রের আর একটা দিক দেখতে পাওয়ার পর লোকটাই যেন বদলে গেল তার চোখে। এতদিন সে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল, এই অপ্রত্যাশিত নূতন আলোতে একটা পথের রেখা সে যেন দেখতে পেল। যদিও অস্পষ্ট আভাস মাত্র, তবু আশাপ্রদ।

অনুযোগভরা কণ্ঠে ডানা বললে, এতক্ষণে বুঝতে পারছি, সত্যিই আপনি আমাকে পর মনে করেন। আমাকে একটু যদি খবর দিতেন তা হ'লে আপনাকে কচুরি আর রসগোল্লার জন্যে এত কাণ্ড করতে হত না, আমি অনায়াসে সব ব্যবস্থা ক'রে দিতাম।

তা দিতে জানি। কিন্তু তোমার যুক্তিটা ঠিক হ'ল না। পরের কাছেই অসঙ্কোচে ভিক্ষা চাওয়া যায়, কিন্তু নিজের লোকের কাছে সঙ্কোচ হয়। তা ছাড়া তোমার কথা মনেও হয় নি। জীবন্ত কারো কাছে ভিক্ষা না ক'রে মৃতের দ্বারস্থ হচ্ছি এর অভিনবত্বেই মশগুল হয়ে ছিলাম আমি।

মৃতের মানে?

পূর্বপুরুষদের।

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল ডানার মুখের দিকে সহাস্যদৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রেখে আবার বললেন, পূর্বপুরুষদের কাছে যে আমরা সর্বদাই ঋণী সে কথা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। স্মৃতিশাস্ত্র পুত্রোৎপাদন ক'রে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে বলেছেন। আমি স্মৃতিশাস্ত্রের এ বিধান মানি নি, কথাটা মনেও লাগে নি খুব। পিতৃঋণ অপরিশোধ্য এই আমার বিশ্বাস। পূর্বপুরুষদের দাক্ষিণ্যের দ্বারে হাত পেতে তাই ভারী আনন্দ পেয়েছি আজ।

ডানা মুচকি হেসে বললে, আমি আপনার মত পণ্ডিত নই। অত চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারব না। তবে রামায়ণে পড়েছিলাম যে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে কয়েকটি শহুরে মেয়ে সন্দেশের লোভ দেখিয়ে শহরে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। সন্দেশ দেখে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শেষকালে তিনি রাজা দশরথের জামাইও হয়ে গেলেন। আপনার কথা শুনে গল্পটা মনে প'ড়ে গেল।

সন্ন্যাসী হেসে জবাব দিলেন, অতটা বেকুবি আমি করব না। যাক, আমার কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, ওটা এখন বন্ধ থাক। কোনও দরকারে এদিকে এসেছিলে, না, এমনি বেড়াতে এসেছ।

দরকার আমার একটা আছে। আগেও দু একবার বলেছি

আপনাকে, কিন্তু আপনি ব্যাপারটাকে আমল দেন নি। অথচ আমার ধারণা, আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

সন্ন্যাসী একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখে একটা শঙ্কার ছায়াপাতও হ'ল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মনে করবার চেষ্টা করলেন, মেয়েটি কবে কোন প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর কাছে এসে বিফলমনোরথ হয়েছে। কিন্তু মনে পড়ল না। তখন বললেন, তোমার কথাটা বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার দ্বারা তোমার যদি কোনও উপকার হয়, নিশ্চয় করব যথাসাধ্য। ব্যাপারটা কি?

আপনাকে আগেই বলেছি, পৃথিবীতে এখন আমার আপন বলতে কেউ নেই। এখন যাঁর আশ্রয়ে আছি তিনি অতি সদাশয় লোক সন্দেহ নেই। আমার অনেক উপকার করেছেন, আরও হয়তো করবেন, কিন্তু যে কাজ তিনি আমাকে দিয়েছেন তা একেবারেই ভাল লাগছে না আমার। কতকগুলো নিরীহ পাখীকে তিনি বন্দী ক'রে রেখেছেন আর আমার ওপর ভার দিয়েছেন তাদের তদারক করবার। ওদের আর্ত-চিৎকার রোজ রোজ আর শুনতে পারি না। মাঝে মাঝে মরেও যাচ্ছে। ছেড়ে দিয়েছি কয়েকটাকে। ইচ্ছে করে, সবগুলোকেই ছেড়ে দিই, কিন্তু ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই যখন আমার চাকরি তখন সব ছেড়ে দিলে হয়তো আমার চাকরিই থাকবে না। নিজের স্বার্থের জন্য অতগুলো প্রাণীকে কষ্ট দিচ্ছি একথা ভাবতেও খুব খারাপ লাগে। তার ওপর আছেন ওই রূপচাঁদবাবু, লোকটার ধরণধারণ মোটেই ভদ্র নয়। মোটের ওপর আমি বড় অস্বস্তিতে আছি। মনে হচ্ছে এ পরিবেশ থেকে স'রে না গেলে স্বস্তি পাব না। অথচ স'রে যাবই বা কি ক'রে, হাতে টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই। এ অবস্থায় কি করি বলুন তো। আমাকে একটা পরামর্শ দিন।

সন্ন্যাসী বললেন, সাংসারিক ব্যাপারে আমি তোমার চেয়েও আনাড়ি। অনেকদিন হ'ল সংসার থেকে চ'লে এসেছি। তোমাকে সাংসারিক পরামর্শ দেবার যোগ্যতা তো আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, এ পরিবেশ তোমার যদি খারাপ লাগে এখান থেকে চ'লে

যাওয়াই উচিত। স্বাধীনতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সত্যের সন্ধানে যে শক্তি আমাদের একমাত্র সম্বল, স্বাধীনতা না থাকলে সে শক্তিও আমাদের থাকে না। সংসারে অনেকেই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না, আমি পারি নি, তাই আমাকে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছে। সকলের পথ অবশ্য এক নয়, কোন পথে গেলে তুমি সুখী হবে, তা তোমাকে ঠিক করতে হবে।

কিন্তু আমি ঠিক করতে পারছি কই।

তোমাকেই ঠিক করতে হবে। কোন খাবারের স্বাদ কি রকম, তা ভাল লাগছে, না, মন্দ লাগছে এ যেমন নিজেকেই ঠিক করতে হয়, আনন্দের পথও তেমনি নিজেকে বার করতে হয়, কেউ সংসারের ভিতরে থেকেই তা পায়ে, কাউকে সংসার ছাড়তে হয়। আমাকে হয়েছে, তুমি কি করবে সেটা তুমিই ঠিক কর। অনিশ্চয়তার মধ্যেই ধ্রুবকে পাওয়া যায়। অনিশ্চয়তার পটভূমিকাতেই তো চেনা যায় তাকে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এ পরিবেশ যদি ভাল না লাগে অন্য কোথাও চ'লে যাও।

আমার কিছু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম। মুশকিল হয়েছে আমি নিঃস্ব।

কষ্ট ক'রে থেকে কিছু টাকা জমাও তা হ'লে মাইনে থেকে। তারপর কোথাও একটা চাকরি জোগাড় ক'রে চ'লে যেও। এই লক্ষ্যটা ঠিক রেখে চলা ছাড়া আর অন্য কি-ই বা উপায় আছে তা তো মাথায় আসছে না আমার। অলক্ষ্য থেকে হয়তো অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্যরকম হয়ে যাবে কিছু একটা, তখন আবার তদনুসারে চলতে হবে। এই তো জীবন।

সন্ন্যাসী ডানার দিকে চেয়ে হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

ডানাও চুপ ক'রে রইল। মনে হতে লাগল, সে যা বলতে এসেছিল তা বলেছে, কিন্তু তবু যেন বাকি আছে কিছু। অনেক কিছু।

[ক্রমশ]

"বুনফুল"

একটি করুণ সূর্যাস্ত

মমতা খবরটা পেল সিনেমা-পাগল দেওরের কাছে।

বৌদি খেতে দাও চটপট,—ব'লেই দড়াম ক'রে পিঁড়ি পেতে ব'সে পড়ল নিখিল।

ওমা, চান নেই কিছু নেই, হাত পা ধুলোয় ভর্তি; কি ব্যাপার ঠাকুরপো, কি এমন রাজকাজে চলেছ শুনি? একেবারে যে ঘোড়ায় জিন চেপে এসেছ!

আঃ! এতও বকতে পারে মেয়েরা! স্যুটিং বুঝেছ, স্যুটিং করতে এসেছে পালেদের মাঠে, মস্ত তাঁবু ফেলেছে।

মমতা মাথার ওপর আঁচল তুলে দিয়ে রান্নাঘরে এসে ঢোকে।

স্যুটিং? স্যুটিং আবার কি?

বললাম বুঝবে না কিছু, তবু সব ব্যাপারে থাকতেই হবে, হুঁ। সিনেমা বুঝেছ, সিনেমার ছবি তোলাকে স্যুটিং বলে। মানসী দেবীর নাম শুনেছ? শোননি তো, জানতুম। এত বড় ডিরেক্টার প্রবাল সেনগুপ্ত, তার নামও নিশ্চয়ই এই প্রথম শুনছ!

প্রবাল সেনগুপ্ত!!···প্রবাল সেনগুপ্তের নাম এই প্রথমই শুনছে বটে মমতা! স্যুটদার নাম এই প্রথমই শুনছে ও!

বিস্ময়ে বোবা হয়ে যায় মমতা। স্যুটদা এসেছে এখানে, এত কাছে!

কি বউদি, একেবারে যে পাথর হয়ে গেলে! দাও খাবার শিগগির, নইলে আমি চললাম সারাদিনের মত!

দেওরের চিৎকারে চমক ভাঙে মমতার। তাড়াহুড়ো ক'রে ভাত বেড়ে দিতে থাকে ও।

ভাল ক'রে ভাববারও অবকাশ পেল না মমতা। দেওরকে দাঁড়াতে ব'লে কাগজ টেনে দু ছত্তর চিঠি লিখে ফেলল।

এইবার খুবই অবাক হ'ল নিখিল।

কি বললে বউদি, কাকে দোব এই চিঠি?

স্যুটদাকে।

কাকে?

ঐ যে ডিরেক্টার এসেছে, তাকে।

প্রবাল সেনগুপ্ত? বউদি। নিখিল চোখ কপালে তুলে রাখল ত্রিশ সেকেণ্ড, আর মুখ দিয়ে কথা বেরুতে লাগল আরও ত্রিশ সেকেণ্ড।

প্রবালবাবুকে তুমি চেন?

দেওরের অবাক হওয়ার বহর দেখে হেসে ফেলল মমতা। আর হেসেই মনে পড়ল, হাসলে তার গালে টোল পড়ে, আর এই টোল পড়া দেখতে বড্ড ভালবাসত মুটুদা। সেই মুটুদা এসেছে এখানে। এই গণ্ডগ্রাম নোয়াদিয়ায়!

খুব আলাপ আছে বউদি? নিখিলের প্রশ্নিল চোখের ওপর শ্রদ্ধার আবরণ।

অ্যাঁ, ও হ্যাঁ। আমরা এক বাড়িতে থাকতুম।

বউদি, তোমার পায়ে পড়ছি, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। উত্তেজনায় নিখিল হাত চেপে ধরে মমতার।

হবে, দোব। আমি নেমন্তন্ন করেছি। আসুক।

ওঃ, বউদি কি জয়! চেঁচিয়ে ধূমকেতুর মত ছিটকে বেরিয়ে গেল নিখিল।

পাগল ছেলে! হাসল মমতা। এমন সময় কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। খুকী উঠেছে।

ঘরে এসে খুকীকে কোলে তুলে নিল মমতা। বললে, কাঁদে না, কাঁদে না খুকী, জানিস আজ কে আসছে বাড়িতে? তোর মুটুমামা। কাঁদিস না, মুটুমামা তোর কান্না সইতে পারে না একেবারে।

সত্যি কান্না সইতে পারত না মুটুদা। চোখের জল দেখলেই কেমন হয়ে যেত। সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে মমতার।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে অনেক দিন। বাড়ি থেকে ঠিক হ'ল, মুটুদা এবার কলকাতায় যাবে কলেজে ভর্তি হতে। শুনেই সারা শরীর হিম হয়ে যায় মমতার।

অনেক কিছু বলবে ভেবেছিল মমতা, কিছুই বলতে পারল না

গুছিয়ে। এমন যে কথার তুবড়ী মেয়ে সেও কেমন হাবা হয়ে গেল। কি লজ্জা, কি লজ্জা! অনেক চেষ্টা ক'রে কটি কথা বলেছিল সে। মুটুদা স্যুটকেশ গোছাচ্ছিল।

পেছন থেকে এসে আস্তে ডেকেছিল মমতা, মুটুদা। চমকে উঠেছিল প্রবাল।

কি রে মমতা?

মমতা চুপ।

কিছু বলবি?—প্রবাল জিজ্ঞাসু।

গলাটা কেমন ধ'রে এল মমতার।

কলেজে না পড়লে কি হয় মুটুদা? ব'লেই মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল মমতা।

কি বললি? প্রবাল কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছিল ওকে। আর তক্ষুনি কি বলতে গিয়ে থেমে গেল সে।

জলভরা টলটল চোখ মমতার।

তুই কাঁদছিস?

মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত ক'রে দৌড়ে ঘরে চ'লে এসেছিল মমতা, অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়েছিল বিছানায়।

সেই কান্নার জের মেটে বাপ-ছেলের তুমুল ঝগড়ায়। প্রবাল জানাল সে কলকাতায় পড়বে না, ঢাকাতেই পড়বে। সব ঠিকঠাক, এমন সময় ছেলের এমন বেঁকে বসার কোন হেতু খুঁজে পেলেন না মন্মথবাবু।

একরোখা মানুষ ছিলেন মন্মথবাবু। তিনি ঘোষণা করলেন, ছেলে কলকাতায় পড়ে ভাল কথা, নইলে নিজের পথ নিজে দেখুক। অমন ছেলের মুখদর্শন করতে তিনি নারাজ।

কিন্তু আশ্চর্য! ভীরু, দুর্বল, সাত চড়ে রা করে না যে ছেলে, সে এতে এতটুকু বিচলিত হ'ল না। মাকে জানাল, আমি পড়াশুনো বন্ধ করলাম মা, আর বাবা যেদিন বাড়ি থেকে বের ক'রে দেবেন, সেদিন চ'লে যাব, কিন্তু কলকাতায় আমি যাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত নিরুপায় মা মমতার শরণ নিয়েছিলেন। মমতাই শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়ে প্রবালকে কলকাতায় পাঠাল।

এত কাণ্ড, কিন্তু প্রবাল মমতার কে? কি হয়? কিছু না। মমতারা শুধু প্রবালদের বাড়ির ভাড়াটে ছিল। শুধুই ভাড়াটে।

শুধুই ভাড়াটে!…

প্রবালের সব কিছুই ছিল মমতার নখদর্পণে। ও জানত প্রবাল কি খেতে সবচেয়ে ভালবাসে, আর কি দেখলেই ওর বমি আসে, কোন রঙ ওর পছন্দ, কোন ঢং সবচেয়ে অপছন্দ, তার প্রতিটি খুঁটিনাটি, প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় ছিল মমতার। ঘুরে ঘুরে আজ সব কথাই মনে পড়ছে, পোড়া চোখ ভ'রে আসছে জলে। কি বিড়ম্বনা, কি জ্বালা!

যাদু জানত মমতা। প্রবাল ওকে না ব'লে কোনদিন কিছু করতে পারত না। আর চোদ্দ বছরের মেয়ে মমতা আঠারো বছরের ছেলেটাকে কি শাসনটাই না করত!

মুটুদা, স্কুল থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

কই, কোথাও যাই নি তো!

মুটুদা আবার—

মা—মাঠে গিয়েছিলাম, খেলা দেখতে।

আহা, 'মাঠে গিয়েছিলাম খেলা দেখতে'। কে বলেছিল মাঠে যেতে? আমি শেষবার ব'লে দিচ্ছি মুটুদা, আর একদিন এমন দেরি হ'লে চা বন্ধ বিকেলের। কপট রাগে এক ঝটকায় বেরিয়ে যেত মমতা। আর ভিজে বেড়ালের মত রান্নাঘরের চৌকাঠে ব'সে রাগ ভাঙাতে চাইত প্রবাল,—এই মমতা, রাগ করলি?

উঃ, পারিনে বাপু তোমায় নিয়ে। প্রায় গিন্নীসুলভ গম্ভীর গলায় বলত মমতা, কতবার বলেছি চৌকাঠে বসবে না, ঋণ হয়। তারপর ঠাস ক'রে একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বলত, নাও ব'স।

মা কোথায় রে? এতক্ষণ কথা না খুঁজে পেয়েই হোক বা মার কথা মনে পড়াতেই হোক প্রশ্ন করে প্রবাল।

টানগঞ্জে গেছে সুধাদির বাড়ি।

ও। অনেক ভেবে চিন্তে অন্যপথ ধরে প্রবাল। প্রশংসার উষ্ণতায় মমতার গাম্ভীর্যের বরফ ভাঙতে চেষ্টা করে সে। ফস ক'রে ব'লে বসে, বেশ চুল বেঁধেছিস তো, চমৎকার দেখাচ্ছে তোকে। শাড়িটাতেও ভারি মানিয়েছে।

সব সময়ই আমাকে ভাল দেখায়। সব শাড়িতেই।

ইস, খুব যে অহংকার!

তোমার মত বাঁদরের চেহারা নয় তো যে অহংকার হবে না।

বাঁদর বললি আমাকে? ব'লেই খপ ক'রে চুল চেপে ধরে মুটুদা, বল্, আর বলবি?

বলব না, বলব না, উঃ, ছাড় লাগছে। উঃ—

ছেড়ে দিতেই ফের তড়পে উঠল মমতা, বলব, একশোবার বলব।

মমতার মুদ্রাদোষ ছিল এই 'একশোবার'। এইবার হেসে ফেলত প্রবাল, বলত, বেশ, ঠিক একশোবার বলা চাই, নিরানব্বুই বার হ'লে শুনব না কিন্তু। বল্—

হাসত মমতাও। সেই আশ্চর্য কমনীয় শুভ্র গালে লাল টোলের হাসি।

বড় ফাজিল হয়েছ মুটুদা। ব'লে তৈরি পেয়ালায় আরও কিছুক্ষণ চুড়ি বাজিয়ে চামচ নেড়ে কাপটা এগিয়ে দিত।

কপালের বিন্দু বিন্দু ঘামের ওপর উনুনের আভা মুক্তো জ্বালাত। প্রবালের চোখে মুগ্ধতা দেখে সলজ্জ ভঙ্গীতে আঁচল দিয়ে ঘাম মুছত মমতা।

সেদিন কপাল থেকে ঘাম মুছে গিয়েছিল, কিন্তু স্মৃতির স্বেদাশ্রু আজ আবার এসে জমা হয়েছে মমতার আরও আট বছর পেরিয়ে-আসা কপালে। লজ্জা পেল মমতা। আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে সিন্দুররঞ্জিত ক'রে ফেলল শাড়ির প্রান্তভাগ। কোলের মেয়েটা নাড়া খেয়ে ককিয়ে উঠল একটু।

সেই মুটুদা এসেছে এ গাঁয়ে, এত কাছে।...

মুটুদা হয়তো এক্ষুনি এসে হাজির হবে। যা পাগলা ঠাকুরপো,

ধ'রে-বেঁধে এক্ষুনি নিয়ে আসা বিচিত্র নয় কিছু। খুকীকে ফের ঘুম পাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল মমতা। তারপর কি ভেবে সূচ নিয়ে বসল কাঁথা সেলাই করতে। ফুটুদা তার এমন কোন বাইরের মানুষ নয় যে, তার জন্যে সেজেগুজে ধর্না দিয়ে ব'সে থাকতে হবে। হোক না সিনেমার মস্ত বড় ডিরেক্টার; ফুটুদা, ফুটুদাই।

মমতার বিয়ের ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর। মনে পড়লে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। পিসতুতো বোনের বিয়েতে বেড়াতে গিয়েছিল মমতারা। ঢাকা কলেজে পড়া আধুনিকা মেয়ে সুলতা। দোজবর বিয়েতে তার ভয়ঙ্কর আপত্তি, কিন্তু বাপ-মা তাতে কর্ণপাত করেন নি। বর হরিহরের বয়েস চল্লিশ আর প্রথম পক্ষে মাত্র একটি রুগ্ন ছেলে রয়েছে, সুতরাং সুলতার বাবা এতে অপছন্দের কিছু দেখেন নি। কিন্তু বিয়ের রাত্রে মেয়ে এক কাণ্ড ক'রে বসল। কোত্থেকে এক ডেলা আফিং গিলে প্রায় এখন যায়, তখন যায় অবস্থা। ডাক্তার ডাক, বস্তি ডাক, ওঝা ডাক, বিয়ে বাড়িতে সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড! সুলতা অবশ্য বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু বিয়ে বন্ধ রইল না। নতুন ব্যবস্থা হ'ল তৎক্ষণাৎ। বরপক্ষের উৎসাহ দেখা গেল অসীম। মমতার মার রাজী হতেও বিশেষ অনিচ্ছা দেখা গেল না।

মমতার বিয়ে হয়ে গেল সুলতার বদলে। কনে বদল হয়ে গেল। শুধু মমতাই জানল, শুভদৃষ্টিতে তার চোখে ও কিসের অগ্নি-জ্বালা ছিল, বাসর ঘরের ও-অশ্রুর অর্থ শুধু সে একাই বুঝল।

অনেক অনেক রাতের কথা ভুলে গেছে মমতা, আরও অনেক অনেক রাতের কথা ভুলে যাবে, কিন্তু সেই নীরব যন্ত্রণার নিষ্ঠুর রাতের কথা ভুলতে পারবে না কিছুতেই। কোনদিন না।...

খবর পেয়ে পাগলের মত কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিল ফুটুদা। কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত মমতাকে ডেকে বলেছিল, আমি জানি এতে তোর কোন হাত ছিল না, চল, আমরা পালাই।

দাঁতে দাঁত চাপে মমতা।

ঘোমটা টেনে দিয়ে ও শুধু বলেছিল, ছিঃ মুটুদা, বাজে কথা ব'ল না। ও-সব কথা বলা পাপ।

বাজে কথা? পাপ? সত্যি কথা বলা পাপ?

নিশ্চয়ই পাপ। আমি এখন পরস্ত্রী।

কি বললি?—যেন এত বড় সাংঘাতিক কথা জীবনে শোনে নি প্রবাল। স্ত্রী! জোর ক'রে একটি মেয়েকে—

জোর ক'রে নয়,—দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল মমতা।

মানে?—যেন ভূত দেখেছে প্রবাল। বললে, তুই ইচ্ছে ক'রে নিজে বিয়ে করেছিস!

হ্যাঁ। শীতল কণ্ঠে জবাব দিল মমতা।

ও।—শুনে কেমন গিঁড়ে গিয়েছিল প্রবাল। মাথা নীচু ক'রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল স্থাণুর মত, তারপর ভাঙা গলায় বলেছিল, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। আর বিরক্ত করব না, আর না।

ধীর পায়ে চলে গিয়েছিল প্রবাল। একবারও পেছন ফিরে তাকায় নি। সেই তার শেষ বিদায়।

সেই মুটুদা এসেছে এখানে, এত কাছে।…

বউদি,—ঊর্ধ্বশ্বাসে নিখিল এসে ঘরে ঢুকল। বললে, প্রবালবাবু বললেন, এখন সময় নেই, সময় পেলে আসবেন।

সময় নেই!…

চমকে ওঠে মমতা। অন্যমনস্কতায় সূচটা ফুটে গেছে আঙুলে। এক বিন্দু রক্ত জ'মে উঠল ক্ষত মুখে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না সে। অবাক হয়ে শুধু ভাবতে লাগল, মুটুদার সময় নেই! মমতার সঙ্গে দেখা করবার সময় নেই মুটুদার!….

সমস্ত শরীর কেমন জ্বালা ক'রে উঠল মমতার। এত বড় অবাধ্যতা! ঠিক আছে, সে নিজেই যাবে দেখা করতে, চোখের দিকে তাকিয়ে কি ক'রে তাকে অস্বীকার করতে সাহস পায় মুটুদা, সে দেখবে! তীব্র অভিমানে নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে ওঠে মমতার।

দাঁড়িয়ে উঠে খানিকক্ষণ কি ভাবল, তারপর হতভম্ব নিখিলের দিকে তাকিয়ে বললে, যাও তো ভাই ঠাকুরপো, দৌড়ে মালতীদির কাছ থেকে একটু হিং চেয়ে নিয়ে এস। ততক্ষণে আমি কাপড়টা পালটে নিচ্ছি। হঠাৎ জিজ্ঞাসু নিখিলের চোখের দিকে তাকিয়ে বক্তব্যটা পরিষ্কার করে মমতা,—আমি যাচ্ছি ঘুটুদাকে আনতে। কানে ধ'রে সঙ্গে নিয়ে আসব, তুমি ততক্ষণ একটু খুকীর কাছে থেকো, কেমন? পাস্থ নণ্টু ও স্কুল থেকে আসবে এক্ষুনি!

এক্ষুনি যাচ্ছি। প্রবালবাবুকে নিয়ে আসবে তো বউদি?—নিখিল দরজার দিকে পা বাড়াল।

হ্যাঁ ভাই আনব।

নিখিল চ'লে গেল।

ঘুটুদার অবাধ্যতা বার করছি আমি,—মনে মনে ভাবে মমতা। কানে ধ'রে এনে রান্নাঘরে সেই আগেকার মত পিঁড়ি পেতে বসিয়ে গরম গরম হিং-এর কচুরী খাওয়াতে খাওয়াতে ধমকে ধমকে না কাঁদিয়ে ছাড়ছি না আজ! খুব মাতব্বর হয়েছে, সময় নেই তাঁর!···

আলনা থেকে একটা ফরসা শাড়ি টেনে নেয় মমতা। তারপর ত্রস্ত-ব্যস্ততার সঙ্গে বেশ-পরিবর্তনে মন দেয়।

ঘুটুদা ডিরেক্টার হয়েছে, যেন মাথা কিনেছে,—গজরানি কমে না মমতার। পোশাক পালটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য প্রসাধনটুকু সেরে নেয় সে তাড়াতাড়ি।

হিজলপোড়ার মোড় ছাড়িয়েই পালেদের মাঠ। দূর থেকেই ভীড় চোখে পড়ল। তাঁবু দুটোও দেখল মমতা। ঘোমটা টেনে শান্ত পায়ে গুটি গুটি এগোয় সে। তাঁবুর কাছাকাছি এসে একবার এদিক ওদিক তাকাল। এখন রীতিমত অস্বাস্তই লাগছে।

দরজার কাছে ইতস্ততঃ করতে দেখে একজনের নজর পড়ল।

কাকে চাই?

দু বার ঢোক গিলল মমতা, তারপর বলল, প্রবালবাবু।

ও, আপনার নাম কি বলুন, কি দরকার?

চোখ দুটো আরেকবার জ্বলে উঠল মমতার। হুটুদার কাছে দেখা করতে এখন তাকে দরকার জানাতে হবে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে বললে, বলবেন মমতা দেখা করতে এসেছে।

ছোকরাটি একটুক্ষণ কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর 'বেশ' ব'লে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর।

এখন তাকে হুটুদার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? অসম্ভব। মমতা জোরে জোরে পা ফেলে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর। সামনাসামনি এ সবকিছুর জবাব চাইবে সে।

কিন্তু ভেতরে পর্দা-আড়াল কোণ থেকে এক বালক হাসি শুনে পা দুটো আপনি থেমে গেল তার। পাথর হয়ে গেল যেন। হুটুদার হাসি। সেই পুরনো হাসি, তেমনি উজ্জ্বল, উচ্ছল, উর্মিল।

একটি মেয়েকণ্ঠ শোনা গেল—কে, সেনগুপ্ত?

সেই যে ছোকরা এসেছিল চিঠি নিয়ে, মমতা, মাই ফার্স্ট লাভ। দাঁড়াও ডাকাচ্ছি, দেখে নাও। বাচ্চা বয়েস থেকে সুরু করলেও আমার চয়েস কোনদিন খারাপ ছিল না।

না বাপু, ডাকতে হবে না,—ন্যাকামী-ভরা গলা শোনা গেল, তোমায় বিশ্বাস নেই, আবার ফ্রেশ স্টার্ট ক'রে বসবে কিনা কে জানে! ও তরফ যেভাবে ধাওয়া ক'রে আসছে, বাবা!

হোঃ হোঃ ক'রে আরেক প্রস্থ তাঁবু-কাঁপানো হাসি হেসে নিল প্রবাল; বললে, পাগল, তুমি থাকতে একটা মাঝবয়সী গেঁয়ো মেয়েকে আমি,—সবটুকু সেন্সই কি হারিয়েছি ব'লে তোমার ধারণা? গড হেল্প মি! দাঁড়িয়ে আছ কেন ললিত, ডেকে আন ভদ্রমহিলাকে।

কিন্তু মমতা ততক্ষণে হিজলপোড়ার বাঁক ছেড়ে আরো অনেক দূরে। সমস্ত শরীর যেন গনগনে আগুনের হলকায় পুড়ে যাচ্ছে।

জলন্ত চিতার ওপর হাঁটা কি এর চেয়েও কষ্টকর! মমতার চোখের সামনে সমস্ত নোয়াদিয়া গ্রাম দুলতে লাগল। আকাশে সূর্যাস্তের রঙ। কিন্তু মমতার চোখে আজ কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। কালো, শুধুই কালো।

শ্রীশচীন ভৌমিক

চিলিমপুরের ঘাট

একটি নিশ্চিন্ত গরু লেজ নাড়ে, ছিঁড়ে খায় ঘাস।
চারিপাশে কিছু নেই। ঘননীল হেমন্ত আকাশ
ছড়ায় সোণালী রোদ। ঢালু মাঠে, লাল বালুচরে
সাড়া নেই, শব্দ নেই। বিকেলের পড়ন্ত প্রহরে
চোখে পড়ে অন্তত পারে ধূ-ধূ করে কমনীয় কাশ
সুদূরে সবুজ শাল। বেঁকে গেছে ভাঙা ভাঙা তীর
কোথাও মানুষ নেই, চিহ্ন নেই জনবসতির
হৃদয় বিষণ্ণ হ'ল, হ'ল মন আশ্চর্য উদাস
নির্জন নিঃসীম শূন্যে, লুপ্ত রেখা সমস্ত স্মৃতির।
হঠাৎ মাটির ঘ্রাণ নিয়ে এল দুপুরে বাতাস
একটি নিশ্চিন্ত প্রাণী ঘুরে ফিরে ছিঁড়ে খায় ঘাস।

চিলিমপুরের ঘাট ঃ প্রত্যাবর্তন

১

কি জানি তুমি কি বলবে একে!
পথ বেঁকে গেছে পথের থেকে—
ফাল্গুন এল, মাঘের শেষে,
আলোয় শালের গন্ধ মেশে,
দেশ থেকে দূর নিরুদ্দেশে—
হাওয়া নিয়ে যায় সঙ্গে ডেকে।—
কি জানি তুমি কি বলবে একে।

২

আহা তুমি চেয়ে দেখতে যদি!
ঘন হ'ল বন, বনের পরে,—
এঁকে বেঁকে যায় একটি নদী।

পৃথিবী হারায় নম্র নীলে,
জল বালু আর আকাশ মিলে,
একাকার। শীত রৌদ্রামোদী—।
তুমি শুধু চেয়ে দেখতে যদি।

৩

কি জানি তুমি কি ভাবতে মনে
আলো হ'ল লাল মাঠের কোণে,
ছায়া গাঢ় হ'ল শালের বনে,
হাওয়ারা হারাল অন্ধকারে—
তারা দেখা দিল সে নির্জনে।
সেই পথে সেই দিনের পারে,
কি জানি তুমি কি ভাবতে মনে।

অসিতকুমার

প্রার্থী

কি আবেগে, পাতা কাঁপে গাছে,
কি আবেগে, মন নিত্য নাচে,
কি আবেগে, সমুদ্র-মুখর,
কি আবেগে, বর্ষায় বসন্তে ওঠে ঝড়,
মাঠে মাঠে।

বলো তুমি, আমাকেই বলো,
কি আবেগে, প্রত্যহ বিকেলে দেখি,
রাজপথ ধূলি,
মুখ তুলি',
ধূসর পতাকা হাতে, আনে এক সুন্দর গোধূলি

জানি না তো কেন,
তার পরে ধীরে অতি ধীরে
সন্ধ্যা নামে জনারণ্যে,
পৃথিবীর তীরে।

আশ্চর্য এ পৃথিবীর সব,
লাল নীল সমারোহ, আলোক-উৎসব,
বুঝি না কিছুই তার।
তবু প্রতিদিন,
তিক্তমুখ রিক্ততার শূন্য ডালা হাতে,
এখানে দাঁড়াই
কখনো বাড়াই
শীর্ণ বাহু দুই ;
এক গুচ্ছ যূঁই
ভ'রে দেবে শূন্য হাত, এ আশ্বাসে—
অখণ্ড বিশ্বাসে।

যে মহান পূর্ণ করে প্রতিদিন সুরে সুরে,
পৃথিবীর শূন্যতার থলি,
আমাকে কি দেবে না সে—
একমুঠো সুরের কাকলী॥

শ্রীচিত্ত সিংহ

—

পার্থক্য

কৃপণের ধন যায় ইঁদুরের গর্তে ;
আকাশের ধন আসে আলো হয়ে মর্ত্যে।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

সাহিত্যের ব্যাপার নয় যদিও, তথাপি আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাই সংবাদ-সাহিত্য পরিবেশন করিতে বসিয়া সর্বাগ্রে মনে হইতেছে।

১৯১৪ সনের প্রথম মহাযুদ্ধের বেলায় আমরা বালক ছিলাম; যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদিগকে পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধিয়াছিল, জার্মানির হাতে সেই সাম্রাজ্যবাদীদের লাঞ্ছনার কথা কল্পনা করিয়া আমাদের পূজনীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা উল্লাস করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদেরও উল্লাসের অন্ত ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে বয়স-বাড়িয়া-যুবক আমাদের গুরুতর আশাভঙ্গ হইয়াছিল। যুদ্ধ-শেষে রাউলাট অ্যাক্ট, জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রভৃতির দ্বারা নাগপাশ দৃঢ়তর হইয়া আমাদের লাঞ্ছনা-বৃদ্ধিই ঘটিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী-পরিচালিত প্রায় কুড়ি বছরের অসহযোগ-সাধনার দ্বারা দৃঢ় আমরা ১৯৩৯ সনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে এই হিসাবে বরণরূপে বরণ করিয়াছিলাম যে, এইবার শিথিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শিথিলতর হইয়া ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য হইবে এবং ইংরেজের ভারতছাড়া অনিবার্য হইয়া উঠিবে। সে ফললাভ আমরা করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের দুঃখ ও দুর্দশার চরমও ঘটিয়াছে। পোড়ামাটি-নীতির ফলে সমুদ্রকূলবর্তী শস্যশ্যামলা বাংলা দেশ শ্মশানে পরিণত হইয়া ১৩৫০-এ যে মন্বন্তর সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ধাক্কা আমরা এখনও সামলাইতে পারি নাই। ফরমোসাকে কেন্দ্র করিয়া যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে আমাদের চিত্ত সংশয়াকুল ও ভীতসন্ত্রস্ত হইতেছে। সেদিন নবতিপর বৃদ্ধ ইংরেজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল মাত্র আইসেনহাওয়ার ও চৌ-এন-লাইকে যুদ্ধবাজ অপবাদ দিয়া কূটকৌশলী ইংরেজের গোপন ভূমিকাকে চাপা দিতে চাহিলেও সাম্প্রতিক লণ্ডন-সম্মেলনে তাঁহাদের যে স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে তাহা মোটেই শান্তির দ্যোতক নহে। কাহার দোষ, কাহার ন্যায্য অধিকারে কে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে, উলুখড়দের তাহা জানিবার হুকুম নাই। আমরা এইটুকু অনুমান করিয়াই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি যে, যুদ্ধ বাধিলে পূর্ব-পাকিস্তান আমেরিকার ঘাঁটি হইবে এবং তদ্দ্বারা ভারতবাসী আমরা কম বিপন্ন হইব না। এই বুড়া

বয়সে আর একটা বিশ্বমহাযুদ্ধের ধকল সহিবার মত মনোবল আমরা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না—তাই এই দুঃখ-নিবেদন।

—

সমগ্র বিশ্বের আশাবাদী রাজনীতিবিদেরা নাকি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মুখাপেক্ষী হইয়া আছেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই যুদ্ধ নিবারিত হইবে। এ বিষয়ে আমরা বাঙালীরা—যুদ্ধ বাধিলেই সব চাইতে বড় মার যাহাদের উপর পড়িবে—নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি কই? দেশ-বিভাগের ফলে বাংলা দেশকে খণ্ডিত খর্ব করিয়া পূর্বতন আয়তনের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত করা হইয়াছে, এবং তাহা করিয়াও আমাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেওয়া হয় নাই। পদ্মার পরপার হইতে হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে লোক সর্বস্ব হারাইয়া আসিয়া এই সঙ্কীর্ণ স্থানেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে এবং আজও চাপিতেছে। বিপন্ন আমরা প্রতিবেশী-প্রদেশ হইতে, প্রধানত বাঙালী-অধ্যুষিত কিছু স্থান কিঞ্চিৎ চাপ লাঘবের জন্য প্রার্থনা করিতেছি, নিঃসংশয় প্রমাণও দাখিল করিয়াছি যে উক্তস্থানগুলি এই সেদিনও মাত্র বাংলা দেশেরই অঙ্গ ছিল, ওই সকল স্থানের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্প সঙ্গীত আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সবই বাঙালী, তথাপি পণ্ডিত নেহরুর স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক শাসনে বাঙালীর সেই দাবি গ্রাহ্য তো হইলই না, একটা কমিশন পাঠাইয়া বিহারের পূর্বাঞ্চলে এমনই অবস্থার সৃষ্টি করিলেন—ঘোরতর ধাঙ্গার সময়েও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা যাহা অপেক্ষা ভাল ছিল। নিজের হস্তধৃত রাজ্যের মধ্যে যে জওহরলাল এই অমানুষিক অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতেছেন না বা করিতে পারিতেছেন না, সারা বিশ্ব শান্তির জন্য তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও আমরা বাঙালীরা সংশয় প্রকাশ করিব। ভগবানের কৃপায় আমরা এখনও কমিশনের প্রতি আস্থা হারাই নাই, বিহারের মত লাঠিবাজির দ্বারা অধিকার সাব্যস্ত করিতে অগ্রসর হই নাই, ইহাতেও যদি কমিশনের ফল ভাল না হয়, তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ এই বাংলা দেশের সীমান্তেই আরম্ভ হইলে বিস্মিত হইব না। যেখানে আণবিক বোমার বালাই এখনও নাই,

সেখানে কয়েক লক্ষ বাস্তুহারা অভাবী দুর্দশাগ্রস্ত লোকই যে ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে বিশ্ব-ইতিহাসের ছাত্র জওহরলালের তাহা না জানিবার কথা নয়। বাংলা দেশের কংগ্রেস ও চিন্তাশীল মনীষীদের ধন্যবাদ, তাঁহারা বিপন্ন বাংলা দেশকে এখনও শান্ত রাখিতে পারিতেছেন।

—

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার স্বাধীনতা-যজ্ঞে সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে আহ্বান জানাইয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না, যদিও তর্কে-বিতর্কে রবীন্দ্রনাথকে ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়া বালতি হাতে অগ্রসর হইয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর বিবিধ রচনা ও ভাষণ ছাত্রদের প্রতি, রাজন্যবর্গের প্রতি, নারীদের প্রতি, হরিজনদের প্রতি, হিন্দুদের প্রতি, মুসলমানদের প্রতি ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হইয়া বাহির হইয়াছে। সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁহার সম্বোধন এই-রূপ মর্যাদা লাভ করে নাই। সেদিক দিয়া গান্ধীশিষ্য বিনোবাজীকে প্রাগ্রসর বলিতে হইবে। তিনি ভূদানযজ্ঞে সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে সাহিত্যিকদের আহ্বান করিয়াছেন এবং এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন, সাধারণ মানুষের চিত্তে স্থায়ী কোন ভাব, মহৎ কোন ভাবের উদ্রেক করিতে হইলে কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনীর সহায়তা ব্যতিরেকে তাহা হইতে পারে না। তিনি উত্তর-প্রদেশে (চিরগাঁওয়ে), বিহারে (গয়ায় —২ ৫. ৫৩) এবং সর্বশেষে বাংলা দেশে (মেদিনীপুর—বলরামপুর ১৯. ১. ৫৫) সাহিত্যিকদের ডাকিয়া সাহিত্যের শক্তির কথা শুনাইয়াছেন। গয়ায় তিনি মনোবৈজ্ঞানিক গবেষকদের ব্রহ্মর্ষি, সমাজ-সেবকদের রাজর্ষি এবং সাহিত্যস্রষ্টাদের দেবর্ষি আখ্যা দিয়া বলিয়াছিলেন, সরস্বতীই বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ দেবতা। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে ভূদানযজ্ঞের মত গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাইতে সাহিত্যের শক্তি অপরিহার্য—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। বলরামপুরে বিনোবাজী সাহিত্যিকদের প্রতি যাহা বলিয়াছেন, শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-ধৃত তাহার অনুলেখন হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"সাহিত্যিকদের শক্তি ঈশ্বরের শক্তির ন্যায়। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে সাহিত্যে তাহা আছে, আবার ব্রহ্মাণ্ডে যাহা নাই তাহাও সাহিত্যে আছে। গঙ্গার একটি ধারাই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যিকরা সৃষ্টি করিয়াছেন আরও দুইটি—আকাশগঙ্গা এবং পাতালগঙ্গা। সাহিত্যিকদের কোনও কিছু রচনা করিতে নির্দেশ দেওয়া ধৃষ্টতা এবং মূর্খতা। ধৃষ্টতা এই কারণে যে, তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের প্রেরণা যোগান। মূর্খতা এই কারণে যে, ফরমায়েসে সাহিত্য হয় না, স্বতস্ফূর্ত প্রেরণায় হয়। বিশ্বের কল্যাণ করিতে বসিয়াছি এই ভাব হইতে আর যা কিছু হউক, সাহিত্য হয় না। আত্মার সহিত যাহা চলে তাহাই সাহিত্য।"

আমরা জানি ভূদানযজ্ঞের অর্থনৈতিক দিক যাহাই হউক, ইহার সামাজিক চিত্তশুদ্ধির দিকটি কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিকের মর্মস্পর্শ করিয়াছে। স্রষ্টা সাহিত্যিকদের অগ্রণী তারাশঙ্কর বিবিধ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া বিনোবাজীর আসল স্বরূপ ধরিতে পারিয়াছেন, সে স্বরূপ বুদ্ধ শঙ্করাচার্য চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাজনদেরই অনুরূপ। মহতের চরণস্পর্শে ধরণীর ধূলি বার বার পবিত্র হয়, স্বার্থান্ধ মানুষ ক্ষণেকের জন্য স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া মহৎ আদর্শের পায়ে আত্মনিবেদন করে—বিনোবাজীর পরিক্রমায় সে মহাকাব্যিক মহিমা আছে। আশা করিতেছি, সেই মহিমা অচিরাৎ বাংলা-সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে।

—

৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোডে মধুসূদন ১৮৫৬ ২রা ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ও ১৮৬২ ৯ই জুন "ক্যাণ্ডিয়া" জাহাজযোগে ইউরোপ-যাত্রার মধ্যকালীন সাড়ে ছয় বছরের প্রায় অর্ধেক কাটাইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার বাংলা-সাহিত্য-সৃষ্টিকালের শ্রেষ্ঠাংশ ৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোডে কাটিয়াছিল। দীর্ঘকাল পূর্বে তাঁহার প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বসাক এই বাড়িটিকে জাতীয় স্মৃতিতীর্থরূপে সংরক্ষিত করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। ইংরেজ রাজত্বে তাহা সম্ভব হয় নাই। আমাদের সৌভাগ্য, স্বাধীনতালাভের পরও বাড়িটি খাড়া আছে এবং ইহার নম্বরও পরিবর্তিত হয় নাই। এখন এই সুযোগে বাঙালী জাতির অবহেলিত কর্তব্য যদি পালিত না হয়, পৃথিবীর সাহিত্যিক-সমাজ ও আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা আমাদিগকে ধিক্কার

দিবে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের জাতীয় সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক। বাঙালী সাহিত্যিক-সমাজের অকুণ্ঠ সহযোগিতা যখন তাঁহারা পাইতেছেন তাঁহাদের উচিত, অবিলম্বে এই গৃহটি মন্দির-সংরক্ষণী-আইনের কবলে আনিয়া মধুসূদনের স্মৃতিমন্দিররূপে রক্ষা করা।

* * *

মধুসূদন-প্রসঙ্গে আর একটি কথা। অনেকেই প্রশ্ন করেন, 'চতুর্দশপদী পদাবলী'র "চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে"—কোন্ পুস্তককে লক্ষ্য করিয়া লেখা? আমরা যাহা অবগত আছি তাহা এই: মধুসূদন কালীপ্রসন্ন সিংহকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে তাঁহার স্বগৃহে মধুসূদনকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেন। সেই কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'কে অত্যন্ত অভদ্রভাবে আক্রমণ করেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'হুতোম'কে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত অক্ষম পুস্তক 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'র "ভূমিকা"য়। মধুসূদনের মনে সেই "ভূমিকা" পাঠে যে ক্রোধ উদ্রিক্ত হয়, তাহার প্রকাশ পায় বিদেশে 'চতুর্দশপদী' রচনার কালে।

—

২৬ জুন হেন্‌রিয়েটা ও ২৯ জুন (১৮৭৩) মধুসূদনের মৃত্যুর পর ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ পিতৃমাতৃহীন সন্তানদের তাঁহার গৃহে লইয়া যান, সন্ধান করিতেছিলাম সে গৃহ কোথায় ছিল। ইহাও প্রচার আছে যে, ১৮৭২ সনের ১৫ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দ মনোমোহন ঘোষের গৃহেই ভূমিষ্ঠ হন। কেহ বলেন—সে গৃহ ছিল লোয়ার সারকুলার রোডে, কেহ বলেন—থিয়েটার রোডে। শ্রীঅরবিন্দও নাকি থিয়েটার রোডের বাড়িরই উল্লেখ করিতেন। অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতেছি, পুরাতন ডাইরেক্টরিতে ১৮৭১ হইতে ১৮৭৮ সনের মধ্যে থিয়েটার রোডের কোনও বাড়ির বাসিন্দা হিসাবে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের নাম নাই। কিন্তু ১২ নং লোয়ার সারকুলার রোডের বাসিন্দা হিসাবে

আছে। সারকুলার রোড তখন আপার লোয়ার শুধু এই দুই ভাগেই বিভক্ত ছিল না, "টাউন সাইড" ও "চব্বিশ পরগনা সাইড" এই দুই ভাগেও উক্ত রাস্তার নম্বর বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ কলিকাতা-শহর-সংলগ্ন দিকটা ছিল "টাউন সাইড" এবং নম্বর ছিল এক দুই ইত্যাদি, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের অংশ ছিল "২৪ পরগনা সাইড" এবং নম্বর ছিল এক দুই ইত্যাদি। ২৪ পরগণার দিকের ১২ নম্বরে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ বাস করিতেন। পরম্পরায় শুনিয়াছি, ওই গৃহ পরে ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী খরিদ করেন এবং পরে ইহাই নলিনীরঞ্জন সরকারের "রঞ্জনী" হয়।

—

কাঁঠালপাড়ার ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দের চেষ্টায় সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীশতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সংগ্রহের বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পর্কিত যাবতীয় স্মৃতিদ্রব্য উক্ত সংগ্রহশালায় দান করিয়া বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই ধরনের মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকিলে শেষ পর্যন্ত নষ্ট হইবেই, জাতীয় সংগ্রহশালাই এগুলি সংরক্ষণের উপযুক্ত স্থান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিকট হইতে এই বঙ্কিম-স্মৃতিমন্দির রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সকলের এইরূপ সহযোগিতা পাইলে এই সংগ্রহশালা একদিন সমগ্র বাঙালী জাতির তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে। ইংরেজের কাছে শেক্সপীয়র যত বড়, বন্দেমাতরম্-মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙালীর কাছে ততখানিই বড়। ইংলণ্ডে যদি অ্যাভন-তীরবর্তী স্ট্রাটফার্ডের স্মৃতিমন্দির সম্ভব হইয়া থাকে, বাঙালীই বা কাঁঠালপাড়াকে সেইরূপ করিতে পারিবেন না কেন?

—

পিতৃবিয়োগের পর এক ব্যক্তিকে উল্লাস প্রকাশ করিতে শুনা গিয়াছিল, একটা ছিল দুটো হ'ল। অর্থাৎ তামাকু সেবনে অভ্যস্ত ওই ব্যক্তির গোপনে সংগৃহীত একটি হুঁকার স্থলে প্রকাশ্যে পিতার হুঁকাটিও যুক্ত হইল। পিতৃহারার উল্লাসের অন্তরালে যে অশ্রুসিক্ত বেদনা ছিল, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনুভব করিবেন। আমরাও

আজ এই উল্লাস করিবার অবকাশ পাইয়াছি যে, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট দিয়া হাঁটিবার কালে মুখের বা হাতের জ্বলন্ত বিড়ি-সিগারেট আর ত্রস্ত হইয়া মাটিতে ফেলিয়া পদদলিত করিতে হইবে না, সিগারেট-সেবী ভক্ত-ভাইদের আতঙ্ক কিরণদা আর লাঠি হাতে প্রত্যহ বৈকালে ওই দুটি রাস্তায় টহল দিয়া ফিরিবেন না। এই উল্লাস যে কত বড় দুঃখের স্তোতক, কিরণদা যাঁহাদের দাদা ছিলেন না তাঁহারা বুঝিবেন না। পৃথিবীতে অনেক অনাত্মীয় মানুষ এক বা একাধিক মানুষের পরমাত্মীয় হইয়া উঠেন এইরূপ ঘটনা বিরল নহে, কিন্তু বসুধা অর্থাৎ কলিকাতার প্রৌঢ় ও যুবক সম্প্রদায়ের সত্যকার শ্রদ্ধেয় দাদা একমাত্র কিরণদাই হইতে পারিয়াছেন, সুয়োর পাজী গাধা গরু দুষ্টু সম্বোধন যে কত মিষ্ট হইতে পারে, কিরণদার গালি যাঁহারা না খাইয়াছেন তাঁহারা তাহা কখনও জানিতে পারিবেন না।

কিরণদা অর্থাৎ কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটা অতীত ইতিহাস আছে। তিনি মানিকতলার বোমা ও যুগান্তর সন্ধ্যা-নবশক্তির আমলের কর্মী। বারংবার জেল খাটিয়াছেন, বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, ভারতের বিপ্লববাদের গোপন রহস্যের কোন কোন চাবিকাঠি তাঁহার কাছে ছিল। এই সকল কথা যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা মাঘের 'প্রবাসী'তে জংলীদার অর্থাৎ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "কিরণদা" প্রবন্ধ পড়ুন। আমরা আরও এক বড় কিরণদার সন্ধান পাইয়াছিলাম, যিনি শান্তি ও সংযমের অবতার, যিনি স্নেহে ও প্রেমে অদ্বিতীয়, যিনি দেশের ভবিষ্যৎ যুবক সম্প্রদায়কে মানুষ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্থাপিত "প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার" একটি সত্যকার আশ্রম হইয়া উঠিয়াছে। আজ সেখানকার আনন্দস্বরূপ কিরণদার তিরোভাব ঘটিল, কিন্তু আমরা যদি সেখানে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন বজায় রাখার ব্যবস্থা করিতে পারি, তবেই কিরণদার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হইবে।

—

১৩৩১ সালের ১০ই শ্রাবণ সাপ্তাহিকরূপে 'শনিবারের চিঠি' যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, তখন পরাধীন পরশোষিত পরনিগৃহীত দেশের

অবস্থাকে সর্বনাশের অবস্থাই বলা চলিত। আমরাও প্রায় সকলেই তখন সদ্য-ইউনিভার্সিটি-ত্যাগী অর্থাৎ পণ্ডিত। কাজেই সর্বনাশ সমুৎপন্ন দেখিয়া আমরা অর্ধেক ত্যাগই পণ্ডিতজনোচিত কার্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম। তখন প্রমাণ-সাইজ ছিল প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, মাসিক বসুমতী, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতির। আমরা অর্ধেক ত্যাগ করিয়া প্রমাণের অর্ধেক সাইজ লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। সেই সাইজেই সুখে দুখে থাকিয়া, ক্রুত চলিয়া সাড়ে ত্রিশ বৎসর কাটাইলাম। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট রাষ্ট্রনৈতিক মতে সর্বনাশের হাত হইতে রেহাই পাইলেও অর্ধেকের অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই। লেখার পরিমাণ পর্যাপ্তরূপে বাড়িয়া যাওয়াতে লেখকেরা এবং প্রমাণ-সাইজে বিজ্ঞাপন দিতে অভ্যস্ত আমাদের বিজ্ঞাপনদাতারা সেই হইতে অবিরত তাগাদা দিয়া শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে প্রমাণ-মূর্তি ধরিতে বাধ্য করিতেছেন। অর্থাৎ আগামী ১লা বৈশাখ হইতে 'শনিবারের চিঠি' নব কি না প্রমাণ কলেবর ধারণ করিবে; 'শনিবারের চিঠি' মাসিকের পংক্তি-ভোজনে প্রবাসী-ভারতবর্ষ-বসুমতীর পর্যায়ভুক্ত হইবে। 'শনিবারের চিঠি'র কর্মাধ্যক্ষেরা আমাদের এই বিজ্ঞপ্তি দিতে আদেশ করিয়াছেন। দাম পৃষ্ঠা-সংখ্যা কাগজ হরফ ইত্যাদির খবর আশা করি যথাসময়ে তাঁহারাই নিবেদন করিবেন, আমরা লেখকদের নিকট ইহা বিজ্ঞাপিত করিতে পাইয়া খুশি যে, অতঃপর স্থানাভাবের অজুহাত দেখাইয়া আমরা তাঁহাদের হৃদয়োচ্ছ্বাসকে সংহত করিবার প্রয়াস করিব না; লেখক ও প্রকাশকদের এই কথা বলিয়া আশ্বস্ত করিতে পারিব যে, কয়েকজন সক্ষম পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা কৃত পুস্তক-সমালোচনা প্রমাণ-সাইজের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হইবে এবং পাঠকদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিব যে দুই-একটি বিশেষ বিভাগ খুলিয়া 'শনিবারের চিঠি'কে একটি পূর্ণবিকশিত সাহিত্য-পত্রিকায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিব। প্রথম সাপ্তাহিক প্রকাশের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছিলাম (১০ই শ্রাবণ ১৩৩১) তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া ১৩৬২ বৈশাখের নবকলেবরান্বিত মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র সম্পর্কে বলিতেছি—"অনেক রকম গোলমালই আমরা বাধাব, কিন্তু অলমতি বিস্তরেণ।"

প্রসঙ্গ কথা

[৩৭০ পৃষ্ঠার পর]

সম্মেলনের সরকার-ঘেঁষা চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করতে হ'লে এক দমকে তাকে অতিরিক্ত প্রগতিবাদী সম্মেলনে পরিণত করাটাই উদ্দেশ্য-পূরণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অসম্ভব নয়, এ বৎসরের কর্মকর্তাদের মধ্যে উগ্র বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য ছিল, তাঁদের নির্বাচনের চরিত্রের দ্বারাই শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে। এ যেন এক প্রান্ত থেকে সহসা মুখ ঘুরিয়ে এক দমকে বিপরীত প্রান্তে চ'লে যাওয়া। দীর্ঘকালের অভ্যস্ত শিবির থেকে নাম খারিজ ক'রে রাত না পোয়াতেই বিপক্ষ শিবিরে গিয়ে যোগ দেওয়া। এককালীন প্রবাসী অধুনা নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের এত বড় পার্শ্ব-পরিবর্তনের জন্য বোধ করি সম্মেলনের অধিকাংশ সদস্যই প্রস্তুত ছিলেন না।

সরকারপন্থী অথবা উগ্র বামপন্থী লেখক—তাঁরা তাঁদের স্বস্থানে থাকুন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা স্বীয় নির্দিষ্ট বিচরণসীমার মধ্যে আবদ্ধ আছেন, ততক্ষণ সাহিত্য সম্পর্কে অন্তত তাঁদের সঙ্গে আমরা কলহ করতে যাব না। কিন্তু তাঁরা যখন সাহিত্যে মাথা গলাতে আসেন তখনই ঘটে বিপত্তি। জবরদখল সব ক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক, তবে সাহিত্যে এর চাইতে অন্যায় ও অবিচার আর কিছু হতে পারে না। আমাদের দেশের সত্যিকার সাহিত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য এক-এক সময় বড় দুঃখ হয়। সাহিত্যকর্মী হিসাবে তাঁরা দক্ষিণেও নন, বামেও নন। তাঁদের যেখানে থাকার কথা সেখানেই তাঁরা আছেন। তাঁরা তাঁদের স্বভূমির উপর দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থেকে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য-সাধনায় নিরত। তাঁদের পথ সত্যের পথ ব'লেই প্রান্তীয় রেখায় তাঁদের বিচরণ নয়, জীবনের সর্বব্যাপারে তাঁরা মধ্যগ আদর্শের সাধক। তাঁদের ভালে না আছে সরকারী রাজটীকার চন্দন-লাঞ্ছন, না তাঁদের পৃষ্ঠে আছে রাজনৈতিক পোষকতার ছাপ। এক দিকে সামাজিক-আর্থিক কৌলিন্যের সুবিধা তাঁদের অনায়ত্ত, অন্য দিকে উদ্দেশ্যমূলক সঙ্ঘশক্তির আনুকূল্যলাভে তাঁরা বঞ্চিত। অকৃত্রিম সাহিত্য-সাধনার

ক্ষুরধার দুর্গম পথে তাঁদের নিভৃত একক সঞ্চরণ। তাঁদের আদর্শ দুরূহ ব'লে তাঁদের সাধনাও দুরূহ। কিন্তু এ দুরূহতার বিশেষ কোন স্বীকৃতি সমাজে নেই। সর্বপ্রকার ডামাডোলের ব্যাপারে হয় আসর জাঁকিয়ে আছে ক্ষমতাবান রাজপুরুষেরা, নয় রাজনৈতিক নেতারা, নয় উদ্দেশ্যমূলক রাজনীতির আওতায় লালিত তথাকথিত শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। দেশের যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী গুণী সাহিত্যিক, তাঁদের সঙ্গে এ সব সম্মেলনের বিশেষ কোন যোগ নেই। তাঁদের সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল বৃহত্তর পাঠকসমাজ, সেই সমাজকে খুশি করতে পারলেই তাঁরা তৃপ্ত।

* * *

সম্মেলনের মূল সভাপতি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ভাষণে আমাদের অনেক আশার কথা শুনিয়েছেন। আশার কথা শুনতে ভালই লাগে, তবে সে আশাবাদিতার প্রাকার যথোপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তির উপর বিলম্বিত কি না সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। মূল সভাপতির ভাষণে চিন্তাযোগ্য অনেক উপাদান থাকা সত্ত্বেও এক ধরনের ভাবালুতাময় আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাসে তা কিঞ্চিৎ জবজবে হয়ে উঠেছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীনীহাররঞ্জন রায় ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ-গঠনের সমস্যার উল্লেখ করেছেন, এবং সেই খাতে তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে যতদূর বুঝতে পারলাম, তাতে মনে হয়, মানভূম সিংভূম প্রভৃতি বিহারের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলির উপর পশ্চিমবঙ্গের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও তিনি এই নিয়ে বিহারের সঙ্গে কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটাতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-গঠনের প্রশ্নটি ভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকে অবান্তর। বাংলা সাহিত্যের যদি যথেষ্ট ঐশ্বর্য ও প্রাণশক্তি থাকে, তা হ'লে বাংলা দেশের রাষ্ট্রিক ও ভৌগোলিক সীমানার সংকুচন এবং আর্থিক বিপর্যয় সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হবে। "ব্যক্তিগতভাবে আমার দৃঢ় ধারণা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শক্তিসমৃদ্ধি যত বেশি হবে, বাংলা দেশের সীমা তত বিস্তৃত হবে; তবে তা ভৌগোলিক সীমা নয়, আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সীমা, এবং এই

শেষোক্ত সীমা-বিস্তারেই আমি বেশি বিশ্বাসী। আমার দৃষ্টিতে ভাষা ও সাহিত্য রাষ্ট্রীয় মানচিত্রের ঊর্ধ্বে।"

মানভূম প্রভৃতির ব্যাপার নিয়ে বাংলা ও বিহারের মধ্যে যদি কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তার বারো-আনা দায়িত্ব বিহার সরকারের। বিহার সরকার পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবি স্বীকার ক'রে নিলে আবহাওয়া ঘুলিয়ে উঠত কি না সন্দেহ। কিন্তু আপাতত বিহার-বাংলার সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত বিতর্ক আমাদের বিচার্য বিষয় নয়; রায় মহাশয়ের উত্থাপিত প্রশ্নটিকে আমরা নিছক সাহিত্যের মঙ্গলামঙ্গলের দিক থেকেই বিচার ক'রে দেখতে চাই। রায় মহাশয় বাংলার খণ্ডিত রাষ্ট্রসীমানার মধ্যে বাস ক'রেও বাঙালী সাহিত্যিককে অখণ্ড সাহিত্যদৃষ্টি অনুশীলনের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা দেশের বর্তমান বিপর্যয়কর অবস্থায় এই অখণ্ড সাহিত্যদৃষ্টির অনুশীলন আদৌ সম্ভব কি না এ প্রশ্ন তাঁকেই করি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমিত প্রাণশক্তি কে না কামনা করে, কিন্তু নিদারুণ দেশবিভাগ ও তৎপ্রসূত অন্যান্য দুর্দৈবের ফলে বাংলা দেশের যে হাল দাঁড়িয়েছে, তাতে বাঙালী জাতির অমিত প্রাণশক্তির উপর ভরসা করতে হ'লে অলৌকিক সংঘটনের উপর ভরসা স্থাপন করতে হয়। মনে হয়, রায় মহাশয় বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা ক'রে অভিলাষের সুতোয় বড্ড বেশি ঢিল দিয়েছেন। তাঁর মনের কামনাকে তিনি বাস্তবের বেশ পরিয়েছেন। সত্য পরীক্ষার ধোপে এ কামনা টেকে কি না সন্দেহ।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী, পশ্চিমবঙ্গের কথাটাই বলতে পারি। বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এক্ষণে অবিভক্ত বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশে পর্যবসিত। তার সঙ্গতিও তদনুপাতে সংকুচিত। যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, দেশবিভাগ ও তজ্জনিত চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা, উদ্বাস্তু-সমস্যা ইত্যাদি তরঙ্গের পর তরঙ্গের আকারে আগত একাধিক তাণ্ডবের ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অতিশয় ম্রিয়মাণ। খণ্ডিতকলেবর ও বিশীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা কায়ক্লেশে কোন প্রকারে টিকে আছে মাত্র। তাদের আর্থিক অবস্থা তো শোচনীয়

বটেই, তেমনি উল্লিখিত নানাবিধ ঘটনা-সমবায়ের কারণে তাদের স্ফূর্তিও অতিশয় মলিন। যুদ্ধকালে সেই যে জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, তার অবসন্নতা ও গ্লানিভার থেকে আজিও জাতি অব্যাহতি লাভ করে নি। পশ্চিমবঙ্গের ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, সেই তুলনায় জন-বসতি ঘনসন্নিবদ্ধ। এর উপরে উদ্বাস্তু-সমস্যার ফলে জমির উপর অতিরিক্ত মাত্রায় চাপ পড়েছে। কি ভৌগোলিক, কি পার্থিব, কি আত্মিক—সব দিক থেকেই আজ পশ্চিম-বাংলার পরিস্থিতি নৈরাশ্যজনক। এরূপ অবস্থায় পশ্চিম-বাংলার সম্ভাব্য প্রাণশক্তির উপর আশ্বাস স্থাপন ক'রে বাংলা-সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আশা পোষণ করা আকাশ-কুসুমের মত অবাস্তব স্বপ্ন-কল্পনা ব'লে মনে হয়। দেশ সর্ববিষয়ে মৃতপ্রায় হয়ে আছে, অথচ সাহিত্যে তার প্রাণশক্তি জাগ্রত আছে, এরূপ যোগাযোগ সোনার পাথর বাটির মতই অসম্ভব। রায় মহাশয় প্রগতিশীল চিন্তাদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর চিন্তাদর্শ ই কি এই কথা বলে না যে, জাতির অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য সমুন্নতি বাদ দিয়ে জাতির সাংস্কৃতিক সমুন্নতি কল্পনা করা যায় না? সংস্কৃতির সঙ্কট আর্থিক সঙ্কটের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এমত অবস্থায় খণ্ডিত রাষ্ট্র-সীমানার সঙ্কীর্ণ পরিসরের অভ্যন্তরে জীবন-যাপনকারী বাঙালী সংস্কৃতকর্মীকে তিনি কি ক'রে যে প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে অখণ্ড শিল্পদৃষ্টি অনুশীলনের পরামর্শ দেন, ভাল বোঝা যায় না। ঘর না সামলিয়ে সংস্কৃতিকে সামলাতে গেলে বিপদ অনিবার্য। সেই বিপদই আজ বাঙালী জীবনের দিকে দিকে পরিদৃশ্যমান।

বরং এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের বিশ্লেষণ নির্ভুলতরভাবে সমস্যাটির মূল স্পর্শ করতে পেরেছে ব'লে মনে করি। "মানুষের রাজতীর্থে" এই শিরোনামায় তিনি তাঁর সাহিত্যভাষণে বলেছেন, "সেই অভঙ্গ বঙ্গ-ভূমি আর নেই, খণ্ড-বিকীর্ণ হয়ে গেছে। তার কত সমস্যা, কত যন্ত্রণা, ব'লে লিখে শেষ করা যাবে না। তবু সহস্র বাধাবিপদের মধ্যেও তার প্রাণ উন্মুখর রয়েছে সাহিত্যে, দুর্দিনের দুর্যোগ তাকে রুদ্ধ বা স্তব্ধ করতে পারে নি। কিন্তু ইদানীং এই কি মনে হচ্ছে না যে, নদীর বহুবিস্তৃত

শাখাপ্রশাখাই আছে, কিন্তু যেন সেই স্রোতচাঞ্চল্য নেই, নেই বা স্বচ্ছ-শীতল গভীরতা।" যেন এক বৃহৎ হাজা-মজার দেশে এসে গিয়েছে, জটিল জঙ্গলের আবর্জনায় আটকে গিয়ে হারিয়েছে তার গতি-দ্যুতি। কত লেখা, কত লেখক, কিন্তু সর্বত্রই, কেমন যেন একটা হতাশার সুর নিষ্ফলতার চেতনা।" অচিন্ত্যকুমার-কথিত এই হতাশার সুর, এই নিষ্ফলতার চেতনাই সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে খাঁটি কথা। রায় মহাশয়ের অপরিমিত আশাশীলতা বাস্তব-অচেতনতার পরিচায়ক। বালিস্তূপের মধ্যে মুখ গুঁজে ঝড়কে অস্বীকার করতে গেলে উটপাখিকে যেমন ঝড়ের ঝাপটাই খেতে হয়, ডক্টর নীহাররঞ্জনের আত্যন্তিক আশাবাদের মধ্যে সেই বিরূপ সম্ভাবনারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আজকের দিনের বাংলা দেশে বাস ক'রে বাঙালীর প্রাণোচ্ছ্বাসের দোহাই পাড়া সর্বথা-উপক্রুত বাঙালীর কর্ণে কেমন ব্যঙ্গের মত শোনায়।

ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রীয় সীমার সংকুচন-প্রসারণের সঙ্গে ভাষার উন্নতি-অবনতির মূলগত কোন যোগ নেই—এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রায় মহাশয় ইংরেজী ভাষার উল্লেখ করেছেন। ইংলণ্ড একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ অথচ তার ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পৃথিবীবিস্তারী। বক্তার মতে এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে ইংরেজী ভাষার অন্তর্নিহিত অপরিমিত প্রাণশক্তির দরুণ। আমরা এ কথা আংশিক স্বীকার করি, আংশিক স্বীকার করি না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সর্বস্বীকৃত—তা সত্ত্বেও এ কথা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না যে, ইংরেজের যদি পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্য না থাকত তা হ'লে ইংরেজী ভাষার প্রভাব এমন সর্বব্যাপী হতে পারত না। শুধুমাত্র অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে ইংরেজী ভাষা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছে—এ কথা বলা ইতিহাসকে অস্বীকার করা। ফরাসী সাহিত্য ঐশ্বর্যের দিক থেকে ইংরেজী সাহিত্য থেকে কোন অংশে ন্যূন নয়, বরং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে শ্রেষ্ঠতর। তা সত্ত্বেও ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের জগৎ-জোড়া প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হয় নি। ইংরেজের তুলনায় ফরাসীর ভৌগোলিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক শক্তির অপকৃষ্টতাই নিঃসন্দেহে এই জন্য দায়ী।

সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির প্রশ্নে দেশের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভাল-মন্দকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। কোন রকম আক্রমণাত্মক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে নয়, নিতান্ত আত্মরক্ষার গরজেই আজ পশ্চিম-বাংলাকে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবি উচ্চকণ্ঠে জানাতে হবে। তা ছাড়া বিহারের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি ফেরত চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ কিছু অন্যায়ও করে নি, কেন না এগুলি এক সময় বাংলা দেশেরই অঙ্গীভূত ছিল। পশ্চিম-বাংলার দাবি একান্ত ন্যায্য, ইতিহাসসম্মত, সত্যনির্ভর। এ আন্দোলন কিছু অস্বাভাবিক বা অসময়োচিতও নয়, কেন না, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস নিজেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য-গঠনের আদর্শকে কার্যকরী রূপদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্ধ্রের বেলায় রূপদান করছেনও। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিহারের সঙ্গে বাংলার মনোমালিন্য ঘটাবার প্রশ্ন ওঠে না।

সাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ভাল ভাল কথা অনেক বলেছেন, তবে সবটাই অলঙ্কারবহুল ভঙ্গিপ্রধান ভাষার জটিলতায় আচ্ছন্ন। সাদামাঠা স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে আমাদের অধিকাংশ গদ্য-লেখক কেন যে অযথা কাব্যিক ভঙ্গির অবতারণা করেন বুঝতে পারি না। সভায় শ্রোতৃবৃন্দের প্রতি উদ্দিষ্ট অভিভাষণের ভাষা সহজ সরল যথাযথ হবে, এইটিই প্রত্যাশিত—সেখানে কাজের কথা থাকবে, সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাতের চেষ্টা থাকবে। সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি-দিঙ্‌নির্দেশের চেষ্টা থাকলে আরও ভাল। তা না হয়ে সমস্ত ভাষণটাই যদি ঝুড়ি ঝুড়ি কাব্যকথার বাষ্পভর্তি ফানুষ হয়ে দাঁড়ায়, তা হ'লে সমস্ত সম্মেলনের আবহাওয়াটাই ভাবালুতামণ্ডিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যের যে-ক্ষেত্রে যেটা শোভা পায়, সাহিত্য-সম্মেলনে সেটা শোভা নাও পেতে পারে। অন্যান্য দেশের আধুনিক সাহিত্যের খবর যেটুকু জানি তার থেকে বলতে পারি, কোন দেশের গদ্যের ভাষাতেই এমন কাব্যিক ঢঙের প্রচলন নেই। বাংলা ভাষার এটি একটি মূলগত ত্রুটী এবং সম্ভবত এই মূলগত ত্রুটীর কথা স্মরণ ক'রেই শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

বৎসরাধিককাল পূর্বে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় বাংলা গদ্যভঙ্গির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। অচিন্ত্যবাবুর ভাষণের একটুখানি নমুনা দিই—

"তাই, বলতে সঙ্কোচ ক'রে লাভ নেই, হৃদয়ের কথাটাই সাহিত্যের প্রাণবস্তু। যখনই জ্ঞানের কথা বলবে প্রমাণ চাইব। যখনই জৈব বৃত্তির কথা বলবে বিজ্ঞানের বই খুলে দেখব মিলিয়ে। যখনই বাস্তব ভূমির কথা বলবে জিজ্ঞেস করব কোন্ পাড়ায় এঁকে দেখে এলে? কিন্তু হৃদয়ের কথা বলো, ষোল আনার উপর আরো দু-আনা মেনে নেব। তোমার যা বাঁধা-বরাদ্দ তার উপর পেয়ে যাবে কিছু উপরি পাওনা। আমার অকারণের খুসি। আমার সৌহার্দ্যের নৈবেদ্য। বস্তুত, তুমিও তো আমার হৃদয়কেই আকাঙ্ক্ষা করো, আমার হৃদয়ের মধ্যেই চাও তোমার প্রবেশ-প্রতিষ্ঠা। তুমি তো প্রচারিত হতে চাও না, সঞ্চারিত হতে চাও…।"

উদ্ধৃতাংশের ভাবের সঙ্গে আমার কোন অনৈক্য নেই, ভাষাভঙ্গির সঙ্গেই যা কিছু অনৈক্য। এ ভাষা কৃত্রিম, চঙসর্বস্ব, মুদ্রাদোষদুষ্ট। অচিন্ত্যকুমারের অভিভাষণটি আগাগোড়া এই ভাষায় রচিত। সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনের কোন এক দ্বিধান্বিত মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কথ্যভঙ্গি মিশিয়ে এই এক কৃত্রিম ভাষারীতির সূত্রপাত করেছিলেন, তার পর থেকে বাংলা-সাহিত্যে এ ভাষার একটানা অভিযান চলেইছে। গদ্যে চঙ ক'রে কথা বলার রেওয়াজ আর ঘুচল না। এ ভাষায় কবির শান্তিনিকেতন-মন্দিরের প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলি রচিত, এ ভাষায় কবির শেষ বয়সের তাবৎ গদ্যকথা রচিত, এ ভাষায় কবির বিরাট বিপুল পত্র-সাহিত্যের পনেরো আনা রচিত। এ ভাষার রসায়নে রসান্বিত ক'রে অচিন্ত্যকুমার তাঁর নব রামকৃষ্ণকথামৃত সাধারণ্যে পরিবেশন করেছেন, এ ভাষা মকশ ক'রেই তার সাম্প্রতিক অভিভাষণটি ফেঁদেছেন। যতদিন না বাংলা গদ্য এই ভঙ্গির কবল থেকে মুক্ত হয় ততদিন বাংলা গদ্য আংশিক খণ্ডিত হয়েই থাকবে। বাংলা গদ্যকে গভীর চিন্তন-মননের উপযোগী বাহন করতে হ'লে তার এখনকার কথায়-কথায়-এলানো ভাব দূর করতে হবে।

উপরে যে ব্যবহারিক মনোভাবের কথা বলা হ'ল, সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি শ্রীগোপাল হালদার মহাশয়ের ভাষণে তার পরিচয় আছে, কিন্তু এখানে অন্যরূপ বিপত্তি। হালদার মহাশয় তাঁর সমগ্র বক্তব্যটিকে গোঁড়া মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে কতকগুলি বাঁধি গত আওড়েছেন। মার্ক্স-নির্দেশিত ফরমুলার বাইরে তিনি এক-পাও বাড়ান নি। তিনি যখন বলেন, "সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, সমাজ দিয়েই সংস্কৃতিরও পরিচয়। সমাজ-সৌধের বনিয়াদ যদি হয় আর্থিক জীবন, তার উপরতলা তা হ'লে সাংস্কৃতিক জীবন", তখন তার মধ্য দিয়ে বহুল-উচ্চারিত সেই একই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে পাই। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক আমরাও স্বীকার করি, এবং তা করি ব'লেই শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের অর্থনীতি-বিমুখ অমিত আশাবাদের প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজন মনে করেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, অর্থনীতি সংস্কৃতির ষোল-আনা নিয়ন্ত্রণকারী। তেমন নিয়ন্ত্রণের কথা কট্টর মার্ক্সবাদীরাই শুধু বলে, আর কেউ বলে না। ইতিহাস এবং রাজনীতির বিবর্তনের গতিপথ নির্ধারণে মার্ক্সীয় দর্শনের আংশিক সার্থকতা থাকতে পারে; কিন্তু শিল্প সাহিত্য ইত্যাদির স্বরূপনির্ণয়ে মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ সতত লক্ষ্যভ্রষ্ট, ব্যর্থ।

হালদার মহাশয় এবং অনুরূপ মনোভাবাপন্ন সমালোচকদের সম্পর্কে মুশকিল এই যে, এঁরা কি সমাজ-সমালোচনা, কি সাহিত্য-সমালোচনা উভয়ত বিদেশী কিতাবী বুলিতে অভ্যস্ত। পরের মুখে ঝাল খেয়ে এঁরা স্বজাতীয়ের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়েন। যুক্তির নিজস্ব ধারায় সিদ্ধান্তকে অগ্রসর হতে দিলে পাছে সিদ্ধান্ত অভীষ্ট প্রতিপাদ্যের বিপরীতপথগামী হয়ে দাঁড়ায়—সেই আশঙ্কায় এঁরা নিরপেক্ষ যুক্তির পথে কদাচ চলেন। সচরাচর এঁদের বক্তব্য নিয়ন্ত্রিত হয় পূর্বাহ্নে নিরূপিত চিহ্নিত কোন মতবাদের দ্বারা। অর্থাৎ ফরমুলায় এঁদের বিশ্বাস, স্বার্থলেশশূন্য সত্যনিষ্ঠায় নয়। এ প্রক্রিয়ার সুবিধা এই যে, এতে ভাববার দায় কম, পক্ষান্তরে তৈরী কথার উপর দাগা বুলোতে পারলেই সিদ্ধি। সেই কারণে পরনির্ভর ব্যক্তিদের এই পথে নিয়তসঞ্চরণ।

কিন্তু সত্য, বলাই বাহুল্য, এত সহজায়ত্ত নয়। সত্য দক্ষিণ বাম অতি-বাম এই সব লেবেল এঁটে চলে না, তার পথ উত্তরাভিমুখী কম্পাসের কাঁটার মত সর্বদাই চিরন্তনতার অভিমুখী। ধ্রুবতারার মত সত্যের লক্ষ্য অবিকম্প, স্থির। বিরাট সত্য মাত্রই শাশ্বত, চিরন্তন, সার্বভৌম। সাহিত্যের সত্যও তাই।

ব্যক্তিজীবনে আমরা যে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগামী হই না কেন, সাহিত্যকে তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। সাহিত্যে দক্ষিণ কিংবা বামের একচক্ষু সঙ্কীর্ণতা স্বীকার্য নয়, সর্বপ্রকার একদেশদর্শিতা সাহিত্যের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী। উগ্র বামপন্থীরা যা-ই বলুন, আমরা বলি, সাহিত্যের রসের মহোৎসবে আনন্দের পংক্তিভোজে সকলের জন্যে সমান আসন পাতা আছে। এখানে অযথা শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের অবতারণা করলে সব-কিছুকেই বিকৃতদৃষ্টিতে দেখা হয়। যুগ ও দেশ-ভেদে সাহিত্যের প্রকাশরীতির বদল ও তারতম্য ঘটে, কিন্তু তার বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের খুব কম ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয়। সাহিত্যের এই বস্তুগত বৈশিষ্ট্য কতকগুলি মৌলিক সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চিরন্তন মানুষ এবং তার হাসি-অশ্রু সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে এই মৌলিক সত্যগুলি গ'ড়ে উঠেছে। যে মানুষ সর্বকালের মানুষ, তার শ্রেণী নেই, জাত নেই। সামাজিক মানুষের বেলায় শ্রেণীর তত্ত্ব খাটে, সাহিত্য-সেবিত মানুষের বেলায় নয়। সেখানে সাধারণ মিলনভূমির শ্রীক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষ এক হয়ে মিশে গেছে। যাঁরা অর্থনীতির সূত্রের দ্বারা পুরাপুরি শিল্প-সাহিত্যের রহস্য ভেদ করতে চান, তাঁরা এইখানটায় এসেই বাধান যত গণ্ডগোল। আত্মপ্রকাশের তাড়নায় শিল্পীর অগোচর সৃজনী লীলা কখন কোন্ শ্রেণীর মানুষকে শিল্পের বিষয়ীভূত করবে, অর্থনীতিভিত্তিক সাহিত্যতত্ত্ব আগে থাকতে তা নির্দেশ ক'রে দিতে পারে না। শিল্পসাহিত্য এত সহজ ব্যাপার নয় যে, ইচ্ছা করলেই তাকে ফরমূলার বাঁধনে বাঁধা যায়। সাহিত্যনীতি কতিপয় চূড়ান্ত মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তার প্রকাশ বিচিত্র। প্রকাশের এই বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতাকে ধরতাই বুলির ছকে ফেলে সরলীকৃত করা সম্ভব নয়। সমাজের অর্থনৈতিক বিন্যাসের দ্বারা শিল্প-

সংস্কৃতির রূপ কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় সত্য কথা, তবে তাকে শিল্প-সংস্কৃতির একমাত্র নিয়ন্তা মনে করার মত ভুল আর নেই।

এ বিষয়ে খোদ একটি বামপন্থী সংগঠন কী বলে তা অনুধাবন করা যাক। ক্রান্তি-শিল্পী-সংঘ নামক পশ্চিম-বাংলার একটি বামপন্থী সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রাদেশিক সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে—

"শিল্পসাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে কিছুদিন যাবৎ দেশে বিদেশে প্রগতিশীল বস্তুবাদী সমালোচনার নামে এবং অংশত, দলগত রাজনীতির প্রভাব সাহিত্যের মূল্যমান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংক্রামিত হবার ফলে যে একটি মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা আবশ্যক ব'লে আমরা মনে করি। শিল্পসাহিত্যের বস্তুবাদী ঐতিহাসিক বিচারের নামে কোন কোন তথাকথিত বামপন্থী রাজনৈতিক সাহিত্যিক মহলে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে যে, শিল্পসাহিত্য ইত্যাদি বাস্তব অর্থনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়, শিল্পের সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনের সম্পর্ক দু'য়ে দু'য়ে চারের মত সরল।·· আমরা মনে করি শিল্পসাহিত্যের বিশেষ প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে সমাজের আর্থিক শ্রেণীবিন্যাসের বা শ্রেণীস্বার্থপ্রসূত আর্থিক লাভক্ষতি বিচারের এই সহজ সমীকরণ ভ্রান্ত ও বিকৃত।"

বিপত্তির এখানেই শেষ নয়। শিশু-সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বায়না ধরেছেন, বাংলা দেশের রূপকথার "বিষয়বস্তুর আমূল পরিবর্তন" করতে হবে। রূপকথা থেকে গ্রাম্যতা বাদ দিতে হবে, অবাস্তব ও অলৌকিক বিশ্বাস বাদ দিতে হবে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রূপকথা লিখতে হবে। "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী" থেকে রূপকথা লেখা—একটা নতুন আবদার বটে। রূপকথার মধ্যে একটা জাতির স্বপ্ন ও কল্পনা লীলায়িত হয়ে ওঠে স্বতস্ফূর্তভাবে। যুগে যুগে তার কল্পনার সঞ্চয় বর্ধিত হতে থাকে। রূপকথার মধ্যে জাতির একান্ত অন্তরের কথা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়—মাপজোপ ক'রে ওজন ক'রে রূপকথা লেখা যায় না।· কোন দেশেই আজ পর্যন্ত লিখিত হয় নি। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মনে রেখে রূপকথা লেখানোর ফরমাশ তাঁরাই শুধু দিতে পারেন, যাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে বহিরারোপিত

নিয়ন্ত্রণের আদর্শে বিশ্বাসী, শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য regimentationএর দ্বারা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে যাঁদের আপত্তি নেই। রূপকথা বস্তুটি যেন দরজী-বাড়ির অর্ডারী জামা—মাপ মিলিয়ে তৈরি না করলে গায়ে দেওয়া চলবে না। আসলে বিজ্ঞানের ভূত এমন ভাবে আমাদের পেয়ে বসেছে যে, তার প্রয়োগকালে আমরা স্থান-অস্থান বিবেচনার কথা ভুলে যাই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ভাল জিনিস, তবে শিল্প-সাহিত্যের কল্পনা-মূলক বিভাগে তাকে নির্বিচারে অনুশীলন করলে শুভের চাইতে অশুভের সম্ভাবনাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। সৃজনী-তৎপরতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসুলভ নিছক যুক্তিবুদ্ধির আধিপত্য কোন শিল্পীই আজ পর্যন্ত স্বীকার করেন নি, ভবিষ্যতেও করবেন না। এমন কি সোভিয়েট রাশায়ও এই সাহিত্যনীতির নামে অনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে স্বতই আমাদের রবীন্দ্রনাথের "একটি অসম্ভব কাহিনী" রচনাটির কথা মনে পড়ছে। "এক যে ছিল রাজা"—রূপকথার এই সনাতন কাহিনীর সূত্রপাতেই যদি এখনকার কালের অতিরিক্ত সেয়ানা বালক শ্রোতা প্রশ্ন তোলে—সে কেমন রাজা, কোথায় তার রাজধানী, তা হ'লে তো যুক্তির হাতুড়ির বাড়ি মেরে গোটা রূপকথার জগৎটাকেই চুরমার ক'রে ফেলতে হয়। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় হাতেখড়ি-প্রাপ্ত জ্ঞানপাপী আধুনিক বালক শ্রোতার পক্ষে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলা অসম্ভব নয়, "রাজতন্ত্র জিনিসটা বড্ড খারাপ, সুতরাং ঠাকুমা, রাখো তোমার রাজার কথা, ওসব রাজা-টাজা এখনকার কালের রূপকথায় আর চলবে না।" এ বলাও যা, ফরমাশ দিয়ে রূপকথা লেখানোর আবদার ধরাও তা। শিশু-সাহিত্য-শাখার সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞানকে রূপকথার মধ্যে গ্রথিত করবার পরামর্শ দিয়ে সৃজনমূলক সাহিত্যের মৌলিক ভাবাদর্শকেই খণ্ডন করেছেন ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

নারায়ণ চৌধুরী

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ২৮৩৮

জন্ম
৫ অগ্রহায়ণ ১২৮৪
[১৯ নভেম্বর ১৮৭৭]

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু
২২ মাঘ ১৩৬১
[৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫]

শনিবারের চিঠি
২৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬১

সর্বেশ্বর

যাঁর প্রকাশে সব প্রকাশে, বিশ্ব যাঁহার কাব্য
ইচ্ছাতে যাঁর সম্ভবপর সকল অসম্ভাব্য,
যাঁহা হতে সূর্য ওঠেন, যাঁহাতে যান অস্ত,
তিনিই আমি, তিনিই তুমি, তিনিই তো সমস্ত।
গ্রহ-উপগ্রহগুলি যাঁর খেলিবার বর্তুল
কল্পে কল্পে করেন লীলা তিনিই স্থূল ও অস্থূল।
নিষ্ক্রিয় সেই মায়াতীত হ'লেও মহামায়া,
চরাচরের প্রাণদেবতা তিনিই আলোকছায়া।
সিনীবালী চন্দ্রকলার মতন অগোচর
ভূত ভবিষ্য বর্তমান নিত্যকালেশ্বর।
তিনিই গড়েন রক্ষা করেন নাশেন তাঁহার সৃষ্টি,
ক্বচিৎ কারেও দেন গো দেখা করেন কৃপাদৃষ্টি।
সেই দয়াময় যেথায় রাখেন, যাহা খাওয়ান পরান,
সহান যে দুখ, বহান যে ভার, যেসব কথা কওয়ান।
যোগান যাহা, ভোগান যাহা নতশিরেই নিও,
মোদের দিয়ে করান তিনি যে কর্ম তাঁর প্রিয়।
বাহ্য জগৎ হারা হয়ে তাঁরেই ধ্যেয়াইও,
ফলের সনে কৃতকর্ম তাঁরেই সমর্পিও।
সদাই ফেরেন সাথে সাথে সেই আনন্দময়,
বিষকেও অমৃত করে তাঁহার বরাভয়।
বুদ্ধি তাঁরে বুঝতে নারে, বুদ্ধি মন তো জড়,
পশ্যন্তী শক্তিতে তাঁর ছোটরা হয় বড়।
চিত্তের অতলস্পর্শে লুকিয়ে আছেন জানি
মৃত্যুপরে পুনর্জাতক শোনে তাঁহার বাণী।
কী নিগূঢ় যোগ রয়েছে সেই অধরার সনে
শেষ হবে এই স্বপ্ন দেখা তাঁহার দরশনে।

প্রেমের ঘটে করলে পূজা জাগেন জগৎস্বামী,
ফাঁকি দেওয়া চলবে না তাঁয় তিনি অন্তর্যামী।
বিবেক বিচার দিলেন মোদের তিনিই বিধানকর্তা,
সংসার-সমুদ্র থেকে তিনিই সমুদ্ধর্তা।
এই অভিনয় লীলা করেন নিরূপ নির্বিকার
ঋষিরা তাঁর নাম রেখেছেন একাক্ষর ওঙ্কার।
নামীর চেয়ে নামটি বড়, জপ নামের মালা,
প্রয়াণকালে নাম স্মরিলে ছাড়বে পান্থশালা।
হও যদি নাম-মন্ত্র-ভ্রষ্ট পাবে চরম শান্তি,
তাঁহার চরণ শরণ বিনা অপর তীর্থ নাস্তি।
প্রথম কবি "চতুরানন" মানব সচেতন
সবিভাজ্য বিষ্ণুরূপে পালেন ত্রিভুবন।
মহেশ্বর শিবের রূপে রুদ্র মৃত্যুঞ্জয়
নটরাজের পটতালে ঘটে গো প্রলয়।
এই সৃষ্টির নাইকো আদি নাইকো অন্ত তার
পূর্ব-পরিকল্পিত সব সৃজেন বারংবার।
তাঁহার লাগি বিবাগীদের পরম প্রসাদ মিলে
চিনে নিও অতিথরূপে দ্বারে দাঁড়াইলে।
সর্বত্রই দেখো তাঁরে ডাক শ্রদ্ধাভরে,
জীবের বুকে বাজলে ব্যথা বাজুক ও অন্তরে।
চিন্তা-সরিৎ যদি কভু অপথ দিয়ে বয়
তাঁহার রথচক্রতলে মরবে সুনিশ্চয়।
নিবু নিবু জীবনপ্রদীপ সলতে জ'লে যায়
শেষের তৈলবিন্দুটি তার নিঃশেষে ফুরায়।
নূতন কিছু দেখলে কোথাও লাগে চেনা-চেনা,
পূর্বে বুঝি দেখেছি তায় ঠিক মনে পড়ে না।
রাত যে প্রভু হয় না প্রভাত ডাকে ফেরুর-দল
পূর্বজন্ম পড়ছে মনে, ঝরছে চোখের জল।

দেখেই চিনি ধর্মক্ষেত্র রক্তিম তীরথ
যে স্থানে পার্থ সারথি চালান বিজয়রথ।
যুদ্ধ জিতে যে পথ দিয়ে মহাপ্রস্থান
'গুপ্তকাশী' 'কর্ণপ্রয়াগ' দেখিতে চায় প্রাণ।
উপেক্ষিয়া 'স্বর্ণকিরীট' পঞ্চভ্রাতা চলে,
পার হয়ে যায় সপ্তধারা জলের কলরোলে।
হাতছানি দেয় তুষারশৃঙ্গ, মৌনে প্রশ্ন করে,
উত্তর দেয় প্রতিধ্বনি অসীম নীলাম্বরে।
পাই শুনিতে পাঞ্চজন্য গাণ্ডীব-টংকার
ব্রহ্ম ভূর্ভবঃ স্বরোম শাশ্বত ওঙ্কার।
শোনবার কান পেলেই তুমি শুনবে তাঁহার জয়,
অকস্মাৎ হবে তোমার সব বন্ধন ক্ষয়।
সর্বভূতের হৃদয়দেশে তাঁরই অধিষ্ঠান,
নামই রূপায়িত হয়ে রসে ভাসমান।
সমাধিতে আপনারে যাও ভুলিয়া যাও,
নিরন্তর স্মরণ কর যদি তাঁরে পাও।
দূর অতীত ভারতবর্ষ পড়বে তোমার মনে
চিনবে তাঁরে; চিনবে কেদার-বদরীনারায়ণে।
একীকৃত হিন্দুভারত সুদূর রামেশ্বরে
দেখবে গিয়ে দেবভাষায় পূজা-মন্ত্র পড়ে।
ভৃঙ্গারে জল ভ'রে নিয়ে গঙ্গোত্রী থেকে
দেয়-ঢালিয়া শিবের শিরে বিল্বপত্র রেখে।
দেখিবে কন্যাকুমারী সমুদ্রস্নান করে
সপ্তঋষি দিব্যনেত্র মেলেন চিদম্বরে।
মাটি ছাড়া চিৎশক্তির ব্যক্ত মূর্তি নাই,
মাটি দিয়াই গঠিত চিন্ময়ীর প্রতিমাই।
মাতা তিনি পিতা তিনি পরাপ্রকৃতি,
এই জীবনেই পারে দ্বিজ নব-জাগৃতি।

চাও না ব'লেই পাও না তাঁরে আবিঃ সন্নিহিত
ভূমি সলিল অগ্নি সত্য সত্যে আকাশ ধৃত।
কাল-কে ফাঁকি দিতে পার হও যদি ধ্যানমগ্ন
উদয় হবে তাঁহার সাথে তোমার মিলন-লগ্ন।
সমস্ত রূপ তাঁহার স্বরূপ সব নামই তাঁর নাম,
তিনিই পরম রমণীয়, তিনিই প্রাণারাম।
সাকারকেই করলে পূজা পূজবে নিরাকারেও
ডাক দিলে তাঁয় পায় ক্ষমা পায় অতি দুরাচারেও।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণানিধানের কবিতা

অল্পদিনের মধ্যে রবীন্দ্র-শিষ্য কবিদের মধ্যে মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, করুণানিধান কবিলীলা সংবরণ করিলেন, রবীন্দ্রযুগের শেষ খ্যাতনামা কবি কাজী নজরুল জীবন্মৃত। দুই-চারিজন যাঁহারা জীবিত রহিলেন, তাঁহারা জরাজীর্ণ।

যতীন্দ্রনাথকে অনেকে রবীন্দ্রশিষ্য বলিতে চাহেন না। যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে সত্য; কিন্তু অন্য সকল অঙ্গে তিনি রবীন্দ্রশিষ্য। রবীন্দ্রনাথের সহিত মোহিতলালের তত্ত্বগত পার্থক্য আছে, অন্য সকল অঙ্গে তিনিও রবীন্দ্রশিষ্য। কাজী নজরুল একটু চড়াগলায় গান ধরিয়াছিলেন এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর একটু বেশি এম্‌ফ্যাসিস দিয়াছিলেন, অন্যথা তিনিও রবীন্দ্রশিষ্য। এই তিনজনের রচনায় স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য আমরা স্বীকার করি।

করুণানিধান ছিলেন পুরাপুরি রবীন্দ্রশিষ্য—দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীরই অনুবর্তী, করুণানিধানের কবিতায় কোন তত্ত্বের বালাই নাই, তিনি রবীন্দ্রনাথের সুরেই সুর মিশাইয়াছিলেন। কখনও গলা চড়াইয়া রবীন্দ্রনাথের সুরকে ছাড়াইয়া উঠিতে চেষ্টা করেন নাই। রচনার কোন অঙ্গে তিনি এম্‌ফ্যাসিস দেন নাই, এ বিষয়েও তিনি গুরুর অনুবর্তী, গুরুর রচনার টেকনিকও তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। তবু তাঁহার রচনাভঙ্গীতে স্বাতন্ত্র্য আছে।

চিত্র ও সঙ্গীত তাঁহার রচনায় অপূর্ব মিলন-সমন্বয় ও ব্যঞ্জনাটক লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ করুণানিধানের কবিতায় রহস্যময় মোহাবেশে পরিণত হইয়াছে—প্রেম তাঁহার রচনায় Passionএর রূপ ধরিয়াছে, আর কবিগুরু বঙ্গ-সাহিত্যে যে নব রোমান্টিক মনোভাবের প্রবর্তক, সেই মনোভাব এই কবির রচনায় স্বপ্ন-বিহ্বলতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজী ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের প্রাধান্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সে ক্ষেত্রে রোমান্টিক কবিদের রচনার আদর বাড়িয়া গেল। এ দেশে রবীন্দ্রনাথ সেই কবিদিগের প্রতিনিধি। ইংরেজী রোমান্টিক সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী এ দেশের শিক্ষিত সমাজে একটা রোমান্টিক মনোভাবের আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই আবহাওয়ায় করুণানিধানের কবিতাগুলি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সিম্বলিক্যাল কবিতাগুলির রস উপভোগ করিতে পারিতেন না, তাঁহারাও করুণানিধানের কবিতাগুলির চিত্র ও সঙ্গীতের অপূর্ব মিলন-মাধুর্য উপভোগ করিতেন।

সেকালের কলেজের ছেলেরা করুণানিধান ও সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তি করিত। তাঁহার প্রেমের কবিতা ওদিকে তরুণ-তরুণীরা আদর্শ প্রেমের কবিতা বলিয়া মনে করিত। সেগুলির কলঝঙ্কারে তাহারা নিজেদের প্রেমমুগ্ধ অন্তরের আবেদনের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইত। সহযোগী কবিরা এই আত্মভোলা, ভাববিভোর, নিন্দা-স্তুতিতে উদাসীন কবিকে কি ভালই না বাসিতেন। করুণানিধানও সহযোগী কবিদের প্রত্যেকের রচনা উপভোগ করিতেন এবং অকপটে অনাবিল উল্লাস প্রকাশ করিতেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে এই একটি মানুষকে দেখিয়াছি, যিনি কখনও কাহাকেও ঈর্ষা করেন নাই, তাঁহাকেও কেহ ঈর্ষা করেন নাই।—এই অনসূয় অকৈতব সহৃদয় কবি কখনও রচনায় বা রসনায়, আচরণে বা বিচারণে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র পীড়া দেন নাই।

বাংলা-সাহিত্যের হিমাচল হইতে যে রোমান্টিক ভাবের বন্যাধারা আসিয়াছিল, ক্রমে তাহা অপসারিত হইতে লাগিল। রবীন্দ্র-প্রবর্তিত রসাদর্শের প্রাধান্যের প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইল। নব্যতন্ত্রের সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্র-প্রবর্তিত রসপ্রবাহকে গড্ডলিকাপ্রবাহ বলিয়া মনে করিলেন; তাঁহারা রোমান্টিক দৃষ্টিকে Conventional মনে করিয়া বৈচিত্র্যের সন্ধানী হইলেন ভাবে ভাষায় ভঙ্গীতে ছন্দে আলঙ্কারিকতায়। সাহিত্যের অগ্রগতি সকল দেশেই Spiral movementএরই অনুসরণ করে।

এ দেশেও তাহাই হইয়াছে—তাহাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কালক্রমে বৃদ্ধ বরজলালের দিন ফুরাইয়া যায়। তরুণ কাশীনাথের প্রতিষ্ঠার দিন আসে।—নব্যতন্ত্রের পাঠক ও লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে উড়াইয়া দিতে পারিল না—কিন্তু রবীন্দ্রশিষ্যদের কাব্যসাধনার মর্যাদা স্বীকার করিল না।

যাহারা বলে, রবীন্দ্রশিষ্যেরা আসল প্রেমের কবিতা লিখিতে পারে না, তাহারা দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সর্বোপরি করুণানিধানের প্রেমের কবিতাগুলি পড়িয়াও দেখিল না। রবীন্দ্রশিষ্যদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ করুণানিধানের কবিতা ক্রমে নব্যবঙ্গে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া গেল। বিস্মৃতপ্রায় হওয়ার অন্য কারণও আছে। সারস্বত যজ্ঞে আহিতাগ্নিকের মত প্রত্যহ সমিধ্ যোগাইয়া না চলিলে এ দেশে মরুত্ত যজ্ঞের হোতাকেও লোকে ভুলিয়া যায়। করুণানিধান যৌবনাবসানের পর কবিতা লেখা বন্ধ করিয়াই দিলেন। মাঝে মাঝে যাহা দুই-একটা লিখিতেন তাহাতে তাঁহার রসগদগদ চিত্তের মুদ্রাঙ্ক থাকিত না। কোন সাময়িক পত্রে তাঁহার কবিতা দেখা যাইত না, তাঁহার কোন পুস্তক বাজারে পাওয়া যাইত না। তিনি কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠী-মজলিসে যাতায়াত করিতেন না, কোন সভায় সভাপতি বা প্রধান অতিথিরূপে তাঁহাকে দেখা যাইত না। কবিপ্রতিষ্ঠার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার কোন চেষ্টাই তাঁহার ছিল না। বিনা আয়াসে বিনা আমন্ত্রণে যে রসপ্রবাহ তাঁহার যৌবনের কুঞ্জতলে আসিয়াছিল, ধ্রুব আশ্রয় না

পাইয়া তাহা ধীরে ধীরে সরিয়া গেল, কবি তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না।

যতদিন ল-কলেজ-হস্টেলের চাকরি করিতেন ততদিন কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বৎসরের অধিকাংশ কাল থাকিতেন, অবসর গ্রহণের পর কলিকাতার বাহিরে বাহিরেই কাটাইতেন। মোটের উপর, সাহিত্য-জগতের সঙ্গে পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল কোন যোগাযোগ তাঁহার ছিল না।

আমরা ভুলি নাই বটে, নব্যতন্ত্রের তরুণ-তরুণীরা তাঁহার কথা ক্রমে ভুলিয়াই গেল, অথচ করুণানিধানই বিশেষ করিয়া তারুণ্যেরই কবি।

যে যৌবনকে তাহারা রাজটীকা দিয়াছে, সেই যৌবন-রাজের সভাকবিকে তাহারা জয়মাল্য দান করিল না।

দেশের লোককে তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার সত্তর বৎসর বয়সের সময় আমরা প্রকাশ্য সভায় সংবর্ধনা দান করি এবং নূতন করিয়া নবরূপে তাঁহার কবিতা-সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা করি। সংকলনের নাম 'শতনরী'। 'শতনরী' নামেই তাঁহার সংকলন বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 'শতনরী' বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর বি. এ. অনার্সে পাঠ্য ছিল।

ইহার পর সাহিত্য-পরিষদে ও দেশের নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁহার সংবর্ধনা হয়। শ্রীমান সজনীকান্ত তাঁহার তিনখানি লুপ্তপ্রায় কবিতা-পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে আবার কলম ধরাইয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার জগত্তারিণী পদক তাঁহাকে দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছে। কবির জীবনের বসন্ত বহুদিন আগে শেষ হইয়াছিল—দীর্ঘনিদাঘের শেষের দিন-গুলি কিয়ৎ পরিমাণে পরিণামরমণীয় হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

আমি সাহিত্যের Spiral movementএর কথা আগে বলিয়াছি। এই Spiralএর আর এক পাক ঘুরিলেই আবার করুণানিধানের কবিতার আদরের দিন আসিবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আজকাল কোন কবির কাব্যবিচারে একটা কোন ism বা

বাদের সন্ধান করা হয়।—যেমন, দুঃখবাদ, মহাসাম্যবাদ, অধ্যাত্মবাদ, দেহাত্মবাদ, বিদ্রোহবাদ, ঘৃণাবাদ ইত্যাদি। কেবল কবিতার চিরন্তন 'বাদ' অর্থাৎ রসবাদকেই বাদ দেওয়া হয়। করুণানিধানের কবিতার ক্ষেত্রে রসবাদ ছাড়া অন্য বাদের আবাদ ছিল না। বহুবাদের বাদানুবাদের পরে শেষ পর্যন্ত রসবাদের প্রাধান্যের দিন আবার ফিরিয়া আসিবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আমাদের দেশে একশ্রেণীর কবি জন্মিয়াছেন যাঁহাদের কবিমানস তাঁহাদের সৃষ্টির চেয়ে ঢের বড়। এই শ্রেণীতে বিহারীলাল, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দদাস ও করুণানিধানের নাম করা যাইতে পারে। বিহারীলালের কবিতা তাঁহার কবিমানসের অসম্যক্ প্রকাশ, দেবেন্দ্রনাথের কবিতা তাঁহার কবিমানসের অবলম্বিত উচ্ছ্বাস, গোবিন্দদাসের কবিতা তাঁহার কবিমানসের অমার্জিত প্রতিরূপ, আর করুণানিধানের কবিতা তাঁহার উদাত্ত গহন কবিমানসের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র। তাঁহার কবিমানসে অপূর্বতর ও প্রভূততর সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। কবি-মানুষটিকে ভাল করিয়া জানিতাম বলিয়া তাঁহার কবিমানসের ঋদ্ধির পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম। বর্তমান যুগের এবং পরবর্তী যুগের সাহিত্যরসজ্ঞেরা সে পরিচয় পাইবে না। যে কয়েকটি কবিতা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে সূক্ষ্মদর্শী পাঠক তাঁহার কবিমানসের অনভিব্যক্ত সম্ভাবনার বিপুলতা অনুমান করিতে পারিবেন। মুগ্ধতার যুগ কাটিয়া গিয়াছে, উপেক্ষার যুগও কাটিয়া যাইবে। তখন তাঁহার অসামান্য সৃষ্টির প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হইবে।

শ্রীকালিদাস রায়

"কর্মে তাঁরে করিলে প্রীত হবে গো তাঁর প্রিয়,
যা কিছু কর ফলের সনে তাঁরেই সমর্পিও,
ভাল হ'লেই বাসেন ভাল, দেখান খেয়া-তরীর আলো;
একান্তে গো তাঁরেই ডেকো তিনিই রমণীয়।"

—করুণানিধান

করুণানিধান

তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কবি—
অনাসক্ত আড়ম্বরহীন,
অক্রোধ, পরমানন্দ
নিরানন্দে কাটায়েছ দিন।
যশ মান আসিয়াছে যাচি।
অগৃহীর ছিলে কাছাকাছি,
তোমার হৃদয়পদ্ম
টলটল অম্লান নবীন।

২

ভাষা তব যাদুকরী,
ইন্দ্রজাল রচে,—নাহি হুঁশ,
আকাশে দেউল তোলে
উড়ায় যে মণির ফানুষ।
স্বপ্ন দিয়ে সত্য গড়ে নিতি,
কল্পলোকে তার অবস্থিতি।
হে গুণী খেয়ালী কবি—
তুমি তার মনের মানুষ।

৩

ভক্ত তুমি ছিলে কি না
মোর কাছে তাহা অপ্রকাশ,
প্রেমিক যে বট তাতে
সন্দেহের নাহি অবকাশ।
রূপকে জড়ায়ে তুমি আছ,
তুমি শুধু ভালবাসিয়াছ
স্বর্গরাজ্যে না হউক
প্রেমরাজ্য তোমার নিবাস।

৪

প্রকৃতির সুধাস্তন্য
বুক ভরি করিয়াছ পান,
প্রীতি হয়ে ভক্তি দেবী
তোমাতে করেছে অবস্থান।
তুমি চিরদিবসের প্রিয় ;—
আত্মীয়ের অধিক আত্মীয়,
সমগ্র নিসর্গ করে
বার বার তোমারে আহ্বান।

৫

সুনিবিড় আনন্দকে
রূপায়িত করেছে ভাষায়।
অপূর্ব বিচিত্র চিত্র
ভ'রে দিলে স্বপ্ন সুষমায়।
তীক্ষ্ণ তীব্র মর্মবেদনাকে,
রেখে গেলে পাপিয়ার ডাকে,
ভাব তব রূপ নিল
অপরূপ হবার আশায়।

৬

তোমাকে প্রণাম করি,
করি আমি সহস্র প্রণাম,
অভিরাম তব স্নেহ—
অবিরাম আমি লভিলাম।
হে বিদেহী, নমো নমো নমঃ
উঠে চক্ষু আর্দ্র হয়ে মম,
হও তুমি চিরযুক্ত—
জয়যুক্ত হোক তব নাম।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাংলা-কাব্যক্ষেত্রে করুণানিধানের দান

গত ৫ই ফেব্রুয়ারি কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্র-সমসাময়িক যুগের আর এক বিশিষ্ট প্রাচীনের অবসান হ'ল। ১৮৭৭ সন থেকে ১৯৫৫—এই দীর্ঘ ৭৮ বৎসর তাঁর জীবনলীলা। এরই মাঝে তাঁর কাব্যকলার বিস্তার এবং রবীন্দ্র-তেজে উদ্ভাসিত আধুনিক বাংলা-কাব্যের বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলে তাঁর স্বকীয় দীপ্তি এক স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। জীবনের প্রারম্ভ থেকে প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী যে কবিকর্ম ও কাব্যশিল্পের জন্ম দিয়েছেন তা স্ব-মহিমায় বাংলা-কাব্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এই দীর্ঘদিনে অজস্র কবিতা তিনি রচনা করেছেন—প্রথম কৈশোর থেকে পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত যে কাব্যপরিমণ্ডল তিনি গ'ড়ে তুলেছেন, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তার মূল্যবোধ যাই হোক না কেন, বিশুদ্ধ রসবিচারে তার সত্যবস্তুকে অস্বীকার করা চলে না। রবীন্দ্র-সমসাময়িক যে কবিগোষ্ঠী, তাকে রবীন্দ্রোত্তর জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার শুধু ভ্রমাত্মকই নয়, সমালোচনার পক্ষেও তা স্বভাবতই একদেশদর্শী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, অতুলপ্রসাদ সেন, প্রমথ চৌধুরী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কালিদাস রায় ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক—এই যে কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্র-সমসাময়িককালে স্ব স্ব বিশিষ্ট প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন—কবি করুণানিধান এঁদেরই শেষ প্রতিনিধি। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, "করুণানিধান সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। কবি বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভক্ত করুণানিধানের কবিতায় ভাষার লাবণ্য, শব্দচয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য, এবং শব্দের সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণ ও রূপ চিত্রিত করিবার শক্তি—এই তিনটি গুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবের দিক দিয়া তিনি যেমন নিছক সৌন্দর্যপ্রীতির কবি, তেমনি ছন্দের অনুযায়ী ভাষা ও ভাবের অনুযায়ী শব্দসঙ্গীত রচনাতেও তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয়

দিয়াছেন, এবং ভাষার ললিত-মধুর ও উদাত্ত-গম্ভীর—দুই সুরেরই সাধনা করিয়াছেন। তথাপি করুণানিধান বাংলা-গীতিকাব্যে যে একটি নূতন ধরনের প্রকৃতি-প্রেম যুক্ত করিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতা ও কবিত্বের প্রধান নিদর্শন।" করুণানিধানের কাব্যের এই যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাষা ছন্দ ও প্রকৃতিপ্রেম—এই ত্রিগুণাত্মক কাব্যকলার বর্ণনায় তিনি রূপদক্ষ শিল্পী, জীবনের রূপকার, কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভাবাবেগের প্রাবল্য তাঁকে কখনো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি, প্রকৃতিকে তিনি ভাষায় চিত্রে ও মূর্তিতে প্রত্যক্ষ ক'রে তুলতে পেরেছেন, এখানে তিনি যতখানি না Wordsworth-ধর্মী তার চেয়ে বড় Tennyson বা রবীন্দ্রনাথের অনুকারী। সেই জন্যই এই রূপায়ণ তাঁর "ফুলের ন্যায় কোমল ও নির্মল, পরিপক্ক ফলের ন্যায় নিটোল ও রসোচ্ছল, এবং মণিগণের মত দৃঢ়সংহত দীপ্তিমান।" এই সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিরাজ করছে ছন্দমাধুর্য। বস্তুত "তাঁহার কাব্য-পাঠকালে মনে হয় শব্দের অক্ষরগুলি পর্যন্ত বর্ণে ও গন্ধে তাঁহাকে মুগ্ধ করে। ভাষা সম্বন্ধে এই অতিরিক্ত সচেতনতায় তাঁহার কাব্যে ভাবের প্রাবল্য অপেক্ষা সৌকুমার্য ও কোমলতাই সমধিক সঞ্চারিত হইয়াছে।"

১৮৭৭ সনের ১৯ নভেম্বর কবি করুণানিধানের জন্ম। তাঁর নিবাস ছিল শান্তিপুর নদীয়ায়। বি.এ. পাস না করতে পেরে তিনি ছাত্রজীবন শেষ করেন এবং ১৯০২ সনে চাকুরিজীবনের শুরু হয়। প্রথমে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসমূহের পরিদর্শক-রূপে কাজ ক'রে ১৯৩৮ সনে অবসর গ্রহণ করেন। ১১ বৎসর বয়সে পঞ্চকোটে পার্বত্য পরিবেশের মধ্যে তাঁর কবিজীবনের উন্মেষ হয় এবং সে জীবন শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৩০৮ সালে দেশপ্রেমমূলক কবিতা-সংগ্রহ 'বঙ্গমঙ্গল' প্রকাশ ক'রে তিনি কবিখ্যাতি পান, তারপর সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনার ফল হিসাবে 'প্রসাদী,' 'ঝরা ফুল,' 'শান্তিজল,' 'ধান-দূর্বা,' 'শতনরী,' 'রবীন্দ্র-আরতি' ও 'গীতারঞ্জন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী

স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে শান্তিপুরে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়, এখানেই তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কবি করুণানিধানকে আমরা অনায়াসেই William Morrisএর মত happy poet আখ্যা দিতে পারি। এ কথার এ অর্থ নয় যে, তিনি আজীবন আনন্দের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন, বরং এর বিপরীতটাই সত্য। সমস্ত জীবন তিনি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছেন, তবু জীবনের সব কিছু ঝড়ঝঞ্ঝা নিরাশাদ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে প্রকৃতিকে এক নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেছিলেন এবং এই জন্যেই তিনি সহজ কথা সহজ ক'রে বলতে পেরেছিলেন। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ, ছন্দ সাবলীল, ভঙ্গী অকপট—তাঁর কাব্যে বিশ্বমানবতার বাণী নেই, মহান জীবনদর্শন নেই, মহৎ বিশ্বতত্ত্ব নেই,—ঘরের কথা, ঘরোয়া কথা, ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথা অকৃত্রিম সরল ভাষায় তিনি বিবৃত করেছেন। সেই বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ফুটেছে তাঁর সুস্থ কল্পনা ও স্বচ্ছ মমতার নিবিড় স্পর্শ। তাঁর দরদী লেখনী বাংলাকে, বাঙালীকে আন্তরিক মমতায় অঙ্কিত করেছে। বঙ্গপল্লীর ছায়াস্নিগ্ধ আম্রকানন, কুমুদখচিত বিল, ডাহুক-ডাকা দীঘি এবং এই শান্ত পরিবেশের পটভূমিতে অনুষ্ঠিত নানা উৎসব-অনুষ্ঠান তাঁর রচনায় যে ভাবে মূর্ত হয়েছে তা সত্যই অতুলনীয়। কিন্তু কেবলমাত্র বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই তাঁকে মুগ্ধ করে নি—তার দুঃখ বেদনা আঘাত অবমাননা তাঁকে ব্যাকুল করেছে। একাধারে কাব্য-সাহিত্যের নানা শাখাকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন—ভাষা তাঁর হাতে নৃত্য করেছে কখনও নটীর মতো, কখনও বা উদাসিনী ভৈরবীর মত, কখনও বা প্রণয়ভীতা কিশোরীর মত। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রবাহের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের মধ্যে থেকেও তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে চলেছেন—তাঁর কাব্যে প্রাণধর্মের ঘরোয়া আবেদনই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থগুলি বাংলা-সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্নরূপে স্মরণযোগ্য। আধুনিক ইংরেজী কাব্যে Bridges, Mare, Davies ইত্যাদি প্রবীণ কবিরা ইংরেজী-সাহিত্যে

যে ধরনের সৌন্দর্যসাধনা করেছেন করুণানিধানকেও আমরা সেই সৌন্দর্যধর্মেরই সমধর্মী বলতে পারি। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—

"জন্মমরণ রহস্যময়,
কিসের লাগি এ অভিনয় ?—
সুর বাজানো জলে-ভরা
কাচের পেয়ালায়।
ওগো আকাশ, ওগো বাতাস,
তোমরা জানো কিছু আভাস,
নিজের সাথে লড়াই করে
হার মানিল রে !" [পঞ্চাশ বছর পরে]

জীবনলীলার এই যে স্নিগ্ধ মরমিয়া দৃষ্টিভঙ্গী, রবীন্দ্রোত্তর যুগে তা ক্রমশই অপ্রতুল হয়ে উঠেছে। একটি ইংরেজী সমালোচনা-গ্রন্থে রবীন্দ্র-সমসাময়িক এই স্বচ্ছ দর্শনকে বলা হয়েছে "Direct and simple response to direct and simple things becomes more and more difficult when our nerves and hearts are continually lacerated by naked and unashamed brutality." সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাতে করুণানিধান প্রমুখ প্রাচীনেরা ক্রমশই পাঠকসমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। কবির শেষ বয়েসেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিমান ছিল। নবযুগের নতুন জীবনদর্শনের নববাণী থেকে তাঁদের জীবনধর্ম ভিন্নধর্মী, কাজেই অবশ্যম্ভাবীরূপেই প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রাচীনের যা সত্যবস্তু তা আমাদের নবযুগে গ্রহণ করতেই হবে। নতুন যুগগঠনে প্রাচীনকে আমরা অবহেলা করতে পারি না : "Not the things we ought, all of us, to bury with the dead past." কবি করুণানিধান আহ্বান জানিয়েছেন—

"কে আছে মোর ব্যথার ব্যথী—ডাকছি তায়
এই দুনিয়া দেয় নি যাহা, দাও আমায়।" [তোমার প্রতি]

অন্যত্র বলেছেন—

"হা মুসাফির, আশার ফকির
ছটফটিয়ে মরিস ঘুরে'—
যায় না জানা সেই ঠিকানা
যেথায় গেলে পিয়াস পুরে।
জেগে-কাঁদার রাত ফুরাবে,
চিতার জ্বালা জুড়িয়ে যাবে,—
বদলে যাবে 'পূরিয়া' তান
ভোরের ললিত-ভৈঁরো সুরে।" [আবছায়ায়]

V. S-West কথিত "Sculptural on the blue, together twined" কাব্যাদর্শের ভঙ্গী আশ্চর্যরূপে এখানে সার্থক হয়েছে। সমালোচক মোহিতলাল তাঁর কাব্যভঙ্গী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তাও সমান প্রণিধানযোগ্য : "এই তড়িৎস্পর্শবৎ রূপরেখাবলী কবি আবিষ্টের মত শব্দপটের উপরে মেলিয়া ধরিয়া ঐকান্তিক তৃপ্তিলাভ করেন; এজন্য গভীর অনুভূতি চিন্তাগভীর হইতে পায় না। তাঁহার অনুভূতিক্ষেত্রে রুদ্র কঠিন বীভৎস বস্তুর স্থান নাই; তার কারণ, তাঁহার প্রাণ প্রকৃতির নিকটে মাধুরী ভিক্ষাই করে,—তাহাকে কল্পনা-বলে জয় করিয়া আত্মচেতনার প্রসার কামনা করে না।"

জীবনের সহজ কথা সরলভাবে ব্যক্ত ক'রে তিনি বিদায় নিয়েছেন। তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে অতিক্রান্ত হ'ল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পুরনো যুগের অবসানের পর এবার শুরু নবযুগের নব আদর্শের নব দৃষ্টি-ভঙ্গীর। আগামী অর্ধ শতাব্দীর যে পদধ্বনি আজ শোনা যাচ্ছে, তারই পটভূমিতে আজকের জীবনের সন্ধিক্ষণ। Barrington Gates-এর কথায় তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা বলা যায়—

"What of this silence, so there stay
Child's laughter to the end of day ?"

শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

৺কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমারে দেখেছি কবি, সৌম্য স্নিগ্ধ প্রসন্ন মূরতি,
পল্লীর শ্যামলকুঞ্জে চিরমগ্ন মৌন তপস্যায়!
বাণীর মন্দিরতলে নিত্য তব নিভৃত আরতি
ভরেছে প্রশান্ত সন্ধ্যা অপরূপ ছন্দ-সুষমায়!
হে অজাতশত্রু বন্ধু, বাঙালীর চিরবরণীয়,
তুমি ছিলে পল্লীকবি সকলের অন্তরের ধন,
ছন্দের বাঁধনে বাঁধি সবারে যে করেছিলে প্রিয়,
তাই তব কাব্যলোক আমাদের একান্ত আপন।
বেদনার ডালি নিয়ে দিলে তুমি অমৃত পসরা,
তব কল্পলোকচ্ছায়ে ডেকে নিলে তৃষার্ত মানবে,
নেচে চলে নির্ঝরিণী ল'য়ে তব বাণী মধুক্ষরা,
আজো বাজে উদ্বোধনী মহার্ণব সে নীলভৈরবে!
কণ্টক-আস্তৃত পথে কণ্টকে যে করেছিলে ফুল,
দিয়েছ গীতার মর্ম, শোকে তাই কর নি আকুল।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন আমি মিরাটে থাকি। ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে আমাদের এক বন্ধু ছিলেন (এখনও বেঁচে আছেন কি না জানি না), যিনি মিলিটারি একাউন্টস্ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতেন, আবার কবি মোহিতলালেরও খুব বন্ধু ছিলেন। এই ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মুখে মোহিতলালের "নাদিরের জাগরণ" "নাদিরের শেষ" প্রভৃতি কবিতা মিরাটে ব'সে আবৃত্তি শুনতাম।

ধীরেনবাবু একবার প্রস্তাব করলেন, চলুন, ছুটি নিয়ে একবার কলকাতা ঘুরে আসা যাক, সাহিত্যিকদের সঙ্গেও আপনার আলাপ করিয়ে দেব।

আমি সানন্দে রাজী হলাম। তখন বয়স কাঁচা, গাঁটের পয়সা

খরচ ক'রে ছুটি নিয়ে সাহিত্য ক'রে বেড়ানোর মত উৎসাহের অভাব ছিল না, দিনকালও এত কঠিন হয় নি।

কলকাতায় এসে জোটা গেল। মোহিতবাবু তখনও ঢাকায় যান নি—সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে একটা বাড়িতে থাকতেন। সজনীবাবু তখনও 'শনিবারের চিঠি' বের করেন নি—বাদুড় বাগান লেনে একটা মেসে থাকতেন এবং কলেজে পড়তেন।

মোহিতবাবুর সঙ্গে কবিরাজ জীবনকালীর কবিরাজখানায় কদিন আড্ডা জমানো গেল।

একদিন ধীরেনবাবু বললেন, চলুন, আজ কবি করুণানিধানের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি—তাঁকে আমার একটা কবিতা শুনিয়ে আসি। (ধীরেনবাবু কবিতা লিখতে পারতেন।) একটু পরে বললেন, কিন্তু আপনাকে আজ দুপুরে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে আসতে হবে, সেখানে কবি করুণানিধানের সঙ্গে দেখা হবে।

তথাস্তু।

দুপুরে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে গেলুম। কবি করুণানিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেসের ইন্‌স্‌পেক্টার বা এই রকম কি একটা চাকরি করতেন ঠিক মনে নেই।

দুপুরে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংসের তিনতলা কিংবা চারতলার বারান্দায় গিয়ে কবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

সদানন্দময় পুরুষ। চেহারায় কথাবার্তায় পোশাকে কোথাও এতটুকু বাহুল্য নেই—একেবারে মাপাজোকা খাঁটি বাঙালী। আড়ময়লা ধুতি, পিরান, পায়ে চটি। যতদূর মনে পড়ে, কানে একটা দেশলাইয়ের কাঠি গোঁজা, তাই দিয়ে কান পরিষ্কার করার কাজ চলে।

ধীরেনবাবু সপ্রতিভভাবেই নিজের আরজি পেশ করলেন, দাদা, আপনাকে আমার একটা কবিতা শোনাতে এসেছি।

দাদার তো চক্ষুস্থির। বারান্দা দিয়ে দলে দলে ছাত্রেরা (তখনও কো-এডুকেশন হয় নি) হল্লা করতে করতে যাচ্ছে এবং আসছে, বেলা দুপুর, ঝাঁ-ঝাঁ করছে চারিদিকে রোদ্দুর, আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ।

মোট কথা কবিতা শোনার বা শোনানোর মত উত্তম কারও হওয়ার কথা নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, কবি রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু গোলমাল বাধল জায়গা নিয়ে—কোথায় ব'সে কবিতা শোনা যায়! যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় কবির কোন পৃথক আপিস-ঘর সেখানে ছিল না, কিংবা সেখানে গিয়ে কবিতা শোনা সুবিধে হবে না ব'লে আমাদের নিয়ে গেলেন না। সেই বারান্দার একান্তে গিয়ে কবি মাটিতে উবু হয়ে বসলেন, একটা বিড়িও যেন ধরালেন মনে পড়ছে, বাধ্য হয়ে কবিতা-পাঠক এবং তার সহকারীকেও মাটিতে উবু হয়ে বসতে হ'ল। অতঃপর কাব্য শোনানোর চেষ্টা হ'ল। কবি শুনে প্রশংসাই করলেন।

সেদিন ঘটনাটির পুরো তাৎপর্য বুঝতে পারি নি, আজ পারি। কবি কি সাহিত্যকে কোনদিন অনাদর করতে পারেন? কেউ তাঁকে কবিতা শোনাতে চেয়েছে, জায়গার অপ্রতুলতার জন্য কিংবা সময়ের অনুপযোগিতার জন্য তিনি কি তাকে নিরাশ করতে পারেন? তা হ'লে তো দেবী সরস্বতীকেই বিমুখ করা হবে।

অথচ কবির চরিত্রের একটা দিকও এই ঘটনার আলোকে একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায়। সাহিত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা। এমন কোন ঘটনাই হতে পারে না, যাতে সাহিত্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য বিচলিত হয়। তাঁর স্বভাবের মাধুর্যও প্রমাণিত হয়। এমন মিষ্টি স্বভাব ছিল ব'লেই তাঁর কাব্যে শব্দচয়নের এমন মিঠা বেলোয়ারি সুর কান জুড়িয়ে দেয়।

ঘটনাটি ছোট, কিন্তু আমার স্মৃতিপটে ছোট হয়ে নেই।

তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। কি আরও বেশি।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

—

"মরমাহত সাঁঝের পাখি পেয়েছে ভালবাসা,
এ ঋণ আমি শুধিতে পারি, না করি হেন আশা,
এ চন্দন-সুরভি মোরে নন্দিয়াছে গরবী ক'রে
কুজনহীন কণ্ঠে মোর ফুরে না কোন ভাষা।"

—করুণানিধান

কবি করুণানিধান

যুগের চাহিদা নিয়ে ওড়াও নি কথার ফানুস,
স্বপ্নে ওঠে গুঞ্জরিয়া তোমার আকাশচারী মন।
নতমুখী যে মেয়েটি দীপ জ্বালে তুলসীতলায়
অশ্রুসিক্ত হ'ল আজ অলক্ষিতে তাহারও নয়ন!

পরিপূর্ণ দৃষ্টি ল'য়ে নিরখিয়া বিশ্ব-প্রকৃতিরে
পান করেছিলে তার রূপ-রস-গন্ধ তিলে তিলে।
গ্রাম-বাংলার এই ছায়াঘন স্নিগ্ধ শ্যামলিমা
সমস্ত অন্তর দিয়া সঙ্গোপনে ভালবেসেছিলে।

আজ তব কাব্য পড়ি একযোগে আমি আর প্রিয়া,
কখন এসেছে কাছে অকস্মাৎ মনের ফাল্গুন,
গোপন কন্দরে ছিল ভক্তের করুণ আতিটুকু
বঙ্গভারতীর গলে হ'ল তাই প্রসাদী-প্রসূন।

রসিকের চিত্তে জেগে রবে তব স্মৃতির সুরভি,
হুজুগের কবি নও, তুমি ভরা বসন্তের কবি।

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

রূপদক্ষ করুণানিধান

কবি করুণানিধানের সপ্তর বৎসরের সম্বর্ধনা-উৎসবে কবি-সমালোচক মোহিতলাল একটি কবিতার মাধ্যমে করুণানিধানের কাব্য-জগতের এক আশ্চর্যসুন্দর পরিচয়-চিত্র এঁকেছিলেন। সংক্ষিপ্ত অথচ গূঢ় ভাষণে সেই অংশটি করুণানিধানের কবিস্বপ্নের যথার্থ পরিচয়বাহী হয়ে উঠেছে—

"জমিছে সবুজ ঘাসে এখনো সে ব্যাকুল বকুল,
দামিনী তেমনি নাচে, মেঘে তাই বাজে পাখোয়াজ;

ভালে কোহিনূর টিপ, ঝিলিমিলি রেশমী দুকূল—
নামে সন্ধ্যা তালীবনে, পাখী করে কাঁকণ-আওয়াজ!
রূপার ফলক তোলে চন্দ্রকর তালের বাকলে,
মুঠি ভরি জ্যোৎস্না ধরে কে তরুণী লতাকুঞ্জতলে;
প্রভাতে গিরির শিরে—দেখ দেখ কে গিয়েছে ফেলি—
কি সুন্দর!—যেন সে ময়ূরকণ্ঠী কুয়াশার চেলী।"

করুণানিধানেরই বিক্ষিপ্ত রূপ-কণিকা সঞ্চয় ক'রে মোহিতলাল ফুটিয়ে তুলেছেন কবির রাগরক্ত বাসনালোক। করুণানিধানের কাব্যজগৎ এমনই এক দুর্লভ কল্পবাসর। এখানকার বস্তু অংশের সমস্ত রূঢ়তা গীতিস্পন্দের মায়ামন্ত্রে বিগলিত হয়। নিজেরই রচিত এই রূপ-নিকেতনের মাঝখানে এসে কবি আত্মবিহ্বল হয়ে পড়েন।

করুণানিধানের রূপলোক রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত সেই "বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর।" করুণানিধানের রসলোকেই বস্তুকে নির্যাসে পরিণত করার ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতার মূলে রয়েছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা, অথচ এই ক্ষমতা কত সূক্ষ্ম ও মনোময়! জাগর-চৈতন্যের সীমান্তরেখায় যে আস্বাদন-অভিরুচি তা যেন—

"When the light of Sense
Goes out but with a flash that has revealed
The invisible world;"

করুণানিধান সেই আস্বাদনের কবি। এখানে বুদ্ধি ও বোধ কোনটিই সত্য নয়—এ যেন ব্যক্তিবিবর্জিত অলস-তন্ময়তার এক কবিভাষ্য। "প্যাশান" শব্দটির মধ্যে ব্যক্তি ও মানবিক সম্পর্ক পরিস্ফুট, করুণানিধানের এই রূপতন্ময়তা গূঢ়রক্ত প্যাশান-এর আলোড়ন নয়, অথচ এতে মৃদু আন্দোলন ও লীলাস্পন্দনটুকুর লাবণ্য সুখাবহ। বর্ণ-গন্ধ-সুরময় জগতের দর্শক হয়েও কবি ভাবস্থির ও মৌন-তন্ময়। ইংরেজ কবির স্বপ্ন-জাগরণের দ্বন্দ্বও যেমন নেই, তেমনি নেই ক্ষণ-ভঙ্গুরতার হতাশা, তাই তিনি বলতে পারেন না—

"Was it a vision, or a waking dream ?
Fled its that music :—do I wake or sleep ?"

তার বদলে বাংলা দেশের এই রূপরসিক বলেন—

"তাদের চুলের ফুলের বাসে গন্ধ হারায় গোলাপ বেলা।
কে অপ্সরী সারেঙ বাজায় কি অপরূপ সুরের খেলা।
নিদাঘ রাত্রে রাখাল ছেলে চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে
স্বপ্ন শোনে নূপুর তাদের গুঞ্জরিছে মেঘের কোলে।"

[স্বপ্নলোকে]

কবি এতই ভাবালস যে, সর্ব প্রকার জিজ্ঞাসার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছেন—এতই মগ্ন এই কবি। এই আত্মনিমগ্নতা কবিকে বিক্ষুব্ধ হতে দেয় না। অথচ কবির স্বপ্নও নাকি মানুষেরই মত শুনতে পায়—তার কারণ করুণানিধান স্বপ্নৈক-জীবি[illegible] তাঁর স্বপ্ন কানে শোনে, চোখে দেখে; এমন কি নিজের[illegible] বিজন পথে মাঝে মাঝে পথ হারিয়েও ফেলে—"পথের জ্যো[illegible] আমারে, কাঁপে প্রাণ-পারাবত।"—এই স্বপ্নকেই নিয়ত উ[illegible] সুরের সুরা—

"উড়োপাখীর সুরের সুরায় সরল তরুর আবছা,
প্রবাল-বরণ-বৈকালে আজ কোন্ পাষাণী গান গাহে ?" [তন্দ্রাপথে]

দৃশ্যমান বিশ্বের অতীত তীরের পরীদের খেলার প্রাঙ্গণই কবির স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র—করুণানিধানের কবিতার অপসর-স্বপ্ন এক পূর্ণমুক্ত আনন্দলোকের দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। জগতের যত মূর্তি তার প্রত্যেকটির নেপথ্যে আছে একটি আদিম ভাবচ্ছবি—কবি ছুটেছেন সেই আদি ভাবসত্তার দিকে,—সেই আদিম ভাবসত্তাই তাঁর কাব্যে সুরের আলপনায় চিত্রিত হয়ে রূপবান হয়েছে।

করুণানিধানের অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ় বয়সের কবিতায় প্রকৃতিপ্রীতির মধ্যে এক আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি সঞ্চারিত হয়েছে। প্রথম বয়সের প্রেয়সী-রূপিণী প্রকৃতি অথবা প্রকৃতরূপিণী প্রেয়সী কবিকে যে অর্থে বিহ্বল করেছিল, এখানে ঠিক সেই ভাবে বিহ্বল করে না। তীর্থ-গ্রথিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের দেবস্থান পরিক্রমা করে কবি এক বিরজ-

বিশুদ্ধ রূপের অধিকারী হয়েছেন—বিশ্বসৌন্দর্য স্বরলোকের অপার্থিব রূপে মূর্ছিত :

"নিম্নে সানুতে কর্পূর-শ্বেত ধূপ-ধূম্রের ভেলা ;
দেবাঙ্গনার অলকে নূপুরে তরল-রূপালি-খেলা।" [হিমাদ্রি]

তীর্থ-পরিক্রমার কবিতাগুলিতে যে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি-চিত্র আছে তার প্রতিটি অনুভবই এই অমৃতপিপাসায় পূর্ণ। প্রাচীন পৌরাণিক জগৎকেও অপরূপ রোমান্সরসে পূর্ণ ক'রে তোলেন কবি—কারণ করুণা-নিধানের কাছে এই তীর্থ রূপতীর্থও বটে। "শ্রীক্ষেত্রে" কবিতায় সমুদ্র-বর্ণনায় অপরূপ পৌরাণিক রোমান্স সৃষ্টি হয়েছে—শব্দ-ধ্বনি ও রস-ধ্বনির বাঞ্ছিত মিলনে এক 'Mytho-poetic imagination' মূর্ত হয়ে ওঠে—

"কোন্ উপ[illegible]বঙ্গফুল-পরিমলে বায়ু ফুল্ল ?
দ[illegible]বনে অপরূপ পাখী
করাল কপালে জলধনু আঁকি
মন্দ-দোদুল তরুর তোরণে চন্দ্রহারের তুল্য।" [শ্রীক্ষেত্রে]

ভারতবর্ষের এই তীর্থ-পরিক্রমার ভিতর দিয়ে কবি পেয়েছেন সুপ্রাচীনকালের এক ঐতিহ্য-লালিত জীবনধারা। কিন্তু এই প্রাচীন জীবন-মানসের সুদীর্ঘ বর্ণনা অতিরিক্ত তথ্যবহ হয়ে ওঠে নি—কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও কালিদাস রায়ের এই শ্রেণীর কবিতায় অনেক সময় তথ্যের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে রসের হানি ঘটেছে। করুণানিধানের মনের গঠনই স্বতন্ত্র, তাঁর রোমান্টিক অতীতচারণা তাঁর কবিতাকে ভারাক্রান্ত না ক'রে ঐতিহ্যকেই রসে পরিণত করেছে। রোমান্টিক মুক্তকল্পনার সামনে ক্ল্যাসিকাল রীতির বন্ধনে কবির রূপরচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা "রেবা"। প্রাচীন কবি-কথিত পুরাকাহিনীটিকে কবি নূতন ক'রে সৃষ্টি করেন—এই সৃষ্টির ক্ষমতাতেই করুণানিধান যথার্থ 'রূপদক্ষ'—

"পৌর্ণমাসী অর্ধরাতে, জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রালসে অলিন্দের পরে,
দ্রাক্ষারসে টলমল স্বর্ণপাত্রে শশি-বিম্ব চুম্বিত অধরে।

আবর্ত-শোভন-নাভি অলঙ্কৃত কটিতট হংস-মেখলায়—
কোথায় রূপসী রেবা ভুলাইলে কালিদাসে যৌবন-বিভায় ?" [রেবা]

মণ্ডনশিল্পে ও রসধ্বনিতে পুরাতনী নায়িকার যে লাবণ্যশ্রী ফুটে ওঠে তা কোন বিশেষ ভৌগোলিক চিত্র নয়—এমন কি এ চিত্র কালিদাসেরও নয়। কিন্তু প্রকৃতিকে দেখার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী যেমন খাঁটি ক্ল্যাসিকাল ভাবের পরিচায়ক, তেমনি রূপমন্দিরতায় এ ছবি কবির নিজস্ব। লাবণ্য আছে ব'লে এ চিত্র sensual হতে পারে নি। রূপগোস্বামী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে লাবণ্য সম্পর্কে বলেছেন:—"মুক্তার রূপের ভঙ্গী নিষ্প্রভ, যদি না তাহাতে লাবণ্যের দীপ্তি থাকে। তেমনি চিত্রের রূপ এবং প্রমাণ এবং ভার সকলই নিষ্প্রভ, যদি না এই তিনে লাবণ্য আসিয়া দীপ্তি দেয়" [অবনীন্দ্রনাথের অনুবাদ]। করুণানিধানের কবিতা সেই লাবণ্যের অধিকারী, তাই কোথায়ও অসংযত রূপ নেই। চিত্র-সম্পর্কে লাবণ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ক'রে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলেন, "লাবণ্য চিত্রের ভিতরে সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে অথচ আড়ম্বরটি তাহার সর্বাপেক্ষা কম। লাবণ্য নিজে শুদ্ধা এবং সংযতা, সুতরাং যাহাকেই স্পর্শ করেন তাহাকেই বিশুদ্ধি দেন, সংযম দেন।"

সমকালীন কবিদের মধ্যে করুণানিধানই একমাত্র কবি, যাঁর কাব্যে বর্তমান-জীবনের মালিন্য ও সমস্যার কাঁটা নেই। করুণানিধানের গার্হস্থ্য জীবন ও পল্লীচিত্র বর্ণনা থেকেই তাঁর এই স্বরূপ-প্রকৃতিটি উপলব্ধি করা যায়। কবি ক্ষয়িষ্ণু পল্লীর চিত্রকার নন—প্রাচুর্য-আনন্দ যেদিন পল্লীর নিরাভরণ সৌন্দর্যকে পূর্ণ ক'রে রেখেছিল—করুণানিধান সেই সৌন্দর্যেরই মুগ্ধ পূজারী। তাই কোথাও ক্লান্তি, অপূর্ণতাজনিত চিত্তক্ষোভ তাঁর কবিতায় নেই। কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের কবিতায় যন্ত্র-যুগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ও একদা-সমৃদ্ধ পল্লী-জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতায় যে বেদনাবোধ আছে, করুণানিধানের কবিতায় সে সুর একেবারেই নেই। কবিশেখর কালিদাস রায় যথার্থই বলেছেন, "আধি-জীবনের কবি তিনি নহেন, অধি-জীবনের কবি তিনি।"

করুণানিধান কতকগুলি কাহিনীমূলক কবিতা লিখেছেন। কিন্তু এই জাতীয় কবিতা ঠিক করুণানিধানের কবি-মানসের স্বরূপধর্মের অঙ্গীভূত নয়। উচ্চতর কবি-প্রতিভা অথবা গীতিধর্মিতা থাকলেই এই জাতীয় গীতি-আখ্যায়িকা রচনা করা সম্ভব নয়,—কাহিনী-রচয়িতারও কিছু ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন। কাহিনী-বিন্যাস, গ্রন্থন ও সংযোজন-নৈপুণ্য না থাকলে একটি প্রথম শ্রেণীর কাহিনী-কবিতা রচনা করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-কাব্যের কবিতাগুলিতে কাহিনী ও সঙ্গীতের এক দুর্লভ মিশ্রণ হয়েছে। করুণানিধানের এই শ্রেণীর কবিতায় তেমন গ্রন্থন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। "বাদশাজাদী" কবিতায় জেবুন্নিসার প্রেম-জীবনের একটি সুপ্রচলিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কাহিনী-রস তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি, মোহিতলালের অথবা সত্যেন্দ্রনাথের বাদশাহী রোমান্স-চিত্রণের বর্ণাঢ্য গরিমা ও গ্রন্থন-নৈপুণ্য এখানে নেই। সুতরাং এই জাতীয় কবিতা করুণানিধানের কবি-প্রকৃতির স্বভাব-বিরোধী।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল করুণানিধানের কবিতা-প্রসঙ্গে বলেছেন, "করুণানিধানের কবি-জীবনে একটা অকাল-বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাঁহার কবি-মানস অভিক্রুত অবসাদ-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে।" করুণানিধানের কবি-জীবনের এই "অকাল-বিপ্লব"-এর কারণ কি? এই পট-পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত তাঁর কবি-জীবনের মূল প্রকৃতির মধ্যেই পাওয়া যায়। অপরূপ রূপলোকের দর্শক এই কবি শুধু রূপের মধ্যেই তৃপ্তি বা পূর্ণতার স্বাদ খুঁজে পান নি। তাই অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে, রূপজগতের উপরে আর এক দ্বিতীয় জগতের ছায়া পড়েছে—বিশ্ব-প্রকৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে কবি-কণ্ঠ আকস্মিকভাবে থেমে গেছে—কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি তাঁর কণ্ঠ থেকে গান কেড়ে নিয়েছে। পদ্মাতীরের নিভৃত সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে করতে আকস্মিক-ভাবে কবি-কণ্ঠ ভয়ে বিস্ময়ে পুলকে বেদনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—

"ঢাকিল মলীতে মানস-কানন,
যা কিছু আছিল আঁখি-রঞ্জন—

আঁধারে বিধুর ধুধু করে মাঠ
কাঁপিল আকাশে উদাসীন ঠাট
কে আছে স্তব্ধ দাঁড়ায়ে।" [পদ্মা-তটে]

রূপ-জগতের পরপারবর্তী আর এক দ্বিতীয় জগৎ কবির কাব্যে প্রবেশ করেছে। এই দ্বিতীয় জগতের স্বপ্নই কবির রূপলোকের বিরোধ হয়ে উঠেছে। অনুশোচনায় ও আত্মগ্লানিতে কবি ছুটেছেন তীর্থময় ভারতবর্ষের দিকে দিকে। কোন কোন কবিতা আধ্যাত্মিক রসে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কারণ সেখানে আধ্যাত্মিকতা ও রূপতন্ময়তার কোন বিরোধ ঘটে নি; কিন্তু আবার কোন কোন কবিতায় এই দুই অনুভবের বিরোধ চলেছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাই কাব্যাংশে দুর্বল। আসল কথা, করুণানিধানের কাব্যে যে পরিমাণ সূক্ষ্ম ও অতিপেলব সংবেদনশীলতা, সেই পরিমাণ "শক্তি" নেই, যে শক্তি 'গীতাঞ্জলি'-পরবর্তী যুগের রবীন্দ্রনাথের, যে শক্তি যি টলস্টয়ের দ্বন্দ্বরিক্ষুব্ধ ভাবজীবনের। করুণানিধানের প্রতিভা বাউলের একতারার মত, একটি সুরেরই তিনি সাধক, তাই আর একটি সুর যখন আসে তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে প্রথমোক্ত সুরটি অন্তর্হিত হয়—দুটি সুরই পাশাপাশি থাকতে পারে না।

নিভৃত-চরিত এই কবি রূপজগতের সাধনা করেছেন—বর্ণগীতগন্ধ-মন্থর সেই জগৎ—এমনি ক'রেই রূপ-জগৎ পার হয়ে অরূপ-জগতের এক রহস্যময় অনুভূতি ভক্তিস্নিগ্ধ উপচারে বরণীয় হয়ে উঠেছে। তবুও উভয় ক্ষেত্রেই রূপ-রচনায় তিনি সিদ্ধ। কুণাল জাতকে আছে, কামলোকের পর রূপলোক, তারপরে অরূপলোক। করুণানিধান রূপলোক থেকে অরূপলোকের তীর্থপথিক হয়েছেন—এইটিই সম্ভবত তাঁর কবি-চরিতের নিয়তি, কিন্তু কবি-ভাষণ ও রূপ-রচনার ক্ষেত্রে তিনি যথার্থই রূপদক্ষ।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী

(শ্রীরামপুর বনফুল-সাহিত্য-সমিতির সভা উপলক্ষে রচিত)

পঞ্চবটী-বেদীতলে আবির্ভাব যে দেব-আত্মার,
তুমি তাঁর ধর্মপত্নী, প্রণমি চরণে দুজনার।
প্রণমি তোমারে শ্রীমা, গণো নাই আপন বা পর,
দেশে দেশে সেবা-মঠে অকৃপণ তোমার শ্রীকর।
মাতৃসম গুরু নাই, তাই মোরা মিলি' গুরুভাই
যুগধর্ম-সংস্থাপনে তোমার বন্দনা-গীতি গাই।
জয়রামবাটী থেকে পদব্রজে এসেছ জননি,
পথে কত দস্যুহানা, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপও করো নি।
স্থূল-দেহ ধরি' ভক্তে ঠাকুর যে দেন দরশন,
তৎক্ষণাৎ ক্ষয় পায় সাংসারিক মোহের বন্ধন।
জ্ঞান ক্রমে সূক্ষ্ম হয়ে পরিণত ভক্তির অমৃতে ;
এই চিত্ত-শুদ্ধি-করী দীক্ষা মোরা পেয়েছি নিভৃতে।
পতি এসে পূজে তোমা, নিলে তাহা ষোড়শী-মূরতি,
সর্বার্থ-সাধিকা ছিলে, তুমি তাঁর পরমা শকতি।
'না দেখিবে পরদোষ'—এই তব জীবনের বেদ,
সর্বত্র সমদর্শন, মানুষে মানুষে নাহি ভেদ।

১২ই পৌষ ১৩৬০ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

—

"গৃহে গৃহে মনান্তর, বাদ, বিসংবাদ,
নাই সে সরল হাসি, আমোদ-আহ্লাদ,
আছে শুধু পিশাচের ভৈরব উৎসব,
ক্ষুদ্র স্বার্থখণ্ড ল'য়ে বীভৎস বিপ্লব!
আসিয়াছে দুঃসময়, বড় দুঃসময়—
স্তম্ভিত হইয়া আছে আসন্ন প্রলয়।"

—করুণানিধান

ডানা

১৩

ডানা কবির বাড়িতে যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্তে এসে সে পৌঁছেছিল—যদিও তাতে নূতনত্ব কিছু ছিল না, নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে এ কথায় চমক-লাগানো অভিনবত্ব কিই বা থাকতে পারে, কিন্তু তবু এই আলোচনার ঘোরটা কিছুতেই যেন কাটতে চাইছিল না তার মন থেকে। ক্ষিধে পেলে খাবারটা পছন্দসই কিনা তা ভাববার অবসর থাকে না অনেক সময়, যা পাওয়া যায় তাই খেতে হয়, ক্ষিধের মুখে অখাদ্যও ভাল লাগে, তাই সন্ন্যাসী বলছিলেন—যে পথ সামনে পেয়েছ সেই পথেই চল। চলতে চলতে নিজেই বুঝতে পারবে পথটা তোমার মনমত কিনা। পথই তোমাকে নূতন পথের সন্ধান দেবে, নূতন বিচারের প্রেরণা জোগাবে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কবির বাড়িতে এসে হাজির হ'ল সে। হাজির হয়েই অর্থাৎ কড়া-নাড়ার আগেই মন্দাকিনীর কথা মনে পড়ল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। মনের রঙটা বদলে গেল একেবারে, কল্পনা-বীণায় বেজে উঠল নূতন সুর। বকুলবালার মত মন্দাকিনীও অপ্রত্যাশিত কিছু হবেন নাকি! হঠাৎ মনে হ'ল, মন্দাকিনী লেখাপড়া জানেন কি? আনন্দবাবুর কবিতা পড়েন কি? সহসা লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। আনন্দবাবু তাকে লক্ষ্য ক'রে যে সব কবিতা লিখেছেন তা যদি ওঁর নজরে প'ড়ে থাকে···। কয়েক মুহূর্ত অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে সে কড়া নাড়ল। কপাট কিন্তু খুলল না। কবি দোতলায় নিজের ঘরে তন্ময় হয়ে ব'সে ছিলেন, কড়া নাড়ার শব্দ তাঁর কানে গেল না। মন্দাকিনী রান্নাঘরে মৈথিল ঠাকুরটার সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তিনিও কিছু শুনতে পেলেন না। চাকরটা ছিল না, তাকে মন্দাকিনী বাজারে পাঠিয়েছিলেন সা-জিরে আনবার জন্যে। ডানা নিরামিষ খায় শুনে তিনি নানারকম নিরামিষ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে সোৎসাহে লেগে পড়েছিলেন এবং ঠিক এই কারণেই ডানার সম্বন্ধে একটু সশ্রদ্ধও হয়েছিলেন তিনি। লেখাপড়া-জানা বর্মী মেয়ে মাছ-মাংস খায় না, এটা

যেন বাঘের গায়ে কালো-ডোরা-নেই জাতীয় আশ্চর্য খবর মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। তা ছাড়া আর একটা বড় কথা, আনন্দবাবুও প্রশংসা করেছেন মেয়েটির। উনি যার-তার প্রশংসা বড় করেন না। মোষের মত মোটা একটা মেয়ে কিছুদিন আগে ওঁর পিছু নিয়েছিল, যখন উনি প্রফেসারি করতেন। এক গাদা পদ্য নিয়ে এসে প'ড়ে প'ড়ে রোজ শোনাত ওঁকে। মুখখানা কাছিমের পিঠের মত, তার উপর বড় বড় হলদে হলদে ফাঁক ফাঁক দাঁত, মুখে সর্বদা পেয়াজ-রসুনের গন্ধ। চুল ফাঁপিয়ে, হাত-কাটা জামা প'রে, কত ঢঙ ক'রেই যে আসত! আসতে যেতে পেন্নাম। কিন্তু তবু উনি আমোল দেন নি তাকে। এলে বিরক্তই হতেন। তাঁর দূরসম্পর্কের ছোট বোন জবাও ফষ্টি-নষ্টি করবার চেষ্টা করেছিল তাঁর সঙ্গে শালী হিসেবে, কিন্তু ওঁর গাম্ভীর্যও টলাতে পারে নি, প্রশংসাও কুড়োতে পারে নি। আড়ালে বলতেন, মেয়েটা ডেঁপো। জবা সুন্দরী ছিল, কিন্তু উনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। তাঁর মত লোক যখন বলেছেন যে, মেয়েটির রূপও আছে, গুণও আছে, তখন সে কথা মূল্যবানই মনে হয়েছিল মন্দাকিনীর। তিনি বাইরে স্বামীর যত রূঢ় সমালোচনাই করুন, মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন খুবই। এত বয়েস হয়েছে কিন্তু শিশুর মত সরল, নিজের কাপড়জামাটা পর্যন্ত সামলাতে পারেন না, কখন কোথায় কোন্ কথা বললে মানাবে জানেন না, ফট ক'রে বেমানান হয়তো ব'লে বসলেন একটা কিছু, এ-সবের জন্যে অনেক বকা-ঝকা, অনেক অশান্তি সৃষ্টি তিনি করেছেন, কিন্তু ওই সরলতার জন্যেই ওঁকে শ্রদ্ধাও করেন। আসল কথা, মন্দাকিনীর মনটা এসে থেকেই খুব খুশি হয়ে আছে, সেই জন্যেই সব কিছু ভাল লাগছে তাঁর। তিনি এখন সামান্য মাস্টারের স্ত্রী নন, এত বড় জমিদারির সর্বেসর্বা ম্যানেজারের স্ত্রী, এই ব্যাপারটা তাঁকে খুশির সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়েছে। মল্লিক মশায়ের বউয়ের গুমরটা যে ভেঙেছে, এতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করেছেন। জগু মোক্তারের স্ত্রীও পরশু ঘটা ক'রে বেড়াতে এসেছিলেন—আগে কখনও আসতেন না, দেখা হ'লে কথাও কইতেন না। এখন মুখে কথার খই ফুটছে! রূপচাঁদবাবুও এসেছিলেন দুবার। আগে এত ঘন ঘন

আসতেন না। স্বামীর আয় বাড়াতেই শুধু নয়, পদমর্যাদা বৃদ্ধি হওয়াতে মন্দাকিনীর যেন নবজন্ম হয়েছে। স্বামীকে তিনি পাখী দেখতেও উৎসাহ দিচ্ছেন আজকাল। জমিদারের যখন পাখী দেখার বাতিক আছে, তখন পাখীদের খবরাখবর রাখলে তিনি খুশি হবেন নিশ্চয়, আর তিনি খুশি হ'লে চাকরির বনিয়াদ ক্রমশ পাকা হবে—এই তাঁর যুক্তি। ডানা মেয়েটিও এই পাখী-তদারকের কাজে নিযুক্ত হয়েছে শুনে ডানার প্রতি একটা আত্মীয়সুলভ মনোভাব হয়েছিল তাঁর। মহা উৎসাহে তার জন্যে রান্না করছিলেন তিনি।

তৃতীয় বার একটু জোরে কড়া নাড়ার পর ফল হ'ল। মৈথিল ঠাকুরটি এসে কপাট খুলে দিয়ে আধা-বাংলা আধা-হিন্দীতে অভ্যর্থনা করলে, আসেন মাইজী, ভিতরে আসেন—

ব্যাপারটা কবিরও কর্ণগোচর হয়েছিল। তিনি নেবে এলেন। মন্দাকিনীও কড়াটা নাবিয়ে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। লণ্ঠনটা তুলে ধ'রে ডানার মুখখানি ভাল ক'রে দেখে একমুখ হেসে বললেন, হামই ডানা নাকি! একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। এ যে আমার শঙ্করী গো—

ডানার মধ্যে নিজের মেয়ে শঙ্করীকে দেখে মন্দাকিনী বিগলিত হয়ে পড়লেন একেবারে। কবি কোনও কথা বললেন না, স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু। মন্দাকিনীর আড়ময়লা কাপড়ে হলুদের দাগ লেগেছিল একটু, মাথায় টাক পড়েছিল সামনের দিকটা, কপালে গালে কালো কালো দাগ পড়েছিল, দেহ শীর্ণ, গায়ে সেমিজ পর্যন্ত নেই, কিন্তু তবু মন্দাকিনীকে খুব ভাল লাগল ডানার। তাঁর স্নেহমাখা মুখের দিকে চেয়ে নির্ভয় হ'ল যেন সে। ঝুঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে তাঁকে। প্রণাম করতে গেলে অনেকে যেমন মৌখিক লৌকিকতা ক'রে 'হাঁ-হাঁ' ক'রে ওঠেন, মন্দাকিনী সে সব কিছু করলেন না। তাঁর প্রাপ্য প্রণামটা নিয়ে তার চিবুকে হাত দিয়ে নিজের আঙুলগুলি ঠোঁটে ঠেকিয়ে আলগোছে চুম্বন করলেন। তারপর আশীর্বাদ করলেন, সতীলক্ষ্মী হয়ে দীর্ঘজীবী হও। ডানার মনে হ'ল, মস্ত বড় একটা সম্পদ পেয়ে গেল সে

অপ্রত্যাশিতভাবে। তাকে এমন ক'রে আশীর্বাদ কেউ কখনও করে নি। তার দেহমন স্নিগ্ধ হয়ে গেল যেন।

রান্নার এখনও একটু দেরি আছে। তোমরা ওপরে ব'সে ততক্ষণ লেখাপড়া কর। ঠাকুর, তুমি বেরিয়ে দেখ একটু, হরিয়া মুখপোড়া দু আনার সা-জিরে আনতে গিয়ে যুগ কাবার ক'রে দিলে। ঠিক মোড়ে বিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে মুখপোড়া।

ডানাকে নিয়ে কবি উপরে উঠে গেলেন।

আমার কাজ প্রায় হয়ে এসেছে। তুমি ততক্ষণ আমার কবিতার খাতাটা ওলটাও। শেষের দিকে দেখ, কয়েকটা নূতন কবিতা লিখেছি।

ডানা খাতা ওলটাতে লাগল। কয়েকটি নূতন কবিতা চোখে পড়ল।

টিয়া

ওরে টিয়া তোকে যদি বলি কলাগাছ
ঠোঁটটি তা হ'লে তোর মোচা,
কিন্তু যে কবি তোকে কলাগাছ বলবে
সে কবি নিতান্তই ওঁছা।

তুই কি রে সবুজের জয়-গান
তাই কি কোরাস্ ধরে যত বন-ময়দান
যোগ দিয়ে পাখার সঙ্গে
এসে কি মিশল তার অঙ্গে।

সবুজ হতে না পেরে চুনীটা
হ'ল বাঁকা টুকটুকে ঠোঁট কি।
চুনীতে তৈরি ওটা আবীরের মটকি।
সে আবীর কারো কারো কণ্ঠেও লেগেছে
কারো কারো ডানাতে
এ কথা রটেছে রূপখানাতে।

সেখানের রূপসীরা তাই নাকি ঠোঁটে গালে চরণে
আলতা মাখায় নানা ধরনে!
রসিকেরা হেসে হয় সারা
টিয়ার নকল করা—এ কেমন ধারা!

ছাতারে

দিন গেল, মাস গেল, কাটিল বছর
তবু তোর থামিল না কচর-বচর
রে ছাতারে পাখী,
বল্ তোর ভাষণের আর কত বাকি।
কান প্রাণ গেল যে ছাপিয়ে
আর কত বকবি রে লাফিয়ে লাফিয়ে!

ফুৎকি

ওরে ওরে ফুৎকি, মাটিতে নামবি না?
একটু থামবি না?
ডালে ডালে চিরকাল ছটফট করবি
সারাদিন ক্রমাগত কত পোকা ধরবি?
একটু নাম্ না ভাই
একটু থাম্ না ভাই!
দূরবীনে দে না ধরা ক্ষণিকের জন্য,
চট্ ক'রে দেখে নি'
কবিতায় এঁকে নি'
কোন্ গুণে হয়েছিস এতটা অনন্য!

ফটিক জল

ফটিক জল পাখীটির দেখা পেলাম সকালে
দেখা দিয়েই ঠকালে,

ফুড়ুৎ ক'রে পালিয়ে গিয়ে লুকোল
অমনি আমার কাব্য-মুকুল শুকোল,
কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ উঠল ফুটে হর্ষিত
'ফটি—ক জল' গহন থেকে হ'ল যখন বর্ষিত।

ফিঙ্গক-শারিকা-কাব্য

আমড়াগাছের শুকনো ডালে একটি ফিঙে এবং একটি শালিক পাশাপাশি ব'সে ছিল। কেন জানি না, মনে হ'ল শালিকটি স্ত্রী-শালিক এবং ফিঙেটি পুরুষ-ফিঙে। এ অবস্থায় মানব-রুচির মনে যে ভাব আসা স্বাভাবিক তাই এসেছিল। কিন্তু শেষে অপ্রস্তুত হতে হ'ল।

ওহে ফিঙে চৌধুরী
করেছ কার বউ চুরি?

শালিক-প্রিয়া তোমার পাশে
আছেন ব'সে কিসের আশে!
মিল হবে কি শালিক-ফিঙে কূজনে?
করছ নাকি কেলেঙ্কারি
বাঙালী আর তেলেঙ্গারি
গাঁথছ নাকি মিলন-মালা দুজনে!

খাসা কাব্য ফেঁদেছিলাম
ছন্দটি বেশ গেঁথেছিলাম
এমন সময় ফিঙা গেল উড়িয়া
শালিক পাখী নির্বিকার
দেখলে নাকো ফিরেও আর
রইল একা আমড়া-শাখা জুড়িয়া।

তার পরেতে একটু পরে
উড়ল সে-ও 'পিড়িং' ক'রে
দিব্যজ্ঞান হইল পরকীয়ার কি

বসল শিরীষ গাছে গিয়ে
তার পরেতে ঘাড় ফুলিয়ে
ঝাঁকিয়ে মাথা বললে, এ কি ইয়ার্কি !
মনে রেখো শালিক মোরা,
এবং মোরা সেকেলে,
মানুষ নই, মানুষ নই
এবং নই একেলে ।।

শিকারী পাখি

অলঙ্কৃত কর তুমি আকাশের নীল
বহু নামে। কভু ভিস্সা, কভু চিল,
কখনও কোড়ল, ঈগলের রূপ ধরি
কভু দৃপ্ত পক্ষীরাজ। শিক্রে, কুরুরী
কভু ; কখনও আবার সাপমারা হয়ে
ধ্বংস করি সর্পকুল বেড়াও নির্ভয়ে।
পানডোবা-মাঠচিল-রূপে পুনঃ দেখি
ক্ষিপ্র বেগে শত্রুমাঝে ঝম্প দিয়া, এ কি
অসঙ্কোচে অনুসরি বেদুঈন-রীতি
সুতীক্ষ্ণ নখরপ্রান্তে ঝুলায়ে ঝটিতি
রক্তাক্ত শিকারটিরে, হও নিরুদ্দেশ।
কভু দেখি ধরিয়াছ অপরূপ বেশ
পাংশু মাথা লাল ডানা ; কভু লাল শির
ডানায় নীলাভ পাংশু তন্বী তুরমতীর।
মাঝে মাঝে মনে হয় ঋষি দুর্বাসার
তুমিই কি পক্ষীরূপ ? অথবা দুর্বার
চেঙ্গিস নাদির কোন ধর পক্ষীসাজ।
পক্ষী-জগতের বজ্র, হে বিহঙ্গ বাজ,
কহ, কহ, সমুদ্যত নখ-চঞ্চুবান,
রুদ্রবীণে তুমিই কি সারঙের তান ?

কাজল গৌরী

ও রূপসী বণিকবধূ
মাথা তোমার করছে ধূ-ধূ
হঠাৎ কেন করলে এমন স্থৌরি,
হলদে পাখী বললে হেসে
দিলাম দেখা নূতন বেশে
নামটি মোর এখন কাজল গৌরী।
বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম
কালার দেখা পেয়েছিলাম
মাথার কালো হারিয়ে গেল সেই কালোয়,
তাহার ধটির পীতবরণ
হলদে রংও করবে হরণ
থাকব কি আর তখন আমি এই আলোয়?
শুনি এই নিদারুণ বাণী
আদ্যোপান্ত পুনরায় পড়িলাম জীর্ণ গীতাখানি।

ডানা

পাখীর ডানা আছে, তুমিও ডানা
আকাশে উড়িবার নাই তো মানা
কিন্তু জানি তুমি উড়িবে না গো,
মনে মনে তারই দরশ মাগো
যাহার বাজারেতে অনেক দাম
স্বর্ণ-পিঞ্জর যাহার নাম
হারেম বলে কেউ, কেউ বা ঘর,
সবাই চেনা-শোনা নাইক পর,
তাহারই নিরাপদ কোমল কোলে
জানি গো জানি তব হৃদয় দোলে,
অজানা আকাশেতে দেবে না হানা
যদিও নাম তব শ্রীমতী ডানা।

কবিতাটি প'ড়ে ডানার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। কবির দিকে চেয়ে দেখলে একবার। কবি নিবিষ্ট চিত্তে কি লিখে যাচ্ছিলেন, ফিরে চাইলেন না। ডানা তবু চেয়েই রইল, তার মনে যে প্রতিবাদটা জেগে উঠেছিল, সে ভাবছিল, সত্যিই কি সেটা অন্তরের কথা তার? অজানা আকাশে নিজেকে বিলিয়ে দেবার সাহস তার আছে কি? সহসা মনে হ'ল, আছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে অজানা পথেই তো চলছে। শুধু সে কেন, সকলেই। মাতৃগর্ভ থেকে মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, অজানা জগতেই এসে অবতীর্ণ হয় সে। তার পর থেকে প্রতিমুহূর্তে তার অভিযান চলে অজানাকে জানবার, অনায়ত্তকে আয়ত্তে আনবার। এই চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে ডানা কোনও সমাধানে পৌছতে পারল না। পৌছবার আগেই করি রাধা দিলেন।

একটা খবর তোমাকে দিতে ভুলে গেছি। নিখিল বদলি হয়ে গেল এখান থেকে। তার জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন মিস্টার বোস। তিনি নাকি চেনেন তোমাকে। আসবেন তোমার কাছে একদিন।

মিস্টার বোস?

হ্যাঁ, ভাস্কর বসু।

ডানা স্তম্ভিত হয়ে রইল।

[ক্রমশ]

"বনফুল"

অভিনয়

কতদিন নবনীতাই বলেছে: অফিস যেন আর কেউ করে না, তুমি একাই কর। একটু সকাল সকাল যে বাড়ি ফিরবে, তা আমার অদৃষ্টে লেখে নি। কত বাড়ির কত লোক বউকে নিয়ে থিয়েটার-বায়স্কোপে যায়, ঘুরেও আসে এখানে ওখানে। জানি, আমি সে কপাল নিয়ে তোমার সংসারে আসি নি, তবু সাধ-আহ্লাদটুকুও তো মানুষের হয়!

উত্তরে বিনয় প্রকাশ ক'রে সুবিনয় বলেছে, আমিই কি বলেছি, হয় না। তবু তুমি ব'লে সহ্য কর, অন্যে হ'লে এতদিনে আমাকে তালাক দিয়ে যেত।

শুনে নবনীতার কিন্তু হাসি পায় নি, বরং দুঃখটা আরও দ্বিগুণতর হয়ে বুকের মধ্যে দাগ কেটে গেছে। সুবিনয়ের হাত ধ'রে যেদিন প্রথম সে এ সংসারে এল, মনে মনে অনেক স্বপ্ন ছিল সেদিন। স্বামী তো শুধু স্বামী নয়, স্বামী যে একটা বিরাট পৃথিবী! সেই পৃথিবীর সূর্যের আলো প'ড়ে দিক-বিস্তার ঘটবে জীবনে, সংসারে এ যে সব মেয়েই কামনা করে। কিন্তু নবনীতার সে কামনার কোমল গান্ধার ছিন্ন-বীণার ব্যর্থ সুরের আঘাতে বার বার প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল। পাঁচ বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে তার, এই পাঁচ বছর ধ'রে শুধু সংসারেরই কর্তব্য ক'রে এসেছে সে। এতকাল শাশুড়ী বেঁচে ছিলেন, সম্প্রতি বছর দুই হ'ল সংসারের মায়া কাটিয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর জন্য যে দুঃখ না হয়, এমন নয়। সাবেকী ধরনের মানুষ হয়েও একালের হালচাল বুঝতেন। কতদিন তিনিই তো ছেলেকে তাড়া দিয়ে বলেছেন, বিকেলে অফিস থেকে এসে বউমাকে নিয়ে একটু বেরোলেও তো পারিস খোকা! এই বয়সে ঘরের মধ্যে এমন চব্বিশ ঘণ্টা আবদ্ধ হয়ে থাকতে ওর কেন ভাল লাগবে?

আড়ালে এসে সুবিনয় ঠাট্টা ক'রে বলেছে, কি গো, মাকে ঘুষ দিয়ে বুঝি এরই মধ্যে হাত করেছ? কিন্তু বেরোই কখন বল তো? অফিস থেকে ফিরতে ফিরতেই যে সন্ধ্যে কাবার!

উত্তরে অভিমান ক'রে নবনীতা বলেছে, বেশ তো, অফিসই কর না, কে তোমাকে এমন মাথার দিব্যি দিয়েছে ঘরে ফিরতে! পার তো এর পর কাপড়ের খুঁটে চাল-চিঁড়ে বেঁধে অফিসেই সারারাত কাটিয়ে দিও।

সুবিনয় বলেছে, দিতে পারলেই ভাল ছিল। আমাদের অ্যাকাউন্টস সেকশনের যা কাজ, সারা রাত করলেও তা ফুরোবার নয়। অথচ ফেলে রাখলেও কর্তাদের মুখ ভার। ইন্‌এফিসিয়েন্ট ব'লে

শেষ পর্যন্ত যদি ইন্‌ক্রিমেণ্ট বন্ধ ক'রে দেয়, তবে যে চোখে সরষেফুল দেখব!

দরকার নেই সরষেফুল দেখে, বরং সারা রাত গিয়ে অফিসে ব'সে কলম গুঁতিয়ে দেখ, আশি টাকার কেরানী থেকে দু শো টাকার বড়বাবু হতে পার কিনা!—ব'লে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে নবনীতা।

কথা দিয়ে সুবিনয়ের পৌরুষকে সে যত না আঘাত করেছে, তার চাইতে নিজের মনে আঘাত পেয়েছে বেশি। এমন কারাগারের মত জীবন যাপনেরই কি তবে এতকাল স্বপ্ন দেখেছিল নবনীতা? সুবিনয় কিছু বুঝতে চায় না। শুধু বাজার, অফিস আর বাসা। তার কল্পনার অত বড় জগৎটা শেষ পর্যন্ত এসে মিশেছে ছোট্ট একটা বদ্বীপের মত এই ত্রিপদী ছন্দে। শাশুড়ী চক্ষু বোজবার আগে তার কোলে রেখে গেলেন আদরের ছোট্ট নাতিকে। তিনি নাম রেখে গেলেন—ধ্রুব। এই অচল অবরুদ্ধ সংসারের সে যেন ধ্রুবতারা। এত দিনে দু-বছরেরটি হয়ে দস্যি হয়ে উঠেছে। স্বামীর সঙ্গে বাইরে বেরোবার মোহ ধীরে ধীরে নিজে থেকেই কেমন চাপা প'ড়ে গেছে নবনীতার। ধূসর শ্লেটের মত তার নির্জন দিগন্তের ধ্রুবতারার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানির দিকে মাতৃত্বের স্নেহ নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়েই নবনীতার সকাল এসে সন্ধ্যায় গড়িয়ে পড়েছে, সন্ধ্যা গিয়ে আবার প্রভাতের ভৈরব-দরজায় হানা দিয়েছে। একদিন শুধু স্বামীর সঙ্গে ধ্রুবকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে সে হাসপাতালে বেরিয়েছিল। মাঝে মাঝে 'ওয়েট' নিয়ে ধাত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা ভাল। সংসারে নতুন মাদের অনেক জ্বালা। সন্তান সম্পর্কে ঠেকে ঠেকে সব কিছু শিখতে হয়। তার মধ্যে কিছু বা অপটুতার ত্রুটি থেকে যায়। দ্বিতীয়টির বেলা সে ত্রুটি আর থাকে না। কিন্তু নবনীতা আর সন্তান চায় না, ধ্রুবকেও অত শিগগির চায় নি। যে কদিন স্বামীর সঙ্গে নিজের একক অনুভূতি দিয়ে তাঁর জগৎটাকে উপভোগ করা যায়! মা হ'লে যে এমন সুযোগ আর থাকবে না! কিন্তু তার সেই একক অনুভূতির ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে এল। কোলে এল ধ্রুব। কিন্তু তাই ব'লে ধ্রুব কি একেবারেই

অবাঞ্ছিত ? না, তা কেন ? ভাবতে গিয়ে নিজের বুকখানির মধ্যেই যেন কেমন ক'রে ওঠে নবনীতার। সাতজন্ম তপস্যা করলে তবে ছেলে মেলে। ধ্রুব এসে বরং তার একাকিত্বের জ্বালা ঘুচিয়েছে। নইলে শাশুড়ীহীন নির্জন সংসারে বোধ করি একেবারে পাগল হয়ে যেত সে।

কিন্তু সুবিনয় ? সুবিনয়ের কথা কি এতটুকুও বুঝল নবনীতা ? বুঝল না। বুঝলে এমন অহেতুক অভিমান নিয়ে নিজের মধ্যে জ্ব'লে মরত না সে। সুবিনয় যখন বি. এ. পাস ক'রে, বেরুল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন সবে থেমেছে। বাজারে মুদ্রাস্ফীতি তখনও প্রতিরোধ হয় নি। এক কলকাতার বুকের উপরেই তখন একশোটার উপরে ব্যাঙ্ক। শুনল, লোক নিচ্ছে এখানে-ওখানে। চেষ্টা ক'রে তারই একটাতে ঢুকে পড়ল সুবিনয়। মাইনে যা ঠিক হ'ল, দেখল মেসের চার্জ আর হাতখরচা মিটিয়েও তা থেকে মাকে কিছু কিছু ক'রে পাঠানো চলে। তাই পাঠাল। পূর্ববঙ্গের অজ একটা মহকুমা শহরে একটিমাত্র বৈধব্য-জীবনে কতই বা আর খরচা ? কিন্তু খরচ বেশি না লাগলেও মা আর এমন ক'রে একা একা দূরে প'ড়ে থাকতে চাইলেন না। ততদিনে দেশ স্বাধীন হয়েছে। দুই বাংলায় দুই ডোমিনিয়ন। একা পাকিস্তানে প'ড়ে থাকা নিরাপদ নয়। ভয় পেয়ে মা চিঠি লিখলেন— শুনছি, এর পর যাতায়াত নিয়ে নানারকম কড়াকড়ি শুরু হবে, তার আগে ভালয় ভালয় তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে যা। আসার আগে কলকাতায় দেখে-শুনে একটা বাসা ভাড়া ক'রে আসিস। আমি গিয়ে তো আর তোর মেসে উঠতে পারব না

অনেক খোঁজাখুঁজির পর তবে এই টেংরা অঞ্চলে দুখানি ঘর মিলল। দুখানি না ব'লে বলা যায় দেড়খানি। পূর্ববঙ্গে তাদের দেশে এমন ঘরে গরুও বাস করত না। অথচ এই ঘরই ভাড়া নিতে হ'ল ত্রিশ টাকায়। ব্যাঙ্কের আশি টাকার কেরানীর পক্ষে ত্রিশ টাকা ঘরভাড়া দেওয়াও কি সম্ভব ? তবু উপায় নেই। অফিস থেকে দুদিনের ছুটি নিয়ে গিয়ে নিয়ে এল সে মাকে। বাড়ি বিক্রি ক'রে

কিছু টাকা হাতে এল। সুবিনয় ভাবল, এই দিয়ে তবু যা হোক কিছু ধার-দেনা শোধ করা যাবে। কিন্তু মা একেবারেই উলটো সুর ধরলেন; বললেন, এবারে তোকে বিয়ে করতে হবে খোকা। টাকাটা হাতে থাকতে থাকতে আমি বউমাকে এনে তার হাতে সংসার বুঝিয়ে দিতে চাই।

সুবিনয় বললে, তুমি ক্ষেপেছ মা? একে নিজেদেরই চলে না, তার ওপর পরের ঘরের একটি মেয়েকে এনে মিছেমিছি কষ্ট দেওয়া! তা হয় না মা।

কথা কেটে মা বললেন, তুই পুরুষমানুষ না? রোজগার ক'রে দুটো প্রাণীকে খাওয়াতে পারবি না তো এমন রোজগার না করলেই হয়।

কথাটা ব'লে মা তার পৌরুষেই আঘাত দিলেন। সে আঘাত ফিরিয়ে দেবার সাধ্য নেই সুবিনয়ের। বাধ্য হয়ে একদিন তাই বিয়ে ক'রে নবনীতাকে সে ঘরে নিয়ে এল। নবনীতাকে ঘিরে স্বপ্ন কি তারই কম ছিল? সেই স্বপ্নকে জীবনে সার্থক ক'রে তোলবার জন্যই অতিরিক্ত পরিশ্রমের পথ বেছে নিতে হ'ল তাকে। না নিয়ে উপায় নেই। এক সময় মুদ্রাস্ফীতির সুযোগ নিয়ে যে ব্যাঙ্কগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, দেখতে দেখতে তার চোদ্দ আনা বন্ধ হয়ে গেল। সুবিনয়দের ব্যাঙ্কটা যাই যাই ক'রেও তবু যা হোক শেষ পর্যন্ত কিছু কর্মচারীকে ছাঁটাই ক'রে রক্ষা পেয়েছে। সুবিনয়ের ভয় ছিল, পাছে সেও ছাঁটাইয়ের মধ্যে প'ড়ে যায়! গেলে মা আর স্ত্রীকে নিয়ে দাঁড়াবার পথ থাকবে না তার। কোথাও থেকে চাকরি গেলে আজ আর মাথা কুটলেও কেউ চাকরি দেয় না। বাধ্য হয়ে সাত ঘণ্টার কাজের পরেও আরও দু ঘণ্টা ওভারটাইম নিয়ে নিল সুবিনয়। ওভারটাইমের জন্য বাড়তি টাকা পাওয়া যায়। দৈনিক এক টাকা ক'রে হ'লেও মাসে ত্রিশ টাকা। মাইনের সঙ্গে যোগ ক'রে সর্বসাকুল্যে দাঁড়ায় এক শো দশ। তবু কিছু স্বস্তি। অফিসের চেয়ার ছেড়ে যখন পথে নেমে আসে সুবিনয়, রাত তখন সাড়ে সাতটা। এক দিন নয়, দু দিন নয়, বারো মাস ত্রিশ দিন। জীবনের মূল্য দিয়ে তবে যে সংসারে সব কিছু

কিনতে হয়, এতবড় সত্যটা এই প্রথম উপলব্ধি করল সুবিনয়। নিজের মধ্যে নবনীতার প্রেমকে জাগিয়ে রাখবার জন্যে অধিক পরিশ্রমকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল সে। কিন্তু পরিশ্রম সহ্য হ'ল না শরীরে। ঘরে ফিরে সারা দেহ ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন আর ইচ্ছে করে না যে, মাথা তুলে বসে। কিন্তু সংসারে ধ্রুব আসার পর তাও বসতে হয়। সারাদিনের পর বাবাকে কাছে পেয়ে ধ্রুব দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। নবনীতার মনে কোথায় যে সব চাইতে বড় আঘাত, তা বুঝতে পারে বই কি সুবিনয়, কিন্তু বুঝেও উপায় নেই। সারা মাসে এক-আধ দিন পথে বেরুতে বা থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখতে এমন বেশী পঞ্চাশ কিছু খরচ নয়, কিন্তু সময় কোথায়? সপ্তাহে একটা মাত্র রবিবার, তা যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, টের পায় না সুবিনয়। 'ক্লোজিং'-এর সময়ে এমন অনেক রবিবারেও অফিস থেকে ডাক আসে। নবনীতার যে একাকিত্ব, সেই একাকিত্ব। একঘেয়ে জীবনযাত্রার মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে তার। মনে হয়, মাথার উপরের আকাশটা ক্রমে ছোট হতে হতে এসে তাকে একেবারে অষ্টোপাশের মত ঘিরে ধরে। অফিসে ব'সে অ্যাকাউন্টসের কাজের মধ্যে তখন সাইকেলের দ্রুত ঘূর্ণমান চাকার মত মাথাটা বোঁ-বোঁ ঘুরতে থাকে সুবিনয়ের।

এমনি ক'রেই দিন কাটছিল।

নবনীতা যে ক্রমেই তার কাছে থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে এটুকু বুঝতে একটুকুও কষ্ট হয় নি তার। অবসন্ন রাত্রিশয্যায় কখনও আদর ক'রে ডেকেছে, সাড়া দেয় নি নবীনতা, ধ্রুবকে কোলের মধ্যে নিয়ে এক পাশে স'রে শুয়েছে; কখনও বা হাতের ঝটকা দিয়ে সুবিনয়ের হাতখানি সরিয়ে দিয়ে বলেছে, যাও না, যেখানে ছিলে সেখানেই যাও না, রাত-দুপুরে আবার জ্বালাতন করতে এলে কেন? শুনে নিজেরও অভিমান হয়েছে বই কি সুবিনয়ের। এত যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে, এ খাটুনি কার জন্যে? তারও কি শরীর ব'লে, মন ব'লে কিছু নেই? সেও কি চায় না একটু বিশ্রাম, একটু মিষ্টি কথা, একটু সান্ত্বনা? কিন্তু নবনীতা সেদিক থেকে একেবারেই নির্বিকার। তার নিজের

স্বার্থের কাছে সুবিনয়ের স্বার্থ সে এতটুকুও ভেবে দেখতে চাইল না কোনদিন। যে জীবনটা সোনায় সোনায় ভ'রে উঠতে পারত, সে জীবনটা আজ রীতিমত তেতো হয়ে উঠেছে। কেন, কার জন্যে? ভাবতে গিয়ে ব্যাঙ্কের অঙ্ককষা মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল সুবিনয়ের। এ যে তার নিজের হাতে গড়া সংগ্রাম, নবনীতা তো স্বেচ্ছায় আসে নি এ সংসারে, সে নিজেই যে পিঁড়িতে ব'সে মন্ত্র প'ড়ে নবনীতাকে এনে ঘরে তুলেছে। নবনীতার সুখের জন্যেই যে তাকে আজীবন পরিশ্রম ক'রে যেতে হবে।

সে দিন শনিবার অফিসের পথে একটা সিনেমা-হলের কাউণ্টারে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে দুখানি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেটে নিল সুবিনয়। ঠিক করল আজ আর অফিসে ওভারটাইম খাটবে না সে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে হকচকিয়ে দেবে সে নবনীতাকে, তারপর সাড়ে পাঁচটার শোতে সোজা দুজনে প্রেক্ষাগৃহের দুটো চেয়ারে গিয়ে ব'সে পড়বে। ধ্রুব এমন কিছু জ্বালাতন করবে না যে, ছবি দেখা মাটি হবে। অনেক বাড়ির অনেক ছেলের তুলনায় ধ্রুব অনেক বেশি শান্ত হয়েছে। সে-ই বরং সারাক্ষণ ধ্রুবকে কোলে নিয়ে বসবে। কাঁদলে পকেট থেকে লজেন্স বার ক'রে তার মুখে পুরে দেবে। নবনীতা তাতে বরং স্বস্তি নিয়ে অভিনয় দেখতে পারবে। দেখে মনটা তার আবার প্রথম বাসরের মত সহজ হয়ে আসবে। এত পরিশ্রমের অর্থ সার্থক হবে সুবিনয়ের, নবনীতার মুখে হাসি দেখতে পেয়ে সমস্ত পরিশ্রম তার লাঘব হয়ে যাবে।

সারাদিন অফিসের কাজে কিছুতেই আজ আর মন বসতে চাইল না। অঙ্কে বার বার ভুল হতে লাগল, কখনও বা অনাবশ্যকভাবে খানিকটা উচ্ছলতা প্রকাশ করে ফেলল বেয়ারাদের সামনে। তারপর ছুটি হতেই একদণ্ড আর দেরি নয়। অন্য দিন অফিস ফিরতি পায়ে হেঁটে হাঁটার অভ্যাসটা চালু রাখতে চেষ্টা করে সুবিনয়, কিন্তু আজ একেবারে সোজা স্টেট বাসে ক'রেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল সে। নতুন নতুন বই সবে রিলিজ করেছে, কাগজে পত্রে প্রশংসার ছড়াছড়ি। নবনীতা ভাবতেই পারছে না আজকের দিনটাকে

কিন্তু বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পা দিতেই চোখের সামনে যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সে নবীনতা বা ধ্রুব নয়, তিনকড়ি—নবনীতার বড় বোনের দেওর। বেলঘরিয়ায় বাড়ি, ওখানকার কোন একটা মিলে চাকরি করে।

মনে মনে বিরক্তি নিয়েই সুবিনয় বিস্মিত হবার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল, আঃ, তিনকড়ি যে! হঠাৎ এমন অসময়ে, কি মনে ক'রে?

বিগলিত হবার ভঙ্গীতে তিনকড়ি বললে, মনে ক'রেও নাকি আবার আসতে হবে! আপনারা যাওয়া একেবারেই ত্যাগ করেছেন ব'লে আমরা তো আর করি নি। কিছুদিন ধ'রে বউদির কেমন ঘুষঘুষে জ্বর চলেছে। নবনীদিকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়েছে, তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। ভয় নেই, কাল বিকেলেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। আপনি যদি সঙ্গে যান, তবে তো কথাই নেই।

এত তোড়জোড় ক'রে ছবি দেখবার এতবড় উৎসাহের অর্ধেকটা এইখানেই প্রায় মাটি হয়ে গেল। কণ্ঠে হঠাৎ যেন কেমন অপ্রস্তুত হবার মত স্বর খেলে গেল একবার সুবিনয়ের। বললে, যে চাকরি করি, তা নিয়ে আজকাল আর আত্মীয়তা রক্ষা ক'রে উঠতে পারি না। আত্মীয়েরাও সম্ভবত এই জন্যেই আমাকে ত্যাগ করেছে। তা, তোমার নবনীদি কি যাবার জন্যেই তৈরি হয়েছে নাকি?

তৈরি মানে কি, এতক্ষণ আপনার জন্যেই যা অপেক্ষা, নইলে কখন পৌঁছে যেতাম বেলঘরিয়ায়!—সহজভাবেই কথাটা ব'লে ফেলল তিনকড়ি।

কিন্তু সুবিনয়ের কান অবধি গিয়ে তা পৌঁছাল ব'লে মনে হ'ল না। তার আগেই দ্রুত সে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। দেখলে, ট্রাঙ্ক থেকে শাড়ি ব্লাউজ বার করা নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে নবনীতা। বিষয়টার দিকে তেমন গা না মাখিয়ে সুবিনয় বললে, তিনকড়ি তোমাকে নিতে এসেছে দেখলাম। কিন্তু কেমন ক'রে যাওয়া হবে? নতুন ছবি এসেছে হাউসে, আমি টিকিট কেটে নিয়ে এসেছি, সন্ধ্যের শো। আজ তোমার কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না।

ট্রাঙ্কের তালা বন্ধ করতে করতে সুবিনয়ের মুখের দিকে ভ্রূ কুঁচকে একবার চোখ তুলে তাকাল নবনীতা, বললে, তা বেশ তো, অফিসের বন্ধুবান্ধব কতই তো আছে, একেবারে ছবি দেখেই ঘরে ফিরতে পারতে!

পারলে আর টিকিট কেটে নিয়ে এলাম কেন! মনে মনে সমস্ত অসন্তোষ চেপে রেখে সুবিনয় বললে, সারা সপ্তাহ ওভারটাইম খেটে খেটেই তো মরি, আজ আর ওভারটাইম নিই নি। লক্ষ্মীটি, রাগ না ক'রে চল বেরিয়ে পড়ি। ওদিকে সময়ও আর বেশি নেই। গোছগাছ করতে করতেই বেলা প'ড়ে যাবে। তিনকড়িকে দিয়ে দরকার নেই, কাল বরং আমিই তোমাকে নিয়ে বেলঘরিয়ায় গিয়ে দিদিকে দেখে আসব।

মুখে কেমন একবার চুক্‌চুক্ শব্দ ক'রে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নবনীতা বললে, আহা-হা, দরদ যে উথলে উঠল, এত দরদ এতকাল ছিল কোথায়?

ছিল গো ছিল, কিছুই মরে নি।—ব'লে সহসা নবনীতাকে দু বাহুর মধ্যে আকর্ষণ ক'রে নিতে চাইল সুবিনয়, কিন্তু ধরা দিল না নবনীতা; বললে, যাও, সর, দেখতে পেলে তিনকড়ি হাসবে।

হাসুক, মুখে হাসি নিয়েই বরং বিদায় হোক।—থেমে সুবিনয় বললে, তুমি না বলতে পার, আমিই বরং ব'লে দিচ্ছি। তুমি তৈরি হও।

না।—স্বরটা যে এত রূঢ় শোনাবে, শব্দটা ব্যবহার ক'রে নবনীতা নিজে অবধি তা ভাবতে পারে নি।

সুবিনয় প্রশ্ন করল, কী না?

মনে কোনরকম দ্বিধা না রেখেই নবনীতা বললে, তোমার সঙ্গে আমি অভিনয় দেখি না, দেখতে যাব না, কোনদিনই না।

সুবিনয় তবু কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না; ভাবল, এতদিনের অভিমান, আর একটু সাধ্যসাধনা করলেই ভেঙে যাবে।

কিন্তু কোন সাধ্যসাধনাই কাজে দিল না। নবনীতা তৈরি হয়ে নিল ঠিকই, শুধু নিজে নয়, ধ্রুবকেও অল্প সময়ের মধ্যেই সাজিয়ে

গুজিয়ে নিল। তারপর ঘরের চাবির গোছাটা ঝন্ ক'রে সুবিনয়ের সামনে ফেলে দিয়ে তিনকড়িকে বললে, চলুন তিনকড়িবাবু।

তিনকড়ি এতক্ষণ পা বাড়িয়েই ছিল, সুবিনয়ের উদ্দেশে এবারে নমস্কারের ভঙ্গীতে কপাল অবধি হাত দুখানি উঁচিয়ে বললে, আসি তা হ'লে। কাল যদি আপনি যান, বউদি খুব খুশি হবে। আসার সময় নবনীদিকে নিয়েই ফিরতে পারবেন।

অন্য সময় হ'লে এ কথার জবাবে হয়তো ভদ্রতর স্বরে কিছু বলত সুবিনয়; কিন্তু নবনীতার ঔদ্ধত্য লক্ষ্য ক'রে নিজের মধ্যে ক্রমেই এত বেশি প্রচণ্ড হয়ে উঠছিল সে যে, তিনকড়ির কথার কোনও জবাব দেবার প্রয়োজনই বোধ করল না।

ধ্রুব একবার পিছন ফিরে বাবাকে লক্ষ্য ক'রে বললে, এস। কিন্তু নবনীতার উদ্ধত ঘাড় একটি বারও বেঁকল না। ধীরে ধীরে একসময় তারা চোখের অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্রোধে অপমানে দাঁতগুলো একবার কড়মড় ক'রে উঠল সুবিনয়ের। তার শরীরে যে এত রাগ আর অপমানের এত জ্বালা আছে, আজ এই প্রথম উপলব্ধি করল সে। বুকপকেটে তখনও সেকেণ্ড ক্লাসের নীল রঙের টিকিট দুখানি অক্ষতভাবে র'য়ে গেছে। বের ক'রে কি খেয়ালে একবার চোখের সামনে মেলে ধরল সে টিকিট দুখানা, তারপর দেশলাইয়ের একটা জ্বলন্ত কাঠি ছুঁইয়ে দিল তাতে। একটু আগেই নবনীতা ব'লে গেল, তোমার সঙ্গে আমি অভিনয় দেখি না। কিন্তু অভিনয় ক'রে যেতে বাকি রাখল না সে। প্রেক্ষাগার ভর্তি লোক যখন অধীর আগ্রহ নিয়ে পর্দার অভিনয় দেখবে, তার ফাঁকে সুবিনয় আর নবনীতার ফাঁকা চেয়ার দুখানির দিকে লক্ষ্য ক'রে কেউ কি কল্পনা করতে পারবে একটি ছোট্ট দাম্পত্য-জীবনের এত বড় অভিনয়টাকে? নিজের মনেই একবার হো-হো ক'রে হেসে উঠল সুবিনয়।

টিকিট দুখানার পোড়া ছাই তখন সারা ঘরময় লুটচ্ছে।

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

গ্রাহক এবং পাঠকগণের প্রতি নিবেদন

'শনিবারের চিঠি'র সুবিদিত সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যকৃতির ন্যায় উহার আকার-আয়তনেরও একটি সুস্পষ্ট ঐতিহ্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই ঐতিহ্যের সহিত পাঠকসাধারণ দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত। কিন্তু ইদানীং গ্রাহকদের পত্রে এবং আমাদের একাধিক শুভানুধ্যায়ীর সহিত কথা বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি, তাঁহারা সকলেই পত্রিকার আকার পরিবর্তনের পক্ষপাতী। কিছুকাল যাবৎ আমরাও উপলব্ধি করিতেছি যে, 'শনিবারের চিঠি'র বর্তমান আকার উহার সম্প্রসারণ ও সমুন্নতির একটি প্রধান অন্তরায়। পাঠকের রুচিবৈচিত্র্যের ক্ষুধা মিটাইতে হইলে পত্রিকায় অধিক পরিমাণ পাঠ্যবস্তুর সমাবেশ ঘটানো দরকার, সেক্ষেত্রে আয়তনবৃদ্ধি ছাড়া গত্যন্তর দেখা যায় না।

এই সকল কারণে আমরা স্থির করিয়াছি, আগামী ১৩৬২ বৈশাখ হইতে 'শনিবারের চিঠি'র আয়তন বৃদ্ধি করিয়া উহাকে ক্রাউন চার-পেজী (অর্থাৎ বাংলা মাসিক পত্রিকার প্রচলিত সাইজ) করা হইবে। এখন 'শনিবারের চিঠি'তে যত পাঠ্যবস্তু যায় (৯ ফর্মা), রূপান্তরিত আকারে (১৪ ফর্মা) উহার প্রায় দ্বিগুণ পাঠ্যবস্তু উহাতে ধরানো সম্ভব হইবে। কিন্তু তদনুসারে পত্রিকার খুব বেশি মূল্যবৃদ্ধি হইবে না। আমাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নব-কলেবর 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি সংখ্যার দাম ধার্য করা হইল বারো আনা মাত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ন' টাকা, যাণ্মাসিক সাড়ে চার টাকা।

আশা করি, প্রস্তাবিত পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সুবিধা হইবে। এবং আমরা গ্রাহক এবং পাঠকদের সহৃদয় আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হইব না।

কর্মাধ্যক্ষ
'শনিবারের চিঠি'
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড : কলিকাতা-৩৭

সহোদরা

পরাণ ব'সে ব'সে বিড়ি টানছে চুপচাপ।

বোনের অসুখ। ওর আর ভাইবোন নেই। ওই একটা মাত্রই যা। কিন্তু সে আজ চিকিৎসার অভাবে মারা যেতে বসেছে।

ঝাড়-ফুঁড়-জলপড়া অনেক চলেছে। কিছুতেই ওর কিছু হয় নি। হাতুড়ে ডাক্তারদের দেখানো হয়েছে অনেক দিন ধ'রে।

বোনের একটা কিছু করতে না পারলে পরাণের আর শান্তি নেই।

কথা বলছে অন্য সবাই। বিশেষ ক'রে পরাণের মা চারুবালা। বলছে, কি যে নিয়ম-কানুন বাবা! বাপের জন্মে কেউ শুনেছে এ সব কথা? একটা মাত্র বোন, কোম্পানির ডাক্তার নাকি তার চিকিচ্ছে করবে না। ছেলে, মেয়ে, বউ আর নিজে। তা আমার ছেলে তো বিয়ে করে নি। কেন করবে না মা-বোনের চিকিচ্ছে? বিয়ে করলে ছেলে-মেয়ের তো ওরতে হ'ত? তার বদলে এদের করবে না কেন?

মতি বলে, অনেক কারখানায় চিকিৎসারই বন্দোবস্ত নেই, তা আবার মা-বোন?

চারুবালা তাতে বুঝ মানে না। বলে, নেই তো, ভাল কথা। তাদের মাইনে-কড়ি লিচ্ছয় বেশি দেয় কোম্পানি। তারা বাইরের ডাক্তার-কবিরাজ দিয়ে চিকিচ্ছে করায়।

মতি কি একটা কথা বলতে যায়, বলতে পারে না।

ভেতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে সুশীলা ডাকছে, মা, ও মা—

চারুবালা কথা বলতে থাকলেও কান রয়েছে ঘরে রুগ্না মেয়ের দিকে। সে বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি মা?

সুশীলা বললে, একটু জল।

সেদিন রোব্বা (ওঝা) বারণ ক'রে গেছে। জল খাওয়া যে তোর বন্ধ মা। একটু কষ্ট ক'রে থাক্।

বড় তেষ্টা পেয়েছে যে।

চারুবালা মনে মনে বলে, মুখপোড়া ডাক্তারটা একবার দেখতে এলো না! জল খাওয়াব কিনা তাও তো জানি না। যদি অবস্থা আরো খারাপের দিকে যায় জল খেলে? চারু গেলাসের তলায় একটু জল দেয়। বলে, মা, বেশি খেতে নেই। এটুকুই খা।

গেলাসটা মেয়ের মুখের কাছে ধরতে ধরতে ওর সিঁথির সিঁদুরের দিকে নজর পড়ে। মনের ভেতরটা হু-হু ক'রে ওঠে মার। ওর সব কিছু থাকতেও কিছু নেই। জামাইটা বেকারীর দরুণ গেছে বাউণ্ডুলে হয়ে। সেই ফেলে গেছে—আজ প্রায় তিন বছর।

চারুবালার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সে তাড়াতাড়ি গেলাসটা মাচার নীচে রেখে বেরিয়ে আসে বারান্দায়।

এইবারে সে চোখে আঁচল দিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদে।

পরাণের মাথায় চট্ ক'রে একটা বুদ্ধি খেলে যায়। বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও উঠে আসে। মার হাত চেপে ধ'রে ঝাপসা গলায় বলে, মা, কেঁদো না। আমি ব্যবস্থা করছি।—ব'লেই আর কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন ক'রে চ'লে যায়।

কেউ কিছু বুঝতে পারে না, পরাণ কি বলছে! খানিক বাদে সবাই দেখে, ডাক্তার নিয়ে এসেছে পরাণ। ওরা থেমে যায়। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়, ইশারা করে। পরাণের মা মাথায় কাপড় টেনে বারান্দা থেকে স'রে দাঁড়ায়।

পরাণ ডাক্তারকে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢোকে।

নোংরা পরিবেশে ডাক্তাররা প্রায়ই অভ্যস্ত। কিন্তু তবু, সমস্ত অবস্থা বুঝেও কিছু না ব'লে থাকা সম্ভব হয় না একজন চিকিৎসকের পক্ষে। ডাক্তারবাবু বলেন, এ নোংরা ন্যাকড়াগুলো ওখান থেকে সরিয়ে ফেলো। ঘরটা বেশ পরিষ্কার রাখতে হবে। রোগী একা এ ঘরে থাকবে।

চারুবালা মনে মনে দাঁত খিঁচোয়। বলে, কি মুখপোড়া ডাক্তারটা? আমরা যাব কোথা? ঘর তো সবে একখানাই। মেয়েটা একলা পড়ে থাকবে এখানে?

ডাক্তারবাবু বুকে পিঠে দু-দুবার করে স্টেথিস্কোপ দিয়ে দেখেন। প্লুরিসি হয়েছে নিশ্চয়। তবে কতটা সাংঘাতিক অবস্থায় পৌঁছেছে তা সঠিক বুঝতে পারা যাবে 'এক্স-রে'র প্লেটে।

ডিম, মাংস, ফল এবং দুধ যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে খাওয়ানোর

পরামর্শ দিয়ে ডাক্তারবাবু এসে বাইরে দাঁড়ান। হাত ধোবার জন্তে ভাল সাবান না পেয়ে মনে মনে একটু চ'টে যান তিনি, বিরক্ত হন; কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেন না।

পরাণ আসামীর মত দাঁড়িয়ে আছে সামনে। হাতে ডাক্তারবাবুর ব্যাগ। এক টুকরো কাগজ বার ক'রে ডাক্তারবাবু একটা ঠিকানা লিখে দিয়ে বলেন, এখানে নিয়ে যাবে। একটা ফোটো তুলবে ওরা।

খরচ ?

কোম্পানির। তুমি শুধু নিয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু হাঁটেন। পরাণ চলে পিছনে পিছনে।

এখান থেকে ট্রাম-বাসের রাস্তায় যেতে মিনিট পনেরো সময় লাগে। তাই ডাক্তারবাবুর জন্য রিক্‌শা ডাকা হয়।

ডাক্তারবাবু রিক্‌শায় উঠে বসেছেন। পাশে ব্যাগটি। 'ডেলি ভিজিট' 'নোট' করার জন্য 'ডায়েরি' খুলে নিয়েছেন কোলের উপরে।

পরাণ কোম্পানির ডিসপেন্সারীতে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলেছে একবার সবই।

ডাক্তারবাবু তবু আবার জিজ্ঞাসা করেন,—তোমার নাম কি ?

পরাণ উত্তর দেয়, শ্রীপরাণচন্দ্র দাস।

ডাক্তারবাবু একটু রসিকতা করেন, শ্রীতে আর দরকার নেই। বিশ্রী হ'লেও চলবে। তা, কোন্ ডিপার্টমেণ্ট ?

ডেসপ্যাচ বাবু।

সেক্‌শান ?

পোস্টাল প্যাকিং।

রোগীর নাম ?

পরাণ এবার শ্রীমতী কথাটা মুখে এলেও সামলে নেয়। বলে, সুশীলাবালা দাসী।—ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিচ্ছেন।

তোমার কে হয় ?

পরাণ অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দেয়, স্ত্রী।

শ্রীপ্রণয় গোস্বামী

এই গ্রহের ক্রন্দন

"We do not love those whom we think we love. Even the genuinely good cannot, unaided, learn to love."

—*Francois Mauriac*

॥ প্রথম রাত্রি ॥

রত্না, আজই ক্লাশিয়ংয়ের নতুন বাড়িতে এসে উঠলুম। কোন কিছুই গোছানো হয় নি। শোবার ঘরটা কোন রকমে সাজিয়ে নিয়েছি। নিশীথ আগেই আমায় খবর দিয়েছিল যে, পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে বাড়িটা কেনা হ'ল ব'লে কোন জিনিসই ছুটে গিয়ে চট ক'রে সংগ্রহ ক'রে আনা যাবে না। সংসারের জন্যে কি কি জিনিস দরকার কাল একটা তার লিস্ট তৈরি করা হবে। আজকের মত আমি নিশ্চিন্ত। জগতের যাবতীয় আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে দেহটাকে এবার আমি সুরক্ষিত ক'রে রাখলুম।...

শয়ন-কামরার জানলা-দরজা সব বন্ধ।

আমি অসুস্থ। অসুস্থ না হ'লে জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ জাগত। কেবল বেঁচে থাকবার দিক থেকে বিচার করলে, দেহটার মত নিশ্চিত-বাস্তব আমার অনুভব-রাজ্যে আর কিছু ধরা পড়ে নি। মানুষের দেহটা যখন মরে, বুদ্ধিও মরে সেই সঙ্গে। এইটুকু জানবার স্বাধীনতা ধ'রে রাখতে গিয়ে আমার জীবনের ত্রিশটা বছর গ'লে গেল অতি নিঃশব্দে। কুমারী জয়া বসু তার আবদ্ধ শয়ন-কামরার দরজায় বাইরের জগৎটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কেন জানিস? আজ আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আমি চেয়েছিলুম আমার ব্যক্তিত্বের মুক্তি। গলা-মোমের মত আমার ব্যক্তিত্বকে মিশে যেতে দিই নি বাইরের জগৎ-সত্তায়। আমার নিজের জীবনের অস্তিত্ব কেবল আমারই কাজে লাগাতে চেয়েছিলুম। প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির মধ্যেই আমি চেয়েছিলুম নন্দনতত্ত্বের অধিকারক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করতে। জীবনের পরমসত্য আমি খুঁজছিলুম আমারই চিহ্নিত করা সেই মুহূর্তগুলোর মধ্যে। যেদিন ইতিহাস ও শাশ্বতের

মধ্যে একটা দিক আমায় বেছে নিতে হ'ল, সেদিন আমি ইতিহাসকেই বেছে নিয়েছিলুম। কারণ, শাশ্বতের অনিশ্চয়তা আমি স্বীকার করি নি। সেইজন্যে ভগবান-রহস্য আমার উপলব্ধি-জগতে প্রবেশ করতে পারে নি। তাই রত্না, তুই টের পেয়েছিলি কি না জানি না, আমি কোনদিনই প্রামাণিক জীবনযাপনের বাইরে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করি নি—অথেনটিক্ লিভিং ছিল আমার জীবনজিজ্ঞাসার শুরু ও শেষ। কিন্তু···কিন্তু কি যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। গোলমাল না বাধলে তোকে বোধ হয় এ চিঠি আমি লিখতুম না।

গোলমাল শুরু হয়েছিল কিছুদিন আগে থেকেই। তুই জানিস, কলকাতায় আমার লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে বহু লোক আসা-যাওয়া করত। ব্যবসায়ী, রাজনীতিজ্ঞ, ব্যারিস্টার, অধ্যাপক, লেখক ও শিল্পীর সমাবেশ হ'ত আমার বসবার ঘরে। প্রামাণিক-জীবনযাপনের মধ্যে এরা ছিল আমার কাছে প্রয়োজনীয় ডেটা। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার জন্যে এদের আমি স্বীকৃত বিষয়সমূহের মত ব্যবহার করতুম। কিন্তু একদিন আমার মনে হ'ল, এরা আমার চোখের সামনে পায়চারি ক'রে চলেছে দিবারাত্র, অথচ কাউকেই আমি চিনতে পারছি না—অপরিচিতের ভিড়। সারাজীবনের পরিচয় ক্রমশ উহ্য হয়ে যাচ্ছে আমার স্মরণশক্তি থেকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির জগতে মানুষের কেবল একটা পরিচয়ই সরলরেখার মত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই সরলরেখাটির চোখে শিক্ষা ও সভ্যতার দুটো ঠুলি বাঁধা ছিল—সহসা যেন ঠুলি দুটো খুলে পড়ল। আমি দেখলুম, মানুষের মনের অরণ্যে সেই আদিম জন্তুটা আবার নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার নিজের চোখের ধাঁধাটা কাটল। আমি উপলব্ধি করলুম, মানুষ তার হাজার হাজার বছরের শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠেছে। হিংস্র জন্তুটা তাই পুনরায় ক্রমবিবর্তনবাদের প্রথম অন্ধকার থেকে ফিরে এল আধুনিক মানুষের মনের অরণ্যে। নগ্ন-বাস্তব চেয়ে রইল আমার দিকে এক দৃষ্টিতে। কি করব আমি?

রত্না, তোর কি মনে হয় না, মানবজাতির সভ্যতা-গুদামের ধনরত্ন সব হিসেব ক'রে দেখবার এবং দেখাবার সময় এসেছে? স্টক-টেকিং

কিংবা সম্ভার গণনার প্রয়োজন আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না? আমার বিশ্বাস, সভ্যতা-গুদামের ধুলোয় ইতিহাসের প্রতিটি পাতা আজ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পাতা থেকে ধুলো সাফ করতে যাওয়ার আগে, আমার উপলব্ধির ক্ষেত্রটির দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে দেখলুম, সেখানেও সেই আদিম জন্তুটা উঁকি দিচ্ছে নতুন আস্বাদনের লোভ নিয়ে। পালিয়ে এলুম কাশিয়ংয়ে। আমি জানি, লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে ওরা কেউ আর আমার অস্তিত্বের প্রলোভনে ছুটে আসবে না।

পালিয়ে এলুম বটে, কিন্তু জন্তুগুলোকে আমি ভুলতে পারছি না। জীবনের মধ্যে ওরা আমার অনেকগুলো ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এই ক্ষত-গুলোই আমায় জাগিয়ে রেখেছে জীবনের দীর্ঘতম সময়। জেগে থাকতে বাধ্য হয়েছি। ত্রিশ বছর ধ'রে আমি কেবল কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এই গ্রহের ক্রন্দন। কান্নার মধ্যে রয়েছে একটা অসহায় মনের আকুল আবেদন—বৃহত্তম আবেদন, সন্দেহ নেই। পরম সত্যের পায়ে লুটিয়ে পড়বার প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তৈরি হয়েছে আবেদনের অ্যানাটমি। জন্মনাড়ীর মূলে একটা চিনচিনে ব্যথা ক্রমশ তীব্র হতে লাগল—তীব্রতম ব্যথার মুহূর্তটিকে ঘিরে সৃষ্টির বৈকুণ্ঠ তৈরি হচ্ছে! পুরো গ্রহটাই কাঁদছে—সৃষ্টির মুহূর্ত এবার সমাগত।

কিন্তু কি যেন হয়ে গেল! সেই ঘটনাটাই তোকে বলতে চাই। সেইটুকু ব'লে নিতে পারলে আমার গল্প শুরু করতে আর বিলম্ব হবে না।

আমার বয়স তখন দশ। কেষ্টনগরে বাবার কাছে থাকতুম। আমাদের বাড়িটা ছিল বড় রাস্তার ঠিক পাশেই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক-চলাচল দেখতে আমার ভাল লাগত। কদিন থেকে একটা কুকুর এসে দাঁড়িয়ে থাকত আমার বাড়ির সামনে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত আমার দিকে। কুকুরটাকে খুব রুগ্ন দেখে আমি ওকে প্রত্যেক দিনই কিছু কিছু খাবার এনে দিতুম। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে কুকুরটা শুয়ে থাকত রাস্তার পাশে। খাবার সংগ্রহ করবার জন্যে সে আর কোথাও যেত না। কুকুরটার বাচ্চা হবে ব'লেই বোধ হয় ওর চারদিকে ছোটাছুটি করতে ভাল লাগত না।

প্রতিদিনকার মত সেদিনও থালায় ক'রে ভাত নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালুম ওর সামনে। ভাত খাওয়ার সেদিন বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না তার। মাটিতে শুয়ে রইল। মাঝে মাঝে গলা দিয়ে ওর কি রকম একটা আওয়াজ বেরুচ্ছিল। মনে হ'ল, ও কাঁদছে।

রাত দশটার পরে আমি শুয়ে পড়লুম। শুয়ে শুয়ে কুকুরটার কান্না শুনতে লাগলুম। ঘুম এল না। মা তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি ধীরে ধীরে দরজা খুলে চ'লে এলুম বারান্দায়। রাস্তায় আর জনমানব নেই। ল্যাম্প-পোস্টের আলোয় আমি দেখলুম, কুকুরটা শুয়ে আছে রাস্তার ঠিক পাশে নয়—রাস্তার ওপরেই। কি করব ভাবছিলুম। বাচ্চা হবে ব'লেই বোধ হয় কুকুরটা মাঝে মাঝে এমন ক'রে কেঁদে কেঁদে উঠছিল। আমি বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। সহসা রাত্রির নির্জনতা ভেদ ক'রে একটা অতি গভীর কিন্তু অতি সূক্ষ্ম একটা কান্নার আওয়াজ এসে ধাক্কা খেল আমার কানের পর্দায়। কানের পর্দায় ধাক্কা খেয়ে আওয়াজটা মিলিয়ে গেল না। আমার সমস্ত মন ও দেহের ওপর কান্নার শব্দটা লুটোপুটি খেতে লাগল। আমি অস্থির হয়ে উঠলুম। একটা মোটর-গাড়ি প্রায় পঞ্চাশ মাইল বেগে কুকুরটার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। রত্না, এ শুধু মুহূর্তের মৃত্যু নয়, নয় সেই কুকুরটার আকস্মিক আর্তনাদও। নষ্ট-সৃষ্টির মূল থেকে প্রতিবাদের ভাষা গড়িয়ে পড়ছে বসুন্ধরার গা বেয়ে। ভাষার মধ্যে জ'মে উঠেছে অসহায়ত্বের ফোঁটা ফোঁটা জল। ভূ-ত্বকের প্রতি রোমকূপে তাই আজ শুনতে পাচ্ছি ফোঁটা-জলের কল্লোল। মোটর-গাড়ির চাকায় এ কল্লোলের দাগ পড়ে নি। পড়তে দেয় নি বিংশ শতাব্দীর সেই ছদ্মবেশী জন্তুগুলো। কিন্তু আমি ভাই ঘুমুতে পারি নি গত ত্রিশটা বছর। সেই কান্নাটা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আজ মনে হচ্ছে, কান্নাটা আসছে সৃষ্টি-রহস্যের মূল থেকে। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে এ রহস্যের সন্ধান মেলে নি। মেলে নি, তার কারণ কি ক'রে ভালবাসতে হয় তার শিক্ষা আমি পাই নি।···রাত এখন কটা হবে? বোধ হয় দুটোর কম নয়। কাশিয়ংয়ের নতুন বাড়িতে এই আমার প্রথম রাত্রি।

পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড়টা যেন শিবের মত ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। রাত এখন অনেক। কোন পার্বতীরই নূপুর-নিক্কণ শোনা যাচ্ছে না। বাঙালী পার্বতীর পক্ষে এত উঁচুতে উঠে নৃত্য করা সম্ভব নয়। কলকাতার নিউ এম্পায়ারের পাদপ্রদীপের সামনে শীততাপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যা টিকিট কেটে দেখা যায় তা কেউ পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে বিনা টিকিটেও দেখতে চাইবে না।

আমার বাড়িটা সেণ্ট মেরী পাহাড়ের নৃত্য-গীতবর্জিত ব্রতচারিণীদের তপস্যার মন্দির-সংলগ্ন চার কাঠা জমির ওপর অবস্থিত। একটু আগেই কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে সেণ্ট মেরী পাহাড়টাকে দেখবার চেষ্টা করেছিলুম। কলকাতার ক্রোড়ে যারা আজীবন লালিত পালিত, তাদের চোখে কাশিয়ং কেবল হাওয়া-পরিবর্তনের পাহাড় ছাড়া আর কিছু নয়। আমি কিন্তু জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে এলুম, কালো-কাপড়-পরা সেণ্ট মেরী ধ্যানমগ্না—প্রশান্ত এই পুণ্যপ্রহরটুকু আমি তাই নিজের কাছে ধ'রে রাখলুম। হৃদয়ের ধ্যানমন্থন অনুভব-অমৃতের রঙ ছাড়া শিল্পের সত্যরূপ প্রকাশ করা যায় কি? বিন্দু পরিমাণ অমৃতের খোঁজ করতে গিয়ে সারা জীবনটাই তো আমার ভেসে গিয়েছিল হলাহলের মহাসমুদ্রে! কলকাতা থেকে কাল যখন কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে এলুম, তখন কি মনে ক'রে একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। নীলকণ্ঠের কথা স্মরণ ক'রে তাঁর পায়ে মাথা নত করতে গিয়ে দেখলুম যে, আমার সমস্ত জীবনের বিষ এসে ছড়িয়ে পড়েছে সারা অস্তিত্বের ওপর। নিশীথ পাশের ঘরে হোল্ডঅল বাঁধছিল। দু ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করবার সময় মনে হ'ল, নিশীথের গলার ত্বকটা আর সাদা নেই, সবটাই নীল। নিশীথ কেবল সুপুরুষ নয়, শক্তপুরুষও বটে। নিশীথ আমার ভৃত্য। ভৃত্য ব'লেই ওকে আমি কলকাতার সাতাশ নম্বর ওয়ার্ডে ফেলে আসতে পারলুম না। আদমের পাপ যদি মানবজাতির স্বাভাবিক পাপ হয়, তা হ'লে নিশীথের পাপ আমি মাথায় ক'রে তুলে নিয়ে এলুম কাশিয়ংয়ের পাহাড়ে। ওকে তোরা ক্ষমা করিস।

রাত এখন অনেক। চোখের সামনে ঘড়ি নেই। দুটো ঘড়িই

আমি লেক প্লেসের ফ্ল্যাট থেকে কলকাতার রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছি। এতক্ষণে হয়তো বড়লোকদের গাড়ির তলায় ঘড়ি দুটো গুঁড়ো হয়ে গেছে। নিত্যকালের সময়ের সঙ্গে যার পরিচয় হয়, তার আর ঘড়ি রাখবার দরকার কি? সময়ের হিসেব রাখবার প্রয়োজন আমার ফুরিয়েছে। কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েই আমি চ'লে এলুম। পনরোটা বছর তো কলেজে লজিক আর দর্শনশাস্ত্র পড়িয়ে এলুম, আর কেন? ঘড়ি মিলিয়ে কলেজে গেছি। কেউ কোনদিনও অনুযোগ করতে পারে নি যে, আমি পনরো বছরের মধ্যে পনরোটা মিনিটও চুরি করেছি। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে গিয়ে ঢুকতুম ব'লে তুই নিজেই তো আমার পাংচুয়ালিটিকে মনে-প্রাণে অবজ্ঞা করতিস। তখন তুই আমার ছাত্রী ছিলি ভাবতে গিয়ে বুকের তলার বালিশটা সহসা পেরেকের মত ছুঁচলো হয়ে উঠল। বোধ হচ্ছে, পেরেকটা যেন অত্যন্ত চেনা। মধ্যপ্রাচ্যের কোন্ এক বধ্যভূমি থেকে প্রায় হাজার দুই বছর আগের সেই পুরনো পেরেকটাই লম্বা হয়ে আমার বুক পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। সর্বকালের মানবভাগ্য আজও দেখলুম পেরেকের মুখে নিষ্ঠুরতার রক্তে বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি। আমার গায়েও পেরেকের খোঁচা লাগছে। তা লাগুক। রক্ষণশীল ত্বকটাকে কলকাতার জন্তুগুলো স্পর্শ করতে পারে নি ব'লে সুচলো বালিশের মুখে বুকটাকে ঠেকিয়ে রাখতে ভালই লাগছে। রক্ষণশীলতার মূল্য না দিলে কিছুই হয়তো রক্ষা করতে পারতুম না। রোদে পোড়া ছেঁড়া কলাপাতার মত বুকের ত্বক আমার কেবল তামাটে হয় নি, ছিঁড়েও গেছে।...

রত্না, তোদের বিশ্বাস, জন্তুগুলোর নখের ধার আমার ত্বকের মসৃণতাকে বিক্ষত করেছে। কিন্তু... তুই জানিস না ভাই, সারাটা জীবন ধ'রে আমি বোধ হয় তপস্যা করছিলুম, কেবল একটু বিক্ষত ত্বকের তপ্ত অনুভব সংগ্রহ করবার জন্যেই। সে তপস্যায় আমার সিদ্ধি এল না। দুটো কচি মাড়ির মাঝখানে মগ্ন হয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না শুকনো দেহের সামান্যতম বিস্তৃতিও।

সেণ্ট মেরী পাহাড়ের পশ্চিম দিক থেকে মুরগী ডাকার শব্দ পাচ্ছি। নতুন প্রহর শুরু হ'ল। যে মুরগীটার গলা থেকে নতুন প্রহরের ঘোষণা আমি শুনতে পাচ্ছি, কে জানে কাল সকালেই হয়তো নিশীথ গিয়ে বাজার থেকে তাকে কিনে নিয়ে আসবে। বাবুর্চিখানার বড় ডেকচিতে মুরগীটাকে সেদ্ধ করবে নিশীথ। নিশীথ—নিশীথ—

শেষের নামটা জয়ী বসু চিঠিতে লিখতে পারলেন না। থেমে থেমে আরও বার তিনেক নাম ধ'রে ডাকলেন তিনি। প্রথম ডাকের পরে গলার শক্তি তাঁর শিথিল হয়ে আসতে লাগল। হাতের কলমটা প'ড়ে রইল আলগা ভাবে আঙুলের মাঝখানে। দেহটা কেমন অবশ হয়ে গেছে, মুখটা নেতিয়ে পড়ল চিঠির ওপর। রয়েল ব্লু কালি দিয়ে লেখা অক্ষরগুলোর সঙ্গে লাল রঙের সংমিশ্রণ ঘটল। মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে দু ফোঁটা। সেই দু হাজার বছরের পুরনো পেরেকটা বুকে এসে বিঁধল না কি? জয়া বসু জ্ঞান হারিয়েছেন।

দুখানা পাশাপাশি ঘর পার হ'লেই একটু ফাঁকা জায়গা—করিডোর। তারই ঈষৎ পূবদিকে যে-ঘরখানা আছে তাতে নিশীথ রাত্রে ঘুমুবে। নিশীথকে নিজের শয়ন-কামরা থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন জয়া বসু নিজেই।

কি কারণে নিশীথ আজ এত রাত অবধি জেগে ব'সে ছিল তা সে জানে না। চিঠি লেখবার প্রয়োজন নিশীথের নেই, থাকলেও সে লিখতে পারত না। নিশীথ লিখতে পড়তে জানে না।

সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জয়াদির গলার আওয়াজ সে শুনতে পেয়েছে। নিরক্ষর নিশীথের বিদ্যা নেই বটে, কিন্তু কান আছে। জয়াদির ডাক সে শুনতে পেয়েছে। করিডোরের ফাঁকা আয়তনের মধ্যে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল জয়া বসুর প্রিয়তম ভৃত্য শ্রীনিশীথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দশ বছর ধ'রে সে চাকরি করছে। মাঝরাত্রে জয়াদিদির ঘরে সে কোনদিনই যায় নি। গত দশ বছরের মধ্যে তিনি দরজায় খিল লাগাতে ভুল করেন নি। কলকাতার লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে তিন-চারটে

মানুষকে নিয়ে কত বড় ইতিহাসই না রচিত হয়েছে, কিন্তু মাঝরাত্রে সে কখনও তাঁর শয়ন-কামরায় ঢুকতে পারে নি।

ঢোকবার সুযোগ ওর এসেছিল। এক দিন নয়, অনেক দিন। তখন সবেমাত্র ও চাকরি নিয়ে এসেছে। জয়াদিদির বয়স তখন সাতাশ কি আটাশ। ওর নিজের বয়স পঁচিশের বেশি নয়। কিন্তু জয়াদিদি ওর হাতের রেখা দেখে ব'লে দিয়েছিলেন, নিশীথ, তুই আমার চেয়ে এক বছরের বড়। আমার সাতাশ; তোর আটাশ। নিজের মা বেঁচে থাকলে, হাতের রেখার অঙ্ক তিনি ভুল প্রমাণ ক'রে দিতে পারতেন। কারণ, নিশীথের স্পষ্ট মনে আছে, মা যখন মারা যান তখন ওর বয়স ছিল পাঁচ। কিন্তু জয়াদির হিসেবের পর থেকে সে কখনও বয়স নিয়ে মাথা ঘামায় নি। সে এসেছে বাড়ির কাজ করতে। রান্না এবং ঘরদোর সাফ করবার কাজে তার দরকার গায়ের জোর। দু-চার বছর বয়স তার বাড়ল ব'লে গায়ের জোর তার এক রত্তিও ক'মে যায় নি। কিন্তু জয়াদি ওর বয়সের হিসেব নিয়ে বড্ড বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। কেন করতেন, নিশীথ তা বুঝতে পারত না। বুঝতে পারত না ব'লেই লেক প্রেসের ফ্ল্যাটে সে কোন কোন দিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে পড়ত। মনে হ'ত, জয়াদিদি ওকে ডাকছেন। তাঁর ঘরের বাঁ দিকে একটু আড়াল মত জায়গা ছিল। নিশীথ ঘুমের চোখে এসে দাঁড়াত সে জায়গাটায়। খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে সে দেখত, জয়াদি অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুলগুলোকে টেনে টেনে খুলে ফেলছেন, না, ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন, নিশীথ তা কয়েক বছর পর্যন্ত সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি। আজ দশ বছর পরে সে অনেক কথাই বুঝতে পারে। বুঝতে পারে ব'লেই জয়াদির কাজে সে আজও ইস্তফা দেয় নি।

আজ আবার সে এসে দাঁড়াল ফাঁকা জায়গাটায়। কাচের জানলাটা বন্ধ ব'লে এখানে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। ভেতরের আলো থেকে নিশীথ অনুমান করল, জয়াদিদি জেগে রয়েছেন। গত

দশ বছরের মধ্যে তিনি ক'টা রাতই বা আর ঘুমিয়েছেন? শোবার ঘরে তাঁর ঢুকতে পারে নি বটে, বাইরে দাঁড়িয়েই নিশীথ জয়া বসুর সঙ্গে সঙ্গে রাত জাগছে পুরো দশটা বছর। কি কষ্ট তাঁর? কেন কষ্ট? নিশীথ বুঝতে পেরেছে যে, জয়াদিদির দেহ এবং মনের মধ্যে কষ্টের নুড়িগুলো আজ বোধ হয় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠেছে। সে নিজে পাহাড়টাকে ভেঙে দিতে পারে না—পারে না তাঁর কষ্টের ছোট্ট নুড়িটাকেও টান মেরে ফেলে দিতে। নিশীথ জয়াদিদির চাকর। রান্না এবং ঘরদোর সাফ করবার কাজের বাইরে সে কেমন ক'রেই বা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে? কি মনে ক'রে নিশীথ করিডোরের দক্ষিণ দিকের জানলাটা খুলে দিল।

ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। কার্শিয়ং পাহাড়ের কোথাও কোনও শব্দ নেই। জানলা থেকে হাত পাঁচেক দূরে একটা বিলিতী ঝাউগাছ আছে। গাছের পাতা থেকে টুপটুপ ক'রে জল পড়ছে—ফোঁটা ফোঁটা হিম।

হঠাৎ একটা গোঙানির আওয়াজ এল নিশীথের কানে। আওয়াজটা যেন পাহাড়ের দিক থেকেই উঠেছে ব'লে মনে হ'ল ওর। আওয়াজটার মধ্যে একটা কান্নার সূক্ষ্ম সুর ছিল। মিহি রেশমী সুতোর মত সেই সুরটা যেন পাহাড়ের অন্ধকার অবয়বের ওপর দিয়ে পিছলে প'ড়ে গেল নীচের দিকে। নিশীথ খোলা জানলার ওপর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। মাথাটা নীচু ক'রে ঝাউ গাছের তলায় দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে রইল দু-এক মিনিট। না, সেখানে কোন সুর নেই। হিম পড়ার শব্দ আছে। পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ঠাণ্ডা বুকে ব'সে গেলে বিপদ ঘটতে পারে। জানলাটা বন্ধ করতে করতে নিশীথ ভাবল, পাহাড়টাও হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। ব্যথার নুড়িগুলো ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলে হয়তো ওই পাহাড়ের বিরাট দেহটা থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরোয়। সহসা নিশীথের মনে একটা কথা ভেসে উঠল। কি যেন কথাটা? জানলায় ছিটকিনি লাগাতে গিয়ে কথাটা সে চকিতের মধ্যে প্রায় ভুলে গিয়েছিল।

জয়াদিদি পাহাড়টার মতই নিজের বুকের তলায় ব্যথার নুড়িগুলোকে লুকিয়ে রেখেছেন। নুড়িগুলো তাঁর ধৈর্যের বেড়া আজও ভাঙতে পারে নি। কলকাতার লক্ষ লক্ষ চিঠির মধ্যে তিনি তাই হিমালয়ের মত উঁচু হয়ে রইলেন। কিন্তু—

নিশীথ দ্বিতীয়বার গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেল। এবার আর ওর দিক্‌নির্ণয়ে ভুল হ'ল না। জয়াদির ঘর থেকেই আওয়াজটা আসছে। সে এসে দাঁড়াল দরজার বাইরে। কাচের দরজা। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। কাচের ওপর চোখ রেখে সে দেখবার চেষ্টা করল বার কয়েক। কি করবে নিশীথ? মধ্যরাত্রে জয়াদির ঘরে ঢুকবে কি ক'রে? ভেতর থেকে দরজা নিশ্চয়ই বন্ধ আছে। বন্ধ আছে কি না পরীক্ষা করতে গিয়ে দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল। নিশীথ দেখলে, জয়াদির মাথাটা মচকানো ডালেই মত নুয়ে পড়েছে চিঠির ওপর। ঘাড়টা ধনুকের মত বাঁকানো। ঘাড়ের নীচে থেকে গোটা দেহটাই তাঁর বড্ড এলোমেলো। এমন খোলাখুলিভাবে জয়াদিকে নিশীথ কখনও দেখে নি। ফাঁক-করা দরজাটা সে সহসা বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে দিল। পশমের পুলওভারের তলায় হাত চালিয়ে দিয়ে নিশীথ বুঝতে পারলে, কোথায় কি যেন একটা নড়চড় হয়ে গেছে।

নড়চড় হ'ত না নিশীথ যদি সঠিকভাবে জানতে পারত, জয়া বসুর দেহটা মৃতদেহ। বাইরে দাঁড়িয়ে সে মনের বাঁধন শক্ত করতে লাগল। চোখের সামনে ভাসিয়ে তুলল একটা মৃতদেহ। জয়াদির দেহটাকে মৃতদেহ ভাবতে ভাবতে নিশীথ ঢুকে পড়ল ঘরে। দেহ-থেকে-স'রে-যাওয়া লেপটা টান দিয়ে তুলে নিয়ে এল জয়াদির ঘাড় অবধি। পায়ের গোড়ালিটা পর্যন্ত তাঁর লেপ দিয়ে ঢেকে দিতে ভুল করল না নিশীথ।

জয়া বসুর দেহটা মৃতদেহ নয়। নিশ্বাস বন্ধ হয় নি। নিশীথ তাড়াতাড়ি ক'রে নিজের হাত দুটো জয়া বসুর গলা এবং পেটের দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে লেপে-ঢাকা দেহটাকে চিৎ ক'রে শুইয়ে দিল। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে সে তাঁর চোখ এবং কপালের ওপর জলের ছিটে দিতে লাগল। একটু পরে চোখ খুললেন জয়াদি।

মূর্ছা গিয়েছিলুম, না রে নিশীথ?

হ্যাঁ। নিশীথ আলনা থেকে একটা ছোট্ট টাকিস তোয়ালে এনে জয়া বসুর কপালের জল মুছিয়ে দিতে দিতে তোয়ালে-সুদ্ধ হাতটা নামিয়ে নিয়ে এল তাঁর ঠোঁট পর্যন্ত। তোয়ালের পেছনে দুটো আঙুল আলাদা ক'রে নিশীথ যতদূর সম্ভব আঙুলের মাংসটুকুকে মোলায়েম এবং মসৃণ করবার চেষ্টা করতে করতে বললে, কস বেয়ে একটু রক্ত পড়েছে, দেখি, মুছিয়ে দি।

দে, আজ আর আমি আপত্তি করব না। নিশীথ—

দিদিমণি।

তোর বয়স কত রে?

দশ বছর আগে আমি যখন তোমার কাছে কাজ করতে আসি, তুমি আমার হাত দেখে বলেছিলে আটাশ।

না, ভুল বলেছিলুম। আমার চেয়ে তোকে বড় করবার জন্যেই আমি ভুল হিসেব করেছিলুম। তুই আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট।

সেই জন্যেই তো তোমায় আমি প্রথম দিন থেকেই 'দিদি' ব'লে ডাকি।

জয়া বসু উঠে বসলেন। চিঠির দিকে চেয়ে তাঁর মনে পড়ল, রত্নাকে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখছিলেন। আজ রাত থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেছেন। আত্মজীবনী লেখবার প্রথম রাতটাতে তাঁর মূর্ছা যাওয়া উচিত হয় নি। রয়েল ব্লু কালির সঙ্গে বুকের রক্ত মিশে সাদা কাগজটার ওপর একটা ছবি ফুটে বেরিয়েছে। কার ছবি এটা? সীমাবদ্ধ পৃথিবীর মধ্যে যেন লাঞ্ছিত মানুষের মিছিল চলেছে, লোকারণ্য, ভিড়—ভিড় আর ভিড়। একান্ন নম্বর পার্কারের মুখে রয়েল ব্লু কালি এঁকে এঁকে চলেছিল কতকগুলো বিকৃত অক্ষর। ভিড়ের কাছ থেকে সহানুভূতি আদায় করবার স্বার্থান্বেষী প্রতীক্ষা ছিল প্রতিটি আঁচড়ের মধ্যে। বুকের রক্ত দিয়ে এবার তিনি লাঞ্ছনার মধ্যে সত্যের আলেখ্য ফুটিয়ে তুলবেন। লাঞ্ছনাকে সুন্দরের স্তরে টেনে তুলতে না পারলে পার্কারের মুখে সত্য আসবে কি ক'রে? রয়েল ব্লু কালি আর রক্তের

মধ্যে জয়া বসু একটা সমন্বয়ের সেতু দেখতে পেলেন। কুমারী জীবনের সবচেয়ে বড় কামনাটা যেন দেহাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এল রাজমুকুট মাথায় দিয়ে। রথে চেপে পার হচ্ছে সমন্বয়ের সেতু।

নিশীথের সামনে আর তাঁর লজ্জা নেই। লুকিয়ে রাখবার মত আর তাঁর কি আছে? দশ বছর পরে আজ তাঁর কাছে রাত্রিটা বড় ভাল লাগছে। কুমারী-জীবনের সবচেয়ে উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষাটা নিশীথের দু বাহুর মধ্য দিয়ে মুক্তি পেল আজ। সেণ্ট মেরী পাহাড়ের ধ্যানমগ্ন পুণ্য-প্রহরের মধ্যে লোপ পেল জয়া বসুর দৈহিক চঞ্চলতা। উড়োজাহাজের ভাড়া জুগিয়ে পাহাড়ের উচ্চতায় এসে না উঠলেও মানব-জীবনের উচ্চতা তিনি দেখতে পেয়েছেন। দেখিয়েছে নিশীথ, ভবতোষ নয়।

দিদিমণি, এমন দুর্বল শরীর নিয়ে কলকাতা থেকে হঠাৎ না চ'লে এলেই পারতে। ভবতোষবাবুকে কাল একটা তার পাঠিয়ে দিই এখানে আসবার জন্যে?

না, নিশীথ। ভবতোষ আমাদের কেউ না।...একটু ব্র্যাণ্ডি দে তো। এক পেয়ালা গরম কফি এনে দিই?

না। রাত্রির দুর্বলতা আমার বড্ড সাংঘাতিক রোগ। নিশীথ, তুই বোধ হয় জানিস না, গত দশ বছরের মধ্যে আমি রাত্রিবেলা ঘুমুই নি? রাত্রে আমার ঘুম আসে না রে।

আমি জানি। সেই জন্যে তুমি দিনের বেলা ঘুমোতে। ঘুম থেকে উঠেই এক রকম সোজা চ'লে যেতে কলেজে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও রাত জেগেছি। অবিশ্যি, সাবিত্রীর জন্যেও আমায় রাত জাগতে হ'ত। কফি আনব?

না। বোতলটা এখানে নিয়ে আয়।

ব্র্যাণ্ডি খাওয়ার পরে জয়া বসু একটু সুস্থ বোধ করলেন। নিশীথ দাঁড়িয়ে ছিল সামনেই।

দিদিমণি, লেখাটা কি জরুরী? কাল লিখলে হয় না? আজ না হয় একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

আর পাঁচ মিনিট আমায় সময় দে। তারপরে...আজ আমার ঘুম

আসবে। প্রথম রাত্রির ঘুম আমার সমস্ত অনুভূতি ছেয়ে উড়ে আসছে কোন্ এক অজানা আকাশ থেকে। প্রতি রোমকূপে আমার ঘুমের নেশা লেগেছে। নিশীথ, যাচ্ছিস?

তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়। দরজাটা খোলাই থাক্।

যদি চোর আসে?—এই ব'লে জয়া বসু ঘরের উত্তর দিকে দৃষ্টি ফেললেন। একটা ষোল ইঞ্চি মাপের সুটকেস ছিল সেখানে। সেদিকে চেয়েই তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। মরণের ডাক্ আমি শুনতে পেয়েছি।...কাম, ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি সবই আমার ছিল। কোন কিছু কাজে লাগল না। স্বভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলুম সারাটা জীবন। নিশীথ—

দিদিমণি।

সুটকেসের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, মরণের পরে মানুষ আবার জন্মায় নাকি রে?

শুনেছি পাপ করলে জন্মাতে হয়।

আমার তবে কি হবে নিশীথ? সুটকেসটা কোথায় রেখে যাব? ফিরে এসে সুটকেসটা কি পাব?

কি আছে ওতে? তোমার ঘরদোরের সব খবরই আমি রাখি। কিন্তু ওই সুটকেসটা তুমি আমায় কখনো ছুঁতে দাও না। ওতে কি রেখেছ দিদিমণি?

মিস জয়া বসু বললেন, ওতে আমি গোটা জগৎটাকে আটকে রেখেছি—বস্তুজগৎ। তোকে সব কথা আমি বোঝাতে পারব না। যাদের তুই আমার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে দেখেছিস, তারা সবাই আছে ওই সুটকেসটার মধ্যে। আছে ভবতোষও। একজনকে কেবল আমি ওখানে ধ'রে রাখতে পারলুম না—কেবল একজন। নিশীথ, আমি যখন ম'রে যাব, তখন ওই সুটকেসটা তুই চুরি করতে পারবি?

না।

কেন?

চুরি করা মহাপাপ।

আমার জন্যে একটু পাপ করতে পারবি না? তা ছাড়া, সুটকেসটা যদি চুরি করতে না পারিস, তা হ'লে সংসারটা যে ওখানে আবদ্ধ হয়ে থাকবে? ভবতোষদের মুক্তি দেবে কে?

গাদা গাদা বই প'ড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বরং কাল ভবতোষবাবুকে এখানে আসবার জন্যে একটা তার পাঠিয়ে দিই।

দিস, আমি যখন আর থাকব না। তার পেলে ভবতোষ আসবে আমি জানি। নিশীথ, একটা কথা আমার মনে পড়ল, শুনবি?

বল। নিশীথ এগিয়ে এল খাটের দিকে। কার্শিয়ংয়ের প্রথম রাত্রিটা সবচেয়ে কালো নয় বটে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি রহস্যাবৃত ব'লে মনে হ'ল ওর। দশ বছর পরে, জয়াদিদিকে যেন সে নতুন ক'রে দেখছে। কলকাতার মানুষরা সবাই তো তাঁকে অপবাদ দিত, কুৎসা রটাত দিন-দুপুরেও। সেই জন্যেই তাঁকে কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়েছে। কিন্তু নিশীথ কখনও জয়াদিকে পাপ করতে দেখে নি, মদ খেতে দেখেছে। মদ খেলে পাপ হয় ব'লে সে বিশ্বাস করে না। নিরক্ষর লোকের পক্ষে এমন বিশ্বাসটাকে এতকাল টিকিয়ে রাখা সোজা কথা নয়। জয় দি যে পাপ করেন নি, তাও তো সত্যি নয়। নিশীথের ধারণা, উপযুক্ত সময়ে বিয়ে না করাটাই হচ্ছে আসল পাপ। কিন্তু কলকাতার সমাজ তাই বা হতে দিল কই? এমন ক'রে কুৎসা রটালে, কে আসবে তাঁকে বিয়ে করতে? গত দশ বৎসরের মধ্যে সে গাদা গাদা লোক দেখেছে জয়াদির বসবার ঘরে। দিনের পর দিন তাঁরা গল্প ক'রে গেলেন, বিকেলের চা থেকে রাত্রের ডিনার খাওয়া পর্যন্ত সবই শেষ করলেন জয়াদির পয়সায়। কিন্তু ফল কি হ'ল? তাঁরাই তো জয়াদির বিরুদ্ধে শত্রুতা করলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁর বসবার ঘরে সুপুরুষের অভাব ছিল না। অভাব ছিল কেবল বীরপুরুষের। ভবতোষবাবুই বা কি? বিলেত-ফেরত শিক্ষিত লোকটা নাকি জয়াদিকে ভালবাসতেন! তারপর যে কি সব গণ্ডগোল বেধে গেল, নিশীথ তার খবর রাখে না। দেখতে জয়াদি কোনদিনই সুশ্রী ছিলেন

না। কুৎসিত বললেই বরং সত্য বলা হবে। ওপরের দাঁতগুলো একটু সামনের দিকে বেরিয়ে রয়েছে। গায়ের রঙ কালোই বলা চলে। কিন্তু দাঁত কিংবা গায়ের রঙটাই তো মানুষের সবটুকু সৌন্দর্য নয়। তা ছাড়া সত্যিকারের ভালবাসা থাকলে কে কবে গায়ের রঙ কিংবা দাঁত দেখতে যায়? বিয়ে না করার জন্যে জয়াদির যদি পাপ হয়ে থাকে, তবে সে পাপের জন্যে দায়ী ভবতোষবাবু।

আরও একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে জয়া বসু বললেন, আমি আবার জন্মাতে চাই নিশীথ।

তা বেশ। কিন্তু এবার বাপু জন্মাবার সময় স্বামী-পুত্র সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। বোতলটা দাও দিকি, সরিয়ে রাখি। দুর্বল ব'লে একটু-আধটু ব্র্যাণ্ডি খাওয়া ভাল, কিন্তু বেশি খাওয়া ভাল নয়। বাড়াবাড়ি করলে আমি রত্নাদিকে কলকাতা থেকে ডেকে নিয়ে আসব। নিশীথ ব্র্যাণ্ডির বোতলটা সরিয়ে রেখে এল আলমারিতে। জয়া বসুর হাতের গেলাসের দিকে চেয়ে সে বললে, তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলো। গলা দিয়ে রক্ত পড়েছে।

তা পড়ুক। আমি আবার জন্মাতে চাই নিশীথ। গেলাসটা এবার ধর্। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম? ও, হ্যাঁ, আমার নতুন জন্মের কথা। শোন্, পাখী হয়ে জন্মাতে গেলে কি কি পুণ্য করতে হয় রে? কি মজাই না হবে! অন্ধকার গাছের ডালে ব'সে ইচ্ছেমত আমি তাঁকে ভালবাসতে পারব। আঃ, ভালবাসা! সমাজ নেই, সংসার নেই—ভবতোষরা উঁকি দিতে আসবে না, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিসেস সুজাতা রায় কৈফিয়ৎ চাইবেন না···বড্ড শীত করছে নিশীথ, লেপটা একটু পিঠের দিকে তুলে দে তো।

ও নিঃশব্দে নিশীথ আদেশ পালন করল। গত দশ বছরের পুরনো আদেশগুলোর সঙ্গে আজকের আদেশগুলো একেবারেই মিলছে না। তবু ভাল লাগছে আদেশ পালন করতে। কার্শিয়ংয়ের প্রথম রাত্রিটা ক্রমশই সুন্দর হয়ে উঠছে। ধারে-কাছে কোথাও বিবাহযোগ্য বীরপুরুষ নেই বটে, তবু জয়াদির মুখে ভালবাসা শব্দটা খুবই সুন্দর শোনাচ্ছে।

ভালবাসা কেবল সুন্দর ব'লে নয়, তাঁর মুখে কথাটা প্রথম ধ্বনিত হচ্ছে ব'লেও নিশীথের বিস্ময় ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল। জয়াদি কলেজে পড়াতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁকে কথা বলতে হয়েছে। কথা, কথা আর কথা। কিন্তু আজকে সে বুঝতে পারছে, জয়াদির মুখে কেবল কথা নেই, ভাষাও আছে। শুধু ঠোঁট নাড়লেই বোধ হয় এমন ভাষা কেউ সৃষ্টি করতে পারে না ব'লেই ওর বিশ্বাস। ওর বিশ্বাসটাকে দৃঢ় করবার জন্যেই যেন জয়া বসু বলতে লাগলেন, সারা জীবন ধ'রে যদি আমি তাঁর পাশে ব'সে থাকি—মানে গাছের ডালে, কে আমায় বাধা দেবে? প্রতি মিনিটে একটা ক'রে পুণ্য না করলে মানুষ সম্ভবত পাখী হতে পারে না। পাখীর ঠোঁট আমার ভাল লাগে নিশীথ। আঃ, ঠোঁট। গাছের ডালে ব'সে দুটিতে মিলে পাশাপাশি রাত কাটাব। দিনের বেলায় যার খাবার সংগ্রহ ক'রে আনতে। আমার নিজের ঠোঁটে ক'রে গম আর চালের দানাগুলো তুলে নিয়ে আসব। কলকাতা কিংবা দিল্লীর খাদ্যমন্ত্রীর শাসন-নিয়ন্ত্রণ আমি মানব না। ক্ষিধের অন্ন যারা কেড়ে নেবে তাদের আমি ঠুকরে ঠুকরে গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেব। মনের অন্ন যারা সামাজিক আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে আসবে, তাদের ঘরে আমি রেখে আসব প্লেগের বীজাণু। নিশীথ, তোদের পৃথিবীটা এত বেশি সাংঘাতিক হয়ে উঠছে যে, প্লেগের বীজাণু পর্যন্ত মানুষরা সব হজম করবার ওষুধ তৈরির চেষ্টা করছে। কিন্তু পারবে না। কিছুতেই পারবে না। তিনি ছাড়া তেমন ওষুধ আর কেউ তৈরি করতে পারবেন না।

তিনি কে দিদিমণি?

তুই।—কথাটা ফস ক'রে ব'লে ফেলেই জয়া বসু সঙ্গে সঙ্গে নিশীথের দিকে হাত বাড়িয়ে পুনরায় বললেন, দুশ্চিন্তার আর কারণ নেই নিশীথ, আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। রক্তাদর পায়ের নূপুরে—। আর একটু ব্র্যাণ্ডি দিবি? দুর্বল বোধ করলেই ডাক্তার আমায় ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছেন।

না, মদ আর তুমি খেতে পাবে না। মদ খাওয়া তোমায় কে

শেখাল দিদিমণি?—আলোটা নিবিয়ে দেবার জন্যে সুইচের দিকে হাত বাড়িয়ে প্রশ্ন করলে নিশীথ।

কেউ না, কেউ না। বোধ হয় ভবতোষ শিখিয়েছে।—এই ব'লে জয়া বসু লেপের তলায় ঢুকে পড়লেন। শুয়ে পড়লেন লম্বা হয়ে। নিশীথের মনের স্বাভাবিকতা এলোমেলো হয়ে গেল। মাসকাবারে মাইনে নিয়ে এখান থেকে স'রে পড়বে না কি? আপাতত আলোটা নিবিয়ে দিয়ে চ'লে যাবার জন্যে নিশীথ সুইচটা টিপতে গেল। এমন সময় জয়া বসু লেপের তলা থেকেই ঘোষণা করলেন, আর আমার ভয় নেই। মদের চেয়েও বড় নেশার সন্ধান আমি পেয়েছি। সন্ধানটা কে দিল, জানিস? তুই। মানে, কি বললাম যেন? সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। লেপের তলায় কী ভীষণ অন্ধকার! গাছের ডালটা কোথায় রে? তিনি কোথায়?

নিশীথ আলোটা এবার নিবিয়ে দিলে।

তুই চললি নিশীথ?—লেপের অন্ধকার থেকেই প্রশ্ন করলেন জয়া বসু।

দরজার কাছে গিয়ে নিশীথ বললে, যাচ্ছি। অনেক রাত হয়েছে।

পা দুটো তোর একটু এগিয়ে নিয়ে আয় না রে।

কেন?

ধুলো নেব। তোর সৌন্দর্য তো শরীরে নেই, আছে পায়ে। তুই যে ব্রাহ্মণ।

আমি চাকর।

তুই আমার ঠাকুর।

তুমি আমার দিদি—জয়াদিদি।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিশীথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

[ক্রমশ]

দীপক চৌধুরী

আত্মস্মৃতি

তৃতীয় প্রবাহ—দ্বাদশ তরঙ্গ

'বঙ্গশ্রী' ও রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

১৩৩৯ পৌষেই প্রকৃতপক্ষে আমি গদিতে বসিলাম। ১লা মাঘ প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' বাহির হইবে; তোড়জোড় শুরু হইয়া গেল।

তোড়জোড় অর্থে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের প্রত্যহ আকর্ষণ করিয়া আনিবার মত আড্ডা জমানো। 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'র কল্যাণে আর কোনও কাজে না হউক, ওই কার্যটিতে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলাম। মূলধন ছিল অসীম ধৈর্য। বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত কুরূপ-প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী-কটুভাষী বেকুব-বুদ্ধিমান ভাবুক-কর্মী সৎ-বদমাস বহুবিধ বিচিত্র মানুষকে লইয়া যিনি দুনিয়ায় আসর জমাইতে পারেন, তিনিই অবতার-রূপে পূজিত হন। এরূপ একটি ছোটখাট অবতার না হইলে মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে কাগজ চালানো সম্ভব নয়। আমার ত্রিশ বৎসরের কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতায় এই প্রত্যয় দৃঢ়তর হইয়াছে। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা অধিক ভাবপ্রবণ, কাজেই সম্পাদকত্বে প্রতিষ্ঠা অবতারত্বে প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা দুরূহতর সাধনা। আমি স্বভাবসুলভ ধৈর্য ও দীর্ঘদিনের অভ্যাসের দ্বারা এই সাধনায় প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম। ধৈর্যের দিক দিয়া আমার আদর্শ ছিলেন একমাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আমি যখন তাঁহার সংস্পর্শে আসি তখন আড্ডা জমাইবার বয়স তাঁহার ছিল না, তবে যৌবনে 'দাসী' 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী'র প্রারম্ভযুগে তিনি যে সাহিত্য-মজলিসী ছিলেন তাহার প্রমাণ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের "বাঙাল হাঁকুড়াবাসী দুষ্ট রামানন্দ" প্রভৃতি কবিতার পংক্তিতে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘজীবনের কয়েকটি খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন বৎসর 'সাধনা' 'ভারতী' 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) 'ভাণ্ডার' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতির সম্পাদকত্ব করিতে গিয়া এমনই বিপর্যস্ত হইয়াছিলেন যে, পত্রিকা-সম্পাদকের কাজের কথা মনে হইলেই বিভীষিকা দেখিতেন; কাহারও নিষ্ঠুরতম পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিলে তিনি বলিতেন, লোকটা মরিয়া মাসিকের সম্পাদক হইবে।

সাহিত্যিকের জীবনে ইহা অপেক্ষা কঠিন শাস্তি তিনি কল্পনা করিতে পারিতেন না। অনেক দিনের তালিমী সত্ত্বেও 'বঙ্গশ্রী'র আমলে বিবিধ জনসমাগমের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমিও মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতাম—'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র নকল গুরু শিয়ালমারার মত বিদ্রোহ করিতে ইচ্ছা হইত। বহু কষ্টে সামলাইয়া লইয়া আসর জাঁকাইয়া বসিয়া থাকিতাম। গুণী ও সুধী ব্যক্তিরা আসিতেন, অবসর ও মর্জি মত আড্ডা দিয়া চলিয়া যাইতেন। আমি একা স্থাণুবৎ সম্পাদকীয় চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়া তিতিক্ষার পরীক্ষা দিতাম। পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, মৎসম্পাদিত দুই বৎসরের 'বঙ্গশ্রী'ই তাহার প্রমাণ।

এ যুগের সাময়িকপত্র-পরিচালকদের আমার এই কাহিনী হইতে কিছু শিখিবার আছে। পত্রিকা-আপিসে ঢালাও আড্ডা অর্থাৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতি যথোপযুক্ত সমাদরের অভাবে আমাদের কালেই বহু জমজমাট পত্রিকার পতন হইয়াছে, অনেকগুলি বিলকুল মরিয়া গিয়াছে। সাহিত্যিকের আড্ডাই সাহিত্য-পত্রিকার প্রাণ; ঢিলাঢালা স্বাচ্ছন্দ্য, তক্তপোশ তাকিয়া তামাক তাম্বুল, অবাধ রাজা-উজিরমারী গল্প অথবা তীক্ষ্ণ কথার তরবারিক্রীড়ার মধ্যেই সাহিত্যের আড্ডা স্ফূর্তি লাভ করে। আজকালকার টেবিল-চেয়ার-টেলিফোন-সমন্বিত সাময়িক পত্রিকার আপিসগুলি পাশ্চাত্ত্য আদর্শে নিছক কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি-ধরা ভাবে চালাইতে গিয়া কর্তৃপক্ষ হয়তো ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করিতেছেন, কিন্তু কাল্‌চু স্বর্ণখণ্ডরূপ আড্ডার অভাবে সাহিত্য—মকরধ্বজে দানা বাঁধিতেছে না, স্বর্ণসিন্দূরেই ব্যর্থ হইতেছে। সাহিত্যের বিকাশ ও প্রকাশের পক্ষে মা-লক্ষ্মীর চেক-দাক্ষিণ্যই যথেষ্ট নয়, চক্রে বসিয়া চা ও চুরুট সহযোগে বাক্ ও বাৎ-এর অবাধ সাধনাও প্রয়োজন। শুধু সাহিত্য-পত্রিকার আপিসগুলিই নয়, শিল্পীদের স্বর্গধাম অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওর কলিকাতা শাখারও ফরসি-ফরাস ছাড়িয়া বিলাতীকেতাদুরস্ত হইতে গিয়া সাহিত্যিক-শিল্পীদের কাছে আর সে আকর্ষণ নাই। তাহার ফল ভাল হয় নাই।

সম্পাদক-কাম-জেনারেলম্যানেজাররূপে ৫৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট ভবনের

দখল পাইয়াই আমি সর্বাগ্রে আড্ডার সুব্যবস্থা করিলাম। তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য-জীবনে' লিখিয়াছেন—

"'বঙ্গশ্রী'র আসরে সজনীকান্তের মহল ছিল তিনটে। প্রথম মহলে থাকতেন কিরণ রায়, তিনি আপ্যায়িত করতেন নূতন আগন্তুকদের; তার পরের মহল ছিল সজনীকান্তের সম্পাদকীয় দপ্তর; এখানেই বসত এই বিখ্যাত মজলিস। এর পর ছিল তাঁর খাসমহল, এখানে চারিদিকে ঠাসা ছিল হাজার পাঁচেক বই, এরই মধ্যে তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন এবং গভীর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।"

তারাশঙ্কর আর একটা মহলের খবর দিতে ভুলিয়াছেন। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের শাস্ত্রপ্রকাশ-বিভাগের সদাচারসম্পন্ন পণ্ডিতেরা ফরাস-তাকিয়া-সজ্জিত একটা প্রকাণ্ড হলঘরে পুথিপত্র খুলিয়া কাজ করিতেন। তাঁহারা বিদায় হইলে মাঝে মাঝে সেটি হইত আমাদের সঙ্গীত-জলসা-মহল। প্রধানত নলিনীদা—নলিনীকান্ত সরকার এই আসরে একসঙ্গে আদি ও অনাদি রসের জোগান দিতেন, আমরা চিৎ অথবা কাৎ হইয়া সুরতানময় রসের সাগরে ভাসিতে থাকিতাম। সেটিকে নিষিদ্ধ মহলও বলা চলে।

এই চার মহলের চার ফেলিয়া শাশ্বত সহকারী কিরণকুমারকে পুরোভাগে রাখিয়া আমি ধৈর্যসহকারে বসিয়া থাকিতাম। সৌভাগ্যক্রমে শুরু হইতেই রুই-কাৎলা-চুনো-পুঁটির সমাগম হইতে থাকিত। রাঘব-বোয়াল-হাঙ্গর, তিমি-তিমিঙ্গিল জাতীয় দুই-একজন যে না আসিতেন তাহা নহে। তারাশঙ্কর তালিকা দিয়াছেন—

"অধ্যাপক সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমূল্য সেন, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ, স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত সরোজ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, চিত্রকর শ্রীযুক্ত চৈতন্য চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী অরবিন্দ দত্ত, স্বর্গীয় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়,...মধ্যে মধ্যে আসতেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, কবি অজিত দত্ত, বিখ্যাত চিকিৎসক উদার আশুতোষ শ্রীরাম অধিকারী; কখনও কখনও আসতেন শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়, শিল্পী শ্রীঅতুল বসু, শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে আসতেন এবং আসর জমিয়ে তুলতেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।"

কয়েকজন আড্ডাধারীর নাম এই তালিকায় বাদ পড়িয়াছে, যথা—ঢাকা-প্রবাসী মোহিতলাল মজুমদার, ডাঃ সুশীলকুমার দে ও ডাঃ

বটকৃষ্ণ ঘোষ (কলিকাতায় আসিলে), নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ডাঃ মনোমোহন ঘোষ, কবি কৃষ্ণধন দে, মনোজ বসু, মহাজনপদাবলী-বিশারদ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডাঃ প্রমথনাথ রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, স্ট্যাটিষ্টিশিয়ান যতীন্দ্রমোহন দত্ত, রূপদক্ষ যামিনীকান্ত সেন, "বৃদ্ধের বচন"খ্যাত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, সটীক শশাঙ্কমোহন চৌধুরী, পক্ষীতত্ত্ববিদ সুধীন্দ্রলাল রায়, কবি হেমচন্দ্র বাগচী, কবি সুধীরকুমার চৌধুরী, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও "কালোরবি" নামে খ্যাত 'নারায়ণে'র বহুনিন্দিত লেখক সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। আসর রীতিমত জমিয়া উঠিতে সপ্তাহ খানেকের বেশি সময় লাগে নাই। কাজী নজরুল ইসলাম রাত্রি গভীর হইলে কোন কোন দিন ধূমকেতুর মতন উদয় হইয়া চাদরের পুচ্ছতাড়নায় ও গানে পবিত্র শাস্ত্রপ্রকাশ-বিভাগকে পবিত্রতর করিতেন, সঙ্গে থাকিতেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—আমাদের পবিত্রদা। বন্ধুবর গোপাল হালদার তখন আলিপুরদুয়ারের বক্সাফোর্টে আটক ছিলেন, সুনীতিকুমার-মারফৎ তাঁহার দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠি আসিলে সকলে মিলিয়া পড়া হইত। মাদ্রাজ প্রবাস হইতে শিল্পী দেবীপ্রসাদ আসিলে হৈচৈ-এর অন্ত থাকিত না।

মোটের উপর, বাংলা-সাহিত্যে উদিত ও উদীয়মান প্রায় সকলেই আসিয়া ধরা দিয়াছিলেন; দীনেশ দাস, মুরলীধর বসু ও যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক) সহ গোটা 'কল্লোল'-'কালি-কলম' দলটাই আসিয়া জুটিয়াছিলেন, আসেন নাই কেবল অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব। অনেক পরে রামকৃষ্ণরসায়িত অচিন্ত্যকুমারের উদার স্পর্শ লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে, কিন্তু ধ্যানী-মৌনী বুদ্ধদেবকে টলাইতে পারি নাই।

'বঙ্গশ্রী'র বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য কি কি হইবে এবং ধারাবাহিক কোন্ কোন্ রচনা ইহাতে স্থান পাইবে অচিরাৎ স্থির হইয়া গেল। বিভাগগুলি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য—প্রচলিত পত্রিকাগুলি অপেক্ষা কিছু বৈচিত্র্য এই-গুলিতে ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন প্রভৃতি বিদেশী পত্রিকা হইতে সঙ্কলন করিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব

মনোরম ভঙ্গিতে সচিত্র "বিচিত্র জগৎ" লিখিতে লাগিলেন। বিষ্ণুশর্মা (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) আমাদের "অন্তঃপুরে"র অতি প্রয়োজনীয় কথা সরসভাবে লিখিয়া একটা নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিলেন, বাংলার আর্থারী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অচিরাৎ আসিয়া বাংলা দেশের বিদ্যার্থীদের জন্য "চতুষ্পাঠী" খুলিয়া বসিলেন, কিরণকুমার ও শশাঙ্কমোহন চৌধুরী "সন্ধানী" বিভাগে পৃথিবীর নবতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। প্রথম কিছুকাল জীবতত্ত্ববিদ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার সুবিখ্যাত "বিজ্ঞান-জগৎ" লইয়া উপস্থিত হন নাই বলিয়া একদা বিজ্ঞানের ছাত্র আমি "সৃষ্টি-রহস্য" নাম দিয়া বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ লিখিতে লাগিলাম। পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়ের ভারও নিজের হাতেই রাখিলাম। 'বঙ্গশ্রী'র সেই 'বিচিত্র-জগৎ' ও 'বিজ্ঞান-জগৎ' আজ পুস্তকাকারে বিধৃত হইয়া বাংলা-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য হইয়াছে। "অন্তঃপুর" ও "চতুষ্পাঠী" পুস্তকের স্থায়ীরূপ লয় নাই বলিয়া মনে মনে আমার ক্ষোভ আছে। প্রমাণ-সাইজের নূতন সাময়িক পত্রিকা যাঁহারা বাহির করিবেন, তাঁহারা 'বঙ্গশ্রী'র এই বিভাগগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলে উপকৃত হইবেন।

শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র এক-একখানি উপন্যাস লইয়া উপস্থিত হইলেন, আমি নিজে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুবাদের মধ্য দিয়া ('রাজমোহনের স্ত্রী') আসরে নামাইলাম। ধারাবাহিক উপন্যাসের দিক দিয়া 'বঙ্গশ্রী' একরূপ নিশ্চিন্ত হইল।

সৃষ্টিধর্মী গল্প ও কবিতার নির্বাচনে আমার বিচারবুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সজাগ রাখিয়াছিলাম; আমার বিশ্বাস ছিল, বঙ্গ-বীণাপাণির বীণার ওই দুইটি তারই প্রধান। গল্পে যাঁহাদের বাছাই করিয়াছিলাম তন্মধ্যে সীতা দেবী, সরোজকুমার, মনোজ, রবীন্দ্র মৈত্র ও সুধীরকুমার চৌধুরী তখনই খ্যাতনামা, প্রথম ছয় মাসে ইঁহাদের প্রত্যেকের মাত্র একটি করিয়া গল্প নির্বাচিত হইয়াছিল। সর্বাধিক সম্মান পাইয়াছিলেন প্রায়-নবাগত তারাশঙ্কর; তাঁহার দুইটি গল্প প্রথম ছয় মাসে 'বঙ্গশ্রী'কে অধিকতর শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিল। বস্তুত, এই গল্প দুইটি হইতেই বঙ্গ-

সাহিত্যে তাঁহার জয়যাত্রা শুরু। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "এইখানে যাত্রা শুরু হ'ল 'বঙ্গশ্রী'তে।" 'বঙ্গশ্রী'র কবির সংখ্যা খুবই কম—মোহিতলাল, সুশীলকুমার, প্রমথনাথ বিশী, কৃষ্ণধন দে ও হেমচন্দ্র বাগচী। তৎকালীন প্রমথনাথের "পৃথ্বীরাজে"র "অযুত কণ্ঠে ওঠে ঝঞ্ঝনা, অযুত কণ্ঠে 'পৃথ্বীরাজ'" অথবা "শকুন্তলা"র "গাহিবে সে সুর, আঁখি ভরপুর, আজি কতদূর—শকুন্তলা" এবং কৃষ্ণধন দের "নিশির ডাকে"র "চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল—খোল বধূ, দ্বার খোল"—আজিও আমার মনে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরে।

বঙ্গ-সাহিত্যে 'বঙ্গশ্রী'র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দান ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের "বুদ্ধকথা", তৎপরেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়" এবং সুকুমার সেনের (অধুনা ডক্টর) "বাঙ্গালা-সাহিত্যে গদ্য", ও "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"। আমার স্বল্প দুই বৎসরের কার্যকালের মধ্যেই 'বঙ্গশ্রী'র এইগুলি কীর্তি। শেষোক্ত তিনখানি গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনের আনন্দবিধান করিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সর্বশ্রেষ্ঠ "বুদ্ধকথা" এখনও গ্রন্থাকারে সাধারণের হস্তগত হয় নাই।

অমূল্যচন্দ্রের সঙ্গে আমার পুরাতন পরিচয়; খ্রীষ্টধর্ম-প্রভাবিত ডাফ হস্টেলে যে দুই-একজন কালাপাহাড়ী হিন্দু সাহস করিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম ১৯২০ সনে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি কোথায় কি ভাবে ছিলেন আমার জানা ছিল না। দেখিলাম, তিনি বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম বিষয়ে বিশেষ গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি "বুদ্ধকথা"র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিসহই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—দুই-চার পাতা উল্টাইয়াই অনুভব করিলাম, অমূল্যচন্দ্রের কৃপায় একটি অমূল্য রত্ন হাতে পাইয়াছি। বাংলা ভাষায় বুদ্ধকথা এরূপ চমৎকারভাবে আর কখনও লেখা হয় নাই, এমন বিস্তারিতভাবেও নয়। রত্নটি সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না। 'বঙ্গশ্রী'তে ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যথেষ্ট আনন্দ বিধান করিয়াছিল। অমূল্যচন্দ্র

তাঁহার গবেষণা সমাপ্ত করিবার জন্য এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জার্মানি গিয়া ডক্টরেট-ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। বিষয়ান্তরে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার 'বুদ্ধকথা'ও এতাবৎ ছাপা হয় নাই। শুনিয়াছি "পুরান প্রেস" ইহা ছাপিতেছেন। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

সুকুমার সেন মহাশয়কে বাংলা গদ্য ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করিবার কৃতিত্ব আমার। তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' পুস্তকাকারে আমিই প্রকাশ করি। তিনি আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অন্যতম প্রধান গবেষক। তারাশঙ্কর যেমন মৌলিক সৃষ্টি ব্যাপারে 'বঙ্গশ্রী'র অক্ষয় কীর্তি, উক্টর সেন তেমনই গবেষণার ব্যাপারে।

সপ্তাহকালের মধ্যেই প্রথম দুই সংখ্যার জন্য প্রায় তৈয়ারী হইলাম, গোল বাধিল প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের গৌরব কাহাকে দিব তাহা লইয়া। জীবিতকে এই সম্মান দিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হইতে হয়। হেমন্তবালা দেবীর দৌত্য সত্ত্বেও আমার প্রতি তাঁহার বিরূপতা সম্পূর্ণ কাটে নাই। তাঁহার নামে প্রেরিত 'বঙ্গশ্রী' 'শনিবারের চিঠি'র মতই ফেরত আসাতে এই মর্মান্তিক সত্য আরও প্রকট হইয়াছিল। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইতে সাহসী না হইয়া মৃতের দরবারে হাত পাতিতে হইল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-তরণীর দীর্ঘকাল বৈঠাবাহী রামকমল সিংহের কৃপায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা "ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস" দিয়া গোড়াপত্তন হইল।

ঠিক ১লা মাঘ তারিখে (১৩৩৯) "শ্মশান-ঘাট" (তারাশঙ্কর) ও "ম্যালেরিয়া" (সরোজকুমার) সমৃদ্ধ 'বঙ্গশ্রী' আত্মপ্রকাশ করিল। শিল্পী হরিপদ রায়ের হংস-লাঞ্ছন-প্রচ্ছদ-শোভিত 'বঙ্গশ্রী' সর্বত্র সমাদৃত হইল, আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। চাকরি-সংশ্লিষ্ট লোক ছাড়া সর্বাধিক হৈ-হৈ করিলেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবির একটি গল্প প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি অসাহিত্যিকসুলভ উদারতায় তারাশঙ্করের "শ্মশান-ঘাট"কে স্থান

ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তারাশঙ্কর তাঁহার 'সাহিত্য-জীবনে' এই কারণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছেন।

সুনীতিকুমার আয়র্ল্যাণ্ড জার্মানি প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সচিত্র কাহিনী দিয়া গোড়া হইতেই 'বঙ্গশ্রী'র আসর জমাইয়া ফেলিলেন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের "সাগা" বা বীর-কাহিনীগুলি বাঙালীকে শুনাইবার ঝোঁক তাঁহার বরাবরই আছে। 'বঙ্গশ্রী'তে দুই-একটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহার বিবিধ কাজের প্রচণ্ড চাপ সরাইয়া তিনি যদি অন্তত এই কাজটি সম্পূর্ণ করিতে পারেন, বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী কীর্তি অর্জন করিবেন। সুনীতিবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সত্যসুন্দর দাস (মোহিতলাল), হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতির কল্যাণে 'বঙ্গশ্রী'তে সাহিত্য-প্রবন্ধের যেন বান ডাকিল। একটু মাথা ঘামাইতে হয় প্রথম মুখপাতের প্রবন্ধের জন্য। দ্বিতীয় সংখ্যায় পুনরায় রামকমলদার কৃপায় প্রখ্যাত 'সাধারণী'-সম্পাদক বঙ্কিমবন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকার "সেকালের টোলে"র কথা শুনাইতে আসিলেন। পুরাতনপন্থী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রবন্ধটি আমার মান বাড়াইল।

সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলিলাম, এইবারে দুঃখের কথা বলি। ১লা ফাল্গুন 'বঙ্গশ্রী'র দ্বিতীয় সংখ্যা বাহির হইল, সেই দিন সায়াহ্নে পোলক স্ট্রীটের হেড আপিসে কর্তার কাছে হাজিরা দিতে হইল। পরের দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ধর্মতলার আপিসে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের উৎসব। এই দিনটির কথা বিশেষভাবে আমার স্মরণ আছে, কারণ এই দিনই আমার সাহিত্যপথের ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী বন্ধু রবি মৈত্রের সহিত শেষ দেখা। আসরে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। রবির উপস্থিতিতে স্বভাবতই আলোচনা 'বঙ্গশ্রী' হইতে 'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র বিপুল অভিনয়-সাফল্যের দিকে ধাবিত হইল। রবি স্বয়ং তখন সেকেন্দার বাদশাহের মত দিগ্বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর। তাহাকে প্রশ্রয় দিবার মত সহানুভূতি সকলের থাকিবার কথা নয়। রবি সেটা অনুভব করিয়া শেষ পর্যন্ত আমার হাত ধরিয়া আমাকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে টানিয়া লইয়া

গেল। ভূম্যাসনে বসিয়া শুইয়া সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিশ্রম্ভালাপ চলিল। রংপুর হইতে রবির মায়ের অসুখের খবর সেই দিনই তার-যোগে আসিয়াছে, পরদিন দ্বিপ্রহরের পরই শিলং মেলে সে রংপুর রওয়ানা হইবে। ঢাকা হইতে মোহিতলালও 'বঙ্গশ্রী' ও 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে উপদেশ দিবার জন্য আমাকে মুহুর্মুহু ডাকিয়া পাঠাইতে-ছিলেন। পূর্বদিন ছুটি লইয়া আসিয়াছি, পরের দিন ঢাকা মেলে আমিও ঢাকা রওয়ানা হইব। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া দুই বন্ধু পরস্পর বিদায় লইলাম। রবি তাহার 'মানময়ী'র প্রথম মুদ্রিত কপিখানি আমাকে ও আমার গৃহিণীকে নিবেদন করিয়াছিল। কারণ এই যে, আমারই রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের বাড়ির একটি কক্ষে তাহাকে বদ্ধ করিয়া বাহিরে শিকল তুলিয়া দিয়া আমি তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই 'মানময়ী' রচনা শেষ করিতে বাধ্য করিয়াছিলাম। একটা পুরা দিন লাগিয়াছিল। গৃহিণী জানালা-পথে এই সময়ে তাহাকে ঘন ঘন চা সরবরাহ করিয়াছিলেন। রবি সব শেষে সেদিন কৌতুক করিয়া বলিল, যদি আর না ফিরি এই বইখানা যত্ন ক'রে রেখে দিও, ওর মধ্যেই আমাকে পাবে। সেদিন মনে হইয়াছিল কৌতুক; সপ্তাহকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম—কৌতুক নয়, রবি মর্মান্তিক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আমার নিকট চিরবিদায় লইয়া গিয়াছে।

পরদিন শিলং মেলে রবি এবং ঢাকা মেলে আমি যথাক্রমে উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গ যাত্রা করিলাম। মোহিতলালের সহিত পরামর্শ শেষে কলিকাতায় ফিরিলাম ৭ই ফাল্গুন সকালের ঢাকা মেলে। পৌষ হইতে নিযুক্ত 'শনিবারের চিঠি'র নূতন সম্পাদক শ্রীপরিমল গোস্বামী আমার রাজেন্দ্র-লাল স্ট্রীটের বাসাতেই তখন বাস করিতেছিলেন, তিনি সুর-সম্পর্কে রবির ভাগিনেয়। তাঁহার মুখেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত—রংপুরে রবির আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম। রবি ওরা ফাল্গুন রাত্রে পাবনা তাহা মাতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়, ৪ঠা ফাল্গুন রাত্রি দশটায় হঠাৎ তাহার কম্প দিয়া জ্বর আসে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে। চারিদিক হইতে ডাক্তার বৈদ্য কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হন

বটে ; কিন্তু ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া, না, সাপ্রেস্‌ড্‌ স্মলপক্স এই সংশয়ের মধ্যে চিকিৎসার বিলম্ব হয়। সকালে রংপুরের অনেক ডাক্তার কুইনিন ইনজেকশন দিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রবির প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ৫ ফাল্গুন ১৩৩৯ (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) সকাল দশটায় বাংলা-সাহিত্যের একটি অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনাময় প্রাণ, হিন্দুসমাজের একজন নিষ্ঠাবান সেবকের জীবন মধ্যপথেই খণ্ডিত হয়।

রূঢ় ধাক্কা খাইয়া প্রথমটা ঠিক ঠাহর করিতে পারি নাই, বিশ্বাস করিতে বাধিয়াছিল। যখন বিশ্বাস হইল, আমি বিমূঢ় ও মুহ্যমান হইয়া গেলাম। সেই অবস্থায় দ্বিতলে শোবার ঘরে গিয়া আমি বালিশে মাথা গুঁজিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিছু খাইতে বা কাহারও সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিলাম না। আমার সাহিত্য-জীবনের সেই প্রথম শোক, নিদারুণ শোক ; শনিমণ্ডলেও সেই প্রথম ভাঙন ধরিল। অনেক রাত্রে উঠিয়া বসিলাম। রবির চেহারা স্পষ্ট হইয়া আমার চোখে ভাসিতেছিল—তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রায় স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি তখনই লিখিলাম—

অপরূপ রূপ, রূপ অপরূপ, বুঝি না ছায়ার মায়া—
তরল আঁধারে অর্ধোত্থিত তব দক্ষিণ বাহু—
তোমার রোমশ বাহু,
ঝুলে পড়িয়াছে খদ্দরী আস্তিন,
শীর্ণ করাঙ্গুলি—
নখাগ্রে তার জাতির মুক্তি-বারতার স্পন্দন—
এ অভিশপ্ত এই লাঞ্ছিত জাতি।

বন্ধু, বন্ধু মোর—
কোথা তব মুখ, কোথা বাণী তব—বজ্রকঠিন বাণী,
থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধ আবেগে ভাবগদগদ ভাষা,
অশ্রুজড়িত চাপা কণ্ঠের স্বর ?
তোমার আঁখির নীল,
আয়ত চক্ষে বুকের নীলাভ জ্বালা,
কোথায় বন্ধু, অবিন্যস্ত মাথার বিরল কেশ
দেখিতে যে নাহি পাই—

মৃত্যুর কালো ছায়া—
এত কি নিবেট নিবিড় অন্ধকার!
মৃত্যুর নীরবতা—
এমনই বধির কঠোর বাক্যহীন!

তব দক্ষিণ বাহু
আঁধার মৃত্যু পারিল না গ্রাসিবারে,
আমি দেখিতেছি—বাক্যমুখর ক্ষীণ
শমন তার
বলিতেছে, আমি আছি।
তব অনাবৃত বক্ষের উপবীতে
লেগেছে আগুন-ছোঁয়া—
বলিতেছে, জাগো জাগো,
জাগো চণ্ডাল, জাগো কঙ্কাল জাগো,
জাগো জাগো ব্রাহ্মণ।

অগ্নি-জ্বালায় প্রদীপ্ত তব বক্ষের উপবীত
পরাইয়া দাও, দাও কঙ্কাল-গলে,
শুনি এ শ্মশানে কঙ্কাল-মঙ্গল।

বন্ধু, বন্ধু মোর—
তুমি কি চলিয়া গেছ?
তবে কেন শুনি ওরাও-আবাসে
জীবন-জয়ধ্বনি,
চামার মুচির ডোমের মুখেতে নির্ভর-আশ্বাস
দেখিতে যে আলো পাই।
বাবা ঠাকুরের সেবার লাগিয়া তারা প্রতীক্ষা
করে।
নিরীহা নির্ঘাতিতা,
সবাই তো ভাই আশ্রয় পায় নাই।
তোমার 'ছেলেরা' সবে
আসন পাতিয়া বসে আছে পাতা পেড়ে—
কলেজের ফীস্ হয় নি সবার দেওয়া।

বন্ধু, তোমার নাটকের প্লট মরিচেছে
মাথা খুঁড়ে,
উদাসী আজিও একাকিনী কাঁদে মাঠে,
থার্ড ক্লাস সেই র'য়ে গেল থার্ড ক্লাস—
তবে কেন ছিঁড়ে চ'লে গেলে মায়াজাল?
বাস্তবিকার আসরে আজিও হরিকুমারেরা
বসি
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতেছে নাকী সুরে.
শেষ না হইতে দিবা তুমি কেন ছেড়ে গেলে
দিবাকরী,
বলিয়া গেলে না, কোথা থাকে তব ত্রিলোচন
কবিরাজ
বন্ধু, তুমি তো দেখে গেলে নাকো মানময়ী
গার্ল-স্কুলে
বদনের মুখে ছাই দিয়ে মেয়ে হাজারে
হাজারে আসে,
ঘৃতকুম্ভটি প্রাঙ্গণে আছে প'ড়ে—
দধিকর্দমে পিচ্ছিল প্রাঙ্গণ।

* * *

বন্ধু, তোমার দক্ষিণ বাহু আরো কি কহিবে
কথা?
শুনিতে না পাই মিলায় ছায়ার মায়া,
আমারই মনের ভুল—
তুমি নাই, তব দক্ষিণ বাহু নাই,
কান পেতে শুনি অসীম শূন্যে চকিতে
থামিয়া গেছে
গতি-আবেগের অনাহত গীতধ্বনি।

আকাশের নীহারিকা—
বিরাট বিপুল প্রচণ্ড বেগে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই,
ধরার ধূলার গুঁড়া গুঁড়া হয়ে মরিয়াছে
নীহারিকা,
বাতাসে উড়িয়া গেছে।

* * *

বন্ধু, তোমার ভস্ম-বিভূতি উড়িছে আকাশ ছেয়ে
ভস্মের চোখ নাই।
পায় না দেখিতে; কাঁদিছে বিধবা, কাঁদিছে উন্মাদিনী,
পিতারে হারায়ে কাঁদিছে সাতটি শিশু।
মরজীবনের সীমান্তে আসি কাঁদিতেছে অভাগিনী
মাতার শয়ন-শিয়রে অনিছে
ঘৃতের প্রদীপ নহে,
মৃত পুত্রের চিতা।

পরে ইহারই সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ একটা ভূমিকা যোগ করিয়া "রবীন্দ্রনাথ মৈত্র" কবিতা প্রস্তুত হইল। ভূমিকার গোড়াটা এই—

রবি নাম তব, ধর নাই রবি-রূপ—
তোমারে ঘিরিয়া গ্রহ শশী আজও করে নি ভ্রমণ শুরু;
তুমি নীহারিকা, নেবুলা-বাষ্প, অসীম শূন্য ব্যেপে
গতির আবেগে শিহরে ঈথর নীল
বাষ্প-বিকারে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান।
লক্ষ তারকা অযুত রবির কোটি গ্রহ-চন্দ্রের
সম্ভাবনায় ব্যাকুল তরল প্রাণ।
জ্বলে নিবে যায়, জ্বলে জ্বলে ওঠে ধাতব বাষ্প যত,
গলিত লৌহ গলিত স্বর্ণ জল মাটি ধোঁয়াধার—
জমাট বাঁধিয়া ধরে নি কঠিন দেহ।
রবি নাম তব, নীহারিকা ইতিহাস।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি কালে প্রকাশিত মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে কবিতাটি মুদ্রিত হইল। ফাল্গুন সংখ্যা হইল "রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যা"। তাহাতে মোহিতলাল, সুনীতিকুমার, গোপাল হালদার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী ও কৃষ্ণধন দে রবির ব্যক্তিগত জীবন, সাহিত্য-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করিলেন; আমি রবির দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহায়তায় তাঁহার জীবনী লিখিলাম। 'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে আজ যাঁহারা নামে মাত্র জানেন, বাংলা সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণ অথচ বিস্ময়কর প্রতিভার বিষয় তাঁহাদের আরও জানা উচিত—এই বোধে রবি-মানুষটির সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় 'আত্মস্মৃতি'ভুক্ত করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সাহিত্যিক মর্যাদা—তিনি তাঁহার আটত্রিশ

বৎসরের জীবনে যে সকল কীর্তি পুস্তকাকারে এবং মাসিক, সাপ্তাহিক অথবা দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় রাখিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারাই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সাহিত্যরসিকেরা নির্ধারণ করিবেন। তাঁহার জীবনীর উপকরণ যৎসামান্য, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহার কর্মজীবন সাহিত্যিক মনের দ্বারা পূর্ণভাবে প্রভাবিত ছিল। তাঁহার অসম্পূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেই তাঁহার মৃত্যুহীন জীবনের সন্ধান মিলিবে। তাঁহার লৌকিক জীবন সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যায়—তাঁহার আদি পৈতৃকবাস ছিল ফরিদপুর জিলার নাতুরিয়া গ্রাম। রবির পিতা প্রিয়নাথের বয়স যখন আড়াই বৎসর মাত্র তখন পিতামহের মৃত্যু হয়; পিতামহী তাঁহার পিত্রালয় যশোহরের ঝিনাইদহ মহকুমার ফাজিলপুর গ্রামে বাস করিতে থাকেন, প্রিয়নাথও সেখানেই লালিতপালিত হন। ফরিদপুর রতনদিয়া গ্রামের উমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, রবি ইঁহাদের সপ্তম সন্তান। তাঁহার জন্ম হয় ১৩০২ কিংবা ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসের এক রবিবারে, কাজেই নাম রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাল্য ও কৈশোরে অতিশয় মেধাবী এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। পিতা শেষ বয়সে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ফাজিলপুরে বসবাস করিতে থাকেন, স্থানীয় শৈলকুপা হাই স্কুলে রবি ভর্তি হন। এইখানেই স্বদেশী-আন্দোলনের আবর্তে পড়িয়া, সুরেন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমার বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের বাণী ও রচনাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি স্বদেশী কবিতা ও নাটকাদি রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তদানীন্তন সরকারের বিরূপ দৃষ্টিও তাঁহার উপর পতিত হয়। এই দৃষ্টির প্রকোপ তাঁহাকে আজীবন ভোগ করিতে হয়।

১৯১৩ সনে শৈলকুপা হাই স্কুল হইতে রবি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১৫ সনে কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে আই.এ. এবং ১৯১৭ সনে ওই কলেজ হইতেই কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাস করেন। পরে ইউনিভার্সিটি কলেজে এম.এ. ও ল পড়িবার কালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া লেখাপড়ায় ইস্তফা দেন। ১৯১৭ সনে বি.এ. পরীক্ষার পরই (১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ) ফরিদপুর

জেলার ভীমনগর-নিবাসী দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের কন্যা হরিবালা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন, কলিকাতায় পঠদ্দশায় নাট্যকার ডি. এল. রায়ের স্নেহ লাভ করিয়া নাটক রচনাতেই তিনি বিশেষ উৎসাহী হন; কবিতা, গল্প, ছড়া প্রভৃতিও অজস্র লিখিতেন। ১৩৩৯, ৫ই ফাল্গুন রংপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়, ৪ঠা ফাল্গুন সন্ধ্যার পরও তিনি একটি নাটক রচনা করিতেছিলেন। তাঁহার জীবনের দুইটি লক্ষ্য ছিল, সমাজসেবা ও বাণীসাধনা; তিনি যৌবনপ্রারম্ভ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজ নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক কর্মজীবন হয়তো কালপ্রবাহে হারাইয়া যাইবে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যে আমরা তাঁহাকে হারাইয়াও যাহাতে পুনঃ পুনঃ পাইতে পারি সে ব্যবস্থা তিনি স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই মানুষটির সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে ক্ষতি হইল তাহার আর পূরণ হইবে না; তাঁহাদিগকে চিরটাকাল এই আক্ষেপ করিয়াই কাটাইতে হইবে যে, আমাদের রবি সর্বসাধারণের রবি হইতে পারিলেন না; সেই প্রাণস্ফুলিঙ্গ সমস্ত জাতির প্রাণে আগুন ধরাইয়া গেল না। রবিকে যাঁহারা চিনিতেন, তাঁহাদের কাছে মানুষ-রবি সাহিত্যিক-রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বা দিবাকর শর্মার চাইতেও ঢের বড় ছিলেন—তাঁহার সাহিত্যকে চাপা দিয়া তাঁহার মনুষ্যত্ব, তাঁহার পৌরুষ, তাঁহার প্রাণ বড় হইয়া দেখা দিত; তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব দিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতেন। বাংলা দেশের সামান্যসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে এই ক্ষমতা দেখিয়াছি। রবি বাঁচিয়া থাকিতে আমরা কখনও তাঁহার লেখাকে প্রাধান্য দিতে পারি নাই; তাঁহার অসম্বৃত বেশবাস ও কেশকলাপ, নীল চক্ষু, রোমশ বাহু ও মেঘগম্ভীর নিনাদে নিজেকে এমনই জাহির করিতেন যে, আর পাঁচজনের ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিকট ম্লান হইয়া যাইত। তিনি তখন আমাদের কাছে একটা মানুষ মাত্র থাকিতেন না, একটা আদর্শ একটা ভাবরূপে প্রতিভাত হইতেন।

আদর্শ বা আইডিয়া মাত্র নয়, রবি ছিলেন অদ্ভুতকর্মা। হিন্দু সংগঠন, শুদ্ধি আন্দোলন, নারীনির্যাতন-প্রতিকার এবং কোল ভীল সাঁওতাল ওঁরাওদের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এই কাজে, দুই-দুইবার সাক্ষাৎ-মৃত্যুকে প্রায় বরণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তবু তিনি ভয় পাইয়া জীবনের ব্রত ছাড়েন নাই। তাঁহার আর একটা ব্রত ছিল—দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, ইহার জন্য একটা সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় ছিল। একটি প্রথম ভাগ, একটি ওয়ার্ড বুক, একটি স্পেলিং বুক এবং একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ তিনি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রচনা করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপি আকারেই সেগুলি বিনষ্ট হইয়াছে।

তাঁহার একটা ছবি আজও আমার মনে ভাসিতেছে। সকলে বসিয়া খোসগল্প করিতেছি, রাজা-উজির মারিতেছি, হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কির বন্যা বহিতেছে, হঠাৎ দেখিলাম রবি বিমর্ষ হইয়া গেল। প্রথমটা বিস্মিত হইলাম। পরে প্রণিধান করিয়া বুঝিলাম, বাচালতার মধ্যে একজনের মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইয়াছে যাহা জাতির অকল্যাণকর। আহত রবি আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না, অকস্মাৎ আড্ডা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। এই মহাপ্রাণ মানুষটিকে আমরা বিস্মৃত হইব, রবির অকালমৃত্যু সেই দুর্ভাগ্যেরই কারণ হইয়াছে। ছাপার অক্ষরে তাঁহার উপন্যাস 'মায়াজাল', তাঁহার গল্প 'থার্ড ক্লাস' 'উদাসীর মাঠ' 'ত্রিলোচন কবিরাজ,' তাঁহার নাটক 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', তাঁহার ব্যঙ্গ-রসরচনা 'দিবাকরী' 'বাস্তরিকা,' তাঁহার কবিতা 'সিন্ধু-সরিৎ' তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র 'শনিবারের চিঠি' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আজিও বাঁচিয়া আছে; কিন্তু রবি-মানুষটিকে এই যুগের এবং ভবিষ্যৎ যুগের বাঙালীর কাছে আজ তুলিয়া ধরিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমাদের ক্ষতি ব্যক্তিগত ক্ষতিই রহিয়া গেল।

[ক্রমশ]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

২য় দৃশ্য। দুর্গপ্রাসাদের এক হলঘর।

[হ্যামলেট ও হোরেসিয়োর প্রবেশ]

হ্যাম। এটা শেষ হ'ল ; অপরটা শুরু করি।
সব কথা মনে আছে ?

হোরে। মনে আছে। বলেন কি ?

হ্যাম। অন্তরের দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিদ্রা হারাইনু।
অবস্থা এমন হ'ল
শৃঙ্খলিত বিদ্রোহী হতেও ক্লেশকর।
সহসা হারানু কাণ্ডজ্ঞান,
সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে,
কাণ্ডজ্ঞান-হারা হ'লে ফল ভাল হয়,
জেনো হোরেসিয়ো,
যত শ্রমই করি মোরা কাঠামো বাঁধিতে
রূপে রঙে মূর্তি দেওয়া বিধাতারই হাত।

হোরে। সে কথা নিশ্চয়।

হ্যাম। পোশাকটা কোনক্রমে জড়াইয়া গায়ে
জাহাজের কক্ষ ছাড়ি হইনু বাহির।
অন্ধকারে খুঁজিতে খুঁজিতে
অকস্মাৎ কার্যসিদ্ধি।
গোপন নির্দেশপত্র হাতে উঠে এল ;
ফিরে এনু নিজ কক্ষে,
সাহসে করিয়া ভর লজ্জা ভয় ভুলি,
খুলিলাম আঁটা খামখানি।
কি দেখিনু হোরেসিয়ো !
রাজকীয় ঘৃণা প্রবঞ্চনা !
নানা ছন্দে অলঙ্কারে
ইংলণ্ড ও ডেনমার্কের বন্ধনার সাথে
লিখিত হয়েছে সেথা—

আমি যে কি ভয়ঙ্কর মারাত্মক জীব!
দৃষ্টিমাত্র, এক তিল বিলম্ব না করি,'
ঘাতক কুঠারে শান দিতে নাহি দিতে,
আমার এ মুণ্ড যেন মাটিতে লুটায়।

হোরে। এও কি সম্ভব?

হ্যাম। এই সে নির্দেশপত্র,
প'ড়ে দেখো অবকাশমতো।
তার পর কি করিনু শুনিতে কি চাও?

হোরে। বলুন, বলুন।

হ্যাম। চারিদিকে বদ্ধ হয়ে কৃতঘ্নতা-জালে
চিন্তার পূর্বেই মন কাজে নেমে গেল।
সেইখানে ব'সে প'ড়ে
নূতন নির্দেশপত্র চমৎকার ছাঁদে
তখনি লিখিনু।
পূর্বে ভাবিতাম অন্য মহতেরই মতো
লিপিকর হেয় কাজই করে,
এ বিদ্যা ভুলিয়া যাই তাই চাহিতাম।
কিন্তু ভাই, সেদিন তা দিল খুবই কাজ।
কি লিখিনু শুনিবে কি?

হোরে। বলুন কুমার।

হ্যাম। সনির্বন্ধ অনুরোধ ডেনমার্করাজের :—
যেহেতু ইংলণ্ড তাঁর বিশ্বস্ত সুহৃৎ,
যেহেতু সে দৃঢ় মৈত্রী আজও বর্ধমান,
যেহেতু শান্তির মালা উভয়ের গলে,
যেহেতু সদ্ভাবাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশী মোরা,—
ইত্যাদি 'যেহেতু' যত একত্র গাঁথিয়া
নূতন নির্দেশপত্রে দিলাম নির্দেশ,—
পাঠমাত্র, তিল দ্বিধা বিলম্ব না করি,

মুমূর্ষুরও শেষকৃত্য অসমাপ্ত রাখি,
হত্যা যেন করা হয় পত্রবাহীদ্বয়ে।

হোরে। কি ভাবে তা মুদ্রাঙ্কিত করিলেন শুনি।

হ্যাম। সেখানেও শুভহস্ত দেখিনু বিধির।
সাথে ছিল পিতার মোহর,
ডেনমার্কের মুদ্রাঙ্কন তারই প্রতিলিপি।
লিপিটি যে লিখিয়া রাজার নিজনাম,
যথাপূর্ব ভাঁজ করি, দিয়ে মুদ্রাঙ্কন
যথাস্থানে এলাম রাখিয়া।
চৌর্যবৃত্তি পড়িল না ধরা।
পরদিন দস্যুসাথে জলযুদ্ধ হ'ল,
তার ফল শুনেছ পূর্বেই।

হোরে। তা হ'লে গিলডেন্‌স্টার্ন, আর রোজেনক্রান্‌জ্‌
সেই পথে চলেছেন ছুটি?

হ্যাম। তাঁরাই ছিলেন মোর সে পথের দূত,
মোর চিত্তে কোন ক্ষোভই নাই।
আপনারই ফাঁদে তারা পড়েছে আপনি।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে
মাঝে প'ড়ে পুড়ে মরে উলুখাগড়াই।

হোরে। এ যে দেখি সর্বনেশে রাজা!

হ্যাম। উপস্থিত আমার কর্তব্য কি তা বল।
পিতারে করিল হত্যা,
মাতারে করিল কলঙ্কিতা,
মোর অভিষেকে করি প্রতিবন্ধকতা
অবশেষে প্রাণটুকু হরিতে আমার
বিস্তারিল প্রতারণা-জাল।
তারে যদি নিজ হস্তে শাস্তি দিই আমি
দোষ কিছু আছে? এ হেন দুষ্কৃত যদি

পায় আরও সুযোগ সুবিধা,
সে পাপে কি মজিব না আমরা সবাই ?

হোরে। এর পরিণতি কিন্তু
সত্বর জানিবে রাজা ইংলণ্ড হইতে।

হ্যাম। সত্বর জানিবে সত্য ;
তার পূর্বে যেটুকু সময়
সেটুকু আমারই হাতে ;
মানুষের প্রাণ ?—
যেটুকু সময় লাগে 'এক' উচ্চারিতে।
কিন্তু হোরেসিয়ো, মোর এই অনুতাপ
আত্মবিস্মরণ হ'ল লেয়ার্টিসে দেখে।
আমার ব্যথার মাঝে—
হেরি যে তাহারই মুখচ্ছবি।
মার্জনা মাগিয়া তার প্রীতি ফিরে লব।
এ কথাও খুবই সত্য,
দেখে তার শোকের বড়াই
অতিক্রোধে হারাইনু জ্ঞান।

হোরে। থামুন, কে ওই আসিছে হেথা।

[অস্রিকের প্রবেশ]

অস্রি। মহামহিমান্বিত কুমার, ডেনমার্কে ভবদীয় শুভ প্রত্যাবর্তন জয়যুক্ত হোক।

হ্যাম। সবিনয় ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কি হে, এই কাঁচ-মাছিটি তোমার পরিচিত ?

হোরে। না কুমার।

হ্যাম। তা হ'লে তুমি ভাগ্যবান মুক্ত পুরুষ। একে জানলেও অপরাধ হয়। এর বিচরণক্ষেত্র সুপ্রসর, প্রজননশক্তি প্রচুর।

অস্রি। সদাশয় কুমার, ভবদীয় অবসর থাকলে প্রবল প্রতাপ মহারাজের নিকট হতে যে বার্তা বহন ক'রে এনেছি সেটি নিবেদন করতে পারতাম।

হ্যাম। একান্ত অবহিত চিত্তে আমি তা কর্ণগোচর করতে প্রস্তুত। টুপিটি যথাস্থানে স্থাপন করুন, ওর স্থান মস্তক।

অস্রি। অশেষ ধন্যবাদ। আজ বড়ই গরম।

হ্যাম। নাঃ; তা তো নয়; বড়ই ঠাণ্ডা, বাতাস বইছে উত্তর থেকে।

অস্রি। যথার্থ বলেছেন কুমার, একটু ঠাণ্ডাই বটে।

হ্যাম। কিন্তু আমার আবার বড়ই গরম লাগছে, রীতিমত গুমোট মনে হচ্ছে!

অস্রি। ঠিক বলেছেন কুমার; বড়ই গুমোট, ঠিক যেন— কি আর বলি? কিন্তু কুমার, প্রবলপ্রতাপ মহারাজের আদেশে জানাচ্ছি যে তিনি আপনার নামে এক প্রকাণ্ড পণ রেখেছেন। ব্যাপার হচ্ছে—

হ্যাম। একান্ত অনুরোধ, ভদ্রতার খাতিরে (তাহাকে টুপি মাথায় দিবার ইঙ্গিত করিলেন)।

অস্রি। সদাশয় কুমার, সত্য বলছি আমি অতি স্বচ্ছন্দে আছি। হ্যাঁ; সম্প্রতি রাজদরবারে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় লেয়ার্টিস। সাতিশয় ভদ্র, মার্জিতরুচি, শিষ্টাচারসম্পন্ন, নানা গুণের আধার। ভদ্রতার আদর্শস্বরূপ বললেও অত্যুক্তি হয় না; ভদ্রলোক বলতে যা বোধগম্য হয়, আপনি তাঁর মধ্যে সে সকলেরই একত্র সমাবেশ পাবেন।

হ্যাম। আপনার প্রমুখাৎ তাঁর বর্ণনা তিলমাত্র অপচয় প্রাপ্ত হয় নি। বেশ বোধগম্য হচ্ছে, তাঁর সমষ্টীভূত গুণের পৃথক্‌করণ অঙ্কশাস্ত্রীর স্মৃতিবিভ্রম ঘটাবে, স্বয়ং লীলাবতীও পশ্চাদপসরণ করবেন। তাঁর অবশ্যপ্রাপ্য প্রশংসার বিশ্লেষণও অসম্ভব; যে সব দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য উপাদানে তিনি প্রস্তুত, তাতে তিনিই তাঁর একমাত্র উপমা, অন্য উপমান সেই উপমেয়ের ছায়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

অস্রি। সদাশয় কুমারের মুখে তাঁর বর্ণনা যথাযথ হয়েছে।

হ্যাম। কিন্তু এর প্রাসঙ্গিকতা? তিনি যখন এমনই অবর্ণনীয় তখন কেনই বা তাঁকে তুচ্ছ বর্ণনার সগুণে মণ্ডিত করবার প্রয়াস পাচ্ছি?

অস্রি। কি বলছেন?

হোরে। যে ভাষায় আপনি কথা কইছেন, ঠিক সেই ভাষাতেই

উত্তর পাচ্ছেন; তবু তা আপনার বোধগম্য হচ্ছে না! চেষ্টা করুন, অবশ্যই বুঝবেন।

হ্যাম। ঐ ভদ্রলোকটিকে নির্বাচন করবার উদ্দেশ্য কি?

অস্রি। লেয়ার্টিসকে বলছেন?

হোরে। ওঁর ভাঁড়ার খালি; দামী কথার পুঁজি ফুরিয়ে গেছে।

হ্যাম। হ্যাঁ, লেয়ার্টিসকে।

অস্রি। আমি জানি, আর আপনারও অজ্ঞাত নয়, লেয়ার্টিস কত উচ্চস্তরের গুণী। আমি তাঁর অস্ত্রচালন-গুণের কথা বলছি। কিম্বদন্তী বলে, এ গুণে তাঁর সমকক্ষ নেই।

হ্যাম। তাঁর অস্ত্রটি কি?

অস্রি। অসি ও ছোরা।

হ্যাম। দুটি অস্ত্র হ'ল। তা হোক, তার পর?

অস্রি। মহারাজ পণে ধরেছেন ছয়টি বার্বারীয় অশ্ব; আর লেয়ার্টিস দ্যূত করেছেন ছয়টি ফ্রান্সদেশীয় তরবারি ও কৃপাণ, মারকোষ কটিবন্ধ প্রলম্বন ইত্যাদি। তন্মধ্যে তিনটি শকট অতিশয় সুদৃশ্য, মুষ্টিরই অনুরূপ শিল্পখচিত ও নিপুণভাবে অলঙ্কৃত।

হ্যাম। শকট কাকে বলা হচ্ছে?

অস্রি। শকট ওই অসির প্রলম্বনকেই বলা হয়ে থাকে।

হ্যাম। অসির পরিবর্তে কটিপার্শ্বে কামান ঝুলিয়ে নিয়ে গেলেই শকট শব্দটির প্রয়োগ সার্থক হ'ত। তা যতদিন সম্ভব না হয় ততদিন প্রলম্বন বলাই ভাল। আচ্ছা, ব'লে যান। একপক্ষে ছয়টি বার্বারী অশ্ব, অপর পক্ষে ছয়টি শিল্পখচিত শকটসমন্বিত ফরাসী তরবারি মায় সাজসরঞ্জাম? ফরাসী ও দিনেমার পক্ষীয় বাজি এই? কিন্তু দ্যূত বলা হ'ল কেন?

অস্রি। মহারাজা পণ নিরূপিত করেছেন, আপনার আর লেয়ার্টিসের মধ্যে অসিক্রীড়াকালে প্রতি দ্বাদশ বার অসিচালনায় আপনি লেয়ার্টিসকে যতবার আঘাত করতে সক্ষম হবেন, লেয়ার্টিস আপনাকে তদপেক্ষা তিনবারের বেশি আঘাত করতে পারবেন না। আর লেয়ার্টিস

পণ করেছেন প্রতি দ্বাদশবারে তিনি নয়বার আপনাকে আঘাত করবেন। আপনার সম্মতি প্রাপ্ত হ'লে এ পরীক্ষার নিষ্পত্তি হতে পারে।

হ্যাম। আমি যদি না বলি?

অস্রি। আপনার প্রতিপক্ষের পরীক্ষার কথাই বলেছি কুমার।

হ্যাম। আমি এই হলঘরে একটু ভ্রমণ করব; এখন আমার ব্যায়ামের সময়। তরুবারি আনা হোক। যদি প্রতিপক্ষ মহাশয়ের ইচ্ছা থাকে আর মহারাজের অভিরুচি হয়, সাধ্যপক্ষে মহারাজের পণরক্ষার চেষ্টা আমি করব, নচেৎ লজ্জা ও গোটা কয়েক আঘাত ছাড়া অন্য কিছুই আমার লাভ হবে না।

অস্রি। আপনার এই কথা কি মহারাজকে জ্ঞাপন করতে পারি?

হ্যাম। পারেন, আপনার স্বভাবসিদ্ধ বাগাড়ম্বর সহ।

অস্রি। মহামহিম কুমারের একান্ত অনুগত সেবক।

হ্যাম। ভবদীয়—ভবদীয় বলুন। [অস্রিকের প্রস্থান]

হোরে। খবরটা রাজার কর্ণগোচর ক'রে বাহাদুরি নেবার আশায় এতক্ষণ ছুটছে।

হ্যাম। এরা সব জন্মচাটুকার; মাতৃস্তন্য পান করবার সময়েও নিশ্চয় সবিনয়ে স্তন্যপানের অনুমতি প্রার্থনা করত। আর যুগটাও হ'ল ঘোর কলি, এখন চাটুকারের বাহ্য চাকচিক্যই সকলের লাগে ভাল। তাদের ফেনানো কথার প্যাঁচে অনেক সত্যকারের গুণী জ্ঞানীও ভড়কে যান। অথচ ঠিকমতো ফুঁ দিতে পারলেই বুদ্বুদ ফেটে গিয়ে ফাঁকি ধরা প'ড়ে যায়।

[একজন লর্ডের প্রবেশ]

লর্ড। কুমার, অস্রিকের মুখে মহারাজ শুনেছেন যে, আপনি তাঁর জন্য এইখানে অপেক্ষা করছেন। তিনি জানতে ইচ্ছা করেন, লেয়ার্টিসের সঙ্গে অসিক্রীড়ায় আপনার অভিরুচি কি। আপনি কি আরও সময় নিতে চান?

হ্যাম। মহারাজের যেমন অভিপ্রায়। তিনি যে সময় ধার্য করবেন, আমি প্রস্তুত থাকব। এখনই হয়, হোক; পরে হ'লেও ক্ষতি নেই। আমার শরীর সুস্থ থাকলেই হ'ল।

লর্ড। মহারাজা ও মহারাণী সভাসদ্‌বৃন্দের সঙ্গে এখানে আসছেন।

হ্যাম। ভালই করছেন।

লর্ড। মহারাণীর ইচ্ছা, ক্রীড়া আরম্ভ করবার পূর্বে আপনি লেয়ার্টিসের সঙ্গে শান্তভাবে আলাপ করেন।

হ্যাম। তাঁর উপদেশ শিরোধার্য। [লর্ডের প্রস্থান]

হোরে। কুমার, এই প্রতিযোগিতায় আপনার পরাজয় ঘটবে।

হ্যাম। আমার তা মনে হয় না লেয়ার্টিস। ফ্রান্সে যাওয়া অবধি আমি নিয়মিত অভ্যাস রেখেছিলাম। আমিই এতে জিতব। কিন্তু, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না হোরেসিয়ো, আমার বুকের এইখানে কি যন্ত্রণা। তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

হোরে। তা হ'লে তো কুমার—

হ্যাম। না না, কিছু নয়; এ রকম দুশ্চিন্তা স্ত্রীলোকেরই শোভা পায়।

হোরে। আপনার মন যা চায় না তা করবেন না। তাঁদের আসবার পূর্বেই আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে আপনার শরীর বেশ সুস্থ নয়।

হ্যাম। তা হতেই পারে না। আমি দুর্লক্ষণে ডরাই নে। সামান্য একটি চটকের মৃত্যুও পূর্ব হতে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে হোরেসিয়ো। মৃত্যু যদি এখনই আসবার হয়, পরে আসবে না; যদি পরে আসবার না হয়, এখনই আসবে; যদি এখন নাও আসে, একদিন আসবেই তো। সব সময় প্রস্তুত থাকা চাই। মানুষ তো সঙ্গে কিছুই নিয়ে যাবে না, তবে আগে আগে চ'লে গেলেই বা দুঃখ কিসের?

[রাজা, রাণী, লেয়ার্টিস, লর্ডগণ, অস্রিক এবং তরবারি ইত্যাদি লইয়া অনুচরগণের প্রবেশ]

রাজা। এস এস হ্যামলেট, এই হাতে হাত দাও। (লেয়ার্টিসের ও হ্যামলেটের হাত যুক্ত করিয়া দিলেন)

হ্যাম। অন্যায় করেছি আমি, আমারে মার্জনা কর ভাই।
মহৎ তোমার প্রাণ তাই মাগি ক্ষমা।
উপস্থিত সকলে জানেন,
তুমিও নিশ্চয় শুনিয়াছ,

দারুণ মস্তিষ্করোগে কী কষ্ট পেতেছি।
ভদ্রতার সীমারেখা করিয়া লঙ্ঘন
যা কিছু করেছি তব অমর্যাদাকর,
সত্য কহি সভামাঝে সকলই তা উন্মত্ততাবশে।
লেয়ার্টিসে অপমান করিল হ্যামলেট ?
হ্যামলেট সে নয়।
হ্যামলেটের মাঝে যদি হ্যামলেটই না থাকে,
সে যদি তখন কারে করে অপমান,
সে কাজ কি হ্যামলেটের ?
হ্যামলেট তা করে অস্বীকার।
কে তবে করিল তাহা ? হ্যামলেটের উন্মত্ততা।
হতভাগ্য হ্যামলেটের মহাশত্রু সেই।
তাই যদি হয়, হ্যামলেটও তো পড়ে অপমানিতের দলে।
সভায় দাঁড়ায়ে আমি উচ্চকণ্ঠে কাহ—
যে কুকার্য করেছি তা ইচ্ছাকৃত নহে,
হঠবুদ্ধিবশে শর করিয়া নিক্ষেপ
আহত করিনু আমি আপন ভ্রাতারে ;
চিত্তের মহত্ত্বগুণে ক্ষম মোরে ভাই।
লেয়া। অন্তর হইল শান্ত,
যদিও সে স্বভাবত প্রতিহিংসা চাহে।
কিন্তু এ যে সম্মানের কথা,
অসম্ভব তব সাথে সদ্ভাব স্থাপন ;
যদি কোন প্রাজ্ঞজন নিদর্শন সহ
বুঝাইতে পারে কোন দিন
এ সদ্ভাবে অসম্মান নাই,
তখন তা করিব বিচার।
আজ শুধু বলি,—তব প্রীতি করিনু গ্রহণ,
রাখিব মর্যাদা তার।

হ্যাম। ইহাই যথেষ্ট গণি ;
ভাইয়ে ভাইয়ে অসিক্রীড়া অকপটে চলুক এখন।
অসি দাও আমাদের ; চ'লে এস।

লেয়া। আমাকেও অসি দাও।

হ্যাম। তুমি দক্ষ লেয়ার্টিস ;
আমার অজ্ঞতা মাঝে তব তীক্ষ্ণ অসি
ঝলকিবে অন্ধকারে নক্ষত্র সমান।

লেয়া। কেন এ বিদ্রূপ ?

হ্যাম। বিদ্রূপ এ নহে।

রাজা। অস্রিক, অসি দাও উভয়কে।
বৎস হ্যামলেট, পণ কি তা শুনেছ নিশ্চয় ?

হ্যাম। শুনিয়াছি মহারাজ ! আপনি দুর্বল পক্ষে ধরেছেন পণ।

রাজা। ঠিকই করিয়াছি।
দুজনেরই নৈপুণ্য তো জানি ;
লেয়ার্টিস শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়,
তোমাকে দিয়েছি তাই অধিক সুবিধা।

লেয়া। এ অসি নিতান্ত ভারী ; আর একটা দেখি।

হ্যাম। এখানি হাতের যোগ্য মোর।
সবগুলি দৈর্ঘ্যে তো সমান ?

[অসিক্রীড়ার জন্য উভয়ে প্রস্তুত হইল]

অস্রি। একই দৈর্ঘ্য, মহান কুমার।

রাজা। সুরাপাত্র সাজাও এখানে।
হ্যামলেট যদ্যপি হানে প্রথম কি দ্বিতীয় আঘাত,
কিংবা যদি তৃতীয় বাজীতে
যথারীতি প্রত্যাঘাত পারে সে হানিতে,
দুর্গে দুর্গে গর্জিবে কামান ;
হ্যামলেটের স্বাস্থ্যপান করিবেন রাজা ;
সেই পাত্রে নিক্ষেপিব দুর্লভ মুকুতা

যার তুল্য রত্ন কভু ধরে নাই শিরে
ডেনমার্কের বিভিন্ন নৃপতি চতুষ্টয়।
পাত্রগুলি দাও মোরে।
তূরীরবে জাগিয়া উঠিবে ভেরীধ্বনি,
ভেরীনাদে গর্জিবে কামান বহির্ভাগে,
সে ধ্বনি আকাশে উঠি' প্রতিধ্বনি পাঠাবে ধরায়—
হ্যামলেটের শুভ তরে পান করে ডেনমার্ক-ভূপতি।
আরম্ভ হউক এইবার, রাখুন সতর্ক দৃষ্টি বিচারকগণ।

হ্যাম। এস লেয়ার্টিস!

লেয়া। আসুন কুমার! (অসিক্রীড়া চলিতে লাগিল)

হ্যাম। করেছি আঘাত।

লেয়া। কোথায়?

হ্যাম। বিচারক কি বলেন?

অস্রি। আঘাত নিশ্চয়, প্রত্যক্ষ আঘাত।

লেয়া। বেশ, এস পুনর্বার।

রাজা। থাম, সুরা দাও মোরে।
হ্যামলেট, এই মুক্তা তব তরে;
তব স্বাস্থ্য করিতেছি পান।
[তূরী ভেরী ও কামানের শব্দ]
এই পাত্র ধর হ্যামলেট।

হ্যাম। এ বাজীটা শেষ করি; রাখুন এখানে।
এস। (খেলা চলিতে লাগিল)
আবার মেরেছি; কি বল হে?

লেয়া। সামান্য আঁচড়, স্বীকার পেতেছি।

রাজা। জিতিবে মোদের পুত্র।

রাণী। ও একটু স্থূল, হাঁপিয়ে পড়েছে তাই।
এস হ্যামলেট, মুখখানি মুছে ফেল রুমালটি নিয়ে।
তোমার শুভার্থে হ্যামলেট,
রাণী আজ যোগ দিল সুরা-মহোৎসবে।

হাম। প্রণাম জননী।
রাজা। গার্ট ড, ক'রো না ক'রো না সুরাপান।
রাণী। ক্ষমা কর মোরে প্রভু, আজ করিবই সুরাপান।
এস হ্যামলেট।
রাজা। (স্বগত) বিষমিশ্র পাত্র দিল মুখে;
আর নিরুপায়।
হাম। সুরাপানে এখনই সাহস নাহি হয়;
আরও কিছু পরে দেবী।
রাণী। কাছে এস, মুখখানি মুছাইয়ে দিই।
লেয়া। মহারাজ, এবার আঘাত আমি করিব উহারে।
রাজা। মনে হয় পারিবে না।
লেয়া। (স্বগত) তবু মোর বিবেক দিতেছে যেন বাধা।
হাম। এস লেয়ার্টিস, তৃতীয় বাজীটা শুরু হোক।
তুমি যেন নিতান্তই খেলা করিতেছ;
সঞ্চালন কর অসি তীব্রতর বেগে;
আমারে অযোগ্য ভাবি অবহেলা করিছ কি মোরে?
লেয়া। তাই বুঝি? এস তবে। (যুদ্ধ করিতে লাগিল)
অস্রি। সমান সমান।
লেয়া। এইবার সাবধান!
(লেয়ার্টিস হ্যামলেটকে আহত করিল। পুনরায় যুদ্ধকালে উভয়ে তরবারি বদল করিয়া ফেলিল। হ্যামলেট লেয়ার্টিসকে আহত করিল।
রাজা। ছাড়াইয়া দাও, অতিক্রুদ্ধ হয়েছে দুজনে।
হাম। নাঃ, ফের এস। [রাণী পড়িয়া গেলেন]
অস্রি। ওদিকে রাণীকে দেখ।
হোরে। দুই পক্ষে রক্তপাত। কেমনে তা ঘটিল কুমার?
অস্রি। এ কেমন হ'ল লেয়ার্টিস?
লেয়া। অস্রিক, আপনি পড়িনু আমি আপনার ফাঁদে।
ঠিকই হ'ল, নিজ কৃতঘ্নতামূলে মরিলাম নিজে।

হ্যাম। কেমন আছেন রাণী ?

রাজা। রক্ত দেখে মূর্ছা গেছে।

রাণী। না, না, রক্ত নয়, ওই সুরা! ওরে বাছা হ্যামলেট,
সুরা, ওই সুরা। বিষ দিল মোরে!

হ্যাম। সর্বনাশ! দ্বার বন্ধ কর চারিদিকে।
কে কৃতঘ্ন খুঁজিয়া বাহির কর তারে।

লেয়া। এই যে এখানে, হ্যামলেট!
হ্যামলেট, তুমিও হত;
কোন ঔষধেই তব রক্ষা নাই আর।
খুব বেশি আধ ঘণ্টা জীবন তোমার।
খরমুখ বিষমাখা অবৈধ সে অসি
এখন তোমারই হাতে।
আমার অন্যায় ঘুরে হানিল আমায়।
এই যে শুয়েছি আর উঠিব না আমি।
বিষ দিল জননীকে তব।
কথা নাহি সরে, রাজা—ওই রাজা অপরাধী।

হ্যাম। অসিমুখে বিষও দেওয়া আছে!
তবে, বিষ, তোর কাজ তুই কর্ দেখি!
(রাজাকে অসিবিদ্ধ করিলেন)

সকলে। রাজহত্যা! রাজহত্যা!

রাজা। বন্ধুগণ, এখনও বাঁচাও মোরে;
আমি মাত্র আহত হয়েছি।

হ্যাম। এই যে, লম্পট, জহ্লাদ, ওরে ডেনীয় পিশাচ!
সুরার এ শেষটুকু পান কর্।
দেখ্ দেখি, মিশালি তো ঠিক?
হে আমার জননীর সাথী। (রাজার মৃত্যু)

লেয়া। ঠিকই প্রায়শ্চিত্ত হ'ল ওর।
ও বিষ সে নিজেই মিশাল।

মহান হ্যামলেট, এস মোরা ক্ষমি পরস্পরে।
তুমি হত্যা করিয়াছ আমাকে ও আমার পিতাকে,
সে পাপ স্পর্শে না যেন তোমা।
তোমাকে হত্যার পাপে ক্ষমা যেন পাই। (মৃত্যু)

হ্যাম। সর্বপাপে মুক্তি তোমা দিন ভগবান।
আমিও তোমার সাথী হই।
হোরেসিয়ো, শেষ হ'ল মোর।
হা হতভাগিনী রাণী, বিদায়, বিদায়।
তোমরা মলিন মুখে কম্পিত হৃদয়ে
অবাক বিস্ময় ভরে চেয়ে আছ যারা,
তোমরা ত জান না কিছুই।
ইচ্ছা ছিল তোমাদের সবই ব'লে যাব।
সে সময় পেলাম না,
শমন আসিয়া কেশে ধরেছে আমায়;
যাক। হোরোসিয়ো, চলিলাম আমি।
তুমি থাকো ভাই,
মোর কথা মোর ব্যথা যারা বুঝে নাই
তাদের বুঝায়ে ব'লো তুমি।

হোরে। তা হবে না। যে শোণিত বহে এ শিরায়
সে মোরে দেখায় অন্য পথ।
এখনো পানীয় কিছু অবশিষ্ট আছে।

হ্যাম। বন্ধু যদি হও, পাত্র দাও মোরে।
ছেড়ে দাও; এটুকু আমিই করি পান।
হোরেসিয়ো, গভীর রহস্যভরা কি দুর্নামই
রেখে গেনু পিছনে আমার!
যদি মোরে কোনদিন বুকে ধ'রে থাকো,
নিজশান্তি কিছুদিন দিয়ে বিসর্জন
ব্যথাভরা এ জগতে জীবন বহিয়া

আমার যা বলিবার তুমি ব'লে যাও।
[দূরে সৈন্যাভিযান ও বন্দুকের শব্দ]
ও কিসের কোলাহল ?

অস্রি। তরুণ ফর্টিনব্রাস জয়ী হয়ে ফিরে এল
পোলাণ্ড হইতে, ইংলণ্ডের রাজদূতে করে সংবর্ধনা।

হ্যাম। যাই তবে হোরেসিয়ো!
আচ্ছন্ন হইল জ্ঞান নিদারুণ বিষে।
ইংলণ্ডের সংবাদ শুনিতে থাকিব না আমি।
তবু ব'লে যাই—রাজা হবে এই ফর্টিনব্রাস।
অন্তিমের কথা দিনু তারে;
কি হতে কি হ'ল মোর বলিও তাহাকে।
এইবার নীরবতা। (মৃত্যু)

হোরে। একটি মহৎ হৃদি ফেটে টুটে গেল।
হে সৌম্য কুমার, বিদায়, বিদায়!
ঘুমাও শান্তির ঘুম
শত শত দেবাঙ্গনা-কণ্ঠের সঙ্গীতে।
এদিকে আসিছে কেন দামামার ধ্বনি ?
[সৈন্যদলের অভিযানসূচক বাদ্য]
[ফর্টিনব্রাস, ইংলণ্ডীয় রাজদূত ও অপরাপরের প্রবেশ]

ফর্টিন। সে দৃশ্য কোথায় ?

হোরে। কি দেখিতে চান ?
চরম বেদনা আর পরম বিস্ময়—
সকলি মিলিবে হেথা।

ফর্টিন। সর্বধ্বংসী এ কি শবস্তূপ!
গরবী মরণ, একমাত্র মৃত্যুবাণে
এতগুলি রাজরক্তপাত!
অনন্ত খর্পরে তোর কোন্ মহাভোজে
লাগিবে এ শব ?

১ম রাজদূত। মর্মান্তিক এ দৃশ্য ;
যে সংবাদ আনিলাম ইংলণ্ড হইতে
বৃথা হ'ল তাহা ; যাঁর আজ্ঞাক্রমে
রোজেনক্রান্জ্ গিলডেন্‌স্টার্ন হইল নিহত
নিরুদ্ধ শ্রবণে তাঁর আর পশিবে না
সে শুভসংবাদ। কে মোদের দিবে ধন্যবাদ?

হোরে। সে যদি রহিত বেঁচে তবু তার মুখে
ধন্যবাদ হ'ত না বাহির।
উভয়ের হত্যা তরে যে আদেশ গেল
সে আদেশ নহেক রাজার।
কিন্তু আপনারা, সুদূর পোলাণ্ড আর ইংলণ্ড হইতে
এখানে এলেন যদি এই দুঃসময়ে,
আজ্ঞা দিন—শবদেহগুলি
কোন এক মঞ্চোপরি হউক স্থাপিত।
সেথা হতে সর্বসাধারণে
জানাইতে চাই আমি কি হতে কি হ'ল।
মোর মুখে শুনিবেন,—
রক্তলোভী কামুকের অকথ্য কাহিনী,
আকস্মিক দুর্ঘটনা, হত্যা দৈবাধীন,
নির্দোষীর প্রাণ নিতে ধূর্তের ছলনা,
রক্ষিতে তা প্রাণান্ত প্রয়াস,
পরিণামে চক্রান্ত গভীর
কি ভাবে হানিল অসি স্বয়ং চক্রীরে,
সব কথা শুনিবেন মোর মুখ হ'তে।

ফর্টিন। তাই হোক্, সে কথা শুনিতে
সম্ভ্রান্ত সজ্জন সবে করহ আহ্বান।
একান্ত ব্যথিত চিত্তে
আমার সৌভাগ্য আমি করিনু গ্রহণ।

এই রাজ্যে কিছু দাবি ছিল তো আমার ;
সেই দাবি সবিনয়ে জানাই সবায়।

হোরে। এ বিষয়ে আমারও বক্তব্য আছে কিছু ;
সে কথা যে ব'লে গেল জানাতে সবারে
সবাই মানিবে তার কথা।
এখন রাখুন মোর পূর্ব অনুরোধ ;
সকলেরই চিত্ত উত্তেজিত ;
তথাপি সমস্ত কথা বলিব এখনি,
ভ্রান্তপথে নূতন চক্রান্ত
কি জানি ঘটায় পাছে নব দুর্ঘটনা।

ফর্টিন। চারিজন বিশিষ্ট সেনানী
হ্যামলেটে উঠায়ে লও বীরের সম্মানে।
সে যদি রহিত বেঁচে,
দেখাইত রাজোচিত সর্বগুণপনা।
তার যাত্রাপথে আজ বিহিত বিধানে
বাজুক সমরবাদ্য সামরিক অনুষ্ঠান সহ।
শবদেহ উঠাইয়া লও।
এ দৃশ্য সমরক্ষেত্রে সাজে;
অতি বিসদৃশ ইহা রাজসভামাঝে।
সৈন্যগণ, কর তুমি এখনি একযোগে বন্দুকের ধ্বনি।

[সামরিক প্রথায় শবযাত্রা, শবদেহ লইয়া সকলে
নিষ্ক্রান্ত ও বাহিরে তোপধ্বনি]

॥ সম্পূর্ণ ॥

অনু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রসঙ্গ কথা

হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ

সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে হিন্দু কোড বিলের বিচ্ছিন্ন অংশ 'হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন গৃহীত হওয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদের ঔচিত্যানৌচিত্যের উপর সকলেরই মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। হিন্দু কোড বিলের আর-একটি অংশ হ'ল বিশেষ বিবাহ আইন। এই ধারাটি এখনও পাস হয় নি, তবে এক দফা সংস্কার-সংশোধনের পর পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত দুই পরিষদের যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে আলোচিত হয়ে শীঘ্রই তা পার্লামেন্টের সমক্ষে উপস্থাপিত হবে, এবং যথারীতি গৃহীত হবে ব'লেও আশা করা যায়। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত বিবাহ বিলেও প্রথম বিলের ন্যায় অসিদ্ধ বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য তিনটি টুকরো বিলেরই উদ্দেশ্য : প্রচলিত হিন্দু বিবাহবিধির সংস্কার সাধন। তবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তফাত এই যে, প্রথম বিলটিতে হিন্দু বিবাহের চিরাচরিত ধর্মীয় সংস্কারকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে; অন্ত পক্ষে বিশেষ বিবাহ বিলে বিবাহ-অনুষ্ঠানকে ধর্মের সংস্কারের সঙ্গে না জড়িয়ে রেখে তাকে চুক্তির স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ একটি ধর্মসিদ্ধ (sacramental) বিবাহ; অপরটি চুক্তিসিদ্ধ (contractual)। কিন্তু উভয়ত বিবাহ-বিচ্ছেদকে হিন্দু বিবাহবিধির একটি অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এইখানেই হিন্দু বিবাহ ও বিশেষ বিবাহ আইনের বৈশিষ্ট্য। যে কারণে বিল দুটির এই বিশিষ্টতা সম্পাদিত হয়েছে সেই কারণটির উপর, অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রসঙ্গের উপর কিছুক্ষণের জন্তে আমাদের সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

প্রশ্নটিকে প্রথমত বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যাক। হিন্দু বিবাহের সংস্কার-প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীদের অন্যতম যুক্তি এই যে, হিন্দু বিবাহবিধি হিন্দুধর্মের একটি অচ্ছেদ্য অংশ। হিন্দু বিবাহের সংস্কার হিন্দুধর্মেরই সংস্কারের নামান্তর। হিন্দুধর্ম কতকগুলি মৌলি

মূল্যবোধ, কতকগুলি অপরিবর্তনীয় সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্কারগুলির যে-কোন একটির সামান্যতম পরিবর্তনে হিন্দুধর্মের বিকার ঘটানো হয়। কালভেদে অঞ্চলভেদে হিন্দু সমাজের নানাবিধ প্রথা ও আচারের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এত সব পরিবর্তন সত্ত্বেও সমস্ত বিবর্তন-পরিবর্তনের অন্তরালে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে আছে হিন্দুধর্মের সনাতনত্বের ধারণা। আমাদের দেশের প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ নিজ নিজ জীবনের গভীর ভাগবত উপলব্ধির ফল কতকগুলি অপৌরুষেয় বাণীরূপে শাস্ত্র-বাক্যের মধ্যে গ্রথিত ক'রে গেছেন, সেই সার সত্যগুলিই কালক্রমে দীর্ঘাভ্যস্ত বিশ্বাস ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের আকার পরিগ্রহ করেছে। হিন্দুধর্মের পরিবর্তন নেই, কেন না তার ভিত্তিগত সত্যগুলি মানুষী বুদ্ধিসঞ্জাত নয়, ঐশী চেতনার ফল। এই ক্ষেত্রে বিশ্ববিধানের অন্তর্নিহিত পরম প্রজ্ঞার বাণীরূপ মানুষের খণ্ডিত বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র। হিন্দুধর্মের সার সত্যগুলি মনুষ্যকৃত শাস্ত্রের আধারে রক্ষিত, কিন্তু তাদের মূলে অভ্রান্ত দৈববাণী। অতএব হিন্দু-ধর্মের কোনরূপ সংস্কার চলতে পারে না। আর হিন্দু বিবাহ যেহেতু হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সে-কারণ হিন্দুধর্মের অপরিবর্তনীয়তার ধারণা হিন্দু বিবাহের প্রতিও আরোপিতব্য।

এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় কি না সন্দেহ। সত্য বটে, হিন্দু বিবাহ হিন্দুধর্মের সংস্কারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু সেটি এক কথা, আর অপরিবর্তনীয়তার ধারণা অন্য। তেমন তেমন ভাবে বিচার করলে পৃথিবীতে কোন কিছুই বোধ করি অপরিবর্তনীয় নয়। কালের প্রভাব, যুগের প্রভাব, দেশ ও পরিবেশের প্রভাব অতি মৌলিক ধারণার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়। ধর্মের সংস্কার মানুষের মধ্যে সব চাইতে দৃঢ়মূল ব'লে সেখানে পরিবর্তন ঘটে সব চাইতে ধীরে ধীরে, তা হ'লেও সেটিও পরিবর্তন ঘটে। যুগভেদে নানা অবস্থাগত কার্যকারণের সমবায়ে দৃষ্টিভঙ্গীর যে বদল ঘটে, সেই পরিবর্তন মনুষ্যকৃত সব-কিছু অবস্থা ও ব্যবস্থার উপরেই তার অবধারিত প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রভাব কখনও লক্ষ্য, কখনও অলক্ষ্য, কিন্তু সুনিশ্চিত। বিশেষ, অনুষ্ঠান ও

প্রতিষ্ঠানগত ধর্ম এ প্রভাবের নিতান্ত অধীন। ধর্মের যেটি সার্বভৌম ও সার্বকালিক দিক, তার ধারণায় পরিবর্তন কদাচ ঘটে; কিন্তু যেখানে ধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক সাম্প্রদায়িক চেহারাটাই বড় কথা, সে স্থলে কালোচিত পরিবর্তনপ্রভাব কোনক্রমেই রোধ করা যায় না। এসব প্রশ্ন নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, সে সামর্থ্যও আমাদের নেই, তবে এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্যটিকে সুপরিস্ফুট করবার জন্যে হিন্দুধর্ম থেকেই দুই-একটি নজিরের উল্লেখ করা যেতে পারে।

যেমন জাতিভেদপ্রথা। জাতিভেদপ্রথা হিন্দু বিবাহবিধির মতই আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের একটি অচ্ছেদ্য অংশ। বস্তুত, ওটিকে অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান-গত হিন্দুধর্মের ভিত্তি বলা যেতে পারে। বহু মনীষী এই প্রথার গুণকীর্তন করেছেন, কেউ কেউ তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু জাতিভেদপ্রথার দোষগুণ যা-ই হোক, কেউ কি এ কথা বলতে পারেন যে জাতিভেদ প্রথার পুরাতন সংস্কার আজকের দিনেও অক্ষুণ্ণ আছে? এক কালে ব্রাহ্মণকুলে সম্ভূত ব্যক্তিমাত্রের শাস্ত্রচর্চা বিধি ছিল, এক্ষণে কতকটা অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে, কতকটা সামাজিক কাঠামোর রূপান্তরের ফলে ব্রাহ্মণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর মৌলিক আচার থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন। একসময়ে শাস্ত্রাচারী ব্রাহ্মণের পক্ষে ম্লেচ্ছস্পর্শ দূষণীয় ছিল, কিন্তু দেখা যায় ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের অধিকাংশ বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই ম্লেচ্ছ ইংরেজের স্পর্শদুষ্ট আর্থিক ভাতাগ্রহণে দ্বিধাবোধ করেন নি। এই যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, অভ্যাসের ভিন্নমুখী গতি, এর জন্যে যুগপ্রভাবই মূলত দায়ী। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক আর্থিক সামাজিক চেহারার যখন বদল ঘটতে থাকে, তখন তা অতি বড় সনাতন ব্যবস্থাকে নিয়েও টান দেয়। কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার বিবর্তন, ইউরোপখণ্ডে শিল্পবিপ্লব, যন্ত্রতন্ত্রের প্রসার ও নাগরিক সভ্যতার বিস্তৃতি, সর্বোপরি বিজ্ঞানের বাধাহীন অগ্রাভিযান—এ সকল নানা কারণের সমবায়ে আজ কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মের চেহারাই আর পূর্ববৎ নেই। যেমন অন্যান্য ধর্মে, তেমনই হিন্দুধর্মেও বহু কালোচিত

পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের জাতিভেদপ্রথা আত্মরক্ষার সর্বপ্রকার আয়াস সত্ত্বে তার পূর্বতন সংস্কার কোন মতেই টিকিয়ে রাখতে পারছে না। সব শেষে, তার উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে এ কালের সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা। সমদর্শিতা সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা, এ আদর্শ জাতিভেদপ্রথার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ দেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শের যত প্রসার ঘটবে তত সমাজজীবনের উপর জাতিভেদপ্রথার প্রভাব ক'মে আসবে। বিরুদ্ধবাদীরা যা-ই বলুন, এক সময়ে এ প্রথা ভারতীয় সমাজ-দেহ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়।

জাতিভেদের যুক্তিটি হিন্দু বিবাহবিধির সম্পর্কেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। সকলেই জানেন, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকেই হিন্দু বিবাহপ্রথায় নানাবিধ ছোটখাটো পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। অভিভাবক-শাসিত বিবাহের অত্যাচার পূর্বের তুলনায় কমেছে। প্রেমজ বিবাহের যৌক্তিকতায় বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সময়ে লোকে অসবর্ণ বিবাহের কথায় আঁতকে উঠত, এক্ষণে এ জিনিস অল্প-বিস্তর সকলেরই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মনে হয়, অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকদের পূর্বতন প্রতিকূল মনোভাব দ্রুত ক'মে আসছে। বাহুত গোঁড়া কিন্তু বিবাহ সমস্যার দ্বারা বিশেষভাবে প্রপীড়িত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার এই ব্যবস্থার প্রতি যে নীরব সমর্থন নেই—এমন কথাও বলা চলে না। এক সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বাঙালী জাতির কল্যাণের মুখ চেয়ে আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ-সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, সে সময় এই অগ্রগণ্য স্বজাতি-প্রেমিকের কথায় আমরা কর্ণপাত করি নি, কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সংরক্ষণশীলতার দুর্গে ফাটল ধরছে। একাধিক ব্যক্তিগত সাহসিকতার দৃষ্টান্তের সামনে ভীরু সংস্কার আজ অসহায়তার চেতনায় অবসন্ন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দু বিবাহের ধারণায় একটি মৌলিক পরিবর্তন। আইনের সাহায্য ছাড়া এই পরিবর্তন নিষ্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই হিন্দু সমাজের প্রগতিকামীরা এ ক্ষেত্রে আইনের শরণাপন্ন

হয়েছেন। এতাবৎ এ আইন ছাড়াও হিন্দু সমাজের চলেছে, কিন্তু নানা লক্ষণ দৃষ্টে এ সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছিল যে, সমাজের গুরুতর ক্ষতি না ক'রে এ আইনের প্রচলন বোধ করি আর অধিককাল কোন মতেই ঠেকিয়ে রাখা যেত না। হিন্দু বিবাহ অনেকটা সপ্তরথীবেষ্টিত অশ্বত্থামার যুদ্ধব্যূহের ন্যায়। তাতে প্রবেশের পথ আছে, নির্গমনের পথ নেই। মনে হয়, যে কোন রকমের ব্যবস্থায় এই রকমের একটি নির্গমনের পথ থাকা ভাল। ব্যক্তির আত্মরক্ষার এটি একটি সদুপায়। কোন প্রথার দ্বারা, কোন প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতার দ্বারা যখন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিষ্পিষ্ট হতে থাকে, এবং নিষ্পেষিত সেই ব্যক্তি—নারী হোন পুরুষ হোন—তা থেকে যখন তাঁর উদ্ধারের উপায় থাকে না, তখন এই-জাতীয় একটি সুযোগ তাঁর জীবনে দৈব আশীর্বাদের মতই দেখা দেয়। বর্তমান ভারতের আইন-প্রণেতৃগণ বিবাহ-বিচ্ছেদকে হিন্দু বিবাহপ্রথার মধ্যে গ্রথিত ক'রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে সবিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

আমাদের কেউ ভুল বুঝবেন না। আমরা নির্বিচার বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার-প্রয়োগের নীতির পক্ষপাতী নই। ইউরোপে আমেরিকায় অনিয়ন্ত্রিত বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষময় পরিণাম লক্ষ্য ক'রে তত্তৎ দেশের সমাজনায়কগণ ভীত হয়ে পড়েছেন। যেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি ভোগেচ্ছা-পরিপূরণের ছদ্ম আবরণে আত্মপ্রকাশ করে, বহুচারিতার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার উপায়-হিসাবে বিবাহ-বিচ্ছেদের সহজলভ্য সুযোগ সন্ধান করা হয়, সে স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদের ন্যায় অনিষ্টকর ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। দাম্পত্যজীবনের সাধারণ খুঁটিনাটি অবনিবনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় ক'রে বিবাহ-বিচ্ছেদের রন্ধ্রপথে দাম্পত্যবন্ধন ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে আসার দৃষ্টান্ত আমেরিকায় ক্রমশ এত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে যে, পবিত্র বিবাহ-অনুষ্ঠান সে দেশে অনেক ক্ষেত্রে প্রহসনে পর্যবসিত হবার উপক্রম হয়েছে। আমাদের হিন্দু সমাজে তেমন সম্ভাবনার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের পক্ষে এই পরিণাম আরও অবাঞ্ছিত এই কারণে যে, হিন্দু বিবাহ ধর্মীয় সংস্কারের

দ্বারা সর্বাংশে নিয়ন্ত্রিত। ইউরোপ-আমেরিকায় বিবাহপ্রথায় গির্জার ভূমিকা অপ্রধান না হ'লেও সে বিবাহের মধ্যে চুক্তির মনোভাব অনুস্যূত হয়ে আছে। কতকটা এ দেশের ব্রাহ্ম বিবাহের মতো। কিংবা বিশেষ বিবাহে'র পদ্ধতি-প্রকরণের সঙ্গেও কতকাংশে তার তুলনা দেওয়া যায়। হিন্দু বিবাহ আদৌ সে জাতীয় ব্যাপার নয়। পাশ্চাত্ত্যের কোন বিবাহরীতির সঙ্গে হিন্দু বিবাহপ্রথার তুলনা দিতে গেলে একমাত্র রোমান-কাথলিক-ধর্মনিষ্পন্ন বিবাহের সঙ্গেই সে তুলনা দেওয়া চলে। হিন্দু বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য বন্ধন একটি পবিত্র বন্ধন। শালগ্রাম-শিলা সাক্ষী রেখে অর্থাৎ ধর্ম সাক্ষী রেখে পারস্পরিক বাক্যদানের ভিত্তিতে এই বিবাহের সংস্কার গ'ড়ে উঠেছে। এই সংস্কারের ভিতর দেহমিলনের চাইতেও অনেক—অনেক বড় আধ্যাত্মিক মিলনের আদর্শ। কামজ মোহ আত্মিক মিলনমাধুর্যে রূপান্তরিত ও উন্নীত হ'লে তবেই হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। দেহ থেকে দেহান্তরে যাওয়ার সাধনার মধ্যেই হিন্দু বিবাহের পূর্ণতা। এইখানেই পাশ্চাত্ত্য বিবাহের সঙ্গে হিন্দু বিবাহের মূলগত পার্থক্য। পাশ্চাত্ত্য বিবাহরীতির ভিতর দেহবাদ মোটামুটিভাবে বলবৎ, আমাদের হিন্দু বিবাহে দেহ-কামনাকে কতকগুলি অখণ্ডনীয় ধর্মীয় সংস্কারের দ্বারা সংযত ও অবদমিত রাখা হয়েছে। বৃহত্তর সমাজ-কল্যাণের দিক থেকে এর ফল ভাল বই মন্দ হয় নি। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনরূপ আত্মপ্রবঞ্চনার মনোভাব পোষণ না ক'রেও যদি বিবাহবন্ধনের পবিত্রতাকে জীইয়ে রাখতে হয়, কামজ আকর্ষণের মালিন্য শোধন ক'রে বিবাহবিধির ভিতর আধ্যাত্মিক চেতনার সঞ্চার করতে হয়, তা হ'লে হিন্দু বিবাহের উদ্ভাবিত পন্থাই যে শ্রেষ্ঠ পন্থা সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান নাকি মানুষের কল্পনাশক্তির শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তা যদি হয় তো হিন্দু বিবাহকে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপ বলা যেতে পারে।

এতৎসত্ত্বেও এই প্রবন্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুকূলে যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়েছে কেন? সে এই জন্যে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রয়োজন আছে ব'লে আমরা মনে করি এবং সে প্রয়োজনের

আইনগত স্বীকৃতিও বাঞ্ছনীয়। নিরঙ্কুশভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার-প্রয়োগের যেমন বিপদ আছে, তেমনই বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার-প্রয়োগের পথ একেবারে রুদ্ধ থাকাটাও কিছু কাজের কথা নয়। এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যে স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হ'লে সমাজের পক্ষে তার ফল ভালই হবে। তাতে অশান্তি নিবারিত হবে, শক্তিক্ষয় নিবারিত হবে, ব্যক্তিস্বাবকাশের পথ উন্মুক্ত হবে। দাম্পত্য-জীবনে সংঘর্ষের পরিমাণ ক'মে এলে তার সুফল শুধু দাম্পত্যজীবনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে। অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে অশান্তির সম্ভাবনা যত কমবে, সমাজ-জীবনে প্রীতির ক্ষেত্র তত সুবিস্তৃত হবে।

সুখের বিষয়, এই সমস্ত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভারতীয় পার্লামেন্টের আইন-রচয়িতাগণ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, কারণ হিন্দু সমাজ ও হিন্দু বিবাহরীতির বৈশিষ্ট্য স্মরণ ক'রে এ অধিকারকে কোথাও যথেচ্ছাচারী হতে দেওয়া হয় নি, একাধিক কঠোর শর্ত আরোপ ক'রে তার প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদ না হ'লেই নয়, সেখানেই শুধু এ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা নীতিগত তথা আইনগত-ভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে, অন্যত্র হিন্দু বিবাহের সনাতন অচ্ছেদ্যতার ধারণা বলবৎ রাখা হয়েছে। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা আমাদের দেশের সকল কর্মে পরিলক্ষিত হয়, আলোচ্য প্রগতিমূলক বিলগুলির মধ্যেও সে চেষ্টার ছাপ বিদ্যমান। এখানে ব্যক্তিগত মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে কোথাও উদ্দাম হতে দেওয়া হয় নি, অথচ মুক্তির পথ খোলা রাখা হয়েছে। এখানেই তাদের বৈশিষ্ট্য।

স্বামী কিংবা স্ত্রী অশক্ত পঙ্গু খঞ্জ বা অন্ধ হ'লে বিপরীত পক্ষকে স্বতই কঠিন আত্মপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। হিন্দুসমাজ এই কঠিন পরীক্ষায় বরাবর উত্তীর্ণ। হিন্দু স্বামী বা স্ত্রী তার ধর্মসাক্ষিক জীবনসঙ্গীর কারণে দুঃখবরণে কদাচ পরাঙ্মুখ নয়। আত্মত্যাগের আগুনে আপনাকে দগ্ধ ক'রে পরিশুদ্ধ হয়ে তবে সে অপর পক্ষের প্রাণপ্রিয় হবার উপযুক্ততা

অর্জন করে। হিন্দু বিবাহবিধির মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর উপযুক্ততার এই ধারণাই সমর্থিত। এ কথার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে মোটামুটি-ভাবে এই উক্তি আধুনিকতাভিমানী বর্তমান সমাজের পক্ষেও সত্য। বিজ্ঞানকেন্দ্রিক বিংশ শতাব্দীর মধ্যসীমা অতিক্রম করার পরও দাম্পত্য আদর্শের ক্ষেত্রে আমরা স্থূল পুরাতন ঐতিহ্যেরই সমর্থক। আমাদের দেশে দাম্পত্যবন্ধনের দৃঢ়তা ও পবিত্রতা মনস্তাত্ত্বিক খুঁটিনাটির উপর নির্ভর করে না, যৌন জীবনের সার্থকতা অথবা অসার্থকতার চেতনার উপরও তার সম্পূর্ণ নির্ভর নয়; পক্ষান্তরে এক জোড়া নরনারীর মিলনের মাধুরীর অন্তরালে পরমাত্মা ও জীবাত্মা, পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনলীলার যে তত্ত্ব নিহিত, সেই তত্ত্বমহিমাই হিন্দু বিবাহকে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত অম্লান গৌরবে ধারণ ক'রে এসেছে। হয়তো অনক্ষর বা সাধারণ শিক্ষিত হিন্দু নরনারীর মধ্যে এ তত্ত্বের কোন চেতনা নেই; কিংবা বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা ও জড়বাদকবলিত সাধারণ মধ্যশ্রেণীর মানুষের জীবনে হিন্দু বিবাহের এই তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হবার তেমন অবকাশ নেই; তা সত্ত্বেও বলব, এই চেতনা একটি গূঢ় সংস্কারের মত সজ্ঞান অজ্ঞান সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই সতত ক্রিয়াশীল। সেদিন রাজপথে একটি কুৎসিতদর্শন অন্ধকে দেখলাম। বেশবাসে মনে হ'ল হিন্দু। দেখলাম, তার যুবতী স্ত্রী ভিক্ষার আশায় স্বামীর হাত ধ'রে তাকে এ-দুয়ার থেকে ও-দুয়ারে নিয়ে যাচ্ছে। রোগজীর্ণ কদাকার এক পঙ্গু পুরুষের পাশে মোটামুটি সুন্দরী ও স্বাস্থ্যোচ্ছলা যুবতীটিকে দেখতে বড়ই বেমানান ঠেকছিল। মেয়েটির বিড়ম্বিত-ভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে মনে দুঃখও হয়েছিল খুব। কিন্তু সেই সঙ্গে সেদিন এর মধ্যে একটি গভীর আত্মত্যাগের মহিমাও প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এই ভেবে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম, হয়তো সব ক্ষতির পিঠেই এই রকম এক-একটি সান্ত্বনার সঞ্চয় থাকে, নতুবা দুঃখ দুর্বহ হ'ত। এই মেয়েটি জীবনে বঞ্চিতা হয়েছে সত্য, কিন্তু স্বামীর এই দুর্গতির সুযোগে তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে সে যদি আর কোন পুরুষকে আশ্রয় ক'রে চ'লে যেত, তা হ'লে ন্যায়ধর্ম মানবধর্ম

নারীধর্ম এর কোনটাই রক্ষিত হ'ত না। দাম্পত্য-বন্ধনের মধ্যে যে নিবিড় আত্মিক আকর্ষণের টান আছে, সেই ভালবাসাই সম্ভবত এ দুটি ভাগ্যহত মানুষকে শত বিপর্যয়েও পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নি। হিন্দুর দাম্পত্যবন্ধন এত ঠুনকো নয় যে, স্বামী বা স্ত্রীকে তার নিজ অসহায় ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে অপর পক্ষ আত্মসুখ অন্বেষণ করবে। ভোগমুখ্য আত্মসুখের প্রবৃত্তি সর্বথা নিন্দনীয়, দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও। কেন না, দুইয়ের পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তির উপর দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত, এ স্থলে নিছক একের সুখ অগ্রাহ্য।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, স্বামী লম্পট কুক্রিয়াসক্ত স্ত্রী-পীড়ক কিংবা স্ত্রী ব্যভিচারিণী শোধনাতীতরূপে দজ্জাল ও সর্বপ্রকার নীতিবিহীনা, এবং তাদের স্বভাবের পরিবর্তনের কোন আশাই নেই, সে ক্ষেত্রে একের অত্যাচারের কবল থেকে অপরকে রক্ষা করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা আইনে বিধিবদ্ধ থাকা উচিত। স্পষ্টতই এরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা হিন্দুসমাজে নিতান্ত সীমাবদ্ধ, কাজেই আইনের যথেচ্ছ বা বহুল ব্যবহারের আশঙ্কা এ ক্ষেত্রে আদৌ প্রবল নয়। হিন্দু বিবাহের সনাতন ধর্মীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করা হ'ল, অথচ কতকগুলি চরম হৃদয়হীনতার দৃষ্টান্তের বেলায় উপদ্রুত স্বামী-স্ত্রীকে আইনের সাহায্যে আত্মরক্ষার সুযোগ দেওয়া হ'ল—এ যদি করতে হয় তা হ'লে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আর কোন কারণে নয়, নিছক মানবতার কারণেই এই অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত। উল্লিখিতরূপ দাম্পত্য-অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ উন্মুক্ত হ'লে শুধু যে অত্যাচারিত রক্ষা পাবে তা-ই নয়, যে অত্যাচারী সে-ও সমপরিমাণে রক্ষা পাবে। যেখানেই অসামঞ্জস্য সেখানেই গ্লানি। অত্যাচারিতের তুলনায় অত্যাচারীকেও এ গ্লানি বড় কম পীড়া দেয় না। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে গ্লানির পীড়নভার থেকে মুক্তি দুই দিক দিয়ে সুফল প্রদান করবে। দুটি মানুষের শক্তিক্ষয় নিবারণে সমাজ বহুতরভাবে উপকৃত হবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে যদি কোন আশঙ্কা থেকে থাকে সে হচ্ছে এই যে, এই অধিকারের ছিদ্রপথে বহুচারিতার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার লোভ উদ্রিক্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। পূর্বেই বলেছি, লোভের প্রবৃত্তি প্রায়শ যুক্তি-বুদ্ধির ছদ্মবেশে মানুষকে হাতছানি দেয় ও প্রতারিত করে। একসঙ্গে ঘর করতে গেলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে অবনিবনা ঘটাই স্বাভাবিক, তাকে প্রচণ্ড রকমের বিরোধের পর্যায়ে টেনে তোলবার কোন যুক্তি নেই। এ জাতীয় ক্ষুদ্র সংঘর্ষের উপলক্ষ দাম্পত্য জীবনে যেমন আচম্বিতে উপস্থিত হয়, তেমনই আবার অবলীলায় অদৃশ্যও হয়। এই সংঘর্ষ অমীমাংসেয় সমস্যায় অবনীত হয় তখুনি, যখন এক পক্ষে আত্মসুখেচ্ছা প্রবল থাকে এবং অপর পক্ষ হয় দুর্বল। এ সব ক্ষেত্রেই সাধারণত অপবুদ্ধি বিবাহ-বিচ্ছেদের কামনার ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে কানে প্রলোভনের মন্ত্র গুঁজে দেয়। আমাদের সমাজের তথাকথিত উচ্চাশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যতগুলি স্ত্রীত্যাগ ও পুনর্বিবাহের দৃষ্টান্ত একালে ঘটেছে তার অনেকগুলিরই পিছনে এ জাতীয় অপবুদ্ধির পোষকতা ছিল, এরূপ অনুমান করলে আশা করি সভ্য সুজনদের কাছে প্রত্যবায়-গ্রস্ত হতে হবে না।

কাজেই এক পক্ষের (অথবা দু পক্ষেরই) অনিয়ন্ত্রিত ভোগেচ্ছা সংযত করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা আইনে গ্রথিত থাকা উচিত। সুখের বিষয়, আলোচ্য আইনগুলিতে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। নানারূপ সতর্কতামূলক শর্তের দ্বারা আইনপ্রয়োগের ক্ষেত্র যথোচিতভাবে প্রাচীরাবদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের আইন-প্রণেতৃগণ এ ব্যাপারে আদর্শ মধ্য-পথের অনুসরণ করেছেন। মহামতি অ্যারিস্টটল-কথিত 'Golden-Mean'-এর নীতিকে যদি জীবনের সর্ব কর্মে ও ভাবনায় শ্রেষ্ঠ আদর্শের মর্যাদা দিতে হয়, তা হ'লে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়ে ভারতীয় পার্লামেন্টের আইন-রচয়িতাগণ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন তা মানতেই হয়।

নারায়ণ চৌধুরী

সংবাদ-সাহিত্য

করুণানিধান

কবি করুণানিধানের মৃত্যু (৫ ফেব্রুয়ারি, শনিবার রাত্রি আটটা) আকস্মিক নয়, শোকাবহও নয়। তিনি স্বয়ং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া খেয়াঘাটে উপনীত হইয়াছিলেন এবং "উত্তরণে"র প্রতীক্ষায় বলিতেছিলেন—

"ছুটি দাও তবে হে বসুন্ধরা,
প্রণমে মন,
পিয়েছি তোমার বিদ্যুতে মধু-
নির্ঝরণ।
মৃত্যু হাসিয়া প্রসাদ বিতরে
কাঁপে থর থর বুকের ভিতরে,
বাই গো তরণী, কোন্ কূলে শেষ
উত্তরণ?"

অতি নিঃশব্দে অনাড়ম্বরভাবে তাঁহার "উত্তরণ" হইয়া গেল, তাঁহাকে আর "জীবন-মৃত্যু-সঙ্গমে একা" তরণী বাহিবার ঝক্কি পোয়াইতে হইবে না; যে জীবন-সঙ্গিনীকে দীর্ঘকাল পূর্বে হারাইয়া হাহাকার করিয়া ফিরিতেছিলেন সেই "মাটির-কোল-ছাড়া"র ইশারায় তিনি স্বয়ং মাটির কোল ছাড়িলেন।

মাটির কোলই বটে। ওইটুকু ছাড়া তাঁহার আর কিছুই ছিল না। নিরাসক্ত কবি তাঁহার সীতারামের পায়ে পূর্বেই সকলই সমর্পণ করিয়াছিলেন, এতদিনে নিজেকে সমর্পণ করিলেন। সুখের বিষয়, ইতস্তত-সঞ্চরমাণ কবির স্ব-ভূমি শান্তিপুরেই এই শেষকার্য সমাপ্ত হইল। পাঁচ বৎসর পূর্বে তাঁহার তিয়াত্তরে তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন:

"আকাশ মোরে করে গো যাদু সাগর-কিনারায়
দিগন্তরে তরীর আলো জলছবিতে ভায়।
কে যেন বাঁশী বাজায় দূরে উতলা করে পূরবী সুরে
মেঘের কোলে পাহাড় দোলে ঝড়ের ইশারায়।"

ঝড় আর আসিল না, তিনি নিবিড়তম প্রশান্তির মধ্যে শান্তির পারাবারে তলাইয়া গেলেন, রাখিয়া গেলেন এই কয়খানি কাব্যগ্রন্থ—

১। বঙ্গমঙ্গল, ১৩০৮, পৃ. ৩২। প্রথম সংস্করণে কবির নাম ছিল না; ৪৪ পৃষ্ঠা ২য় সংস্করণটি ১৩১২ সালে কবির নামাঙ্কিত হইয়া বাহির হয়।

২। প্রসাদী, ১৩১২, পৃ. ৬৪।

৩। ঝরাফুল, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, পৃ. ৭৯। ২৩টি কবিতা আছে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা।

৪। শান্তিজল, ১৩২৯ (?), পৃ. ১১৮। ১৮টি কবিতা, ২য় সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্তিত।

৫। ধান-দূর্ব্বা, ১৩২৮ (?), পৃ. ১৩৬। ৩৮টি কবিতা।

৬। শতনরী, শ্রাবণ ১৩৩৭, পৃ. ২৩৯, পূর্ববর্তী কাব্যগুলি হইতে কবি হেমচন্দ্র বাগচী সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

৭। রবীন্দ্র-আরতি, বৈশাখ ১৩৪৪, পৃ. ৮১। ২২টি রবীন্দ্র-বন্দনা কবিতা।

৮। শতনরী, ভাদ্র ১৩৫৫, পৃ. ২৫৪+২। কবি কালিদাস রায় সঙ্কলিত

৯। গীতায়ন (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অবলম্বনে), জন্মাষ্টমী ১৩৫৬, পৃ. ৪৮+৵০। কবি ইহাকে খসড়া বলিয়াছেন।

১০। গীতারঞ্জন (উক্ত খসড়ারই পুস্তকাকারে প্রকাশ) ও অগ্রহায়ণ ১৩৫৮, পৃ. ৮৮। কবির শেষ জীবনদর্শন ইহাতে আছে।

১১। ত্রয়ী, ফাল্গুন ১৩৬০, পৃ. ৵৹+১১৮। 'বঙ্গমঙ্গল' 'প্রসাদী' ও 'ঝরাফুলে'র শেষ সংস্করণ, একত্র মুদ্রিত। সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য পাঠ।

৮, ১০ ও ১১ নং ছাড়া সবগুলিই অপ্রাপ্য। 'শতনরী' শেষ সংস্করণ মিত্র ঘোষে এবং 'গীতারঞ্জন' ও 'ত্রয়ী' রঞ্জন পাবলিশিং হাউসে প্রাপ্তব্য।

ইহা ব্যতীত কবির প্রথম জীবনের কয়েকটি এবং শেষ জীবনের কয়েকটি কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

কবির জীবনীও দীর্ঘ বা বিচিত্র নয়। অতি সংক্ষেপে তাহা এই :

আদি নিবাস হুগলীর গুপ্তিপাড়ায়। পিতামহ চন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়ার ভয়ে নদীয়া-শান্তিপুরে বসবাস করেন। সেই হইতে শান্তিপুরই তাঁহাদের দেশ। কবির পিতা নৃসিংহচন্দ্র শিক্ষকতা করিয়া জীবনাতিপাত করেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ৫ অগ্রহায়ণ (১৯ নবেম্বর ১৮৭৭) সোমবার শান্তিপুরে কবির জন্ম হয়। বি. এ. পাস করিতে পারেন নাই। দীর্ঘদিন নানা স্থানের নানা স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া শেষ পর্যন্ত জীবনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ল কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচির চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস-পরিদর্শক হন। ১৯৩৮ সনে ৬১ বৎসর বয়সে ওই কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১৩৬১ শনিবার) ৭৮ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতার সহিত পঞ্চকোটে অবস্থানকালে মাত্র এগারো বৎসর বয়সে পাহাড়-অরণ্যসমাবৃত প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখিয়া কবিচিত্তের প্রথম উন্মেষ হয়, তাহার পর ৬৭ বৎসর ধরিয়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কাব্য-সাধনা করেন। তাঁহার সরস্বতী গদ্যরচনায় মোটেই স্ফূর্তিলাভ করেন নাই। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিকুলের মধ্যে তিনি শুধু বয়সের দিক দিয়াই সর্বজ্যেষ্ঠ নন, সর্বরকমেই সর্বজ্যেষ্ঠ।

কবির একটি শেষ রচনা "সর্বেশ্বর" আমরা বর্তমান সংখ্যার প্রথম কবিতারূপে মুদ্রিত করিলাম। কবিতাটি কবির নাতি শ্রীমান দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য দিয়াছেন। তিনি "কামালপুরে কবি করুণানিধান"-শীর্ষক একটি স্মৃতিকথাও পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা অংশত প্রকাশ করিতেছি—

"স্থানীয় পাঠাগার স্থির করলেন, কবিকে সংবর্ধনা জানানো হবে। কবি যখন এই কথা জানলেন, তখন দেখলাম, তিনি গম্ভীর হয়ে ব'সে আছেন। বড় বিরক্ত হয়েছেন মনে হ'ল। শেষে কবি বললেন, 'একদিন ছিলাম যশের কাঙাল। আজ আর যশ চাই না। যশ কি হবে? দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুর মোহন রূপ। এ অভিনয় আর ভাল লাগে না।'

বাইরের সবাই চ'লে গেলেন। আমি আর কবি ব'সে আছি।

কবি বললেন, 'কবির পরিচয় কবির কাব্যে। যার জন্যে সংবর্ধনা দিচ্ছে, তার কি হবে?'

আমার বুঝতে একটু দেরি হ'ল না। ব'সে গেলাম খাতা কলম নিয়ে। বছরখানেক আগে (১৩৬০) কবি দেওঘরে যান। সেই সময় থেকেই কবির মনে কতকগুলি কবিতা আসে। এখানে সেগুলি বাণীরূপ পেল। কবি বললেন, 'তুমি হ'লে আমার গণেশ। প্রাইভেট সেক্রেটারি।' "আনার-কলি" কবিতাটি লেখা হয়ে গেছে। তার পর লেখা চলছিল "রেবা-শোণ," "সর্বেশ্বর," "শিরী-ফরিয়াদ" ইত্যাদি কবিতাগুলি। কবি সেই সময় বলেছিলেন, 'আমি তিনখানা নতুন বই বের করব। একটা 'শেষ পসরা', একটা 'চিত্রায়ণী' আর একটা 'আজব-আয়না'। 'শেষ পসরা'টা দেব সজনীকে। 'চিত্রায়ণী' থাবাকে, আর 'আজব-আয়না' তোমাকে। তুমি তো নাতি—তাই একটু হাসি-খুশি হবে এই বইতে। সবই হাসির কবিতা।'...

"শেষ-পসরা'য় যাবে "জীবনের পরিপ্রেক্ষি"তে কবিতা আর তার পর 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত সব কবিতা। আর 'চিত্রায়ণী'তে যাবে "সর্বেশ্বর," "মধুপুরে" আর "শিরী-ফরিয়াদ"—"মধুপুরে" হচ্ছে কবিতাগুচ্ছ। 'আজব আয়না' আদ্ধেক লেখা হয়েছে; বাকিটা লিখব।'

কবি ব'লে চলেছেন। কবিতার কথা বলতে তাঁকে কখনও ক্লান্ত দেখি নি। সব সময়েই প্রশান্ত। বালকের সরলতা নিয়ে যে চাইত শুনতে, কবি তাকেই বলতেন তাঁর জীবনের সব ঘটনা। কবি ব'লে চলেছেন। আমি শুনছি।

'গেলাম অমরকণ্টক পাহাড়ে। গিয়ে দেখি—'শোণ' আর 'রেবা' নদী ঐ পাহাড় থেকে নেমেছে। মনে হ'ল, একটি পুরুষ আর একটি প্রকৃতি। একটি উদ্ধত আর একটি শান্ত। কিছু দূর ব'য়ে যাওয়ার পর তারা পাশাপাশি চ'লে এসেছে।...দেখে খুব আনন্দ হ'ল। তখন থেকেই "রেবা-শোণ" আমার মনে এসেছে। তারই প্রকাশ হবে বাণীরূপে।'...

'আমি ব'লে চলি, আর তুমি লিখে যাও। তোমাদের খুব ভাল

লাগবে। বাঙালীর ভাল লাগলেই হ'ল। যেখানে কানে লাগবে অমনি বলবে। আগে লিখে নাও।'...

রোজই প্রায় সকাল আটটায় বসি। আমি আর কবি। কবি ব'লে চলেন, আমি লিখে যাই—কবিতার প্রতিলিখন। কোন কোন দিন বারোটা একটা হয়ে গেছে। তখনও কবি কবিতায় বিভোর। কবিতা লেখার স্থান ছিল সামনের ফুলবাগান, না হয় আম্রকুঞ্জ।

কোন কবিতা একবার লিখে তাঁকে সন্তুষ্ট হতে দেখি নি। এমনও দেখেছি, একটা কবিতা অন্তত পনরবার নতুন ক'রে লেখা হয়েছে। নতুন ক'রে লিখতে গিয়ে অদলবদল করেছেন।

কবি বললেন, 'আমি যা বলছি, সঙ্গে সঙ্গে লিখে নাও। তার পরে হবে প্রসাধন। যেখানেই কানে লাগবে, অমনি বলবে। আগে অবশ্য লিখে নিও। তার পর প্রসাধন। আর তা না হ'লে কবিতা—কবিতা হয় না।'...

কবি ব'লে চলেছেন। আমি লিখছি। কবিতা লিখে তারপর মধ্যাহ্নভোজন। কবি ছিলেন স্বল্পাহারী। কিন্তু সময়টা লাগত খুব বেশি। খেতে খেতে চলত অফুরন্ত গল্প।

রাত্রে ভাল কেন, প্রায় দেখতেই পেতেন না। তাই তিনি বলতেন, 'সকালবেলা হচ্ছে আমার মাহেন্দ্রক্ষণ। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমার কবিতার 'মুড' থাকে। সকালে সব সুন্দর হয়।'...

যত সকালেই উঠেছি, কবিকে কোনদিন বিছানায় দেখি নি। কবি ফুলবাগানের পাশে ব'সে আছেন। দ্রুত লেখনী চলছে। আর আনন্দের গুঞ্জরণধ্বনি ফুটে উঠছে বাতাসে। এ সময়টিকে কবি বলতেন 'কবিতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সময়।' সত্যিই তাই ছিল। রাত্রে যা ছিল, পরদিন সকালে তার রূপ যেত বদলে। অন্য সুগভীর ব্যঞ্জনায় ভ'রে উঠত।

একবার বললাম, একটা কবিতা পাঁচ-ছবার ক'রে লিখলে কত দিনে সব শেষ হবে? কবি চ'টে উঠলেন। বললেন, 'কবিতার প্রসাধন না হ'লে কবিতা কখনও ভাল হয় না। জান, রবিবাবুর একটি কবিতা

দুবার ছাপা হয় 'ভারতী'তে। আগে তার প্রসাধন হয় নি ব'লে রবিবাবু দুবার ক'রে ছাপালেন।...কবিতা কি ম্লান? কবিতা হচ্ছে বনিতা। বনিতার প্রসাধন যেমন অবশ্যকর্তব্য, তেমনি কবিতারও।"

শ্রীমান সরিৎশেখর মজুমদারও একটি স্মৃতি-কথা পাঠাইয়াছেন। তিনি কবির ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পত্নীহারা কবি ১৩৪৪ সালে (১৯৩৭) ছেলেদের লইয়া সাহেবগঞ্জে বিশ্রামের জন্য যান। সেখানে সাহিত্যব্যাপারে প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীসুধাংশুশেখর মজুমদার নেতা। সুধাংশুশেখর আমাদের বটুদা। ঠিক ওই সময়ে সাহেবগঞ্জে বনফুলসহ আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম। কবি ছিলেন বটুদার তত্ত্বাবধানে। সরিৎশেখর বটুদার পুত্র, সেই সময়ে অনেক সেবা করিয়া কবির স্নেহ লাভ করেন। করুণানিধানের করুণ এবং করুণাময় রূপ সেই সাহেবগঞ্জেই আমরা প্রথম দেখি, ফলে গভীর অন্তরঙ্গতা জন্মে। সরিৎশেখরের স্মৃতিকথাটি এখানে মুদ্রিত করিতেছি—

"শান্তিপুরের কবি করুণানিধান চিরশান্তিপুরে চ'লে গেলেন। করুণাময় কৃপাই করলেন বলব; 'গীতা'ময় মন আর জরাগ্রস্ত দেহ নিয়ে তিনি ইদানীং শুধু এই কৃপাই প্রার্থনা করতেন।

এমন সরল নিরহঙ্কার মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। এঁরা সেকালের লোক। কবি করুণানিধানকে বাঙালী চিরকাল দেখবে তাঁর কাব্যে। কিন্তু মানুষ করুণানিধানকে যারা খুব আপনজনের মত কাছে পেয়ে দেখেছে, সে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার মত বেদনা আর নেই।

অনেকদিন অনেক অমূল্য কথা তাঁর কাছে শুনেছি, মুগ্ধ হয়েছি। আজ ছাড়া-ছাড়াভাবে মনে পড়ছে সে সব। কবিতা রচনার কথা উঠলেই বলতেন, 'ওরে বাবা, বড় শক্ত কাজ, বড় সাধনার কাজ। বড় নিষ্ঠুরের কাজও। হু-হু ক'রে চার-পাঁচ পাতা লিখে গেলে—এক-একটা লাইন তোমার এক-একটা উপযুক্ত ছেলের মত। কত মায়া; কিন্তু তবু নির্মমভাবে তাদের কেটে ছেঁটে ফেলে দিতে হবে। ঠাস্ বুঝুনি চাই বাবা, ঠাস্ বুঝুনি। সর্বদা মনে রেখো।' শব্দ-নির্বাচনের ব্যাপারে কবির বিশেষ নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিটি কাব্যে। চোখ বড়

বড় ক'রে বার বার বলতেন তিনি—'শব্দ কি সোজা জিনিস! ওরে বাব্বা—বলে, শব্দ ব্রহ্ম!'

মানুষ ভবিতব্যের দাস। উনি বলতেন, 'তোমার আমার কিছুই করবার নেই।' তাঁর একটি কবিতায় তিনি এই বিশ্বাসের কথা দুটি সোজা সহজ লাইনে বলেছেন—

'ঘটবে যা, ঘটছে তাই
পূর্বেকার ঠিক করাই।'

ভগবানে অচল বিশ্বাস ছিল কবির। এই সূত্রে মনে পড়ছে এক-দিনের স্মৃতি। তারিখটা উনত্রিশে জানুয়ারি ১৯৫০ সন। ব'সে আছি, কবি ভগবানে বিশ্বাসের কথা বলছেন। 'প্রাণভরে ডাকতে পারলে, আকুলতা থাকলে তিনি নিশ্চয় সাহায্য করেন। আমার জীবনের একটি ঘটনার কথা তোমায় বলি। হৃষীকেশের ঘটনা।' সেখানকার হৃদয়গ্রাহী সৌন্দর্যে ডুবে গেছি। সেই স্বর্গীয় শোভা দেখতে দেখতে পথ হারিয়ে গিয়ে পড়েছি গভীর অরণ্যে। যখন ফেরার কথা মনে পড়ল—পথ, খুঁজে পাই না। চেষ্টা ক'রেও পথ পাই না। দারুণ ভয় হ'ল। বেশ মনে পড়ে, সেই অসহায় অবস্থায় আমি চোখ বুজে আকুলভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে বলেছিলাম—একজন কাউকে পাঠিয়ে দাও ভগবান এই পথে, আমি তাকে অনুসরণ ক'রে ফিরি। প্রায় দু মিনিট চোখ বুজে কাতর প্রার্থনা করার পর চোখ মেলতেই দেখি—দূরে কে একজন ছুটে চলেছে। আবছায়া মূর্তি। আমি ভরসা পেলাম। তার পিছু পিছু আমিও ছুটতে লাগলাম। চিৎকার ক'রে তাকে ডাকতে লাগলাম: এ ভাইয়া! এ ভাইয়া!! থাম ভাই, আমি সঙ্গে যাব। মূর্তি কোন সাড়া দেয় না, ছুটে চলে। আমিও প্রাণপণে ছুটি তার পিছু পিছু। এমনিভাবে কতক্ষণ ছুটেছিলাম জানি না। একটি ছোট্ট রেলওয়ে স্টেশনের ধার পর্যন্ত মূর্তিটা ছুটতে ছুটতে এসে কর্মরত কয়েকটি রেলের কুলির পিছন দিকে গিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি আর তাকে দেখতে পেলাম না। এতক্ষণে যেন জ্ঞান ফিরে এল। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম সমস্ত ঘটনাটা।

'ছোট স্টেশন।' নাম সোমনাথ ব্রিজ হল্ট। একজন রেল-কর্মচারী আমায় দেখে আশ্চর্য হলেন। তাঁকে সব বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, হরিদ্বারে ফেরার গাড়ি পাব?

'তিনি বললেন, গাড়ি বলতে তো কিছু নেই, কেননা কোন গাড়িই এখানে থামবে না! তবে ব্রিজের অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে মাঝে মাঝে গাড়ি থামে। এখনই একটা গাড়ি পাস হবার কথা আছে।

'দেখতে দেখতে গাড়ির আলো গেল দেখা। হে ভগবান! একবার গাড়িটা থামবে না? না হ'লে আমি ফিরব কি ক'রে?

'...এমনই ভগবানের কৃপা! হঠাৎ সিগন্যালের লাল আলো। এক সেকেণ্ডের জন্য গাড়ি গেল থেমে—যেন আমাকে তুলে নেবারই জন্যে। আমি এক নিমেষে উঠে পড়লাম। আজও আমার সেদিনকার ঘটনা মনে পড়ে। ভাবি, ভগবানের কি দয়া! অসহায় হয়ে আকুলভাবে তাঁকে ডেকেছিলাম, তাই তাঁর দয়া হয়েছিল। কে ওই ধাবমান মূর্তি? তোমরা বলবে, আমারই সেই আকুলতা ছায়ামূর্তি ধ'রে আমায় পথ দেখিয়েছিল। আমি তাকেই বলব, ভগবান। তা ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবানে বিশ্বাস রেখো বাবা।'*

কবির কোনও স্বতন্ত্র জীবনী বা কবির কাব্যের কোনও স্বতন্ত্র সমালোচনার গ্রন্থ এতাবৎকাল প্রকাশিত হয় নাই। বাংলাকাব্য-সংসার এখনও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত। আমরা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে কবির নিজের দেওয়া উপকরণ হইতে যে জীবনী রচনা করিয়াছিলাম, এখন পর্যন্ত তাহাই তাঁহার একমাত্র জীবনী হইয়া আছে। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঝরাফুলে'র (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮) "ভূমিকা"য়, মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার 'কাব্য-মঞ্জুষা'য় ও তৎ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়, শ্রীকালিদাস রায় তাঁহার 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে' করুণানিধানের কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তির হাতে কবি করুণানিধানের জীবনী ও কাব্যালোচনা বিস্তার লাভ করিবে সন্দেহ নাই। আমরা এখানে উপকরণের ইঙ্গিত মাত্র দিলাম।

বাংলা দেশের সাহিত্যরসিক গুণীসমাজ বিশেষ সম্বর্ধনানুষ্ঠানের মধ্যে

দিয়া তাঁহাকে কয়েকবারই সম্মানিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৯৪৬ সনে কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে বঙ্গীয় সাহিত্যিক মণ্ডলী হাজার টাকার দক্ষিণা সহ যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাহা উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৫০ ২১ জানুয়ারি, ৭ মাঘ ১৩৫৬ কবির ৭৩ বর্ষে তাঁহাকে সদক্ষিণা সম্বর্ধিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ সনে ৭৬ বৎসরে তাঁহাকে জগত্তারিণী-পদক-ভূষিত করেন। কিন্তু কাব্যের নিত্য ও শাশ্বত লোকে চির-অধিষ্ঠিত কবির পক্ষে এ সকলই বাহ্য ছিল; তিনি জাগতিক রূপের বন্দনা করিতে করিতে আনন্দময় অরূপের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, ভাষায় তাহার কিরূপ প্রকাশ হইত তাহা অনুমান করিয়া আমরা একটি কবিতায় লিখিয়াছি—

করুণানিধান, এ কি এ বিধান তব !
মনেরে রাখিয়া শ্যামলসবুজ দেহেরে করিছ পীত,
রুদ্ধ করিয়া কণ্ঠ, মরমে জাগাইছ সঙ্গীত—
চিত্ত ভরিছ আশা-আনন্দে নব !
বয়স-ধর্মে-অন্ধ নয়নে শিশুর কৌতূহল
জাগাইছ প্রভু, এ কি বল তব ছল !
নিজে আশ্রয় দিয়া দয়াময়, সব আশ্রয় করিছ বিলয়
খঞ্জ করিয়া পা দুখানি তুমি আগুন দিতেছ ঘরে,
মর্ম-ভেদিয়া তব জয়গান তবু ওঠে অন্তরে।
হে অজানা, আমি জানিয়াছি তব লীলা।
আঘাতে আঘাতে ব্যথা বেদনায় তোমার মহিমা বক্ষে ঘনায়
কঠিন উপল-খণ্ডের তলে করুণা অন্তঃশীলা।
সব ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া খুলিছ চিত্ত-দ্বার,
আলোর প্লাবন ভিতরে আমার, বাহিরে অন্ধকার।

সেই পরমকরুণানিধান করুণানিধানকে শেষ আশ্রয় দিয়াছেন, আমাদের নালিশ করিবার কিছু নাই।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ২৮৩৮

শনিবারের চিঠি
২৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬১

আত্মস্মৃতি

তৃতীয় প্রবাহ—ত্রয়োদশ তরঙ্গ

অদলবদল

১৩৩৯, ৯ই অগ্রহায়ণ (২৫ নবেম্বর ১৯৩২) তারিখের ডায়েরিতে দেখিতেছি:

চাকরির শর্ত অনুযায়ী 'শনিবারের চিঠি'র নূতন সম্পাদক বাছাই আজই করিতে হইল। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সকল দায়িত্ব লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিরণকুমার রায় পরিমল গোস্বামীর নাম করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণকে চিনি, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও সত্যেনদা (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার) সত্যেন্দ্রকৃষ্ণের বিবিধ ব্যক্তিগত দুর্বলতার উল্লেখ করিয়াও সাহিত্যিক কৃতিত্বের জন্য শুধু সম্পাদকীয় ভার তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে বলিলেন। 'নারায়ণে'র নানা গল্প-নাটক-উপন্যাসের রুচি আমার পছন্দবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহাকেই নির্বাচন করিব একরূপ স্থির করিয়াই আপিস গিয়াছিলাম। রবি ঠিক ভরা দ্বিপ্রহরে ঝড়ের মত আমার নিভৃত সম্পাদকীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতে বলিল, অনেক ভেবে দেখলাম, পরিমলই 'শনিবারের চিঠি'র উপযুক্ত সম্পাদক হবে। ও আমার ভাগনে। ওকেই নাও। উপাসনা'র ফোটোগ্রাফির উপর দুই-একটি প্রবন্ধ ছাড়া পরিমল গোস্বামীর কোনও সাহিত্যিক রচনার সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু ইতস্তত করিবার উপায় নাই। রবিকে কথা দিতে হইল। সন্ধ্যার মুখে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণকে গাড়িবারান্দার ছাতে লইয়া গিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলাম। পরিমল গোস্বামী সেই দিনই চাকরি লইলেন।

অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি' অবশ্য দিন ছয়-সাতের মধ্যে আমার সম্পাদকত্বেই বাহির হইল। এই সংখ্যায় চারিটি উল্লেখযোগ্য রচনা ছিল, প্রমথনাথ বিশীর সম্পূর্ণ কাব্য "বিদ্যাসুন্দর," রবি মৈত্রের "মিল-মেধ-কাব্য," আমার "কে জাগে" এবং শ্রীহলধর ভড় বিরচিত "উর্দোস্কৃত প্রচারিণী সভা"। হলধর ভড় অবশ্য গুপ্তনাম; লেখক গণিতবিদ্ অধ্যাপক মোহিতমোহন ঘোষ স্বনামেও সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। এই একটি মাত্র রচনার দ্বারা তিনি কতটা খ্যাতি অর্জন করিলেন জানি না, 'শনিবারের চিঠি'র খ্যাতি অনেক বাড়িয়া গেল। সাপ্তাহিক যুগে আমার "কামস্কাটকীয় ছন্দ", মাসিক-নবপর্যায়-যুগে যতীন্দ্র-

নাথ সেনগুপ্তের "হিজলী-দর্শন" যে-জাতীয় আলোড়ন তুলিয়াছিল "উর্দোস্কৃত"ও ঠিক তাহাই করিল। বাহির হইবামাত্র অগ্রহায়ণ সংখ্যা নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল। এই বিদায়ী-সফলতা আমার "বাধ্যতামূলক" বিরহ-ব্যথাকে প্রায় অসহ করিয়া তুলিল।

নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সম্পাদক ৫।সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের আপিস-ছাপাখানা-বাড়িতেই ডেরা বাঁধিলেন। আমি ও পরিমলদা দুইজনে দুই দিক হইতে জাল ফেলিয়া বঙ্গসাহিত্য-অরণ্যের দুই ভাবী বিহঙ্গম-ধুরন্ধরকে ধরিয়া চিরতরে বাঁধিয়া ফেলিলাম। আমি ধরিলাম তারাশঙ্করকে, পরিমলদা ধরিলেন বলাইচাঁদ অর্থাৎ বনফুলকে। পরিমলদার শিকারও অনতিবিলম্বে মৎকবলিত হইল। সমসাময়িক আরও অনেকে এই যুগে আমার আকর্ষণের বিষয় হইয়াছেন, তোরণদ্বার পার হইয়া বৈঠকখানাতেও আড্ডা জমাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃপুরে এই দুইজন ছাড়া আর কেহই প্রবেশাধিকার পান নাই। অবশ্য পূর্বগামী মোহিতলাল, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ সেখানে তৎপূর্বেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরে স্নেহাস্পদ আরও দুই-চারিজন প্রবেশ-পত্র পাইয়াছেন। ভক্তিভাজন রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ ও করুণানিধানের কথা বাদ দিতেছি। "আত্মস্মৃতি" পাঠকেরা জানেন বনফুলের সহিত আমার আগেই পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু সে পরিচয় মাত্র। ক্যাটালিটিক এজেন্টের মত পরিমলদাই আত্মীয়তায় পাক ধরাইয়া কাটিয়া পড়িয়াছেন। আর কোনও কারণে না হউক, এই কারণেই তিনি আমার ধন্যবাদার্হ। তারাশঙ্কর 'উপাসনা'র ধারাবাহিক পথে ধরা দিলেও আমি তাঁহাকে নিজেই অর্জন করিয়াছিলাম। চতুর্থ প্রবাহের গোড়ার দিকে তারাশঙ্কর-বনফুল-সংবাদ বলিব।

"উর্দোস্কৃত" একটি নিত্যরসে টলমল মাণিক্যবিশেষ। কিন্তু কালের কপোলতলে তাহা বিশুষ্ক হইয়া রেখামাত্র না রাখিয়া হারাইয়া গিয়াছে। রচনাটির কিঞ্চিৎ এখানে ধরিয়া রাখিলে অন্যায় হইবে না।—

"আজ প্রায় তিন মাস হইল মামা বাত সারাইবার জন্য আমার বাসায় আসিয়াছেন। মামার বাত সারিয়া গিয়াছে, এখন প্রত্যহ দুপুরবেলায় ষ্টীমারে চাঁদপাল ঘাট হইতে রাজগঞ্জ

অবধি ভ্রমণ করেন। সেদিন মামার সহিত ষ্টীমারে বেড়াইতেছি। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘাট হইতে একটি প্রৌঢ়বয়স্ক মুসলমান ষ্টীমারে উঠিলেন। শ্রোতার অভাবে এতক্ষণ মামার গল্প বন্ধ ছিল। মুসলমানটিকে সাদরে নিজের পাশে বসাইয়া একটি বিড়ি দিলেন। মিঞা সাহেব ব্যাগ হইতে একখানা হাতপাখা বাহির করিয়া দাড়িতে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, বিসমিল্লা, কি গরম!

আমা। হ্যাঁ, সামান্য গরম পড়েছে বটে তবে বোগ দাদের তুলনায় এ কিছুই নয়।

মিঞা। আপনি বোগ্‌দাদ গ্যাছলেন না কি?

মা। আমি ধনপতি বসু। পৃথিবীর কোন জায়গায় যাই নাই তাই জিজ্ঞাসা করুন।

মি। বোগ্‌দাদে কি খুব গরম?

মা। গরম তা আর বলতে? সেবার তিনটে উট আমার চোখের সামনে হাটফেল হয়ে মরে গেল। আবার পড়ে রইল আমার তাঁবুর সামনে। তখন ভয়ানক যুদ্ধ চলেছে, ঘণ্টায় ২৫।৩০টা হাত পা মাথা অ্যাম্পুটেট করছি, উটগুলোকে যে টাইগ্রিসে ফেলে দেব সে সময় নাই। দুদিন বাদে হাসপাতাল থেকে বেরুবার সময় পেলুম। বেরিয়ে দেখি উটগুলো পচে নি। তিন দিন দিনযামিনীতাঁয়প্রাতঃ রৌদ্র লেগে একেবারে আমসত্ত্বের মতন হয়ে গেছে।

মি। বলেন কি? হাড্ডি ভি শুকিয়ে গেল?

মা। একদম বিলকুল শুকিয়ে খেংরাকাটি বনিয়ে গেল।

মি। তাজ্জব কি বাত!

মা। এ আর তাজ্জব কি? তখন চীনদেশে ডাক্তারি করি। বুদ্ধদেবের উইসতম টুথ উদ্গম উপলক্ষ্যে আমাদের ২১দিন ছুটি। সঙ্গে একটি চীনে হাবসী চাকর নিয়ে চীনের পাঁচিল দেখতে বেরুলুম। গিয়ে দেখি চীনারা কাঁচা পাঁপরে জলের ছিটে দিয়ে পাঁচিলের ওপর রাখছে আর খানিক বাদে পাঁপর মুচমুচে ভাজা হয়ে উঠছে।

মি। বিসমিল্লা, এমন কাণ্ড ত কখনও শুনি নি!

মা। শুনবেন কোত্থেকে? আগে ত আর ধনপতি বোসের দেখা পান নি। আমি 'চীনময় ভারত' বলে একখানা বই লিখছি তাতে এই সব কথা থাকবে। গরমে পাঁচিলের পাথরগুলো স্কটাফট কাটছিল, তার এক টুকরো ছিটকে লেগে হাবসীটা মরে গেল।

মি। একদম মরে গেল?

মা। একদম আপাদমস্তক মরে গেল। প্রতি বৎসর পাঁচিলের কাছে ৩৭ হাজার লোক গরমে গলে মারা যায়—

মি। পাঁচিলের ধারেই পচে, না তাদের কলসীতে পুরে গোর দেওয়া হয়?

মা। পচেও না, গোরও দেওয়া হয় না। গরমে গলে শিলাজতু হয়ে হিমালয়ের গা বেয়ে তিব্বতে এসে পড়ে আর কবিরাজরা তাই কুড়িয়ে নিয়ে ওষুধ করেন। যাক, অনেক

কথা হ'ল, শালিমারে এসে পড়েছি দেখছি, আহুন আর একটা বিড়ি নিন, আমিও একটু তামাক খেয়ে নিই।

তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, তাই ত মিঞা সাহেব, এতক্ষণ আলাপ হ'ল, আপনার নাম ত জানা হ'ল না! কোত্থেকে আসছেন?

মি। আমার নাম গাজী বিটকেলউদ্দীন, ঢাকা জিলার মতুব হতে বাংলা বাত ইমপ্রুভ করবার জন্য কলকাতায় এসেছি।

মা। আহা হা! আপনিও বাতে ভোগেন নাকি? ও অতি মারাত্মক ব্যারাম।

মি। আরে মশাই, আমি বাত ব্যারামের কথা বলছিনা। আমার বাত বাংলাবাত, যাকে আপনারা বলেন, ব্যাঙ্গলী লিংগুয়েজ। হিঁদুদের হাতে পড়ে বাংলা বাত একদম পয়মাল হয়ে গ্যাছে। আমি এই বাংলা লিংগুয়েজে উর্দু ও আরবী বাত ঢুকিয়ে এমন একটি চীজ বানাব যে দুনিয়া শুদ্ধ লোক অবাক হয়ে যাবে।

মা। সাবাস মিঞা, সাবাস! এ অতি উত্তম কথা বলেছেন। বাংলা ভাষায় বাত ধরিয়ে দিতে পারলে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়। আপনার প্ল্যানটা খুব ভাল, এতে পার্কে ঢেঁপো ছেলেগুলোর বক্তৃতা বন্ধ হবে, বাড়িতে মেয়েদের ঝগড়া বন্ধ হবে—

মি। না না, আপনি কিছু সমজাচ্ছেন না। আমরা চাই আপনাদের বাংলা ভাষায় শওকরা ৫০টি উর্দু ও ফারসী কথা ঢোকাতে। আপনাদের হাতে পড়ে সংস্কৃতের ঠেলায় বাংলা লিংগুয়েজ একেবারে জাহান্নামে গেছে, আমরা ওর উদ্ধার করতে চাই।

মা। ও বাবা! আপনি তো সোজা লোক নন। তা এ ভাষাকে বাংলা বলবেন কেন? একে বলুন উর্দোস্কৃত।"

ইহাই হইল মামার উর্দোস্কৃতের গোড়াপত্তন। আজ সমগ্র ভারতের কল্যাণে বঙ্গবলিদানের পর উর্দোস্কৃতের মহিমা আমরা সঠিক বুঝিতে পারিব না, কিন্তু ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে সত্যই উহা ভয়াবহ মূর্তি লইতে বসিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিণ্ডিকেট-সভার মিনিট-বইয়ে ইহার অনেক প্রমাণ মিলিবে। যাহা হউক, "উর্দোস্কৃতে"র শেষটা অংশত এই—

"আজ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে উর্দোস্কৃত প্রচারিণী সভার প্রথম অধিবেশন। সর্ববাদিসম্মতিক্রমে দামাদুস্সোলা সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে গাজী বিটকেলউদ্দীন উঠিয়া বলিলেন—ভাইছাব ও বহিমছাবীগণ, আজ মোদের কি সুরোজ। আমরা এতগুলি আদমী আদমিনী জাড়পীড়িত বকরা-বকরীর ন্যায় একত্র হইয়াছি। টুকিওয়ালা মৌলবীদের হাতে পড়িয়া বাংলা ভাষার নাজেহালত্ব লাভ হইয়াছে, অবে সোবে হয় দৌলতখসম [ধনপতি] বহু ও সেরাবাগটী হাহেবের মেহেরবানীতে উহার পুনর্বার

প্রাপ্তি হইবে। মজর করুন হিন্দু বাঙ্গালীরা কি পাজী। আমরা শওকরা ৫৫জন হইলেও ওরা আমাদের বাত মোটেই পুছে না। একমাত্র বিনয়কুমার সরকার ছাব—দুনিয়া, দৌলত, পয়সার প্রভৃতি বাত ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু হিঁদুয়ানীর চক্রে পড়িয়া তিনিও একখানি কেতাবের নাম 'পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' রাখিয়াছেন। কেন, উস্কোর বদলে 'জরু, গরু ও মুলুক' নাম দিলে কি ক্ষতি হইত?

বিটকেলউদ্দীন এই বক্তৃতা দিয়া ঘন ঘন দাড়ি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ও চতুর্দিক সাবাস, সাবাস, কেয়াবাৎ শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন দৌলতখসম বহুছাব কিছু বলিবেন। ইনি উর্দোস্কুতে বহুত কেতাব বানাইয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু পড়িবেন। তখন মামা ভুঁড়ি দোলাইতে দোলাইতে বলিতে লাগিলেন, মজলিসখসম জবরাশয় [সভাপতি মহাশয়] ও অদ্রাভদ্র মাজলিশগণ, উর্দু ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাত। উরস দুলাইয়া যাহা পড়া যায় তাহাকে উর্দু বলে। আপনাদের নিশ্চয়ই নজরস্ত হইয়াছে যে আদমী শিশুগণ যখন নয়া পড়িতে সুরু করে তখন তাহারা হাতি দুলাইয়া পড়িতে থাকে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে পহেলা সকলেই উর্দুতে পাঠ করে। আমরা মেহেরবানী করিয়া শওকরা ৪৫টি সংস্কৃত বাত রাখিতেছি। এই বাতে যে আচ্ছা কেতাব বানানো যাইতে পারে তাহা দেখাইবার ওয়াস্তে আমি রামায়ণখানি উর্দোস্কুতে বানাইয়াছি। আপনারা স্থির মেজাজিস্থ ও খাড়কর্ণ হইয়া শ্রবণ করুন। এই বলিয়া মামা একতাড়া কাগজ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

সীতার সাথ রিস্নাদশ-[দশরথ]-হাওয়াল রামের সাদী হইয়া গিয়াছে; কয়দিন খুব জোর খানাপিনা চলিয়াছে। রাম লক্ষ্মণ ভরত দুসমনয় সকলেই হাজির। সীতামায়ির ললাটে সিন্দুর পাণি-পাণি করিতেছে। সবাবর্ষি জনক চারপায়োপবেশনে উজু করিতেছেন, তাঁহার সামনে বশিষ্ঠ মৌলবী দুনিয়া-দোস্ত [বিশ্বামিত্র] মোল্লা গৌ চুরি করিয়াছে বলিয়া মালিশের আরজি পেশ করিতেছেন। এমন সময় 'হরিনাম হক্, হরিনাম হক্' বলিতে বলিতে নারদ মোল্লা আসিয়া হাজির, ইয়া আজানুলম্বিত নূর, হাতে অলাবুর বদনা। জনক তখনই তাঁহাকে লুঙ্গিগর্দাম [গলবস্ত্র] হইয়া আ-জমীন সেলাম করিলেন।...

মামার বক্তৃতা শেষ হইলে সকলে 'দৌলতখসম বহুকা জয়' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সভা ভঙ্গ হইল। শ্রোতারা উৎসাহে মামাকে চাংদোলা করিয়া রিক্‌শায় চাপাইয়া দিল, আমিও রিক্‌শার একধারে বসিলাম। আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। রিক্‌শা যখন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মমন্দিরের কাছ দিয়া যাইতেছে তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, শুনিলাম কয়েকটি যুবক সিঁড়ির উপর বসিয়া গান গাহিতেছে—

চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ আত্মাই-চন্দ্রোদয় হে!

উর্দোস্কুতের আবিষ্কারক মোহিতমোহন ঘোষকেও আজ কেহ

স্মরণে রাখে নাই, কিন্তু তাঁহার একক রচনাটির মতই তিনি মানুষটিও ছিলেন মাণিক্যবিশেষ। ১৯১১ সনে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পরীক্ষায় উত্তরপাড়া বিদ্যালয় হইতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯১৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্র হিসাবে বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম.এস-সি. পাস করেন। সঙ্গে সঙ্গে সার্ আশুতোষের দৃষ্টি এই দরিদ্র অথচ কৃতী ছাত্রটির উপর পড়ে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপকরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। বিশুদ্ধ অঙ্কের ছাত্র হইলেও মোহিতমোহন সর্ববিদ্যাবিশারদ বা চৌকস ছিলেন; সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান ছিল, ব্রিজ খেলাতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মাতৃভাষায় তাঁহার অতিশয় সরস রচনাভঙ্গির পরিচয় "উর্দোস্কুতে"র উদ্ধৃতাংশেই মিলিবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতিশয় মাতৃ-ভ্রাতৃ-পরায়ণ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিতে করিতেই তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। বঙ্গসাহিত্যের এই অপরিস্ফুট প্রতিভার প্রতি এই সুযোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

রবির আকস্মিক মৃত্যুর প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া একদিন তাহার ইটালির বাসায় গেলাম। তাহার প্রতিপালিত, কলিকাতায় শিক্ষারত কিশোর-যুবকদের এবং তৎসঙ্গে তাহার ঘরজোড়া সুবৃহৎ আলমারির বই ও পুথিগুলির কাতর হাহাকার যেন আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কয়েকটি মোটা মোটা খাতায় ও টুকরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাগজে অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত তাহার বহু গদ্য-পদ্য রচনা ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ছিল; সেগুলি সংগ্রহ করিলাম। ক্ষীণ আশা ছিল, এই কাগজপত্রের মধ্যে "ঘৃতকুম্ভে"র শেষাংশ, অন্তত তাহার একটা প্রাথমিক খসড়াও খুঁজিয়া পাইব। এই অপূর্ব উপন্যাসখানি ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠের 'শনিবারের চিঠি'তে আরম্ভ হয় এবং পৌষ সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্বের অষ্টম অধ্যায় বাহির হয়। ওই পর্যন্ত কপি আমরা পাইয়াছিলাম। ঘাঁটাঘাঁটি করিতে করিতে পূর্ণ ও খণ্ডাকারে অনেক কবিতা গল্প ও নাটিকা পাইলাম, কিন্তু প্রার্থিত বস্তু মিলিল না।

অনেকগুলি রচনা 'শনিবারের চিঠি'র "রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যা"-ভুক্ত করিলাম, 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাতেও অনেকগুলি লেখা বাহির হইল। আজও পর্যন্ত দেখিতে পাই, রবির অপ্রকাশিত লেখা এখানে ওখানে বাহির হইতেছে। কিন্তু "ঘৃতকুম্ভ" অসম্পূর্ণ আছে। রবির দাদাদের ইচ্ছা ছিল, আমিই উহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু রবির রচনার উপসংহার করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। রবির এক দাদা "ঘৃতকুম্ভ" শেষ পর্যন্ত নিজেই শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমি উপযুক্ত বিবেচনা করি নাই।

রবির রচনাবলীর মধ্যে "কুকৃরি" শীর্ষক একটি ছোট্ট কবিতা ছিল, পারমলদা তাহা চৈত্রের 'শনিবারের চিঠি'ভুক্ত করেন। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত আমার "টুকৃরি"-কবিতাগুলি রবির খুবই ভাল লাগিত। বিশেষ করিয়া অমলদা (শ্রীঅমল হোম), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার নিজের সম্বন্ধে রচিত "টুকৃরি"গুলি সে প্রায়ই আমাদের আড্ডায় আওড়াইত। অমলদার সঙ্গে পরিচয় তখনও ঘনিষ্ঠ হয় নাই, তাঁহার ভাবী ভায়রাভাই হাবল (হিরণকুমার) সান্যালের কৃপায় একটুকু ছোঁওয়া লাগিয়াছিল, একটুকু কথা শুনিয়াছিলাম এই মাত্র। কিন্তু রবির কণ্ঠে যখন শুনিতাম—

জহরলালের নিজ হাতে সইকরা,
টেবিলে পড়িয়া বই তাঁর একখানা,
রবি ঠাকুরের লক্ষ্মীরূপের লক্ষ ফোটোগ্রাফ।
অদ্ভুত মায়াজাল—
শাখাপাতাহীন গাছ, মনে হয় পুষ্পস্তবকান্বিত,
ফুলের গন্ধে মন্দিত চারিদিক।
বেলোয়ারি ঝাড়, কাচ তার একখানা
কোহিনুর ভ্রমে তুলে রাখি সিন্দুকে।
ট্রামে চাপে তাই মনে হয় যেন রোলস্,
কথা কহে, যেন মনে হয় গান গাহে।

তখন সকলেরই মনে হইত, মানুষটি আমাদেরও খুবই চেনা, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। প্রায় ২৩ বৎসর পার হইতে চলিল, তাঁহার সহৃদয় হৃদয়লোকে

ধীরে ধীরে প্রবেশাধিকার পাইয়া অভিষিক্ত ও ধন্য হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার বহির্বাস বা "টোগা"র ভাঁজের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখি নাই। ধোপদুরস্ত অমলদা টিলাঢালা আমাদের বিস্ময়ই রহিয়া গিয়াছেন। যাক, অমলদার কথা পরে হইবে। রবি তাহার নিজের নামের "টুক্‌রি"টিও সমান দরদ দিয়া আবৃত্তি করিত, তাহার স্মৃতিশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ—

রিক্সায় চেপে বেলেঘাটা পুল পারে
যেতে যেতে বলে মাথাভরা রুখু চুলে
লক্ষ টাকার স্বপ্ন কজন দেখে।
দাড়ি গোঁফ যদি থাকে থাক্ খোঁচা খোঁচা
হোক খদ্দরী ধুতি পাঞ্জাবি ম্লান—
ক্ষতি কি হ'লেই মহিলাকুলের সভা।
হোগা গায়ে হিলে শিস্ হাজার দশ
কাটিহারে আছে ন'হাজার সাঁওতাল,
তবু মন কাঁদে, কোথা পাট-ক্ষেতে বিষবা-নিবাতন।
নির্যাতিতের কথা—
কহিতে গেলেই গলা চড়ে ধাপে ধাপে
চোখ ভ'রে আসে অকারণ আঁখি-জলে।
দেশ কি ধর্ম বড়
যাচাই করিয়া আজিও হয় নি দেখা।
প্ল্যাটফর্মের দাঁড়াইয়া একধারে
থার্ড ক্লাসের দেখিছে প্যাসেঞ্জার।
ওদিকে আবার শর্মা শ্রীদিবাকর
হরিকুমারের করিছে অন্বেষণ।

মৃত্যুর পর দেখা গেল, ক্ষত্রিয় রবির মনের উত্তাপে 'শনিবারের চিঠি'র "টুক্‌রি" কুক্‌রিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সে লিখিয়াছে—

"ঘুঁটে কুড়াইতে কুড়ায়ে চাপার কলি
শনিবার-হাটে কহিছে, কে নিবি ঘুঁটে?
সস্তায় যায়—চারি গণ্ডার দরে।
ফুলের ব্যাপারী ক্ষ্যাপারে কহিছে ডাকি,
ঘুঁটে কুড়ানো তো ব্যবসা তোমার নহে,
মারিতেছ মজী গোবেচারাদের শুধু।

ক্যাপা হ্যা-হ্যা হাসে উনুনে চালিতে যায়।
উমার জননী খস্তি লইয়া রোখে।
নীচে এসে ক্যাপা পাখা খুলে পড়ে প্রুফ।
টুকরি উজাড় করিয়া ফেলিল টানি
আস্তাকুঁড়েতে খ্যাপার ঘরণী রেগে।
মাটিতে বুঝিবা ভেল্‌কি লুকায়ে ছিল
নিমেষে টুক্‌রি হইল কুক্‌রিখানা।
চাদরের ভাঁজে লুকায়ে আনিনু ঘরে,
ভাবিতেছি এরে কাহারে জবেহ করি।"

'শনিবারের চিঠি'তে ইহাই রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সর্বশেষ রচনা। সে চাহিয়াছিল, আমি ওই ছন্দে তীক্ষ্ণ "স্যাটায়ার" রচনা করি। তাহার আকাঙ্ক্ষা যে আমি পূর্ণ করিয়াছি, আমার 'রাজহংস' ও 'মানস-সরোবরে' তাহার প্রমাণ আছে। সে খুশি হইয়াছে কি না জানিবার উপায় নাই।

নূতন চাকরি-জীবনে বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই নানা দিক দিয়া নানা অদলবদল হইয়া গেল। শহরতলীসন্নিহিত রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীটে আর ভাল লাগিতেছিল না, ব্যবসায়ের পক্ষেও স্থানটা অসুবিধাজনক। একমাত্র আকর্ষণ—মাসীমা হেমন্তবালা দেবীর আকর্ষণ, তিনি ক্রমাগত পত্রধারায় আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য অনেকটা ধুইয়া আনিয়াছিলেন। মাসীমাকে লেখা কবির কয়েকটি পত্রেই দেখিতেছি, আমার প্রসঙ্গ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। একটু একটু নমুনা দিলে মাসীমার কৌশলটি অনুধাবন করা সহজ হইবে। ১৩৩৯ ৪ঠা কার্তিকের চিঠিতে দেখিতেছি—

"সজনীকান্ত যদি আমাকে চিঠি লিখতে চান নির্ভয়ে লিখতে বোলো, আমি কখনো তাঁকে অসম্মান করব না। যাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল বা মনের মিল নেই তাঁদের সঙ্গে সেই অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক কারণবশত আমার ব্যবহারকে কলুষিত করতে আমি অক্ষম। অনেক সময় দেখতে পাই আমার সঙ্গে সৌহার্দ্যের অভাব অহৈতুক, আমার অবাধ দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও তা দূর হয় না, যেহেতু আমি অতিমানব নই সেই জন্যে সেটা আমাকে বেদনা দেয় কিন্তু তাই বলে আমিও বেদনা দিয়ে তার শোধ নিতে গ্লানি বোধ করি। দৈবাৎ কখনো যদি আত্মবিস্মৃত হই তবে লজ্জা পাই।"

২৭ কার্তিক ১৩৩৯ তারিখে লেখা চিঠিতে আছে—

"সজনীকান্ত তোমার জন্মদিনে যে কবিতা তোমাকে দিয়েচে সেটা পড়ে ভালো লাগল।"

অনেক পরের আর একখানি চিঠিতে দেখিতেছি—

"হঠাৎ খবর পেলুম আমাদেরি বংশের কোন লোক সজনীকান্তকে নিন্দা করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে। কিছুদিন আগে সজনীকান্ত ··· পত্রে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে আমার কাছ থেকে লেখা চাইবার জন্যে আশ্রমে এসেছিলেন। আমি দিতে পারি নি, তাঁকে উপেক্ষা করা তার কারণ নয়। এই অনুরোধ নিয়ে তাঁর ভাষায় ও ব্যবহারে আত্মসম্ভ্রম-জনক কিছুই প্রকাশ পায় নি। লেখার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ জানান নি বাংলা দেশে এমন সম্পাদক অল্পই আছেন, তার দ্বারা তাঁরা আমাকে সম্মান করেছেন কিন্তু আত্ম-সম্মানের হানি করেছেন এমন কথা বলা অসঙ্গত। যা হোক আমাকে জড়িত করে এই রকম অন্যায় কুৎসাবাদের সৃষ্টি করায় আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ ও দুঃখ বোধ করচি।"

হেমন্তবালার মধ্যস্থতায় গুরুশিষ্যের পুনর্মিলন-কাহিনী স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়; মাসীমা যে ক্ষুরধার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে নানা কৌতুকের সাক্ষাৎও মিলিবে। বলা বাহুল্য, এই সকল ঘটনার কোনটিই আমার জ্ঞাতসারে ঘটে নাই, কবিগুরু ও ভক্তকুল মধ্যে পত্রধারায় আমাকে লইয়া নেপথ্য-বিধান চলিতেছিল। আপাতত অদলবদলের কথায় ফিরিয়া আসা যাক।

স্থানান্তর-সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন বাল্যবন্ধু দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৫।২ মোহনবাগান রো-এর বাড়ির সন্ধানই শুধু দিলেন না, সে বাড়ি পাইবারও ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ও জ্ঞান-দা (আয়কর-উকিল জ্ঞান রায়) সম্প্রতি 'বঙ্গশ্রী'র আড্ডায় খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কীর্তি মিত্তির লেন সংলগ্ন মোহনবাগান রো-এ তাঁহাদের প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ বাড়তি লাভ। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৩ (২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪০) বন্ধুবর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সমভিব্যাহারে প্রথমে আমি একা নূতন-গৃহপ্রবেশ করিলাম, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ নিজস্ব তন্ত্রমতে বাড়িটা শোধন করিয়া বলিলেন, এই পত্তন শুভ হইবে। তাঁহার পুরশ্চরণ ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সেই দিনই সন্ধ্যায় (কারণ পরদিন শনিবার ১লা পৌষ, যাত্রা নাস্তি) পুত্রকন্যাসহ গৃহিণী আসিয়া নূতন গৃহে অধিষ্ঠিতা হইলেন, এবং পরিমল গোস্বামী নীচের একখানি ঘর দখল করিলেন; প্রবাসী প্রেসের মুদ্রাকর

মানিকচন্দ্র দাসও চাকরিগত ব্যবধান সত্ত্বেও সঙ্গ ছাড়িলেন না। বস্তুত কিছুকাল পরে রেঞ্জার্সের ঘোড়দৌড়-প্রতিযোগিতায় ছত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়া আমহার্স্ট রো-এ স্বগৃহ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গ ছাড়েন নাই। সন্তানহীন এই মানুষটি আজীবন আমার পুত্র শ্রীমান রঞ্জনকে পুত্রবৎ স্নেহে লালন-পালন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

সর্বাপেক্ষা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল 'শনিবারের চিঠি'র সহিত আমার সম্পর্কে। আমি নামেমাত্র পরিচালক, জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ সমস্তই পরিমলদা করেন। এইভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া তিনি বাল্যবন্ধু বনফুলের শরণাপন্ন হন। সাহেবগঞ্জের (ভাগলপুর) স্কুলের সতীর্থ ইঁহারা, পরিমল সঙ্কটে পড়িয়া বনফুলের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, পরিমল-লোভে শুধু অলি নয়, ফুলও যে ছুটিয়া আসে সজনীহীন 'শনিবারের চিঠি'তে সেই ইতিহাসই রচিত হইল। মাসের পর মাস একটি দুইটি করিয়া গোটা 'বনফুলের কবিতা' বইখানাই 'শনিবারের চিঠি'তে বাহির হইতে লাগিল। আমি 'বঙ্গশ্রী'র শ্রী-সম্পাদনে ৫৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট আয়তনেই প্রাতঃহইতে সন্ধ্যাতিক এবং প্রায়শই রাত্রিতেও নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে লাগিলাম। নূতনের প্রেমে পুরাতনের প্রতি এই নিদারুণ অবহেলা যে সাংঘাতিক হইতে পারে নাই, তিন বৎসর সাত মাসের (পৌষ ১৩৩৯—আষাঢ় ১৩৪৩) দুধ-মা পরিমল গোস্বামীর অশেষ স্নেহই তাহার কারণ।

পরকীয়া-প্রীতি সাহিত্যে যত সমাদরই লাভ করুক, গার্হস্থ্যজীবনে ইহার পরিণাম শোচনীয়। এই "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘরে"র ট্র্যাজেডি আমার বহু পরিচিত বন্ধুর জীবনে মর্মান্তিক হইতে দেখিয়াও নিজে সাবধান হইতে পারি নাই। বিশেষ করিয়া এই কালটা ছিল আমারও জীবন-ব্যাকরণের পরস্মৈপদী যুগ। আমার আপন আঙিনায় ধূলা জমিতেছে, না, শ্যাওলা পড়িতেছে—ঘরের চালে খড় উড়িতেছে, না, কাক চিল বসিতেছে সেদিকে আমার লক্ষ্যই ছিল না, পরের চণ্ডী-মণ্ডপে প্রাত্যহিক আসর জমাইতেই আমি ব্যস্ত ছিলাম।

সেখানে সর্বাপেক্ষা বড় আসর বসিবার কথা ছিল ১লা মাঘ ১৩৪০—'বঙ্গশ্রী' প্রকাশের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে। আমার ইষ্টদেবতা সেদিন প্রচণ্ড রূঢ় ভূমিকম্পের মূর্তিতে দেখা দিয়া এই নিদারুণ আত্মবিস্মৃতির মধ্যে আমাকে আত্মস্থ করিবার প্রথম চেতনা সঞ্চার করিলেন। ১৫ই জানুয়ারি ১৯৩৪ বেলা আন্দাজ তিনটার সময় বিহারের ভূমিকম্পের ধাক্কা আমার বিহ্বল ও অসতর্ক মনকে নাড়া দিয়া জাগাইয়া দিল। মধ্যাহ্ন-আহারান্তিক দিবানিদ্রার পর, সন্ধ্যার মজলিসে নব বৎসরের প্রথম সংখ্যাকে কেন্দ্র করিয়া আনন্দ-উৎসবের বিচিত্র পরিকল্পনা মাথায় লইয়া ট্রামে চড়িয়া বসিয়াছিলাম। শ্যামবাজার হইতে ধর্মতলা—. উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিতেছিলাম; হ্যারিসন রোড জংশনের কাছে অর্থাৎ প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল। আচমকা তন্দ্রা ছুটিয়া যাইতেই অনুভব হইল, আশেপাশের বাড়ি ঘরদুয়ার যানবাহন মানুষ সমস্তই দুলিতেছে। বাহিরের আকর্ষণে সম্মুখে আগাইয়া যাইব, না, ঘরের টানে পিছন ফিরিব—এই চিন্তা সর্বপ্রথম আমাকে অভিভূত করিল। আমার অব্যবস্থিতচিত্ততার মধ্যেই মাতা ধরিত্রী স্থির হইলেন। ক্ষণিক মানসিক দুর্বলতার জন্য মনে মনে হাসিয়া দক্ষিণগামী ট্রামেই বসিয়া রহিলাম, উত্তরে অবস্থিত হয়তো-বিপন্ন শিশুপুত্রকন্যা ও ঘরণীর দাবি অস্বীকার করিয়া দক্ষিণের দাক্ষিণ্যই বরণ করিতে চলিলাম।

আপিসে পৌঁছিয়াই শুনিলাম, সেই পুরাতন বাড়ির একাংশে ফাটল দেখা দিয়াছে। তখন সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাহিত্য-শিল্পরসিকেরা অনেকেই আসিয়া জুটিয়াছেন। হৈ-হৈয়ের মধ্যে আমার মনকম্প স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। আমরা দল বাঁধিয়া লালদীঘির চত্বরে ষ্টিফেন হাউস, আরমানী গির্জা ও গড়ের মাঠে অক্টরলনি মনুমেণ্টের ফাটল দেখিতে গেলাম। ধর্মতলায় ফিরিয়া চা-জলযোগের মজলিস বসাইলাম। কিন্তু আজিকার ধাক্কায় আমারও মনের মধ্যে কোথায় ফাট ধরিয়াছিল, ঠিক স্বস্তি পাইতেছিলাম না। সেদিনকার আড্ডায় 'শনিবারের চিঠি'র একেবারে আদিযুগের চারিজনের মধ্যে তিনজন—অশোক-হেমন্ত-সুধীরকুমার (একমাত্র যোগানন্দ বাদ) উপস্থিত থাকিয়া আমার উদ্‌ভ্রান্ত

দৃষ্টি অবহেলিত 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি মুহূর্মুহু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, আমি যাহাকে বলে মরমে মরিয়া গেলাম। অশোক চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং তখন তাঁহার একদা-নিজস্ব কাগজে আবার মধুকরকুমার কাঞ্জীলাল বেনামে নিয়মিত লিখিতেছেন। তাঁহার খোঁটাই সর্বাধিক বাজিল। যে নিশ্চিন্ত আরাম ও যশের মধ্যে 'বঙ্গশ্রী'র চাকরি খিতাইয়া আসিয়াছিল, সেখানে আলোড়ন উপস্থিত হইল। অশান্ত ও অস্থির চিত্তে রাত্রে বাড়ি ফিরিলাম। গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘর ও বাহির, উত্তর ও দক্ষিণ—দুই দিকের আকর্ষণ পরিমাপ করিতে করিতে লিখিলাম "দুই মেরু"—

... ...

আমার মনের এই দুই মেরু উত্তর দক্ষিণ,
দুই হিমমেরু নহে তুহিন-শীতল।
তুষার-আবৃত হিম উত্তর আমার,
ক্ষীণ রৌদ্রহীন আলোরেখা
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ঝলসিয়া—
মৃতের অধরে ম্লান পাণ্ডুহাসি যেন।
... ...
মনের দক্ষিণ মেরু, উত্তপ্ত ফুটছে
রক্ত-রাঙা লাভা-স্রোত আগ্নেয়-গিরির।
মরে, পচে, পাকে চুল, শাখাপত্র খসি খসি পড়ে—
ফুলের সুগন্ধে বায়ু ক্ষণেক মন্থর,
পূতিগন্ধ ক্ষণে ক্ষণে নাকে আসি লাগে।
ভাল মন্দ রমণীয়, বীভৎস বিকৃতি—
চলে কালস্রোত।
... ...
দক্ষিণ মেরুতে মোর পৃথিবীর সব নদী মেশে—
আবর্ত পঙ্কিল।
ভেসে আসে শব-দেহ, ভেসে আসে কাঠ-খড়-কুটা,
বিচিত্র ধরার আসে মৃত্যু ও জীবন-পরিচয়।
আলো-অন্ধকারের সন্দেশ।
পথের বন্ধুরা আসে, ঝড়ো হাওয়া, ভাঙা-ভাঙা পাখী,
ওড়ে চিল, ওড়ে মাছরাঙা,
কানাকানি হাসি ও চিৎকার—
... ...

উত্তর উত্তরে মোর, দক্ষিণে দক্ষিণ,
দোঁহে দোঁহাকার নাহি জানে পরিচয়—
দুই শুধু এক হ'ল আমার অন্তরে ;
পরিচয়হীন ক্রোধে—
নিষ্ফল আক্রোশে ছুঁয়ে এ উহারে হানে।
এই হানাহানি—
আমার অন্তর ব্যাপি নিরন্তর এ দ্বন্দ্ব-মন্থন,
বিষবাষ্প উঠে আবর্তিয়া,
কুৎসিতে সুন্দর করে, সুন্দরে ভীষণ।
... ...
দক্ষিণে সবার আমি, উত্তরে আমার স্বামি একা,
পথের বকুল-ছায়ে উত্তরেতে আমার সমাধি—
ফাল্গুনের উন্মন বাতাসে
শাখাচ্যুত ফুলদল পড়ে ঝরি শিয়রে আমার ;
অজ্ঞাত পথিক আসি ফেলে বেদনার অশ্রুজল—
আমার মৃত্যুর মৃত্যু সেখানে হয়েছে বহুদিন।

দক্ষিণেরে ভালবাসি, উত্তর আমারে করে প্রেম,
সমাধি-শয়ন রচি মোর লাগি সে জাগে প্রহর,
দক্ষিণে আঁকড়ি লোভে আমিও অনন্তকাল ধরি
রচি উত্তরের ব্যবধান।
... ...

সেই দিন—সেই ১৫ই জানুয়ারি রাত্রে 'বঙ্গশ্রী'র চাকরি সম্পর্কে আমার মনে মনে অনাস্থা-প্রস্তাব পাস হইয়া গেল। সেই প্রস্তাব কার্যকরী হইতে পুরা এক বছর সময় লাগিল। ১৯৩৫ সনের ১৫ই জানুয়ারি আমি পাকাপাকি রকমে দক্ষিণকে বর্জন করিলাম, অর্থাৎ চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। এই এক বৎসরের মধ্যে আমার জীবনে আরও অনেক গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিলাম। পরবর্তী বৈশাখে (১৩৪১) রবীন্দ্রনাথের স্নেহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া এক দিকে মন যেমন হাল্‌কা হইল, অন্য দিকে ঢাকায় গিয়া একটা বিপুল পরস্মৈপদী বোঝা মাথায় লইয়া কলিকাতায়

ফিরিলাম, নিজ কলিকাতাতেও আনুষঙ্গিক কম বোঝার সৃষ্টি করিলাম না। বহু নূতন ও পুরাতন অজ্ঞাতনামা সাহিত্যিককে আবিষ্কার করিবার গৌরব অর্জন করিলাম। 'অঙ্গুষ্ঠ' ও মনোদর্পণ'-লেখকের 'রাজহংস' ও 'আলো-আঁধারি'র প্রায় সব কবিতাগুলিই রচিত হইল। ব্রজেন্দ্রনাথ ও রামকমল সিংহের আগ্রহাতিশয্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত সম্পর্ক ঘটিল। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া শ্রীরামপুর মিশনরি কলেজে গবেষণার কাজ আরম্ভ করিলাম। আজ হিসাব খতাইয়া দেখিতেছি, সেইদিনকার বোঝা আজ প্রায় সকলই নামাইয়া ফেলিয়াছি, বোঝার ভারে মাথার মাঝামাঝি টেরিটা শুধু বিপর্যস্ত হইয়া ব্যাকব্রাশে পরিণত হইয়াছিল, সেই চিহ্নটুকু আজও মস্তকে ধারণ করিতেছি।

'বঙ্গশ্রী'র দুই বৎসরে নূতন লাভ অনেক হইয়াছে। শত্রুপক্ষের শৈলজা প্রেমেন্দ্র নৃপেন্দ্র মিত্র হইয়াছেন, অপরিচিত তারাশঙ্কর বনফুল নির্মল-কুমার (বসু) পরিমল চন্দ্রহাস (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়) সরোজকুমার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘনিষ্ঠ ও আপন হইয়াছেন, উত্তমর্ণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাব চুকাইয়া প্রেমের স্বর্ণসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছেন, সায়ান্স কলেজ মেসের স্নেহাস্পদ বন্ধু ললিতানন্দ গুপ্ত "অমলা দেবী"রূপে নূতনভাবে ধরা দিয়াছেন, কলেজের কাঁচা ছেলে শ্রীমান জগদীশ "কলেজ বয়"-রূপে আসিয়া লক্ষ্মণ-ভাইরূপে চিরসম্পর্কিত হইয়াছেন। মোটের উপর জমার খাতার অঙ্কই বেশি। চতুর্থ প্রবাহে এই সকল হিসাব-নিকাশ করিবার বাসনা রহিল।

॥ তৃতীয় প্রবাহ সমাপ্ত ॥

শ্রীসজনীকান্ত দাস

একটি সাঁওতালী কবিতা

রাহুল, রাহুল

রাহুল, রাহুল, কোনদিন তুই আর
যাবি নাক' ঐ কয়লাকুঠির ধার।

আহা কতদিন, আহা কত রাত পরে,
এলি তুই গাঁয়ে এলি তুই এই ঘরে।
ধুলোপায়ে ফের আঙনে দাঁড়ালি এসে—
আমাকেই ফের ডাক দিলি ভালবেসে।

রাহুল, রাহুল, কোনদিন তুই আর
যাবি নাক' ঐ কয়লাকুঠির ধার।

সেই ৩-বছর বুঝি পৌষের শেষে,
চ'লে গেলি তুই ভিন্‌গাঁয়ে ভিন্‌দেশে,
ফাল্গুনে এল নতুন পাতার কাল
চিকন পাতায় তাকাল সবুজ শাল,
পাহাড়ের বুকে গরম হাওয়ায় মেতে
ভালুকেরা এল নতুন মউল খেতে।
বৈশাখে ফের জাগল বাঁধের মাটি,
ডাকে নাক' কেউ, কার ঘরে জন খাটি?
সারাদিন শুধু কুড়োনো বনের ঝাঁটি,
আর সারারাত ব'সে ব'সে চেয়ে থাকা।

রাহুল, রাহুল, কোন্‌খানে ছিলি তুই?
আষাঢ়ে যখন ভিজল আবার ভুঁই।
কোন্‌খানে ছিলি? যখন মাটির বাসে,
তোরই কথা শুধু ঘুরে ঘুরে মনে আসে
গান করি আর হাতে হাতে ধান রুই।

রাহুল, রাহুল, কত আর বলি তোকে
কয়লাকুঠিতে যায় যদি কোন লোকে
আসে না কখনও ফিরে আসে নাক' আর—
কোনও দিন তুই কাঁচা পয়সার ঝোঁকে
হোস্ নেক' এই পলাশডাঙার পার॥

অসিতকুমার

এই গ্রহের ক্রন্দন

॥ দ্বিতীয় রাত্রি ॥

রত্না, উনিশ শো পঁয়ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের কথা মনে পড়ে? আমি সেবার দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এম.এ. পাস করলুম। বছরের শেষের দিকে চাকরি পেলুম তোদের কলেজে। পরীক্ষায় সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়ার জন্যেই সম্ভবত সরকারী কলেজে আমার চাকরি জুটল না। তুই কিন্তু সব সময়ে আমায় স্মরণ করিয়ে দিতিস যে, সরকারী কলেজে চাকরি না পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল, আমার কুৎসিত চেহারা। তোর ধারণা ছিল যে, কলেজে মেয়েরা কেবল বই ঘাঁটতে আসে না, চেহারা দেখতেও আসে। মাইনে দিয়ে যারা কলেজে পড়তে আসে তারা কেন নীত-উঁচু অধ্যাপিকার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে? প্রথম দিন থেকেই তুই আমার ক্লাসে তাই সবচেয়ে বেশি গোলমাল শুরু ক'রে দিলি। আমার রূপ নেই ব'লেই যে আমার লেকচার তোর ভাল লাগত না, তা নয়। তোর নিজের রূপ খুব বেশি ছিল ব'লেই আমাকে অপমান করতে তোর ভাল লাগত। ক্লাসে গিয়ে লেকচারটা আমি তোতাপাখির মত মুখস্থ ব'লে যেতাম, কিন্তু দৃষ্টি এবং মনোযোগ থাকত তোর ওপর। তুই কোনদিনও আমার লেকচার শুনিস নি। শোনা সম্ভব ছিল না। কারণ, তোর মন এবং মুখের মধ্যে তখন সাধনরতির তথমা পরা রয়েছে। আমার নিজের স্বাস্থ্য ভাল নয় ব'লে পেছনের বেঞ্চিতে ব'সে পঁয়তাল্লিশটা মিনিট তুই নিজের দেহটাকে নিয়ে খেলা করতিস। হাত দুটো উঁচু ক'রে কনুই দুটো ফেলে রাখতিস বেঞ্চির ওপরে। দূর থেকে স্বাস্থ্যের জয়পতাকা তোর আমি দেখতুম। গলার স্বর আমার কর্কশ হয়ে উঠত। দম-ফুরিয়ে-যাওয়া গ্রামোফোনের মত আমার লেকচারের শেষ বাক্যটি কখন যে শেষ হয়ে যেত, আমি তা টের পেতুম না। স্টাফ-রুমে তাড়াতাড়ি এসে ব'সে পড়তুম। বড্ড অসহায় বোধ করতুম। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারালে আমার আর থাকবে কি?

জীবিকার প্রয়োজনে আমায় পড়াতে হয় ব'লে কেবল লেকচার দেওয়াই আমার কাজ নয়। প্যাস্টিল খেয়ে খেয়ে গলার কর্কশ আওয়াজটাকে মসৃণ করতে হ'ত ব'লে তুই আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে গুন গুন ক'রে গান করতিস। আমি স্টাফ-রুমে ব'সে প্রায়ই শুনতে পেতুম যে, তুই গান করতে করতে করিডোর দিয়ে যাওয়া-আসা করছিস। তোর নিষ্ঠুরতা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। তোকে দেখলেই আমার গলা আরও বেশি কর্কশ হয়ে উঠত, বুকের স্বাস্থ্য যেন ভেঙেচুরে সমতল হয়ে যেত। স্টাফ-রুমে ব'সে কাঁদতে ইচ্ছা করত। তোকে আমি জানাতে চাইতুম যে, আমি কেবল অধ্যাপিকা নই, আমি যুবতী। আমার বয়স মাত্র তেইশ। তোর তখন কত? কুড়ি।

কুড়ি বছর বয়সেই দুবার পরীক্ষায় তুই ফেল করেছিস। খবরটা আমি সংগ্রহ করেছিলুম প্রিন্সিপাল সুজাতাদির কাছ থেকে। তোকে আক্রমণ করবার অস্ত্র খুঁজছিলাম আমি। কিন্তু সুজাতাদির কথা শুনে মনে হ'ল, তুই ফেল করেছিস ব'লে কলেজের খুব উপকার হয়েছে। পাস ক'রে বেরিয়ে গেলে কলেজের ক্ষতি হ'ত। তাঁর কাছেই আমি প্রথম শুনলুম যে, বাংলা খবরের কাগজে তোর ছবি এবং নাম বেরোয়। নাচ এবং গানে তোর নাকি দেশজোড়া নাম। কলকাতায় বড়লোক বাঙালী আর মারওয়াড়ীরা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে তোর নাচ দেখতে যায় নিউ এম্পায়ারে। তোর আকর্ষণে কলেজে প্রতি বছরই কিছু কিছু ছাত্রীসংখ্যা বাড়ে। শিক্ষার চেয়ে তাই ছাত্রীসংখ্যার দিকে সুজাতাদিকে বেশি ক'রে নজর রাখতে হয়। নজর রাখতে হয় নৃত্যশিল্পী রত্নার দিকে। নজর রাখবার জন্যেই তিনি নিউ এম্পায়ারে যান তোর নাচ দেখতে। আজ পর্যন্ত একটা সুযোগও তিনি নষ্ট করেন নি। কেন করবেন? সামনের সারিতে বসবার জন্যে তুই তাঁকে প্রতিবারই দুখানা ক'রে পাস এনে দিতিস। দ্বিতীয় পাসখানা কার জন্যে তিনি নিতেন, তা অবিশ্যি সুজাতাদি বলতেন না। তিনি বলতেন যে, শিবের—

ধ্যান ভাঙাবার কি একটা বিশেষ নাচ নাকি তোর সবচেয়ে ভাল। সেই নাচটা দেখতে দেখতে তিনিও নাকি চেয়ারে ব'সে পা দোলাতেন। অপূর্ব, অপূর্ব তোর নৃত্যশিল্প! ভোলা মহেশ্বরের ধ্যান ভেঙেছে। ভাঙিয়েছে রত্না। মারওয়াড়ীবাবুরা ত্রিশ টাকার আসনে ব'সে হাততালি দিচ্ছেন। ত্রিশ টাকার টিকিট কেনা সার্থক হয়েছে। বিনা টিকিটে এসে সুজাতাদিও মারওয়াড়ীবাবুদের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিলেন। ড্রপ্ পড়ল। প্রেক্ষাগারের চারদিকে আলো জ্ব'লে উঠল। মারওয়াড়ীবাবুরা সব উঠে পড়েছেন। কোটি টাকা আয় থেকে ত্রিশ টাকার টিকিট কেনা খুব একটা শক্ত কাজ নয়। সুজাতাদি দেখলেন, চেয়ারগুলো সব খালি প'ড়ে রইল। প্রাইভেট কলেজের আর্থিক সংকটের কথা ভেবে তাঁর নিজের মনটাও কেমন শূন্য বোধ হতে লাগল। নতমস্তকে ধীরে ধীরে তিনি প্রেক্ষাগার থেকে বেরিয়ে এলেন সবার শেষে। সঙ্গে তাঁর কে ছিল তা তিনি বললেন না।

রত্না, উনিশ শো পঁয়ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের ক'টা মাস আমার জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে লেপ্টে রয়েছে যে, হাজার চেষ্টা ক'রেও সেই সময়টুকুকে জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারলুম না। ফেলে দিতে পারলে তোর ওপর আমি প্রতিশোধ নিতে পারতুম। প্রতিশোধ নেবার আমি চেষ্টা করেছি। তোর দৈহিক সৌন্দর্যের খোলসটাকে গলা মোমের মত গলিয়ে দিতে চেয়েছি আমার মনের প্রতিশোধ-উত্তাপ দিয়ে। কিন্তু পারি নি···

সেদিনটা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তুই রাস্তার দিকে চেয়ে ছিলি। অন্য কেউ সেখানে ছিল না। স্টাফ-রুমে ব'সে আমি তখন বাঁশীর সুর শুনতে পাচ্ছিলুম। দুপুরবেলা কে যেন বড্ড করুণ সুরে বাঁশী বাজাচ্ছিল। সুরটা আমায় ঘর থেকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। করিডোরের কোণা থেকে দেখলুম, তন্ময় হয়ে তুই চেয়ে আছিস রাস্তার দিকে। ফুটপাথের ওপাশে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল তোর দিকে চেয়ে।

তাড়াতাড়ি ক'রে চ'লে গেলুম সুজাতাদির ঘরে। তাঁকে ডেকে

নিয়ে এসে বললুম, ওই দেখুন, ছেলেটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে। এটা প্রেক্ষাগার নয়, কলেজ। কেবল রত্নার জন্যে শিক্ষা-মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে না। তা ছাড়া, নীতির প্রশ্নও আছে। সুজাতাদি তোকে বললেন, আজ থেকে কেউ আর বারান্দায় দাঁড়াতে পারবে না, আমি নোটিশ টাঙিয়ে দিচ্ছি। তুই কোন জবাব দিলি না। সুজাতাদি বোধ হয় নোটিশ লেখবার জন্যে চ'লে গেলেন তাঁর কামরার দিকে, আমিও যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিলুম। তোকে আমি আঘাত করতে পারলুম ব'লে খুবই আরাম পাচ্ছিলুম মনে মনে। ভাবলুম, কলেজ থেকে যেদিন তোকে তাড়িয়ে দিতে পারব সেদিন আমার মনের জ্বালা মিটবে।

রাস্তার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তুই আমার সঙ্গে প্রথম কথা বললি, আপনি আমায় অপমান করলেন?

মনটা যেন আমার আনন্দের উত্তাপে ঘেমে উঠল। বললুম, জনৈকা ছাত্রীর অপমানের কথা শুনতে গেলে কলেজ চলে না। তা ছাড়া, এখানে সবাই পড়তে আসে, রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে আসে না।

আমি রাস্তার দিকে চেয়েছিলুম কি ক'রে বুঝলেন?

কি ক'রে বুঝলুম? যুবকটি শিস দিচ্ছিল না?

শুনি নি।

তবে এখানে কি করছিলে মাই ডিয়ার রত্না?

বাঁশী শুনছিলুম।

বাঁশী? প্লীজ, ক্লাসে যাও।

কমনরুমের বেয়ারা কেষ্ট এসে উপস্থিত হ'ল সেই সময়। সে বললে, প্রিন্সিপাল আপনাকে একবার ডাকছেন।

যাচ্ছি। আমি লক্ষ্য করলুম, কেষ্ট তবু দাঁড়িয়ে রইল। কেন দাঁড়িয়ে রইল তা আমি বুঝতে পেরেই কেষ্টকে একটু কর্কশ গলায় আদেশ দিলুম, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাজ করতে যাও।

লজ্জা পেয়ে কেষ্ট দ্রুতপায়ে করিডোরের মধ্যে মিশে গেল।

তোকে আমি নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, দুনিয়ার পুরুষমানুষরা সব তোমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে থাকে কেন?

খুব সম্ভব আমি দেখতে খুব ভলাপ চুয়াস, তাই।

রিয়েলি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মিস বোস। ফুলভারারনত গাছই মানুষ দেখতে চায়? প্যাকাটির প্রতি ওরা নজর দিতে চায় না। চোখের ধর্মই হচ্ছে সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ানো, কানের ধর্ম যেমন সুরের পেছনে ছোটা।

প্রতিশোধ নেবার আরামটুকু তখন আমার উবে গেছে। তোর সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম বটে, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম রাস্তার সেই সুন্দর ছেলেটির দিকে। আমি নিজেকে দেখাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম। গলার ঘাম মুছবার অজুহাতে শাড়ির আঁচলটাকে একটু টেনে নামিয়ে দিয়েছিলাম কণ্ঠাস্থির তিন ইঞ্চি তলায়। তুই সে সব লক্ষ্য করেছিলি কি না জানি না। ছেলেটি করল না আমি দেখলুম। সে চেয়ে রইল তোর মেরুদণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আমি বুঝতে পারলুম, তোর কাছে আমি হেরে যাচ্ছি। বুঝতে আমার কষ্ট হ'ল না যে, পুরুষমানুষের চোখে আমার নারীত্ব এখনও ধরা পড়ে নি। আমি জয়া বসু নই। আমি কেবল একজন অধ্যাপিকা।

বারান্দা থেকে চ'লে যাওয়ার আগে তুই আমাকে একটা উপদেশ দিয়েছিলি—মা গো, কথাটা আমি আজো ভুলি নি। কথাটা মনে পড়লে কেমন অসহায় বোধ করি। এই বয়সেও একটা জবাব দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নিশীথের পায়ে লুটিয়ে পড়তে পারলুম না ব'লে সারাটা জীবন আমি অস্তিত্ববাদের মরুভূমিতে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে সময় নষ্ট করলুম, জবাব আমার তৈরি হ'ল না।

রম্ভা, সেদিনের কথাটা তোকে পনেরো বছর পরে আজ আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কল্পনার উর্বশীর চেয়েও তোকে সুন্দরী ব'লে মনে হত। অনেকের মতে তুই ছিলি শিল্পী-ভগবানের সবচেয়ে বড় শিল্প। সৃষ্টিকর্তার পক্ষপাতিত্বের জন্যে আমি নিজে কখনও শিল্পী এবং ভগবান প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামাই নি। মাথা না থাকলে তাকে

ঘর্মাক্ত ক'রে তোলবার জন্যেই মানুষ বোধ হয় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে যাক। তোর অমন মুখখানা আগুনে পুড়ে গিয়েছিল ব'লে তুই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি। আমি তোকে সেদিন রক্ষা করেছিলুম। কেন করেছিলুম জানিস? কেবল প্রমাণ করবার জন্যে যে, তোদের সৃষ্টি-কর্তার হাতের চেয়ে জয়া বসুর হাত কোন অংশেও দুর্বলতর নয়। প্রমাণ করতে চেয়েছিলুম বটে; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, তিনিই বোধ হয় আমার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, বস্তুজগতের বৃহত্তম আগুনও তাঁর অত বড় শিল্পকে পুড়িয়ে দিতে পারল না। আজ তো তোর ভুরু নেই। বাঁশীর মত নাকটা আধ-পোড়া হয়ে আছে। দুধে-আলতায় মেশানো রঙের বাহার নেই, গালের চামড়া কুঁচকে রয়েছে একতাল ভেজা নেকড়ার মত। আর ঠোঁট? ভবতোষ বলত, নিউ এম্পায়ারের পার্বতীর ঠোঁটে আজ মাছি বসতে পর্যন্ত ঘেন্না বোধ করে। শীত পড়লেই পোড়া চামড়া ফেটে যায়। তামাটে রঙের সেলোফেন কাগজের মত পাতলা দুটো চামড়া ফাঁক হয়ে রয়েছে। ঠোঁট ব'লে আর বোঝাই যায় না। চামড়ার গায়ে এক চিমটে মাংস নেই। আঁচল দিয়ে মুখটা ঢেকে না রাখলে দু পাটি দাঁতের একটি দাঁতও লুকিয়ে রাখতে পারিস না। বিগত দিনের মত প্রলুব্ধ ঠোঁটে চুম্বনের প্রতীক্ষা থাকলেও নপুংসক মাছি পর্যন্ত আজ আর আসে না খাদ্যের বুভুক্ষা নিয়ে। ঠোঁটে আজ তোর বিরাট মন্বন্তর। কলকাতার পিচের রাস্তায় জন্তুর সংখ্যা গত পনেরো বছরে পনেরো গুণ বাড়ল, কিন্তু তোকে দেখলে আজ ওরা উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। আমিই কেবল তোর দিকে আজও চেয়ে রইলুম রস্তা। ও মা, আমি যে এরই মধ্যে আগুনের কাহিনী শুরু ক'রে দিয়েছি! না, সে কাহিনীতে আমি পরে ফিরে যাব। এখন আবার আমি ফিরে যাচ্ছি উনিশ শো পঁয়ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে, কলেজের বারান্দায়।

দেহের ওপরের অংশটাকে নাচের ছন্দে খানিকটা নাড়াচাড়া দিয়ে তুই বললি—দেখুন মিস বোস, জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে হাজার হাজার নুড়ি না কুড়িয়ে, একজন নরের সন্ধান করুন।

তোর কথা শুনে কয়েক মিনিট পর্যন্ত আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে

রইলুম। রাগের উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এত বেশি সাহস তোর এল কোত্থেকে? একটু পরেই তোকে আমি বললুম, জান, তোমায় আমি কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি?

সেই চেষ্টাই তো করছেন। আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে আপনার খুব সুবিধে হয়।

আমার কি সুবিধে হয়?

যে শিসটা আমার প্রাপ্য ছিল, সেটা আপনি কেড়ে নিতে পারেন। একচেটিয়া বাণিজ্য করবার সনদ না পেলে আপনি কোনদিনও বাণিজ্য করতে পারবেন না।

রত্না—। গলার স্বর আমার কাঁপতে লাগল।

মিস বোস, আমি কচি খুকী নই। দুবার ফেল করেছি। বয়স আমার কুড়ি। দোসরা ডিসেম্বর একুশে পড়ব। বছর খানেক আগে আমাদের দুজনের বিয়ে হ'লে আমি মা হতুম আপনার আগেই। মা কি ক'রে হয় তাও আমি জানি। আর এও আমি জানি যে, ওই ছেলেটার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে আপনি নিজে করিডোর থেকে উঁকি দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছেলেটা এসেছে আমাকে দেখতে, আপনাকে নয়।

ছি ছি, রত্না! না না, এ কিছুতেই হতে পারে না। আমাকে দেখে ছেলেটা শিস দেওয়ার সাহস পাবে না। রত্না—

ছেলেটা শিস দেয় নি। আপনি ভাবছেন, শিস দিলে ভাল হ'ত। জয়াদি, ছেলেটা কে জানেন?

না তো।

মিসেস সুজাতা রায়ের ছেলে, মনোজ। নিউ এম্পায়ারে আমার নাচ দেখতে যাবে ব'লে পাস চাইতে এসেছে। মিসেস রায় দূর থেকে তাঁর ছেলেকে চিনতে পারেন নি।

সেদিন বাড়ি ফিরে পরের দিনের লেকচার তৈরি করবার জন্যে বই খুলে বসতে পারলুম না। চোখ ভেঙে জল আসতে লাগল। তোর কাছে হেরে যাওয়ার লজ্জা আমায় বিঁধতে লাগল প্রতি মুহূর্তে। আঘাত

করতে গিয়ে প্রতিঘাত পেলুম। লজিক আর দর্শনশাস্ত্রের বইগুলো সত্যি সত্যি রসকসহীন নুড়ির মত মনে হতে লাগল। ভবতোষ ছাড়া এ লজ্জা থেকে কেউ আমায় মুক্তি দিতে পারবে না। তুই জানতিস না যে, ভবতোষ ব'লে একটি ছেলে আমায় ভালবাসে। বিলেত যাওয়ার আগে সে আমায় বুঝিয়ে গেছে যে, আমাদের ভালবাসা কেবল কবিতার কতকগুলো পংক্তি নয়—আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মতই সুপ্রতিষ্ঠিত। আমার দাঁত উঁচু হওয়া সত্ত্বেও ভবতোষ রওনা হবার আগে আমায় আদর করতে চেয়েছিল। কিন্তু মামা হঠাৎ এসে ঢুকে পড়লেন ঘরে। ভবতোষ হাত দুটো তার প্যাণ্টের দু পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বণিক-অফিসের বড় সাহেবদের মত চিন্তান্বিত ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। ভবতোষ রওনা হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মামা ঘর থেকে বেরুলেন না।

সে কথা যাক। এখন আমি কি করব? কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তুই যে আমায় আঘাত করলি, তা থেকে মুক্তি পাই কি ক'রে? ভবতোষ তো বিলেতে। তার গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমাদের ভালবাসার উত্তাপ তোকে দেখাই কি ক'রে? মিডিয়াম কিংবা মডেলের সাহায্যে তোর অহঙ্কার আমি ভাঙতে পারব না। শেষ পর্যন্ত যেন এক রকম নিরুপায় হয়েই ভবতোষকে চিঠি লিখতে বসলুম। বড় চিঠি নয়। বড় চিঠি লেখবার উদ্দেশ্য ছিল না আমার। এমন কি, বিলেতে পাঠাবার জন্যে ডাক-বাক্সে গিয়ে চিঠিখানা ফেলবারও উৎসাহ ছিল না। সেদিন চিঠিখানা ভবতোষকে লিখেছিলুম কেবল তোকে দেখাবার জন্যে। সবটা চিঠিও তোকে দেখাতে চাই নি। একেবারে শেষের লাইনটা তোকে পড়িয়ে আমার পরাজয়ের গ্লানি দূর করব ভেবেছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয় নি। সমস্তটা রাত জেগে বোধ হয় একটা লাইনই লিখেছিলুম, শেষ লাইনটা। লিখেছিলুম—ভবতোষ, তুমি আমার ভালবাসা ও চুমু নিও। ইতি তোমার জয়া।

এই পর্যন্ত লেখবার পরে মিস জয়া বসু মোরগ ডাকার শব্দ পেলেন। বোধ হয় গত রাত্রের মোরগটাই আজও নূতন প্রহরের ঘোষণা করছে।

প্রহর ঘোষণা করা মোরগের স্বভাবধর্ম। গত রাত্রের মোরগটা যদি কাশিয়ংএর বাজারে বিক্রি হয়ে গিয়েও থাকে, তাতেও প্রহর-ঘোষণায় বাধা জন্মায় নি। একজন গেল ব'লে অন্যজন তার কর্তব্য থেকে বিরত থাকবে কেন? মিস জয়া বসু কলমটা রেখে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন। গেলাস ধরতে হবে। সামনেই ছোট টী-পয়ের ওপর গেলাস রয়েছে। তার পাশেই রয়েছে ব্র্যাণ্ডির বোতল। কলকাতার দুজন বিলিতী ডিগ্রীওয়ালা ডাক্তারের নির্দেশমতই তিনি ব্র্যাণ্ডি খান। অনেক দিন ধ'রেই তাঁরা চিকিৎসা করেছিলেন। অসুখ কিছুই ধরা যায় নি। মিস বসু তবু দুর্বল বোধ করতেন। খেতে ইচ্ছে করত না, খেলেও হজম করতে পারতেন না। একেই রোগা, তার ওপরে হজম না হ'লে শরীরে আর থাকবে কি? ডাক্তার সেন শেষ পর্যন্ত মিস বসুর শরীরে কিছু রাখবার জন্যেই অল্পমাত্রায় ব্র্যাণ্ডির ব্যবস্থা করলেন। জয়া বসু রাত্রিবেলা ঘুমোন না। এক চামচে ব্র্যাণ্ডি নিয়মিতভাবে বেশি দিন খাওয়াও যায় না, অতএব মাত্রা বাড়ল। শরীরে যখন কিছুই নেই, তখন লিভারটাকে সুস্থ রেখে লাভ কি? কলকাতায় লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে তিনি ডাক্তার সেনকে একদিন বলেছিলেন, আগের চেয়ে আমি ভালই আছি। আপনাদের আবিষ্কৃত সংখ্যাতীত ভাইটামিন যা পারল না, ব্র্যাণ্ডি তা পেরেছে। লিভারটা বোধ হয় শুকিয়ে আমসির মত হয়ে গেছে—তা হোক, আমি সুস্থ বোধ করছি।

ডাক্তার সেন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, বিয়ে করলে আপনার অসুখবিসুখ সব সেরে যেত। অত টাকা ভিজিট দিয়ে আমাকে আর বার বার ক'রে ডাকতে হ'ত না।

আপনার ছেলেটি তো শুনেছি দিল্লীর স্বাস্থ্য-মন্ত্রী অমৃত কাউরের দপ্তরে ভাল চাকরি পেয়েছে। সেখানে সে কত টাকা মাইনে পায় ডাক্তার সেন?

হাজার টাকা।

আর কিছু উপরি পায় না?

বোধ হয় না।

পেলেও তা হিসেবের মধ্যে আসবে না। স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর লিভারও বোধ হয় আমার চেয়ে শক্তিশালী নয়। ডাক্তার সেন, ছেলে তো আপনার বিয়ে করে নি?

না।

কত বয়স হ'ল?

প্রায় ত্রিশ।

আমার চেয়ে বছর দশেকের ছোট। তা হোক ছোট···আপনি আমার শ্বশুর হবেন ডাক্তার সেন?

শশাঙ্ক সেন তাড়াতাড়ি ক'রে হাতঘড়িতে সময় দেখলেন। একটু ব্যস্ত হয়েই বললেন তিনি, এক আউন্স ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে একটা মুরগীর ডিম মিশিয়ে নেবেন। আপনার চাকরটাকে—

বাধা দিয়ে মিস বসু বললেন, নিশীথ আমার চাকর নয়, ঠাকুর। কলকাতার সমাজে ওর খুব নাম।

ডাক্তার সেন স্টেথেস্‌কোপটা গলা থেকে নামিয়ে ভাঁজ ক'রে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। মিস বসুর বুকে কিছু নেই। এখন মুখটাকে বন্ধ করতে পারলে তিনি বেঁচে যান। আপাতত মুখ বন্ধ করবার ওষুধের নাম তাঁর মনে পড়ল না। তিনি তাই হাত বাড়িয়ে বললেন, এবার আমি যাই। ভিজিটটা—

দেব, দেব। এত তাড়া কেন?

অন্য একজন পেশেণ্টের কাছে যেতে হবে। ডিউটি, মানে কর্তব্য কাজে অবহেলা করি কি ক'রে? আমরা ডাক্তার, আমাদের কর্তব্যই হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টার ধ্যান-ধারণা মিস বোস।

আপনার পশার খুব বেড়েছে জানি। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ ক'রে এত ভিজিট কুড়িয়ে কি লাভ হবে ডাক্তার সেন? এমন সুন্দর লাল টুকটুকে বুর্জোয়া আঙুলগুলো দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই যদি স্টেথেস্‌কোপটা নাড়াচাড়া করেন, তা হ'লে সংসারের অন্যান্য আরও দু-চারটে কর্তব্য-কাজ নাড়াচাড়া করবার সময় পাবেন কখন? মানুষের কি আর কোন কর্তব্য নেই?

আছে বই কি।—ডাক্তার সেন হাসবার চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত গম্ভীরভাবেই বললেন, মানুষের আসল কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রতি।

ভগবান? আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন নাকি? ডাক্তার সেন, এখন আর আপনাকে রোগী দেখতে যেতে হবে না। আমি আপনাকে ডবল ভিজিট দেব। আমার এই বিছানার পাশে ব'সে আপনি একটা ভগবানের গল্প বলুন। গল্প শুনতে শুনতে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তা হ'লে আমার আর ওষুধের দরকার হবে না। তোশকের তলা থেকে সবগুলো টাকা—বোধ হয় শ তিনেক হবে, আপনি নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন ডাক্তার সেন। ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে ডিম মিশিয়ে খেলে কি হবে? ঘুম আসবে না। আপনি আমাকে ঘুম পাড়ান। বলুন, এক যে ছিল ভগবান—

ডাক্তার শশাঙ্ক সেন সত্যি সত্যি মিস জয়া বসুর বিছানার পাশেই ব'সে পড়লেন। ডাক্তার সেনের কোট-প্যাণ্টের পকেট থেকে বিলিতী সেণ্টের গন্ধ আসছিল। জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, সেণ্ট-মাখানো রুমালটা কোন্ পকেটে রেখেছেন ডাক্তার সেন?

ডান দিকের পকেটে।

তাই আপনার স্টেথেস্‌কোপটা থেকেও তখন গন্ধ আসছিল। আপনি সেণ্টের শিশি পকেটে নিয়ে ঘোরেন কেন ডাক্তার সেন?

শশাঙ্ক সেনকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে মিস জয়া বসু তাঁর ডান পকেট থেকে সেণ্টের একটা শিশি বার করলেন। রুমালটায় তিনি হাত দিলেন না। শিশিটার মুখ থেকে ছোট একটা রবারের ছিপি খুলে ফেলে জয়া বসু সবটুকু সেণ্ট ঢেলে ফেললেন তাঁর নিজের গায়ে। সারা ঘরময় একটা আমোদের আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ল। ডাক্তার শশাঙ্ক সেন তাঁর ছাই রঙের গ্যাবার্ডিন কাপড় দিয়ে মোড়া ডান পাটা গুণ-চিহ্নের মত ফেলে রাখলেন বাঁ-পায়ের ওপর। বয়স তাঁর পঞ্চাশ বটে, কিন্তু 'প্রোটিন' আর 'হরমোনে'র বৈজ্ঞানিক সমন্বয়ের ফলে আজও তিনি সুস্থ আছেন। ডান পাটা তাই মৃদু মৃদু

দোলাতে দোলাতে তিনি ভগবানের গল্প না ব'লে বলতে লাগলেন তাঁর স্ত্রীর সমাচার। দু-এক মিনিট শোনবার পরে জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, কত দিন হ'ল মিসেস সেন মারা গেছেন?

এপ্রিল মাসের একত্রিশ তারিখে এক বছর হবে। হিসেবটায় যেন একটু গলদ র'য়ে গেল সন্দেহ ক'রে ডাক্তার সেন বিছানা থেকে উঠে নাক দিয়ে সশব্দে হাওয়া টানতে লাগলেন।

জয়া বসু বললেন, বোধ হয় ত্রিশে এপ্রিল হবে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এপ্রিল মাসের শেষ তারিখেই তিনি মারা গেছেন। ভোরবেলা সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে—

থাক্ ডাক্তার সেন। এক বছরের মধ্যেই যে মিসেস সেনের নামটা আপনি ভুলে যান নি, তাই যথেষ্ট।···কিন্তু মনে ক'রে রেখেই বা লাভ কি? তিনি তো আর কিছুই দেখতে আসবেন না। ধরুন, আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নতুন ক'রে সৃষ্টি করেন···মানে ধরুন, আপনি যদি রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরতে না পারেন, তা হ'লে কার কি ক্ষতি হচ্ছে?

ক্ষতি? না, ক্ষতি কারও হচ্ছে না। মোক্ষদার বরং সুবিধেই হবে। কালকে আর মোক্ষদাকে নতুন ক'রে বিছানা পাততে হবে না।

মোক্ষদা কে ডাক্তার সেন?

বাড়ি-ঘর দেখাশোনা করে।

আর কি করে মোক্ষদা?

আমার একতলায় একটা নার্সিং-হোম আছে। সেখানে সে দুপুরবেলা চার ঘণ্টা ডিউটি দেয়। আচ্ছা, এবার আমি চললুম। ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে ডিম মিশিয়ে খেতে যেন ভুলবেন না মিস বোস।

খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন মিস জয়া বসু।

ডাক্তার সেন চ'লে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন দেখে জয়া বসু বললেন, পালাচ্ছেন কেন? মিসেস সেন তো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না?

পাচ্ছেন না; তাই বা বলি কি ক'রে? মিসেস সেন যতদিন বেঁচে

ছিলেন, ততদিন তাঁর মত অত উঁচুদরের সতীলক্ষ্মী মহিলা আমাদের নতুন আলিপুর রোডের কোন বাড়িতেই দেখি নি। আজ তিনি বেঁচে নেই ব'লে কিছুই দেখতে পাবেন না তেমন যুক্তি বৈজ্ঞানিক হ'লেও সত্যি নয়।—ডাক্তার সেন পুনরায় এসে দাঁড়ালেন জয়া বসুর বিছানার পাশে। মিস বসু হাতটা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এবার সেই ভগবানের গল্পটা বলুন। মিসেস সেন কি ভগবান মানতেন?

ভগবান না মানলে সতীলক্ষ্মী হওয়া যায় না মিস বসু।—ডাক্তার সেন আবার এসে ব'সে পড়লেন বিছানাব ওপর। সেন্টের খালি শিশিটা ডান দিকের নাসারন্ধ্রের কাছে এনে তিনি বার দুই নিশ্বাস টেনে বললেন, মিসেস সেন লক্ষ্মীর ফোটো পূজো করতেন। চিলেকোঠাটা পূজোর জন্যেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। ফোটোর পেছনে একটা আঠারো ইঞ্চি মাপের বাক্স ছিল। গিন্নী সেটা এক নম্বর ইস্পাত দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। ডালার ওপরে ছ ইঞ্চি লম্বা একটা গর্ত আছে। তিনি প্রতিদিনই পূজো-আহ্নিকের পরে দু-একখানা কাগজের টাকা কিংবা টাকার কাগজ সেই বাক্সের মধ্যে ফেলে দিতেন। বছরে একবার ক'রে তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারটি পরিষ্কার করতেন। ইন ফ্যাক্ট, পরিষ্কার করতেন গুড ফ্রাইডেতে।

গুড ফ্রাইডেতে কেন?

ওই দিনটিতে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। ভগবান না মানলে কি বছরের ওই ভাল শুক্রবারটিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তিন-চার হাজার টাকা কিছুতেই জমত না। ধন না থাকলে ধর্ম হয় না, বিয়ে না করলে হয় না ভালবাসা, মিস বোস।

সেই জন্যেই আমার জীবনের প্রতিটি শুক্রবার এমন অসুর্বর হয়ে রইল। আমার ঘরেও একটা আঠারো ইঞ্চি মাপের সুটকেস প'ড়ে আছে গত পাঁচ বছর থেকে, ওতে আমি হাত দিই নি। কারণ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আমার কাম্য নয়। আপনার বিয়ের প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করতে হ'লে কাম-দেবতার খোঁজ করতে হয়। আমার তো

চিলোকোঠা নেই।...ডাক্তার সেন, আপনাকে যদি শ্বশুর ব'লে ভাবি তা হ'লে আপনার আপত্তি কি? বয়স না হয় আমার আটাশ ব'লেই প্রমাণ করব। ছেলেকে ডেকে নিয়ে আসুন। স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর দপ্তরে হাজার টাকা ছাড়া আর কিছু তো নেই। আমার এখানে টাকা আছে, আমি আছি। ছেলে যদি আসে, তা হ'লে একটা সুস্থ সংসারও থাকবে। আজ আপনি আমায় সত্যিকারের ওষুধ দিয়েছেন—বিয়ের ওষুধ। স্বভাবের বিরুদ্ধে যাওয়া মানেই ভগবানের বিরুদ্ধে যাওয়া। ডাক্তার সেন, বত্রিশটা টাকা ভিজিট দিয়ে আপনাকে আর অপমান করতে চাই নে। আমাকে আপনি নিন, মানে ছেলের বউ ক'রে ঘরে তুলে নিন। ও কি, কিছুই না নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন যে?

আজ আর ভিজিট নেব না। স্টেথেস্‌কোপটা আপনার গায়ে লাগাই নি, ভিজিট নেব কেন?

স্টেথেস্‌কোপ?—একটু হেসে মিস জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় লাগাবেন? চ'লে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

প্রস্তাবটা আপনার পছন্দ হ'ল না, না?

না।

দেখুন, প্রস্তাবটা কিন্তু আমার দর্শন-পড়া মাথা থেকে আসে নি, এসেছে এক যুবতী নারীর স্বভাবের সত্য থেকে। ডাক্তার সেন, চ'লে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছেন, ভিজিটটা নিয়ে যান।—মিস জয়া বসু বিছানার তলা থেকে বত্রিশটা টাকা বার ক'রে শশাঙ্ক সেনের হাতে দিয়ে বললেন, গত এক বছর থেকে আপনার নির্দেশিত কোন ওষুধই আমি খাই নি।

বলেন কি! ওষুধগুলো তবে গেল কোথায়?

বেড-প্যানে গেল।—জবাব দিলেন মিস বসু।

বিলিতী কায়দায় ঘাড়ের মাংস দুলিয়ে নিয়ে ডাক্তার সেন বললেন, নিজের সর্বনাশ নিজেই করেছেন। আজ আপনাকে আমি একটা খুবই বড় রকমের দুঃসংবাদ দিতে বাধ্য হচ্ছি।

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন জয়া বসু। শুয়ে প'ড়ে বলতে লাগলেন, আমার সম্বন্ধে সব সংবাদই দুঃসংবাদ, ডাক্তার সেন। এবার বলুন, আমার কোনও ভয় নেই।

আপনার এক্স-রে প্লেটে প্যাচ পাওয়া গেছে।

তাতে আমার ভয় কি, ডাক্তার সেন? আমি এবার থেকে নিশীথের ওষুধ খাব।

হাবা লোকের মত গলার স্বরে জড়তা মিশিয়ে শশাঙ্ক সেন জিজ্ঞাসা করলেন, নিশীথ? মানে আপনার চাকর নিশীথ?

আমার ঠাকুর নিশীথ।—জয়া বসু একটু ঝুঁকে ব'সে বলতে লাগলেন, নিশীথ যে কতবড় ডাক্তার আমি তা আগে বুঝি নি। গৌরীশঙ্করের চেয়েও উঁচু শঙ্কর নিশীথ। ডাক্তার সেন, আপনি কি রামানুজের নাম শুনেছেন?

আজ্ঞে না, আমার মাদ্রাজী পেশেণ্ট নেই।

সেণ্ট অগাষ্টিনের কনফেশন পড়েছেন?

আপনি কি আমায় পরীক্ষা ক'রে দেখছেন যে, আমি কতটা লেখাপড়া করেছি? তা যদি হয়, তবে 'চরিত্রহীনে'র পরে আমি আর কোন উপন্যাস পড়ি নি। সময় পেলুম কই?

তা হ'লে নিশীথকে আপনার প্রতিদিনই একবার এসে দেখে যাওয়া উচিত। দেখা উচিত যে, সাবিত্রীর টি. বি. রোগ সে সারিয়ে দিয়েছে। এক্স-রে প্লেটে ওর প্যাচ কিংবা স্পট নেই।

বলেন কি! কি ক'রে আরোগ্য করল? তুকতাক জানে নাকি?

তা তো বলতে পারব না। ভাল ক'রে তুলেছে সে কথা সত্যি।

তা হ'লে আমার ওষুধগুলো বেড-প্যানে ফেলে দিয়ে ভালই করেছেন।—ডাক্তার সেনের কণ্ঠস্বরে হতাশার ধ্বনি।

জয়া বসু বিছানায় ব'সেই বললেন, সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপারটাই আপনাকে বলা হয় নি।

এর পরে আরও আশ্চর্যের ব্যাপার আছে নাকি? যাক, সবগুলো পেশেণ্টই আমার গোল্লায় যাক। আপনি বলুন, আর তো আমার

এখানে আসতে হবে না, সবগুলো আশ্চর্য ব্যাপার আমি শুনে যেতে চাই। নিশীথকে ডাকুন না একবার, দেখি।

দেখে কিছু বুঝতে পারবেন না। দশ বছর ধ'রে তো আমিও দেখছিলুম, কিন্তু কি হ'ল?

কি হ'ল?—পালটা প্রশ্ন করলেন ডাক্তার সেন, মানে, আশ্চর্য ব্যাপারটার কি হ'ল?

নিশীথ যে এত বড় একজন ডাক্তার তা সে নিজে জানে না।—এই ব'লে জয়া বসু বিছানা থেকে নেমে এলেন। ডাক্তার সেন একটু ব্যস্তভাবে হাত বাড়ালেন জয়া বসুর দিকে। ধ'রে ফেলবার আগেই তিনি বললেন, উঠছেন কেন? আপনি অসুস্থ। না না, নিশীথ যত বড় ডাক্তারই হোক··· আপনার অবস্থা খুবই খারাপ।

মিস জয়া বসু তবু বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এলেন ভেতর দিকের জানলার কাছে। এ জানলা থেকে জয়া বসুর ভেতরের অন্য দুখানা ঘর দেখা যায়। জানলার পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তিনি চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। ডাক্তার সেনের বিস্ময় বাড়ছে প্রতি পলে পলে। তিনি এসে দাঁড়ালেন জয়া বসুর পাশে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখছেন, মিস বোস?

নিশীথকে। আপনি কি দেখলেন ডাক্তার সেন?

জয়া বসুর মাথার ওপর দিয়ে শশাঙ্ক সেন তাঁর নিজের মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ওই তো নিশীথকে দেখতে পাচ্ছি।

কেবল নিশীথকেই দেখতে পাচ্ছেন? আর কিছু নয়?

হ্যাঁ, মানে নিশীথ বোধ হয় হাতজোড় ক'রে প্রার্থনা করছে। আপনি আর কি দেখছেন মিস বোস? মানে, নিশীথ এবং প্রার্থনা ছাড়া আপনি আরও কিছু দেখছেন নাকি?

হ্যাঁ, ইণ্টারনাল ডায়মেনশন। ডাক্তার সাহেব, আমার সারা জীবনের বিশ্বাস নিশীথ ভুল প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। এতদিন যা শিখলুম কিছুই তার কাজে লাগল না। বিদ্যার অহংকারে বুক ফুলিয়ে হাঁটতুম, না, না, ডাক্তার সেন, আমি কোন দিনও বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারি নি। আমি

একটা দিনের জন্যেও—। কথাটা শেষ না ক'রে জয়া বসু চোখের জল ফেলতে শুরু করলেন। চল্লিশ বছর বয়সে পরিতাপের আর অন্ত নেই। ডাক্তার সেনের মনটাও ভিজে এল। কিন্তু তিনিই বা কি করবেন? এক চামচে ব্র্যাণ্ডির বদলে অধ্যাপিকা এক গেলাস ক'রে ব্র্যাণ্ডি খেতে লাগলেন। এখন তাঁর পচা লিভার কেমন ক'রে আরোগ্য করবেন তিনি? বিয়ের সম্ভাবনা থাকলেও স্বাস্থ্য ফেরবার সম্ভাবনা থাকত, কিন্তু সে কথা বলতে গেলেও, অধ্যাপিকা এক্ষুনি তাঁর ছেলের বউ হতে চাইবেন।

ডাক্তার সেন সহানুভূতির সুরে অনুরোধ করলেন, কাঁদলে আরও বেশি দুর্বল বোধ করবেন। চলুন, শুয়ে পড়বেন।

জয়া বসু নিজেই এবার ডাক্তার সেনের হাতটা টেনে নিলেন নিজের হাতের মধ্যে। দুর্বল পায়ের ওপর নির্ভর ক'রে বিছানা পর্যন্ত যেতে পারতেন না তিনি। মেঝের মাঝামাঝি জায়গায় এসে জয়া বসু সহসা থেমে গেলেন। ভেজা চোখ দুটো ডাক্তার সেনের দিকে তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, আমার চোখ দুটোও কি সুন্দর নয়?

ভগবানের নামে শপথ ক'রে বলতে পারি, এমন সুন্দর চোখ আমার নিজের স্ত্রীরও ছিল না।

ডাক্তার সেনের হাত দিয়ে নিজের চোখের জল মুছতে মুছতে জয়া বসু বললেন, তবুও আমার বিয়ে হ'ল না!

সাহস ক'রে বিয়ের অনুষ্ঠানটা শেষ ক'রে ফেলুন না মিস বোস? বিয়ের পরে দুজনে মিলে প্রার্থনা করবেন।

ও মা, সে কি, তার যে দুটো ছেলেমেয়ে আছে!

কার?

ভবতোষের।

নিঃশব্দে ডাক্তার সেন বাকি পথটুকু জয়া বসুকে ধ'রে এনে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলেন। নিঃশব্দেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। অধ্যাপিকা ডাকলেন, শুনুন।

আবার কি হ'ল?

সাবিত্রীর এক্স-রে প্লেটটা একটু দেখবেন? ডাক্তার চ্যাটার্জি বলেছেন যে, ওতে কোন স্পট কিংবা প্যাচ নেই। আপনি না বললে যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। দেখবেন?

দেখব।

ওই সুটকেসটা দয়া ক'রে আমার কাছে নিয়ে আসুন।

ডাক্তার সেন সুটকেসটা নিয়ে এলেন জয়া বসুর কাছে। এনে বললেন, বড্ড ধুলো জমেছে। নিশীথ কি ঘরদোর ঝাঁট দেয় না? রোগীর ঘর ঠাকুর-ঘরের চেয়েও পরিষ্কার থাকা উচিত।

নিশীথ এযাবৎকাল আমার ঘরের ধুলোই সাফ করছিল, এবার থেকে সে সাফ করছে আমার মনের ধুলো। ডাক্তার সেন, আমার আর সাবিত্রীর দুটো এক্স-রে প্লেটই এতে আছে। চেম্বারে গিয়ে দুটো প্লেটই ভাল ক'রে দেখবেন। ডাক্তার চ্যাটার্জি বলেন যে, সাবিত্রীর টি. বি. একেবারে সেরে গেছে। আপনি না বললে আমার বিশ্বাস হয় না।

কি মনে ক'রে ডাক্তার শশাঙ্ক সেন জিজ্ঞাসা করলেন, দুটো প্লেট অদলবদল হয় নি তো?

হওয়া সম্ভব—খুবই সম্ভব। আপনি এই গোটা সুটকেসটাই নিয়ে যান, ডাক্তার সেন। এই ব'লে মিস জয়া বসু সুটকেসের তালাটা খুলে ফেললেন। ডাক্তার সেন সহসা সাপ দেখার মত চমকে গিয়ে পেছন দিকে স'রে গেলেন দু পা। স'রে এলেন ঘর থেকে। তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন রাস্তায়। লেক প্লেসের রাস্তা থেকে বেরিয়ে যেতে তাঁর দু মিনিটও লাগল না।

জয়া বসু শূন্য ঘরে লক্ষীর ভাণ্ডার সামনে নিয়ে মানব-জীবনের শূন্যতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে লাগলেন—শূন্যতার বাইরে সত্যের পথ খোঁজবার চেষ্টা করতে লাগলেন অধ্যাপিকা জয়া বসু।

কার্শিয়াংএ আজ তাঁর দ্বিতীয় রাত্রি কাটছে। চিঠি লেখা বন্ধ ক'রে জয়া বসু বিশ্রাম করছিলেন। অবসাদের মেঘ তাঁর মনের আকাশকে

ছেয়ে ফেলেছে। এ কেবল অসুস্থ শরীরের অবসাদ নয়। মৃত্যুর শূন্যতায় মিশে যাওয়ার অবসাদ। জীবনের শেষ রাত্রিটা দেখতে পাচ্ছেন ব'লেই কার্শিয়াংএর প্রতিটি রাত্রি যেন তিনি হিসেব ক'রে খরচ করছেন। দীর্ঘ দিন পথ চলার পর জয়া বসু আজ তাঁর গন্তব্যের সন্নিকটে এসে পৌঁছেছেন। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করার পরে তিনি হাত দুটো ছড়িয়ে দিলেন দু দিকে। বিছানার দু দিকেও সীমাহীন শূন্যতা! আজ যদি ভবতোষ এসে দাঁড়ায় এখানে, তবুও দেয়াল আর বিছানার মাঝখানের শূন্যতা কিছুতেই ভরাট হবে না।

বাইরে থেকে নিশীথ ডাকল, দিদিমণি—

নিশীথ? আয়, ভেতরে আয়।—জয়া বসু সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

নিশীথ ভেতরে এসে বললে, রাত প্রায় শেষ হয়ে এল, কখন ঘুমবে?

ঘুম যে আসে না।

একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না।

নাঃ, ঘুম আমার আসবে না। ভবতোষ আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তোকে তো সব কথা বলা যায় না নিশীথ।

তা যায় না। আর বললেও আমি শুনতুম না। কিন্তু তোমার নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি না দিলেই বা চলবে কি ক'রে?

দৃষ্টি দেওয়ার মত আমার শরীরে আছেই বা কি বল্? ওরা আমার সবই নিয়ে গেল—মান সম্মান স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ। পচা লিভারটা কেবল প'ড়ে রইল আমার কাছে।

নিশীথ এবার চিঠিলেখার কাগজগুলো বিছানা থেকে তুলে নিয়ে রেখে দিয়ে এল টেবিলের ওপর। ব্র্যাণ্ডির বোতলটাও সরিয়ে রাখল। বিছানার চাদরটা খাটের চারদিকে গুঁজে দিতে দিতে বললে, এবার শুয়ে পড়, বাতি নিবিয়ে দেব।

শুয়ে পড়ব, কিন্তু ঘুম পাড়াবে কে? ভবতোষ যদি কাছে থাকত!

পরের স্বামীকে নিয়ে অমন ক'রে কথা বলতে নেই, দিদিমণি।

ভবতোষকে আমি কোনদিনই পরের স্বামী হতে দিই নি। ভবতোষকে নিয়ে মনে মনে আমি কী-ই না কল্পনা করি! কল্পনার রাজ্যে

তো তোদের নীতির নিয়ম চলবে না, নিশীথ। ও কি, চ'লে যাচ্ছিস? এখানে একটু ব'স্ না, কটা রাত্রি আর বাঁচব বল্। বাতিটা নিবিয়ে দিলি? অকৃতজ্ঞ জানোয়ার! না না, তুই বোধ হয় অকৃতজ্ঞ দেবতা। তোকে যে আমি এতকাল নিষ্কলঙ্ক রেখে দিলুম, তার ঋণ বুঝি তুই এমনি ক'রে চুকিয়ে দিলি? ভোগের কলঙ্ক যেন তোকে স্পর্শ করতে না পারে, সেই জন্যে তোর বিয়ে দিয়েছিলুম সাবিত্রীর সঙ্গে। গণ্ডমূর্খ জানোয়ার, দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলি?—এই ব'লে মিস জয়া বসু বিছানা থেকে নেমে এলেন। সুইচটা খুঁজতে গিয়ে টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে গেলেন মেঝেতে। সেই সঙ্গে ব্র্যাণ্ডির বোতলটাও প'ড়ে গেল টেবিল থেকে। শব্দ শুনে নিশীথ তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে ফেলল। ঘরের মধ্যে না ঢুকেই সে জিজ্ঞাসা করল, কি হ'ল দিদিমণি? প'ড়ে গেলে না কি?

হ্যাঁ রে অকৃতজ্ঞ জানোয়ার। আলো জ্বালাবার দরকার নেই।

কেন?

লজ্জা পাবি।

কথা শুনে নিশীথ অন্ধকারের মধ্যেই সুইচের কাছ থেকে হাতটা সহসা সরিয়ে নিয়ে এল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, উঠেছিলে কেন?

তোকে বলতে চেয়েছিলুম যে, সাবিত্রীর যক্ষ্মারোগ আছে জেনেই আমি ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়েছিলুম। জয়া বসু বুঝলেন, নিশীথ চ'লে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দেওয়ার আওয়াজ পেলেন তিনি। মেঝেতে ব'সেই অনুপস্থিত নিশীথকে উদ্দেশ ক'রে জয়া বসু বললেন, অকৃতজ্ঞ দেবতা, তোমার পায়ে শত কোটি প্রণাম।

বিছানায় উঠে এলেন তিনি। শুনতে পেলেন, ফোঁটা ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি টেবিলটার কোণা থেকে টুপ টুপ ক'রে মেঝেতে পড়ছে। ঘরের বাতাসে মদের নেশা। নরক? মিস জয়া বসু কান পেতে রইলেন, মদের ফোঁটাগুলোতে বোধ হয় শয়তানের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। লেপটা মাথার ওপর পর্যন্ত টেনে দিয়ে মিস জয়া বসু ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

[ক্রমশ]

দীপক চৌধুরী

প্রসঙ্গ কথা

রবীন্দ্রসঙ্গীত

এবারকার "প্রসঙ্গ কথা"য় এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই যার সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ দৃশ্যত খুবই অল্প, অথচ এখানে আমি কিঞ্চিৎ ভিন্ন সুরের কথা উত্থাপন করব। কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গী বা মতবাদ যখন একই কালে বহু মানুষের দ্বারা গ্রাহ্য হতে থাকে সেই ব্যাপক রুচির সাম্য নিজের অনুকূলে এক ধরনের শক্তি অর্জন করে, যাকে ঘাঁটানো সহজ ব্যাপার নয়—কোন কোন সময়, এমন কি, নিরাপদ পর্যন্ত নয়। গতানুগতিকতার প্রতি, গড্ডলিকাবাহী ভাবধারার প্রতি সাধারণের মোহ প্রবল, এই মোহগ্রস্ততা কখনও রাজনীতি, কখনও শিল্পসাহিত্য, কখনও ধর্ম, কখনও আর-কোন বিষয়কে আশ্রয় ক'রে অভিব্যক্ত। আপাতত দেখতে পাচ্ছি, বাংলা দেশের শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই মোহান্ধতা কিছুকাল যাবৎ নিতান্ত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় এই দৃষ্টিহীনতা সব চাইতে বেশি উৎকট। শ্রুতিহীনতাকে কেন্দ্র ক'রে দৃষ্টির আবিলতা কী পরিমাণ সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে, তথাকথিত রবীন্দ্রসঙ্গীতামোদীদের ব্যাপক অত্যুৎসাহের মধ্যে বারে বারেই তার প্রমাণ পাচ্ছি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর প্রায় চোদ্দ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই কিঞ্চিন্ন্যূন দেড় দশক সময়ের মধ্যে বাংলায় ও বাংলার বাইরে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অবলম্বন ক'রে একটি প্রচণ্ড হিড়িকের সৃষ্টি হয়েছে। রেডিও, গ্রামোফোন, সিনেমা, যে কোন প্রকারের সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠান, ঘরোয়া জলসা, সভা-সমিতি—সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাত্রাতিরিক্ত আধিপত্য। এর ফলে অন্যান্য ধরনের সুশ্রাব্য সঙ্গীত—মাত্র বিশ বছর আগেও দেশে যার সবিশেষ অনুশীলন হয়ে এসেছে—অধুনা প্রকাশ্য অধিবেশনগুলি থেকে অন্তর্হিত হবার উপক্রম হয়েছে। এখন আর রাগপ্রধান বাংলা গান, হিন্দী-ভাঙা বাংলা খেয়াল, প্রাচীন ঢঙের বাংলা গান বড় একটা শুনতে পাই না। ভজন কীর্তন এবং নানাবিধ লোকসঙ্গীতেরও প্রায় সেই দশা। শ্রোতার যে মনোযোগ বিভিন্ন ধরনের গানের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হ'লে জিনিসটা সব দিক থেকে শোভন হ'ত, তা এক্ষণে রবীন্দ্রসঙ্গীত একাই সর্বটুকু

গ্রাস করতে বসেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই ব্যাপক সমাদরে উল্লসিত হতে পারতুম যদি বোঝা যেত, রবীন্দ্রসঙ্গীত সুরের বিচারে অন্য সব সঙ্গীত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তা তো নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর সম্পদ অতুলনীয়—বস্তুত ভাবকল্পনার চূড়ান্ত উৎকর্ষ ঘটেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে, সে কথা বার বার স্বীকার করব। কিন্তু কথা হচ্ছে, গানের কাব্যবিচার এক, সুরবিচার আর। গানের কাব্যভাবের দ্বারা গানের সুরবিচার আদৌ প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। অন্তত, সে বিচার সাঙ্গীতিক মহলে গ্রাহ্য না হবারই কথা। আমাদের দেশের এমন কতিপয় বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ্ আছেন যাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, বাণীর অতিরিক্ত লালিত্য ও সৌন্দর্য গানের সুষ্ঠু সুরবিকাশের পরিপন্থী। ভূরি পরিমাণ কথার চাপে সুরের পাখি প্রায়শ হাঁফ ছাড়বার অবকাশ পায় না। পদের সৌন্দর্য সুরের সৌন্দর্য থেকে শ্রোতার মনোযোগ অকারণে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করে। কথা ও সুরের এই আপেক্ষিক গুরুত্ব-লঘুত্বের প্রশ্ন নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই; তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে প্রশ্নটির গুরুত্ব আছে। এ বিষয়ে বছর সতেরো-আঠারো আগে অধুনালুপ্ত 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, একাধিক সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতামোদী লেখক এই বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন, মামলা শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দরবারে গিয়ে উঠেছিল।

বাংলার সঙ্গীতজগতের হালচাল দেখে মনে হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই আত্যন্তিক লোকপ্রিয়তা সবটাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুমিত উৎকর্ষের কারণে বিহিত হয় নি। এর পিছনে অন্যান্য হেতু সক্রিয় থাকা অসম্ভব নয়। দু-একটি হেতু এই মুহূর্তেই নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী-বিশেষের স্বার্থ প্রত্যক্ষত জড়িত; এবং তাঁদের উৎসাহটা এই ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ উগ্র রকমেই প্রকট। সরকারী মহলের উপর এই মহলের প্রভাবও অনস্বীকার্য। রেডিও প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নীতি যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনামাঙ্কিত কৌলীন্যাভিমানী তথাকথিত বনেদী প্রতিষ্ঠানগুলির কাঁধ-ঘেঁষাঘেঁষি সহজেই কল্পনা করা যায়। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীদের সংখ্যাধিক্য। এ সংখ্যাধিক্য সহজিয়া সাধনার ভ্রান্ত আদর্শ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। চলতি ফ্যাশানও তার একটা কারণ বটে।

ক্ল্যাসিকাল বা রাগসঙ্গীত—প্রকৃত প্রস্তাবে, যে কোন প্রকারের বিদগ্ধ শিল্প—আয়ত্ত করতে হ'লে যে নিষ্ঠা, যে প্রযত্ন, যে দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলন প্রয়োজন—সহজিয়াপন্থী আজকালকার অধিকাংশ নবীনবয়সী শিল্পী তার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নন ব'লেই তাঁরা সব জোট বেঁধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এলাকায় প্রবেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে চূড়ান্তরূপ অধ্যবসায় ও ক্লেশ-স্বীকারের সার্থক দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন—বস্তুত, যে কোন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী-সাহিত্যিক ভাবুকের পক্ষেই এই অধ্যবসায় অপরিহার্য—কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ সব সময় পরকে ছুটির আনন্দ উপভোগ তথা সহজিয়া আদর্শের অনুশীলন করতে বলতেন। বলা বাহুল্য, এতে সার্থকতাপ্রয়াসী তরুণ শিল্পসাধকের মনোজীবনের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। তাঁদের অনেকেরই মধ্যে এই ধরনের একটা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যে, শিল্পসাধনায় সহজ কুশলতার আদর্শটাই বুঝি সব, তার জন্যে মূল্য দেবার প্রয়োজন নেই, ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নেই, যে শিল্পে অধ্যবসায়ের ভাগ যত কম সে শিল্পের সার্থকতা তত বেশি। চাই শুধু আনন্দ আর সহজ প্রাণস্ফূর্তি, শিল্পের মধ্যে আনন্দের আবহাওয়া একবার সঞ্চার করতে পারলে সব রকম চেষ্টা শ্রম যত্ন এক তুড়িতে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

কথাটা এক হিসাবে অত্যন্ত খাঁটি। কিন্তু সাধনার অনেকগুলি ধাপ না পেরোনো পর্যন্ত এই নীতি কার্যকরী করতে যাওয়া বিপজ্জনক। দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলে শিল্পী সাধনার এমন একটি স্তরে উন্নীত হন, যখন তাঁর চক্ষে শিল্পচর্চা খেলার স্বগোত্র হয়ে দাঁড়ায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছিল, যেমন পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বেলায় হয়েছে। তখন শিল্পের ক্ষেত্র সবটাই বিশুদ্ধ আনন্দের নিকেতন, সূক্ষ্মতম কল্পনার সহজতম প্রকাশে শিল্পরূপ তখন শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষমণ্ডিত অভিব্যক্তি লাভ করে। কিন্তু সাধনার গোড়াতেই কিছু এই তুরীয়ানন্দ শিল্পীর আয়ত্ত হতে পারে না। অথচ দেখতে পাই, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় সাধনার একেবারে প্রাথমিক স্তরেই সহজানন্দের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীগণ স্বরসাধনার প্রয়োজন বোধ করেন না—রাগরাগিণী সম্বন্ধে তাঁদের কোনও ধারণা আছে, তাঁদের কণ্ঠাশ্রিত গান অন্তত তার কোন পরিচয় বহন করে না। অধিকাংশ

রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীর একমাত্র নির্ভর হ'ল কণ্ঠস্বরের সহজ মিষ্টত্ব ও স্বাভাবিক সুরবোধ। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাঁদের মোটামুটি ধারণা আছে তাঁরা সকলেই জানেন যে, শুদ্ধমাত্র সহজ মিষ্টত্বের উপর নির্ভর ক'রে ভারতীয় সঙ্গীতে খুব বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। যাকে আমরা সহজ সুরেলা কণ্ঠস্বর বলি সে জিনিসটি বড় বিভ্রান্তিকর। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার এতটুকু পরিবর্তনে বা মেজাজের সামান্য রকমফেরে সেই মিষ্টত্ব বেচাল হয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, অমার্জিত কণ্ঠের স্বাভাবিক সুরমাধুর্য উপলক্ষভেদে বেসুরে রূপান্তরিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। এই জন্য আমাদের সঙ্গীতে স্বরসাধনপ্রণালীর গুরুত্ব বিশেষরূপে স্বীকৃত। একমনস্ক স্থায়ী বা 'খরজ' সাধনের দ্বারা কণ্ঠস্বরকে পরিমার্জিত ও সুদৃঢ় না করা পর্যন্ত গান গাইবার অধিকার দৃশ্যত জন্মায় না। অধিকন্তু, ভারতীয় সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যে রাগরাগিণীর জ্ঞান সুররূপায়ণের পক্ষে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। পরিতাপের বিষয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীত-শিল্পীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এর একটা কারণ এই হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের পরিণত-জীবনের গানগুলিতে সুর-বিস্তারের স্বাধীনতা নির্মম হস্তে সংকুচিত। উত্তরকালের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বড্ড বেশি বাঁধা, বড্ড বেশি অপরিবর্তনীয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্দিষ্ট সুরের চিহ্নিত রেখার উপর দাগা বুলোনো ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীর আর বিশেষ কোন করণীয় নেই। সুরবিস্তারের স্বাধীনতা যেখানে অনুপস্থিত সেখানে শ্রমসহকারে রাগ-রাগিণীর জ্ঞান তথা রাগনিষ্ঠ সুরজ্ঞান আয়ত্ত করবার বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না, কেননা সুরবিস্তারের ভিত্তিই হ'ল রাগের জ্ঞান। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সঙ্গীত-শিল্পীসম্প্রদায়ের উপর বোধ হয় পুরোপুরি দোষারোপ করা চলে না; রবীন্দ্রনাথ পরিণত জীবনের গানের কাঠামো কঠোর হস্তে বেঁধে দিয়ে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব তথা আত্মবিকাশের সম্ভাবনা স্বয়ং বহুলপরিমাণে খণ্ডিত ক'রে গেছেন।

তৃতীয়ত, শ্রোতৃসাধারণের অচেতনতা। পূর্বেই বলেছি, বাংলা গানের মূল্যবিচারে কথার সৌন্দর্যে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে এ জাতীয় বিভ্রান্তির সম্ভাবনা পদে পদে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে যে সকল শ্রোতাকে ঘন ঘন মস্তক সঞ্চালন করতে দেখা যায়, সশব্দ

করতালির দ্বারা যাঁরা প্রতিটি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অভিনন্দিত করেন, তাঁদের মানসিকতার উপর কৌতূহলী মন নিয়ে একটু আঁচড় কাটলেই বোঝা যায়, তাঁদের অধিকাংশ হয় অভ্যাসের বশে কর বা শিরশ্চালন করেন, নয়তো তাঁদের সম্মোহনের পিছনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথার জাদু ক্রিয়াশীল। অবশ্য কথার জাদুতে মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতাটাও বড় কম ক্ষমতা নয়, তাতে অনেকখানি রসজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সাঙ্গীতিক বিচারের সঙ্গে এর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই এইটেই শুধু আমাদের বক্তব্য। সাঙ্গীতিক বিচার মূলত ও বহুলাংশে সুরের বিচার, সুরের ভালমন্দের মাপকাঠিতেই গানের গুণাগুণ প্রধানত নির্ণীতব্য। আমাদের সঙ্গীত-আসরগুলির সাধারণ শ্রোতার দল বাণী ও সুরের এই মৌলিক ভেদজ্ঞান মেনে চলেন ব'লে মনে হয় না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতৃসম্প্রদায়ের স্বপক্ষে কেউ কেউ বলতে পারেন, এঁরা নিছক রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভোক্তা তা তো নয়, এঁদের একটি মোটা অংশকে ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের অনুষ্ঠানেও সমান উৎসাহের সঙ্গে আসর জাঁকিয়ে ব'সে থাকতে দেখা যায়। তদুত্তরে বর্তমান লেখকের বিনীত বক্তব্য এই যে, সোনার পাথর বাটি কথাটা যেমন অসম্ভব, বর্তুলাকার রন্ধ্রে চতুষ্কোণ কসি যেমন স্থাপন করা যায় না, তেলে জলে যেমন কোনমতেই মিশ খায় না, তেমনি উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের সংস্কারের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈরিতা তার চাইতে কিছু কম স্বতঃসিদ্ধ নয়। যাঁরা যুগপৎ রাগসঙ্গীতের রস ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস উপভোগক্ষম ব'লে আত্মপ্রচার করেন, বুঝতে হবে, হয় তাঁদের এ দুয়ের কোন রস উপভোগেরই সত্যিকার ক্ষমতা নেই, নয় ফ্যাশানের অনুবর্তী বহু মানুষের দৃষ্টান্তের অপপ্রভাব তাঁদের রসগ্রহণক্ষমতাকে সাময়িকভাবে আবিষ্ট করে রেখেছে। রাগসঙ্গীতের রস আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসে সপ্ত সমুদ্রের ব্যবধান। রাগসঙ্গীতের গোটা বুনিয়াদ গ'ড়ে উঠেছে সুরের লীলায়িত বিস্তারের ভিত্তির উপর, পক্ষান্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরবিস্তারের স্বাধীনতা সুরকারের প্রভুত্বব্যঞ্জক মনোভাবের দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত। শুধু নিয়ন্ত্রিত নয়, আক্ষরিক অর্থে অস্বীকৃত। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অগণন ব্রহ্মসঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রূপ ধ্রুপদের আদর্শ সজ্ঞানত গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের কাঠামোর মধ্যে সহজিয়া আদর্শটিকে গ্রথিত এবং সঙ্গীতকে

আত্যন্তিক মাত্রায় লোকপ্রিয় করতে গিয়ে ধ্রুপদের বিশুদ্ধি ও কৌলিন্যের আদর্শ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিলেন। উত্তরজীবনের রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমরা এক ধরনের সুরের স্বতস্ফূর্তির সাক্ষাৎ পাই, তবে এ সুর বড়ই নিরাভরণ, বড়ই সরল, বড়ই রিক্ত। এ গানের ভিতর হিন্দুস্থানী খেয়ালের ঢঙে সুরবিস্তার যেমন নেই, তেমনি গানের প্রারম্ভিক স্তরে ধ্রুপদের ভঙ্গিমায় আলাপেরও কোন সংস্কার প্রচলিত নেই। উপরন্তু, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর কোন পর্দায় স্থায়ী ভাবে গিয়ে দাঁড়ায় না, কেবলই পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ফলে সুরের মূল আবেদনটাই নষ্ট হয়।

ভারতীয় সঙ্গীত মেলডিপ্রধান—এ কথাটা ধরতাই বুলির মত মুখে মুখে প্রচলিত, কিন্তু তার ভিতরের কথাটার তাৎপর্য বোধ হয় সকলের নিকট সমান স্পষ্ট নয়। কথাটা হচ্ছে এই যে, ভারতীয় সঙ্গীতে রসের চরমোৎকর্ষ তখনই শুধু আয়ত্তগম্য হওয়া সম্ভব, যখন সুর শিল্পীর কণ্ঠ অথবা যন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে যদৃচ্ছা লীলায়নের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যলোকের অভিসারী হয়। সুরকে যথারুচি খেলাবার স্বাধীনতা ব্যাহত হ'লে ভারতীয় সঙ্গীত অর্থহীন। এই কারণে দেখতে পাই, ভারতীয় সঙ্গীতে সুরকার বড় নন, বড় শিল্পী। কোন্ সুরকার কোন্ গানের সুরযোজনা করেছেন তার পরিচয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু যাঁদের কণ্ঠে একদা সে সব গান অপূর্ব সৌন্দর্যে লীলায়িত হয়েছিল তাঁদের স্মৃতি দেশবাসীর চিত্তে আজও অপরিম্লান। পরলোকগত ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ ও ফৈয়জ খাঁ সাহেব, এবং শ্রীমতী কেশরবাঈ কারকার, হীরাবাঈ বরোদকার, ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁ ও আমীর খাঁ সাহেবের গান শুনে আমরা বিমোহিত, কিন্তু কোন্ সুর-রচয়িতার পদ ও সুরবন্ধকে আশ্রয় ক'রে আলোচ্য শিল্পীদের কণ্ঠ স্ফূর্তিমান, সে খোঁজ আমরা একবারও করি না। ঠিক ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিপরীত। ইউরোপীয় সঙ্গীতে সুরকার (composer) বড়, শিল্পীর (executant) স্থান তন্নিম্নে—অনেক অনেক নিম্নে। কারণ শিল্পীর ভূমিকা সেখানে পূর্বনির্দিষ্ট, সুরকারের দ্বারা পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত। সুরকারের অভিপ্রায়ের বাইরে পাশ্চাত্ত্য শিল্পীর এক পাও এগোবার বা পেছোবার এক্তিয়ার নেই। ভারতীয় সঙ্গীতে তেমন নয়। সেখানে শিল্পীর আত্মবিকাশের স্বাতন্ত্র্য ও স্ফূর্তি অব্যাহত। ভারতীয় রাগসঙ্গীতশিল্পীকে পান

থেকে চুন না খসে এমন ভাবে সুরকারের নির্দিষ্ট সুর অনুসরণ করতে বলা আর পাখা কেটে নিয়ে পাখিকে আকাশে উড়তে বলা একই কথা।

রবীন্দ্রনাথের সুরযোজনার আদর্শের ভিতর ইউরোপীয় সংস্কার সমধিক বলবৎ। বলা বাহুল্য, এ জিনিস ভারতীয় সাঙ্গীতিক সংস্কারের অনুবর্তী নয়। সত্য বটে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচিত অসংখ্য ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে ধ্রুপদের রূপ ও রস বিশেষভাবে অনুস্যূত, তবে সেখানেও আলাপের সুযোগ বা অবকাশ খুব বেশি অবারিত ব'লে মনে হয় না। অন্তত, রবীন্দ্ররচিত ধ্রুপদসঙ্গীত আরম্ভ করার আগে একালীন কোন গায়ক রাগালাপ দিয়ে গানের সূত্রপাত করেন ব'লে আমাদের জানা নেই। ধ্রুপদের আলাপ-অঙ্গ সুরবিস্তারের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। নিশির শিশির স্পর্শে পুষ্পকলিকার পাপড়ি একটির পর একটি উন্মোচিত হয়ে যেমন পুষ্পটিকে পূর্ণবিকশিত করে, তেমনি ধ্রুপদশিল্পী আলাপের সাহায্যে আপনার অন্তরস্থ সুরের ধ্যানরূপটিকে পর্যায়ের পর পর্যায়ে উদ্ঘাটন ক'রে এক সময়ে তাকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যে ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমে রাগের উন্মোচন, বা শিল্পীর খেয়ালখুশি অনুযায়ী সুরের অবলীলায়িত রূপায়ণ (যেমন খেয়াল গানে), ভারতীয় রাগসঙ্গীতের বারো আনা মাধুর্য এখানেই। অথচ আশ্চর্য, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভারতীয় সঙ্গীতের এই মূলগত সংস্কার পরিত্যক্ত। খুব সম্ভব কবি তদ্রচিত গানের সৌষ্ঠববিধানে এই সংস্কারটিকে তেমন প্রয়োজনীয় মনে করেন নি। কারণ যাই হোক, এই বৈশিষ্ট্যের অভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিশেষ, উত্তরজীবনের রবীন্দ্রসঙ্গীত, সুরের দিক দিয়ে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে কথা মানতেই হয়।

তবু প্রাথমিক এবং পরিণত বয়সের রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে যদি আমাদের একটিকে বাছাই করতে হয়, তা হ'লে আমরা বিনা দ্বিধায় আমাদের পক্ষপাত প্রথম বয়সের রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর ন্যস্ত করব। কেন না, এ গানের আর যে অপূর্ণতাই থাক্, এর মধ্যে আমরা রাগের বিশুদ্ধ রূপটিকে অন্তত পাই। রবীন্দ্রনাথের 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন,' 'আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসারকাজে', 'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে', 'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি' প্রভৃতি গানের সঙ্গে শেষ বয়সের যে কোন গানের তুলনা করলেই

দুই অধ্যায়ের গানের উৎকর্ষের তারতম্য শ্রুতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে ব'লে মনে করি। উত্তরজীবনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের কাঠামোয় লোকসঙ্গীতের, বিশেষ, বাউলের প্রভাব প্রত্যক্ষ। কিন্তু মাত্র লোকসঙ্গীতের ধারাশ্রয়ী হয়েই কোন গান রসিক মহলে পূর্ণ স্বীকৃতি দাবি করতে পারে না। ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ভিত্তি হ'ল রাগ—রাগের সংস্কার থেকে রবীন্দ্রনাথ উত্তরোত্তর দূরে স'রে গিয়েছিলেন। আর তারই ফলে তাঁর শেষের দিককার গানে কেমন একপ্রকার সুরের রিক্ততা প্রকাশ পেয়েছে। এ গানে ধ্রুপদভঙ্গিম আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ রূপ কলিবিভাগ হয়তো ঠিকই আছে, কিন্তু রাগসঙ্গীতের সঙ্গে সে গানের সাদৃশ্য মাত্র এই বহিরঙ্গটুকুতেই সীমাবদ্ধ, তার পর শুধুই নিরাভরণ রিক্ততার রাজত্ব। কোন রাগসঙ্গীতনিষ্ঠ সুরমনস্ক ব্যক্তি বোধ হয় এ সুরে প্রকৃত মুগ্ধ হতে পারেন না। পরিণতবয়সী রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের কাঠামোর ভিতর লোকসঙ্গীতের প্রভাব লক্ষ্য করে মন যদি বা উল্লসিত হয়, আবার রাগরূপের সুস্পষ্ট অসদ্ভাবে মন নিরাশও হয়। এ গানে না আছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসুলভ সুরবিস্তার, না আছে লোকসঙ্গীতের বিশুদ্ধ প্রভাব। সুরকে আভরণরিক্ত করতে গিয়ে প্রায় আবৃত্তির স্তরে টেনে আনা হয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীতের দুই মূল বিভাগ—রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত। এই দুই বিভাগের প্রক্রিয়া ঐতিহাসিক ভাবে পাশাপাশি চ'লে আসছে এবং কখনও কখনও এক দেহে লীন হয়ে গেছে। ভারতীয় রাগ ও লোকসঙ্গীতের সমন্বয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের যে শ্রেষ্ঠ যৌগিক প্রকাশ, তা অন্তত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনধিগম্য হয়ে রইল।

আধুনিক রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী ও শ্রোতৃসম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আমার প্রধান আপত্তি এইখানে যে, এঁরা মুখ্যত কবির মধ্য ও শেষ বয়সের গানগুলিকেই অবলম্বন ক'রে আছেন। মধ্য ও শেষ বয়সের গানের প্রতি তাঁদের এই পক্ষপাতের কারণ বোঝা দুরূহ নয়। মধ্য ও শেষ অর্থাৎ পরিণত বয়সের রবীন্দ্রসঙ্গীত সহজ স্ফূর্তির আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার সুর সোজা, তাল সোজা, সুতরাং সে গান গাওয়াও সোজা। নাকের ডগার উপর একটি 'গীতবিতান' (অভাবে গানের খাতা) ঝুলিয়ে

রেখে গড় গড় ক'রে নামতা পড়ার মত সানুনাসিক সুরে বা প্রতিষ্ঠান-বিশেষের অনুমোদিত কায়দায় ন্যাকা ভঙ্গীতে সংশ্লিষ্ট গানের সুর আবৃত্তি ক'রে গেলেই হ'ল। এর জন্যে পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই দীর্ঘস্থায়ী সযত্ন অনুশীলনের। কথা ও কথাশ্রয়ী সুর কোন গতিকে মুখস্থ করতে পারলে অর্ধসমর বিজিত। প্রাথমিক স্তরের রবীন্দ্র-সঙ্গীত এত সহজায়ত্ত নয়। তার জন্যে স্বরসাধন প্রয়োজন, রাগজ্ঞান প্রয়োজন, প্রয়োজন কষ্টসহিষ্ণু অধ্যবসায়ের। নিছক সস্তা আনন্দের জাদুদণ্ড বুলিয়ে ও-জিনিস বাগে আনার আশা দুরাশা। একনিবিষ্ট যত্নে অনেক কাঠখড় পোড়ালে তবে সুরের আগুন প্রাণের ভিতর জ্বালিয়ে তোলা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, "প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে।" স্পষ্টতই এই উক্তিতে পরিণত বয়সের গানের প্রতি সমধিক অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তবে সুরকারের নিজস্ব পক্ষপাত আর শ্রোতার পক্ষপাত যে অভিন্ন হবেই এমন কোন কথা নেই। রূপের চাইতে ভাব কিসে খাটো হ'ল বোঝা কঠিন। সত্য বটে শিল্পের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য রূপ বা form-এর সুষ্ঠুতম প্রকাশ, তা ব'লে তা ভাবরিক্ততার মূল্যে সাধয়িতব্য নয়। ভাব এবং রূপ একাঙ্গী হ'লে তবেই রূপ সত্য সত্য খুলেছে বলা যেতে পারে। পরিণত বয়সের রবীন্দ্রসঙ্গীতে কাব্যভাব প্রচুর, সুরভাব বিসদৃশরূপে দুর্বল। বস্তুত, ওতে যে পরিমাণে কাব্যসমৃদ্ধি, তদনুপাতে সুরের দারিদ্র্য। ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের স্বীকৃত রাগরূপ থেকে বিচ্যুতি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের সঙ্গীতকে যথার্থ সুরামোদী মহলে অকুলীন ক'রে রেখেছে।

শ্রোতার বিষয়ে পূর্বে কিঞ্চিৎ বলেছি, আর একটু বলি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতৃসম্প্রদায়ের শ্রেণিস্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি, এঁরা সেই শ্রেণী থেকে মূলত আগত, যে শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল, বিলাসপ্রিয়তা যার একটি কুললক্ষণ বললেও অন্যায় হয় না। সাহিত্যে এঁদের রুচি বিলিতী ছ'-পেনি নভেলের রুচির উর্ধ্বে নয়; দৃশ্যশিল্পে এঁরা হলিউডের সস্তা ফিল্ম আর নিউ

এম্পায়ারের নাচের প্রদর্শনীগুলির উদার পরিপোষক; শ্রুতিশিল্পে 'মোর ভাবনারে কী হাওয়া মাতালো' বা 'কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা' কিংবা 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে'-জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত আর কোন্ এক আব্বাস উদ্দীনের গাওয়া লোকসঙ্গীত পর্যন্ত এঁদের সাঙ্গীতিক রুচির দৌড়। বোম্বাইমার্কা স্থূল সিনেমা-সঙ্গীতে এঁদের আসক্তির আরম্ভ, উত্তরকালীন রবীন্দ্রসঙ্গীতে তার পরিণতি। অর্থাৎ একই রুচির স্থূল ও সূক্ষ্মাগ্র ভাগ হ'ল ফিলম-কা-গানা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত। বলা প্রয়োজন, আমার এ উক্তি সুরবিচারের ভিত্তিতে করা হয়েছে; সঙ্গীতের বাণী অংশের উৎকর্ষাপকর্ষের ধারণার সঙ্গে এ উক্তির সম্পর্ক নেই। কাব্যবিচারে রবীন্দ্রসঙ্গীত উৎকৃষ্ট হয়েও সুরবিচারে আমাদের প্রত্যাশা বহুলাংশে অপূর্ণ রাখে।

আসল কথা, জীবন ও জগৎকে এক ধরনের তরল মনোভাব নিয়ে বিচার করবার প্রবৃত্তির সঙ্গে কোথায় যেন এই চটুল সঙ্গীতপ্রীতির সংস্কারের যোগ আছে। ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত বা সাহিত্যের ঐতিহ্যের সব কিছুই প্রকৃষ্ট এমন কথা বলি না, যুগধর্ম ও যুগরুচির সঙ্গে তাদের পদ্ধতিপ্রকরণের কিছু পরিমাণে সামঞ্জস্য ঘটানো দরকার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য ও সঙ্গীতের রূপটি মূলত গভীর-গম্ভীর, আর সে গাম্ভীর্যের মধ্যে জীবনের গভীর রূপটিই প্রতিফলিত। ধ্রুপদী শিল্পের রীতিনীতি ও সংস্কার গূঢ় অর্থে অস্তিত্ববাদী, জীবনপ্রীতিময়; কেন না, জীবনের তাৎপর্যে ও মূল্যে তার আস্থা অকাট্য; পক্ষান্তরে এখনকার কালের শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের মূল সুরটাই হ'ল নেতিবাদের সুর। সব কিছুকে হেলাফেলার মনোভাব নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই যেন আধুনিক শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের স্ফূর্তি। হয়তো ধ্রুপদী শিল্পের রূপের মধ্যে কিছু পরিমাণ ঋজুতা আছে, হয়তো রক্ষণশীলতার বর্মের দ্বারা তার বহিরঙ্গকে কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্তভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই বিচ্যুতি শোধন করা খুব কঠিন নয়। ধ্রুপদী শিল্পের আপাত-শুষ্ক পঞ্জরের মধ্যে যদি এ যুগের সচল হাওয়ার বেগ কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চালন করা যায়, তা হ'লে অনায়াসেই তাকে অপ্রতিরোধ্য প্রাণময় সৌন্দর্য-প্রতিমারূপে বর্তমানকালীন রুচির বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। চাই

কিঞ্চিৎ রঙ, রস, চটক। আধুনিক জীবনযাত্রার এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধ্রুপদী শিল্পের সঙ্গে অন্বিত করতে পারলে ধ্রুপদী শিল্পের আর মার নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের গান ধ্রুপদী সংস্কার থেকে বিচ্যুত। ওর চালটাই সহজিয়া পথের পথিকের চাল। যেন বিদগ্ধ শিল্প ব'লে কিছু থাকতে নেই, অনুশীলনলব্ধ শিল্পবুদ্ধি তথা শিল্পনৈপুণ্যের কিছু মূল্য নেই। এমন গানের সোৎসাহ পোষকতা করতে পারেন শুধু তাঁরাই, যাঁরা জীবনের ক্ষেত্রে সর্বব্যাপারে ন্যূনতম প্রতিরোধের পথে চলবার পক্ষপাতী, তুচ্ছ আরাম-আয়েস-প্রীতি যাঁদের স্বভাবের মর্মমূলে নিহিত। কথাটা শুনতে কিঞ্চিৎ অদ্ভুত শোনাবে, তা হ'লেও সত্য যে, সমাজের উপরতলার টঙে যাঁরা কোন গতিকে চ'ড়ে ব'সে আছেন তাঁদের মধ্যেই হাল্কা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সব চাইতে বেশি সমাদর লক্ষ্য করা যায়। ড্রইংরুমে রবীন্দ্রসঙ্গীত যত ভাল খোলে এমন আর কোথাও নয়। অর্গান পিয়ানো গিটার (লক্ষ্য করবেন, স্বরোদ সেতার বেহালা নয়) রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অনুষঙ্গ-যন্ত্ররূপে পরিগণিত। কই, এ-সঙ্গীত রাগসঙ্গীতপ্রিয়দের তো কখনও আকর্ষণ করে না? উঁচুদরের রসিক-সমঝদারদেরই বা এ সম্পর্কে উৎসাহ কোথায়?

সব চাইতে বলিহারি যাই বিশ্বভারতী-সঙ্গীত-সমিতির কাণ্ডকারখানা দেখে। এঁরা ধ'রেই নিয়েছেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলা দেশের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ; তাই সে সঙ্গীতের বিশুদ্ধি রক্ষা করবার জন্যে তাঁদের তৎপরতার অন্ত নেই। পাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্ধারিত সুরের একচুল ব্যতিক্রম ঘটে, সেই আশঙ্কায় এঁদের দিবসের আহার রাত্রির নিদ্রা অন্তর্হিত। কবে কোন্ এক দুর্বল আত্মাবলিপ্ত মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—তাঁর গানের উপর স্বাধীনতার স্টীম-রোলার চালাতে দিতে তিনি নারাজ, সেই থেকে সদাসতর্ক প্রহরায় সর্বপ্রকার কল্পিত কলুষস্পর্শ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা চলছে। সঙ্গীতসমিতির কর্তারা অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় চক্ষুর্মণি-সদৃশ রবীন্দ্রসঙ্গীত-নামধেয় মহামূল্যবান বস্তুটিকে নিরন্তর চোখে চোখে রাখছেন, পাছে তার এক কণা নিয়ে কেউ অতর্কিতে অন্তর্ধান করে। আত্মশ্রেষ্ঠত্বের চেতনা এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে অজ্ঞতা এই দুই একত্র সমন্বিত হ'লেই শুধু কারও মনে এ জাতীয় অরতপ্ত বিক্ষেপ উপজিত হওয়া সম্ভব। বাংলার

সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু নন, অতুলপ্রসাদ কিছু নন, কাজী নজরুল ইসলাম কিছু নন, প্রাচীন বাংলা গান, লোকসঙ্গীত ও কীর্তনের সমৃদ্ধ অবদান কিছু নয়—এক এবং অদ্বিতীয় সঙ্গীত হ'ল রবীন্দ্রসঙ্গীত। তাও রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গান নিয়ে কেউ তেমন উচ্চবাচ্য করে না, সবটুকু উৎসাহ কবির মধ্য ও শেষ বয়সের গানকে ঘিরে আবর্তিত।

পরিশেষে, আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে পুনরায় বিবৃত করি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে অংশ সচরাচর শিল্পীরা গেয়ে থাকেন সে অংশের মেজাজ মূলত পাশ্চাত্য-ভাবান্বিত। এই সঙ্গীতের রূপায়ণে শিল্পীর আদৌ কোন স্বাধীনতা নেই। সুরকার এখানে অত্যাচারী শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। ইউরোপীয় সঙ্গীতাদর্শের অনুসরণে সুরকার তাঁর গানের রূপটিকে পূর্বাহ্নে যে ভাবে বেঁধে দিয়েছেন, আবৃত্তির ভঙ্গিমায় ঠিক সেই রূপটিকে অন্ধের ন্যায় কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীর সবটুকু কৃতিত্ব নিঃশেষিত। এ সঙ্গীতে কোনরূপ স্বরজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, স্মৃতিই এ ক্ষেত্রে একমাত্র সম্বল। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের মুক্তি চেয়েছেন, কিন্তু খোদ রবীন্দ্রসঙ্গীতেই এ মুক্তি সর্বাপেক্ষা ব্যাহত। এ গান কাব্যভাবে সমৃদ্ধ হ'লেও সুরের দিক দিয়ে রিক্ত। ধ্রুপদী সঙ্গীতের সংস্কার—যা তাঁর প্রথম বয়সের গানের বাঁধুনিতে পরিলক্ষণীয়—এ-গানে সজ্ঞানত পরিত্যক্ত। সুরবিচারের মানদণ্ডে এ গান তরল মনোভাবের পোষক—যাঁরা গান গান তাঁরা যেমন এ তরল মানসিকতার দ্বারা আক্রান্ত, যাঁরা সে গান শোনেন তাঁরাও। বাংলার সাঙ্গীতিক বিবর্তন ও অগ্রগতির ইতিহাসে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু সবটুকু স্থান সে একা গ্রাস করতে চাইলে আমরা প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে তারস্বরে তার প্রতিবাদ করব। মনে হয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে কোন মোহ ছিল না, তিনি বলেছেন, "আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত নাওয়ার ঘরে কিংবা এমনি সব জায়গায় গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত, এর বেশি ambition মনে নাই রাখলাম।" এটি বিনয়ভূষণ হ'লেও সত্য-ভাষণ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিচার এই মানদণ্ডেই হওয়া উচিত। যাঁরা অতিরিক্ত রবীন্দ্রিয়ানার মোহে তদতিরিক্ত মূল্য তার উপর আরোপ করতে চান তাঁরা প্রভুভক্তির পরিচয় দেন মাত্র, সঙ্গীতজ্ঞানের পরিচয় দেন না।

নারায়ণ চৌধুরী

কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার দুইটি কবিতা কাব্যগুণে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—"সখার প্রতি" ও "নাচুক তাহাতে শ্যামা"। "সখার প্রতি" কবিতাটিকে এক হিসাবে স্বামীজীর আত্মচরিত বা 'জীবন-দর্শন' বলা চলে। এই কবিতায় যে দুঃখের সুর ধ্বনিত হইতেছে, উহা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বা কবির দুঃখবাদ নহে, উহার মূলে রহিয়াছে ভারতীয় জীবনদৃষ্টি। স্বামীজী বলিতেছে—

"বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুঃক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বত-গহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কি ধন করিনু উপার্জন?"

ইহা স্বামীজীর আত্ম-বিশ্লেষণ। আর এই আত্ম-বিশ্লেষণের ফলেই তিনি বুঝিতে পারিলেন—

"ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন,
মৃত্যু মাগে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।"

তবে নিষ্ক্রিয়তাই কি মানব-জীবনের পরম পুরুষার্থ? তাহাও নহে। পরার্থে আত্মত্যাগ, জীবে প্রেম—ইহাই মানব-জীবনের লক্ষ্য, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য আর কিছু হইতে পারে না। স্বামীজী বলেন—

"ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল,
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম,—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয়;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।"

"নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতায় স্বামীজীর জীবন-দর্শন অপূর্ব তন্ময় ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কবিতাটিতে ললিত ও রূঢ় কঠোর ভাবরাশি পাশাপাশি স্থাপিত হইয়াছে। বাঙালী পরেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবরের"ই উপাসনা করে নাই;

সে মৃত্যুরূপা কালীরও আরাধনা করিয়াছে। কিন্তু বাঙালী দীর্ঘকাল ললিত-মধুর ভাবের অতিমাত্রায় অনুশীলন করিয়া সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সে যথার্থই ক্লৈব্যকে আশ্রয় করিয়াছে। তাই স্বামীজী বলেন—

"রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী।"

যথার্থ শক্তিসাধনার আদর্শ হইতে আজ আমরা ভ্রষ্ট, তাই আমরা দুঃখদৈন্যে সহজে বিচলিত হই, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আমাদের অভিভূত করে, বাধা-বিঘ্ন আমাদের চলার পথকে রুদ্ধ করে। স্বামীজী আমাদিগকে বীর্যের সাধনায়, মনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন—

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

স্বামীজীর গদ্য-রচনার মত কবিতারও স্থানে স্থানে স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—

"পুত্রতরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে, প্রেমের প্রেরণ॥"

ইহার তাৎপর্য এই, পুত্রের প্রতি স্নেহবশত মাতা অবলীলাক্রমে প্রাণ বিসর্জন দেয়, আবার মাতা পিতা বা স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা আছে বলিয়াই দস্যু পরস্ব-অপহরণ করে। এরূপ স্থলে বাক্য স্বভাবত পাঠকের পক্ষে একটু দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ প্রকাশভঙ্গি সমালোচকের দৃষ্টিতে সর্বত্রই দোষ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কখনও কখনও ইহা কাব্যগুণ বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছে।

সংক্ষেপ ভাবপ্রকাশের জন্য স্বামীজীকে কখনও কখনও এমন দুই-একটি বিশেষণ পদের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, যাহার অর্থ স্পষ্ট হয় নাই। এই জন্য 'বীরবাণী'র পাদটীকায় সেই সমস্ত পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—প্রাণসাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, (ক্রন্দনই যাহার অস্তিত্বের সাক্ষী বা প্রমাণ), স্বরময় পতত্রিনিচয় (পক্ষিসমূহ যেন কাকলীর সমষ্টি, তুলনীয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ—

O Cuckoo! shall I call thee bird
Or but a wandering voice?)

এরূপ শব্দপ্রয়োগে যে মুন্সীয়ানা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

স্বামীজীর বাংলা রচনাবলী পাঠ করিলে স্বভাবতই মনে হয়, তাঁহার মধ্যে যতখানি সম্ভাবনা ছিল ততখানি সার্থকতা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক তাঁহার রচনার অনেক দোষ-ত্রুটিরও আবিষ্কার করিতে পারেন। তথাপি এ কথা সত্য যে, তিনি যথার্থ সাহিত্যিক-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার বিচিত্র দানে বঙ্গবাণীকে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে আজও তাঁহার সাহিত্যকৃতি উপযুক্ত মর্যাদা বা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই।

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

১৪

যে ভাস্কর বসুর সঙ্গে রেঙ্গুনে আলাপ ছিল, যার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল সে-ই এখানে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে। কথাটা বিশ্বাস করতে সাহস হ'ল না ডানার। কিন্তু আর কোনও ভাস্কর বসুর সঙ্গে তার তো আলাপ নেই। তা হ'লে···। আশা-আশঙ্কায় বুকটা দুলে উঠল তার। বিয়ে করেছে কি ভাস্কর? যদি ক'রে থাকে, যদি না ক'রে থাকে—উভয়বিধ সম্ভাবনার জন্যেই সে নিমেষে প্রস্তুত ক'রে নিলে নিজেকে। যেন পর-মুহূর্তেই ভাস্কর বসুর সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে। বাইরে কিন্তু কোনও বিচলিত ভাব দেখা গেল না তার। কবি ঝুঁকে কি একটা কাগজ দেখছিলেন, ডানা তাঁর দিকে শান্তমুখেই চেয়ে রইল। তারপর প্রশ্ন করল, ভাস্কর বসুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে নাকি?

কবি কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, না। শুনছি লোকটা ট্যাস-মার্কা। আলাপ হবেই একদিন। ব্যস্ত কি! যেচে আলাপ করতে যাব কেন? ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে চেয়েই রইলেন খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে। তারপর বললেন, একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করেছি পুরোনো কাগজপত্র থেকে। অমরবাবুও বোধ হয় জানেন না ব্যাপারটা।

কি?

তুমি যে বাড়িটাতে আছ আর ওই সন্ন্যাসী যে পোড়ো বাড়িটাতে আছেন—ওই বাড়ি দুটো আর ওর সংলগ্ন বিশ বিঘে জমি অমরবাবুর নয়। ওটা সহায়রাম ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোকের। সমস্ত জমিদারিটাই এককালে তাঁর ছিল। রত্না দেবীর বাবা তাঁর কাছ থেকে জমিদারিটা কেনেন। গঙ্গাধরের ওই বাড়ি দুটো আর ওই বিশ বিঘে জমি তিনি বিক্রি করেন নি, আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল বোধ হয়, এসে বাস করবেন। কিন্তু আর আসেন নি। ওটা ক্রমশ অমরবাবুর সম্পত্তি ব'লে গণ্য হয়ে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো—

ডানার মনে পড়ল, সন্ন্যাসী বলছিলেন যে ছেলেবেলায় তিনি এখানে ছিলেন। সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই তো! তাঁর বাবা এখানকার পোস্ট-অফিসে টাকা জমিয়ে গেছেন···চকিতের মধ্যে

অনেক রকম সম্ভব অসম্ভব কথা বিদ্যুৎচমকের মত খেলে গেল তার মনে। কিন্তু কোন কথা বললে না সে। শান্তমুখে ব'সে রইল চুপ ক'রে। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললে, পোস্ট-অফিসে যখন 'পাসবুক' আছে তখন সন্ন্যাসীর সব খবর সে বার করতে পারবে। যদি পারে, তখন··· চিন্তা আর এগোল না। তখন কি করবে সে? বিশেষ কিছুই তো করবার নেই! বিশেষ কিছু করবার নেই, এই কথাটা মনে হওয়াতে বিমর্ষ হয়ে পড়ল সে।

ওই উদাসীন লোকটা আজ এখানে আছে, কাল আবার অন্যত্র চ'লে যাবে, কোন ঘটনাই তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না কোথাও।

কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে সৌদামিনী প্রবেশ করলেন।

আমার সব রান্না হয়ে গেছে। এইবার রূপচাঁদবাবু এলেই তোমরা খেতে বসতে পার। আমি তোমার জন্যে নিরামিষ রান্না করেছি, রূপচাঁদবাবু নিজেই নিজের জন্যে মাংস রান্না ক'রে আনবেন। আমি আর আঁষের হাঙ্গামাই করি নি এ বেলা। উনি এখানে কাজ করছেন, চল তুমি ও-ঘরে, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। এখানে বক বক করলে উনি রাগ করবেন এখুনি আবার। রাগটি তো কথায় কথায় কিনা! লেখাপড়ার সময় টুঁ শব্দটি করবার জো নেই।

কবি কোন কথা না ব'লে গৃহিণীর দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু ক্ষণকাল। তারপর আবার কাগজপত্রে মন দিলেন। রূপচাঁদবাবু আসবেন শুনে ডানা মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু তার বাইরের শান্তভাব ব্যাহত হ'ল না তাতে। সৌদামিনীর কথা শুনে হাসিমুখে সে উঠে দাঁড়াল।

কবি তার দিকে চেয়ে বললেন, আমি একটা নতুন কবিতা লিখেছি আজ সকালে। সেটা ও-খাতায় নেই। অন্য আর একটা খাতায় আছে। পরে দেখাব। খাওয়াদাওয়ার পর।

সৌদামিনী ঠোঁট উলটে বললেন, আমি মুখ্যু মানুষ। ও-সবের কিছু বুঝি না। তোমার ভাল লাগে বুঝি?

ডানা হেসে বললে, লাগে একটু একটু।

তুমি লেখাপড়া-জানা মেয়ে,
পাশের ঘরে গিয়ে ডানা বল
সংসারের বিষয়ে যত জ্ঞান যত
নেই। আমি কতকগুলো বই মু
সৌদামিনী মনে মনে খুশি
বললেন, তাই বা ক'টা মেয়ে পা
থোকন তো এবার প্রমোশনই পে
বিছানায় দুজনে পাশাপাশি
সৌদামিনী বললেন, তো
পড়ছে। তোমার চিবুকের দি
তার চোখ অবশ্য তোমার চে
ধারণ কিন্তু তোমারই মত।
না। অনেক দিন চিঠি পাই নি
কেমন আছে কে জানে। এইত
নিজের জগতে নিয়ে গেলেন
চেয়ে সুন্দরী গাই বড়, রেকার
বেশি। কথায় কথায় তাঁর
বিয়েতে কতরকম বিশৃঙ্খলা
(আত্মীয়-স্বজনরা পর্যন্ত গামলা
নীচু গলায় বললেন খবরটা)
রকম কৃপণতার পরিচয় দিয়েছি
রক্ত উঠে যাচ্ছিল, আংটিটা পে
টাকা তো দেয়ই নি—যাচ্ছেত
মেয়েটি সুন্দরী। তা ছাড়া ঘরে
মোরব্বা তৈরি করেছিল। আ
আচার-প্রসঙ্গ এসে পড়াতে
ঠিক সময় কুল কেনা হয় নি
পারেন নি। উনি (আনন্দময়

রাখতেন তা হ'লে হ'ত, কিন্তু ওঁকে বিধি যে কি দিয়ে নির্মাণ করেছেন তা তিনিই জানেন। এ অঞ্চলে কুল একটু দেরিতে পাকে, কুল পাকবার আগেই তাঁকে ভায়ের বিয়ের জন্যে চ'লে যেতে হ'ল, কুল কেনা হ'ল না। এবার আমের কাসুন্দি করবার ইচ্ছে আছে। হঠাৎ সৌদামিনী ডানার ব্লাউসের হাতাটায় হাত বুলিয়ে বললেন, ছুঁচের কাজ তুমি নিজে করেছ?

ডানা লজ্জিত হয়ে বললে, আমিই করেছি। কিন্তু ভাল হয় নি, আমি ভাল জানি না।

কেন, বেশ চমৎকার হয়েছে তো। আমি এসব কিছুই পারি না। কাঁথা সেলাই করতে দাও, পারব। পাড় জুড়ে জুড়ে পরদা বা বিছানার চাদর করতে দাও, পারব। কিন্তু ছুঁচ দিয়ে ফুল, পাখী, লতাপাতা আঁকা—এ আমার দ্বারা হয় না। কেউ তো শেখায় নি ছেলেবেলায়। শঙ্করীটা পারে। এক মাস্টারনী শিখিয়েছিল ওকে।

ডানা চিত্রার্পিতবৎ ব'সে ব'সে শুনে যাচ্ছিল। যে জগতে সে মানুষ হয়েছে সে জগতেও গৃহকর্ম-নিপুণা গৃহলক্ষ্মীরা ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন আলাদা জাতের। বিদেশী সংস্কৃতির ছোঁয়াচ লেগে তাঁদের স্বভাবটা একটু যেন দোআঁশলা গোছের হয়ে গিয়েছিল। চাকরকে 'রোয়' ব'লে ডাকতেন, বাইরের কেউ এলে চট ক'রে তার সামনে বেরুতে পারতেন না। দু সেকেণ্ডের জন্যেও অন্তত আয়নার সামনে না দাঁড়িয়ে অচেনা লোকের সামনে বার হওয়া অসম্ভব ছিল তাঁদের পক্ষে। যখন বার হতেন তখন মুখে ঝুলত একটা মেকি হাসি। সৌদামিনীর মত এরকম বেশে বাইরের কারো সামনে ব'সে গল্প করার কল্পনাও করতে পারতেন না তাঁরা। তাঁদের গল্পও পোশাকী গল্প, খবরের কাগজের খবর, আবহাওয়া, বড় জোর মার্কেট-সংক্রান্ত দু চারটে কথা। অন্তরের কথা নয়। তাঁরা যে খারাপ ছিলেন তা নয়, তাঁদেরও অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র জাতের, সৌদামিনীর মত নয়। শুধু যে তাঁরা টেবিলে খেতেন বা ইংরেজী বুকনি দিয়ে কথা বলতেন ব'লেই স্বতন্ত্র

জাতের তা নয়, তাঁদের মন এবং চরিত্রের গড়নই ছিল অন্য রকম। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়াতে মজা লাগল একটু। মনে পড়ল, বিপদে পড়লে এই স্বতন্ত্র সংস্কারে গঠিত চরিত্র বা মন এক নিমেষে বদলে যেতেও সে দেখেছে। জাপানীরা যখন বর্মায় বোমা ফেলল তখন তাদের এক সাহেবী-মেজাজের প্রতিবেশী মিস্টার বিশওয়াস্ বদলে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন দলবদ্ধ হয়ে পালাচ্ছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে দাড়িওলা গলায়-রুদ্রাক্ষের-মালা এক বেঁটে কালো গোছের লোক ছিলেন। তিনি মিস্টার বিশওয়াস্-পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন কয়েক দিনের মধ্যে। বহু লোক একসঙ্গে পালাচ্ছিল। কয়েক দিন মিস্টার বিশওয়াস্দের খবর পাওয়া যায় নি ভিড়ের মধ্যে। সবাই তখন নিজের নিজের সামলাতে ব্যস্ত। দিন দশেক পরে হঠাৎ তাঁদের দেখা গেল একেবারে ভিন্ চেহারায়। মিস্টার বিশওয়াস্ হঠাৎ ভোল বদলে একেবারে বিশ্বেস মশাই হয়ে গেছেন। মাথা কামিয়ে টিকি রেখেছেন, গায়ে নামাবলী। মিসেস বিশ্বাসের ঠোঁটে রুজ নেই, কপালে তিলক। তিনি নিষ্ঠাভরে নিজেকে বিপত্তারিণী-ব্রতে নিযুক্ত করেছেন। সৌদামিনী বক্ বক্ ক'রে ব'কেই চলেছিলেন। ডানা যে তাঁর কথার কোনও জবাব দিচ্ছে না, সে খেয়ালই তাঁর ছিল না। তিনি যেন তাঁর শঙ্করীকে পেয়ে তার কাছেই বহুদিনকার সঞ্চিত সংবাদ সব ব'লে যাচ্ছিলেন অসঙ্কোচে। পাশের ঘরে রূপচাঁদের গলা পেয়ে তাঁর একটু হুঁশ হ'ল, মাথার কাপড়টা টেনে উঠে দাঁড়ালেন।

রূপচাঁদবাবু এসে গেছেন। এবার খাবার ঠিক করি তোমাদের। রূপচাঁদবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে তো?

আছে।

তা হ'লে পাশের ঘরেই বসবে চল।

বলা বাহুল্য, রূপচাঁদবাবুর সামনে ডানার যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তবু বেশ সপ্রতিভভাবেই সে উঠে দাঁড়াল এবং পাশের ঘরে গেল।

ডানাকে দেখে রূপচাঁদবাবু একটু অবাক হয়ে গেলেন।

এ কি, তুমি এখানে! আমি তোমার বাড়ি হয়ে ঘুরে এলাম।

কেন, কোনও দরকার ছিল ?

একটা খবর দিতে গিয়েছিলাম। আমাকে হঠাৎ এখান থেকে বদলি ক'রে দিয়েছে। খবর পেলাম, মিসেস সেনগুপ্তের ইঙ্গিতেই এটা নাকি হয়েছে। পুলিস সায়েব তাঁর নাকি চেনা লোক। মল্লিককেও তিনি বিপন্ন করেছিলেন। আনন্দমোহনের দয়াতে সে বেচারা ছাড়া পেয়েছে। মল্লিকের না হয় কিছু দোষ ছিল, কিন্তু আমাকে কি অপরাধে বদলি করা হয়েছে তা বুঝতে পারলাম না। তাই তোমার কাছে জানতে গিয়েছিলাম, তুমি কিছু জান কি না। তুমি রত্নপ্রভা দেবীর পেয়ারের লোক—হয়তো জানতেও পার।

আমি কিছুই জানি না। আপনার বদলির খবর আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তার দিকে। ডানার মনে হ'ল, তার দু গালে কে যেন দুটো ছুঁচ বিঁধিয়ে রেখেছে। তার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। আনত চক্ষে ব'সে রইল সে।

যাক, এ ব্যাপারটা শেষ হ'ল মোটামুটি এখন।

কবি সশব্দে মোটা খাতাখানা বন্ধ ক'রে দিলেন।

কি ব্যাপারে লিপ্ত ছিলে তুমি ? কবিতা লিখছিলে, না, আর কিছু ?—রূপচাঁদ প্রশ্ন করলেন।

কিছুক্ষণ আগে কবিতা লিখেছি একটা। কিন্তু এই খাতাটায় সমস্ত প্রজাদের একটা বর্ণানুক্রমিক সূচী ও পরিচয় লিখে ফেললাম। আচ্ছা, সহায়রাম ভট্টাচার্যকে চেন তুমি, নাম শুনেছ কখনও ?

না। কোথাকার লোক ?

এককালে তিনিই এই জমিদারির মালিক ছিলেন। রত্নপ্রভা দেবীর বাবা, মানে—অমরবাবুর শ্বশুর তাঁর কাছ থেকেই জমিদারিটা কেনেন। কিন্তু নদীর ধারের বিশ বিঘে জমি আর দুখানা বাড়ি তিনি বিক্রি করেন নি। একটা বাড়িতে ডানা থাকে আর একটাতে ওই সন্ন্যাসী থাকেন।

এ নিয়ে আরও আলোচনা চলত, কিন্তু সৌদামিনী এসে বললেন, লুচি ভাজছি, তোমরা বসবে চল।

রূপচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, ভাত নেই? মাংসে একটু বেশি ঝোল থেকে গেছে। চারটি গরম ভাত পেলে ভাল হ'ত।

ভাত আছে বইকি।

তবে চলুন।

ডানা খেতে ব'সে অবাক হয়ে গেল। সৌদামিনী এক হাতে দশ রকম নিরামিষ তরকারি, দু রকম ডাল, পায়েস, এমন কি পিঠে পর্যন্ত করেছেন। এত রকম এবং এমন সুস্বাদু নিরামিষ তরকারি সে জীবনে আর কখনও খায় নি। খেতে খেতে রূপচাঁদের বদলি নিয়েই আলোচনা হতে লাগল। পূর্ণিয়ায় বদলি করেছে তাঁকে। জায়গাটা বড় অস্বাস্থ্যকর, গেলেই নাকি ম্যালেরিয়া হয়। ডানা এ আলাপে যোগ দিল না। খাওয়া শেষ হবার পর রূপচাঁদ ডানার দিকে ফিরে বললেন, তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে? যাও তো পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি।

আমি একটু পরে যাব। আপনি যান।

রূপচাঁদ তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর চ'লে গেলেন। সকলের খাওয়ার পর সৌদামিনী খেতে বসলেন। ডানা তাঁর কাছে বসল গিয়ে।

এ কি, আপনি আর কিছু খাবেন না?

সৌদামিনী দুখানি রুটি, একটু তরকারি আর গুড় নিয়ে ছিলেন।

রাত্রে বেশি খেলে হজম হয় না। ভাত লুচি কিচ্ছু না। দুখানি শুকনো রুটি খাই, তাও রাত্রে দুবার উঠে জল খেতে হয়।

সৌদামিনী রান্নাঘরের এক ধারেই খেতে ব'সে ছিলেন। তিনি অনুভব করছিলেন, ডানা ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্যেই একটা আসন নিয়ে সাঁতসেঁতে মেঝেতে ব'সে আছে। বসবার ধরন দেখেই তিনি বুঝতে পারছিলেন, বেশ স্বচ্ছন্দভাবে ব'সে নেই সে। অসুবিধা হচ্ছে।

তুমি ওপরে ওঁর কাছে গিয়ে ব'স না। আমার কাছে আর বসতে হবে না। আমার খাওয়া হয়েও গেল।—একটি ছোট ঘটি বাঁ হাতে তুলে আলগোছে জল খেয়ে আহার শেষ করলেন তিনি।

তুমি ওপরে যাও। আমার সারতে-সুরতে এখনও ঢের দেরি।

আমি তবে চ লেই যাই। আর একদিন আসিব।

ডানা কবির সঙ্গে যখন ওপরে দেখা করতে গেল, তখন তিনি লিখছিলেন। ডানাকে দেখে বললেন, এ কবিতাটা নিয়ে যাও, বাড়ি গিয়ে প'ড়ো। এখানে পড়বার নয় ওটা।—ব'লে তিনি মুচকি হাসলেন।

এখনই লিখলেন নাকি ওটা?

না। আগেই লিখেছি। টুকে দিলাম এখন। অনেকদিন পরে এ ধরনের কবিতা লিখলাম। লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হচ্ছিল, শুনলে হয়তো তোমার ভালই লাগবে।

কি কথা?

এ ধরনের কবিতা আর লিখব না।

কেন?

লিখতে পারব না। যে জোয়ারটা এসেছিল সেটা নেবে যাচ্ছে।

কবি স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, কিন্তু সেই জোয়ারের মুখে নৌকো ভাসিয়ে যে অমরাবতীতে আমি উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে। যদি হাতে কোনদিন পয়সা হয় কবিতাগুলো ছাপাব, আর তুমি যদি আপত্তি না কর তোমাকে উৎসর্গ করব সেগুলো।

এর উত্তরে ডানা কিই বা বলবে, একটু মুচকি হেসে চ'লে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে একটা কথা তার মনে হ'ল। যে রকম যোগাযোগ ঘটছে, তাতে তার জীবনে নরপর্বের সূচনা হবে বোধ হয়। এখানে যে লোকটি দুষ্টগ্রহের মত তার জীবনের আকাশে উদিত হয়েছিলেন, তিনি অস্ত যাচ্ছেন। রূপচাঁদের বদলির খবরটা পেয়ে তার মনের একটা অংশ খুশিই হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'লেও এ কথা সে না মেনে পারছিল না যে, ওই লোকটিই তার নারীসত্তাকে এমন একটি মূল্য দিয়েছিল যা আর কারও দেবার সাহস হয় নি, এবং যে মূল্য পেয়ে সে গর্বই অনুভব করেছিল মনে মনে। তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নি সে নানা কারণে, কিন্তু তার বলিষ্ঠ পুরুষোচিত আকুলতাকে সে সত্যি সত্যি ঘৃণা করে নি কখনও। ভয় পেয়েছে, ঘৃণা করে নি। রূপচাঁদবাবু আর

তার জীবনে ছায়াপাত করবেন না, এই সম্ভাবনাতে তাই সে একটু বেদনাও বোধ করল যেন। বেদনাটা আরও বাড়ল কবির কথা ভেবে। তাকে দেখে তাঁর মনে যে জোয়ার এসেছিল তা নেবে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে আর তিনি কবিতা লিখবেন না—এ সংবাদটাও স্বস্তিকর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হ'ল না। মনে হতে লাগল, তার জীবন থেকে কি যেন একটা হারিয়ে গেল চিরকালের মত। পর-মুহূর্তেই মনে হ'ল, ভাস্কর এসেছে। মনে পড়ল তার কথা—তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব, আর কাউকে বিয়ে করব না। অপেক্ষা ক'রে আছে কি? হঠাৎ তার সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে উঠল খবরটা জানবার জন্যে।

মাসীমা—?

কে?

আমি চণ্ডী। কলকাতা থেকে একটা লোক চমৎকার একটা হলদে পাখী নিয়ে এসেছে। অমরবাবুর স্ত্রী পাঠিয়েছেন। বকুল মাসীমাকে তিনি একটা পাখী পাঠাবেন ব'লে গিয়েছিলেন। হয়তো এইটে সেই পাখী। তাই আমি আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম—

ও! আচ্ছা, চল দেখি।

সত্যিই রত্নপ্রভা বকুলবালার জন্যে চমৎকার একটা হলদে পাখী পাঠিয়েছিলেন। চিঠিও একটা লিখেছিলেন—

ডানা, শ্রীমতী বকুলের জন্যে হলদে পাখী পাঠালাম একটা। এই বছরেরই বাচ্চা। তাঁকে পাখীটা পাঠিয়ে দিও। তোমার সমস্যার, আশা করি, সমাধান হয়ে গেছে। অনিলের (মিস্টার গুপ্ত) চিঠি পেয়েছি। আমরা এবার কাশ্মীর পাড়ি দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে ঠিকানা জানাব। কালই আমাদের রওনা হওয়ার কথা। আশা করি, তোমরা সব কুশলে আছ। পাখীগুলোর সম্পূর্ণ ভার তোমার উপরেই রইল। ওদের সম্বন্ধে যা ভাল মনে কর ক'রো। যদি ইচ্ছে কর ছেড়ে দিতেও পার। ওঁর এখন চিড়িয়াখানা করার দিকে তত ঝোঁক নেই। ঝোঁক হয়েছে বিদেশে গিয়ে (ইয়োরোপে, আমেরিকায়, ও-দেশের সমুদ্রের ধারে ধারে) বিদেশী পাখীদের পরিচয় লাভ করা। টাকার যোগাড়

যদি হয় চ'লে যেতে পারি। সুতরাং তুমিই ওই পক্ষীনিবাসের সর্বেশ্বরী হয়ে থাক। ওখানকার জমিদারির আয় থেকেই তোমাদের খরচ চ'লে যাবে। আমরা ওখান থেকে আপাতত কিছু নেব না ঠিক করেছি। আনন্দমোহনবাবুকে আমার প্রণাম জানিও। তুমি স্নেহ-আশীর্বাদ নিও। ইতি রত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

ডানা যতক্ষণ চিঠিটা পড়ছিল চণ্ডী সোৎসুকে চেয়ে ছিল তার মুখের দিকে। পড়া শেষ হতেই জিজ্ঞেস করলে, আমাদেরই পাখী, নয়?

হ্যাঁ, নিয়ে যাও! আমার চাকরটাই গিয়ে দিয়ে আসুক। আমি চিঠিও লিখে দিচ্ছি একটা। দাঁড়াও একটু—

চিঠিটা রূপচাঁদবাবুরও হাতে পড়বে এই সম্ভাবনাটা মনে হ'ল তার। তাই অতি সংযত ভাষায় ছোট চিঠি লিখলে একটা—

শ্রীমতী বকুলবালা, আপনার জন্যে রত্নপ্রভা দেবী কলকাতা থেকে একটা হলদে পাখী উপহার পাঠিয়েছেন। পাঠালাম এই সঙ্গে। শুনলাম, আপনারা বদলি হয়ে গেছেন। যাব একদিন আপনাদের বাড়িতে। নমস্কার জানবেন। ইতি ডানা

পাখী নিয়ে ওরা যখন চ'লে গেল, তখন চুপ ক'রে ব'সে রইল সে বারান্দায় একা। মনে হ'ল, সে যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে। চোখে পড়ল কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ উঠেছে বটগাছের মাথার উপরে। একটা উপমা মনে এল, সংস্কৃত কাব্যের উপমা, বটগাছটা যেন ধূর্জটির জটাজাল, সেই জটাজালে সুশোভিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র। চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল—পাপিয়াটা ডেকে উঠল দূরের একটা গাছ থেকে। তার আকুল স্বরে ডানার মনের আকুলতাই ফুটে উঠল যেন। আরও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। তারপর ঘরে ঢুকে শোবার আয়োজন করতে লাগল। ব্লাউসটা খুলতে গিয়েই কবিতাটা বেরিয়ে পড়ল। সে কবিতার কথা ভুলেই গিয়েছিল। আলোটা কমানো ছিল টেবিলের উপর। সেটা বাড়িয়ে দিয়ে একটু জুৎ ক'রে ব'সে কবিতাটা পড়তে লাগল—

ঝাঁ ঝাঁ রোদে রুক্ষ মাঠের মাঝ দিয়ে
একা চলেছিলে তুমি।

কাছাকাছি আর কেউ ছিল না, আমিও না,
তুমি নিজেও ছিলে না নিজের কাছে ;
আমি যে সুদূর লোক থেকে দেখেছিলাম তোমাকে
হয়তো তারই উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়েছিলে,
কিন্তু নিজেই তা জানতে না ॥
মনে হচ্ছিল তৃষ্ণার্ত মাঠের আর্ত কামনা মূর্ত হয়েছে।
তোমার চলাটা মনে হচ্ছিল প্রবাহ ॥
স্বচ্ছতোয়া তন্বী তটিনীর উপর নেমেছে নব জলধর,
এক জোড়া খঞ্জন উড়ছে,
নীল শাড়িতে ফুটেছে আকাশের মহিমা,
চলার বেগে অকুণ্ঠিত ঔদাসীন্য ॥
রুক্ষ মাঠের তৃষ্ণার্ত কামনা যে ছবি সেদিন এঁকেছিল
জানি তুমি তা নও,
কখনও হবে না তা-ও জানি।
কিন্তু সত্যি তুমি যা
তা নিয়ে স্বপ্নের ছবি আঁকা যায় না।
তোমার ভঙ্গুরতা তোমার ক্ষণিকের সত্যকে,
যে রূপে তুমি সকলের কাছে পরিচিত হয়েছ তাকে
চুরমার ক'রে দেবে একদিন।
বেঁচে থাকবে শুধু এই স্বপ্নটুকু।
অলীক রঙে আঁকা এই ছবিটি, যা তুমি নও,
যা তুমি হবে না ॥

ডানা কবিতাটা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বার দুই পড়ল। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার অধরে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল একটি। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে ব'সে থেকে সে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখলে কবিকে নয়, ভাস্কর বসুকে।

[ক্রমশ]

"বনফুল"

গ্রাহক এবং পাঠকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী ১৩৬২ বৈশাখ হইতে 'শনিবারের চিঠি'র আয়তন বৃদ্ধি করিয়া উহাকে ক্রাউন চার-পেজী (অর্থাৎ বাংলা মাসিক পত্রিকার প্রচলিত সাইজ) করা হইবে। এখন 'শনিবারের চিঠি'তে যত পাঠ্যবস্তু যায় (৯ ফর্মা), রূপান্তরিত আকারে (১৪ ফর্মা) উহার প্রায় দ্বিগুণ পাঠ্যবস্তু উহাতে ধরানো সম্ভব হইবে। আমাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নব-কলেবর 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি সংখ্যার দাম ধার্য করা হইল বারো আনা মাত্র। সডাক বার্ষিক মূল্য ন' টাকা, ষাণ্মাসিক সাড়ে চার টাকা।

এই চৈত্র সংখ্যায় যাঁহাদের চাঁদার মেয়াদ শেষ হইল তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নূতন হারে চাঁদা ৩১শে চৈত্রের মধ্যে আমাদের কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা আর গ্রাহক থাকিতে চান না তাঁহারাও পূর্বাহ্নে পত্রদ্বারা জানাইয়া দিবেন—নচেৎ ভি. পি. ফেরত হইলে আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মোট কথা, আগে কোনরূপ নির্দেশ না পাইলে যথারীতি ভি. পি.-যোগেই পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ
'শনিবারের চিঠি'
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড : কলিকাতা-৩৭

অভিনয়

বসবার ঘরের বড় ঘড়িতে গম্ভীর শব্দে বাজনা শুরু হতেই ঘোষাল মশাই চমকে উঠলেন। চেয়ে দেখলেন, ছোট বড় দুটো কাঁটাই তখন বারোটার ঘরে গিয়ে মিলেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ দুটো আর একবার রগড়ে নিয়ে হাতের 'হিমালয় ও সাধুসঙ্গ'খানা সোফার ওপর উলটে রাখলেন। তারপর বাইরে বেরিয়ে রাস্তার দিকে চাইলেন চোখে প্রচুর আগ্রহ নিয়ে।

গেটে দরোয়ান তখনও জেগে ঢুলছে, নেশাখোরের মত ঝিমুনি বাইরের উজ্জ্বল বাতিতে বর্ষার বাড়ন্ত বাগানের অনেকখানি আলোকিত দেখাচ্ছে। কয়েক রকমের ক্যাক্টাসের ঝোপ, জলে ও আলোয় চকচক করছে তাদের কাঁটাগুলো; পাশেই ক্যালেডিয়ামের বন—সাহেবের বাড়িতে বাংলায় মনসা আর বাহারে কচু বললে যাদের ইজ্জৎ যায়। ড্রেসিনা আর ডায়াফেনবেচিয়া, বারান্দার সিঁড়িতে মাটির গামলায় প্যানাক্স, এরেলিয়া আর লাইকপডিয়ম। গাড়ি-বারান্দা থেকে কয়েকটা ঝোলানো অর্কিডের ছায়া পড়েছে জমিতে। সিরসিরে হাওয়ায় একটা হাল্‌কা ফুলের থোকা অল্প অল্প দুলছে।

সামনের রাস্তাটা অন্ধকারে নিঃসাড় প'ড়ে আছে, প্রাণের স্পন্দন নেই তার বুকে। ঘোষাল মশাই আর এক দিকে চাইলেন। এদিকে ফুটেছে কয়েকটা দিশী ফুল, কয়েক রকমের জবা, রাইবেল আর স্বর্ণ-চামেলি। বড় বড় ঘাসের ভেতরে এক থোকা রজনীগন্ধা ফুটেছে অনাদর-অবহেলায়। ভাবনায় ঘোষাল মশায়ের প্রশস্ত কপালখানা তখন কুঁচকে উঠেছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

ঘোষাল মশাই শাশ্বতীর অপেক্ষা করছেন। তাঁর একুশ বছরের স্বাধীন মেয়ে মঞ্চে অভিনয় করতে গেছে বন্যাপীড়িত নরনারীর সাহায্য-কল্পে। এই বল্‌গাহীন জীবনযাত্রায় বৃদ্ধের চিরদিনের ঘৃণা, অথচ নিজের সংসারেই এটা তাঁর স্বীকার করতে হয়েছে। শাশ্বতী তাঁর শেষ বয়সের সন্তান। স্ত্রীর বিনিময়ে কন্যালাভ করেছেন, এই নিষ্ঠুর সত্য তাঁর জীবনে ধ্রুব হয়ে আছে। শাশ্বতীও তাই পিতার কর্তব্য-কঠোর শাসনের আস্বাদ পায় নি, পেয়েছে স্নেহ-কোমল দুর্বল হৃদয়ের

লালন। যার সব সময়েই ভয় "যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই!" মাতৃহীন কন্যাও পিতার এই দুর্বলতা নিয়ে খেলা করছে উচ্ছৃঙ্খলভাবে।

বার কয়েক টেলিফোন করেছিলেন রঙ্গমঞ্চে। রাত্রি দশটায় অভিনয় ভেঙেছে খবর পেয়েছেন। রাত এগারোটার আগেই যে যার মত বেরিয়ে পড়েছে গাড়িতে ও হেঁটে। মেয়ে এখনও এসে পৌছল না। দুর্ভাবনা হবে না কেন, পিতার? প্রাচীন বন্ধু হীরেনবাবুর কথা মনে পড়ল—যাকে দুর্নীতি ব'লে মনে করেন, তাকে প্রশ্রয় কেন দেন? এ অভিযোগের জবাব নেই। শাশ্বতীর বন্ধুদের কথাও তাঁর মনে পড়ল—নৃত্যে ও জলসায়, অভিনয়ে ও পার্টিতে মেয়ের যে খ্যাতি, তাতে উৎসাহ দিতে কেন তিনি কৃপণ? এ অনুযোগের জবাব তিনি হীরেনবাবুকে দেন। বলেন, দুর্নীতি দমন করার ক্ষমতা নেই ব'লে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে—এ যুক্তি মানতে পারি না হীরেনদা। আমার সম্মতি নেই বুঝেও মেয়ে যদি চোখ বুজে থাকার ভান করে, এতে বাধা দিয়ে উল্‌টো ফলই হবে ব'লে আমার বিশ্বাস। আমি ভয় পাই তার ভবিষ্যৎ ভেবে।

হঠাৎ এক সময় মোটরের ভেঁপু বেজে উঠল। খটমট ক'রে দরোয়ান উঠল জেগে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে গেটটা খুলে দেবার আগেই ছোট টুরারখানা ঘ্যাঁস ক'রে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আর এক দমে এসে দাঁড়াল গাড়ি-বারান্দার ভেতর।

চালকের গদি থেকে নামল শাশ্বতী। পায়ের নূপুর খুলে ফেলেছে, কিন্তু চঞ্চল চরণে নিক্কণ উঠছে সার্থকতার। গর্বদীপ্ত গৌর মুখে অসহিষ্ণু অহমিকা। উজ্জ্বল সোনালী রঙের শিফনে দেহটাকে ঢাকবার চেষ্টা সৌন্দর্যকে অনাবৃত করেছে আরও বেশি। রেখার মত সূক্ষ্ম কালো পাড়টুকু মিশে গেছে ভাঁজের ভেতর। খানিকটা এলোমেলো চুলের ভেতর কয়েকটা গোলাপের পাপড়ি মুগ্ধ দর্শকের জয়ধ্বনি বহন ক'রে এনেছে। ও-পাশের গদি থেকে নাট্যকার সাত্যকি সেন নামল। সাধারণ পুরুষের চেয়ে খানিকটা লম্বা। ভাবনা কিংবা প্রতিভার ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলে। মোটা কালো শেলের চশমার পুরু কাচের ওপর বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ছে। রাশিকৃত ফুলের মালা ও

তোড়া নামাতে নামাতে সাত্যকি বললে, আজ তোমার একার জয়ের দিন নয় শাশ্বতী, আমারও জয়ের দিন। 'মানুষের ক্ষুধা' যখন লিখেছি তখন জানতুম না, সে ক্ষুধায় এত প্রাণ এত রোদন এত আকর্ষণ আছে। তোমার অভিনয়ে আজ শিরায় শিরায় তার তীব্রতা জ্বালা ধরিয়েছে। যা ছিল উপলব্ধির বাইরে, আজ তার নিবিড় অনুভূতি কাঁপন ধরিয়েছে বুকের রক্তে। অমৃত ও বিষ—দুটো পাত্রই সামনে দেখলুম। নেশাখোরের মত আমি তখন ঝিমুচ্ছি—কড়া আফিমের মত নির্জীব নেশা। দুটো পাত্রই প'ড়ে রইল। ছুঁতে সাহস হ'ল না।

শাশ্বতী ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, এমন ক'রে ব'লো না সাত্যকি। তোমার সৃষ্টিই অপূর্ব, আর কোন মেয়ে হয়তো এ সৃষ্টিকে আরও সজীব ক'রে তুলতে পারত।

সাত্যকির এ কথা বিশ্বাস হ'ল না। বললে, আমি শুধু প্রতিমা গড়েছিলুম—শুধু খড় আর মাটির প্রতিমা। তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছ তুমি। তোমার ধুপধুনো শঙ্খঘণ্টার ধ্বনির ভেতর দলে দলে লোক যে প্রতিমা দেখে ভক্তিতে ও ভাবে আপ্লুত হ'ল আজ, এ তোমার পূজার মাহাত্ম্য। তার আগে এ দিব্যজ্যোতি ছিল না দেবীর মুখে। মাটির মূর্তি মাটিরই পুতুল, ছিল প্রাণহীন। সাত্যকির নিশ্বাসে ছিল উষ্ণ আবেগ।

সিঁড়ির দিকে ঘুরে আসতেই বেয়ারা ছুটে এল ত্রস্ত পদক্ষেপে। সেলাম ক'রে ফুলের বোঝাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিল।

শাশ্বতী প্রশ্ন করলে, বাবা শুয়ে পড়েছেন তো?

সঠিক খবরটা তার জানা ছিল না। অনেক রাত পর্যন্ত মনিবের উদ্বেগ লক্ষ্য করেছে সে, তারপর সে-ই ঘুমিয়ে পড়েছে দেয়ালে হেলান দিয়ে। বললে, হ্যাঁ, একটু আগে।

কথাটা মিথ্যে নয়। মোটরের ভেঁপু শুনেই তিনি জেনেছিলেন মেয়ে ফিরেছে। অন্ধকারে চোরের মতন পালিয়ে গেছেন নিজের শোবার ঘরে। তাঁর দুর্বলতা নিয়ে মেয়ে যে খেলা করে, সেটা লুকিয়ে বেড়াবার চেষ্টা তাঁর চিরকালের। জামা কাপড় ছেড়ে আলো নিবিয়ে দেহটা এলিয়ে দিয়েছেন বিছানায়, কান দুটো প'ড়ে ছিল বাইরের বারান্দায়।

শাশ্বতী সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যাচ্ছিল, থমকে থেমে বললে, চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

সাত্যকি বাধা দিলে। এই তো ডোভর লেন—দু মিনিটের পথ।

শাশ্বতী হাসতে হাসতে বললে, দু মিনিটের পথও অনেক সময় শেষ হয় না সাত্যকি, এটুকু অতিক্রম করবার সময়ও মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে।

কটাক্ষ ক'রে সাত্যকি বললে, এ যে কুঞ্জগলি শ্যামরায়!

শাশ্বতী হাসতে হাসতে উঠে গেল।

এই সৌজন্যবর্জিত বিদায়ে সাত্যকি ক্ষুব্ধ হ'ল না। বরং একটা আন্তরিকতার আভাস লক্ষ্য ক'রে তৃপ্ত হ'ল। ধুতির লম্বা কোঁচাটা বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে পা বাড়াল নিজের বাড়ির উদ্দেশে।

পরদিন দেরিতে শাশ্বতী চায়ের টেবিলে এল। ঘোষাল মশাই তাঁর স্নান আহ্নিক সেরে অনেকক্ষণ থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। মেয়েকে অনেক-কিছু বলবেন ভেবে রেখেছিলেন, তাই নিত্যকার মত প্রশান্ত আনন্দে উজ্জ্বল ছিল না মুখখানা। গম্ভীর ও নির্বাক দৃষ্টিতে চাইলেন মেয়ের দিকে। শাশ্বতী লক্ষ্য ক'রে বললে, কাল দেরিতে ফেরার জন্যে রাগ কর নি তো বাবা? দূরে না ব'সে শাশ্বতী পিতার কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

ঘোষাল মশাই বড় অস্বস্তি বোধ করলেন। বলবার কথাগুলো কেমন সব এলোমেলো হয়ে এল। এদিক সেদিক চেয়ে দেখলেন। কাছে কেউ নেই, যে জানে তাঁর গতরাত্রের উদ্বেগের কথা। গোপী চায়ের গরম জল আনতে বেরিয়ে গেছে। আমতা আমতা ক'রে বললেন, কাল রাতে বুঝি খুব দেরিতে ফিরেছ?

শাশ্বতী পিতাকে চেনে, তাঁর সহজ স্নেহের সুরের অভাব লক্ষ্য ক'রে বললে, লক্ষ্মী বাবা আমার, রাগ ক'রো না।

নীচু হয়ে দুটো হাত দিয়ে বাপের গলাটা জড়িয়ে ধরল।

ঘোষাল মশাই ঘাবড়ে গেলেন, ভুলে গেলেন তাঁর শাসন করবার সংকল্পের কথা। কী হবে শাসন ক'রে, যাকে পরের হাতে তুলে দিতে

হবে দুদিন পরে। হাত দুটো পেছনের দিকে বাড়িয়ে বললেন, নাও, এবারে চা ঢালো, সেই সকাল থেকে উপোস ক'রে ব'সে আছি।

হাসতে হাসতে মেয়ে বললে, তা হ'লে ক্ষিধেয় অমন হাঁড়িমুখ হয়েছিল বল।

ঘোষাল মশাই বললেন, ক্ষিধের আর দোষ কি? তোমাদের সকাল যখন শুরু হয়, আমাদের তখন শেষ হয়েছে। অলস হয়ে তোমরা ক্ষিধে কমিয়েছ। পরিশ্রম ক'রে আমরা সেটা বাড়াতে চেষ্টা করি। বেশি খেতে তোমরা লজ্জা পাও, আমরা বাজি রেখে বেশি খাই। এসব কারণেই বোধ হয় তোমরা আমাদের অসভ্য যুগের মানুষ ব'লে দূরে ঠেলতে চেষ্টা করছ দিন দিন।

হৃষ্টচিত্তে এবারে শাশ্বতী ঘুরে এসে একখানা চেয়ার দখল ক'রে বসল। গোপীও ফিরে এসেছে গরম জল নিয়ে। মাখনের ডিশটা টেনে নিয়ে ঘোষাল মশাই রুটিতে মাখন মাখাতে শুরু করলেন, শাশ্বতী টেনে নিল খবরের কাগজখানা। টী-পটটা নামিয়ে রেখে গোপী পরিজের প্লেটটা এগিয়ে দিল। ঘোষাল মশাই 'ও হ্যাঁ' ব'লে সেটা টেনে নিলেন। খানিকটা দুধ ঢেলে একটু চিনি মেশালেন। তারপর বড় চামচেয় তাড়াতাড়ি শেষ করবার চেষ্টায় লেগে গেলেন।

গোটা কয়েক পাতা উল্টে শাশ্বতী চেঁচিয়ে উঠল, ঘোষাল মশাই উঠলেন চমকে।

তোমার মেয়েকে চিনতে পার বাবা? ব'লেই ঘুরে এল ছবি দেখাবার জন্যে। বন্যা-দুঃস্থ নরনারীর সাহায্যকল্পে অভিনয়ের বিরাট আয়োজন। 'মানুষের ক্ষুধা'য় নায়িকার ভূমিকায়—শ্রীমতী শাশ্বতীর অপূর্ব সাফল্য।

ঘোষাল মশাই আগেই দেখেছিলেন এ খবর। অলক্ষ্যে রোমাঞ্চ জেগেছিল দেহে, তার পরেই মিইয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নীতির চাবুকে। এবারে রোমাঞ্চ জাগল না, শুধু গম্ভীর হলেন মনোভাব গোপনের চেষ্টায়।

শাশ্বতী ফিরে এল তার নিজের জায়গায়। পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে দ্রুতগতিতে প'ড়ে গেল পুরো কলমটা। আর কয়েকটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আর কোন কাগজ নাও নি আজ গোপী?

গোপী মাখন মাখিয়ে কয়েকখানা টোস্ট এগিয়ে দিচ্ছিল, পোচের প্লেটটাও। বললে, না দিদি।

একখানা রুটি তুলে নিয়ে শাশ্বতী বললে, আজ তোমার সব কাগজগুলো নেওয়া উচিত ছিল। দরোয়ানকে পাঠিয়ে দাও এক্ষুনি, বাকি কাগজগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুক।

গোপী 'আচ্ছা' ব'লে বেরিয়ে গেল।

ঘোষাল মশাই খাওয়া শেষ ক'রে একটা চুরুট ধরালেন। সাহেবিয়ানার এই শেষ চিহ্নটা অনেকবার ছাড়বার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মেয়ের এই গন্ধটা ভাল লাগে ব'লে ছাড়তে পারেন নি। নেশা না ছাড়বার এও এক অদ্ভুত যুক্তি বটে।

কাগজখানা টেবিলে রেখে শাশ্বতী খাওয়ায় মন দিল। পাখার হাওয়ায় উড়তে লাগল সেখানা। ঘোষাল মশায়ের দৃষ্টি ছিল প্রথম পাতার ছবিগুলোর ওপর—অনাহারক্লিষ্ট নিরাশ্রয় কঙ্কালের শ্রেণী ফুটপাথের ওপর গাদাগাদি হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। মায়ের বুকের দুধ গেছে শুকিয়ে, কোলের শিশুকে বাঁচাতে না পেরে চুল ছিঁড়ছে দু হাত দিয়ে, আর ভৎর্সনা করছে নিজের ভাগ্যকে। এর বেশি আর সে কী করতে পারে!

শাশ্বতী বললে, তুমি দেখেছ বাবা, কী রকম লোক মরছে পথে-ঘাটে! ইউনিভার্সিটিতে ঢোকবার সময় রোজই দেখছি, মিউনিসিপ্যালিটির লরি বোঝাই হয়ে মড়া চালান হচ্ছে গঙ্গায়—ছেলে বুড়ো মেয়েমানুষের মড়া। কী বীভৎস দৃশ্য! গায়ে কাঁটা দেয়।

ঘোষাল মশাই উত্তর না দিয়ে চুরুট টানতে লাগলেন। শাশ্বতীই আবার বললে, এ ক্ষতির পূরণ হবে না কোনদিন।

ঘোষাল মশাই সায় দিলেন না; বললেন, ব্যক্তিগতভাবে কথাটা সত্য। যে লোকটা গেল, সে লোকটা আর ফিরে আসবে না। কিন্তু জাতিগত বা কালগত ভাবে কোন ক্ষতিই অপূর্ণ থাকে না। আজ যে ফসল ভেসে গেল বন্যার জলে, কাল বন্যার জল নেমে গেলেই দশগুণ ফসল উঠবে নতুন পলিমাটির স্তর থেকে। মুখে খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে

আবার বললেন, চীনের বন্যার কথা তোমার অজানা নেই। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক ভেসে থাকে। লক্ষ লক্ষ লোক এসে আবার তাদের স্থান পূরণ করছে। চীনের জনসংখ্যা কোনদিন কমে না।

শাশ্বতী বললে, এই দুঃস্থদের সাহায্যের জন্যেই আমরা কাল অভিনয়ের আয়োজন করেছিলুম। আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি সুজিত বোসকে তো চেনো বাবা—ব্যারিস্টার অরুণ বোসের ছেলে, তারই উদ্যোগে হ'ল।

ঘোষাল মশাই মাথা নাড়তে লাগলেন। শাশ্বতী বললে, 'মানুষের ক্ষুধা' সাত্যকি সেনের এক অপূর্ব লেখা। এত শক্তি এত প্রাণ এত প্রমিস যে তার মধ্যে ছিল, আমরা জানতুম না। কাল রাতেই চড়া দামে তার বইটা বিক্রি হয়ে গেল। শর্ত ছাড়তে সে রাজী হচ্ছিল না, তারপর কেন যে ছেড়ে দিল সে নিজেই জানে না।

ঘোষাল মশাই চুরুট মুখে নিঃশব্দে শুনতে লাগলেন।

একটু ক্ষুণ্ণ সুরে শাশ্বতী বললে, তুমি দেখতে এলে না বাবা, কত খুশি হতে। তোমার মেয়ে ব'লে চিনতেই পারতে না। জ্যাঠা মশাই তো গিয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রো আমি ঠিক বলছি কিনা।

ঘোষাল মশাই চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন, হীরেনদা গিয়েছিল দেখতে? তোমাদের নাটক দেখতে?

শাশ্বতী এক গাল হেসে বললে, তাঁর দাড়ি কি ভুল হতে পারে বাবা! চুপটি ক'রে ব'সে ছিলেন এক কোণে, আমি ঠিক চিনেছি।

ঘোষাল মশায়ের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না মেয়ের কথা। সারাজীবন অধ্যাপনা ক'রে কাটাল যে লোক, অবসরের জীবনে তার নীতিজ্ঞান কি লোপ পেল? শাশ্বতী বললে, তুমি বিশ্বাস করছ না বাবা? আমার চিনতে একটুও ভুল হয় নি। দেখতে দেখতে সবাই যখন হাততালি দিয়ে উঠেছে, আমি ঠিক দেখেছি জ্যাঠা মশায়ের দাড়ি দুলে দুলে উঠছে। তুমি জিজ্ঞেস ক'রো জ্যাঠা মশাইকে।

এ সত্য সমর্থিত হ'লে ঘোষাল মশাই সুখী হবেন না। কন্যার

ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁর সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেন, তিনি এই অনাচারের সমর্থক জানলে মর্মাহতই হবেন। তাই জবাব না দিয়ে আরও খানিকটা ধোঁয়া নিলেন মুখে।

বাইরে অনেকক্ষণ থেকেই অল্প অল্প কলরব শোনা যাচ্ছিল। সেদিকে মনোযোগ পড়তেই শাশ্বতী জিজ্ঞেস করল, বাইরে কারা গোলমাল করছে গোপীনাথ?

গোপীর জানা ছিল। বললে, ভিখিরীরা ভাতের জন্যে অপেক্ষা করছে।

সাত-সকালে ভিখিরী এসে জুটেছে বাড়ির ভেতর?

শাশ্বতী অকস্মাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘোষাল মশাই কিছু বলতে গিয়েছিলেন, সুযোগ হারিয়ে থেমে গেলেন।

শাশ্বতী দেখল, মৃত্যুপথযাত্রীদের একটা ছোট দল গাড়ি-বারান্দার ভেতর জাঁকিয়ে বসেছে। কয়েকটা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সাত-আটটি মেয়ে-পুরুষ গভীর আগ্রহের সঙ্গে পরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছে।

শাশ্বতী চেঁচিয়ে উঠল, কে ঢুকতে দিলে এই হতভাগাদের?

গোপী বেরিয়ে এসেছিল পেছনে, বললে, গেটের বাইরে খাবি খাচ্ছিল ভোরবেলা, বাবু ডেকে এনেছেন। ঠাকুর ভাত রাঁধছে এদের জন্যে।

শাশ্বতীর নাকটা কুঞ্চিত হয়ে এসেছে ঘৃণায়, বললে, না না গোপী, তুমি এদের বার ক'রে দাও। এদের দেখলে আমায় ভয় হয়, ঘেন্না করে জীবনে।

ঘোষাল মশাইও বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। আস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বললেন, না, ওরা যাবে না। ওরাও খাবে আমার সঙ্গে।

শাশ্বতী আহত স্বরে বললে, এ কী বলছ তুমি বাবা?

ঘোষাল মশাই তেমনি স্থির-দৃঢ়স্বরে বললেন, দরোয়ানকে তুমি ব'লে দেবে গোপী, আমার দরজা থেকে যেন কেউ অভুক্ত ফিরে না যায়।

পিতার এমন কণ্ঠস্বরের সঙ্গে শাশ্বতী পরিচিত নয়। ক্ষুব্ধ হ'ল,

আহত হ'ল, বুঝি বা অহংকারেও আঘাত লাগল। কিন্তু মুখে কথা যোগাল না।

সিঁড়ির নীচে হীরেনবাবুর গলা শোনা গেল: এরা বুঝি আমার মায়ের নিমন্ত্রিতের দল? প্রচুর আনন্দের আভাস তাঁর কণ্ঠস্বরে।

তিনি বলতে লাগলেন, সত্যি, প্রাণ না কাঁদলে কি অভিনয়ে প্রাণ আসে?

নীচে একখানা গাড়ি দাঁড়াবার শব্দে পেছন ফিরে চাইলেন। গাড়ি থেকে নামল সুজিত বোস—কালকের রাতের অভিনয়ের উদ্যোক্তাদের একজন। ভিখিরীরা কলরব ছেড়ে তৎক্ষণ স'রে দাঁড়িয়েছে। একটা অপ্রসন্ন দৃষ্টি তাদের দিক থেকে সরিয়ে উপস্থিত সকলকে নমস্কার ক'রে সে বললে, শাশ্বতী দেবীকে অভিনন্দন জানাতে এলুম। সার্থক হয়েছে তাঁর অভিনয়।

তার হাতে এক গোছা খবরের কাগজ।

সম্মতিতে হীরেনবাবুর পরিচ্ছন্ন দাড়ি বোধ হয় একটু দুলে উঠল। বললেন, অনেক টাকা বোধ হয় উঠেছে কাল রাতে?

অনাসক্ত ভাবে জবাব দিল সুজিত, নিমন্ত্রিতই ছিলেন বেশি; তা ছাড়া কাগজওয়ালাদেরও কিছু দিতে হ'ল খবর ছাপবার জন্যে। মনে হচ্ছে কর্মীদের খাওয়াতে কিছু ঘাটতিই পড়বে।

ঘোষাল মশাই এতক্ষণ চুরুট টানছিলেন ঘন ঘন। এবার অসহিষ্ণু ভাবে ব'লে উঠলেন, অভিনয় তা হ'লে সার্থক হয়েছে বল!

খোঁচাটা বড়ই স্পষ্ট, লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে শাশ্বতীর মাথা কাটা গেল ব'লে মনে হ'ল। ইচ্ছে করছিল পালিয়ে যায় এঁদের সামনে থেকে।

নীচে কোলাহল এবারে চরমে উঠল। অনেকক্ষণের অপেক্ষার পর সেই পরম প্রাপ্তির মুহূর্ত আসছে। এক গোছা শালপাতা ছড়িয়ে দিয়ে ঠাকুর গেছে খিচুড়ির হাঁড়ি আনতে।

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

বাঁশরি ও কৃষ্ণচূড়া

দোতলার জানলায় তাকালেই চোখে পড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটা। প্রথম ভোরের রূপালী আলোয় কী সুন্দরই না দেখায় গাছটাকে! রাস্তার ওপর যেন মস্তবড় একটা ছাতা, সবুজ কাগজে লাল কারুকার্য খচিত। গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল ভোরের আকাশে এক পরত সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। রাস্তার ওধারে ফ্যাক্টরি-ঘরের চিমনিতেও সেই রঙের স্পর্শ লেগেছে।

বারো বছরের রাণু এক মুহূর্ত চোখ ফেরাতে পারে না।

ওই গাছে কি দেখছিস রাণু?—ঘরের ভেতর থেকে বাঁশরির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। রাণু উত্তর দেয় না। আস্তে আস্তে বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে আসে। বাঁশরি তখন খোকনকে ডাকছে—ও খোকা! খোকন! ওঠ্ না রে। ওঠ্। রাস্তায় জঞ্জাল কুড়োতে যেতে হবে না আজ? এতক্ষণ আর সব লোকেরা নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে। দেরি ক'রে গেলে কিছুই পাবি না।

এরা কিন্তু ভিখারী নয়। দুঃস্থ নিম্ন-মধ্যবিত্ত। পনের টাকা ভাড়া দিয়ে শহরের উপকণ্ঠে কারখানা অঞ্চলে একখানি ঘর ভাড়া ক'রে থাকে এরা। ছোট সংসার—স্বামী, স্ত্রী, একটা ছেলে, একটা মেয়ে। তাও অচল। কতকাল যোগেশ বেকার। অনেকদিন আগে ভোলানাথ-অপেরা-পার্টিতে সে ক্ল্যারিওনেট বাজাত। শুধু ক্ল্যারিওনেট কেন, প্রায় সব কটা রাস্তযন্ত্রেই তার সমান অধিকার। বিশেষ, সানাই-বাজিয়ে হিসাবে তার নাম আছে। 'কমিক' গানও সে গাইতে পারে।

সেই যোগেশ আজ অন্নবস্ত্রহীন, বেকার। ভোলানাথ-অপেরা-পার্টি উঠে যাওয়ার পর থেকে আজ কতকাল যোগেশের কোন নির্দিষ্ট কাজ নেই। যা হোক কিছু একটা সামান্য কাজের জন্য সিনেমা, থিয়েটার ও অর্কেস্ট্রা পার্টিগুলোর পিছু পিছু সে কত ঘুরেছে। কিন্তু বৃথাই। আজকাল ছিটেফোঁটা কাজের ওপর তাকে নির্ভর করতে হয়। বিয়ে-বাড়িতে সানাই, শ্রাদ্ধ-বাসরে কীর্তন—কখন কোথা থেকে কে ডাকবে, সেই আশায় দিনের পর দিন ব'সে থাকতে হয় তাকে। কখনও বা মাসের পর মাস কেটে যায়, কপালে কিছুই জোটে না।

ভাগ্যিস বাঁশরি বিয়ের আগে টেলারিং ইস্কুলে শার্ট-পাঞ্জাবি ইত্যাদি তৈরি করা শিখেছিল! পাড়ার 'রেডিমেড স্টোর্সের জন্য ডজন-দরে আজকাল জামা সেলাই করে বাঁশরি। দৈনিক এক টাকা রোজগার করতে তাকে গড়-পড়তা ছ'ঘণ্টা সেলাই করতে হয়। মেশিনটা অবিশ্যি রেডিমেড স্টোর্স তাকে ধার দিয়েছে। বাঁশরি জানে, ওরা তার প্রাপ্য মজুরির অনেক কম দিচ্ছে। তবু সে ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। ওই একটা টাকা আয় না থাকলে কি যে হ'ত সে ভাবতেই পারে না।

রাণু ও খোকন পাড়ার অবৈতনিক ইস্কুল—রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনে পড়ে। পাশাপাশি বাড়িতে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিভাগ। ভাই বোন একসঙ্গে ইস্কুলে যায়। মাইনেটা লাগে না, কিন্তু বই-পত্র, খাতা-পেনসিল, কাপড়-জামা সব খরচই তো রয়েছে। পড়ুয়ারাই একদিন সমস্যার সমাধান ক'রে দিলে। ফ্যাক্টরি অঞ্চলে বা রাস্তায়, সপ্তায় দুদিন ক'রে প্রচুর জঞ্জাল ফেলে ওরা। কাগজ, জং-ধরা লোহা-লক্কড়, টিন, ভাঙা প্যাকিং বাক্স, আরও কত কি! ভিখিরীদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গরিব ছেলেমেয়ে ওই সব কুড়িয়ে বাজারে পুরনো পচা মালের দোকানে ওজন-দরে বিক্রি ক'রে বেশ দু পয়সা রোজগার করে। রাণু ও খোকনই বা কেন করবে না? যা পাওয়া যাবে ওতে বই-পত্রের দাম তো উঠবে! বাঁশরি এক কথায় রাজী হয়ে যায়।

ওঠ না রে! ও খোকন!—মা আবার ডাকে।

খোকন বিছানায় উঠে ব'সে চোখ কচলাতে কচলাতে বলে, ক্ষিধে পেয়েছে মা।

বাঁশরি বলে, আগে মুখ ধুয়ে এস বাবা।

মিনিট কয়েক পরে মুন দিয়ে বাসি রুটি খেয়ে ঝোলা নিয়ে ভাই বোন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। জানলায় দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ছেলে ও মেয়েকে দেখে বাঁশরি। জামা ও প্যাণ্টে একাধিক তালি দেওয়া, তেলের অভাবে মাথার চুল রুক্ষ, পিঙ্গল—ভিখারী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রাণু ও খোকনের তফাত কোথায়? নিশ্বাস মোচন করে বাঁশরি। কিন্তু তফাত আছে। তারা গরিব, ভিখারী নয়। রাস্তার জঞ্জাল কুড়িয়ে

দুটো পয়সা কামানো আর ভিক্ষে করা এক কথা নয়। নিজের ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে তার গর্বের সীমা নেই। রাণু তো বরাবরই ক্লাসে প্রথম হয়। খোকনও পড়াশুনায় ভাল। আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায় তারা বস্তির ছেলেমেয়েদের আদর্শ।

উনুনে ভাত চাপিয়ে সেলাই নিয়ে বসে বাঁশরি। সামনের বারান্দা দিয়ে অবিরাম লোকজন যাতায়াত করছে। দরজায় ঝোলানো ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরটা চোখে পড়ে। টালির চাল; করোগেট টিনের দেয়াল,—ব্যারাক-বাড়ির মত একটানা লম্বা দোতলা বস্তি। দোতলা ও একতলায় মিলিয়ে এখানে থাকে শতাধিক পরিবার। অধিকাংশই কলকারখানার শ্রমিক। কেউ বা দোকানদার। কেউ ফিরিওয়ালা। হরেক রকম পেশা এদের। যোগেশ কাজকর্ম করে না, তাই প্রতিবেশীরা এসে সহানুভূতি জানায়। বাঁশরি তার স্বামীর নিন্দা করুক, তারা আশা করে। কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয় তাদের।

একটু পরে আসে সরকার, ঘরের ভাড়া চাইতে। দু মাসের ঘরভাড়া বাকি পড়েছে। সেও যোগেশের নিন্দা শুরু করে।—লোকটার কি বিবেক ব'লে কিছু নেই? কোনকালেই ছেলেমেয়ে স্ত্রীর দায়িত্ব নেবে না যোগেশ? গায়ে ফুঁ দিয়ে চিরকাল ঘুরে বেড়াবে?

সরকারের সঙ্গে এদের দীর্ঘদিনের পরিচয়। যোগেশের সম্পর্কে মন্তব্য করবার অধিকার তার আছে। বললে সে আবার, চেষ্টা করলে কি আর একটা কাজ পাওয়া যায় না? এত সব কল-কারখানা, অফিস রয়েছে এখানে। আমি শুনেছি, সোয়াইকা মিলে লোক নিচ্ছে।

বাঁশরি বিরক্তি চেপে বললে, ওসব কথা থাক্ সরকারকাকা। আপনার এক মাসের ভাড়া আমি আসছে সপ্তায় মিটিয়ে দেব।

বেশ বেশ।—সরকার বললে, শুনলাম তোমার বোন রাণী নাকি থিয়েটার-বায়স্কোপ ক'রে বেশ দু পয়সা কামাচ্ছে আজকাল। তা সব কথা খুলে লিখলে সে নিশ্চয়ই কিছু কিছু সাহায্য করবে তোমাকে।

রাণী যা রোজগার করে ওতে তার নিজেরই চলে না। খুব একটা নাম-যশ না হ'লে কি থিয়েটার-বায়স্কোপ ক'রে পয়সা করা যায়!

কেন, আমি যে শুনলাম কোন এক মাড়োয়ারী রাণীকে রেখেছে। হাজার টাকা ক'রে ওকে প্রতি মাসে দিচ্ছে সেই মাড়োয়ারী। গাড়িও নাকি কিনে দিয়েছে একখানা।

উঠে দাঁড়াল বাঁশরি। লোকটা অকারণেই বুড়ো হয়েছে। মুখের লাগাম নেই। নেহাত বাড়িওয়ালা ব'লে আজ সে বেঁচে গেল। তা না হ'লে বাঁশরি তা'র গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের ক'রে দিত।

সিঁড়িতে রাণু খোকনের কণ্ঠস্বর শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে।

মা! মা গো!—বাঁশরিকে কি বলতে গিয়ে সরকারকে দেখে তারা সহসা থেমে যায়। সরকার রাণুকে বললে, কি গো, জঞ্জাল কুড়ুতে বেরিয়েছিলে বুঝি? ওতে টু-পাইস হয় শুনেছি। কিন্তু নোংরা ঘেঁটে কখন কোন্ ছোঁয়াচে রোগে ধরে বলা যায় না।

সরকারের কথার কি জবাব দেবে বাঁশরি! বললে, রাণু, খোকন! চান করতে যাও। ইস্কুলের বেলা হ'ল।

সরকার চ'লে গেলে রাণু মার হাতে পাঁচ সিকে পয়সা দিলে। লোহা-লক্কড় ভাঙা টিন ও অন্যান্য জঞ্জাল বিক্রি ক'রে আজ মোট পাঁচ সিকে পাওয়া গেছে। বাড়ি থেকে বেরুতে দেরি না হ'লে অন্তত দু টাকা রোজগার হ'ত। খোকন বায়না ধরে, চার আনা পয়সা দাও মা। মাছ নিয়ে আসি। কদিন মাছ খাই নি।

বাঁশরি বললে, আজ থাক্ বাবা। মঙ্গলবারে মাছ খাবি।

মঙ্গলবার!—খোকন অভিমানের স্বরে বললে, মঙ্গলবার তো কোনদিন আসে না।

বাঁশরি আদর ক'রে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, বোকা ছেলে। আগে ভাত রুটি, তবে তো মাছ। তা ছাড়া, আসছে সপ্তায় যেমন ক'রে হোক এক মাসের বাড়ি ভাড়া দিতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া নিয়ে রাণু কখনও কোন আবদার করে না। খোকনের চেয়ে দু বছরের বড় রাণু। কিন্তু বুদ্ধিতে খোকনের সঙ্গে তার বয়সের তফাত এক যুগ। সংসার কেমন ক'রে চলে সে বোঝে। মার জন্য রাণুর সহানুভূতির অন্ত নেই। কিন্তু বাবার কথা ভাবলেই

তার মনখারাপ হয়ে যায়। সেই যে ভোরবেলা যোগেশ বেরিয়ে যায়, রাত দশটা এগারোটার আগে বাড়ি ফেরে না। কাজের সন্ধানে সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়ায় বাবা। দু পয়সার বাদাম কি চানাচুর, ওই তো তার সারাদিনের আহার। এক-একদিন হয়তো তাও জোটে না। ছোট রাণু সবই জানে। যতক্ষণ না বাবা বাড়ি ফেরে, রাণুর চোখে ঘুম আসে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ মেলে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে রাণু। কান তার সিঁড়িতে, রাস্তায়। মেশিনের পাশে মাও হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এক-একদিন গভীর রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে যোগেশ। নীচে সিঁড়ির মুখে এসে সে গান ধরে—স্বপন দেখি প্রবাল দ্বীপে তুলব আমি বাড়ি। অদ্ভুত মিষ্টি গলা বাবার। রাণু খোকনকে জাগায়। তারপর দুজনে ছুটে যায় নীচে বাবাকে ধ'রে আনতে।

ঘুম ভেঙে গেল বাঁশরির। উঠে এসে স্বামীর হাত ধ'রে বারান্দায় দড়ির খাটিয়ায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে।

বাঁশরি বললে, রাণু খোকন, তোমরা শুয়ে পড়।

স্বামীর মাথায় পাখার বাতাস করতে লাগল বাঁশরি। রুক্ষ চাপা গলায় বললে, আজ আবার তুমি ওইসব গিলে এসেছ?

যোগেশ কুণ্ঠিতস্বরে বললে, দীনু খাচ্ছিল। বললে—একটুখানি খাও, মনে বল পাবে, বুকে সাহস ফিরে পাবে।

তোমাকে না কতদিন বলেছি—বাঁশরি ঝাঁঝালো সুরে বললে, দীনুর আড্ডায় কখনো যাবে না। কাজ না থাকে, বাড়ি ব'সে থাক না কেন? না খেয়ে না দেয়ে, সারাদিন পথে পথে ঘুরে, রাত বারোটায় মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতে তোমার লজ্জা করে না? ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। তাদের সামনে কী আদর্শ তুমি স্থাপন করছ, সেদিকে খেয়াল আছে?

যোগেশ উত্তর দেয় না। অবশেষে বাঁশরি তাকে বললে, খাবে এস।

দুই

ফি রবিবারেই বিকালের দিকে রাণী বেড়াতে আসে। টালিগঞ্জে এক মেয়ে-হস্টেলে সে থাকে। বাঁশরি তার ঠিকানা লিখে রাখে নি।

এককালে ছোট বোনটাকে দুদিন না দেখলে সে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করত। মা মারা যাওয়ার পর রাণীকে সে নিজের কাছে এনে রেখেছিল। সংসারে আপন বলতে আর কেউ নেই রাণীর। রাণী আজকাল থিয়েটার বায়স্কোপ করে। তার সম্বন্ধে পাঁচজনে পাঁচ কথা ব'লে বেড়ায়। ভাল লাগে না বাঁশরির।

রাণী হেসে বললে। ওরা কোথায়—রাণু, খোকন?

বাজারে পাঠিয়েছি। এক্ষুনি আসবে।

জামাইবাবুর চাকরি-বাকরি হ'ল?

চাকরি! সে যদি-চাকরি করবে তো আমাদের এ হাল হবে কেন? ও-কথা বলিস নি দিদি। ভদ্রলোক চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। গান-বাজনার লাইনে একটা কাজ জোটানো আজকাল খুব কঠিন।

বাঁশরি বললে, গানবাজনার লাইনে যখন কিছু হ'ল না, অনেক আগেই এ-লাইন ছেড়ে অন্য কিছু শেখা উচিত ছিল তার, নিদেন পক্ষে একটা কেরানীর কাজও কি জুটত না? আসল কথা, সে কিছুই করতে চায় না। ছেলে মেয়ে স্ত্রী সব না খেয়ে ম'রে যাক। সে গায়ে ফুঁ দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

রাণী ভৎর্সনার সুরে বললে, ছি দিদি! তোর মুখে এ কথা শোভা পায় না। মার অমতে সেদিন তুই শিল্পী যোগেশবাবুকেই বিয়ে করেছিলি। যোগেশবাবু কেরানী হ'লে হয়তো তুই তাকে ভালবাসতিস না। মা অন্যত্র তোর সম্বন্ধ করেছিলেন। ভুলে গেলি সে সব কথা?

কিছুই ভুলি নি রাণী। কিন্তু তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম, শিল্পীকে বিয়ে করার এই পরিণাম। রাতদিন সেলাই ক'রেও ছেলেমেয়ে দুটোকে খেতে পরতে দিতে পারি না।—বলতে বলতে তার গলা ধ'রে এল।

রাণী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, ভেঙে পড়িস নি দিদি। জামাইবাবুর নিশ্চয়ই চাকরি হবে। দিন তোর ফিরবেই একদিন। আমার যদি আয়টা একটু ভাল হ'ত, মাসে মাসে তোকে কিছু সাহায্য করতাম। একস্ট্রার কাজ ক'রে এখন যা পাই, তাতে নিজেরই চলে না।...একটা কথা, তোর যদি আপত্তি না থাকে, রাণুকে আমি

সিনেমায় নামাব। দৈনিক পঁচিশ টাকা হিসাবে মাসে যদি চারটে দিন সে কাজ করে, তা হ'লেই তো তোর সংসারটা সচ্ছল হয়ে উঠবে।

হাতের সেলাই বন্ধ ক'রে বাঁশরি মৃদুস্বরে বললে, তা হবে না। সংসারের সচ্ছলতার জন্য রাণুর ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করতে পারব না রাণী। এ কথা ঠিক যে একবার সিনেমায় নামলে, রাণুর আর পড়াশুনা হবে না। নিজের কথা ভেবে দেখ। মা যদি তোকে ছেলেবেলায় শখ ক'রে সিনেমায় নামবার অনুমতি না দিতেন, তোর নামে আজ পাঁচটা লোক এসে আমার কাছে কুৎসা গাইতে সাহস করত না।

রাণী হেসে বললে, এ সব কথা বিশ্বাস ক'রে তুই দুঃখ পাস নি যেন দিদি। এ যদি সত্যি হ'ত, আজ আমার নিজের গাড়ি বাড়ি হ'ত।

তুই নাকি গাড়ি কিনেছিস?—প্রশ্ন করে বাঁশরি।

পাগল! খেতে পাই না, বলে গাড়ি কিনেছি।

কি ভেবে বাঁশরি বললে, এখনো সময় আছে রাণী। সিনেমা থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে, একটা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে-থা কর্। তা ব'লে কোন শিল্পীকে বিয়ে করিস নি যেন।

রাণু ও খোকন বাজার থেকে চাল নিয়ে ফিরে আসে। কদিন বাদে মাসীমাকে দেখে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তারা। ভ্যানিটিব্যাগ খুলে রাণী তাদের চকোলেট টফি ইত্যাদি বিতরণ করে।

তারপর রূপালী কাগজের মোড়ক থেকে একটা মস্ত বড় পান বের ক'রে বাঁশরির হাতে দিয়ে বললে, বেনারসের মিষ্টি পান তুই খেতে ভালবাসিস। তাই একটা নিয়ে এলাম। মমতাভরা দৃষ্টিতে বাঁশরি রাণীর দিকে তাকায়। কতকাল সে মিষ্টি পান খায় নি। আধখানা পান ছিঁড়ে রাণীর মুখে দেয় সে। বাকি আধখানা নিজের মুখে পোরে।

মাসীমাকে জানলায় টেনে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটা দেখায় রাণু। খোকন চকোলেট চিবুতে চিবুতে তাদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। রাণী বললে, কৃষ্ণচূড়া গাছটা আগে কোনদিন লক্ষ্য করি নি তো! সত্যিই সুন্দর।

জামায় বোতাম লাগাতে লাগাতে ভ্রূকুটি করে বাঁশরি। দর্শন-

যোগ্য কি আছে ওই গাছটায়, সে বুঝতে পারে না। ওই তো কটকটে লাল ফুল, না আছে গন্ধ—

জানলায় তখন রাণী রাণুকে বলছিল, কি সুন্দর! গাছটাকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে, জানিস? ও যেন স্বভাব-শিল্পী। শিল্পী যেমন মনের আনন্দে বাঁশী বাজায়, বনের পাখি যেমন গান ধরে, তেমনি ওই গাছটাও আপন উল্লাসেই ফুটে উঠেছে। ইট-পাথর ও সুরকি-সিমেন্ট কিছুই ওকে বাধা দিতে পারে নি। রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীতে স্নিগ্ধ ছায়া দিতে, ফুলের সমারোহে পথিকের চোখে স্বপ্ন জাগাতে ওই কৃষ্ণচূড়া গাছ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

রাণীর কথা শুনে অন্যমনস্ক বাঁশরির আঙুলে ছুঁচ ফুটে যায়। এক ফোঁটা টকটকে লাল রক্ত আঙুলের ডগায়। কৃষ্ণচূড়ার মতই লাল।

পেছনে দাঁড়িয়ে বাঁশরি বললে, নাটক ক'রে ক'রে দেখছি তোর কল্পনাশক্তির বড্ড প্রসার হয়েছে। স্বভাব-শিল্পী কৃষ্ণচূড়া। হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না। তোর জামাইবাবু যতক্ষণ বাড়ি থাকে, ওই গাছটার দিকে সে-ও তাকিয়ে থাকে। ইদানীং রাণুকেও সেই রোগে ধরেছে। তার ওপর তুই যদি গাছটাকে স্বভাব-শিল্পী আখ্যা দিস, রাণুকে যে ভূতে পাবে।

কি যে তুমি বল দিদি!—রাণী প্রতিবাদ ক'রে বললে। এক মুহূর্ত কি ভেবে বাঁশরি বললে, রাণু, খোকন, এক্ষুনি রেডিমেড স্টোর্সে যাও। গিয়ে বলবে, মা কাপড় চাইলেন। যাবে আর আসবে।

ছেলেমেয়েদের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে যেতেই বাঁশরি রাণীকে বললে, যে বনে পাখি গান গায়, সেখানে সে খাবারও সংগ্রহ করে। যে মাটিতে ফুল ফোটে, সেই মাটি গাছের খোরাকও যোগায়। ঠিক সেই নিয়মে বাঁশী বাজিয়ে শিল্পী যদি জীবিকার সংস্থান না করতে পারে, মিথ্যাই তার বাঁশী। রাণী বিস্মিত স্বরে বললে, এসব তুই কি বলছিস দিদি। বাঁশরি বললে, ঠিকই বলছি। আমি চাই না আমার ছেলেমেয়ে তাদের বাবার মত কল্পনা-বিলাসী হয়ে সারাটা জীবন ব্যর্থতার বোঝা ব'য়ে ঘুরে বেড়াক। সত্যি বলছি রাণী, ওই গাছটাকে কিছুতেই আমি

সহ্য করতে পারছি না আর। কর্পোরেশনের লোক এসে কেন এটাকে কেটে দিচ্ছে না তুই বলতে পারিস?

বিমূঢ়-দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত দিদির দিকে তাকায় রাণী। এ কি সেই বাঁশরি, পনের বছর আগে শিল্পী যোগেশকে বিয়ে করবার জন্য যে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল?

তিন

এক মাসের ঘরভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাতে কিছুই রইল না বাঁশরির। ও-বেলার জন্য ঘরে চাল-আটা কিছুই নেই। একমাত্র ভরসা রেডিমেড স্টোর্স। কিন্তু মালিক দোকানে না থাকায় সেখান থেকেও কিছু পাওয়া গেল না। ক্ষুধার্ত হয়ে ছেলেমেয়েই স্কুল থেকে এলে তাদের মুখে দুখানা শুকনো রুটিও সে দিতে পারবে না আজ। ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিকালটা না হয় কাটানো যায়, কিন্তু সন্ধ্যার পর বাঁশরি তাদের কি ব'লে সান্ত্বনা দেবে? খোকনটা মোটে ক্ষিধের জ্বালা সইতে পারে না।

এটা কিছু নবীন অভিজ্ঞতা নয় বাঁশরির পক্ষে। প্রতিমাসেই দু-চারদিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে উপোস করতে হয় তাকে। ভাঁড়ারের হাঁড়িগুলো খুঁজে-পেতে একটা হাঁড়িতে কিছু বাসী মুড়ি পাওয়া গেল। ইস্কুল থেকে ছেলেমেয়ে ফিরলে ভাগ ক'রে তাই খেতে দিয়ে বাঁশরি বললে, মুড়ি কটা খেয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে নাও। আজ রাতে উপোস।

খোকন কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, বা রে! এই কটা বাসী মুড়ি খেয়ে কেউ সারারাত বেঁচে থাকতে পারে?

বাঁশরি উত্তর দিল না। জল আনতে বালতি নিয়ে নীচে চ'লে গেল। মার কথা শুনে রাণু মুড়ি কটা আর খেলে না। খোকনের অলক্ষ্যে মুড়ির বাটিটা একখানি কাগজ দিয়ে ঢেকে টেবিলের নীচে রেখে দিল।

রাণু ঘর মোছে, বিছানা ঝাড়ে। আলো জ্বালিয়ে মা আবার সেলাই নিয়ে বসে। ঘরের কাজ শেষ ক'রে জানলায় এসে দাঁড়ায় রাণু। গোধূলি নামছে। রাস্তায় আলো এখনো জ্বলে নি। গোধূলির ম্লান আলোয় কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো জ্বলছে। একসময় রাস্তায় গ্যাস জ্ব'লে ওঠে। রাত্রি নামে। ক্ষুধার্ত রাত। অন্ধকারে

ঢাকা পড়ে কৃষ্ণচূড়া। ক্ষুধার আগুনে জ্ব'লে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সুন্দরের সাধনা। সারা শরীর অবসাদে নেতিয়ে আসে। খোকন কাঁদতে শুরু করেছে। রাণু একখানি বই হাতে নিয়ে পড়তে চেষ্টা করে।

রাত ঘন হয়। বাঁশরির হাত চলে না আর। সেও একসময় শুয়ে পড়ে। শুধু জেগে থাকে রাণু একা। আস্তে আস্তে জানলায় এসে দাঁড়ায় আবার সে। বাবাকে দুদিন না দেখলেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। আজ চারদিন বাবা বাড়ি নেই। কোন এক যাত্রা-পার্টির সঙ্গে মফস্বল গেছে। কবে ফিরবেন কে জানে।

নীচে বাবাকে দেখতে পেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে সে, বাবা এসেছে। বাবা।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে ছুটে যায় রাণু। যোগেশের এক হাতে সানাইয়ের বাক্স, অন্য হাতে কাপড়ের ব্যাগ। সে বললে, মা-মণি। খোকন কোথায়? তোর মা? কেমন আছিস তোরা?

ভাল।—রাণু উত্তর দেয়, তোমার শরীর ভাল তো বাবা?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কিন্তু তোর মুখখানি অমন শুকনো কেন মা-মণি?

কই, না তো। ব্যাগটা আমার হাতে দাও বাবা।

যোগেশ হেসে বললে, সারাদিন হরিমটর ক'রে ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যায় না মা-মণি। হ্যাঁ রে, খুব ক্ষিধে পেয়েছে?

আমার ক্ষিধে পায় নি তো। খোকনের পেয়েছিল।

ওপরে সিঁড়ির মুখে বাঁশরি দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, তোমার না বিকালে আসবার কথা ছিল?

ব্যাগ ও সানাইয়ের বাক্সটা বাঁশরির হাতে দিয়ে যোগেশ বললে, ট্রেনটা ফেল করলাম কিনা। তাই পাঁচ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল।

মেঝেতে ব্যাগটা উপুড় করে বাঁশরি। সন্দেশ, মাখন, রুটি, বিস্কুট, কলা, ময়দা, মাংস, আলু—আরো কত সব। যা রোজগার করেছিল তার সবটাই খরচ ক'রে ফেলেছে যোগেশ।

বাঁশরি খুশিও হয়, আবার বিরক্তিও বোধ করে। বহুদিন পরে ছেলেমেয়ে ভাল মন্দ খেতে পাবে আজ। কিন্তু তা ব'লে এত খরচ

করা কি ঠিক হয়েছে যোগেশের? যোগেশকে সে কত বুঝিয়েছে, কিন্তু বৃথা। ইদানীং টাকা পেলেই যোগেশ এ ভাবে অপচয় করে।

খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে হয় নি তো ওখানে?

অসুবিধে!—যোগেশ একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে, তুমি বল কি গো! যাকে বলে ইয়ে—আমরা সব রাজার হালে ছিলাম। দু বেলা মাছ-মাংস দই-সন্দেশ যত খুশি খাও। যে যত খেতে পারে বাড়ির কর্তা তার ওপর তত খুশি।

তাই নাকি?—বাঁশরি বললে।

বুঝলে গো, কর্তাবাবুকে একদিন সকালবেলা সানাই শোনালাম। বুকে জড়িয়ে ধরলে আমাকে কর্তাবাবু। বললে—ওস্তাদ, কি হবে যাত্রা-পার্টিতে বাঁশী বাজিয়ে? তুমি এখানে থেকে যাও। আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তি দেব। কর্তাবাবু তো বললেন, কিন্তু অধিকারী আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। বললে সে—ওস্তাদ, তুমি একাই একশো। তুমি না থাকলে আমাদের যাত্রা-পার্টি কাণা হয়ে যাবে। কেন ভাবছ? এবারে কলকাতায় ফিরেই তোমার সঙ্গে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করব। পঞ্চাশ টাকার লোভে কেন এই অজ-পাড়াগাঁয়ে প'চে মরবে, বল!

ঘুম ভেঙে গেল খোকনের। কাঁদো কাঁদো স্বরে সে বললে, ক্ষিধে পেয়েছে মা। বাঁশরি বললে, সারাদিন ওই এক কথা—ক্ষিধে, ক্ষিধে, ক্ষিধে। উঠে এস খোকন। উঠে এসে বাবাকে প্রণাম কর।

খোকন উঠে এসে বাবার কোলে মাথা রেখে মেঝেয় বসল। বললে, আমার বুঝি ক্ষিধে পায় না বাবা?

হাতের বিড়িতে শেষ টান দিয়ে, বিড়িটা দরজা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে মারল যোগেশ। বললে, খুব ক্ষিধে পেয়েছে? কি খাবি বল্? বাগবাজারের রসগোল্লা? ভীমনাগের সন্দেশ? বড়বাজারের আবার খাব, দেলখোসের চপ-কাটলেট? বল্ কি খাবি? চটপট।

ভাত খাব।—খোকন কাঁদো কাঁদো গলায় বললে।

দূর বোকা।—যোগেশ বললে, মাংস পরোটা সন্দেশ কলা আপেল

এ সব পেলে কেউ বুঝি ভাত খেতে চায়। তারপর বাঁশরির দিকে তাকিয়ে বললে, ফল সন্দেশ এসব এদের দাও।

দিচ্ছি।—বাঁশরি বললে, ততক্ষণ তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস দিকি।

বাঁশরি তিনখানি প্লেট সাজিয়ে খোকন রাণু ও যোগেশকে দিল।

তোমারটা?—যোগেশ প্রশ্ন করে।

আর প্লেট নেই। আমি পরে খাব 'খন।

উঁহু। তা হয় না। প্লেট না থাকে, থালায় দাও। চারজন একসঙ্গে খাব। খেয়ে উনুনটা ধরিয়ে দাও। মাংস আর পরোটা তৈরি কর।

বাঁশরি ইতস্তত ক'রে বললে, অনেক রাত হ'ল। মাংস-পরোটা কাল হবে 'খন।

না বাঁশরি, আজই কর। চিরক্ষুধার্ত আমাদের জীবনে আজকের রাতটা স্মরণীয় হয়ে থাক্।

রাত বারোটায় উনুন ধরিয়ে মাংস চাপায় বাঁশরি। যোগেশ খোকন ও রাণুকে রূপকথার কাহিনী বলে। কাহিনী শেষ ক'রে এক সময় সে গান ধরে।

দৈনন্দিন দুঃখ-দৈন্যের কথা ভুলে যায় বাঁশরি। তার মনে হয়, আজকের রাতটাই বুঝি জীবনে একমাত্র সত্য। আর সবই স্বপ্ন। আর সবই মিথ্যা। ছেলে মেয়ে ও স্বামীকে পেট ভ'রে খেতে দেওয়ার চেয়ে বেশি আনন্দ মেয়েদের জীবনে আর কি আছে!

চার

আরও ক'মাস কেটে গেল। যোগেশ ছিটেফোঁটা একটা কাজও যোগাড় করতে পারে নি এই ক'মাস। সপ্তাহে দু-তিনদিন রাণু ও খোকন জঞ্জাল কুড়ুতে যায়। বাঁশরি সকাল থেকে রাত দশটা অবধি রেডিমেড স্টোর্সের জন্য সেলাই করে। ঘর-ভাড়া জমে ওঠে। ছেলেমেয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে উপোস করতে হয় বাঁশরিকে।

একদিন বিকালবেলা মস্তবড় এক মোটর এসে থামল সতের নম্বর বস্তির সামনে। গোটা বাড়িটাতে যে যেখানে ছিল, নিজেদের জানলায় ছুটে এসে রাস্তায় তাকিয়ে মোটর গাড়ি দেখতে লাগল।

উলঙ্গ, আধা উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো বন্ধ ক'রে মোটরের সামনে এসে ভিড় করল। মোটর থেকে নামল রাণী ও জনৈক আধবয়সী ভদ্রলোক। ভদ্রলোক কিন্তু উপরে গেলেন না। গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন। রাণী বললে, আমার কিন্তু দেরি হবে। ভদ্রলোক বললেন, আমার তাড়া নেই।

দোতলার জানলা দিয়ে রাণীর সঙ্গে ভদ্রলোকটিকে দেখে বাঁশরির চোখ দুটো কপালে উঠে গেল। তবে কি সরকার এরই কথা বলেছিল? শেষ পর্যন্ত রাণীরও পতন হ'ল! হ'লই বা মায়ের পেটের বোন। এর পর রাণীর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখা চলে না। ভাগ্যিস রাণু ও খোকন বাড়ি নেই। কি ভাবত তারা ওই লোকটিকে রাণীর সঙ্গে দেখে! রাণী ঘরে ঢুকতেই ফেটে পড়ে বাঁশরি। বলে, কে ওই লোকটা? কবে কিনেছ তুমি এই গাড়ি?

রাণী দিদিকে বোঝাতে চেষ্টা করে, লোকটার সঙ্গে তার ভদ্রতার সম্পর্ক। ইনি একজন পরিচালক। গাড়িটা রাণীর নয়, এঁরই। বাস-স্টপ থেকে তাকে 'লিফ্‌ট' দিলেন। কিন্তু বাঁশরি তার কথা কিছুই বিশ্বাস করল না। স্পষ্ট ভাষায় সে বললে, আমার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ বিবেচনা ক'রে তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না রাণী।

এ সব তুই কি বলছিস দিদি?—রাণী বিমূঢ়স্বরে বললে।

আমাকে ক্ষমা কর রাণী।—বাঁশরি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দেয়, অভাবের সংসারে রাণু ও না একদিন তোর মত বিপথগামী হয়, সেই ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

বেশ, তাই হবে। আমি আর আসব না।

পরক্ষণেই মোটরের শব্দ নীচে রাস্তায় মিলিয়ে যায়।

রাণু ও খোকন বাজার থেকে ফিরছিল। দেখতে পেয়ে মোটর থামিয়ে ব্যাগ থেকে টফি লজেন্স ইত্যাদি বের ক'রে তাদের দিলে রাণী। বললে, আমার সঙ্গে যে দেখা হয়েছিল মাকে বলিস নি যেন। আর কোনদিন তোদের বাড়ি আমি আসব না। দিদি মানা করেছে আসতে।

রাণু ও খোকন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কেন মাসিমা ?

একটু ভেবে রাণী বললে, আমি আজ এই মোটরে ক'রে এসেছি কিনা, তাই বোধ হয় দিদির রাগ হয়েছে। আচ্ছা, আজ আসি। ইস্কুলের পথে তোদের সঙ্গে দেখা করব একদিন।

রাণীকে নিয়ে ধুলো উড়িয়ে মোটর চ'লে যায়।

সেদিন রাতে যোগেশ বাড়ি ফিরলে রাণু তাকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ বাবা, মোটর চড়াটা কি দোষের ? মোটরে ক'রে যদি কেউ বেড়াতে আসে তাকে বুঝি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে হয় ?

সব কথা শুনে যোগেশ বললে, এ তোর মার ভীষণ অন্যায়। ভাবিস নি মা-মণি। তুই আর আমি—আমরা দুজন একদিন ট্যাক্সি ক'রে টালিগঞ্জ যাব রাণীকে ডেকে আনতে।

সত্যি বলছ বাবা ?—রাণু উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, আমি কখনো ট্যাক্সিতে চড়ি নি। রেলেও চড়া হ'ল না একদিন।

ট্যাক্সি, রেল, এরোপ্লেন—সব চড়বি মা-মণি। কেন ভাবছিস ? সব চড়া হবে তোর।—যোগেশ তার কল্পনার রাশ আলগা ক'রে দিয়ে বললে, জানিস মা-মণি, স্থির করেছি, একদিন আমি একটা রেজার্সের টিকিট কাটব। দু টাকা—মাত্র দু টাকা দিয়ে একটা টিকিট কাটলেই নগদ চল্লিশ হাজার টাকা পাওয়া যায়। রেজার্সের টিকিটে যদি একান্তই বাজি না জিতি, একদিন রেসে যাব। রেস জানিস তো ? ঘোড়দৌড়ের মাঠ। পাঁচটা টাকা নিয়ে মাঠে যাব, আর পঁচিশ হাজার নিয়ে বেরিয়ে আসব।

হ্যাঁ, ওইটে বাকি আছে। আর সবই হয়ে গেছে।—পেছনে দাঁড়িয়ে বাঁশরি বললে, এখনও তুমি শুতে যাও নি রাণু ? রাণু নিঃশব্দে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বাঁশরি বললে, চার মাস কেটে গেল, ছিটেফোঁটা কাজও কি কিছুই পেলে না তুমি ?

যোগেশ হতাশস্বরে বললে, না। কিছুই পাচ্ছি নে।

তিন মাসের ঘরভাড়া বাকি পড়েছে। এ ভাবে আর ক'দিন

চলবে তাই ভাবছি। এদিকে রাতদিন সেলাই ক'রে ক'রে আমার চোখ দুটো যেতে বসেছে।

উত্তর দিল না যোগেশ। উঠে দরজার দিকে যেতে লাগল। বললে, বড্ড গরম। রাস্তা থেকে একটু ঘুরে আসছি।

তাড়াতাড়ি এস। দরজা খুলে আমি ব'সে রইলাম।

পাঁচ

দোতলা বাস চলাচলের অসুবিধা হয় ব'লে ওরা একদিন এসে কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডাল-পালা কেটে একাকার ক'রে দিয়ে গেল। আজকাল গাছটাকে দেখে মনে হয় যেন একটা ল্যাম্প-পোস্ট। এমন সুন্দর গাছটির এই অবস্থা দেখে চোখে জল এসে পড়ে রাণুর। যোগেশ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, গাছটাতে আবার ডাল-পালা গজাবে, ফুল ফুটবে। তুই দেখে নিস, কেউ আটকাতে পারবে না।

বাবাকে বড় ভালবাসে রাণু। পাড়ার ছেলেমেয়ে মাতাল ব'লে তাকে ক্ষ্যাপাক, সংসার তাকে ঠেলুক, রাণু তো জানে, তার বাবা একজন স্বভাব-শিল্পী। সত্যিকার শিল্পীমন যোগেশের। রাণু জানে, বাবা কোনও দিন লটারিতে টাকা পাবে না, রেসেও জিতবে না। তবু তার সঙ্গে রঙিন কল্পনার অংশ নিতে ভাল লাগে রাণুর। বাবা মাঝে মাঝে বলে, যাদের কিছুই নেই, কল্পনাও যদি না থাকে তাদের জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে যে। অত কথা রাণু বোঝে না। কিন্তু বাবার সঙ্গে বেড়াতে, বাবার গান শুনতে, তার কল্পনায় অংশ নিতে ভাল লাগে।

অন্ধকার তখনও ভাল ক'রে কাটে নি। মা খোকন ঘুমুচ্ছে।

আয় রাণু, বেড়িয়ে আসি।—বাবা তাকে চুপি চুপি বললে।

রাণু খুশি হয়ে বললে, চল।

বাড়ি ফিরতেই রাণুকে সামনে পেয়ে বাঁশরি ঝাঁজালো স্বরে বললে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

রাণু বললে, আমাদের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বইয়ে লিখেছে, সকালবেলা বেড়ালে শরীর ভাল হয়। তাই বাবার সঙ্গে রাস্তায় বেড়িয়ে এলাম মা।

বইয়ে এ কথা লেখে নি যে, না-খেয়ে থাকলে শরীর আরো ভাল

হয়? দুপুরবেলা পেটে কি পড়বে খেয়াল আছে? আজ না তোমাদের জঞ্জাল কুড়তে যাবার কথা ছিল?

সত্যি মা, ভুলে গিয়েছিলাম।—রাণু ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে বললে।

তোমার যাবার আর কি বল। হাওয়া খেয়ে বাঁশি বাজিয়ে কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ালেই হ'ল। কিন্তু তা ব'লে তুমিও যদি ওর মত দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে ওঠ, আমাকে যে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।

মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ে সিঁড়িতে যোগেশ দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে বাঁশরি। পনের বছর একসঙ্গে ঘর করার পর এই প্রথম আজ বাঁশরি স্বামীর সম্বন্ধে কটূক্তি করল। এক মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে কি ভেবে যোগেশ আস্তে আস্তে নীচে নেমে যায়। রাগের মাথায় কথা ক'টা ব'লে বাঁশরি নিজেও কিছু কম লজ্জিত হয় নি। রান্নাঘরের দরজায় হেলান দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

ছয়

দিন আর কিছুতেই কাটে না। ক'দিন থেকে খোকনের জ্বর। বারো-তেরো বছরের মেয়েকে ভিখারী ও নষ্ট-দুষ্ট ছেলেদের ভেতর একা জঞ্জাল কুড়োতে পাঠাবার সাহস নেই বাঁশরির। রাণুর ইস্কুলে যাবার রুকটিও আর পরা চলে না। মেয়ে বড় হচ্ছে। এখন থেকে শাড়ি পরানো উচিত রাণুকে। কিন্তু—। বাঁশরির নিজেরও যদি একখানা ভাল শাড়ি থাকত, রাণু তাই প'রে ইস্কুলে যেতে পারত।

দীনুর আড্ডা থেকে অনেক রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে যোগেশ। বাঁশরি ফেটে প'ড়ে বলে, ছেলেটা জ্বরে ধুঁকছে, এক ফোঁটা বালি কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। আর তুমি দিব্যি মদ গিলে বাড়ি ফিরে হল্লা শুরু করেছ। লজ্জা করে না?

যোগেশ জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, দীনু বললে—খা। তেষ্টা মিটিয়ে খা, মনে বল পাবি। কোন দুঃখ তোকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ওই দীনুই যত সর্বনাশের গোড়া। একদিন ওর দোকানে গিয়ে পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে দীনুকে অপমান করব। তখন ঠিক হবে।

অনেক দিন বাদে যোগেশ আবার তিন দিনের কাজ পায়। বিয়ে-বাড়িতে সানাই বাজাতে হবে। যার বাড়িতে সে সানাই বাজাতে যাচ্ছে, তিনি নাকি ফিল্ম কোম্পানির মালিক। যোগেশ আবার কল্পনার জাল বুনতে শুরু করে। ভদ্রলোকটিকে ধরাধরি ক'রে ওই কোম্পানিতে সে একটা কাজ যোগাড় করবেই।

বাঁশরি বললে, যেমন ক'রে হোক, কাজ একটা জুটিয়ে নিতে হবেই তোমাকে। এ ভাবে আর চলে না। হ্যাঁ, টাকাকড়ি যা পাবে সব এনে আমার হাতে দেবে। একটা পয়সাও বাজে খরচ ক'রো না।

যোগেশ সায় দিয়ে মাথা নাড়ে।

যোগেশ চ'লে গেলে বাঁশরি ঠাকুরের নিকট মিনতি জানায়, সত্যি সত্যিই যেন যোগেশের একটা চাকরি হয়। ক'দিন ধ'রে রাণু ইস্কুলে যায় না। খোকনের অসুখ। রাণু ইস্কুলে চ'লে গেলে ওকে দেখবে কে? বাঁশরি সেলাই করবে, না, খোকনের মাথায় হাওয়া করবে?

ব্যাগভর্তি কমলালেবু, মুসুম্বি প্রভৃতি ফল নিয়ে কয়েক দিন বাদে রাতে যোগেশ যখন ফিরে এল, রাণু ও খোকন ঘুমুচ্ছে।

কেমন আছে খোকন?—প্রশ্ন করে যোগেশ।

বাঁশরি বললে, কাল জ্বর ছেড়েছে। কিন্তু এত ফল কে খাবে? যা পেয়েছ, সবটাই বুঝি খরচ ক'রে ফেলেছ?

যোগেশ একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে, তুমি ভেবো না গো। এবারে নিশ্চয়ই একটা কিছু হবে আমার। আমার সানাই শুনে বুড়ো চাটুজ্জে তো বেজায় খুশি। বললে, আহা, ওস্তাদ তুমি একজন গুণী বটে। তখন আমি বললাম—হুজুর, অভয় দিন তো একটা কথা বলি। বড় গরিব, বড় দুঃস্থ এই অধম। আপনার কোম্পানিতে যদি একটা কাজ দেন, ছেলেমেয়ে পরিবার তবে খেয়ে বাঁচে।

তারপর, তারপর?—প্রশ্ন করে বাঁশরি উদ্‌গ্রীব হয়ে।

তখন বুড়ো বললে—সানাই-বাজিয়ের কোন কাজ তো খালি নেই ওস্তাদ। তবে তুমি যদি গাইতে পারতে—। বললাম—হুজুর, আমি গাইতেও জানি। 'কমিক' গান গেয়ে অনেক মেডেল্ পেয়েছি। তখন

। ফিল্মের জন্য প্লে-ব্যাক ক'রে মাসে তুমি দু হাজার
তে পারবে। তবে কি জান, আমাদের লোক রয়েছে
পরে তুমি আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।
গিয়েছিল। যোগেশ আবার কাঠি জেলে সেটা ধরায়।
ত বাকি থাকে না, যোগেশের চাকরি-বাকরির কোন
ছ মাসে ন মাসে সেই দশ-পাঁচ টাকা রোজগার।
ন দাঁড়ায় বাঁশরি। বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে
য় থাকে সে।
পাশে এসে বললে, শুনলাম সরকার গাইয়ে-বাজিয়েদের
দিচ্ছে। ঠিকানা নিয়ে এসেছি। আমি কালই
য়ে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করব।
মি।—সহসা চেঁচিয়ে ওঠে বাঁশরি, স্তোকবাক্যে কাকে
দের বাঁচবার কোন পথই আর খোলা নেই। ভবিষ্যৎ
মেয়ে নিয়ে ওই অন্ধকারে তিলে তিলে প'চে মরতে
চাকরি তোমাকে কেউ দেবে না।
ও যায়। বিছানায় উঠে বসে সে।
লছ।—এক মুহূর্ত কি ভেবে যোগেশ আস্তে আস্তে
ত্যিই আমি তোমাকে স্তোকবাক্যে ভোলাচ্ছিলাম।
কেউ দেবে না। গানের কথা আমি তোমাকে যা
ত্য নয়। আমার গান শুনে বিয়ে-বাড়িতে সবাই
দিয়েছিল। বুড়ো চাটুজ্জে আমাকে টিটকিরি দিয়ে

অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বললে, আমি জানি। আমি
দিতে চাই না। কিন্তু মনকে আর চোখ ঠেরে লাভ
জিয়ে, গান গেয়ে তুমি কোনকালেই পরিবার পোষণ
কল্পনার রঙিন পাখায় ভর ক'রে ঘুরে বেড়ালে তো

আর ছেলেমেয়ের পেটে ভাত জুটবে না। যা সত্যি, তা যতই কঠিন হোক না কেন, স্বীকার ক'রে নেওয়া ভাল।

অসহায় ভঙ্গীতে দড়ির খাটিয়ায় ব'সে প'ড়ে যোগেশ বললে, হ্যাঁ, আমি জানি স্বামী হিসাবে, পিতা হিসাবে আমি কর্তব্যজ্ঞান-হীন। যে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে না, সে মানুষ নামেরও অযোগ্য। কিন্তু বিশ্বাস কর বাঁশরি। আর দশজনের মত আমিও আমার স্ত্রীকে, আমার ছেলেমেয়েদের ভালবাসি। কতবার সংকল্প করেছি, গান-বাজনার সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে অন্য কোন কাজ করব। কিন্তু বৃথাই। না, অন্য কোন কাজ আমাকে দিয়ে এ জীবনে আর হবে না।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে যোগেশকে আর কেউ দেখতে পায় না। রাণু ও বাঁশরি ভাবল, নিশ্চয়ই রাত্রে ফিরে আসবে। কিন্তু দেখতে দেখতে তিন দিন কেটে গেল, যোগেশ ফিরল না।

উদ্বিগ্ন বাঁশরি রাণুকে নিয়ে গেল দীনুর দোকানে স্বামীর খোঁজ নিতে। দীনু বিস্মিত হয়। এই ক'দিন সে তো একবারও আসে নি তার কাছে। তবে গেল কোথায় লোকটা?

এক হপ্তা কেটে গেল। যোগেশের কোন খবর নেই। বাঁশরি ও রাণু শূন্যদৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকে।

অবশেষে দীনু যোগেশের সংবাদ নিয়ে আসে একদিন। মাথা নীচু ক'রে সে বললে, যোগেশ আর নেই। সংবাদটা তার কাছেই এসেছে; কারণ যোগেশ দীনুর ঠিকানা দিয়েছিল, নিজের বাড়ির নম্বর দেয় নি। ক'দিন আগে এক সার্কাস-পার্টিতে ব্যাগ-পাইপ বাজাবার কাজ নিয়ে সে মাদ্রাজ চ'লে যায়। অনাহারে অর্ধাহারে বছরের পর বছর কাটিয়ে যোগেশ যে ক্ষয়কাশে আক্রান্ত হয়েছিল—এ কথা সে কাউকে বলে নি। ব্যাগ-পাইপ বাজাবার সময় মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত উঠে সে মারা গেছে।

সহসা ডুকরে কেঁদে উঠে রাণু, বাবা! বাবা গো! তারপর মার দিকে ফিরে বললে, তুমি—তুমি এর জন্য দায়ী। কেন সেদিন বাবাকে—

বাঁশরির চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা ছুটল। বিড় বিড় ক'রে

সে বললে, হ্যাঁ, আমি—আমিই তাকে মেরেছি। ভেবেছিলাম, শক্ত কথা বললে হয়তো তিনি অন্য কোন কাজকর্ম করবার চেষ্টা করবেন। তোরা খেতে পাবি, মানুষ হবি।

রাণু মার বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বললে, আমায় ক্ষমা কর মা।

ক'দিন পরে দীনু আবার এল। যোগেশ তার বিশিষ্ট বন্ধু ছিল। আজ সে নেই। যোগেশের পরিবার চোখের ওপর ভেসে যাবে, আর দীনু চুপ ক'রে ব'সে থাকবে? সে জানে, বাঁশরি কারও দেওয়া অর্থ গ্রহণ করবে না। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হ'ল তাকে। বাঁশরিকে বললে, সার্কাস কোম্পানি যোগেশের পরিবারকে সবসুদ্ধ আঠারো শো টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে স্থির করেছে। মাসিক পঞ্চাশ টাকা ক'রে তিন বছরে ওই টাকা বাঁশরি পাবে।

কয়েক বছর কেটে গেছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটা আবার আগেকার মতই ডালপালা মেলে ফুলে ও পাতায় আকাশের কোণ উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। রাণু এখন বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। শুধু তাই নয়, লেখিকা হিসাবে এরই ভেতর নাম করেছে সে। খোকন গেল-বছর বি. এ. পাস ক'রে সরকারী কাজে ঢুকেছে। বাঁশরির সংসার এখন সচ্ছল। আজও সে রেডিমেড স্টোর্সের জন্য জামা সেলাই করে। তবে দৈনিক দু ঘণ্টার বেশি বাঁশরি কাজ করে না।

মাঝে মাঝে জানলায় এসে শূন্য দৃষ্টিতে কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে বাঁশরি। রাণুকে ডাকে সে, রাণু, দেখ এসে কৃষ্ণচূড়া গাছে কত ফুল ফুটেছে!

রাণু হাতঘড়ি দেখে বললে, পরে দেখব মা। এখন আমার একটু তাড়া আছে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নীচে নেমে যায় সে।

বাঁশরি জানে, তরুণ অধ্যাপক অশোকবাবু রাণুর জন্য নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। নিশ্বাস মোচন করে বাঁশরি। আনন্দের, না, বিষাদের নিশ্বাস কে জানে?

শ্রীবীরেন দাশ

সংবাদ-সাহিত্য

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় [জীর্ণবাস করি পরিহার
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। নববাস পরে যথা নর।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- তথা ত্যজি জীর্ণ দেহ ভার
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ধরে আত্মা নব-কলেবর ॥]

—গীতার এই প্রসিদ্ধ প্রবচন সত্ত্বেও আমরা স্বস্তি পাইতেছি না। চার মাস কম ৩১ বৎসর পূর্বে—১৯২৪ সনের ২৬ জুলাই, শনিবার (১০ই শ্রাবণ ১৩৩১) যে দেহ ধারণ করিয়া 'শনিবারের চিঠি' ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিল সেই দেহ ত্যাগ করিয়া নব-কলেবর ধারণ যে জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করার মত সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যাপার নয়, পুরাতনের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন বন্ধুজনের কাতর প্রার্থনা ও নির্দয় অভিযোগেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। দেহী মাত্রেই দেহের প্রতি মমতাসম্পন্ন, যত জীর্ণই হউক দেহ ত্যাগে দেহীর তীব্র যন্ত্রণাভোগ অনিবার্য। আমরাও দুঃখ ভোগ করিতেছি, আগামী শুভ বৈশাখে নবরূপ ধারণ না করা পর্যন্ত দেহান্তর প্রাপ্তির দুঃখ হইতে আমাদের মুক্তি নাই। সহৃদয় শুভানুধ্যায়ীরা নববাসধারীর কল্যাণ কামনা করিবেন—ইহাই প্রার্থনা। পৃষ্ঠপোষকদের অবগতির জন্য কর্মাধ্যক্ষের নিবেদন এই—দেহান্তরিত 'শনিবারের চিঠি'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৯৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৪৷৷০ টাকা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইয়া দিলে তাঁহাদের ও অনুগ্রাহকদের—দুই পক্ষেরই সুবিধা হয়। ভি. পি.তে খরচ এবং অসুবিধা দুইই বেশি।

—

স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এবং শেষে স্বাধীন সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যাঁহারা অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলেন, এমন দুইজন বীরের নাম আমরা নিত্যই স্মরণ করিতাম—একজন সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফ্‌ফর খান এবং অন্যজন বরিশালের সতীন সেন। দুইজনের একজন, আজীবন যোদ্ধা সতীন সেন, গত ১১ই চৈত্র শুক্রবার রাত্রে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরেই ঢাকাতেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বাধীনতার পর আর পাঁচজনের মত কর্মস্থান ত্যাগের দুর্বলতা স্বীকার করিলেই

ইহারা সহজে একসঙ্গে প্রসিদ্ধি ও আরামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন, কারাগার ইহাদের বাসস্থান না হইয়া রাজভবনেই ইহাদের অধিষ্ঠান হইতে পারিত। কিন্তু এই বীরপুরুষেরা সে দুর্বলতা স্বীকার করেন নাই। অতিচালাকেরা তাঁহাদের বোকা বলিবেন, কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষেরা এই অনমনীয়তার জন্যই চিরদিন সতীন সেনের স্মৃতিকে পূজা করিব। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে ভরসা যোগাইবার জন্যই শারীরিক বিবিধ অপটুতা সত্ত্বেও সেন মহাশয় নজরবন্দিত্ব অথবা কারাগারের ক্লেশ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন, এখন ভীতসন্ত্রস্তদের মনে সাহস সঞ্চার করিবার জন্য তাঁহার মহান্ আদর্শ মাত্র বজায় রহিল। সুদূর অতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত যে অল্পসংখ্যক বীরপুরুষ অন্যায়ের সঙ্গে আপোস না করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, সতীন সেন তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার জয় হউক।

—

ওই একই দুর্যোগের রাত্রিতে (২৫ মার্চ শুক্রবার) বাংলার প্রবীণতমা কংগ্রেস-সেবিকা মোহিনী দেবীরও দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। পিতা ও স্বামী ব্রিটিশ আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও এই স্বদেশপ্রাণা বীর মহিলা নির্ভয়ে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। তাঁহার অ্যাণ্টনিবাগানের বাসস্থানটি আমাদের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় স্বদেশী ঘাঁটিরূপে কীর্তিত হইবে। তাঁহার ৯২ বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে আমাদের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথযাত্রার অনেকখানিই তাঁহার প্রত্যক্ষ আয়ত্তের মধ্যে ছিল। সেই কাহিনী তিনি কোনও ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কি না জানি না, করিয়া থাকিলে তাহা অচিরাৎ সর্বসাধারণের গোচরে আনা প্রয়োজন।

—

অন্ধে যে ব্যাপারটি আমরা সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা মোটেই অন্ধের হস্তীদর্শনন্যায়ানুমোদিত নয়; এখানে খণ্ডশ লেজ শুঁড় কান পা মাত্র দেখিবার দুর্ভাগ্য আমাদের হয় নাই। গোটা

অন্তটাকেই দেখিতে পাইয়াছি। তবে অনেক দূর হইতে যাহাকে শুঁড়যুক্ত বৃহদায়তন ঐরাবত বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, আসলে তিনি শুঁড়হীন এবং আকারেও অনেক ছোট। আমরা নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছি।

—

ক্ষুদের ব্যাটা গদাকে নিঃশেষে পরিপাক করিয়া নবাবধৃত শ্রীঅচিন্ত্যকুমার দেবুর ব্যাটা র'বেকে ধরিয়াছিলেন। কাশির ধমকে র'বে পাতত রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু বিশের ব্যাটা বিলের কপাল মন্দ, ন তাহার পালা চলিতেছে। যিনি সার দেন সে-ই মা সারদা একটা মাথায় সার দিলে আমরাও ধন্য ধন্য করি।

—

কবিদের কপাল ফিরিয়াছে। হঠাৎ দেখিতেছি দৈনিক পত্রে আনন্দবাজার, যুগান্তর), মাসিক পত্রে (পূর্বাশা, বারোমাস), সংস্কৃতি-সম্মেলনগুলিতে, মায় খাস দিল্লীর তখ্‌ততাউসে অর্থাৎ রাজ্যসভায় কবিদের প্রসঙ্গ মুহুর্মুহু উত্থাপিত হইতেছে। রাজ্যসভায় ডক্টর কালিদাস নাগ আর নাই বলিয়াই সম্ভবত তৎবিরহী সতীর্থগণ কবি কালিদাসের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন—ভারত সরকার কর্তৃক মহাকবির স্মৃতি-রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় কালিদাস? সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়াই প্রেমিক ও রসিকদের হৃদয়ে মাত্র তিনি বিরাজ করিতেছেন, প্রভাবৎকাল তাঁহার জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-নিবাসের হদিস তো কেহ করিতে পারেন নাই। সাময়িক ভাবপ্রবণতা এবং রুচি ও মর্জি তাঁহাকে গুর্জর-মালব-গৌড়-মগধ-মদ্র-কলিঙ্গ-কাশ্মীর-রমণীদের বাচন-কটাক্ষ-বসন-ভূষণ-উরু-নিতম্ব-স্তনাদির প্রশস্তিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে; কিন্তু কোন্ দেশীয় মাতার স্তন্য পান করিয়া তিনি মানুষ হইয়াছেন সে পরিচয় কোথাও নাই। অবশ্য মহামান্য কে. এম. মুন্সীরা যেখানে এখনও আছেন সেখানে ব্যাধশরাহত শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত জীর্ণবাসবৎ দেহত্যাগের পরের ন্যায় কালিদাসের জন্মস্থানও অচিরাৎ আবিষ্কৃত হইতে বাধা নাই। যাহা হউক, আপাতত ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণনের সম্পাদকত্বে কালিদাসের সঠিক পাঠভেদসম্বলিত সংস্করণ দিল্লীর সাহিত্য-

আকাদামি হইতে প্রকাশিত হইতেছে—এই আশ্বাস দিয়া রাজ্যসভায় কবি-প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া হইলেও কবিরা যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিবেন এই আশ্বাসে আমরা পুলকিত হইয়াছি। কালিদাস হইতে কালিদাস রায়ের তফাত খুব বেশি নয়। শুধু প্রস্তাব তুলিবার অপেক্ষা শ্রীগোপীকৃষ্ণ বিজয়বর্গীয়ের এই প্রত্যাহৃত প্রস্তাবের মধ্যে একাধে কবিদেরও ভাবী উজ্জ্বলসম্ভাবনা নিহিত আছে সেই আশায় আমরা 'যুগান্তরে'র এই সম্পাদকীয় মতকে সমর্থন করিতেছি—

"যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার সমস্যা, করনীতি, নিরাপত্তা আইন, হিন্দু কোড ইত্যাদির কথাই ষোল আনা আসর জুড়িয়া থাকে, সেখানে হঠাৎ কাব্যসরস্বতীর র কল্পনাকুশলী কালিদাসের দেখা পাওয়া গিয়াছে, ঘটনা হিসাবে ইহা বাস্তবিকই অবি আর অভিনব বলিয়াই ব্যাপারটা সাদরে অভিনন্দিত হইবার যোগ্য।"

* * *

"কবির পুরস্কার" শিরোনামায় গত ৮ই চৈত্রের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'ও পাঠকদের অবহিত করাইয়াছেন যে, শুধু আণবিক বো রাজ্যসীমানা সমস্যা ও পররাষ্ট্রনীতি লইয়াই জগৎ নহে, কবিতা এ কবিরাও আছেন। যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ওই তারিখের পত্রিক লিখিত হইয়াছে তাহা সময়োচিত না হইতে পারে, কিন্তু সত যাঁহারা সাহিত্যের জন্য তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন, সাহিত্যে বিচারকেরা তাঁহাদের দাবি সর্বাগ্রে গ্রাহ্য করিলে সুখের বিষয় হইত এই প্রসঙ্গে মোহিতলাল সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা বাঙা সুধী মাত্রেরই সমর্থন লাভ করিবে। লেখক লিখিয়াছেন—

"আলোচকদের উচিত সত্যভাষী হওয়া—শিষ্টাচারের স্থান সত্যের নীচে। এই রকমের সত্যভাষণের সাহস এই বাংলা সাহিত্যেই একজন কবি ও সমালোচক কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেখাইয়াছিলেন এবং এখন দেখিতেছি মৃত্যুর পরেও তিনি বা তাঁহার পরিবা সেজন্য মূল্য দিতেছেন। তুলনা করিব না, তুলনার প্রয়োজনও নাই, কিন্তু বা আধুনিক গদ্যে ও কাব্যে মোহিতলাল মজুমদারের দান যে সামান্য নহে ইহা খুব লোককে অস্বীকার করিতে শুনি নাই। বাংলার দীন সমালোচনা-সাহিত্যে তিনি প্রাণ আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য তিনি সারা জীব সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি বাঙালী জাতি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে? ক হিসাবেই বা তাঁহার সন্মান কোথায়? তাঁহার পরিবারের অবস্থা ভাল নয়। তিনি

র সাহিত্যিক ছিলেন না, সাহিত্য তাঁহার সমগ্র জীবন অধিকার করিয়া ছিল, তাই অর্থ উপার্জন করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, রুচিও ছিল না। পরিবারের পূর্ণ তাই তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু পারিবারিক এই দুঃস্থতার উল্লেখ প্রসঙ্গত করা হইল। সম্মান ও পুরস্কারের উপর মোহিতলালের দাবী বাংলা তাঁহার দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের বিভিন্ন আকাদামি, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান মোহিতলালের স্মৃতি ও পরিবারের প্রতি আরও দীর্ঘকাল উদাসীন এমন সন্দেহের কারণ হইবে যে, সবগুলি পুরস্কার সব সময় শুদ্ধমাত্র সাহিত্যকীর্তির বিতরিত হইতেছে না এবং যোগ্যতা সত্ত্বেও সরকারী সাহায্য হইতে কেহ কেহ হইতেছে।"

* * * *

ংলা দেশের কবিদের অরণ্য কি নিবিড় ও কণ্টকাকীর্ণ তাহা উপলব্ধি ত হইলে উপরে উল্লিখিত মাসিক দুইটির সাহায্য লইতে হইবে। ও চেতন, ধন ও ধনহীনতা, কল্পনা ও বাস্তব ইত্যাদি ইত্যাদিকে করিয়া কত বিভিন্ন শ্রেণীর লতামণ্ডপ ও গুল্মসমাবেশ যে এই ণ্য ঘটিয়াছে, তালিকা না দেখিলে আমাদের প্রত্যয় হইত না। যে বই হউক, তবু আলোচনা হইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ।

* * * *

কবি-প্রসঙ্গ যখন হইতেছে তখন আমাদের স্নেহাস্পদ সাহিত্যিক বন্ধু কুমারেশ ঘোষ সম্প্রতি ইউরোপ ও নিকট-প্রাচ্য ভ্রমণ করিয়া [illegible]দাদ হইতে একটি যে রত্ন উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, তাহা অনুবাদে তাঁহারই ভূমিকাসহ নীচে হুবহু মুদ্রিত করিলাম।—

"বাগদাদের খালিফ তখন 'আরব্য-রজনী'-বিখ্যাত হারুন-অল-রশিদ। আব্বাসিদ বংশের প্রিয় খালিফ তিনি। যীশু জন্মাবার প্রায় ৮০০ বছর পরে মাত্র ২৩ বছরের জন্ম গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু তাঁর নাম জানে সারা জগতের ছোট্ট ছেলে থেকে বুড়োরা পর্যন্ত।

কিন্তু তাঁর সময়ের এক বিখ্যাত কবির নাম আমাদের অনেকেরই কাছে অজানা। সে অল-মাআআরি। এই বিদ্রোহী কবি অবশ্য বাগদাদে বাস করতেন না, করতেন খলিফের অধীন রাজ্য সিরিয়ায়। তখনকার দিনে কবিরা বেশির ভাগই রাজসভায় গান গেয়ে রাজপ্রাসাদের রাজপ্রসাদ লাভ করতেন। এ কবিটি কিন্তু সে সব গলেন না। তাঁর যা মনে এল তাই গাঁথলেন কবিতায়। অর্থাৎ সোনার খাঁচায় হরিষে-বিষাদে 'কুহু-উহু' না ক'রে গাছের ডালে ব'সে মনের আনন্দে 'কুহু-কুহু' ম।

র বছর বয়স যখন কবির, একদিন বসন্ত দেখা দিল তাঁর মনে নয়, দেহে। মাত্র

ময়ার একটি চোখ হারালেন তিনি। অবশ্য তাতে কিছু আসে-যায় না। যাঁর ম
খোলা, তাঁর দুটো চোখ গেলেই বা কি। তবে তিনি নিজেকে প্রায় বলতেন
অল-মাআ্যান, অর্থাৎ দু খাঁচার কয়েদী। অন্ধ হয়ে বন্ধ বাসায় বাস করাবে
ভবল জেলে বন্দী হয়ে থাকার সামিল ব'লেই মনে করতেন।

অল-মাআ্যাআরির শিক্ষাদীক্ষা সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে। পরে বাগদাদে
হবার, কিন্তু শেষের বার ফিরে এসে মাকে আর দেখতে পান নি। বাগদাদে
দেখা হয়েছিল এক হিন্দুর এবং সেই থেকেই তিনি হয়েছিলেন নিরামিষাশী।
বাকি ৪৫টা বছর আর তিনি মাছ-মাংসের দিকে ঘেঁষেন নি।

চিরকুমার কবি মরবার সময় দু ছত্র কবিতা লিখে ব'লে গেছলেন তাঁর কব
রাখতে। তাই আজো তাঁর কবরে লেখা :

"এই ভুল যেনো পিতা ক'রে গেছে মোর প্রতি,
আসিয়াছি হেথা তাই,
আমি করি নাই এ ভুল কখনো কারো প্রতি,
ব্যথা পেতে কেহ নাই।"

আরব কবিদের মধ্যে অল-মাআ্যাআরির স্থান বহু উচ্চে। আজও সিরিয়া
মাআ্যাআরির কবিতা অনেকেরই মুখস্থ। ১৯৪৪ সনে সিরিয়ার রাজধানী দ্ভা
আরব আকাদামি থেকে কবির সহস্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছে। সে
লেবানন, ট্রান্স জর্ডন, ইরাক, মিশর এবং আরও অনেক দেশ থেকে কবি-প্রতি
দান করেছিলেন। ইউরোপ আমেরিকা থেকেও প্রাচ্যভাবাপন্ন কবিদের
ও কবিতা পাওয়া গিয়েছিল এই সিরিয়ান কবির উদ্দেশে। ডামাস্কাসের এই
জন্মোৎসব আরব-সাহিত্য-ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রায় হাজার বছর আগে লেখা হ'লেও অল-মাআ্যাআরির 'রিসালাৎ-
এর কবিতাগুচ্ছ আজও সিরিয়ায় বহুসমাদৃত, বহু-আলোচিত। ফুকুল-অল-মা
কবি মুসলমানের চোখে কোরানকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর একটি উ
যোগ্য কবিতার অনুবাদ ক'রে দিলাম, যা থেকে তখনকার দিনের খানিকটা আ
পাওয়া যাবে :

"হাসি বটে, তবে ভুল ক'রে হাসি মোরা,
এ জগতে শুধু কাঁদো, কাঁদো আর কাঁদো,
কাচের মতন ভঙ্গুর ওরে তোরা,
জোড়া যায় নাকো, যতই কেন না বাঁধো।
একলা যখন চলতেই হবে, চলো;
বিবেক তোমার সঙ্গে যাবেই, যাক;

আইনকারের আইন ক'রো না "ঘলো",
বিবেকের কথা মাথায় তোমার থাক্ ॥

খ্রীষ্টানগুলো ধর্মের খাবি খায়,
মুসলিমগুলো মুষড়ে পড়েছে ওই,
দীরা দেখি হু-হু ক'রে কাঁদে হায়;
দেখেছ, নেপোয় মারছে দই !"

ার বছর আগেকার কবি শুধু সাধারণ মানুষের কথাই এখানে ন, তৎকালীন কবিদের অবস্থার উল্লেখ থাকিলে আমাদের সঙ্গ সরসতর হইত।

—

ালচারাল ডেলিগেশন বা সাংস্কৃতিক অভিযানের আর শেষ নাই। রা ঘরে ফিরিতে না ফিরিতেই এপ্রিলের শেষাশেষি চৈনিকেরা আসিতেছেন। শেষ চৈনিক দল তবু নাচের সার্কাস দেখাইয়া ছেন, চক্ষুকর্ণের কিছু তৃপ্তি হইয়াছে। কিন্তু আড়াই দিন বা দেড় জন্য দোভাষীর মাধ্যমে কয়েকজন বৈদেশিক শুধু 'আহা উহু সাব' আবার উড়িয়া চলিয়া গেলেই যে সংস্কৃতির বিনিময় হয়—সংস্কৃত এইরূপ নীচু ধারণা আমাদের নয়। পুরাকালে চীন ও ভারতবর্ষের শিল্প সাহিত্য ধর্ম তন্ত্রমন্ত্রের বিনিময় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এই- অভিযানের দ্বারা হয় নাই। একক তীর্থযাত্রী সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া ইষ্ট বা জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আসিয়াছেন য়াছেন, তবেই মহাচীনের সঙ্গে মহাভারতবর্ষ মিলিত হইতে াছে; তবেই ফাহিয়ান, আইসিং, হিউয়েনসাং মহাচীনে মহা- বর্ষকে চিনাইতে পারিয়াছেন; ভারতবর্ষের শীলভদ্র-দীপঙ্করদের ও বহুবিস্তৃত হইয়াছে। দুই দিনের জন্য উড়িয়া আসিয়া হৃদয় বসা যায় না। হৃদয়-বিনিময়ও হয় না।

—

চৈনিক সংবাদপত্রে একটি চিত্রগত সংবাদের প্রতি সকলের দৃষ্টি হইয়াছে কি না জানি না; কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞান

সভ্যতা সম্পর্কে যাঁহাদের মনে সংশয় ও সন্দেহ উপস্থিত হইয়া
চিত্র-সংবাদটি দেখিলে চমকিত হইবেন। ২৮ মার্চ
'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম পৃষ্ঠার গোড়াতেই ছবিটি
লেখা "তিমি মাছেদের পাইকারী আত্মহত্যা—অ
ওয়েস্ট রে উপসাগরের পয়েণ্ট অব কট্‌স্থিত প্রস্তর উ
ব্যাপিয়া ষাটেরও অধিক সংখ্যক তিমি মাছের শ
যাইতেছে—ইহারা আত্মহত্যা করিয়া মরিয়া
করিয়া এই অসাধ্য তাহারা সাধন করিল, এ
চিত্রটি দেখা মাত্র বিশ্বসাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের কথা
মনে হইল—১৮৫১ সনে লেখা 'মবি ডিক'; আমেরিকান লেখক
মেলভিলের (১৮১৯-১৮৯১)। ১৯২০ সন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনাদৃত
সৃষ্টি এই 'মবি ডিক'। কি এই 'মবি ডিক'? ডি. এইচ. লরেন্স
('স্টাডিজ ইন ক্ল্যাসিক আমেরিকান লিটারেচার'—একাদশ
শোনা যাক:

"মবি ডিক বা শ্বেত তিমি।

শিকার, শেষ মহাশিকার।

কি শিকার?

মবি ডিককে—বিরাট সাদা চর্বিদার তিমিকে শিকার। মবি
বুড়া হইয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গ পাকিয়া সাদা, প্রকৃতি তাহার রাক্ষুসে
একা সাঁতার দিয়া ফিরে। রাগিলে সে অক
ভয়ঙ্কর, কার
সে বারম্বার আক্রান্ত হইয়াছে, বরফের মত সাদা
গিয়াছে মবি

বলা বাহুল্য, মবি ডিক একটা প্রতীক।

কিসের প্রতীক?...

মবি ডিক কি? শ্বেতকায় জাতির গভীরতম শোণিত-সত্ত
সে আমাদের অন্তরতম রক্ত-প্রকৃতি।

আমাদের শ্বেত মানসিক চেতনা খুনে খ্যাপার মত তাহাকে
শিকার করিয়া ফিরিতেছে। আমরা তাহাকে একেবারে নিকাশ
চাই, তাহাকে আমাদের হাতের মুঠায় আনিয়া ফেলিতে

আমাদের এই সচেতন হত্যা-লীলায় কালো এবং আধময়লা জাতিরাও আমাদের সাহায্য করিতেছে; লাল, হলদে, কালো—পূর্ব, পশ্চিম—জিয়া (কোয়েকার) এবং অগ্নি-উপাসক সকলেই আসিয়াছে এই বীভৎস শিকারে আমাদের সাহায্য করিতে—এই শিকার মানেই আমাদের আমাদের আত্মহত্যা।"

কাজেই ইহুদিরা আত্মহত্যা করিয়া মরিবে ইহা বিচিত্র নয়। ভ্যার গোড়ায় জার্মানি, পরে আমেরিকা ইংলণ্ড ও য় প্রস্তুত আছে। হার্মান মেলভিলের 'মবি ডিকে'র মত তভাগ্য তিমিগুলাও প্রতীক। ক্রিসের প্রতীক?

—

২ বাদপত্রে দেখিলাম, আমাদের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী আজন্মব্রহ্মচারী ন্দ্র সেন গত ২৬ মার্চ শনিবারের বারবেলায় একটি "বিদ্যাধরী য়" স্থাপন করিয়াছেন। অন্য কেহ হইলে "ধন্য তোমারে জমন্ত্রী" বলিয়া তাঁহার "চরণপদ্মে নমস্কার" নিবেদন করিতাম। তাঁহাকে চিনি বলিয়াই বলিতেছি, আর বিদ্যাধরী বিদ্যালয় না ই ভাল করিতেন।

—

অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বলিয়া মহর্ষি 'ব্রহ্মসূত্র' আরম্ভ াছেন। অর্থাৎ এখন হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শুরু হইল। এতক্ষণ করা গিয়াছে তাহা বাজে, ফালতু। নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-পতি ঋষিকল্প শ্রীধেবরও গত ২৭ মার্চ তারিখে বোম্বাইয়ের বলাভূমি চৌপাটিতে এক জনসভায় বলিয়াছেন, "Hence-ি—" কি না "এখন হইতে সরকার কংগ্রেসের হুকুম অবশ্য মানিয়া রিবেন, কংগ্রেস যে এতদিন সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতেছিলেন রও আর হইবে না।" সব্যসাচী জওহরলাল এক হাতে কংগ্রেস-াষ্ট্রিত্ব এবং অন্য হাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্ব চালাইতেছিলেন, রের "অথাতঃ"র মধ্যে তৎপ্রতি ইঙ্গিত আছে কি না জানি না। এই প্রশ্নটা মনের মধ্যে জাগে—সর্বসাধারণের সরকার শুধু সের হুকুমই বা অবশ্য মানিতে যাইবেন কেন? আবাদি

কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিকতা হইতে এই কয়দিনের মধ্যেই কংগ্রেস কি এক-তান্ত্রিকতায় উত্তীর্ণ হইলেন? আমরা ভাবিত হইয়াছি।

* * *

শ্রীধেবরের একটি কথায় আমরা তাঁহার সৎসাহস দেখিয়া হইয়াছি। কলিকাতা ও বোম্বাই সভ্যতার সর্বনাশের মূল কারণ টানিয়া বাহির করিয়া সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—ওই বোম্বাইয়ে ২৭ মার্চের জনসভায়। কারণগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া সভ্যতাকে তিনি বলিয়াছেন, যথাক্রমে বাবু-সভ্যতা ও ফাট্‌কা-সভ্য কলিকাতার মানুষ একেবারে বাবু বনিয়া গিয়াছে, ভুলিয়াও ত গা ঘামাইবার কাজে হাত দিবে না। কলিকাতায় এ পাপ ঢুকে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও গল্প আছে—স্টেশন এক বাবুর হালকা পোর্টমেণ্টো বহিয়া তাঁহাকে লজ্জা দিতে চাহিয়াছি কিন্তু কলিকাতার বাবু যে লজ্জিত হন নাই তাহার প্রমাণ এখানকার বাবুদের শুধু মাথা ও উদর আছে, হাত ও পা নাই। কলিকাতা জুড়িয়া মস্তকযুক্ত কবন্ধেরা গড়াগড়ি যাইতে বোম্বাইয়ের অবস্থা গতরের দিক দিয়া এতখানি ভয়াবহ নহে, সেখানকার লোকেদের মাথায় ফাট্‌কাবাজির পোকা ঢুকিয়া স করিয়া ছাড়িয়াছে। শ্রীধেবর বলিতেছেন, বোম্বাইয়ে মানুষদের পর দেখা হইলেই সম্মুখবর্তী ধাবমান দুইটি মোটর গাড়ির অগ্রপশ্চাৎ লইয়াই বাজি ধরিয়া বসিবে। বোম্বাইয়ে কলিকাতার মত কেরানীর সৃষ্টি হয় নাই বটে, কিন্তু অর্থকরী বাজির উত্তেজনা ছা তাহারা একদণ্ডও টিকিতে পারে না। ধেবরজী ভালমানুষ লোক, ত দিল্লীর কেরামতি এখনও টের পান নাই। সেখানকার মানুষেরা প্রত্যেকে এক-একটি মদের পিপা হইয়া রাস্তায় গড়াইতেছে, সেটি লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। যাহাদের গড়াইতে দেখিয়াছেন ভাবিয়া তাহারা নিছক পিপামাত্র। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের এই মহানগরীর বৈশিষ্ট্য শুধু বজায় নাই—বাড়িয়াছে। "সত্য সেলুক বিচিত্র এই দেশ"—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ডি-এল-রায়ী কেন্দর বাদ উক্তি চিরন্তন হইয়া রহিল, তাই পুরীর সুবোদয়-মণ্ডপে আচার্য

বলিলেন, কলিযুগ অতিক্রান্ত হইতেছে, সত্যযুগ আগতপ্রায় ন আমরা তাঁহার জন্য নিরতিশয় দুঃখবোধ করিলাম।

—

পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীনলিনীকান্ত সরকার গত মাঘ সংখ্যায় কাশিত শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের "শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা" শ্রীঅরবিন্দের রচনা বলিয়া যে আটটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে তার প্রতিবাদ পাঠাইয়া দেখাইয়াছেন, সেগুলি শ্রীঅরবিন্দের রচনা নয়। াভাবে সমগ্র প্রতিবাদটি ছাপাইতে পারিলাম না। সংক্ষেপে হার যুক্তিগুলি (স্থানে স্থানে তাঁহারই ভাষায়) নিম্নে দিলাম।—

"যখন কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে আলিপুর বোমার মামলার কগুলি কাগজপত্রের ফোটোগ্রাফ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তখন ওই তাগুলি প্রদর্শনীর দ্রব্যসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় কয়েকটি তা হস্তলিপির ব্লকের আকারে শ্রীঅরবিন্দের রচিত বলিয়া কয়েকখানি ক পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল।...দেখিয়া...শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কবিতাগুলি শ্রীঅরবিন্দের া নয়—শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের রচিত;—হস্তাক্ষরও ীন্দ্রকুমারের।" এই সংবাদ নলিনীকান্ত সরকার আমাদের দেন এবং ন্দ্রবাবু কবিতাগুলি সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছেন নিয়া আমরা তাঁহাকেও তাহা বলি। নগেন্দ্রবাবু এই উক্তিকে তপক্ষ খাড়া করিয়া তাঁহার রচনাতে ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে চেষ্টা য়াছেন এই ভাবে, "অরবিন্দের সহধর্মিণী স্বর্গীয়া মৃণালিনী দেবীকে খিত পত্রাবলীও প্রদর্শিত বস্তুর মধ্যে ছিল। অরবিন্দের ৪৮ নং ষ্ট্রীটের বাসভবনে...এই পত্র কয়খানি এবং কবিতাগুলি অন্যান্য ব্যের সহিত পুলিস হস্তগত করে।...হস্তলিপি-বিশারদের সাহায্য ইহাই বলা যায় যে, পত্র কয়খানি ও কবিতাগুলি একই হাতের লেখা।" নগেন্দ্রবাবু বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে "তিনি বলিলেন যে, কাতায় তিনি কোনদিনই সেজদার (অরবিন্দের) সঙ্গে বাস করেন । সুতরাং তাঁহার হাতের লেখা কোন পাণ্ডুলিপি অরবিন্দের -ভবনে পুলিসের হস্তগত হইতে পারে না।"

হাতের লেখার মিলের কথা নলিনীকান্ত স্বয়ং মূল পাণ্ডুলিপি দে
বাতিল করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু দেখিয়াছেন ফোটোগ্রাফ, নলিনীক
দেখিয়াছেন মূল; মূলে দুই লেখার পার্থক্য স্পষ্ট। ফোটোগ্রা
অস্পষ্টতা ও ক্ষুদ্রায়তন নগেন্দ্রবাবুকে ভ্রান্ত করিয়াছে। বারীন্দ্রকু
কথাও সত্য, কারণ নলিনীকান্ত আলিপুর মামলার নথিপত্র
দেখাইয়াছেন, কবিতাগুলি আদৌ অরবিন্দের গ্রে স্ট্রীট ভবনে পাও
নাই, পাওয়া গিয়াছিল ৩২নং মুরারিপুকুর রোডের বাগানবা
বারীন্দ্রের আস্তানায়। অরবিন্দের কোনও পাণ্ডুলিপি সেখানে ছি
নলিনীকান্ত লিখিয়াছেন, "নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'আটটি ক
কাগজের ছোট ছোট স্লিপে লেখা হইয়াছিল।' তা নয়।
একখানি খাতার এক-একটি পৃষ্ঠা। কবিতা আটটি যে-খাতায়
আছে, তাহাতে সরকারী একজিবিটের নম্বর রহিয়াছে ২৬৩। ...
পক্ষের উকিল বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের একখানি বই আছে—
Alipore Bomb Trial...উহাতে মুদ্রিত আছে যে, ২৩৮
২৭৫ সংখ্যক একজিবিটগুলি ৩২নং মুরারিপুকুর রোডে
গিয়াছিল। সেই সূত্রে ২৬৩ নং একজিবিটের পরিচয়ে লিখিত হ
'Bundle of manuscript Bengali Note-books."

নলিনীকান্ত উপসংহারে লিখিয়াছেন, "কবিতাগুলি অরবি
লিখিত বলিয়া আদালতে প্রমাণিত হয়—নগেন্দ্রবাবুর এই উক্তি
...নগেন্দ্রবাবু আশ্বস্ত হউন। গেলই বা আটটি কবিতা। শ্রীঅর
রচিত বহু বাংলা কবিতা আছে—কোনটি সম্পূর্ণ, কো
অসম্পূর্ণ। এমন কি একখানি বাংলা কাব্যগ্রন্থ লিখিতেও তিনি
হইয়াছিলেন, তাহারও পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে। এসব
যে কারণেই হউক, শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন
শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে এই রচনাসম্পদ সযত্নে সুরক্ষিত আছে,
কোনদিন প্রকাশিত হইতেও পারে।"

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার